

CUK-448A1 -11- 24842A



11

756.3
017/85



প্রতিষ্ঠা-প্রবন্ধ সমিতি লাল ★ বৈশাখ : ১৩৭.

আনন্দ উৎসবে
ক. হোডের
প্রসারিত সামগ্রী



কনক স্নো
কনক সেন্ট
মহাভূদ্ররাজ তৈল
কনক টয়ালেট পাউডার
জেস্মিন সুগন্ধি কেশোতল

সুশ্লিষ্ট কমনীয় কান্তি, সৌন্দর্য্য ও
শ্রী সন্দীপনে সর্বোৎকৃষ্ট উপচার

মোহিনী মিলস্, লিমিটেড

১নং মিল :
কুষ্টিয়া (পাকিস্তান)

২নং মিল :
বেলঘরিয়া (ভারত রাষ্ট্র)

ম্যানেজিং এজেন্টস্—চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং
২২নং ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা

এই মিলের ধূতি সাড়ী প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে
ধনীর প্রাসাদ হইতে কাদালের কুটার পর্য্যন্ত
সর্বত্রই সমভাবে সমাদৃত—

কুমারেশ

লিভার ও পেটের পীড়ায়

নিয়মিত কুমারেশ সেবনে লিভার ভাল থাকে, অজীর্ণ
অক্ষুধা, পেটকাঁপা প্রভৃতি রোগে ভুগতে হয় না।
খিটখিটে মেজাজ, সহজে ক্রোধ প্রভৃতি উপসর্গও দেখা
দেয় না।



সর্দি ও কাশিতে

রেস্পেরোসিন

সালফা-ডারমিন

পোড়া, কাট, দাগ, ব্রণ
বাবতীয় ও চর্মরোগে



ও. আবু সি এল. লি.
কুমারেশ হাউস হাওড়া

প্রবন্ধ



বার্ষিক সূচীপত্র : বৈশাখ—চৈত্র : ১৩৭১

লেখক-নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী। প্রঃ=প্রবন্ধ; নিঃ=নিবন্ধ; গঃ=গল্প; নঃ=নন্দা; উঃ=উপন্যাস
চিঃ=চিত্র; কঃ=কবিতা; জীঃ=জীবনী; জীঃ চিঃ=জীবন-চিত্র; কাঃ কাঃ=কাব্য-কাহিনী; আঃ আঃ=
আলাপ ও আলোচনা; আঃ=আলোচনা; ভঃ=ভ্রমণ; গীঃ আঃ=গীতি আলোচনা; নাঃ=নাটক;
গীঃ নাঃ=গীতিনাট্য; সঃ=সমালোচনা; রঃ রঃ=রম্য রচনা; সঃ বঃ=সত্য ঘটনা]

মনিলাবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ	শ্রীকৃষ্ণা মৌলিক এম. এ.	
ধর্মেদ (নিঃ) ২, ৫০, ৮৬, ১২২, ১৫৮, ২২৪, ৩৩০, ৩৬৬, ৪০২, ৪৩৮	অল্পম নেহেরু (প্রঃ)	৫৫
গাজ্জিদ্ ইল্ল (নিঃ) ৩১২	শ্রীকুলদারঞ্জন মজুমদার	
রুণচন্দ্র দত্ত	ভুলের স্বর্গ (কঃ)	১০৪
কয়তুতীয়ার বাণী ও ঐতিহ্য (প্রঃ) ১৭	শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	
পূর্ববর্তক সজ্জ-সভাপতি নলিনচন্দ্র (জীঃ) ২৬৬	মহাভারতের বিহ্বল (প্রঃ)	১৫২
নীষি মন্দির (জীঃ) ৩০১	ডঃ কমলকৃষ্ণ বসু	
কয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	সাহিত্যসাধক শ্রীশুরেশচন্দ্র (জীঃ)	১৬৩
নহেরু ভগবানের বিশেষ বিভূতি (প্রঃ) ৫৩	শ্রীকালীপদ মণ্ডল	
সমর্পণ (প্রঃ) ১৮২	নীরব কক্ষী রামেন্দ্রসুন্দর (জীঃ)	১৭৬
বৈজ্ঞানিকের ঈশ্বরবিকার (প্রঃ) ১২৭	উইলিয়ম কেরী ও রামরায় বসু (প্রঃ)	৩৬৭
ধুমিয়া সেন	শ্রীকালিদাস রায়	
সাহিত্যিক শ্রীনেহেরু (প্রঃ) ৬৩	স্বর্গ ও মর্ত্য (কঃ)	২০০
নব বোধন (প্রঃ) ১২৬	শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়	
নিউ দিল্লীর নেপথ্যে (আঃ) ৪২৭, ৪৫৪	সবারই নলিনদা (জীঃ)	২৭৩
মরী আরতি দত্ত	শ্রীকনকপ্রভা দাশগুপ্তা	
শ্রুতধর (প্রঃ) ২৮১	মৃত্যু-দীপণ (কঃ)	২৮০
ইন্দু গুপ্ত	শ্রীকণা দেবীভারতী	
আষাঢ় প্রথম দিবসে (কঃ) ১৩১	মুক্তির মোহ (গঃ)	৪০৭
উত্তর (কঃ) ২৬২	শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত	
নিবারণের বৈঠক (গঃ) ৩২৩	বছরের প্রথম দিনটি (প্রঃ)	১৫
একটি একাক্ষ নাটিকা (গঃ) ৩২৭	শ্রীগণেশচন্দ্র সামন্ত	
মাপদ নাথ	নেহেরু বিষোদগে (কঃ)	৫২
প্রবর্তক সম্বন্ধে একজন লেখকের মতামত	জননী (কঃ)	৩৩৮
তি রিশে ভাদ্র (কঃ) ২৪১	শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যাতীর্থ	
ঈশচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ	একখানি চিঠি (চিঃ)	১০৫
অক্ষয় তৃতীয়া ও বৈদিক সংস্কৃতি (প্রঃ) ৫	সংহতি রক্ষার সত্বপায় (প্রঃ)	৪৫১
মুদ্ররঞ্জন মল্লিক	শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী	
জগৎ শ্রীমতিলাল (কঃ) ২২	আবালা আনি বলেই বলছি (প্রঃ)	১৪৩
টি সমাজ (কঃ) ২০০	ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর মহাসিদ্ধি (প্রঃ)	৪২০
ব. গাশঙ্কর ভট্টাচার্য	শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	
বংশাধারা প্রসঙ্গে ৪৪, ৮১	অস্তুরাল পদ্য (কঃ)	১৪৫

শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়		শ্রীধনঞ্জয় চক্রবর্তী	
উপলব্ধি (চিঃ)	১৪৫	পাগলিনী শ্যামা (কঃ)	
স্বীকৃতি (চিঃ)	৪৩২	উর মা বাণী (কঃ)	৩৬
শ্রীজগন্নাথ সাহা		শ্রীনিত্যাগোপাল ভট্টাচার্য	
নেহেরু নাই (প্রঃ)	৫১	ভারতীয় কৃষ্টি ও সনাতন ঐতিহ্য (প্রঃ)	১
শ্রীজলধর বিশ্বাস		শ্রীনরেন্দ্র দেব	
জগদ্বরলাল (কঃ)	৬৩	অরণ্যে (কঃ)	
যখন বহিবে না ভাগীরথী (কঃ)	২৪০	ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত	
শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী		স্বাস্থ্যকথা (প্রঃ)	
স্বনীতি ও স্মৃতি সংবাদ (গঃ)	২০৪	শ্রীনিমাইচরণ বসু	
শ্রীতারাকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়		প্রাচীন তামিল সাহিত্যে	
বিজ্ঞানধর্মী নহেরু (প্রঃ)	৬১	সমাজ-শাসনের আদর্শ (প্রঃ)	
পুষ্যতিথি পূর্ণিমা (প্রঃ)	১৩৯	শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত	
নূতন পবরাষ্ট্র মন্ত্রী (প্রঃ)	১৮০	আত্মকথা (জীঃ)	
যুগপুরুষ শ্রীমতিলাল (প্রঃ)	৩৭৬	শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত	
সংহতির অপমৃত্যু (প্রঃ)	৪২৫	প্রথম স্পর্শ (প্রঃ)	
শ্রীতারাকিশোর বর্দন		শ্রীনির্মল রায়	
রাষ্ট্রনীতির কূটিল গতি (প্রঃ)	১১৩	দৃষ্টিকোণ (গঃ)	
ভারত রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি (প্রঃ)	১৮৩	স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী	
ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার		শরণ-প্রশস্তি (কঃ)	
বঙ্গের দুর্গোৎসবের ইতিকথা (প্রঃ)	২২০	শ্রীদুর্গাপ্রশস্তিঃ (কঃ)	
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী		শ্রীদুর্গাবিভূতিঃ (প্রঃ)	
প্রবন্ধক (গঃ)	২২৩	মহর্ষি প্রেমানন্দ	
শ্রীতৃপ্তি মুখোপাধ্যায়		নববর্ষের প্রার্থনা (কঃ)	
ছেলেধরা (জীঃ চিঃ)	৩১৪	একাদশ বৎসরারম্ভে (কঃ)	
শ্রীতুষার দে		শ্রীশ্রীচণ্ডী ও সত্যপ্রতিষ্ঠা : চণ্ডমুণ্ড বধ (প্রঃ)	
তরুণ সমাজের প্রতি সম্বন্ধক (নিঃ)	৪৪৮	বিজয়া (কঃ)	
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচতুর্ধী		জননী রাধারাণীর স্বরূপ (নিঃ)	
ভারত বন্দনা (কঃ)	২৫১	শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য	
শ্রীদৌণ্ডোপল রায়		সমবেত আত্মিক (প্রঃ)	
সাম্প্রতিক কবিতা প্রসঙ্গে (প্রঃ)	৪৬৬	নাম তাঁর মতিলাল রায় (কঃ)	
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার		শ্রীপ্রমদাকান্ত আচার্য	
প্রচ্ছদপট (কঃ)	২৮	ছোটলোক (গঃ)	
কালচক্র (কঃ)	৩৭১	প্রপঞ্চ (গঃ)	
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর		শ্রীপ্রতিভাবালা বর্দন	
শিল্পীমণ (উঃ) ৩২, ৭৫, ১০৭, ১২৭, ১৬৫, ২১৬, ২৫৬, ২৯৭, ৩৩৫, ৩৭২, ৪১৭		আত্মপনা শিল্প (প্রঃ)	
কবি জগদ্বরলাল (প্রঃ)	৫৭	শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
ভেজিটেবল দি (আঃ)	১৪৭	ফরাসী চন্দনগরের কামান (প্রঃ)	
স্কুল ফাইন্যাল (আঃ)	১৮৫	শ্রীপ্রবীর বিশ্বাস	
মৌন মিছিল (নিঃ)	৪২৩	অমর বাংলা (কঃ)	
শিক্ষা-ভাবনা (আঃ)	৪৬৩	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	
		বিজ্ঞাপন (কঃ)	

বিষয়		বিবর্তকের পঞ্চশালা (গঃ)	১৭৪
উপবাস ও আয়ুর্বেদ	৩৬	পাণ্ডপাঞ্জী (গঃ)	২৩৭
সম্পাদকীয়	৩৮, ৭২, ১১৪, ১৪২, ১৮৭, ২২৮, ২৮৬, ৩২০, ৩৫৮, ৩৯১, ৪২২, ৪৬৮	সারল্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি (প্রঃ)	২৭০
একটি রূপক গল্প	৪১	সম্বৎসর অরণে (কঃ)	৩৭৫
সমালোচনা	৪৬, ১১৮, ১৫৪, ২৮২, ৩২৫, ৪৭৩,	শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস	
সাময়িকী	৪৭, ৮০, ১১৯, ১৫৫, ১৯১, ২৪৬, ২৯০, ৩২৬, ৩৬৩, ৩৯৮, ৪৩৩, ৪৭৫	একটি সন্ধ্যায় (গঃ)	১৪০
নেহেরু জীবনের রূপরেখা	৬৭	কুমারী মমতা দাস	
মহাপ্রয়াণে সম্ব-সভাপতি শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত	২৬৩	আমাদের নলিনদা (জীঃ)	২৬২
প্রজ্ঞাঞ্জলি	২৮৩	শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক	
বীরেন্দ্রচন্দ্র পুরকায়স্থ		সাধক নলিনচন্দ্র	২৭৬
ভারতের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা (প্রঃ)	৩৭	শ্রীমতিলাল দাশ	
বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত		যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের শিক্ষা (প্রঃ)	৩৬২
মরমী কবি করুণানিধান অরণে (কঃ)	১৩৮	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	
মৃত্যু তোমা করে নাই মান (কঃ)	২৭৮	মহাপ্রয়াণে (কঃ)	৫৪
মী বিশ্বরূপানন্দ		কবি করুণানিধানের কথাপ্রসঙ্গে (প্রঃ)	১৩৪
বীরবালা চম্পা (গঃ)	১৪৪	জরুরালা পুনর্বিবাহ (কাঃ কাঃ)	২০২
বংশী মণ্ডল		সম্বৎসর তিরানীতম জন্ম-জয়ন্তী (কঃ)	৩৮৪
প্রতিমা (কঃ)	২৪১	সম্বৎসর জন্মোৎসব (কঃ)	৪২৬
বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস		হুটি সনেট (কঃ)	৪৬৫
পুণ্যস্থিতি (প্রঃ)	২৭২	শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী	
আবিষ্কার (চিঃ)	৩৩৪	শ্রীনেহেরু প্রশান্তিঃ (প্রঃ)	৫১
ভেরবপ্রসাদ হালদার		সুস্বপ্নজুর্বেদের আদিকথা (প্রঃ)	২৯৫
পুরুষসিংহ আন্তোতোষ (জীঃ)	২৫	ভাষাতত্ত্বের গোড়ার কথা (প্রঃ)	৩৮৬
কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন (প্রঃ)	১৩২	ভারতের রাষ্ট্রভাষা	৪১৩
কুম. সংবাদ-পরিক্রমা (প্রঃ)	১৭৮	শ্রীরাজমোহন নাথ	
নাগা সমস্যা ও ভারতবর্ষ (প্রঃ)	৩১৬	চৌরঙ্গী রাস্তা (প্রঃ)	১১১
শ্রী. হিমালয়-কথা ভূটান (প্রঃ)	৪১০	বৈদিক সর্পরাজী (প্রঃ)	৩৩১
স্বঘুরে		একখানি চিঠি (পঃ)	৩৭৮
বসন্তপথ (কঃ)	২০৮	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী	
স্বগুরু শ্রীমতিলাল		বেদোক্ত গৌতম-অহল্যা ও ইন্দ্র (প্রঃ)	১২৩
নববর্ষের বাণী (প্রঃ)	১	শ্রীরাজকুমার লাহিড়ী	
শ্রী. অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব (প্রঃ)	১০	দৃশ্য পরিচয় (কঃ)	১৪২
জীবনের আলো	৪২, ৮৫, ১২১, ১৫৭, ২৪২, ২৯৩, ৩২২, ৩৬৫, ৪০১, ৪৩৭	কুমারী রেণুকণা ঘোষ	
ভারত জাতীয়তার ভিত্তি (প্রঃ)	১৫৮	মাতা ধরিত্রীর ক্রন্দন (প্রঃ)	২৩৫
মহাপূজার বোধন (প্রঃ)	১২৩	শেষ শয়ান পার্শ্বে (প্রঃ)	২৭৩
গনোজ দাস		শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য	
কি পেয়েছি আর কি পাইনি (প্রঃ)	৬৪	পূর্ণ হোক এই নিবেদন (কঃ)	২৪৫
বাংলার বিগত মনীষী অরণে (প্রঃ)	১২৫	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	
শ্রী. মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়		মুকুতার (সঃ)	৩১২
ভারতের লগুন (গঃ)	৭৭	শ্রীরাধাবল্লভ দে	
		ভারতে কুটার-শিল্প (আঃ)	৩১৫
		ভারতের বেকার সমস্যা (প্রঃ)	৪২২
		ভারতের দারিদ্র্য (প্রঃ)	৪৫৭

শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার		শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু. এম. এ.	
জাতীয় ভাষারূপে সংস্কৃতির স্থান (প্রঃ)	৩৮২	স্বন্দরের আবির্ভাব (প্রঃ)	
শ্রীরমণ		শ্রীসমীরণ কর	
শ্রীশ্রীধর্মনারায়ণ (নিঃ)	৩২৫	আমি কবি (কঃ)	
শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়		শ্রীসাধনপ্রসাদ দাশগুপ্ত	
শব্দক (প্রঃ)	৪৪২	বকুলগাছের তলায় (গঃ)	
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়		শ্রীসন্তোষকুমার দে	
অবিস্মরণীয় (নিঃ)	২৮২	ভারতের ভাষা-সমস্যা (প্রঃ)	
শ্রীশান্তশীল দাশ		শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য	
সশ্রদ্ধ স্মরণ (কঃ)	২৩	বোধন (কঃ)	
সম্বৎসর শ্রীমতিলাল (কঃ)	৩৮৫	ডঃ হরগোপাল বিশ্বাস	
শ্রীশৈলদেব বিদ্যাবিনোদ		পণ্ডিত নেহেরুর আত্মজীবনী কথা (প্রঃ)	
ভারতীয় ভৈষজ্যবিজ্ঞান (প্রঃ)	২০	বাংলা ভাষা প্রসারের অন্তরায় (প্রঃ)	১০
শ্রীশ্যামাদাস দে		ভাষা সমস্যা ও তার চূড়ান্ত নির্দেশ (প্রঃ)	৪০
উইলিয়ম সেক্সপীয়র (প্রঃ)	১২৪	শ্রীহংস	
শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ		দেবে এলাম চন্দ্রনগর (স্রঃ কাঃ)	৩
বৈষ্ণবকাব্যে রাধাপ্রীতি (প্রঃ)	৩১০	শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত	
শ্রীশীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		আগমনী (স্রঃ লিঃ)	২৫
বক্রেশ্বর মহাপীঠ (প্রঃ)	৩২৯		
শ্রীশশী রায়			
সম্বৎ শরণঃ (আঃ)	৩৪২		
শ্রীমুখীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী			
সেকালের নববর্ষ (প্রঃ)	৮		
জহরলাল আবার আসিবে (প্রঃ)	৬৫		
খেলায় মাঠের স্মৃতি (প্রঃ)	১৬২		
শোধবোধ (গঃ)	৪৫৮		
শ্রীশুরেশচন্দ্র মজুমদার			
স্মৃতি কথা (প্রঃ)	১১		
শ্রীমুখীর গুপ্ত			
ভারত-জহর (কঃ)	৫৪		
মাঘের লীলা (কঃ)	১২২		
জহর-জ্যোতিঃ (কঃ)	২৬০		
শ্রীমুদর্শন চক্রবর্তী			
একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি (প্রঃ)	৬০		
‘সংস্মৃতা সংস্মৃতা’ (প্রঃ)	২২২		
শ্রীমুখমা মৈত্র			
অমর জহর (কঃ)	৭১		
আনাড়ী যোদ্ধা (কঃ)	২৩২		
শ্রীসত্যেন্দ্র জ্ঞান			
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র (কঃ)	১৬১		
শ্রীমুখীল চৌধুরী			
অপরূপ রূপকুণ্ড (স্রঃ কাঃ) ২১১ ; পুতুল (গঃ) ৩৮১			

চিত্রসূচী

বৈশাখ—অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব প্রতিষ্ঠাতা সম্বৎসর
শ্রীমতিলাল ১৯ ; যোগ ও ব্রহ্মবিজ্ঞান মন্দির ২১ ; মহাত্মা
গান্ধী ও সম্বৎসর ২২ ; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও সম্বৎসর
২৩ ; নিখিল ভারতের সমাগত সাধুগণ ২৫ ।

জ্যৈষ্ঠ—জহরলাল ৫১ ; ঐ (রেখাচিত্র) ৫০
পণ্ডিত নেহেরুর একখানি অপ্রকাশিত চিত্র ৬১ ।

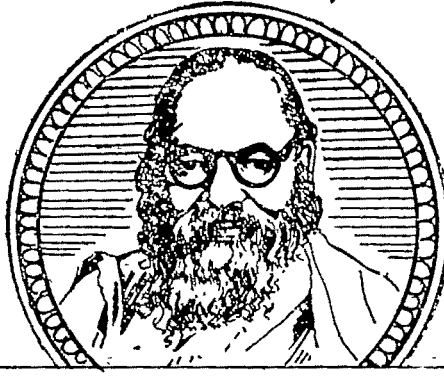
আষাঢ়—স্মার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৯৫ ।

আশ্বিন—বিজ্ঞা: সমস্তান্তবদেবি (দুর্গা দেবী
আল্পনা ২০১-২০৩ ; হোমকুণ্ডের সন্নিকটে স্থাপি-
শিবির ও অভিযাত্রীগণ ২১১ ; রূপকুণ্ডের দুর্গম স্র-
পথ ২১৩ ; শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ২২৫ ; আচার্য
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ২২৫ ; স্বামী বিবেকানন্দ ২২৬ ;
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ২২৬ ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২২৭ ;
হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৭ ; সম্বৎসর শ্রীমতিলাল
(আর্ট প্লেট) ; ফরাসী চন্দ্রনগরের কামান ২৩৫
ঠাকুর অহঙ্কুলচন্দ্র ২৪১ ।

কার্তিক—সম্বৎ-সভাপতি শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত ২৫

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ২৮৮ ।

অগ্রহায়ণ—আচার্য্য ব্রজেননাথ শীল ৩০১ ; আচ-
ব্রজেননাথের পত্র ৩০৬ ।



৪৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

প্রবন্ধ

বৈশাখ, ১৩৭১

নববর্ষের বাণী

সর্বাপেক্ষা যে বৃহৎ প্রেরণাটি শ্রীভগবান আমার মনে জাগিয়ে তুলেছেন, সেই প্রেরণার কথাই আজ নববর্ষের প্রথম দিনে ব্যক্ত করব। জাতিকে বাঁচতে হবে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে—ইহা ভাগবৎ প্রেরণা। কিন্তু শুধু বাঁচার জন্তও নহে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্তও নহে—যার জন্ত বাঁচা, স্বাধীনতা রক্ষা করা, তারই ভিত্তির উপর জাতির প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। তাহা আর অল্প কিছু নহে, আমাদের আত্ম-সংস্কৃতি। এই আত্ম-শুদ্ধোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে—ইহা ভারতসংস্কৃতি, ভারতের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির উদ্ধার সাধনের প্রয়োজন আছে। ইহার জন্ত বাঙ্গালীকেই আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। আত্মগঠনের ভিত্তির উপর আত্মরক্ষার ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে। যদি এখানে আমাদের দৌর্বল্য প্রকাশ হয়, যদি আমরা টিকে থাকার স্পর্ধা না রাখি, কোন্‌ ভরসায় এ দেশ ধর্মের দেশ বলে', অতিমানবের দেশ বলে' গর্ব করবে? ধর্ম ভীষণতা নয়, অতিমানবতা পঙ্খ, ক্রীবৎ নয়। ধর্ম দুর্বল চিন্তে মুক্তির মরীচিকা সৃষ্টি করে না, কাল্পনিক স্বর্গের ছায়ার খুলে দেয় না। অতিমানবতা মানুষকে প্রত্যয়হীন করে না। অতিমানব ভণ্ড, পাবণের দল নয়। আত্ম-সংস্কৃতির উপর ভর করে দাঁড়াবার শক্তি অতিমানব রাখে। কোথাও আছে এই ধর্মবীৰ্য্যাপ্ত অতিমানবের দল—জাতি স্বজনের বজ্রবাণী নববর্ষের প্রথম দিনে তোমাদের শোনাতে চাই।

জাগ অতিমানবের দল! কণ্ঠে কণ্ঠে ইরশাদ গজ্জনে হিমালয়ের উন্নত শির কাঁপিয়ে তোল। সমুদ্র বক্ষ ছলে উঠুক তোমার ভীম-ভৈরব নিনাদে। বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হোক তোমার পাঞ্চজন্তে। অবাস্তব ধর্মপ্রবৃত্তি পুড়িয়ে ছাই করে দাও তোমার জীবনবাদের ঘোষণায়। বাঙ্গালীর হিমায় বাঁচার প্রেরণা জাগুক। ভূয়া কড়ির মত কাঁকির অতিমানবতা পায়ের তলায় রেখে জগতের ডাকে আজ সাড়া দিতে হবে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত প্রাণ বলী দিতে হবে বাঙ্গালীকেই সর্বপ্রাণে। বাঙ্গালীর প্রাণের আহুতিতেই পৃথিবীর সকল জাতির প্রাণে আগুন জ্বলে উঠবে। হে বীর বাঙ্গালী! প্রাণ দেওয়ার খেলায় এগিয়ে এস—গড়ে তোল নূতন সমাজ—ঐক্যবদ্ধ সংহতি। আশ্রয় কর শিক্ষাদীক্ষার নব-বিধান। আবার বাঙ্গালী ভারতের পথ-প্রদর্শকরূপে অগ্রণী হোক দিশারীর জয়টাকা ললাটে এঁকে। তার জন্ত চাই চরিত্রবল। চাই এক অধ্যয়, অজান্ত মতবদ্ধ। চাই সংহতিবদ্ধ শক্ত মনের মানুষ। ঈশ্বরের দান তবেই নেমে আসবে ধর্ম অর্থ কামের আশীর্বাদ



ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

(প্রথমঃ অষ্টকং। সপ্তত্রিংশং সূক্তং।) অষ্টমী ঋক্

(সম্ভবতঃ শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

যেযাজ্জমেষু পৃথিবী জুজুর্ক। ইব বিশ্পতিঃ।

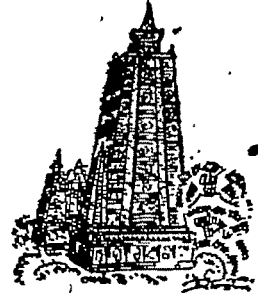
ভিয়া যামেষু রেজতে ॥ ৮ ॥

অর্থ—“যেযাজ্জ” (যে, আপনাদের) “যামেষু” (গমনকালের) “জুজুর্ক” (বিক্ষেপ হেতু) “ভিয়া” (ভয় প্রযুক্ত) “পৃথিবী” (পৃথিবী, ভূমি) “রেজতে” (কম্পিতা হইয়া থাকেন) [সে কেমন? না] “জুজুর্কান ইব বিশ্পতিঃ” (বৃদ্ধ নিবন্ধন এবং রোগাদি হেতু জীর্ণ প্রজাপালকের দ্বায়) ॥ ৮ ॥

সরসার্থ—বৃদ্ধ নিবন্ধন এবং রোগাদি হেতু জীর্ণ শত্রুভয়ে ভীত প্রজাপালকের দ্বায় হে মরুদেবগণ পৃথিবীও তোমাদের গমনকালের বিক্ষেপ হেতু ভয় প্রযুক্ত কম্পিতা হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশদার্থ—পূর্ব ঋকে আমরা বায়ুর দুইটি দ্বার গতির পরিচয় পাইয়াছি—একটি গতিশীল, অপরটি স্থিতিশীল। এই ঋকে ঋষি গতিশীলতারই আরও একটু বিশদ বর্ণনা প্রদান করিতেছেন “যামেষু”-র সঙ্গে “জুজুর্ক” পদটি যোগ করিয়া। গতি এবং ক্ষেপণার্থক “জুজুর্ক” বাতুই জুজুর্ক পদের মূল। উপমা সহযোগে বিষয়বস্তুকে সহজভাবে বোধগম্য করাইবার প্রচেষ্টা বৈদিক সাহিত্যের একটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য। এই ঋকে এই বৈশিষ্ট্যেরও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবল বায়ুর দ্বার গতিবেগে পৃথিবী কম্পিতা হন—সে কেমন? উদাহরণ দিয়া ঋষি বলিতেছেন, যেমন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ রাজা শত্রুভয়ে ভীত হন, সেই রকম। প্রচলিত প্রবাদবাক্যে আছে—“যা আছে ভাঙে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।” যে বায়ু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সেই বায়ুই আমাদের দেহভাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছে। দেহমধ্যস্থিত এই বায়ুরই নাম প্রাণ। প্রাণই পঞ্চা বিভক্ত হইয়া যানবের দেহেন্দ্রিয়কে সংযমিত করিয়া রাখে, মাংসের মধ্যে কৰ্ম্মপ্রেরণার সৃষ্টি করিয়া জীবনকে নিত্য গতিশীল ও অস্তী হইয়া করিয়া তুলে। কিন্তু কালধর্ম্মে দেহেন্দ্রিয়গুলি যখন শিথিল হইয়া পড়ে, তখন প্রাণবায়ুর উদ্দাম গতিবেগ ধারণে অসমর্থ হয়। সামর্থ্যহীনতাই ভয়ের জনক। অসমর্থ জীব সর্বদাই সম্ভ্রান্ত থাকে পর শত্রুর আক্রমণ ভয়ে। শত্রু দুই রকম ধরা যায়। এক বাহিরের পরাক্রমী প্রতিরোধী কোন শক্তি আর অপরটি হইতেছে অন্তরেরই স্নায়ুদৌর্বল্য। মাংসের মধ্যে প্রাণশক্তি যখন সতেজ ও সবল থাকে, তখন সে রোগবীজাণুগুলি যত সহজে পর্য়াদন্ত করিতে পারে—ইন্দ্রিয় দৌর্বল্য হেতু প্রাণশক্তি স্তিমিত হইয়া পড়িলে তাহা আর সম্ভবপর হয় না। তাই সর্বদাই সে হয় “ভীয়া”—শত্রুভয়ে ভীত। ঋষি বলিতেছেন—এইরূপ ভীত রাজ্যপালের দ্বায় পৃথিবীও ভীত। কম্পিতা হইতে থাকেন প্রবল বায়ুর দুর্দমনীয় গতিবেগে।

স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—যে দ্বার গতিসম্পন্ন মরুদেবগণ জিলোক নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাঁহাদের উৎপত্তিস্থান কোথায়? কি ভাবেই বা তাঁরা সৃষ্ট হইলেন? পরবর্তী মন্ত্রসমূহে ঋষি সেই সব প্রশ্নের যথাক্রমে উত্তর দান করিবেন।



শরণ-প্রশস্তি

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী

ঘোরা ঘূর্ণিৱর্তী বচশ্চবনা ধ্বংসায় যাহিবর্ততে
যন্তোংপাটনবিক্রমাদ্ গুরুতমঃ শৈলোহপি তুচ্ছং তৃণম্ ।
বাত্যা হিংস্রমুরারিণা মনসি চেৎ তদ্বৎ করানোমিতা
গোপালং স্মর যোহবতি ব্রজকুলং ত্রাসাৎ তৃণাবর্তজাৎ ॥ ১

মুচাবর্তভয়ে হনস্তশয়নো জাগৰ্তু নারায়ণো
ঘোরাবর্তভয়েহবতু ব্রজগিরে বোঢ়া স বিশ্বস্তরঃ ।
রামস্তামসকুন্তকর্ণকবলান্ লঙ্কেশ্বরাজাসা-
দুৰ্দ্ধাধঃ পরিতো বরাহনৃহরী রক্ষস্ত চোন্নক্রমঃ ॥ ২

জনগণমনে, প্রচণ্ড করাল, ঘূর্ণিবাঘ হ'ল ক্ষিণ্ড,
সৰ্ব্বঋবধৈরজের মূল, সে বজ্রায় হ'ল উৎপাটিত—
বিকটবিক্রম সেই উন্মাদ অশ্বর,
উর্দ্ধে তুলি তোমা, কংসের মতন,

আছাড়িতে শিলাপৃষ্ঠে করে বিঘূর্ণিত—
সে চরম সঙ্কটে, আন্তিভরা প্রাণে,
স্মর যশোদার কোলে সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন

(ব্রজ গোপাল বেশ),
যেবা মোর তৃণ্যবর্তভয়ে, ব্রজকূলে সদ্য ক'রেছিল
অভয় বিস্মিত !

মুচাবর্তমাঝে ধ্বংস আধোমুখ, ঘোরাবর্তে ধ্বংস উর্দ্ধমুখ;
একে ক্লেব্য মৃত্যু অবসাদ, অস্ত্রে হিংস্র
মৃত্যু আশ্ফালন ।

মুচাবর্তে মজ্জমান স্মর নারায়ণ,
অনস্তশয়ন যোগসমাধি নিদ্রায়,
সৰ্ব্বসৃষ্টি শক্তিবীজ, নাতিপদ্মে ধীর,
পায় অগ্নিবীৰ্য্য উদ্বোধন !

ঘোরাবর্তে স্মর গোবর্দ্ধনধারী গোপাল বিশ্বস্তর,
ইন্দ্রদৰ্পচূর্ণকারী, সৰ্ব্বগ্রামী প্রাবনরোধন,
স্মর কালিয়দমন !

কেস ভুলে রবে 'রাম' নাম,
রাম সত্ববিশীষণ সখা, ঘোর রাজস রাবণে,
আর, মুচু তামস কুন্তকর্ষে,
অসমোর্দ্ধ আত্মমহিমায় করে নিহনন !
সৰ্ব্ব অধোভয়ে জাগ কৰ্ম্ম যজ্ঞতত্ব বরাহ ভগবান্ ;
সৰ্ব্ব উর্দ্ধভয়ে, বলিরে ছলিল যেবা সেই—

ওকারের পাদমাজাতীত শুদ্ধ জ্ঞান তহু ত্রিবিক্রম,
স্মর, চারিভিতে (পরিতঃ) সকল সঙ্কটহারী,
ভক্তের বৎসল, আশ্রিত-আশ্রয়তত্ব, নরলিংহ,
তত্র ও ভীষণ !



নববর্ষের প্রার্থনা

মহর্ষি প্রেমানন্দ

শান্তির ললিতবাণী লঙ্ঘনত শির
হুস্মতির দাবদাহে ; অশান্ত অধীর
অস্তহীন মহাকাল। প্রলম্ব বিষণ
ক্ষুকারিয়া নৃত্যরত হয়েছে দিশান।
বিশ্বের সকল অন্ন অন্নপূর্ণা চালে
ক্রমে পূর্ণ করে ভিক্ষু শিবের কপালে।
বিশ্ব পুনঃ ফিরে চলে উৎসমুখে তার—
মহাকাল বক্ষ ভেদি জনম যাহার
কালের চটুল হুন্দে। কারণ সলিলে
যোগমায়ী কোলে সুপ্ত, সুব্যাপ্ত অনিলে
নারায়ণ মৌন ভানে। নির্ভিন্ন মানসে
প্রজাপতি ধ্যানরত। ভীতির বিবশে
প্রকম্পিত কলেবর। মাগিছে নিধন
নিতি মধু কৈটভের। সুরেলা জীবন
হারায় সুখমা তার।

ধ্যানের গভীরে
পূর্ণরূপে প্রকাশিত চেতনার তীরে
অনন্ত পরম সত্তা। তথাপি সকল
অভিব্যক্তি দিতে তাঁর হয় যে বিফল
প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যক্তি মন। জানায় ইজিতে
বিশ্বময় তাঁর বার্তা বিচিত্র ভঙ্গিতে।
ভাষাতে আভাষ দেয়, তবু বাকী রয়
পূর্ণ স্বরূপের ছবি।

স্বজন বিলম্ব
ঘটিতেছে অবিরাম—মহাকাল কোলে,
সহযাত্রী পরমের। মৌন হুন্দে দোলে
বিশ্বের অঙ্গন ভরি। কালের খেলায়
রয় স্তূর্ধ্ব পরিমিত। পৃথিবী বেলায়

তাঁর বিনয় বিলাস অধ্যাক্ষ নয়নে
আসে পরিচ্ছন্ন রূপে। সংযুক্ত জীবনে
তায় স্পষ্ট করি বলের দৃষ্ট স্তমহান
কালের কাহিনী নিতি। পরম সমান
পূর্ণ হুন্দে মহাকাল রয় যে সত্যত
প্রজ্ঞারও অন্তরালে ; স্বরূপ নিয়ত
বিকাশ বন্ধনহীন। ধ্যানালোকে তাঁর
প্রসন্ন প্রকাশ গতি হারায় ভাষার
চকাসিত চিত্রপট। নাই কোন দৃষ্ট
বলিতে বারতা তার ; চির অহুচ্ছিষ্ট
পরম ব্রহ্মের মত। মাল্য মালিত্বের
তাই কণ্ঠে দোলে অধ্যাক্ষজনের।
ভাষায় আভাষ ছিল, আলেখ্য আকিতে
পারেনি ত কোন জন। কোন মূর্তিতে
প্রলম্ব বিষণ হাতে তাগুব নাচনে
নবরঙ্গে নটরাজ ধরায় সসনে
উচ্চারিতে মৃত্যুমন্ত্র।

বেদনার্ত্ত ধরা

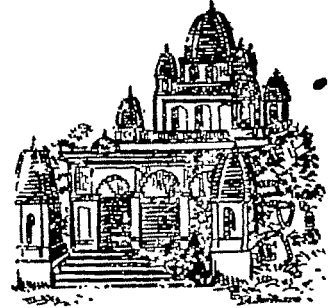
মৃত্যুর মারণ অস্ত্রে আজি রক্তক্ষরা
করুণ কাহিনী লেখে। পরিজ্ঞান মাগি
উর্দ্ধে তুলি ছুই পাণি নিত্য রহে জাগি
নববর্ষের বিভাতে। অপেক্ষায় বাপে
বিশীর্ণ বেতস সম থর থরি কাঁপে
বিবিধ বাতাসে সদা।

আলোর দিশারী

নব পূবালী দিগন্তে, হয়ে ব্যথাহারী
বিশ্বের প্রশান্তি পুনঃ করি স্থনিশ্চয়
শোণিতাক্ত দিনে তব হোক অভ্যুদয়।

অক্ষয় তৃতীয়া ও বৈদিক সংস্কৃতি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ



ভারতে আজও যতগুলি ব্রত-পার্কণ উৎসব রয়েছে তার মধ্যে প্রাদেশিকতার ছাপে জড়ান বেশীর ভাগ। বৈদিক স্মৃতি-সংস্কৃতি আগে কয়েকটিতে মাত্র। তার মধ্যে বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া অন্যতম। অক্ষয় তৃতীয়ার তথ্য-মূলক আলোচনা করলে দেখা যায়, কেন সর্বস্বতীয় হিন্দুসমাজে এই অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতের সমাদর। তবে পুরোহিত সমাজে অক্ষয় তৃতীয়ার কৃত্য হিসাবে পৌরাণিক ও স্মার্ত-সম্প্রদায়ের নির্দেশ পালন ছাড়া প্রায় অস্ত্র কিছু অজ্ঞাত। প্রাচীন বৈদিক সমাজের স্মৃতি-সংস্কৃতির মধ্যে পৌষ-পার্কণও অন্যতম। সেটি এক কালের যাযাবর স্মৃতি। বসন্তোৎসবও তাই। তবে তাতে অনেক পরবর্তীকালের রূপ দেওয়া হয়েছে। চৈত্রের কোমুদী-উৎসব, কুবের উৎসবও গিয়েছে—পুঁথিতে লেখা আছে মাত্র। তেমনি গিয়েছে মদনোৎসব আর ইজ্ঞাতিষেক। যাক সে কথা—

বক্তব্য—অক্ষয় তৃতীয়া যে বৈশাখে পালিত হয় তার রহস্য কি? এ তিথিতে ব্রত ও পার্কণ দুই-ই রয়েছে। মূল তথ্য রয়েছে—শতপথ ব্রাহ্মণে আর যজু ও ঋকবেদে, কিছু কিছু অর্থকরী বেদেও বটে; তবে অর্থকরীর কথা ঢের পরে বটে।

শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে “বিদ্বাংসোহিদেবাঃ” বার্মা বিদ্বান তাঁরা দেবতা। এই দেবতাদের বিশেষ কাজ কি ছিল অথবা কি হওয়া উচিত তা চার বেদের মণ্ডলে এবং স্তোত্রে ছড়াছড়ি। বিদ্বানদের একটি বিশেষ কাজ ছিল “অক্ষয়ং অন্নং সমিতিগমে প্রবিজ্জুহোতি”। তাঁরা সমবায় সমিতি স্থাপন করতেন অক্ষয় অন্নদান করবার জন্ত। ‘কো অপারেটিভ’ তিথিতে অন্নভাণ্ডার খুলতেন। অন্ন পাঁচ প্রকারের—“ধানাঃ করন্তাঃ, পরিবায়ঃ পুরোডাশঃ পরশ্রাঃ”

সামান্য বল্ছেন—ধানা লাক্ষাঃ আভ্যস্যংযুতা শক্তবঃ করন্তাঃ, পরিবায়ঃ তণ্ডুলঃ চিপিটকচ্চ, পুরোডাশঃ পিঠ বিকারঃ, পদ্মস্যাঃ পানাই রসবতী।”

অর্থাৎ ধৈ, স্নাতমিশ্রিত ছাতু, চাউল বা চিঁড়ে; পিঠে এবং পানযোগ্য সরবৎ।

বিদ্বান ব্যক্তির। এই পাঁচ প্রকারের অন্নের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করতেন অন্নযজ্ঞের জন্য। সে যজ্ঞ হতো সর্বসাধারণের সেবার নিমিত্ত। এ যজ্ঞটি হতো বর্ষের আদিতে।

বৈদিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সময়টিতে বর্ষের আদি ব’লে কোন এক বিশেষ মাস বা ঋতু নির্ধারিত হয়েও স্থির থাকতো না—মাঝে মাঝে পাঁচটে যেতো। অবশ্য তা অল্পদিনে নয়। বেদের এক এক জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ষারম্ভ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বসন্ত ঋতুর নাম “মধু”। তারপর গ্রীষ্ম, বৈশাখ তখনও মাধব হয় নাই। গ্রীষ্মের নাম ছিল “আগ্নেয়”। বর্ষার নাম সোম। শরৎ শরদই ছিল, হেমন্তের নাম “যমকাল”। শীতের নাম “শীকর” ইত্যাদি।

ছয়টি ঋতু চিরদিনই আছে। যেহেতু সূর্য্য চন্দ্র চিরদিন বর্তমান। কিন্তু কোন যুগে মধুমাসকে বর্ষাদি ধরা হ’য়েছে, কোনও যুগে আগ্নেয় মাসকে বর্ষের আদি ধরা হ’য়েছে। আবার অর্থকরী বেদের নির্মাণ যুগে শরৎকে আদিবর্ষ বলা হ’য়েছে। তাই সে যুগের আশীর্কচন ছিল “জীবতাং শরদাং শতম্”। কোন যুগে প্রকৃতির আশ্চর্য্য পরিবর্তন বর্ষা ঋতুকে দেখে তাকেই বর্ষাদি ধরা হ’য়েছে—“সোমঃ সংবজ্জতে বর্ষঃ”।

যে সময় আগ্নেয় বা গ্রীষ্মঋতুকে বর্ষের আদি বলে ধরা হতো সেই সময়ই বৈশাখ হতো তার প্রথম মাস। এ সম্বন্ধে মনে করার অনেক কারণ রয়েছে। আগ্নেয় ঋতুতে রুদ্রের আরাধনা হতো। রুদ্র অগ্নিদেবতা। তাঁকে অন্নেরও দেবতা বলা হ’য়েছে, রুদ্রশক্তি অগ্নি বিশ্বকে জ্বলহীন, শত্রুহীন করতে পারেন। তাই তাঁর উপাসনা। তিনি যেন শান্ত হন, মানবের তথা প্রাণীবৃক্ষের মুখের গ্রাস যেন অব্যাহত হ’য়ে থাকে।

“অন্নপতে ! অন্নস্য নো দেহ নমীশ্চ শুদ্ধিনঃ।

প্রদাতারং তারিষু উর্জ্জনো বেষি দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥”

• এই অগ্নিদেবতা, অন্নের দেবতা। তিনি আগ্নেয় ঋতুতে উপাসিত হতেন। সেই আগ্নেয় ঋতুর আদি মাস বৈশাখ। নাগদৈশীয় (হিমালয়স্থ) শিব তখনও রুদ্ধ হন নাই। তাঁর প্রচণ্ড রৌদ্রমূর্তির কাছে ভারতবাসী পরাজিত হ’য়ে পরে তাঁকে রুদ্ৰাবতার বলেছেন ; তা আছে পুরাণে, বেদে নয়। যেমন তুর্কাসা মূনি।

যাক সে কথা। আজকের দিনে আমাদের আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব যে সব ধর্মীয় কৃত্য চলে আসছে সবগুলিই যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক তানয়, অনেক বৈদিক সংস্কৃতিরও উদ্দীপনা রয়েছে। যেমন এই অক্ষয় তৃতীয়ার কৃত্যগুলিতে। বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় এই পার্বণের অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্নদান, ছাত্তদান, জলদান, ব্যজনদান ইত্যাদি ধর্মীয় কর্মগুলিতে সেই বৈদিক সংস্কৃতিরই অন্বেষণ।

কোন যুগেই তো বর্ষারস্তুর আদিমস্তা স্থির ছিল না, এখনও নাই। আমাদের এখনকার দিনেও জাম্ববতী, যেমন আছে, এপ্রিলও আছে, রামনবমীর অন্তদিনও আছে। আবার সংবৎ, শকাব্দ, হিজরী, ফসলী, সন সবই আছে, আগেও ছিল। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হারীতে বলা হয়েছে—

মাষাদেঃ বর্ষতোহগ্রাৎ দেহেদ্রিয় মনোবলং।

বর্দ্ধতে প্রাণিনা সর্বং রবৌ চোত্তরতো গতে ॥

অর্থাৎ বর্ষের আদি মাস মাঘ, ঐ সময় সমস্ত প্রাণীর দেহ ইন্দ্রিয় মনে বল বাড়ে। যেহেতু রবি তখন উত্তর অয়ণে গতি নেয়। এটা যে আরও পরবর্ত্তকালে পাক্টে গিয়েছিল তার নজীর অগ্রহায়ণ শব্দে দেখি। অগ্র অর্থাৎ প্রথম, হায়ণ অর্থাৎ বর্ষ।

এই সব দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, বৈশাখ মাস আমাদের দেশে বহু প্রাচীন গণনার স্মৃতি-জাগান বর্ষের আদি মাস। এই বৈশাখের গণনা হোতো কোন্ তিথিকে ধরে তা স্বল্প দৃষ্টিতে অনুমান করা যেতে পারে। অর্থাৎ বর্ষের এই আদি মাসের ক্ষেত্রে কি কি কৃত্য ছিল তার স্মৃতি আমাদের বহু পুরাণে উল্লিখিত হ’য়েছে। বৈশাখের শুক্লা

তৃতীয়ায় অন্নদান, ঘৃত-ছাত্তদান, জলদান অবশ্য কর্তব্য। সে দান “অক্ষয়” হয়। এই কথাটির প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছি। অর্থাৎ—দেবতাগণ (বিদ্বান-বৃন্দ) অক্ষয় অন্নদান করতেন। সেই স্মৃতিতে আমরা আজও অক্ষয় অন্নদান পার্বণ পালন করি।

তবে যে বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়াটিকেই নির্বাচন করি তাকেও স্বল্পদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারি।

আমাদের দেশে যাবতীয় পুণ্যকর্ম ও ধর্মীয়স্থান এবং দৈনন্দিন কাক্ষকর্ম পরিচালনা করার জন্ত দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্রের বিচারের আওতায় রেখে কালের একটি পরিমিতির প্রয়োজন। আগেও তাই হোতো। শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে অল্পবিস্তর ক্রমে হ’ত, তা আজও হয়। এগুলির বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দণ্ড প্রভৃতি পরিভাষাগুলি যে সূর্য্যের গতি ধরে নির্বাচিত হয় এটা প্রত্যক্ষ এবং প্রাচীন কালেও যে তা ছিল তাও অস্বাভাবিক।

হিন্দু, গ্রীক, মিশরীয়, চীন, ব্যাবিলন, হিব্রু, পারস্য, প্রাচীন রোমক প্রভৃতি সকলের মধ্যেই ধর্মকর্মস্থানানের জন্ত সূর্য্যের গতির ওপর গণনারীতির প্রচলন করে দিন, মাস, বৎসর সংজ্ঞা দিয়ে বিভক্ত করা হতো এবং হয়। প্রাচীনতম কালের কোনও এক আদিযুগে নিশ্চয় মত-ভেদ হ’য়েছিল কালের উপবিভাগ নিয়ে। অর্থাৎ দিনের আদি ধরা হবে কখন, মাস হবে কতদিনে, বৎসর হবে কতদিনে ইত্যাদি। অর্থাৎ মধ্যরাত্রে, না মধ্যদিনে অথবা সূর্য্যোদয় দেখে।

আমাদের দেশে এমন বিচার আরম্ভ হয় যাগ-যজ্ঞকে কেন্দ্র করে। যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত সময়টিকে ঐ জন্তই বলা হোতো বৎসর। যজ্ঞ ও বর্ষ তখন একার্থবাচী। বৎসর তখন বিভক্ত ছিল উত্তরাযণ ও দক্ষিণায়ন সংজ্ঞায়। তারপরই তাঁদের দৃষ্টি পড়ে চন্দ্রের কলার হাস বৃদ্ধির সঙ্গে ঋতুর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান দেখে। তারপর চন্দ্রেরই পূর্ণ উদয় ও তিরোধান দেখে। মাঝে ঘটে তার কলায় কলায় হাস ও বৃদ্ধি ; এতে চন্দ্র ও সূর্য্য দুই হোলো কালনির্ণয়ের ভিত্তি। পরে

ওই নিয়ে ছুটি দলের উদ্ভব হয়, একদল সূর্য্যের স্থিতি ও উদয়-অস্ত নিয়ে কাল-নির্ণয় করতে লাগলেন, একদল চন্দ্রের। ওতেই নাম হয় সৌরমাস, চান্দ্রমাস। সৌরমাস সৌরদিনে, চান্দ্রমাস চান্দ্রদিনে।

তারপর আরও স্বল্পদৃষ্টি আসে নক্ষত্রের উদয় ও গতি পরিবর্তনের ওপর লক্ষ্য রেখে। এই জীবিত কাল নির্ণয় নিয়ে বহুদিন কেটে গেল। তিন পক্ষই মাস বৎসরের পরিমাণ নির্ণয় করলেন তিনদিক থেকে। ফলে জানা গেল বৈদিক যুগে সূর্য্যোদয় থেকে দিনের আরম্ভ, সেইজন্ম বেদাচারনিষ্ঠ আর্য্যভট্ট লঙ্কায় অবস্থান করে সূর্য্যোদয় থেকে দিন গণনা করেছেন; আর বরাহমিহির চন্দ্রের গতির উপর ভিত্তি করে মধ্যরাত্রি থেকে দিন গণনা করেছেন।

পরবর্তীকালে পূর্বের দুটি প্রধান মত চারভাগে বিভক্ত হয়। সূর্য্যোদয়, মধ্যরাত্রি, মধ্যদিন, আর সূর্য্যাস্ত নিয়ে। এই চারভাগেই গণনা-রীতি প্রচলিত হয় এবং ভারতে তা দীর্ঘদিন চলতে থাকে। তবে প্রধানভাবে চলে আসছে আর্য্যভট্টের মত। ওই নিয়ে একটি বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয় সূর্য্যঘটিকা বা সূর্য্যঘড়ির।

এই ব্যাপারে ক্যাণ্ডিয়ানরা সূর্য্যঘড়ি এবং চন্দ্রঘড়ি দুইই ব্যবহার করেন। প্রাচীন চীন কিন্তু অস্ত্র পথ ধরে-ছিল, সেদেশে প্রত্যেক সম্রাটের পরিবর্তনের সঙ্গে জ্যোতিষী পরিষদের অভিমতের ওপর দিন-গণনার ভার দিতেন। চীনা ভাষায় ঘণ্টাকে বলা হয় “সি”। একটি সি ১২০ মিনিটের সমান। ৩টি আবার সাম্রাজ্য ঘটনারও স্মৃতি। তারপর “ছে”, তারপর “ফেন”। ১ মিনিট মানে ১ ফেন। ফেন বিভক্ত হয়ে হয় “মিয়াও”, অর্থাৎ এক সেকেন্ড। এই পরিভাষাগুলি সম্রাট পরিবর্তনের স্মৃতি-সংকেত। চীনাদেশে শুরু হয় চান্দ্রতিথিতে মাস গণনা।

মিশরে হয় বর্ষ। শুরু থেকে বর্ষগণনা। প্রাচীন মিশরে দিনের আরম্ভ থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দিন। তাই নিয়ে মাস ও বৎসর। নবীন মিশর (মিশরের পর থেকে) মধ্যরাত্রি থেকে দিনগণনা প্রবর্তন করে। পরে হয় “পথ” থেকে।

বাসিরা মাসটি নিনকে একত্র করে চারবারে মাস গণনা প্রবর্তন করেন। এবং শনি থেকে পর পর বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি, শুক্র, বুধ, সোম গ্রহ নাম দিয়ে এবং প্রতি গ্রহের আধিপত্য এক একটি দিনে কতক্ষণ এবং তাতে চন্দ্রের প্রভাব কিভাবে অর্থাৎ তিথি হিসাবে কতক্ষণ থাকে তাও নির্ণয় করে দিন, মাস, বৎসর, গ্রহের গতি ও অন্তর্ধান কখন হয়, নিরূপণ করেছেন।

এই রীতিটির সঙ্গে মেলাতে পারলে পণ্ডিতগণ বুঝতে পারবেন আমাদের দেশে বৈদিক সংস্কৃতির আমলে তাঁরা মাস আরম্ভটি কিভাবে করতেন। পাঁজিতে বলা হয়েছে সত্যযুগের উৎপত্তি হয় বৈশাখের রবিবারে শুক্লা তৃতীয়ায়। ঐটিই অক্ষয় তৃতীয়া। এই যে বার এবং নক্ষত্রের উল্লেখ এর পিছনের রহস্য মিশর ও রোমবাসির রীতি-নীতিতে মিল হবে।

আমাদের পুরাণ বলেছেন, সত্যযুগে আবির্ভূত হয়েছে অক্ষয় তৃতীয়ায়—“বৈশাখে মাসি রাজেন্দ্র স্তম্ভপক্ষে তৃতীয়কী। অক্ষয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা কৃত্তিকা রোহিণী যুতা ॥”

পূর্বেই বলেছি বৈশাখ মাস আগ্রের মাস। ৩টি অন্নদান, অন্নপ্রার্থনার মাস। দেবতাগণ অক্ষয় অন্নের ব্যবস্থা করতেন। সেটি যে বার নক্ষত্র তিথি এবং মাস ধরে প্রবর্তন করা হয়েছিল সে কথা সে যুগে ছিল বাস্তব, আর এ যুগে মনুষীদের কাছে হয়ে আছে স্মৃতি, এবং সাধারণের কাছে হিন্দুর পার্বণকৃত্য। আদিতম যুগে ছিল চান্দ্র-তিথিতে নক্ষত্রাশ্রিত একটি গ্রহের আধিপত্য কালের সঙ্গে বারের অধিক্ষেপ, আর এখন তার অন্তঃসার অজ্ঞাত এক পার্বণকৃত্য। যেমন মনীষী বলেন—তুমি সং হও। আমি বলি—তুমি ভগবান, তুমি পূজনীয়। মানবপ্রেমিক বলেন—তুমি উদার হও, তুমি পূজনীয়। মানবপ্রেমিক বলেন—তুমি উদার হও, তুমি অমৃতের সন্তান। আমি বলি—তুমি ঋষি, তুমি পূজনীয়, তোমার বাৎসরিক স্মৃতিপূজা করবো।

এই অক্ষয় তৃতীয়া পৌরাণিকদের আবিষ্কার নয়, বৈদিক সংস্কৃতির একটি ছাপ-রাখা দিন। সৌর, চান্দ্র,

সেকালের 'নববর্ষ'

শ্রীমুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বার-এ্যাট-ল-

গোপা দিন ত' ফুরিয়ে এল,

আর কটাই বা রইল বাকি।

দোহাই তোরে অমন ক'রে

ভাবের ঘরে দিসনে ফাঁকি।

কাঁকি যে না দেয় বর্ষারন্তে এ কথাটা তার মনে
জাগবেই জাগবে।—জাগে ব'লে তখনই সে নিজেকে
বলে—

চোখ চেয়ে দেখ ওরে ভোলা,

হাসিরামির মিলন মেলা,

নিয়ে তোর বেসাতির ডালা,

ফুক দিয়ে কর কিনি বিকি।

হাসি! হাসি! হাসি! হাসির মেলাই বটে।

আগের রাতে শত মাতৃকণ্ঠে পরম উল্লাসে, প্রাণের ভক্তি
শ্রদ্ধা মিশিয়ে দেবাদিদেবের চরণ স্পর্শে ধ্বনিত হয়েছে,
তোমার শিরে দিলাম বাতি

থাকুক ভাল পো পোয়াতি।

ভিক্ষা নহে, দেবতার সান্নিধ্যে ভক্তের দিবা
অভিব্যক্তি। উদ্ভিষ্টতঃ!—জাগ্রত সে যে হইয়াই
আছে। বর্ষশেষে স্বকীয় কর্তব্যপালনে মা উঠিয়াছেন,
জাগিয়াছেন। মাতৃরূপ মাতৃত্বজ্ঞ বিকাশার্থে সশরীরে
আগুয়ান তিনি।

যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর—কার সাধ্য তাঁর গতির
প্রতিরোধ করে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস,
মাতৃরূপিণী জগদ্ধাত্রী। জগদ্ধাত্রী ধারণ করিয়া
আসিয়াছেন তাঁর জগতকে। বর্ষশেষে নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়,
জগদ্ধিতায় নমো নমো। নববর্ষ সম্বর্দ্ধনায় মা সজাগ।
পুণ্য প্রভাতে মা জয়টাকা পরাইলেন তাঁর আশ্রমের

সকলকে। কল্পুনিদানে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত। ধুপধূনার
স্ববাসে সুবাসিত দিবামণ্ডল।

গৃহপ্রাঙ্গণ বর্ষদেবতার শুভাগমনের কারণেই শোভ-
নীয় সর্বত্র। পূজাক্ষেত্রের দ্বারে কদলীবৃক্ষ সংযোজে যুগ্ম
পূর্ণ কলস স্থাপিত। পটুবস্ত্র পরিহিতা পূজার আয়োজনে
ব্যস্ত গৃহিণী। অস্ত্রাশ্রয় মহিলারা অরুণ্যদেবকে পূর্বে
গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়াছেন। আনিয়াছেন অনেকেই
পূজার জন্ত গদাবারি। পাকশালায় যথাসময়ে পাঁচ-
ব্যঞ্জন অন্ন প্রস্তুত ত' হইবেই, নববর্ষোপলক্ষে প্রস্তুতও
রহিবে পায়সাম।

যখনকার কথা তখন গ্রামোফোন বা রেডিওর যুগ
নহে। প্রাতঃকাল হইতে রাজপথ ও গৃহদ্বার, পথ-প্রাঙ্গণ
বৈষ্ণব সঙ্কল্পের নামগানে মুখর। কলিকাতা সহরে হাত
পাতিয়া ভিক্ষা করিবে, আমরা বালক বা কিশোর বয়সে
কোনও হিন্দুকে দেখি নাই। বাটীর দ্বার-সম্মুখ
আসিয়া খোল করতাল থাকিলে তাহা বাজাইয়া, না
থাকিলে এমনই "জয় রাধে কৃষ্ণ" শুভজন মাত্র করিয়াছে
বৈষ্ণব সঙ্কল্পন। কীর্ত্তন গাহিবার অমুজ্জ্বল হইলে কীর্ত্তন
শুনাইত, নতুবা নহে। গৃহস্থ স্বেচ্ছায় কিছু দিলে হাসিমুখে
লইয়াছে। কিছু না দিলে, 'জয় রাধে কৃষ্ণ' বলিয়াই
চলিয়া গিয়াছে। একতারা বাজাইয়া বাউলের দল বা
বেহালা বাজাইয়া গাহক করিয়াছে ওই একই রকম।
নববর্ষের দিবসে তাদের বেশী সংখ্যাতেই আসিতে
দেখা গিয়াছে।

গৃহস্থ বাটীতে প্রভাতে নববর্ষের প্রভাতী।
কালীঘাটের নববর্ষ সে এক বিরাট ব্যাপার। মোটর
নামধেয়ের ছিলনা কিছু তখন। বোড়ার ট্রাম চলিয়াছে

দেববৃন্দের এক মহৎ কণ্ঠের অমুঠান ও দিবসের স্মৃতি বহন
করে আসছি আমরা। এই জন্মই এই তিথিতে জীবের
জন্মযুগ্মকেও আমরা অত্যাচ্চ সম্মান দিই।*

আমরা সপ্রসন্ন অরণ করি সংযুক্ত শ্রীমতিলালের
ভারত-সংস্কৃতির উজ্জীবন-প্রচেষ্টা। তাঁর হৃদয় বৈদিক-
কল্পিত চিত্র। তিনি চন্দননগর

প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠা ক'রে আমাদের সর্বতোমুখী
কল্যাণের বেদী রচনা করে গিয়েছেন। ইহা
বেদসম্মত দেবকর্ষ্য সগিত্ত্বন, সংঘবৎ ও সমবায়িক
প্রতিষ্ঠান। প্রবর্তক সংঘে অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্যপার্বণ
পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে বাংলা দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে
বলা চলে।

খিদিরপুর পর্য্যন্ত। তা হইলে কি হয়, কালীঘাট হইয়াছে যাজীর ভিড়ে ভিড়। কলিকাতার বনিয়াদী ঘরের মা-বোনের খাইতে দেখিয়াছি চিত্তেশ্বরী দেবী দর্শনে। কলিকাতা নামে আখ্যাত হইবার পূর্বে দেবী চিত্তেশ্বরী গঙ্গা সৈকতের অদূরে আপনার আসন করিয়া লন। চিত্তেশ্বরী কলিকাতার আদি দেবী বলিয়া কীৰ্ত্তিতা।

সতীর পতিত অঙ্গাংশ অবলম্বনে কালীঘাট মন্দির ও মন্দির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্ভব ইহা সর্বত্র বিদিত। ঋষি মহর্ষিতুল্য শ্রদ্ধেয় কত মহাপুরুষ দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া কালিকা দেবী দর্শনে যে ধজ হইয়াছেন, সে এক বিরাট পুণ্যকাহিনী।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রামাপূজা, জম্মাঠমী ও শিবরাজি উপলক্ষে কালীঘাটে ভক্ত সমাগমের আধিক্যের অবধি থাকে না। কালীঘাট-সান্নিধ্য ভূকৈলাসে দেবাদিদেব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আবিভূত হইয়াছিলেন—ভক্ত প্রাণে ইহা অকাট বিশ্বাস। উভয় তীর্থেই জনতার অবধি থাকে না নববর্ষ দিবসে। গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভাতে যত শীঘ্র সম্ভব কলিকাতার অসংখ্য হিন্দু ব্যাপারী ও দোকানীরা ‘নতুন খাতা’ করাইতে কালীঘাটে যাইবেই। খাতা মায়ের পায়ে ছোঁয়াইয়া সিদ্ধিদাতা গণেশের নূতন মুন্ডির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাইয়া তাহা সযত্নে লইয়া ফিরিবে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে যথাস্থানে রক্ষা করিতে। ফিরিবার পূর্বে দোকানঘর গোময় ও গঙ্গাজলে বিধৌত হইয়া আছে। হুয়ারে পূর্ণকুন্ত বিরাজ করিয়াছে। পুষ্প-মালায় শোভিত হইয়াছে প্রাচীরাদি।

যথাসময়ে সিদ্ধিদাতার পূজার্চনা হইল সাড়ঘরে। নূতনখাতা রক্ষিত হইল দেবতার পুরোভাগে। বেনাতির ডালা স্ব স্ব স্থানে কিনিবিকি জুড় হইবে অপরাহ্নে। পূর্নাহ্নে তাহার আয়োজন আরম্ভ হইল। বিপনীক্ষেত্র জুড়িয়া পাতা হইল বসিবার আসন, মাহুর। আসনের একাংশ শোভিত হইল রক্তবর্ণ ধন্দরে (খেরো)। আসনের স্থানেস্থানে রক্ষিত হইল তাকিয়া (খেরোর)। অভ্যাগতদের জন্ত পান তামাকুরও ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইল।

অপরাহ্ন প্রায় দুইটা হইতে আসিয়া জমিতে লাগিল বাউল, কীৰ্ত্তনাদির দল ও বহু দরিদ্র বালক। কাঠি বাজাইয়া, সং সাজিয়া লোকরঞ্জন প্রয়াস তাহাদের। দোকানে দোকানে তাহারা যাইবে, নাচিবে, কুঁদিবে, গান গাহিবে, ভালে ভালে কাঠি বাজাইবে। তার পরিবর্তে তাহাদের বাতাসা, মুড়ি,

মুড়কি, কড়ি পাইবে। কোনও পক্ষে কোনও হৈ-হজ্ঞা নাই, বাকবিতণ্ডা নাই, ঝগড়াঝাটি নাই। যতক্ষণ খুশী তাহারা নাচিবে, কুঁদিবে, রং তামাসা দেখাইবে হাসিমুখে। হাসিমুখে দিবে দাও যাহা দিবার। কীৰ্ত্তন, শ্রামা-সঙ্গীত ও বাউল গানে রাজপথ সরগরম হইয়াছে। প্রাতের ফেরি যাহা হইবার হইয়াছে, এখন তাহারা কোনও গৃহস্থের বাটীতে ভীড় করিবে না। সম্বই বা কোথা। ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, বহুবাজার স্ট্রীট, চিংপুর রোড, সাহুলার রোড (অংশ) চুঁ মারিবেই তারা। সন্ধ্যা-সমাগমের সঙ্গে তাহারা তাহাদের নববর্ষের অভিযান করিবে সমাপ্ত।

কাঁচা ঝাঁপ, বঁটি ঝাঁপ, আগুন ঝাঁপ, সংক্রান্তির সং সন্ধ্যা সন্ধ্যা উপভোগ করিয়াছে, ‘নতুন খাতা’র রং-তামাসা। বালক আমাদের ভ’ কথাই নাই। কাঁচা আমের সরবত রসান দিয়াছে তাহাতে। আর মুসলমান ফেরিওয়ালার পসরা কাগজের খেলনা বেচিয়া রাস্তার সংসাজা ছেলেদের সঙ্গে নাচিতে কুঁদিতে ছাড়ে নাই, সুযোগ সুবিধামত।

প্রভাতে ও অপরাহ্নে এম ডি টহল দিতে বাদ দেয় নাই, তবে নববর্ষে ‘পাপী’র প্রতি কশাঘাত করিতে বিরত সে থাকিয়াছে। যত বড় ব্যবসায়ীই হউক না কেন সেদিন অপরাহ্ন পাঁচটার পর হইতে নিমন্ত্রিতেরা দোকানে দোকানে আসিতে আরম্ভ করে নতুনখাতা করিতে। হিসাব-নিকাস যাহা হইবার হয় এবং নতুনখাতায় ‘বহনি’-ও করে যারা আগে সকলেই। কার-কারবার চলে রাজি প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত।

সন্ধ্যা সমাগমে মোমবাতির চিরাগই দেখা যায় নানা আকারে প্রতি বিপণিতে। ছোট, মাঝারি বড়। হাসিমুখে বাড়ী ফিরিয়াছে ক্রেতা। হাসিমুখে বিদায় দিয়াছে বিক্রেতা—মিষ্টান্নাদি সেবা করাইয়া।

হাসি রাজির মাঝে

কু-কু দিয়া কিনি বিকি চলিয়াছে বেশ।

নববর্ষে কালীঘাট সারিয়া বহিরাগতেরা জ্যাস্ত চিড়িয়াখানা, মরা চিড়িয়াখানা ও ‘নন্দনকানন’-এর ‘তীর্থ’ না দেখিয়া নববর্ষ উৎসব অসম্পন্ন করে কেমন করিয়া?

তখনকার এ উৎসবে ব্যয় ও আনন্দের ধার দিয়া গিয়া এখনকার নূতনখাতার গবেষণা করা অযৌক্তিক নিশ্চয়ই নহে, চৈনিক সঙ্কটের কথা সত্যই যদি মনে থাকে।

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল

১৯২১ খৃষ্টাব্দের বিয়োগান্ত জীবন-পৰ্শ। শ্রাবণের বারিধারায় বাংলা দেশ অভিষিক্ত। ঝুটিহীন পণ্ডিচারী। চরণে তার জুটাইয়া পড়ে সমুদ্র-তরঙ্গ। উচ্চাসে আনন্দে বিগলিত হইয়া সাগরের এই নৃত্যলীলা প্রতিদিন সন্দর্শন করি, তবুও আমার অন্তর আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে না।

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির আকর্ষণ কত অধিক তাহা আজ মর্শ্ব দিয়া বুঝিতেছি। সেদিন বিসর্জনে দিয়া আসিলাম যে অমৃতকে অবহেলায়, সে কেবল ভারতের গরলরাশি ভক্ষণ করিয়া নীলকণ্ঠের মত জয় দিতে ভারতেরই—হায়, ভারতের প্রাচীন-সংস্কৃতি! প্রত্যাবর্তন করিলাম বাংলায়। বাংলার আকাশে ঘনায়মান মেঘরাশি নিয়ত বর্ষণশীল। তারপর ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাস, শীতের কুয়াসা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে—শ্রীমন্দির ঘাড়ে চাপিয়া বসিল।

নবচূড় মন্দির। তারই সমুচ্চ শিখরে বসিয়া এক পরমাত্মীয় বন্ধুর সহিত প্রতিদিন উদাসমাগমের পূর্ব হইতে ধ্যানে বসিয়া শুনি অপার্থিব কণ্ঠে কে যেন প্রণব উচ্চারণ করিতেছে নিম্নে বসিয়া। সে মন্ত্র স্পষ্টতর হইয়া উঠিলে, বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—প্রণব-মন্ত্র শুধু আমারই কর্ণ-বুহরে প্রবেশ করিয়া ক্ষান্ত নহে, সেও উহা শ্রবণ করিতেছে। মন্দির শূন্য—আমরা দুইজন ছাড়া আর সেখানে কেহ নাই; তবুও শব্দবাক্য ভাসিয়া আসে বাতাসে। যুগপৎ বিশ্ব ও পুলকে অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। উপনিষদের মন্ত্রধ্বনি তুলিলাম মন্দিরের নিয় কক্ষে। প্রবর্তক-সংজ্ঞার উপাসনা-রীতির সর্বপ্রথম ভিত্তিপাত এইখান হইতেই আরম্ভ হইল।

ধ্যানে দেখিলাম—শূন্য মন্দিরে ত্রিতল বেদী, উজ্জল অক্ষরে প্রণব মূর্তি তাহার উপর সংস্থাপিত। সাধ হইল ত্রিতল বেদী রচনা করিয়া প্রণবের প্রতিষ্ঠা করার। সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্ষয় তৃতীয়ায়।

প্রণব প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেখিলাম—এ মন্দির সঙ্গীতের পাত্র সঙ্গীতের একমাত্র সঙ্গীত। নিম্নলিখিত

নেত্রেই আবার দেখিলাম পঞ্চসম্মাসার মূর্তি। মন্দির-রক্ষার দায়িত্ব পঞ্চ সম্মাসীর উপর ভ্রম করান নির্দেশ বলিয়াই ইহা গ্রহণ করিলাম। সম্মাসের দীক্ষা লইতে উপনীত হইল দুইজন। আমি তখন সপত্নীক। কেমন করিয়া তাহাদের আমি সম্মাসের দীক্ষা দিই? তাহাদের প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়াই তাই সেদিন মহাত্মা ভোলাগিরির নিকট তাহাদের পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি কিন্তু তাহাদের দীক্ষা দিলেন না। আমার কাছে ফিরাইয়া পাঠাইলেন।

তারপর একে একে সাত বৎসর অতিবাহিত হইল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বজ্রপাত হইল আমার মাথায়। আমার সাক্ষী পত্নীকে হারাইলাম। এখন আমি উলঙ্গ সম্মাসী। পঞ্চ তরুণ আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই শ্রীমন্দির তীর্থেই গৈরিকের জয়ধ্বজা উড়াইল।

দ্বাদশবর্ষ পরে বজ্রত কলসের বৃকে স্বর্ণ বিজড়িত প্রণব-বিগ্রহ দৃশ্য কর্তৃক অপহৃত হয়। তারপর মন্দির-গায়ে প্রস্তর-চিত্ররূপে চতুষষ্টি দলপদ্যের মণ্ডলাভ্যন্তরে কুস্ত বক্ষে প্রণব সংস্থাপিত হইল। কিন্তু তবুও শূন্যবেদী নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয় মধ্যে হাহাকার উঠে। সাত্বনা পাইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রতজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। ঘুরিয়া মরিলাম বাংলা হইতে আসাম। তারপর বিহার ও উড়িষ্যায় প্রতজ্ঞা শেষ হইল পুরুষোত্তমের অঙ্গবস্ত্রের স্পর্শে। সে মহাসম্মাসীর আনন্দের কথা আমার চির-স্মরণে থাকিবে। কল্পনেও দেখিলাম—বেদীর বৃকে ত্রিবৃৎ লিঙ্গ। মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিলাম “হরিহর বিধি-বেদ্যম্”।

শ্রীমন্দিরে ব্রহ্মেশ্বর নব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইল। এই বিগ্রহকে বিরিয়াই অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব আজ ত্রিংশ বর্ষে (১৯৫২ সালে) পদার্পণ করিল।

এই শ্রীমন্দির প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার আনিয়াছে আমাদের জীবনে। স্বাধীন ভারতকে আত্মসংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়াই অভিনব জাতীয় জীবন সংগঠন করিতে



স্মৃতিকথা

শ্রীমুরেশচন্দ্র মজুমদার

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে দেবভাষা পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের পর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর বারহাজ আশ্রমে এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর পাটনায় পরিষদের কার্যকারিণী সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীমতিলালের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হইয়াছিল। এই দুই স্থানের কথা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পাটনার সাক্ষাৎকারের পরে তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার আমার আর হয় নাই বটে, কিন্তু চিঠিপত্রের মাধ্যমে আত্মিক সাক্ষাৎকার ইহার পরও অনেক হইয়াছে এবং সেই সকল পত্রে কেবল আমার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতিরই নয় তাঁহার অপূর্ণ মনীষারও অনেক পরিচয় পাইয়াছি। আমাকে লিখিত তাঁহার পত্রগুলির সংখ্যা কম নয় এবং সে সমস্তই উদ্ধৃত করাও সহজ কথা নয়। বলিয়াছি দেবভাষা পরিষদকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন এমন কি প্রবর্তক সঙ্ঘের জীবনের সহিত দেবভাষা পরিষদকে গাঁথিয়া দিবার ইচ্ছার কথাও তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন। এই পরিষদকেই উপলক্ষ্য করিয়া ১৬।৬।৫৩ তারিখে যে পত্রখানি তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

অশেষ প্রীতিভাজন মুরেশচন্দ্র,

বহুদিন পরে আপনার চিঠি পাই। আমার শরীরের কথা আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। প্রচেষ্টে প্লাগু হওয়ায় প্রস্রাবের কষ্ট আছে। চিকিৎসা অর্থে অজ্রোপচার ভিন্ন

অন্য পথ নাই। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন পর্যন্ত একটি গুরুতর কণ্ঠভার মাথায় চাপিয়া বসিয়াছে। যদি সিদ্ধ করিতে পারি আমার জীবন সার্থক মনে করিব। এইজন্ত উপস্থিত সকল রকম চিকিৎসাই বন্ধ আছে। ১৩ই ১৪ই জুন ভাগলপুর, নয়াটোলা শক্তি কুটিরে নিখিল ভারত দেবভাষা পরিষদের কার্যকারিণী সমিতির অধিবেশনের কথা লিখিয়াছেন। আপনাদের অধিবেশন শেষ হইয়াছে; আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় উহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে নিশ্চয়। দেবভাষা পরিষদের প্রতি আমি চিরদিনই পরিতুষ্ট আছি জানিবেন। ভারতে দেবভাষা রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হউক ইহাই আমার কামনা। তগবান দেবভাষা পরিষদের জয়যাত্রা সুসিদ্ধ করুন ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

নিখিল ভারত দেবভাষা পরিষদ বাংলায় পুনরুজ্জীবিত হউক ইহা আমারও ইচ্ছা, কিন্তু এই বস্তুটাকে একজন ধরিয়া থাকার লোকের দরকার। আমার পক্ষে অসংখ্য কর্মের মধ্যে ইহা একটি কর্ম বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। আপনার সবখানি দিয়া ইহার ধারণা-সামর্থ্য আমার নাই। একথা বুঝি বলিয়াই একজন লোকের সন্ধান করিতেছি।

বর্তমানে আপনি একটু ভাল আছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। দীর্ঘদিন শরীর অস্থির থাকিলে আর দুর্বলতা অসম্ভব করিবেন না। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি।

(স্বাক্ষর) শ্রীমতিলাল রায়

হইবে। স্বার্থের পালন করিয়াই এই ভারত বিশ্বমানবতার সমন্বয়-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে। অক্ষয় তৃতীয়ায় সেই সনাতন ভারতেরই মর্ম পরিচয় করিতে আমার দেশবাসী সকল ধর্মী, সকল শ্রেণীর নরনারীকে আহ্বান জানাইতেছি। উৎসব জাতির—উৎসব বিশ্বমানবের। সত্য ও সনাতন ব্রহ্মবিজ্ঞান ও ঈশ্বর-বিজ্ঞানের পরম

সমন্বয়-স্বরূপের এই ব্রহ্মেশ্বর মহাতীর্থে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া, আমরা নবযুগের মহাসত্যকে আবিষ্কার করিব—আহ্বান করিব মহামানবের নব ধর্মকেই। এই ধর্মই করিবে আমাদের জীবন চির-উৎসবময়। ওঁ তৎ সৎ ওঁ। [১৯৫২ সালের বাণী হইতে]

পূর্বেও এই ধরনের অনেক পত্র তিনি আমাদের লিখিয়াছেন। এবং সংস্কৃত ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার বিষয়টা মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের মতবিরুদ্ধ হইলেও কাহারও প্রীতি অপ্রীতির প্রতি ক্ষেপ না করিয়া নিখিল ভারতীয় দেবভাষা পরিষদকে মনে প্রাণে তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন।

তিনি অল্প যে একটি মহৎ কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি করা; চরিত্রহীন মেরুদণ্ডহীন মানুষ লইয়া যে জাতি গঠন হয় না ইহা তিনি বিপ্লব যুগেই মনে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেইজন্তই বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ সৃষ্টিমানসে তিনি প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মানস নয়নে যে মুক্তিগীত রূপ আনন্দ মঠ ভাসিয়া উঠিয়াছিল তাহারও মূলকথা বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ সৃষ্টির জন্ত সম্ভব সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। মনীষী বিবেকানন্দও দিব্যদৃষ্টিতে ইহা দেখিয়াছিলেন বলিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ফলকথা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, মনীষী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমতিলাল যে একই পথের পথিক এবং এই পথেই যে জাতির মুক্তি অবশ্যস্বাবী প্রত্যেক চিন্তাশীল মনুষ্যই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। আজ যে রক্তপাতহীন স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ ব্যতীত সে স্বাধীনতা কখনই দীর্ঘদিন রক্ষা করা যাইবে না। এইদিক দিয়া ভারতের জাতিগঠনে ঋষি মতিলালের অমূল্য অবদান প্রবর্তক সঙ্ঘ যে অত্যন্ত মূল্যবান ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

আজ ভারতের ঐক্য কোন পথে এই বিষয়টা লইয়া আমাদের মনীষীগণ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ইহার জন্ত ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, দেবভাষা পরিষদ এবং ঋষি মতিলালের কার্যাবলী হইতে আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করিতে হইবে আর সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যের শত্রু কাহারো, চরিত্রহীনের বিঘ্ন কোথায় এবং দেশে চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা কেন এত বৃদ্ধি পাইতেছে তাহারও ষাণ্মাষ কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। মোটের উপর আমরা এই সমস্ত বিষয়েই শ্রীমতিলালের দিব্যদৃষ্টি

প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিতে পাই এবং এইজন্তই আমরা তাঁহাকে অসঙ্কোচে ঋষিরূপে স্বীকার করিয়া সত্যের মর্যাদাদান সমুচিত বলিয়া মনে করি।

কাহারও নিকট অর্থভিক্ষা না করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা ধনোপার্জন করতঃ সেই ধনের দ্বারা ধর্ম, সমাজ ও জাতির কার্য সাধন সম্পূর্ণ অভিনব। শ্রীমতিলাল সেই অভিনব পন্থাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাটনায় আসিয়া আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—আপনি তো রাজা! শ্রীমতিলাল প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “অরেশবাবু, ধন কি আমার? এ সবই সঙ্ঘের”। সঙ্ঘের মধ্যে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে সমাহিত করিয়াছিলেন।

ইহাই শ্রীমতিলালের সবখানি পরিচয় নয়। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাঁহার অমূল্য অবদানও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার লিখিত সমস্ত বাংলা বই আমি পড়ি নাই, তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবর্তক পাঠের ফলে তাঁহার যে সকল বাংলা লেখা প্রবর্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অনেকগুলিই ভাল করিয়া পড়িবার চেষ্টা আমি করিয়াছি। ১৩২৫ সাল হইতে ১৩২৮ সালের মধ্যে কোন সময়ের কথা; আমি তখন গোরক্ষপুরের ভাটনী নামক স্থানে কর্মরত। আমার সহকর্মী নগেন্দ্রকুমার মুহুরী একখানি পাক্ষিক প্রবর্তক পত্রিকা আমার হাতে তুলিয়া দিলেন। আমরা উভয়েই বাংলা সাহিত্যের অমুরাগী। নতুন কোন বাংলা পত্রিকা দেখিলেই তৎক্ষণাৎ কিনিয়া লইতাম। নগেন্দ্রকুমার কিছু কিছু কবিতা ও গান লিখিতে পারিতেন; আমারও কিছু কিছু গল্প ও প্রবন্ধ তখন গল্পহরী, পুষ্পোদ্যান, ঐতিহাসিক চিত্র, সুপ্রভাত, সংসার, উপাসনা ও সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই অবস্থায় চন্দননগর হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীমণীন্দ্রনাথ নামক কর্তৃক সম্পাদিত প্রবর্তক পত্রিকা আমার হাতে পড়িল। ছাপা ও কাগজ উৎকর্ষ নয়, কিন্তু ভিতরের লেখাগুলি বিদ্যাদর্প। প্রথম পাঠেই মুগ্ধ হইলাম। ভাবার কি সন্মোহনী শক্তি! সেই সন্মোহন শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি প্রবর্তকের গ্রাহক হইলাম। লেখাগুলিতে লেখকের নাম দেওয়া থাকিত না কিন্তু পরে বুঝিয়াছি সে সমস্তই শ্রীমতিলাল লিখিতেন।

সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত আমি নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই প্রবর্তকের গ্রাহক আছি। মাসিক পত্রিকায় পরিণত হওয়ার পর হইতে অবশ্য অল্প অনেক লোকের লেখাই প্রবর্তকে প্রকাশিত হয়, কিন্তু ইহার মধ্যেও যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার কোন না কোন লেখা প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। কলকথা, বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাঁহার অবদান তো অমূল্যই; ব্রহ্মহত্যা, গীতা ও চণ্ডীর ভাষ্য লিখিয়া ভারত-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন তাহাও অল্প মূল্যবান নয়। তাঁহার এই সমস্ত কার্য্য মিলাইয়া দেখিলে কে তাঁহাকে ধ্বিক্তি অতিহিত করিতে অস্বীকার করিবে? মঙ্গলদ্রষ্টা মহাপুরুষগণকে আমাদের দেশে ধ্বি বলা হয়। শ্রীমত্তিলালের অনেক লেখাই যে মঙ্গলতুল্য এবং নব ভারতের জীবনবেদ হইবার উপযুক্ত কে তাহা অস্বীকার করিবে? আমি তাঁহার এই সমস্ত লেখা হইতে মাত্র কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্যের পরিপোষকরূপে দেখাইবার চেষ্টা করিব :

“উৎসর্গের তীর্থভূমি ভারতবর্ষে হে নবযুগ ঋত্বিক ! নবপ্রাণে নবীন উৎসাহে আবার জাগিয়া উঠ। অবহেলে শ্রীভগবানের প্রতিভূ ইষ্টমূর্তির চরণে নিঃশেষে বলি দাও। কার্পণ্য রাখিও না। হে তরুণ! নূতন মস্ত্রে তোমরা উদ্বুদ্ধ হও—নূতন ব্রত তোমরা গ্রহণ কর—সে ব্রত (এই) লক্ষ লক্ষ মানবের মুখে অন্ন তুলিয়া দেওয়া, লক্ষ লক্ষ মানবের কর্ণে সত্য মস্ত্রের বজ্রার তোলা, লক্ষ লক্ষ মানবের অন্তরে শ্রীভগবানকে জাগ্রত করা। ‘আজ ব্যক্তিগত সিদ্ধি ঋদ্ধি বিসর্জন দিয়া সমষ্টিগত ভাবে জাতি-সম্ভার পূর্ণশ্রী ফুটাইয়া তোলা—তবেই নবরাণালোকে তোনার অন্তর ভরিয়া উঠিবে, তুমি ভারতের যোগ্য সন্তান বলিয়া পরিচিত হইবে।”

শক্তিশালী ভারত সৃষ্টির প্রয়াসে এইরূপ কত বিদ্যুদ্গর্ভ লেখাই যে তিনি প্রবর্তকে এবং অজ্ঞাত পুস্তকের মধ্যে লিখিয়াছেন তাহার ইষত্তা নাই। আমার সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপ প্রধানতঃ নিখিল ভারতীয় দেবভাষা পরিষদের কার্য্য লইয়া হইলেও অজ্ঞাত বহু বিষয়ের কথাও তিনি কোন কোন পত্রে বিশদভাবে আমাকে

লিখিতেন এবং এই সকল পত্রপাঠে তাঁহার অজ্ঞাত সাধারণ মনীষা ও অপূর্ব্ব অদেশপ্রেমের পরিচয় পাইয়া আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। তাঁহার সঞ্চল প্রচেষ্টার মূলে ছিল একদল ভগবানের মাহুয সৃষ্টির বিচিত্র প্রয়াস এবং সেই ভগবানের মাহুযগুলিকে লইয়াই তিনি এই দেবভূমির বক্ষে একটা দেবজাতির সৃষ্টির স্বপ্ন দেখিতেন। আর এই দেবজাতির ভাষা যে দেবভাষা অর্থাৎ দীপ্তিময় সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না, ইহাই তিনি বিশ্বাস করিতেন। বিগত ৩৫ মে ১৯৪৮ তারিখে এই দীনকে লিখিত একখানি পত্র হইতে আবশ্যকীয় অংশগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :

শ্রীজ্ঞানেশচন্দ্র শর্মা

অশেষ স্নেহভাজনে—

তোমার ২৮।৪ তারিখের পত্র। নবসম্মতি নিশ্চয় পাইয়া থাক, আমার ব্যস্ততার কথা বুঝিবে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে যে ষট্‌বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল তাহার শেষ-বর্ষে সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্তির জন্যে শক্তির সীমা অতিক্রম করিয়াও সাফল্য পাই নাই।

অক্ষয় তৃতীয়ার পর বর্তমানের ঝামেলা কতকটা শেষ করিয়া একটি কার্য্যকরী সভার আহ্বান করিব। যাহারা দেবভাষা পরিষদের কার্য্যে সাধ্যমত প্রয়াস রক্ষা করিয়া চলিবে তাঁহাদের লইয়াই পরিষদের কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিব। জুন মাসের মাঝামাঝি এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাইব বলিয়া মনে করি।

মহাভারত সৃষ্টির আশা দীর্ঘদিন ঘুরাশাই থাকিবে। যে ভারত বর্তমান মানচিত্রে দেখিয়াছি সে ভারত যে মহাভারত নহে তাহা অতীতের ইতিহাসবেত্তাগণ অবশ্যই জানেন; সেই অশোচন, আগুণ, গাছার নাই। আজিকার খণ্ডিত ভারত অস্বীকার করার শক্তি যখন নাই তখন নীরবতা শ্রেয়ঃ করা ছাড়া অত উপায় কি আছে?

শ্রীকৃষ্ণের লীলাবসান কথা। বিপ্লবের স্মৃতি সেহিদিন হইতেই যেদিন ভারতে ঈশ্বর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়া রাজস্বয় যজ্ঞে যজ্ঞদেহে আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণরূপে সুধিষ্টির হস্তে প্রধান অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতের এক শ্রেণীর মানুষ শ্রীকৃষ্ণের অমুসরণ শ্রেয়ঃ করিষাচ্ছে আর এক শ্রেণী তাঁহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অমুসূলে তাঁহাদের সাধু পদব্যাচ্য করিয়া আর প্রতিকূলাচারীদের হুঙ্কতকারী আখ্যা দিয়া—“পরিজাণাম সাধুনাম বিনাশায় চ হুঙ্কতাং” শোকবাণী উচ্চারণ করিয়া ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন। দুর্ব্বাশার পার্শ্বে পাণ্ডবদের দোষ দর্শনের প্রয়াস এবং পাণ্ডববংশের অবশেষ না রাখার আশাস সকলই শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্তিত ভাগবত ধর্মের বিরুদ্ধতা। মোক্ষবাদী ভারতকে জীবনবাদী করার প্রচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের গীতার বাণী ব্যর্থ হইয়াছে; বুদ্ধিতির মহাপ্রস্থান উদ্যোগে মোক্ষবাদই প্রবল মূর্ত্তি ধরিয়াছে বুদ্ধিতির স্বজনহত্যার শোকে। পার্থের বিবাদ যোগই কুরুক্ষেত্র শেষে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। নিরাশ কুরুচল্ল দ্বারকায় আসিয়া আরও নিরাশ হইলেন নিজগণের মধ্যে স্থনীতি দর্শনে, তাই উদ্ধব গীতার রচনা। যে যোগ কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে প্রবর্তনের প্রয়াসে মর্ন্ত্যে দৈবের শ্রী ও ঐশ্বর্য্যাদি আনয়নের প্রয়াস করিয়াছিলেন সেই যোগের সন্ধান দ্বারকায় মিলিল না। স্পষ্টই বলিলেন—হস্তী অশ্ব ও রাজ্য মানুষকে যোগ-প্রতিষ্ঠ হইতে দেয় না, উদ্ধব তুমি যোগাশ্রিত হও; বহুল পরিধান কর, বদরিকায় গিয়া অপেক্ষা কর। প্রকৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম অমুতব করি। প্রকৃতির উর্দ্ধে মানবচেতনা উন্নীত করিয়া যে ধর্ম্মকে ভারত-গড়া তাহা আজও স্মদূরপর্য্যন্ত—একটা ব্যর্থতার দীর্ঘনিশ্বাস পশ্চাতে চলিয়াছিল অনার্থ্য্য জাতির বড়যন্ত্রে। বর্ত্তমান বেলুচিস্তানের আহিরজাতি যত্নপত্নীদের হরণ করিয়াছিল। অশ্বখামা অমর হইয়া ভারতের পাঞ্চজন্ম আভিও নীরব করিতে চাহে। ভারতের বিধাতা পুরুষ যাহা চাহেন, যুগধর্ম্মে তাহা নাকচ হয়—এসব কথা মহাভারত ও ভাগবতের ছত্রে ছত্রে আছে। যে ভগবান বৈষ্ণব-শালী, তাঁহার সহিত যুক্তিতে এত দৈন্য, এত ক্লেশ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যার অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আমি তাই গীতার ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিয়া একদল ভগবানের মানুষ গড়ার প্রেরণা লইয়া চলি। এ সকল কথা পত্রে

বলা দুঃসাধ্য; কয়েক ঘণ্টার আলাপেও সম্ভব নয়। সম্ভব আজ কয়েকজন দার্শনিক পণ্ডিত লইয়া আলোচনা করিতেছি। অন্ধভক্তি আমাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। ভারত বাঁচিবে যদি সে বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করে। নাহ্য পন্থা বিদ্যতেহ্যনায়। আমার আশীর্ব্বাদ।

(স্বা:) শ্রীমতিলাল রায়

এই পত্রের ছত্রে ছত্রে যে গভীর স্বদেশপ্রণে, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং দেশ ও দশকে বাঁচাইবার আকুল আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট তাহার তুলনা নাই। তাঁহার এই অকৃত্রিম জাতিনির্মাণ প্রচেষ্টা দেখিয়া মনে হয় যেন স্ববি বন্ধিম-চন্দ্রের মঙ্গলবীর্ষ্যই তাঁহার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এবং আনন্দমঠের সত্যানন্দ ও সন্তান সঙ্ঘই প্রবর্তক সঙ্ঘরূপে ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া দেশসেবার মহাত্মতে ব্রতী হইয়াছে। আনন্দমঠ-শ্রষ্টা সত্যানন্দ যেমন চরিত্র-বলকেই সন্তান ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান ও অত্যাবশ্যক গুণরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, প্রবর্তক সঙ্ঘের মধ্যেও তেমনি চরিত্রবলকে অপরিহার্য্য ও অত্যাবশ্যক বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিও অননুসাধারণ ছিল। “ভারত বাঁচিবে যদি বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করে”। ইহা যে ধর্ম্মেরই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তাহা কে অস্বীকার করিবে? ধর্ম্ম ও চরিত্রবলের ভিত্তিতে শক্তিশালী ভারত গঠনের প্রয়াস তাঁহার এক অক্ষয় কীর্ত্তি এবং এই কীর্ত্তির জন্ত অবশ্যই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, তবু তিনি এক একখানি চিঠিতে এত উচ্চাদের কথা লিখিতেন যে আমি বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যাইতাম। মহাভারতের খণ্ডিত রূপ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন, আবার তিনি এ কথাও আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত কেবল আলাপ আলোচনায় কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। উপরোক্ত পত্রাংশ হইতে ইহাও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশিত পন্থার অমুসরণ করাই ভারতের পক্ষে শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। তাঁহার মত নিকাম কর্ম্মযোগী এবং অননুসাধারণ চিন্তাশীল মনীষী এযুগে অধিক জনগ্রহণ করেন নাই, ইহা দৃঢ় কণ্ঠেই বলিতে পারা

বছরের প্রথম দিনটি

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত, এম. এ.

সময়ের অবিচ্ছিন্ন গতিপ্রবাহে দিনগুলির যাওয়া-আসা মানুষের কাছে পুরনো ; এই পুরনো ইতিহাসের ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তিতে কোন কোন সময় মানুষের মন ক্লান্তিতে ভরে ওঠে। তবুও মানুষেরই চিহ্নিত করা বছরের প্রথম দিনটি মানুষের কাছে নতুন একটি রূপ নিয়ে আসে। শুধু নতুন রূপ নয়, আদও তার নতুন। অন্তরকে সে আনন্দিত করে তোলে একটি অপক্লপ রসাস্বাদে। মানুষের ভালোবাসা চিরদিনই এই দিনটিকে রঙীন করে তোলে, বছরবিধ আনন্দ-সমারোহের মধ্যে একান্ত আপনার করে নেয়, আর অভিনন্দিত করে এই দিনটিকে।

বছরের বাবোটি মাসের মধ্যে বয়ে যায় বহু ঝড় ঝঞ্ঝা, বহু অপ্রীতিকর ঘটনা, এবং অনেক হৃদয়হীন অভিঘাতের বেদনা হৃদয়ের তটভূমিতে এসে আঘাত করে যায় ; কিন্তু মানুষ উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করে এই বিশেষ দিনটির জন্ম। মানবের এই প্রতীক্ষাতুর হৃদয়টিকে বিশ্লেষণ করলে এই কথাই আমরা বুঝতে পারি যে, নববর্ষের দিনটি আসে মানবের চিন্তালোকে এক সমৃদ্ধ দিনের চেতনা সৃষ্টি করে। সেই সমৃদ্ধ দিনটির প্রতীক্ষাতেই হৃদয়গুলি অধীর হয়ে থাকে বলে নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে তাদের ভাল লাগে। মানুষ তাকে অভিনন্দিত করে বহু আশা আনন্দের পুষ্পমালা দিয়ে।

মনে হয়, মানুষ পৃথিবীর প্রথম জন্মলগ্নকে স্মরণ করতে চায় এই নববর্ষ পালন করার মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর পূর্ব দিগন্তে প্রথম সূর্যোদয়ের জ্যোতির্ময় রূপকে জীব-জগৎ যেদিন প্রথম দেখেছিল, সেদিনও তাদের মনের গভীরে এমনি একটি আনন্দের তরঙ্গ দোলা দিয়েছিল।

যায়। নিখিল ভারতীয় দেবভাষা পরিষদের কার্যে ঐকান্তিক পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া তিনি আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, একমাত্র দেবভাষা সংস্কৃতই

সেই আনন্দতরঙ্গের দোলা আজও এসে পৃথিবীর তটে লাগে। সেই মানসপ্রবাহের ধারাবাহিক স্রুতিকে মানুষ আজও ভুলতে পারে নি এবং পারে নি বলেই নতুন বছরের উজ্জল দিনটিতে একটি সর্বব্যাপী অবিরল আনন্দের কলধনিকে মানুষ শুনতে পায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবসমাজের মানস-ইতিহাসকে এইভাবে যেন আমরা নিজেদেরই অজ্ঞাতে নিজেদের মনন ও আনন্দধ্যান দিয়ে অহুসরণ করে চলি। নববর্ষ তাই মানবধারার মানস-ইতিহাসেরই একটি চিহ্নিত করা অভিপ্রেত দিন।

মানুষের দিন গণনার মধ্যে পৃথিবীর কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের দিক আছে ; বিজ্ঞান বলে, পৃথিবী তার একবার কক্ষপরিক্রমা সমাপ্ত করে তিনশ পঁয়ষট্টি দিনরাত্রির কালশীমা অতিক্রম করে নতুনভাবে যখন আবার কক্ষপথে পদক্ষেপ করে, তখনই মানুষ সৃষ্টি করে তার নববর্ষকে। জ্যোতিষীগণনার আঙ্গিক সত্যতার দিনগুলি থেকে আমাদের মানব সমাজে এই নববর্ষেরও পথপরিক্রমা চলে আসছে ; এই পরিক্রমায় আমাদের মন অনেক আশা বৃকে বহন করে তার সাথী হতে চায়। তাই নববর্ষ মানবমনে আকাজক্ষার নতুন সুর রচনা করে করে পরিক্রমার পথে এগিয়ে চলে। যতই সে এগিয়ে যায় ততই মানবসমাজে আসে বহু উৎসবের আনন্দ-কোলাহল, অধ্যাত্মজীবনের নবতম অহুরঞ্জন, বেদনা-বিষাদের সঙ্করণ আর্তধ্বনি, সভ্যতার ইতিহাসে নব অধ্যায় সংযোজনের বিরাতম মানস সাধনা। নববর্ষের সেই চিহ্নিত দিনটির পরে তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে ভাগ করা সেই বছরটি পুরনো হ'তে থাকে বটে কিন্তু সেই বছরটি মানবসভ্যতার উজ্জল

ভারতীয় দেবজাতির রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে এবং উহার মধ্যেই ভারতের অনন্ত কল্যাণ নিহিত। কীর্ত্তিধ্বজ স জীবতি। স্বকীয় কীর্ত্তিবলেই ঋষি মতিলাল অমরত্ব লাভ করিবেন।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিশেষ কোন অবদান দিবে যে-দিনটিকে চিহ্নিত করে দিয়ে যায়, তা' মানুষের কাছে কোনদিন পুরনো হয় না। মানুষের কাছে চিরনবীন রূপ তার অরণ-মননের অস্থ্যানে। তাই নববর্ষ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে নতুন সঙ্কল্পে, মনকে প্রস্তুত করে একদিনের জন্তে হলেও জীর্ণতার ক্ষয়কে অস্বীকার করার জন্তে। মানুষের হিসাবের ধাতায়ও তাই নতুন জীবনের বহু কল্যাণকে বুকে ঠাই দিয়ে নতুন স্বাক্ষর পড়ে।

প্রত্যেকটি ব্যক্তিসত্তার মধ্যে যে-একটি পুরাতন আমি আছে, তাকে নতুন ক'রে উপলব্ধি করার প্রয়াস চিরকালই আমাদের মধ্যে আছে। নববর্ষের দিনটি আমাদেরকে যেন সেই উপলব্ধির একটি নবতম দ্বারদেশে এনে উপস্থিত ক'রে দেয়। কঠোপনিষদ বলেছেন :

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ।

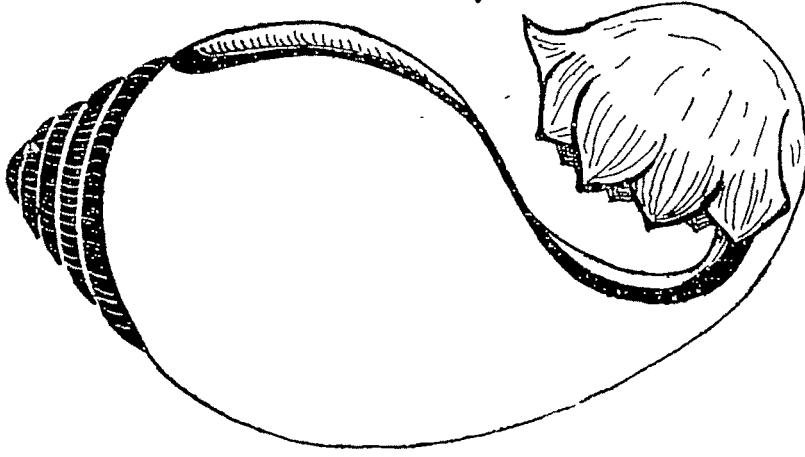
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রত্যাহমেব চ ॥

অর্থাৎ জীবাত্মাকে জানবে রথস্বামীরূপে এবং শরীরকে জানবে রথ ব'লে; আর সেই সঙ্গে বুদ্ধিকে রথচালক আর মনকে লাগাম বলে জানতে হবে। এখানে বুঝতে পারি আমাদের জীবনে গভীরতম উপলব্ধির জন্তে একটি গতির দিক আছে; নববর্ষ সেই গতির দিকটির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। গতি না থাকলে জীবন হয়ে যায় স্থিমিত। জীবনের চলায় যদি একটি স্থিমিতভাব আসে তবে সৃষ্টির মধ্যেও আসে একটি পঙ্কিল নিশ্চলতা। কারণ মানুষের জীবন নিয়েই তো সৃষ্টি। তাই অস্বাস্থ্যকর নিশ্চলতা থেকে রক্ষা করার জন্তেই নববর্ষ শুধু আমাদের জীবনকে আনন্দিত করে না, আত্মাকেও উদ্বোধিত করে,—নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে চির জাগ্রত থাকার প্রেরণাদানও করে।

“ঐতরীয় ব্রাহ্মণের কথায়, জীবনকে যে শুইয়ে রাখা চলে না, নববর্ষ সেই কথাটিই আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়। চলার পথের অব্যাহত গতিধারায় নিজেই যে চালাতে হবে, তার জন্তে সে একটি প্রস্তুতিপর্ব রচনা করে। এক কথায়, জীবনের একটি

সামগ্রিক রূপের পরিস্ফুটনের দিক নির্দেশ করে যায় নববর্ষের বহু আকাজ্কিত দিনটি। এই দিনটি অনাদির মধ্যে যেমন আদিকে অরণ করায়, তেমনি সমারোহের মধ্যে চিরকালীন সত্য ও সার্থকতার পথে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে সাহায্য করে, নবকিশলয়ের স্নিগ্ধ শ্রামল রূপের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির আত্মসংকেও জাগিয়ে তোলে। নববর্ষের আসন তাই মানবজীবনে চিরদিনকার।

আমাদের নববর্ষ আরম্ভ হয় বৈশাখ মাসটিকে অবলম্বন ক'রে; বিশাখা নক্ষত্রের সঙ্গে তার নাকি একটি যোগসূত্র আছে। সূত্রে যা-ই থাক, বৈশাখের একটি তীক্ষ্ণজ্ঞান রূপের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষীয় সাধনার মনটি নিজেকে গভীরভাবে নিবিষ্ট রেখে যেন আত্মিক সূচিচিহ্ন অর্জন করতে চায়। বৈশাখের বিস্তৃত শূন্য প্রান্তরের বহুবিস্তৃতির মধ্যে যে দুর্বিষহ অগ্নিদহনের বাঁঝালো ভাষটিকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাই যেন ভারতীয় আত্মার কঠিন তপস্যার হুঃখবাহী রূপ। এই রূপকে অস্বীকার করার কোন দিক দিয়েই উপায় নেই। বৈশাখ ভারতের সেই রূপটিকেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। ভারত যেন তার দীপ্তোজ্জ্বল অগ্নিবর্ষী রৌদ্রপ্রবাহের মধ্যে বসে স্নকঠিন তপস্যার দ্বারা বিগত বৎসরের পুঞ্জীভূত ম্লানি ও ম্লানিমাকে তস্মীভূত ক'রে নতুন আত্মার উজ্জ্বল দিগন্তকে প্রত্যক্ষ করবে; সূচিসূক্ষ্মর নতুন ভারতের নির্মল একটি রূপকে তুলে ধরবে বিশ্বপৃথিবীর সকলের কাছে। আমাদের ভারতের সেই বহুপ্রার্থিত সমৃদ্ধ রূপটিকে দেখার জন্তেই আমরা চিরদিন অতীলাষী। নববর্ষের দিনটিতে আমরা ভারতের সেই তপস্যাসমৃদ্ধ শুভ্র নির্মল রূপকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করব, আর বলব আমাদের আত্মিক শক্তি জাগ্রত হোক। ভারতের কর্মের সঙ্গে ভারতের আত্মাকে যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি। নববর্ষের পুণ্য দিনটিতে রবীন্দ্রনাথও ‘প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ’ বিরাজ করছেন তাকে অন্তরের প্রণাম জানিয়েছেন। সেই ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে আমরাও আমাদের প্রণাম নিবেদন করি।



অক্ষয়তৃতীয়ার বানী ও ঐতিহ্য

শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত

তিথিপূজা অক্ষয়তৃতীয়ার। সত্যযুগের স্মৃতিরক্ষা। আরও কথা—ইহা প্রবর্তক সঙ্ঘের শুভ জন্মোৎসব। ষাঁরা প্রবর্তক সঙ্ঘের সৃষ্টিকথা জানেন, সঙ্ঘগুরু “জীবনসঙ্গিনী” পুণ্যগ্রন্থ ও অষ্টাঙ্গ রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে ইহা অজানা নহে। তবুও সকলেরই স্মরণার্থে এখানে সঙ্ঘগুরুই আত্মকথা একটু উদ্ধৃত করিতেছি—১৩৫১ সালের “প্রবর্তক” তিনি লিখিয়া ছিলেন—“অক্ষয়তৃতীয়া” শীর্ষক এক আদর্শ ও ঐতিহ্য-স্মারক নিবন্ধে :

অক্ষয়তৃতীয়া

প্রাচীনেরা বলেন—৩৮২৩০৪৫ বৎসর পূর্বে এমন একটি শুভদিনের আবির্ভাব হইয়াছিল। বসন্তের বাতাসে যেমন শুষ্ককুল মুকুলিত হয়, সেইরূপ স্বভাবের মধ্যে ঋতময় সত্য ১৭২৮০০০ বৎসর নিয়ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর কত লক্ষ বৎসর অতীত হইয়াছে, মহাকাল সে পুণ্যময় জীবনস্মৃতি নিঃশেষে মুছিতে পারেন নাই। আজও তাই সেই শুভ দিনটা আমরা প্রতি বৎসর অক্ষয়তৃতীয়ায় স্মরণে রাখি। গ্রহে-গ্রহে কলসোৎসর্গের উৎসবপ্রবাহ বহে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নুতন-খাতার প্রবর্তন হয়। গো-ব্রাহ্মণের পূজাদিতে কুলাঙ্গনারা পথে সারি দিয়া চলে। সেদিন গোধূম ছিল জ্বাতির

প্রধান খাদ্য; তাই আজিও বিষ্ণুপূজায় যব দিয়া হোম-কর্ম-সমাধানের বিধি প্রবর্তিত আছে। যবের ছাত্ত পুত্র-কন্যাদের হাতে দিয়া আমরা তাহাদের দীর্ঘায়ুঃ কামনা করি। যবদানে জ্ঞাতি মুক্তহস্ত হয়। কৃতযুগের পূজা অক্ষয়তৃতীয়ায় আজিও ভারতের সর্বত্র অল্পাঙ্কিত হয়। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে এই শুভদিনে চন্দনযাত্রার উৎসব মহাসমারোহে হইয়া থাকে। এই পুণ্যদিনে হিমালয় হইতে গঙ্গাদেবীকে তপস্বীরূপ আবাহন করিয়া ডাকিয়া আনেন। পরশুরামদেব এই শুভদিনে আবির্ভূত হন। ভারতসম্রাট মহারাজ পৃথু প্রথম ক্ষেত্রকর্ষণে খাদ্যশস্যের বীজ বপন করেন—এই অক্ষয়তৃতীয়ায়। বাংলার বহু স্থানে অক্ষয়তৃতীয়ার মহোৎসব সম্পন্ন হয়। ১২১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে অজ্ঞাতবাস-কালে, তাঁর প্রেরিত মন্ত্র আমার হাতে অক্ষয়তৃতীয়াতেই পৌঁছায়। তারপর আমি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। সঙ্ঘজননীর প্রাণে অক্ষয়তৃতীয়া ব্রতপালনের প্রেরণা অবতরণ করে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর অক্ষয়তৃতীয়ার ব্রত পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমি পূর্বাশ্রম ত্যাগ করিয়া সম্বাশ্রম প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হই। এই অক্ষয়তৃতীয়ায় প্রবর্তক সঙ্ঘের আবির্ভাব হয়।

ইহার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কথা। এই পুণ্যতিথিতে একাক্ষর ব্রহ্মনাম এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। অভাবনীয়

যুগসন্ধি। অপূর্ণ সত্যের গতি। এই কৃতযুগে পূর্ণ পুণ্য ; পাপ অবিরত ছিল। মানুষ দীর্ঘায়ুঃ হইত। পঞ্জিকার ভাষায় বলিব—মানুষের লক্ষ বর্ষ পরমায়ুঃ। তাহার স্বাস্থ্য ছিল, সমুন্নত দেহ ছিল। আজিকার মত প্রাণ অন্নগত হইয়া থাকিত না, মজ্জাগত হইয়া প্রাণ অবস্থান করিত। মানুষ রোগকাতর হইত না। মৃত্যু ছিল ইচ্ছাধীন। সত্যপূর্ণ ভারতের জীবন ঐশ্বর্য্যময় ছিল। সাম-রবে ভারতের আকাশ-বাতাস প্রতি প্রভাতে মুগ্ধিত হইত। এই যুগলক্ষণ কীৰ্ত্তন করিতে গ্রাচীনরা গাহিয়াছেন—

সত্যে ধর্ম্মরতা নিত্যং তীর্থাপাঞ্চ সদাশ্রয়াঃ।

নন্দন্তে দেবতাঃ সর্ষাঃ সত্যে সত্যপরা নরাঃ ॥

—তারক-ব্রহ্ম-নামই ছিল যুগময়। আমি আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া ভাবি, সেই প্রাচীন ঋষিদের মত বলিতে ইচ্ছা হয়—“কেনেযিতং পততি প্রেযিতং মনঃ”—কে এমন অন্তর-প্রেরণা দিল, যাহাতে আমরা উদ্ধুদ্ধ হইলাম। বহু যুগ পরে ব্রহ্মোপাসনা-প্রণবপ্রতিষ্ঠার পর আবাব বেদধ্বনি উঠিল ভাগীরথীর তীরে শ্রীমন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া—শত-শত কণ্ঠে মন্ত্রধ্বনি হইল এই অক্ষয়ভূতীয়ায়। আজ সারা বাংলায় তাহার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। এই জাগ্রৎ ইতিহাস অস্বীকার করি কেমন করিয়া? সেই যে ঋষিরা বলিয়াছেন—

নারায়ণপরা দেবাঃ নারায়ণপরাঙ্করাঃ।

নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ ॥

মোক্ষ, মুক্তি, শান্তি, গতি কৃতযুগে নারায়ণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আশ্রয়ণীয় হয় প্রবর্তক দিব্য-যাত্রা করিয়াছে এই শুভদিনে। অক্ষয় গতি তার। অব্যর্থ লক্ষ্যে সে চলিবে লক্ষ-লক্ষ বর্ষ। আজ সেই অতীতের কৃত যুগ মূর্ত্ত হয় আমার সম্মুখেই। আমি বাঙালি জাতিকে অক্ষয়ভূতীয়ার ব্রতগ্রহণে প্রবুদ্ধ করিতে চাই। ব্রত পূর্ণ হওবার দিনে বাঙালি দেখিবে—সত্যের দেবতা তাহাদের দেশমাতৃকা সোণার বাংলায় আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। সত্যের পূজারী বাঙালি এক অকল্পিত অনির্কচনীয় প্রভাবে আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।

আমাদের উপাসনার মন্ত্র আজ দেশ-জাতির শুভ-

কামনায প্রযুক্ত হউক। আমাদের অন্তর সত্যশ্রীমণ্ডিত হউক। আমাদের চিত্ত নিষ্কলুষ হইয়া প্রেমে অভিষিক্ত হউক। আমাদের মন্দিরচূড়ায় গৈরিক পতাকা জাতিকে নিরাসক্ত করুক। আমাদের চাতুর্ক্য-লাভিত জাতীয় পতাকা জাতির মস্তিকে নূতন মেধা প্রদান করুক। বাঙালির হৃদয়ে প্রেমের প্রবাহ বহুক। প্রাণে মার্শ্বণ্ডের জ্যোতির্ম্ময় বীর্য্য অহুভূত হউক। বাঙালি জাতি সুষ্ট দেহ লইয়া নর-নারায়ণের সেবায় উদ্বুদ্ধ হউক। এই উৎসবমুখে এই প্রার্থনাই পরমেশ্বরের নিকট আমরা সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছি। আমরা স্বরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা চাই। দিব্য সমাজ-সৃষ্টি সার্বক করিতে চাই। সত্যপ্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিক ক্ষেত্র গড়িতে চাই। আমরা বাংলার গ্রামে, নগরে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি ঘরে সত্যের পূজারী সৃষ্টি করিতে চাই। জাতীয় জীবনের দৃঢ়ভিত্তি-রচনার জন্ত প্রেম ও ঐক্যসম্বন্ধিত সংহতি প্রার্থনা করি। আমাদের মধ্যে নীতি, যুক্তি, অহুভূতির জ্যোতিঃ বিরাজ করুক। আমাদের মধ্য হইতে অদ্যত্ন ও মিথ্যা চির নির্দাসিত করিয়া, ভগবান্ আমাদের সত্যের জ্যোতির্ম্ময় রথে লইয়া চলুন—অমৃতের পথে—পর্যাপ্ত পুরুষোত্তমেরই অভিমুখে। শত-শত কণ্ঠে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এস আমরা আগামী পূর্ণিমাষ গগনে পূর্ণচন্দ্র দেখা পর্য্যন্ত চতুর্দশদিনব্যাপী সত্যের সাধনায উদ্বুদ্ধ হই। সর্বপ্রকার দুষ্কৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, বিশুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বলি—আমরা কেহ কাহারও পর নহি। কস্মদোষে কেহ শত্রু, কেহ মিত্র। আজ আমরা সকল ভেদ দূর করিয়া সংহতির জয় ঘোষণা করিব। আমাদের ধর্ম্ম এক, আমাদের লক্ষ্য এক। আমাদের উপাস্ত্র এক। উপাসনা এক। আমরা অনৈক্যকে বিসর্জন দিয়া ঐক্যপ্রতিষ্ঠা হইব। তবেই আমাদের কণ্ঠের এই মন্ত্র সার্বক হইবে, সত্য হইয়া জীবনকে উহা শক্তিপূত করিবে—

“ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমদ্যতে।

পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥”

প্রাতঃস্মরণীয় সঙ্ঘস্মরণীর অমর-লেখনীনিঃসৃত এই মনোজ্ঞ রচনা সবিস্তার এখানে সঙ্কলিত করিলাম। কারণ

—তাঁর কথা—প্রবর্তক সজ্জেরই মর্মকথা; আবার মূলতঃ ইহা সনাতন হিন্দু ভারতেরও মর্মকথা বলিলেও কিছুমাত্র অতিরঞ্জনোক্তি হইবে না।

২

প্রবর্তক শ্রীমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া প্রবর্তক সজ্জের অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব।

মন্দির প্রতীক, মন্দির উপলক্ষ্য। এই প্রতীককে আশ্রয় করিয়া, বাংলায় তথায় ভারতে নূতন জাতি-সাধনারই কল্প-স্বপ্নকে রূপায়িত করার তপস্বী সৃষ্টি করেন পুজনীয় সজ্জগুরু।

দেড় শতাব্দিক বৎসর কালের প্রাচীন এই মন্দিরে—যাহা “কনে বউ’র জ্যোদশ মন্দির” নামে চন্দ্রনগরে সু-পরিচিত—ইহাতে শুনা যায় “ভুবনেশ্বরী” শক্তি-মূর্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ স্থানীয় শক্তি-বৈষ্ণব কলহে বিগ্রহহীন হইয়া তথা-বশেষ অবস্থায় ৪টা মাত্র পার্শ্বমন্দির লইয়া ভাগীরথীতীরস্থ গোঁস্বামিঘাট পল্লীতে দীর্ঘযুগ ধরিয়া কোনমতে ইহা আশ্রয়লাভ করিতেছিল।

ইহারই সংরক্ষণপ্রেরণায়, প্রবর্তক সজ্জগুরু ১৩২৯ সালে সমন্দির স্থানটিকে ক্রয়মূল্যে গ্রহণ করেন ও জীর্ণ মন্দিরগুলির সংস্কার করাইয়া কেন্দ্র-মহামন্দিরে প্রণব-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প প্রাপ্ত হন। সেই প্রণবপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁহার অন্তরের মর্মকথা—তাঁহারই অননুক্রমণীয় ভাষায় আবার সমুদ্রত করিতেছি—

“এই ঠাকুর-মূর্তির সম্বন্ধে কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে। ঠাকুর—বিশ্ববাণীরই অনাহত নাদমূর্তি। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্পকলার চির বীজযোনি—ভারতের সনাতন বৈদিক সাধনার গোমুখী উৎসমূল।

আমরা বিগ্রহহীন মন্দিরে এই নাদ-ব্রহ্মেরই একমাত্র প্রতিষ্ঠা দিতে চাই—কারণ এই প্রতীক-সাধনার অসংখ্য বৈচিত্র্যে, এই একমাত্র মূর্তি প্রতীককে সারা হিন্দুভারত

অথবা কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। উপরন্তু এই স্থলাতিরিক্ত সূক্ষ্মতর শব্দশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ভারতের নব জাতিজীবনে সর্ব-জাতি-সম্মেলনকারী মহা-ভূদয়-মন্ত্র জাগিতে চলিয়াছে। মন্ত্রশক্তি জাতি-চেতনারই সাধনবীজ—আত্মবোধনের মূল প্রেরণা-স্থল। শুভ-সুন্দর স্বপ্ন কারুকল্পখচিত রোপ্যঘটে, পূর্ণকৃষ্ণে, স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা প্রণব-লেখা—পূর্ণস্তরা জাতি-হৃদয়োদ্ভূতা, জ্যোতির্গম্যী, বিদ্যুৎশিখারূপিণী হেম-বর্ণা হৈমবতী উমার স্ফাট

জাতির জাগরণকে

শোভা পাইবেন না কি? এই চিহ্নজি, এই ভাবধনা তপোমূর্তিকে আশ্রয় করিয়াই আমরা ভারতের জাতীয় জীবনে নব দীক্ষাভিক্ষে গ্রহণ করিব।”

এই প্রেরণাকেই মূল করিয়া, তিনি ৬ই বৈশাখ বৈশাখী অক্ষয়তৃতীয়ার দিনেই মহামন্দিরের নব উদ্বোধনোৎসব-সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। সঙ্কল্পেরই সুরে রূপায়ণের পরিকল্পনা—তাহাও তাঁহারই স্বচ্ছ-সুন্দর কল্প-ভাষায় স্বব্যক্ত হইবে—



অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব-প্রতিষ্ঠাতা সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল।

“সেই চিরস্মরণীয় দিনে স্ততদিনে নবযুগদেবতারই মুঙ্গল-শঙ্খধ্বনি আমরা শুনিতে চাই—এই দিন বাংলায় শুদ্ধ কল্যাণময়, সত্য জাতীয় জীবনেরই প্রতিষ্ঠা হউক। এতদ্ব্যপেক্ষেই আমরা সারা বাংলায় শুদ্ধপ্রাণ ও শুদ্ধহৃদয় নেতৃশক্তি, যুবকশক্তি ও জনশক্তির প্রতিনিধিগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিব। তাঁহারা দেশকল্যাণেচ্ছারই বশবর্তী হইয়া জাতীয়ত্বেরই আমন্ত্রণে আসিবেন। নবজাতি যে দিব্য নব ব্রতে দীক্ষা লইতে চায়, দেশমাতা আমাদের সকলকে সেইদিন সেই মহাদীক্ষাভিষেকেই বরিত করিয়া লউন। সেদিন আমরা পূর্ণ সংঘমাচারেই কায়মনঃপ্রাণ তপঃশুদ্ধ করিয়া জাতিদেবতার ঠিকার-মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিব।”

দীর্ঘ দেড়শত বৎসরের অধিককাল গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া, দুর্জনের অত্যাচারে, অপদার্থের অনাচারে, উপেক্ষায়, নব ভবিষ্যতের স্বপ্নবীজ বৃকে লইয়া যে মহামন্দির এতদিন সংগোপনে প্রতীক্ষমাণ ছিল, অমর্যাদায় শ্রীহারা মহিমহীন সেই বহু যুগের তপঃপীঠ এক হিন্দু ধর্ম্মদুর্গকেই নবযুগোপযোগী নবীন শ্রী-বিভূতি-মহিমায় বিমণ্ডিত করিয়া নবজাতির শিক্ষা-দীক্ষা-তপস্কার মহাতীর্থরূপে গড়িয়া তোলায় এই নব প্রেরণা—সজ্জের জীবনে যেমন, তেমনই সজ্জ-সেবিত বাংলা ও ভারতের প্রচলমান জাতীয় জীবনের নিগূঢ় মর্ম্মতলেও এক অভিনব দিগন্তেরই বুকি, সেদিন উন্মোচন করিয়াছিল।

৩

অক্ষয়তৃতীয়ায় সত্যযুগের আবির্ভাব। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চতুষ্টয় পূর্ণ হইলে, আবার নূতন সত্যের প্রকাশ হয়। এখন আমরা সেই নূতন সত্যেরই উষারাগ-রঞ্জিত পূর্ব্বসন্ধিক্ষণে। সত্য হইতে কলি চারিটি যুগের পূর্ণপ্রবাহ যে জাতি ধারণ করিয়াছে, সেই জাতিই আবার নব সত্য-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে। সমগ্রজাতির তত্ত্বজ্ঞ যে সত্য ও দিব্য তিস্তির উপর পুনর্গঠন, উহাই লক্ষ্যরূপে সম্মুখে রাখিয়া নবসংস্কৃত প্রবর্তক শ্রীমন্দিরে জাতি-সাধনার নবজীর্ঘ প্রতিক্রিয়া চাইল।

সঙ্কল্প—নব জাতির প্রতিষ্ঠা। তাই ভারতাত্মারই আবাহন—দেশঘটে তথা দেহঘটে করিলেন গুরু-স্বরূপ সজ্জগুরু এই নূতন জাতীয়তার মন্দিরতীর্থে—“প্রবর্তক-জাতিমন্দিরে” তথা “যোগ ও ব্রহ্মবিজ্ঞা মন্দিরে”। মূন্ময় প্রতীকে চিন্ময় দেবতার উদ্বোধন—প্রণববেদীর মর্ম্মর-মর্ম্মে যেন মহাপ্রাণের চিহ্নজ্ঞি অমুপ্রবিষ্ট হইয়া জড়-চেতনার অপূর্ণ সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটাইল। “শক্ত্যাং তগবতি চ শ্রদ্ধা”—ঋষি শ্রীঅরবিন্দের আবিষ্কৃত এই সিদ্ধমন্ত্র মর্ম্মর-বেদীগাত্রে খোদিত হইয়া শ্রদ্ধার উদ্দীপনী মহিমা আজও সেখান নীরবে ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে।

অসংখ্য জনতাকে সন্মোদন করিয়া সজ্জগুরু যে ভাষণ দিলেন, তাহাতে জাতি-সাধনারই মূল তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইল। তিনি বলিলেন:

“অধ্যাত্মসাধনার ত্রায়, জাতিসাধনাতেও সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, জাতিকেই প্রতীক গ্রহণ করিয়া, ‘আমি জাতি-স্বরূপ’ এই সিদ্ধ বোধেই তপস্কা করিতে হইবে।... এই দেশপ্রতীক শুধু হিমাঙ্গিমুকুট ও সাগরচুম্বিত ভৌগোলিক রূপটুকু নহে, ইহার মধ্যে আছেন যে বিরাট দেশাত্মা, সেই ভারতসত্তাই আমাদের পূজ্য, উপাসনার কেন্দ্র হউন—তাঁহারই নিখুঁৎ রূপ আমাদের জীবন-সাধনায় আবিভূত ও প্রকট হইয়া উঠুন।”

সেদিন এই উদ্বোধনী উৎসব-সভার স্নযোগ্য পুরোহিত জাতীয় নেতা বিপিনচন্দ্র পালের কণ্ঠেও অপূর্ণ মর্ম্ম-সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিল—সেই একই সুরে তাঁরও কথা:

“আমার গুরুদেব, প্রভূপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে নামব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠাপনে এই মহৎ ও গূঢ় উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করিয়া যান। আজ তাই এই প্রবর্তক সজ্জের তপস্যায় চন্দননগরে ঠিকারমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা আমার গভীরতম আনন্দেরই বিষয়।”

রসিক-সাধক বিপিনচন্দ্র আরও বলিলেন—“যে নিত্য দেশের আলো এই ভারত দেশের মাটির বৃকে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই দেশ বৃন্দাবন ছাড়া আর কি? বৃন্দাবনই নিত্য ব্রহ্মভূমি—যেখানে নিত্য সখ্যতারই রসলীলা, মেলা, প্রেমখেলা। আজ ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, বিশ্বমানব ও জীবজগৎ—সকল রূপ, সকল

সম্বন্ধকে রূপায়িত ও রসায়িত করিয়া আপনাদের এই মহাসাধনা সিদ্ধ হউক, সার্থক হউক।”

সেদিন সে উৎসবক্ষেত্রে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য—তরুণ স্মৃতিচরিত্র (বসু), অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক পীযুষকান্তি ঘোষ, বিপ্লবী হৃষীকেশ কাক্সিলাল, কুমারী সম্ভাষকুমারী গুপ্তা, চন্দ্রনগরের হরিহর শেঠ ও চারু-চন্দ্র রায় প্রভৃতি।

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক

পিয়ানিস্ট সাহেব জুদ্র কলম্বো হইতে পত্র, শিল্পাচার্য্য গগনেন্দ্র ঠাকুর ও শিল্পী বীরেন্দ্রনাথ বর্ষগ স্বাক্ষরিত শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণদেবের পটমালা এবং জুদ্র কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ছবি—উপঢৌকন পাঠাইয়া, সম্বন্ধে এই নব প্রেরণার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সহায়-ভূতি ও শুভেচ্ছা সেদিন নিবেদন করিয়াছিলেন।

এ-ঘটনা—১৩৩০ সালের ৬ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার। ঐ পবিত্র তিথিতেই শ্রীমন্দিরের নব জন্মদিনের সঙ্গেই প্রবর্তক সন্থ অক্ষয়-তৃতীয়া মহোৎসবেরও শুভোদয়-স্বচনা।



সম্বন্ধপ্রতিষ্ঠিত (১৯২৩ খৃঃ, ১৩০০) গঙ্গা ও ব্রহ্মবিছা মন্দির : এই জাতীয় মন্দির-প্রাকণে
এতি বৎসর অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব—মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে

৪

১৩৩০ সালের অক্ষয়তৃতীয়ার শ্রীমন্দিরে প্রণববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইল। পর বৎসর উৎসবের আয়োজনে নূতন প্রেরণা ও কল্পনা লইয়া এক জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনীর সংযোজন ঘোষণা করা হইল। মহারাষ্ট্রে লোকমাছ তিলক জাতিচেতনার উদ্বোধনকল্পে “শিবাজী” ও “গণপতি” উৎসব প্রবর্তন করেন। বাংলায় ব্রাহ্মসমাজে নবরূপ মিত্রের উদ্যোগে হিন্দু মেলা ও তন্নী নিবেদিত।

চিত্র, শোভাযাত্রাদির মধ্য দিয়া ভারতসংস্কৃতির পরিচয় দেওয়ার যে প্রয়াস করেন, তাহার মধ্যে ছিল এই জাতীয়-তারই প্রকাশাত্মক প্রেরণা। চন্দ্রনগরে ১৯১০-এ মনীষী চারুচন্দ্র রায়ের উৎসাহে ও সঙ্ঘগুরু সহযোগিতায় যে সারস্বতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেও প্রাথমিক পূর্বভাস ছিল এইরূপ প্রচেষ্টার। প্রাচীন রামলীলাদি

অনুষ্ঠানে ভারতের সর্বত্র কিছু-কিছু পৌরাণিক দেবলীলা মূর্তিযোগে দেখাইবার চেষ্টা দেখা যায়। চন্দ্রনগরে এই গোত্রানিধাটেরই ‘জগদীশতীর্থে’ও পুরাতন মেলায় এইরূপ আয়োজনের চলন ছিল। সঙ্ঘগুরু বিশেষ-ভাবে সেই প্রেরণা গ্রহণ করিয়া, তাহাকে অনন্তনিষ্ঠায় জাতি-জীবনে নব সজীবনীশক্তিসম্ভারেরই অমূল্য ঋণে বহাইয়া দেন—ইহাই সে বৎসর “ভাগীরথীচিত্রশিলায়”

প্রথম রূপায়ণ পায়। মেলার উদ্বোধন করেন—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তদবধি আজ ৪২ বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিক অমুক্রমে এই সাংস্কৃতিক রূপায়ণের সাধনা শুধু প্রবর্তক সম্বন্ধেই বিশেষ ঐতিহ্যসৃষ্টি নহে, ইহা সারা বাংলায় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-প্রচারের এক অভিনব দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইয়াছে—অমুপ্রেরণা দিয়াছে, পথ প্রদর্শন করিয়াছে—নূতন জাতিসাধনার। স্থানীয় প্রাচীন যুগশিল্প তথা মুস্তিশিল্পকে ইহা যেমন নূতন প্রাণ দিয়াছে, তেমনি তরুণজাতির সম্মুখে অন্তরঙ্গ দেশপরিচয় ও জন-



মহাত্মা গান্ধী ও সন্তোষক (দক্ষিণ হস্ত প্রদারিত) : ১৯২৬

সমাজের গণ-চিন্তে নব চেতনাসঞ্চারের নূতন ধারা খুলিয়া দিয়াছে।

প্রতি বর্ষের এই সকল কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যমূলক প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া সন্তোষক ও প্রবর্তক সম্বন্ধে যে সংগঠনী প্রতিভার প্রকাশ ও রূপায়ণশিল্পের উদ্বর্তন হইয়াছে, তাহা একত্র স্থায়ী ভাবে সংরক্ষিত হইলে, এক সুবিশাল অপূর্ণ “মিউজিয়াম” বা মহা “ঐতিহ্যগারে” পরিণত হওয়া অসম্ভব ছিল না।

১৩৪৪ সালে, ১৪ই আষাঢ় অর্থাৎ মন্দিরপ্রতিষ্ঠার

১৪ বৎসর পরে, এক প্রার্টের ঘনাক্ষারময়ী কালনিশায়, শ্রীমন্দির হইতে সুবর্ণাঙ্কিত রক্ত-খট সহস্র তন্ত্র কঙ্ক অপহৃত ও নিরুদ্দেশ হয়। সন্তোষকর হৃদয়ে ইহা নিদারুণ বেদনার সঞ্চার করিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। নিয়তির এই আকস্মিক অকল্পিত গুপ্তাঘাতে কয়েক মাস শুক-বিমুগ্ধ হইলেও, সন্তোষকর অন্তরে হিন্দু ভারতের আগরণোন্মুখ প্রাণশক্তি উদ্দীপ্ত হইতেছিল, তাহা বেদনায় তপোদীপ্ত হইয়া প্রথমে এক নূতন প্রতীক আশ্রয় করিল। এই প্রতীকের ধ্যানদৃষ্টি যোগাইলেন প্রতিভাশালী ভাস্করশিল্পী, মাদ্রাজের শ্রীহরম্বর শর্মা। ইহা মন্দিরগায়ে শিলাঙ্কিত এক বিগ্রহ। প্রতীকের ধর্ম-শাস্ত্র ও শিল্পশাস্ত্রসম্মত মর্ম্মব্যাখ্যা দিলেন শ্রীশর্মা নিজেই—(তাঁহার মূল রচনা ইংরাজীতে)—উহার সুগম্ভীর অধ্যাত্মব্যাঞ্জনা এবং বিশেষ দার্শনিকত্ব ও তাত্ত্বিকতা তাঁহারই রচনাশ্রেয়ে এখানে সঞ্চারিত হইল—ধর্ম্মপ্রাণ, শিল্পপ্রেমিক মাত্রেয় তাহা গম্ভীর প্রণিধানযোগ্য।

সঙ্ঘপ্রতীক-পরিচয়

সকল জীবের বিকাশের পশ্চাৎ যে সর্বশক্তিমান পুরুষ রয়েছেন, মানুষ তাঁকে যখন ইন্দ্রিয়-গ্রাস করার প্রয়াস পেয়েছে, সে তার অমুভূতিকে রূপ দেওয়ার জন্য সীমার আশ্রয় না নিয়ে পারে-নি, কারণ শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক সসীমতা মানুষের প্রকৃতিগত। স্বার্থেদের প্রারম্ভ-সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত অসীমকে সীমায় মুগ্ধ বা ব্যক্ত করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর বহু রূপ এবং নামের। এই নাম-রূপের বহু বিকাশকে সর্বত্রই আচ্ছন্ন করে’ রেখেছে স্বার্থেদের একটি চিরন্তন সত্য ‘একং সৎ বহুধা নামানি’, সত্য এক, নামেরই কেবল বহুত্ব। শিল্পশাস্ত্রের “স্বস্ত-পঞ্জার” তেমনি একটি অতি প্রাচীন ভাব-মুগ্ধি, যা ‘আমাদের কাছে ধারাবাহিক ভাবে পরিবেশিত হয়ে’ এসেছে এবং যা ‘ভাগ্যক্রমে বিগ্রহ-ধ্বংসকারীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে’ দক্ষিণ ভারতের বহু “আল্যামে” এখনও যে-কোন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। স্বভাবতঃই এর শত-সহস্র আকারভেদ লক্ষ্যে পড়ে, কারণ স্থপতিগণ আমাদের ধ্যান-লোকের রূপ

জগতের বাস্তবতায় বিগ্রহায়িত করেছিলেন, আমাদের শিল্প-শাস্ত্র তাঁদের দিয়েছিল রূপ-বিকাশের অবাধ কল্পনা। প্রথমতঃ, নাম থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি, এ একটি কুস্ত এবং যুগপৎ একটি “পঞ্জার” অর্থাৎ পঞ্জর বা খাঁচা। সাদা কথায় একে বলা যায়—কলনী খাঁচা, এমনি একটি খাঁচাতেই অপশ্রু এবং অবোধ্য অসীমকে সীমার মাঝে রূপায়িত করে’ তোলা হয়েছে। খাঁচাটি আবার সম্পূর্ণ রুদ্ধ এবং “আচ্ছাদিত, যা’ থেকে সঙ্কেতিত এবং নিরূপিত হয়—এর অন্তর্বস্তুর সান্নিধ্যে, যাওয়া যায় না। অন্তহীন, অজ্ঞেয়া অপ্রকাশ এবং গুণাতীত যে পুরুষ এই বিশ্বের অবলম্বন, তাঁকে আমাদের ক্ষুদ্র দ্যোতনা-শক্তি বন্দী করেছে একটি কলসে। কুস্ত রূপ-জগতের অতি সুন্দর একটি প্রতীক। কুস্তাকার এই অনন্ত আকাশকে কলস ছাড়া আর কিছু দিয়েই চিত্রিত করা যায় না। কাজেই এমনি একটি “কুস্ত-পঞ্জার” প্রতীকের কেন্দ্রস্থল শোভিত করে’ আছে।

সাংখ্যদর্শনের মতে, যে প্রধান বা প্রকৃতি পরম পুরুষের সাথে সমন্বিত হয়ে’ বিদ্যুত হয়ে’ আছেন, এবং বেদান্ত যাকে অবিদ্যা বলেছে সেই প্রকৃতিই এই বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বাহরূপ। কুস্তের দুই দিকের ফুল দু’টি এই দৈবত ভাবের ব্যঞ্জক। এর মাঝে প্রেমমাণ যে হৃদয়, তা’ বিশ্ব-

হৃদয়েরই প্রতিকৃতি; আর এই সামঞ্জস্য হৃদ্যের বিস্তারের নির্দিষ্ট অস্থাপত্য রক্ষা করে’ চলেছে, তা’ এই বিশ্বের পশ্চাৎ নিত্য অপরিবর্তনীয় বিধানেরই অহুসিপি। সাংখ্য বলেন—পুরুষের দর্শন মাজেই প্রকৃতি নৃত্য করে’ ওঠেন; বেদান্তের কাছে প্রকৃতি শুধুই মারা। সুতরাং

উভয় মতেই প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য রহিয়া গেল। আলোচ্য প্রতীকে সমমাত্রিক, সুপ্রসারিত ফুলের নকশাটি কুস্তের ভিতর হ’তে বিকশিত হয়ে’ ওঠেনি; উঠেছে বাহিরে হৃদয়বদ্ধভাবে। ক্ষণস্থায়ী রেখাআলের লুকোচুরি



বিষকবি ববীন্দ্রনাথ ও সঙ্কল্প : রবীন্দ্রনাথ ১৩৩১ সালে অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবের উদ্বোধন এবং বেলা ও প্রদর্শনী বারোমাস্টিন করেন

ঘিরে’ যে অসীম রেখামণ্ডল প্রতিভাত হয়, তারা এই বিশ্বের মায়াক্রপেরই ইঙ্গিত। যেমন এদের অনির্দিষ্ট প্রবাহ ইঙ্গিত দেয় প্রকৃতির নৃত্যের। “কুস্তপঞ্জারের” দু’দিকের ফুলের আলেখ্য অখণ্ডভাবে অভিনিবেশ সহকারে দেখলে দু’টি চিত্র পরিস্ফুটিত হয়ে’ উঠবে।

একটি পাখীর মূর্তি উর্দ্ধগামী প্রবাহে আংশিকভাবে বসে' পক্ষ সঞ্চালন করছে এবং ঠোঁট দিয়ে কলসের উপরিভাগে ঝাঁকরাচ্ছে—যেন সে চাষ কলস মুক্ত করে' ধৃত বস্তু আহরণ করতে। এর তাৎপর্য এই যে, মামুষের অস্ত-নিহিত আত্মা উর্দ্ধগামী হয়ে' অসীমে লীন হয়ে যেতে চায়। প্রকৃতি এবং পুরুষ, জীবনের এই দ্বৈত ভাবের প্রতীকস্বরূপ দুটি পাখীর সম্মিলন। সঞ্চরণ এই পাখী-মূর্তির সাথে নীচের ফুলের কল্লনার একটি অচ্ছেদ্য সামঞ্জস্য অহুসমানীর চোখে ধরা পড়ে; এই সামঞ্জস্য নির্দেশ দেয় যে, পঞ্চমাত্রা (Matter) উপরেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। বলা হয়ে' থাকে—উপরে ও নীচে ভেদ নাই। এ থেকে আর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়—প্রাচীন মতে, পুরুষই তাঁর প্রতিবিম্বের রূপ নিয়ে থাকেন। সাংখ্য বলেন—এই ভ্রান্ত আরোপ থেকেই বিশ্ব-সৃষ্টির উৎপত্তি। ভারতে যে নানা সাম্প্রদায়িক মতবাদের স্থান হয়েছে, তার পেছনে আছে প্রাগৈতিহাসিক অতীতের এমনি কতকগুলো ধারণা। এখানে রূপকের সাহায্যে এদেরই আভাস দেওয়া হয়েছে। ভারতের চিরন্তন ভাব-ধারার প্রতীকরূপে একটি কমল মূলদেশে বিরাজ-মান। প্রবর্তক সজ্ঞ এর উপচারক।

কমলের দলগুলি যেমন একটির সাথে আর একটি মিশে' এক অখণ্ড সমষ্টির সৃষ্টি করে এবং নয়নে সৌন্দর্য্য প্রতিভাত করে, তেমনি একীভূত সজ্ঞপ্রাণও কল্যাণময় এক অখণ্ড সত্তারই পরিচয়। এরি জন্মে কমল সজ্ঞের শ্রেষ্ঠবিগ্রহ বলে' বিবেচিত হয়েছে। পশ্চাদ্ভূমির দু'-দিকেই রয়েছে ভারতের অতি প্রাচীন দু'টি চিহ্ন—পরস্পর-সংগ্রথিত দুটি ত্রিভুজ ও স্বস্তিক। এদের প্রাচীনত্ব এবং অভিজ্ঞান-শক্তি সুপরিচিত। এই সমগ্র কল্লনাটী আবার একটি বৃত্ত-মণ্ডলে পরিবেষ্টিত। মণ্ডলের প্রান্ত-রেখা ভেদ করে' ফুটে' উঠেছে একটি মহা-পদ্ম; চৌষট্টিটি দল তার অতি সুসন্নিবদ্ধ। চৌষট্টি সংখ্যা চৌষট্টি কলার প্রতীক। কমল-দলগুলির পরস্পরের সম্মিলন প্রাচীন শিল্পকলার শ্রেণীবিভাগের সম্বন্ধ-নির্ণায়ক।

সজ্ঞ কর্তৃক গৃহীত কেন্দ্র-কল্লনাটী থেকে এই চৌষট্টি

কলা শাখা-বিস্তার করেছে। শ্রম-শিল্পের আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা এবং তার আহুসঙ্গিক ব্যবসাবাণিজ্য ভারতের প্রাচীন আদর্শ। সজ্ঞপ্রতিষ্ঠাতা এই আদর্শকেই তাঁর জীবনের সাধনা বলে' গ্রহণ করেছেন। ব্যবসা যেখানে অধিক দিন প্রতিষ্ঠা পায়, সাধুতা সেখানে স্রিয়মাণ হয়ে' পড়ে—পাশ্চাত্য কবির এই বাণী ভারতে অনেক পূর্বেই মিথ্যা প্রামাণিত হয়ে' গেছে। ভারতের প্রাচীন আদর্শ এই আধুনিক জাগরণের ভিতরে সজ্ঞ যে আবার নতুন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তা' এই জড়বাদের দিনেও পাশ্চাত্য ভাবধারাকে অসত্য বলে' প্রমাণ করতে পেরেছে। প্রতীকের অন্তর্বেষ্টনীর মূল-দেশে যেমন একটি ছোট ফুল বিকশিত হয়ে' বীরে-বীরে বহির্বেষ্টনীর বিরীচ ফুলে পরিণতি লাভ করেছে, তেমনি আমরা আশা করি, সজ্ঞের আদর্শ একটা বৃহত্তর ফুলে মুকুলিত হয়ে' সারা দেশ ছেয়ে' ফেলবে।

কেন্দ্রের পুরোভাগে রহস্যময় প্রণব-প্রতীকটী হৈম-কাস্তিতে তার জ্যোতিঃ বিকিরণ করেছে। ভারতীয় ভাবের সাথে যারা পরিচিত, তাঁর এর মর্ম্মার্থ জানেন।

ভাল করে' লক্ষ্য করলে কেন্দ্র কুস্তুর উপরিভাগে একটি অর্ধচন্দ্রের অন্তর্গত আভাস পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এরদ্বারা এই ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র হিন্দু-ধর্ম্মটী প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্ম। এই ভাবটীকেও অস্পষ্ট এবং অদৃশ্য করা সঙ্গত মনে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে এই পবিত্র বিগ্রহটী স্থাপিত হয়েছে, সেই চন্দ্র-নগরের এ একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন। পরিশেষে দূর থেকে বিগ্রহটি ভাল করে' লক্ষ্য করলে, ভারতীয় শিল্প যাকে “কীর্তিমুখা” বলে' অভিহিত করেছে, সেই কীর্তিমুখা সিংহমূর্তির কল্লনা এব মধ্য ভাবকের চোখে প্রতিভাত হয়ে' উঠবে। ভারতের দ্রষ্টা স্থপতিগণও তারই রূপ দিয়েছেন মূর্তিতে। চোখকে অবলম্বন করে' মনের কাছে এরা সহজ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। পরম ব্রহ্ম সম্বন্ধে পুত উপনিষদে যে অনাহত সত্য প্রচারিত, তিনি মোটামুটি এই : তাঁকে সহজে দেখতে পাওয়া যায় না; তিনি অন্ধকারে প্রবেশ করেছেন, গুহায় প্রচ্ছন্ন মহাকাশে তিনি বাস করেন; তিনি সুবর্ণ-শঙ্ক-ভূষিত ইত্যাদি। দ্বিজাসিত

হতে পারে, এই কল্পনাগুলির সুসমাবেশ সিংহের মুখাবয়ব ভিন্ন আর কিসে হতে পারে? উপনিষদে আছে—এই মর চোখ তাঁকে দেখে না; তাঁর ধারণা পেরে যায় চিত্তপটে, বুদ্ধিতে বা মনে। ভারতকলার একটি প্রধান উপকরণ সিংহের মুখাবয়ব। ভারতীয় রূপাঙ্কণ-রীতির সাথে যিনি পরিচিত, তিনি একথা জানেন। প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতীকে উপনিষদের এই

এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উৎসাহ ও সহায়তা করেন মৈমনসিংহের হিন্দুপ্রাণ মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য মহোদয়—তাহার সহস্রমুদ্রা অর্থদানে ও স্বয়ং শরীরে উপস্থিতিতে। বিরাট জনসভায়, সম্মুখ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন:

“আজ নৈমিষারণ্য নাই—আজ হিন্দুজাতির বিজয় দুর্গরূপে হিন্দুমন্দিরের পুনর্গঠন চাই।” সভাপতি



প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয়তৃতীয়া রজত-মহোৎসবে (১৯৪৭) নিখিল ভারতেব সমাগত সাধুগণ। জগদগুরু ১০৮শ্রী শ্রীমৎ ভারতী কৃষ্ণতীর্থ মহারাজ (উপবিষ্ট, বাম হইতে দ্বিতীয়) উৎসবের পৌরোহিত্য ও প্রদর্শনীর দায়িত্বাভ্যাস করেন।

মুখাবয়বের ভাব-চিত্রটি সংযোজিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। বিগ্রহের ঠিক মাঝখানে সেজন্ত ছোট্ট একটি “কীর্তিমুখা” ইন্দিতে জানিয়ে দেয় এর মূল উদ্দেশ্যটি।

সংক্ষেপে এই পবিত্র প্রতীকের পরিচয় এইটুকু। খুবই আশা করা যায়—এই বিগ্রহ অচিরে এমনি শক্তি-সময়িত হবে যে, প্রাচীন ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এর প্রভাব ছড়িয়ে যাবে।”

মহারাজাও স্বয়ং তাঁর ভাষণে একই সুরে প্রাণ মিলাইয়া বলেন:

“প্রাণ থাকিলে, তাহার পরিচয় চাই। হিন্দুমন্দিরের বিগ্রহ অপসৃত হইয়াছে, তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। প্রবর্তকসঙ্ঘের এই প্রাণের পরিচয় ধন্যবাদার্থ। হিন্দুধর্ম চেয়ার, টেবিল নয়। মতিবাবুর ভাষায় বলি—হিন্দুধর্ম একটা সার্বজনীন জীবন্ত সত্য। সব হিন্দু করিতে হইবে। প্রবর্তক সঙ্ঘের এই শ্রীমন্দির

আরও উন্নতিলাভ করুক। সমবেত স্মৃতিবৃন্দের ভক্তি ও প্রদ্বায় এই হিন্দুমন্দির আরও প্রসিদ্ধি লাভ করুক—
“পুষ্টিলাভ করুক—এই আগার প্রার্থনা।”

অমুঠানে ভাস্করশিল্পী শ্রীমন্দের শর্মা নিজেও উপস্থিত ছিলেন ও শিলাখচিত প্রতীকের শাস্ত্রসিদ্ধ শিল্পমহিমা ও অধ্যাত্মতাৎপর্য সঘন্থে ইংরাজীতে একটি স্থললিত বক্তৃতা দেন।

৫

শিলাপ্রতীকে আরাধনা হৃদয়ের কিছুটা ভরিল বটে, কিন্তু সবখানি শূন্যতার পূরণ হইল না। বেদীর উপর বিগ্রহের আসন এখনও শূন্য। সজ্জগুরুর অন্তরে ভাবনার আলোড়ন চলিল। পরিশেষে ১৩৫০ সালের উৎসব-বর্ষে—এই ত্রিস্তর শূন্য মন্দিরদেবীর উপর তাঁর সনাতনী প্রেরণায় ও প্রকল্পনায় ত্রিবৃৎ ব্রহ্মেশ্বর শিবলিঙ্গ আবার যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ তিনি পাইলেন।

এই ব্রহ্মেশ্বর-লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠারই শুভবর্ষে উৎসব-সমাগ্মি-সূচক পূর্ণিমা-সম্মেলনের সুযোগ্য পুরোহিতরূপে আর এক ধর্মপ্রাণ সজ্জমিত্র ও বাংলার ভূম্যধিকারী—জলপাইগুড়ির অধীশ্বর মাননীয় রাজা প্রসন্নদেব রায়কত মহাশয় তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপূত পৌরোহিত্য-ভাষণে যাহা বলেন, তাহা হইতেও এখানে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :

“আজ এই অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবোপলক্ষ্যে সজ্জের সহিত মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি বিশেষ আনন্দ পেয়েছি ও নিজেকে বশ মনে করছি। সজ্জের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য শ্রদ্ধেয় ঋষি শ্রীমৎ মতিলাল রায় মহাশয়ের সাক্ষাৎ পরিচয়ে এবং তাঁর আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধাবনত প্রকৃত নিবেদন করছি। দেশবাসীকে তাঁর অপূর্ণ দান—এই সজ্জ ও আশ্রম। প্রায়...বৎসর পূর্বে শ্রীভগবানের আদেশে লোককল্যাণের যে ক্ষুদ্র বীজ তিনি এই অভাগা বাংলার বৃকে বপন করেছিলেন, তা’ আজ মহামহীর্ষরূপে বিরাজ করছে। ‘উর্দ্ধমূলং অংশাখম্’ এই বিরাট আশ্রমতর উর্দ্ধে শ্রীভগবানের দিকে আপনার রসসজ্জানী মূল সঞ্চারিত করে’ পৃথিবীর বৃকে মেলে’ ধরেছে আপনার

ঐশ্বর্যসম্পোষণ-পুষ্ট বহু শাখা-বাহু যাহা মানব সমাজকে দিচ্ছে ঋদ্ধি। আশ্রমকর্মীদের মহান আদর্শ প্রকৃত কর্মযোগ, যার রূপ আমাদের আকৃষ্ট করে, মুগ্ধ করে। তাঁরা মন্দিরের ঠাকুরকে দেশের দশজনের মধ্যে পেয়েছেন। সেই দিবাদৃষ্টিই তাঁদের সমস্ত কর্মপ্রেরণার, কর্মচেতনার, কর্মশক্তির ও আনন্দামৃতভূতির মূল উৎস। এই কর্মযোগী সজ্জসাধুদের আন্তরিক প্রজ্ঞাতিবাদন জানাচ্ছি।

আজ ঘোরতর দুর্ভিক্ষের আমাদের সম্মুখে। আমাদের এই সোণার দেশ বহিঃশত্রুর আক্রমণে সমস্ত—ভিত্তরে অন্নান্নাভাব ও অশান্তি—এইই আজ বাংলার সত্যকার ছবি।—জীবনের কোন মহামন্ডে হবে—এই অশান্ত দেবতার তৃপ্তি? কোন আদর্শে হবে নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা? মানুষ চাই—সত্যকার শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনায় গুপ্ত মানুষ। সেই মানুষ গড়বে সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র। ...মহাপুরুষেরা বলেছেন—আত্মগঠন করতে হলে, নিজের অন্তঃপ্রকৃতির উপর দৃষ্টি রেখে’ সত্যের ভাবে, ঈশ্বরের ভাবে আপনাকে পরিপূর্ণ করে’ তুলতে হবে। এতে ধীরে-ধীরে অন্তরে যে শক্তি, যে শাস্তি জেগে উঠবে, তা’ দিয়ে বহিঃপ্রকৃতি স্বতঃই রূপায়িত হয়ে’ উঠবে। জীবনের দুঃসহ আঘাতগুলি, দুঃসাধ্য তপস্তাগুলি সৌন্দর্য্যে ভরে’ উঠবে। প্রতি মানুষের পক্ষে যে কথা সত্য, সমাজের পক্ষেও তা’ সত্য। কারণ, মানুষ নিষে’ই সমাজ। এ-কেই সাধুরা বলেন—ধর্মের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন গঠন করা। সন্ন্যাস পৃথিবীতে আজ যে হিংসার তাণ্ডবলীলা চলেছে, তার একমাত্র কারণ—ধর্মের ভিত্তিতে প্রকৃত জাতীয় জীবন গড়ে’ ওঠেনি। বর্তমান জগতের মানুষ আজ বহিঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য হারিয়েছে। বাইরে জান-বিজ্ঞানের সাধনায় আজ সে অনেক এগিয়ে গিয়েছে সত্য, কিন্তু তার অন্তরদেবতা শুকিয়ে মরছে।

অন্তরদেবতার পূজাহীন আগনে আজ তাঁকে জাগরিত করতে হবে।”

বক্তার কথা এখানে একটু বেশী উদ্ধৃত করিতে হইল—তার কারণ, তাঁর সেই কথায় এই উৎসবের মর্মকথাই আবার বড় সরল সহজ ভাষায় স্পষ্টকৃত হইয়া উঠিয়াছে। ‘অন্তঃপ্রকৃতিব উপর দৃষ্টি রাখিয়া, সত্যের ভাবে ঈশ্বরের

সমবেত আঙ্গিক

শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পৈতে হলে ত্রি-সন্ধ্যা আঙ্গিক করতে হয়। কিন্তু এই আঙ্গিকের মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় থাকায়, অধিকাংশ আঙ্গিককারী নিজেও জানেন না—তিনি কী করলেন, কী তার তাৎপর্য। এইজন্য বাংলা ভাষায় তার রূপান্তর করার প্রয়োজন হল।

তা'ছাড়া প্রচলিত আঙ্গিক একান্তভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার। একা এক কোণে চুপচাপ আঙ্গিক সারা হয়। এর ফলে আঙ্গিককারীদের মধ্যে যৌথ মনোভাব সঞ্চারিত হয় না। যৌথ মনোভাব-সঞ্চারের জন্য যৌথ আঙ্গিক প্রয়োজন। আর যৌথ আঙ্গিকের জন্য কীর্তনের মত যৌথ সঙ্গীত-ব্যবস্থা প্রয়োজন। অতএব আঙ্গিকের মন্ত্র বাংলায় রূপান্তর করার সঙ্গে-সঙ্গে তাকে সুরযোজনার উপযোগী রূপ দেওয়া হয়েছে।

এই যৌথ আঙ্গিক যদি প্রবর্তিত হয়, ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যায়, কেননা যৌথ আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে সবাই ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করেন।

যে যার নিজের বাড়ীতে শ্রীপুঞ্জ-পরিজন নিয়ে এই যৌথ আঙ্গিক শুরু করতে পারেন। সম্ভবপর হলে প্রতিবেশীদের নিয়ে নির্দিষ্ট কোথাও নিয়মিতভাবে এমনটি করতে পারেন। বাড়ালী জাতির নবজাগরণের শক্তি এই যৌথ আঙ্গিকের মধ্যে নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে।

ভাৱে আপনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে—ইহাতে যে শক্তি, যে শাস্তি অন্তরে জাগিবে, তাহার দ্বারাই বহিঃপ্রকৃতি স্বতঃই রূপায়িত, অর্থাৎ রূপান্তরিত হইবে—এই শুদ্ধি-সাধ্যের ইচ্ছিতই ত ভারতের সাধনা চিরদিন বহন করিয়া চলিয়াছে। সজ্জ্ব প্রবর্তিত এই অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবের মধ্য দিয়াও সজ্জ্বরুর বিশেষ প্রেরণা—এই সাধনার সঙ্কেত বর্তমান জাতির কাছে নানা ছলে, নানা ছন্দে উজ্জ্বল করিয়া ধরা। সেদিনের সেই উৎসব-সভাপতি এক বাংলার ভূম্যধিকারী যে এই পরম

আপোমার্জন

ধনুক-পিঠ ভূগোলে তীরফলা
গদোজী আমার মঙ্গল
গাঙ্গেয় এ-সমতলেও ঢেলে
সাগর-সঙ্গমে অনর্গল ॥
মাটির চাপ সবলে কেড়ে কুপে
যে-মঙ্গল গুট আবিষ্কার
গাছের ফুলে, ফলের রসে তার
কী সুন্দর সহজ সঞ্চার।
মলিন মেঘ ধেমে স্বয়ং-স্নানে
শোধিত হৃদ, মাখন উজ্জ্বল
সকল মলিনতাকে মুছে ফেলে
জীবন হোক তেমনি নির্মল ॥

প্রাণায়াম

আকাশের নাতি তোরে লাল, বুক দুপুরে নীল,
ললাট গোখুলি বেলায় শান্ত ছুঁধের ঝিল।
তেমনি আকাশ আমি
তিন রঙে গচ্ছামি
লাল থেকে নীলে এবং তুষারে অন্ত্য মিল ॥

প্রয়োজনীয় কথা এত সুন্দরভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহাই এমন প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজ শ্রদ্ধার সহিতই স্মরণ করিতে হয়।

এই অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবেই পরে মহাত্মা গান্ধীজি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য কৃষ্ণভারতী-তীর্থ প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষিস্বর্য্যগণ আসিয়া জাতিকে নব-নব বাণী শুনাইয়াছেন, সজ্জ্বরুর নব জাতীয়তার সাধনায় নব-নব আলোকপাত করিয়াছেন, তাহাদের সকলকেই আজ পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করিতেছি।

ধ্যান

আমিই আকাশ,—ভোরে নাভিমূলে
লাল ব্রহ্মার জ্যোতি,
আর উদয়ের সূর্যের তেজে
স্বয়ং সরস্বতী ॥

আমিই আকাশ,—দুপুরে হৃদয়ে
নীল বিষ্ণুর রঙ,
আর সূর্যের কলমল তেজে
লক্ষী দেবী স্বয়ং ।
আমিই আকাশ,—সাঁজের ললাটে
তুবার শিবের জ্যোতি,
সূর্যের চালচিহ্ন রেখায়
শ্রীদুর্গা ভগবতী ॥

গায়ত্রী-জপ

স্তিন অক্ষরে অ-উ-ম, অ-উ-ম, ও ।
নাভি-বুক-শিরে ভূ-ভূবঃ-স্ব
দেহাধিপতি পরম ॥
সেই উজ্জ্বল অমৃত ধন
আমি এ-অঙ্গে করেছি ধারণ
আমার সকল কর্ম-চিন্তা
শুধু তাঁর অহুলাম ॥

নিত্য এই আত্মিক করার ফলে জীবন-দেবতার ওপর
নিষ্ঠা জাগবে। কেননা জীবনের সকল চিন্তা ও কর্ম
যে-দেবতার কাছ থেকে আসছে, সেই উজ্জ্বল অমৃত
ধনকে আমরা আমাদের অন্তরেই ধারণ করে আছি,—
এই বিশ্বাস আত্মিকের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। উপরন্তু এমন
কথাও বলা হচ্ছে,—সেই জীবন-দেবতা আমাদের দেহের
আকাশের নাতিতে ব্রহ্মরূপে উদ্ভিত হচ্ছেন, হৃদয়ে
বিষ্ণুরূপে মধ্যাহ্ন কিরণ দিচ্ছেন এবং ললাটে শিবরূপে
অন্তরাগ বিতরণ করছেন। এই আত্মবিশ্বাসহীন বাঙালী
জাতির মৃতসজীবনী মন্ত্র এই আত্মিক।

আমরা নিজেরাই দেবতার সাবজেক্টিভ প্রতিমা, তবু
বাইরে চোখের সম্মুখে একটি অবজেক্টিভ প্রতিমা রাখতে
চাই। এই ভূগোলটাইতো সেই অবজেক্টিভ প্রতিমা।
শিল্পী যেমন নিজের বিশ্বাস ও কৃতি-অনুযায়ী নিজের
প্রতিমা ছকে নেয়, আমরাও তেমনি নিজেকে ধ্যান-
অনুযায়ী ভূগোলের মধ্যে তেমনি প্রতিমা খুঁজে নিই।
আমি যখন নিজেকে বিশ্বের নাগরিক অনুভব করি, তখন
গোটা ভূগোলই আমার সম্মুখে প্রতিমা হয়ে ওঠে যখন
নিজেকে ভারতীয় অনুভব করি, তখন ভারতের মানচিত্র
আমার বিশেষ প্রতিমা হয়ে যায়। যখন বাঙালী নিজেকে
অনুভব করি, তখন আমার প্রতিমা বাংলা দেশ। ধ্যানের
বিশ্ব, ধ্যানের ভারত যতখানি সত্য, ধ্যানের বাংলাও
টিক ততখানি সত্য হোক, নইলে বাঙালী জাতি
হিসেবেও আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না।



প্রচ্ছদপট

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

জীবনতিহাসের সে প্রচ্ছদপট—
সেখা কি ছিল না আঁকা শুধু অঙ্ককার,
পথ ছিল কাঁটান্ডরা—আঁকাবাঁকা শুরু হ'তে শেষ ?
—হ্যাঁ, ছিল ।
কোথাও কি কিছু কিছু মৃদু মৃদু ভোরের পেলব স্পর্শ ?
—না ।
—তবুও পথ মোর এক ।
চলা শুরু আধারে, শেষ হ'ক আধারে ।
কি পেয়েছি কি পাইনি, বুঝিনাকো কিছু,
শুধু বাস্তব প্রমাণ এই জীর্ণশালা—
ভিতর বাহির যার কণ্টকের ক্ষতচিহ্ন ভরা ।

অঙ্ককার করেছে জুকুটি—
সমুখের পথে ছিল মায়া মরীচিকা ;
পিছু পিছু সারা পথে
যেন এক অশরীরীর চাপা উপহাস
শুনে শুনে ক্লিষ্ট এ জীবন ।
মোর প্রতি কঠিন পদক্ষেপে
ওরা বলেছে মোরে 'কাপুরুষ',
তবুও এত পথ এসেছিতো বয়ে আপন মনে ।
নাই আজ কোন অভিমান, নাই আজ বাপ্তভরা
মন নিয়ে শেষ প্রান্তে মরণের দুর্গদ্বারে ব্যর্থ প্রলাপ ।



সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পতিত এ জাতি মানুষ হউক—
স্বাধীন হউক দেশ,
কর দেহে মনে শুচি ও সবল
আমাদিকে পরমেশ।

এই ছিল তব চির প্রার্থনা—ইহাই তপস্তা,
শব সাধনায় কাটাইলে কত ঘোর অমাবস্তা
বিশ্বনাথের নিকট নিত্য আর্জি করেছ পেশ।

মার্জিত রুচি, মার্জিত ভাষা,
উদারোন্নত মন,
নিষ্ঠা ভক্তি শক্তি করেছ
জাতিকে সমর্পণ।

জাতির দৈম্য জাতির ক্রৈব্য স্থণ্য কুসংস্কার,
সকল হীনতা সব নীচতার চাহিয়াছ সংহার,
হিংসা ঘেষের উর্দ্ধে উঠাতে করেছ অশেষ ক্লেশ।

বীর, ধীর, তুমি সত্যাত্মী—
অকণী অভিস্কৃক,
পুণ্যভূমির শমীর মতন
অগ্নিগর্ভ বুক।

নিজেই একটা তীর্থ এবং বিরাট প্রতিষ্ঠান।
আর্ন্তরে সদা বিপন্নে সদা অভয় করেছ দান।
অগৃহী তুমি, সব চেয়ে গৃহী, গুরু তব হৃদিকে।

অলৌকিকের সন্ধানী তবু,
ভাল যে বাসিতে লোক,
বন্ধে তোমার 'মণিকর্ণিকা'
'অর্দ্ধদৈব'র যোগ।

তব আশ্রম আশ্রয় ছিল কর্মী ও প্রেমিকের,
উন্মাদনার ক্ষেত্র সে ছিল লুপ্ত লুপ্ত ছিল ঢের,
গরুড়ের সাথে সর্প পুষেছ—গরুর নাহি লেশ।

সশ্রদ্ধ স্মরণ

শান্তশীল দাশ

আমরা প্রাকৃত জন, বুদ্ধিমানো ধরণ ধারণ
সাধকের। শুধু দূর হতে চেয়ে থাকি সবিস্ময়ে;
আর দেখি মুগ্ধ চিত্তে : কী দিব্য অমিত শক্তি নিয়ে
সে-সাধক নিত্য রচে ধরণীতে কত যজ্ঞশালা
জ্ঞানের, কর্মের। সেই জ্ঞান-কর্ম যুগ্ম সাধনায়
চারিধার দীপ্ত হয়, তরে ওঠে কত শত মন।

তুমিও যে দীপ্তিধর একজন তেমনি মহান,
রেখে গেলে কত দান, চিহ্ন তার অটুট অক্ষর;
হ্রাসিত তার বিচ্ছুরিত চারিধারে ভক্তের অন্তরে।
সে-কথা স্মরণ ক'রে ত'রে ওঠে অন্তর প্রদায়,
বার বার নত হই ও-চরণে, বস্তু হয়ে যাই;
পাই চিত্তে অরূপণ কী প্রসন্ন আশিস তোমার।

প্রবর্তক সম্বন্ধে একজন লেখকের মতামত

[মেদিনীপুর কৈবল্যদায়িনী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীউমাপদ নাথ এম.এ., সাহিত্যভারতী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অনাহত ভাবেই প্রবর্তক পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁর যে সূচিস্থিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা এখানে সানন্দে পত্রস্থ করিলাম।—প্রঃ সঃ]

এই বৈশাখে প্রবর্তক উদ্বোধন বর্ষে পদার্পণ করল। গত আটচল্লিশ বছরের মধ্যে প্রায় চব্বিশ বৎসর অর্থাৎ তার জীবনের অর্ধেক কাল ধরে প্রবর্তকের সঙ্গে আমি লেখক হিসাবে যুক্ত। সুতরাং দীর্ঘদিনের লেখক হিসাবে এই পত্রিকার প্রতি আমার আন্তরিক টান ও দরদ থাকি একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু সে সম্পর্কের কথা বাদ দিয়েও নিরপেক্ষ সমালোচক হিসাবে স্বতঃপ্রসূত হয়েই আজ দুটি কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। পাঠকবর্গ একে স্বজনপ্রীতি বলুন—আপত্তি নেই, কিন্তু যা সত্য তা সকল বিচারেই সত্য।

প্রবর্তক কোনোদিন কলেবরের বিচারে বা রচনার চটুল রম্যতার গুণে অথবা অত্যাধুনিক গল্প-উপন্যাসাদির রংদার চাকচিক্যে তথাকথিত প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রিকার সম্মান পায়নি। কিন্তু প্রবর্তক যে-গুণে স্বতন্ত্র, সে গুণে অনন্যও। বলা বাহুল্য, প্রবর্তক একটি বিশেষ আদর্শের উদ্গাতা। সেই আদর্শের হোমায়িশিখা নিত্য প্রজ্জ্বলিত করে রাখা এবং তার স্পর্শ-সঞ্চারে প্রতিটি জীবন-জাগরণকামী মনুষ্যজন্মের নিবন্ত প্রদীপমুখে বহিঃ-সমারোহ জাগিয়ে তোলাই হয়েছে তার এই অর্ধ-শতাব্দীর একমাত্র ত্রুটি। অবশ্য, এ-কথা ঠিক যে, নানা-প্রকার বৈষয়িক তথা বাস্তব অসুবিধা হেতু অনেক সময় তার প্রকাশ কিঞ্চিৎ অনিয়মিত হয়েছে এবং তার বাণী-গ্রহণের নৈপুণ্যও অল্পচ সামর্থ্যের ব্যঞ্জনা বহন করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও অত্যন্ত ঠিক যে, সেই শিথিল কালের ক্রটি-বিচ্যুতির জন্যে একা প্রবর্তকই দায়ী নয়। কারণ, কোনো পত্রিকাই স্বয়ংভূগু নয়। কেবল প্রকাশিত হওয়াই কোনো পত্রিকার পক্ষে চরম পুরস্কার নয়। পত্রিকার সার্থকতা তার পাঠক সৃষ্টিতে এবং সেই ক্রমবর্ধমান পাঠকগোষ্ঠীর নিকট থেকে স্বতঃপ্রণোদিত উৎসাহ-প্রাপ্তিতে। এখানে কথাটির শব্দসংকট একট

রূঢ় হলেও, এ-কথা সকলেরই জানা আছে যে, পাঠক-সৃষ্টি, পাঠকবৃদ্ধি, পাঠক কর্তৃক স্বতঃপ্রসূত সমর্থনদান প্রভৃতি রম্য শ্রুতিমধুর কথাগুলির একমাত্র অর্থটি অত্যন্ত বৈষয়িক। সে-অর্থ ‘অর্থ’। নির্দিষ্ট অর্থানুকূল্যের বিনিময়ে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়াই এই কথাগুলির অর্থ। এ দিকটি যদি নিরুৎসাহজনক হয়, তবে একা পত্রিকার পক্ষে অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে আত্মজাহির করার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। আমার তো মনে হয়, প্রবর্তককে নিত্য এই প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে চলতে হয়। তবু যে প্রবর্তক আত্মপ্রকাশের উৎসাহ অক্ষুণ্ণ রেখেছে সে তার আত্মজাহিরের তাগিদে নয়, সে তার ‘জীবনবৃদ্ধির সংকেতবাহী মহান জীবনাদর্শের অনুপ্রেরণায়। কারণ প্রবর্তকের কোনো নিজস্ব স্বার্থ নেই, বৃহত্তর মানবসমাজের কৃষ্টিক ঐক্য, ধর্মমুখিতা, আদর্শার্থে প্রাণধারণ, পরস্পরস্বার্থী হওয়ার মনোভাব প্রভৃতির সঞ্চারণাই তার স্বার্থ। এই মহৎ জাতীয় স্বার্থের ধারক ও বাহক বলেই মরুভূমির মাঝে পড়েও প্রবর্তক তৃষ্ণায় প্রাণ হারায়নি, বরং অসংখ্য জীবনতৃষ্ণ মানবাত্মাকে সজীবিতই করেছে।

এই অবস্থায় প্রবর্তক ও তার সম্পাদক-পরিচালককে অল্পশ্রম ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে থাকা যায় কি? এখন সহজেই বোঝা যায়, প্রবর্তকের দৈন্যই যাদের চোখে প্রধান হয়ে ধরা দেয়, তাঁদের নিজেদেরও কিছু করণীয় আছে। আমি তো বুঝি, প্রবর্তকের মতো একখানা আদর্শবাদী পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখা ও বাড়িয়ে তোলা সকল জাতিদরদী শিক্ষিত বাঙালীরই কর্তব্য। আমি অকূঠচিন্তে এই-জাতীয় আর-একখানা জীবন-যাজ্ঞিক মাসিক পত্রের নাম করতে পারি—সেটা হচ্ছে সংসদের ‘আলোচনা’। এই পত্রিকাগুলি জাতীয় পত্রিকা বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। ‘আলোচনাব’

ক্ষেত্রেও দেখেছি, প্রতিটি পৃষ্ঠা অতি-মূল্যবান জীবন-সংকেতে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান বাস্তব প্রীতিপ্রদর্শনের অভাবে তার কলেবর আরও সূক্ষ্ম এবং বর্ধিত ও তার বিচরণভূমি আরও ব্যাপক হতে পারছে না।

মহৎ পত্রের সম্মুখেও এই বাধা কেন আসে তার প্রতি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি। কিন্তু সেই অহবিধা দূর করা যায় কীভাবে? এর সহজ উত্তরটিই আগে আলোচনা করে দেখা যাক। আমরা তো বাজারে এমন ঢের পত্র-পত্রিকা হামেশা দেখতে পাচ্ছি যা আজ বেরিয়ে কালই জনপ্রিয় হচ্ছে এবং গ্রাহকসংখ্যাও এক হাজার থেকে এক বছরেই দশ হাজারে উঠে যাচ্ছে। তার কারণও ক্লারও অজানা নয়। জনমানসিকতার নিয়গামিনী প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে যে সকল পত্রিকা হাঙ্কা-চটুল রঙিন কথার মালা গাঁথতে পারে, তাদেরই পোয়া বারো। আর এর সঙ্গে পর্নোপ্রাক্ষিপ-পটুই এসে জুটলে তো কথাই নেই—এক মাসের পত্রিকার একাধিক সংস্করণ বের করেও পাঠক-পাঠিকার চাহিদা মেটানো যাবে না। এসব কথা একটুও অতিরঞ্জিত নয়—এসকল সংবাদ সকলেরই জানা।

কিন্তু প্রবর্তক বা আলোচনার মতো পত্রিকাও কি পেটের দায়ে কিংবা প্রচারের মোহে সেই পথ অবলম্বন করবে? অবশ্যই না। জনমানসকে অবনমিত করা এসব পত্রিকার কাজ নয়, জনচেতনাকে আত্মজিজ্ঞাসার কঠিন প্রস্তুতিতে প্রস্তুত করা এবং জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে নিবার পর সংকল্পদৃঢ় অটল পদবিক্ষেপে সেই তপস্কালক মার্গে ক্রমাগত করা হচ্ছে এ পত্রিকার ব্রত। কাজেই প্রবর্তক যে গ্রাহকসংখ্যা বাড়ানোর জন্তে সজ্ঞাদেবের রম্য-রোমাঞ্চে বা যৌনবিলাসময়তায় তার পৃষ্ঠাগুলো পরিপূর্ণ করবে না, এ জানা কথাই। বরং প্রবর্তক যে কোনো দিনই সহস্র বিপদেও তার আদর্শ থেকে কিছুমাত্র

বিচলিত হয় নি, এ-ই পরম আনন্দের কথা। কাজেই একথা স্পষ্ট বোঝা গেল, আদর্শব্রতী পত্র-পত্রিকার জীবন-চিত্র এই প্রকারই হয়ে থাকে—অন্ততঃ আমাদের এই অভাগা দেশে। এর মধ্যে থেকেও যে প্রবর্তক সূক্ষ্ম হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা হয়, একাধিক বর্ণের রুচি-সম্মত প্রচ্ছদপট বৎসরান্তে পাল্টানো হয় এবং মাঝে মাঝে রচনাগুলোকে সচিত্র করা হয়—এ-ই আমার কাছে আশ্চর্য বলে মনে হয়।

এইবার প্রবর্তকের আর একটি পরিচয় দিয়ে—যা আমি বুঝেছি—কথা শেষ করব। প্রবর্তককে যতোই স্তিমিত তেজ বলে মনে হোক না কেন, কার্যকালে আমি তাকে শতবজ্রের শক্তি ও দীপ্তিতে অলে উঠতে দেখেছি। যখন জাতির নাড়িতে প্রাণস্পন্দন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে কিংবা জাতীয় চেতনা আশ্রিত কবলে পড়ে বিড়ম্বিত ও দুর্বল হয়েছে, তখনই প্রবর্তক তার সূদৃঢ় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অগ্নিবাণে সে জাতি ও দুর্বলতাকে সংহার করতে ধাবিত হয়েছে, এ কি কম ভরসার কথা? এইখানেই তো প্রবর্তকের আসল পরিচয়—তার আসল প্রাণচিত্র। বর্তমানকালীন দুর্ভাগ্য বাঙালীজাতির পিষ্ট-ক্লিষ্ট বিকৃত দেহে প্রাণপ্রবাহ আনবার জন্তে প্রবর্তক-সম্পাদকের সে যে কী দুর্মর তপস্বী চলেছে, তা ইদানীংকালের প্রবর্তক যিনি পড়েছেন তিনিই জানেন। প্রবর্তক এইজন্তেই প্রবর্তক। এই মহান প্রবর্তককে—সংঘর্ষে শ্রীমতীলালের এই আদর্শোজ্জ্বল অগ্নিদগ্ধ প্রবর্তককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই! আর সেই সঙ্গে আমার পরম শ্রদ্ধা-ভাজন সম্পাদক শ্রীযুত রাধারমণবাবুকে জানাই আমার স্বতঃস্বেচ্ছা শ্রদ্ধা। প্রার্থনা করি: ‘প্রবর্তক’—ভূমি আরও দুর্ধর্ষ জ্বালামুখী হয়ে ওঠ, তোমার পতাকা-শিখায় জাতির নতুন জীবনময় লিখিত হোক—দেশ বাঁচুক।

শ্রীউমাপদ নাথ





শিল্পীঘন

—শ্রী বীরেন্দ্র লোকে ধীর—

(পূর্বানুবৃত্তি : চৈত্র, ১৩৭০ সংখ্যাব পর)

দেবকুমার ভাবতে থাকে, শীতের অন্ধকার গভীর থেকে গভীরতর হ'তে থাকে। কোন এক সময় গাছের মাথায় চাঁদ দেখা যায়।

—শিল্পী!

—কে?

—আমি এসেছি,—ঝিন্দন এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।

বিশ্বয়ে দেবকুমার কথা বলতে পারলো না।

ঝিন্দন দেবকুমারের কাঁধে হাত রেখে বললো—চল।

—আমি আর ও গৃহে যাবো না।

—আমিও যাবো না।

—তবে?

—আমি যাবো তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ, এক বস্ত্রে চলে এসেছি, সহিতে পারিনি, এই

দেখ—ঝিন্দন বাহর কাপড় সরিয়ে কয়েকটা কালসিটের দাগ দেখিয়ে দিলে চাঁদের স্তিমিত আলোর গোর দেহের উপর কালো কালো দাগ। বললো—পিঠে

—আর্য কল্যাণকুমার তোমাকে প্রহার করেছেন?

—তিনি সন্দেহ করেছেন, আমি তোমায় ভালবাসি।

দেবকুমারের একবার মনে হলো কালসিটের উপর হাত বুলিয়ে দেয়, কিন্তু সে নিজেকে সংযত করলো।

আঁচলটা আবার কাঁধের উপর তুলে দিয়ে মৃদু হেসে ঝিন্দন বললো—চল। প্রভাতের আগেই আমি খজুরাপুরী ছেড়ে চলে যেতে চাই।

—কোথায় যাব?

—তুমি তো বলেছিলে বারাণসী যাবে, মূলগন্ধকুটি বিহারের শিল্পকলা দেখবে। সেই পথেই যাই।

দেবকুমার উঠে দাঁড়ালো। ঝিন্দন বললো—তোমার ভরসা করেই বেরিয়েছিলাম। এখানে তোমাকে খুঁজে পাব কিনা। সেই ভয় ছিল। বিধাতা স্থান মিলিয়ে দিয়েছেন, আর কিছু ভাবি না। চল—

ঝিন্দনের সঙ্গে দেবকুমার পথে নামলো। শীতের শুকতায় রাত্রি দ্বিপ্রহরে ছুটি নিঃস্বল তরুণ-তরুণী খজুরপুরীর জনপদ অতিক্রম করে চললো।

উষালোকের উজ্জলতা প্রকাশ পাবার আগেই খজুরপুরীর জনপদ শেষ করে প্রান্তরের মাঝে এসে তারা পৌঁছালো। শীতের প্রত্যাঘে পথচলার ক্লাস্তি নেই। তাছাড়া সে যুগের মেয়েরা পথ চলতে পারতো। ছ'প্রহর পথ চলেও ঝিন্দন অবসাদের কথা বললো না। জনপদের সীমায় ধানক্ষেত পাব হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে যখন স্বর্ষ উঠলো, তখন দূরের আকাশের কোলে এক মন্দির চূড়া দেখা যাচ্ছে। ওই মন্দির একটি গ্রামের নিশানা। সমগ্র উত্তরাপথে তখন পাঁচ সাত কোশ অন্তর অন্তর গ্রাম ও মন্দির ছড়িয়েছিল। মন্দির-সংলগ্ন নাটমণ্ডপে পশিক ও স্বার্থবাহীরা অবসাদ বিনোদনের অবকাশ পেতো। বাদ্রীদের এগিয়ে চলার কোন তাড়া ছিল না। দেবতার প্রসাদ ছিল অব্যাহত, আহার ও বিশ্রামের কোন বাধা ছিল না। সমৃদ্ধির সঙ্গে ছিল শান্তি, বিরোধ বা বিতর্ক কদাচিৎ প্রকাশ পেতো।

দেবকুমার চিন্তিত। নিরালাকে সে ছেড়ে এলো, সে কি এই ঝিন্দনের গুণ। এই অনাস্থীয় তরুণীকে সে কোথায় ছেড়ে দেবে? এই বোঝা তাকে বহিতে হবে

ঝিন্দন বোধ হয় দেবকুমারের মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিল, সে বলতে লাগলো—আমার জন্ম তুমি ভেবো না। কল্যাণকুমারের আশ্রয় ছেড়ে চলে যাবার কথা আমি অনেকদিন ধরে ভেবেছি, শুধু সঙ্গী মেলেনি। একজন পথের সাথী না নিয়ে পথে নামতে সাহস পাইনি। তুমি তার সবটুকু পরিচয় তো জানো না, জানলে তুমি আমার কথা বুঝতে পারতে। আমায় সে বিবাহ করেনি, আমাকে সে রক্ষিতা রেখেছিলো। কঙ্কুরী কাছ থেকে সে আমায় কিনেছিল, প্রতিষ্ঠান থেকে সে আমাকে নিয়ে এসেছে গোপনে। আমাকে বিবাহ করার আশায় আশায় দীর্ঘ একটি বছর আমাকে রক্ষিতা করে রেখেছে। উপপত্নীর যে মর্যাদা প্রাপ্য তাও পাইনি।

দেবকুমার বিশ্বয়ে ঝিন্দনের মুখের পানে তাকালো। তারপর বললো—কল্যাণকুমার তো একজন শিল্পী—স্বরকার।

—স্বরকার সে বটে, কিন্তু লাম্পট্য ও আসবাসক্তি কখনও শিল্পীকে বড় হতে দেয় না। কল্যাণকুমার যা কিছু করে তা বাসনার সমুদ্রে ডুবে যায়। তার প্রথম যৌবনের লীলাসঙ্গিনী ছিল ওই চঞ্চলী পানওয়ালী, আমাকে সংগ্রহ করার পর ওকে সে পরিত্যাগ করে, কিন্তু প্রতিষ্ঠান থেকে চঞ্চলী খজুরপুরী পর্যন্ত ওর অহুসরণ করে এসেছে। ওকে ধরেই আমি একবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম। জানতে পেরে স্বরকার আমার জিভ কেটে নেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল।

—তুমি যা বলছ এ যে সহজে বিশ্বাস করতে মন চায় না।

• আমার দেহে যে অত্যাচারের চিহ্নগুলো দেখালাম, সেগুলি তাহলে কী?

দেবকুমার আর কোন কথা বলতে পারলো না।

—কথা বলছ না যে?—তোমাকে তো আমি সামান্যই নমুনা দেখিয়েছি, আরো দেখতে চাও?

ঝিন্দন সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠলো, বললো—দাঁড়াও তবে দেখ!

বুক থেকে সে সাড়ীর আঁচল নামিয়ে দিলে, কাঁচুলির ফিতের কাঁসটা একটানে খুলে ফেললো। পীন-উন্নত বন্ধ

উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো দেবকুমারের চোখের উপর। সেই কোমল মৃদু মাংসল বুকের উপর কয়েকটা শাদা পোড়া দাগ। বললো দেখছ এই দাগ? আমি সহজে শয্যাসঙ্গিনী হইনি, এই দাগ তার সাক্ষী।

দেবকুমার বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে গেল।

কামার উচ্ছ্বসিত আবেগে ঝিন্দন কঁপে উঠলো। কাঁচুলী বাঁধতে বাঁধতে রক্তস্বরে বললো—এসব কথা কাউকে বলা যায় না, বলা চলেও না। চোখে দেখলে তবে মানুষের বিশ্বাস হয়। এই ক্ষত বুক নিয়ে রাজস্ব পর রাজি তার অভ্যাচার সহেছি, বলার মত মানুষ পাইনি। আজ তোমাকে দেখালাম, তুমি হয়ত ভাবছ আমি নিলজ্জ, কিন্তু স্বরকারের এই আগল রূপ।

—এই পণ্ডব সঙ্গে তুমি সুরের সঙ্গত করতে!

—উপায় কি বল, আত্মহত্যা না করতে পারলে এই জীবনকে মেনে নিতে হবে। রাজ্য রাজ্য লড়াই হয়, রাজা ও রাজবংশ নিহত হয়, রাজকন্যাকে লুণ্ঠে নিয়ে গিয়ে শত্রুরাজ্য বিয়ে করেন, রাজকন্যাকে মেনে নিতে হয় সেই অবস্থা—অন্য কোন পথ নেই।

ঝিন্দন আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। দেবকুমার সহানুভূতির সুরে বললো—এখানে বসবে খানিকক্ষণ?

—না, চল, পথ চলা আমার অভ্যাস আছে।

ঝিন্দন চোখ মুছতে মুছতে এগিয়ে যায়, দেবকুমার চলতে থাকে তার পিছনে।

নীরবে বাকি পথটুকু তারা অতিক্রম করে।

ক্রোশখানেক গিয়েই তারা গ্রামে এসে পৌঁছায়, পথের পাশেই ঈদারা, সমনেই নাটমণ্ডপ ও মন্দির।

নাটমণ্ডপের উপর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন—এসো, তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি।

—আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন? দেবকুমার সবিস্ময়ে বললো।

—দেখলাম যে তোমরা আসছ। কাল থেকে তো সারাদিন বিশ্রামের অবকাশ পাইনি। শত শত যাত্রী আসছে, সবাই চলেছে প্রতিষ্ঠানে, সেখান থেকে কান্যকুজ হয়ে যাবে স্বাধীশ্বরে, রাজ্য-অভিষেক দেখার

জন্ম প্রজাদের মধ্যে বড় উৎসাহ দেখি। আপনারাও ওই পথেরই যাত্রী তো ?

—না, আমরা যাবো বারাগদী। দেবকুমার বললো।

—বিখ্যাত দর্শন করতে যাচ্ছেন, মানসিক আছে বুঝি, তা বেশ। এখন স্নানাহার করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। ছপুরের রোদ শান্ত হলে আবার যাত্রা করবেন। রোদের তেজে মা-লক্ষ্মীর চোখমুখ রক্তবর্ণ হবে উঠেছে।

—সরল ব্রাহ্মণ সহজভাবে ধরে নিলেন—ঝিন্দন দেবকুমারের ধর্মপত্নী। প্রসঙ্গতঃ ঝিন্দনের সঙ্গে তিনি সেইমত ব্যবহারই করলেন। দেবকুমার অস্বস্তি বোধ করলো। ঝিন্দন অন্তরালে বললো—সঙ্কোচ করছ কেন? কয়েক দণ্ডের তো পরিচয়, তারপর আর কিসের সম্পর্ক।

—তবু, মিথ্যাচার হচ্ছে তো ?

—কিসের মিথ্যাচার, আমরা তো কিছু বলিনি, উনি যা ধারণা করেছেন সে ওর নিজস্ব। তুমি আর কথা বাড়িও না। এই পরিচয়েই আমাদের এখন পথ চলতে হবে। না হ'লে বহু জন বহু কথা জিজ্ঞাসাবাদ করবে, অনেক কথা শুনতে হবে। সহজ যা হয় সেই ভালো। মাত্র পাঁচটা দিন, পাঁচদিনে আমরা প্রতিষ্ঠান পৌঁছে যাব, এই কটা দিন তুমি আমাকে সহিতে পারবে না ?

ঝিন্দন চোখ তুলে তাকালো দেবকুমারের মুখের পানে। সেই সুন্দর মুখখানির পানে তাকিয়ে দেবকুমার কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। সুন্দরী তরুণীর সুন্দর মুখের জয় হয়। মনে অস্বস্তি থাকলেও মুখ ফুটে কিছু বলা গেল না।

দিনের আলোয় যে সম্পর্ক মেনে নেওয়া সহজ ছিল, রাত্রের অন্ধকারে তা সহজ হলো না।

সন্ধ্যার পরে তারা দুজনে পৌঁছালো দ্বিতীয় গ্রামে। এখানকার নাটমণ্ডপে কয়েকজন যাত্রী ছিল, পুরোহিত বললেন—আপনারা পতিপত্নী এসেছেন, ওপাশে একখানি ছোট ঘর আছে, ওইখানেই আপনাদের সুবিধা হবে।

নাটমণ্ডপের পাশেই একখানি মেটে-ঘর তিনি দেখিয়ে দিলেন। দেবকুমার বললো—তুমি ওই ঘরেই থেকো, আমি বাইরে শোব।

ঝিন্দন বললো—না।

পুরোহিত হেসে বললেন—শ্রীমতী আপনাকে ছেড়ে থাকতে চান না।

ঝিন্দন বললো—ওর কফাধিক্য আছে, এই শীতের রাত্রে বাইরে শুয়ে কফ বৃদ্ধি হলে, তখন আমাকেই তো সেবা করতে হবে।

পুরোহিত তাড়াতাড়ি বললেন—না না, কফাধিক্য থাকলে এই সময় কখনো রাত্রে বাইরে থাকা উচিত নয়, শিশিরপাতে কফ বৃদ্ধি পাবেই।

পুরোহিত একটি দীপ জ্বলে দিয়ে চলে গেলেন। ঝিন্দন মুহূর্তে বললো—আমাকে তোমার বড় ভয়, না ? রাত্রে আমাব সঙ্গে এক ঘরে শুতে তাই সাহস পাচ্ছ না ?

—সাহসের কথা নয়, এটা শালীনতা।

—আমার শালীনতার বাধে না, তোমার বাধে কেন ? আসল কথা কি জান, আমি সর্বতোভাবে সাধারণের সন্মত পরিহার করে চলতে চাইছি, যাতে কেউ না বুঝতে পারে আমরা পতিপত্নী নই। এই পথে কল্যাণকুমার খোজ-খবর করতে এলে, আমাদের সম্মান পাবে না। তুমি কোন সঙ্কোচ করো না। পাঁচটা দিন কোন মতে আমাকে সহ্যে যাও, আমাকে পৌঁছে দাও প্রতিষ্ঠানে।

ঝিন্দন দেবকুমারের হাত ছুঁনি চেপো ধরলো। বললো—আমার এই মিনতিটুকু রাখো। প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে তুমি নিজের পথে চলে যেও, আমি আর কোনো কথা বলবো না।

ঝিন্দনের চোখ দুটি চিকচিক করে ওঠে, দেবকুমারের মন থেকে সব প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায়।

সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজলো, অতিথির দল নাটমণ্ডপে সমবেত হলো। পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি শুরু করলেন। যাত্রীদের একজন গুন্ গুন্ করতে করতে সহসা একখানি ভজন ধরলো। হাতে তালি দিয়ে সে গাইতে শুরু করলো। গানের সঙ্গে সঙ্গে হাতের তালি পড়তে লাগলো বটে, কিন্তু তালটা বেহুঁরো।

সবার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল ঝিন্মন, বললো—
সুর আর তাল দুই যদি না জানা থাকে, তাহলে চুপ করে
আরতি দেখাই ভাল।

পাশে যে বসেছিল, তার কানে কথাটা যেতেই বলে
উঠলো—কেন, ইনি তো খারাপ কিছু গাইছেন না।

—সবটাই তো বেশুরো।

—ভজন গানে ভক্তিভাবটাই তো সব।

—তবু তার একটা সুর লয় আছে—বলে ঝিন্মন
সেই গানের সুর ধরলো। গুন্ গুন্ করতে করতে
সুরেলা কণ্ঠ আপনি উদার মুদারা পার হয়ে তারাধ
গিয়ে উঠলো। সুরশিল্পী প্রকাশের অবকাশ পেয়ে
আত্মবিস্মৃত হলো। মন্দিরের নারায়ণ বিগ্রহের সামনে
ঝিন্মন গেয়ে চললো। স্তব্ধ যাত্রীদের প্রশংসমান দৃষ্টি
এসে পড়লো তার মুখের উপর।

আরতি থামলো, ঝিন্মনেরও যেন ভাবাবেশ
কাটলো। গান থেমে গেল, সকলের দৃষ্টি তার মুখের
উপর দেখে সে তাড়াতাড়ি ভূমিষ্ঠ হয়ে দেবতাকে প্রণাম
করলো। পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে এলেন, যাত্রীরা
তাপ নিতে লাগলো। ঝিন্মনের সামনে এসে হাসিমুখে
বললেন—এই গান আমি আরেকজনের মুখে শুনেছিলাম,
তোমার কণ্ঠ প্রায় তারই মত, সে প্রয়াগের মুখ্য
নাগরিক। নগরশ্রী চাক্রমতী।

ঝিন্মন চমকে উঠলো, তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে
বললো—আমিও এই গান তাঁরই মুখে শুনেছি, শিখেছিও
বলতে পারেন।

পুরোহিত হাসলেন।

ঝিন্মন তাড়াতাড়ি নাটমণ্ডপ থেকে উঠে এলো,
দেবকুমারকে একান্তে ডেকে বললো—কাল রাত্রি শেষ
হবার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো। গান
গেয়ে ভুল করেছি, পরিচয় প্রকাশ হবে যেতে পারে।

—গাইলে কেন?—দেবকুমার বললো।

—বেশুরো গান শুনেলে আমি স্থির থাকতে
পারি না।

দেবকুমার হাসলো।

ঝিন্মন বললো—এই দিকে কল্যাণকুমার আমার

সন্ধানে আসতে পারে, এই গানের জন্ত সে আমার ধরে
ফেলবে। প্রতিষ্ঠান অবধি না পৌঁছাতে পারলে আমার
মুক্তি নেই। আবার তার হাতে পড়লে আমার অদৃষ্টে
অনেক দুঃখভোগ আছে। যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে
যেতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে।

—সে যদি ঘোড়া বা রথে আসে?

সে ভয় নেই, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে সে জাহ্ন
ভেঙেছিল, সেই থেকে সে ঘোড়ায় চড়তে পারে না।
আর রথ ভাঙা নিয়ে আমার মত অর্থ সে এখন ব্যয়
করতে পারবে না। সে এখন প্রায় নিঃশ্ব, তাকে
পদব্রজেই আসতে হবে।

—তাহলে অবশ্য ভাবনার কিছু নেই।

—তুমি তাহলে ভাবছ আমার কথা!—ঝিন্মন খিল
খিল করে হেসে উঠল, আবহাওয়াটা হাল্কা হয়ে গেল।

পুরোহিত এসে পড়লেন, বললেন—মা, সাধারণের
মাঝে প্রসাদ গ্রহণে তোমার সন্মত হতে পারে তাই
তোমাদের জন্ত এই ঘরেই প্রসাদ দেবার ব্যবস্থা
করলাম।

পুরোহিতের পিছনে একটি লোক আহাৰ্য নিয়ে
এসেছিল। ঝিন্মন খুসি হলো, বললো—আপনার
অশেষ অমুগ্ধ।

পুরোহিত শাস্তকণ্ঠে বললেন—আমি আপনাদের
সেবা করতে পারছি, এ নারায়ণের কৃপা।

ঝিন্মন পরিচারকের হাত থেকে পাতা ও দুগ্ধের
মত রুটি, ভাজি ও গুড় গ্রহণ করলো, পুরোহিত বিদায়
লিলেন।

ঘরের কোণে একটি মাটির কলসী ছিল। দেবকুমার
বললো—জল নিয়ে আসি।

কলসী নিয়ে দেবকুমার ইন্দারার দিকে চলে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের সামনে মুহূ কণ্ঠে কে
ডাকলো—ঝিন্মন!

ঝিন্মন চকিতে মুখ তুলে তাকালো, ঘরের সামনে
দাঁড়িয়ে আছে রক্তাধরবারী সন্ন্যাসী, চোখ দুটো জল জল
করছে। সেই চোখের উপর থেকে ঝিন্মন আর দৃষ্টি

উপবাস ও আয়ুর্বেদ

[মাঝে মাঝে এবং একটা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে উপবাস করা আর আহার নিয়ন্ত্রণ করা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, সে কথা ভারতের জনসাধারণ সকলেই জানেন। নিয়ন্ত্রিত উপবাসের গুণ রোগ নিরাময়কারী সম্পর্কে অতি প্রাচীন কালেই ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একদল চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এ সম্পর্কে আধুনিক প্রয়োগ-পদ্ধতির দিক থেকে গবেষণার কাজে রত আছেন। সেই গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে এখানে আলোচনা করিয়াছেন সোভিয়েত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ গালিনা বেরোদিনা। স্বাধীনতার পর ভারত রাষ্ট্র যদি নির্নির্বাচার পরামর্শকরণ না করিয়া নিজের দিকে দৃষ্টি দিতেন, আত্মসম্পদের সম্মান করিতেন, তাহা হইলে বিশ্বের শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারিত। বহুকাল সেবিত ভারতীয় জীবন ধারা দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যে সুদৃঢ় স্থিতি লাভ করিয়াছিল তাহা অনতিক্রমণীয় বলিলেও অত্যাঙ্কি হইবে না। পশ্চিমের জবানীতে না জানা পর্য্যন্ত এ সত্যে আমাদের বিশ্বাস হইবে না। “সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ ও অভিমত” বুলেটিন হইতে নিবন্ধটি উদ্ধৃত হইল।—প্রঃ সঃ]

সম্প্রতি তরুণ সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী ভাদিমির লেশ্‌কোভ্‌ৎসফের-এর ৪৫ দিন ব্যাপী অনশনের খবর সকলেই খবরের কাগজে পড়েছেন। এক কঠিন অশুখে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন : শরীরের তাপাঙ্ক একটানা খুব বেশি চলতে থাকে এবং তাঁর রক্তকণিকার আত্মপাতিক হার হয়ে দাঁড়ায় অস্বাভাবিক। এই অবস্থায় ডাক্তারদের পরামর্শে, পরীক্ষামূলকভাবে দিন কয়েক অনশন থেকে তাঁর শারীরিক উন্নতির উল্লেখযোগ্য লক্ষণ দেখা দেয়। পঁয়তাল্লিশ দিনব্যাপী অনশনে থেকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

উপবাসের ফলে লেশ্‌কোভ্‌ৎসফের এই রোগ নিরাময়ের ব্যাপারটি নিয়ে সোভিয়েত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। তাঁরা বেশ কিছুকাল থেকেই উপবাসের রোগ নিরাময়কারী গুণ সম্পর্কে নানানভাবে পরীক্ষা-অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। লেশ্‌কোভ্‌ৎসফের এই ঘটনাটি হল সেই পরীক্ষাগুলির অত্যন্তম। এখন তাঁরা এই পরীক্ষার কার্যকারণ খুঁটিয়ে

বাচাই করার জন্যে লেশ্‌কোভ্‌ৎসফকে পর্য্যবেক্ষণাধীনে রেখেছেন।

বাত, উচ্চ রক্তচাপ, থ্রম্বোসিস ইত্যাদি রোগে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে উপবাস, অল্পাহার ও নিয়ন্ত্রিত আহার যে ফলপ্রসূ, সে কথা সকলেই জানেন। বাড়ির পোষা কুকুর বিভাল প্রভৃতি পশু অশুস্থ হয়ে পড়লে খাবার দিলেও খায় না—এটাও সকলেই জানেন। হাজার তিন বছর আগে গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটাস স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে মাঝে মাঝে উপবাস দেওয়া ভালো বলে নির্দেশ দিচ্ছেছিলেন। বোধহয় তারও আগে ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রীরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা ও আলোচনা করে গেছেন। ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্রেও কোনো কোনো রোগে উপবাসের নির্দেশ আছে। রোগ নিরাময়ে উপবাসের কার্যকারণিতা সম্পর্কে ১৯১১ সালে মার্কিন ঔপন্যাসিক মার্গটন সিনক্লেয়ার একটি বই লেখেন। তাতে তিনি ঠিকই লিখেছিলেন যে, ভুল ও অসুপযোগী আহাৰ্য্যজনিত

কোরাস্তে পারলো না। মুহূর্ত মধ্যে সে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লো। সম্যাসী ভেমন মুহূর্তে ডাকলো—ঝিন্দন!

—উ!

—এসো!

সহসা ঝিন্দন যেন নিজেকে সম্মাগ করে নিতে চাইল, আর্ডকণ্ঠে বলে উঠলো—না না!

কিন্তু সে কণ্ঠধর বড় ক্ষীণ।

—এসো!

ঝিন্দন আর প্রতিবাদ করতে পারলো না, অভিভূতের মত সম্যাসীর অহুসরণ করলো।

জল নিয়ে দেবকুমার ফিরে এসে দেখলো ঝিন্দন ঘরে নেই।

(ক্রমশঃ)

খাদ্যবিষে এবং শ্রমশিল্পের দূষিত পরিবেশে মানুষের সমস্ত দেহক্রিয়ায় এক বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়—এবং সাময়িক উপবাস তার কুফলগুলিকে কাটিয়ে উঠার সহায়ক হয়। আগটন সিনক্রয়ার ১১৭টি ‘কেস’-এর কথা লিখেছেন, যার মধ্যে ১০৭টি ক্ষেত্রেই উপবাস খুব সফলপ্রসূ হয়েছে।

তবে কি অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে, ওষুধ না খেয়ে শুধু উপোস করলেই সেরে ওঠা যাবে? মোটেই তা নয়। উপবাসটা চলবে চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে—ডাক্তারের নির্দেশে ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরকার হলে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে অম্লান্ত খাদ্য-পানীয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

এই ধরনের উপবাস-চিকিৎসা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি ক্লিনিকে ইদানীং চালু করা হয়েছে। যেমন, মস্কোর ২নং হাসপাতালের সার্জিক্যাল ক্লিনিকে ডাঃ এ. এন. বাকুলেফ এবং রুশ ফেডারেশনের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রির ডাঃ ওয়াই, নিকোলায়েফ অনেকগুলি গুরুতর রোগাক্রান্ত লোককে এই পদ্ধতিতে সুস্থ করে তুলেছেন। সব ক্ষেত্রেই উপবাস আর আহারের মাত্রা কড়াকড়িভাবে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

দীর্ঘস্থায়ী অনশনের ফলে দেহের ভিতরে কতকগুলি খুব জটিল জৈবরাসায়নিক ও জৈবভৌতিক বিক্রিয়া হয়। বিপাক বা মেটাবোলিজম-এর কাজটা সম্পূর্ণ নতুন ভাবে পুনঃসংগঠিত হয়—যার ফলে পাকক্রিয়ায় কোনো অস্বাভাবিকতা থাকলে সেটা সেরে যায় ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়ায় যে সব ক্ষতিকর জিনিষ জমে ওঠে, সেগুলি বেরিয়ে যায়। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পাকস্থলী, বৃহৎ অন্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কও বিশ্রাম পায়।

সব রোগেই যে সংক্রামক জীবাণুকে প্রতিহত করা সম্ভব বা প্রয়োজন, তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেহের

আক্রান্ত অঙ্গটিরই অবস্থার বদল ঘটানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ঘটানো সহজেই সম্ভব হয় অনশনের দ্বারা আর সেই সঙ্গে কতকগুলি চিকিৎসা ব্যবস্থা অলঙ্ঘনের দ্বারা (বিশেষ ধরনের ব্যায়াম, মালিশ, খনিজ জলে স্নান, খনিজ মেশানো কাদার পুলটিং, ইত্যাদি)। এর ফলে একদিকে বিপাক ক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি ঘটে এবং অঙ্গদিকে অব্যাহত যে সব জিনিষ দেহের ভিতরে জমে ওঠে সেগুলি বেরিয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, উপবাস মানে নির্জলা উপবাস নয়। জল ছাড়া বেশিদিন অনশনে থাকা অসম্ভব। কারণ, নিরুদন বা “ডিহাইড্রেশন”এর ফলে দেহের ভিতরে বিপাকজনিত জমে-ওঠা বিষক্রিয়ায় অচিরে মৃত্যু ঘটে। সেই ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট মাত্রায় জল, লেবুজাতীয় ফলের রস, কয়েকটি খনিজ ও লবণ খেতেই হবে। বিশেষতঃ, “বোরজোমি” শ্রেণীর খনিজ জল উপবাসী রোগীর ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞের যথোপযুক্ত পরিচালনায় এই রোগ-নিরাময়-কারী উপবাস মোটেই কষ্টকর নয়। হাসপাতালে এই ধরনের উপোসী রোগীরা সকলেই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অনশনের সময়ে প্রথম প্রথম কয়েক দিন তলপেটে এক ধরনের তীব্র যন্ত্রণা হয়। এই যন্ত্রণাটা ক্ষুধাজনিত। কিন্তু তিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যেই সেই যন্ত্রণা সম্পূর্ণ লোপ পায় এবং তখন থেকে বেশ আরাম বোধ হয়। তখন বেশ একটা মানসিক ও দৈহিক প্রশান্তি আসে এবং ঘুম হয় গভীর ও আরাম-দায়ক। এই অবস্থায় চিকিৎসার যে প্রণালী ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তা বিভিন্ন রোগীর দৈহিক ও মানসিক অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। চিকিৎসা শেষেই রোগী আবার ক্ষুধা অনুভব করে এবং দুর্বল বোধ করে। তখন আবার তাকে খেতে দেওয়া হয় এবং আহার্যের ভারসাম্য বজায় রেখে ক্রমে ক্রমে তা বাড়িয়ে তোলা হয়।



‘প্রবর্তক’-এর স্বপ্ন ও সাধনা :

বর্জমান বৈশাখ, ১৩৭১, সংখ্যা হইতে প্রবর্তক পত্রিকার ৪৯তম বর্ষ পরিক্রমা শুরু হইল।

প্রবর্তকের আদর্শমুগ যে সব গ্রাহক, পাঠক-পাঠিকা, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও অহুবাগী সুহৃদবৃন্দের সপ্রেম সহযোগিতা পত্রিকাখানির এই অদীর্ঘ পথ-চলার আমূল্য করিয়াছে আমরা বর্ষান্ত্রে সন্তোষে অন্তরে তাঁহাদের স্মরণ করিতেছি।

আগামী বৈশাখে প্রবর্তক হীরক-জ্বস্তীর সৌভাগ্য লাভ করিবে, এ ভরসা আমরা রাখি। যেহেতু শ্রীভগবান আমাদের সহায় ও সুহৃদ। আত্মকাম নহে, পরস্তু ঈশ্বর কাম চরিতার্থ করাই প্রবর্তকের ধর্ম, কর্ম ও গতি। ব্যক্তি ও সমষ্টির আধারাত্মক, জীবনের সর্বোচ্চ-ক্ষেত্রে সেই পূর্ণতমের অবিস্মৃত স্তম্ভ প্রকাশটি সম্ভব ও সার্থক করিয়া তোলাই ‘প্রবর্তক’-এর স্বপ্ন ও সাধনা। এই বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি এই পরম সম্ভাবনার ক্ষেত্র ও আশ্রয় বলিয়া আমরা প্রত্যয় করি। মানব মহামিলনের সার্বভৌম ভাব ও ভাবনা এবং সমগ্র বীজ বাঙালীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাধনার মধ্যেই নিহিত। সত্যগুরু শ্রীমতিলালের অমূল্য ভাষ্য : “ভীষ্ম ভাব ও কর্মময়। সে বুদ্ধিতে ভূমাকে অবতারণ করিবে। মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আধারে কল্পাত্মকাল ধরিয়া ভূমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করিবে স্ব-প্রণালীতে। এই দিব্য জীবন প্রকাশেব কেন্দ্রীভূত ভারতবর্ষ। বাংলা এই মহাভারতের হৃৎপিণ্ড। বাঙালী এই হৃদয় শতদলের অপার্থিব মকরন্দ।”

‘প্রবর্তক’ শুধু পত্রিকার নাম নহে। বৈঠকে বসিয়া খেলালখুশী মত পত্রিকার ‘প্রবর্তক’ নামকরণ করা হয় নাই। অক্ষরের সমষ্টিমাত্রও নহে। ইহা মস্তবীৰ্য্যগর্ভ। দূরপ্রসারী তাৎপর্য্য বহন করে ‘প্রবর্তক’ নামটি। এই নামের ইতিবৃত্তটুকু প্রবর্তকের প্রাণপুষ্প সজ্জগুরুজীর ভাষায়ই দিলাম : “পত্রিকা বাহির হইবে, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু কি তাহার নাম হইবে, তাহা জানি না। তাহা

ভগবান তখনও জানান নাই। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমার বুদ্ধিবল্লভ স্তম্ভ হইল। বন্ধুরা আলোচনার স্বর রাখিয়া গেল। আমার তিতর-বাহির কিন্তু মৌন নিখর হইয়া পড়িল। পরদিন অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ধ্যানে বসিলাম। রাত্রির শেষ অংশটি আমার নিকট অতি লোভনীয়। নিরুপ পৃথিবীর কোলে বসিয়া এই সময়ে উর্জলোক হইতে যে অমৃতের বর্ষণ হয়, তাহা আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করি। * * * সেদিনও ইহার অশ্রুতা হয় নাই। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, নিম্নক সমাহিত চিন্তে অন্ধকারে বসিয়া আছি। অস্তর্জগতের দুয়ার যেন উন্মুক্ত হইল। মুদিত চক্ষেই দেখিলাম— কয়েকটা জ্যোতির্ময় অক্ষর। সেই অক্ষর গড়াই পর পর সাজান রহিয়াছে। বন্ধাকর নহে, দেবনাগরী “প্রবর্তক” এই শব্দটি আমি সুস্পষ্ট দেখিলাম। চমক ভাঙিল।”

‘প্রবর্তক’-এর মস্তমুঠা ঋষি ছিলেন সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল। তাঁর কথায়ই বলি : “প্রবর্তক শুধু নাম নয়, মন্ত্র। যোগবীৰ্য্য এই মন্ত্রশক্তির আশ্রয়। এই শক্তি নাম লইয়াছে, রূপ লইয়াছে প্রবর্তক সজ্জ। সজ্জের এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। সে লক্ষ্য বাংলায় নবজাতিগঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা।” ইহাই সজ্জের সাধ্য, ইহাই স্বপ্ন।

ভারতের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির মূল ভিত্তি তিনটি—গুরু, মন্ত্র, প্রতিমা। প্রবর্তক মন্ত্রের রূপবিগ্রহ প্রবর্তক-সজ্জ। পত্রিকার পৃষ্ঠায় যুগগুরু শ্রীমতিলালের ‘প্রবর্তক’-মন্ত্রের উদ্গান একদা দূর দূরান্তের সন্ধানীদের আকর্ষণ করিয়া আনে প্রবর্তকের পাদপীঠে। এই সর্বোৎসর্গীকৃত জীবন-সমষ্টি-চক্রই প্রবর্তক সজ্জ। প্রবর্তক পত্রিকাশরূপে এই সজ্জের ভাবাদর্শবাহী পতাকা। এই দিক দিয়া পত্রিকা জগতে প্রবর্তক শুধু স্বতন্ত্র নহে—অনন্ত ও বটে।

পত্রিকার দীর্ঘায়ু ও সম্ভাবনার সার্থকতা অবশ্যই নির্ভর করিতেছে সজ্জচক্রের মিশান-নিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় ও সাধনবীৰ্য্যের উপর। কিন্তু আমাদের উপলব্ধ দর্শন এই যে, ভারত তথা বাংলার বিশিষ্ট জাতিসাধনার অনিবার্য্য ক্রমেই ইহার যুগ-প্রকাশ। সজ্জ ইহার ক্রমশ্চিহ্ন। সজ্জের সীমিত ক্ষেত্রে আজকে শুধু ভারত জাতি-সংগঠনের যে পরীক্ষানিরীক্ষা চলিয়াছে, তাহাই অনতি-

দূর আগামীকালে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধ জাতিরূপে আত্ম-বিবর্তিত হইবে। লোক-লোচনের অন্তরালে এখনও এই ভবিষ্যৎ জাতীয়তা জাতি-মানসের দূর দিগ্ধলে শ্মৃটোন্মুখমাত্র—বুঝিবা সম্ভাবনারূপে বিদ্যমান। কিন্তু এই ‘মিশন’-এর গর্ভবেদনাই সম্ভব সমস্ত সৃষ্টির বীর্ষ্য, কর্ম-প্রচেষ্টার প্রেরণা ও তপস্ভা।

শত সংঘাত, আশা-নিরাশা আর হুঁহুগের মধ্যে প্রবর্তক পত্রিকারও পথ চলার ইহাই পাথেয়।

গত চৈত্র সংখ্যা প্রবর্তকের ‘নিবেদন’-এ আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম : “চটুল নিম্নগামী লোকমত রঞ্জনের দ্বারা অর্থোপার্জনের গণিকাবৃত্তি প্রবর্তকের নহে। তাই তার তপস্ভা আব কচ্ছ, সাধনা। পাঠক সংখ্যা সীমিত। কলেবরও ক্ষুদ্র। বালুকারণির অপেক্ষা স্বর্ণমুষ্টির গৌরব অধিক নিশ্চয়ই। প্রবর্তকের ক্ষুদ্র আকারও অগৌরবের হবে না যদি ইহা মহৎ ও বৃহৎ ভাবগর্ভ হয়।”

আটচল্লিশ বর্ষ পূর্বে পাক্ষিক প্রবর্তকের সূচনা-পূর্বে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছিল ইহা তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

প্রবর্তকের প্রথম প্রকাশ ১৫ই ভাদ্র, ১৩২২ সাল, ইংরাজি ১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৫। কালটি অগ্নিযুগের অবসান এবং গান্ধীযুগের সূচনার প্রায় সন্ধিক্ষণ। সেই সময়ে প্রবর্তক প্রথম প্রকাশের অস্থান-পত্রে দুঃখ করা হইয়াছিল : “দেশের অধিকাংশ মাসিক পত্রিকা দেশের এই দারুণ সঙ্কটকালে মনোহারী দোকানের নয়নরঞ্জন দ্রব্য-সম্ভারের মত চিত্তাকর্ষক গল্পগুস্তবেই পরিপূর্ণ। মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ দেশের রুচি অহুসারেই চলিয়া থাকেন। ব্যবসা করাই ইহার ধর্ম।”

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বের সেই যুগ-প্রবৃত্তি আজকে স্বাধীনতার পরে কুচির কোন অবর স্তরে নামিয়াছে তাহা মুষ্টিমেয় দেশদরদী, বাহারা এখনও বিবেকবুদ্ধির জলাঞ্জলি দেন নাই, তাহারাই নিশ্চয়ই বেদনার সঙ্গে অহুস্তব করিতেছেন। শিক্ষা-সাহিত্যের যে পরিমাণ ব্যাপক প্রচার হইয়াছে ঠিক সেই পরিমাণে চিন্তার গভীরতা ও সামগ্রিক জীবন-উন্নয়নের গুণগত বোধটির

হৃৎক দেখা দিয়াছে। এই মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক পুনর্কাসনই বর্তমানে জাতীয় জীবনের বড় এবং সত্যকার সমস্যা। বর্তমানে প্রচলিত পত্রিকাগুলির প্রকৃতি ও প্রকার এবং পাঠকের পরিসংখ্যান ব্যারোমিটারেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, দেশবাসীর শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও রুচি-বিকার এক ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। এমনটি আশঙ্কা করা অমূলক হইবে না যে, অনতিদূর ভবিষ্যতে চিন্তাগর্ভ স্বরুচিসম্পন্ন স্বল্প কয়েকখানি পত্রিকা যারা সাহিত্যক্ষেত্রে অর্থোপার্জন করিতে নষ্ট কালোবাজারীতে বিধাগ্রস্ত, যারা হুর্নীতির সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠন খুলিতে ইতস্ততঃপরায়ণ, তেমন পত্রিকাব টিকিয়া থাকাই খানিকটা দায় হইবে।

সামাজিক বা ধার্মিক প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত পত্রিকার সংখ্যাও বাংলা দেশে কম নহে। ইহাদের নিজস্ব বক্তব্য আছে। কোন বিশিষ্ট অধ্যাত্ম জীবনগঠনমূলক মত ও মহৎ কোন আদর্শ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এই পত্রিকাগুলি। ইহার সৌরভহীন বিচিত্র ফুলের সাজি সাজাইয়া উপরিচর লোকচিত্ত বিনোদন করিয়া অর্থোপার্জনের অপগ্রন্যাস করে না। এই সব নীতি ও ধর্মমূলক পত্রিকার প্রচার ও প্রসার যতই ব্যাপক হইবে ততই জাতি-মানস যে সুস্থ হইয়া উঠিতেছে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা হইলেও, প্রবর্তক ভারতজাতির অভ্যুত্থান লক্ষ্যে লোকমত গঠনত্রতী এবং আত্মবীর্ষ্যে আত্মশীল। ‘প্রবর্তক’-এর জীবন ও জাতি-গঠনের নিজস্ব বক্তব্য আছে।

*

আজকের দিনে জাতীয় জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই একটা নির্লজ্জ অদম্য উচ্ছৃঙ্খলতা সকল শোভনীয়তার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর আগেও যে বাঙালীর জীবন ও পরিবেশ ইহা হইতে মুক্ত ছিল এমনটি নহে। ইতিমধ্যে রাজনীতি ক্ষেত্রে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, বহু রাজনৈতিক ত্যাগের দৃষ্টান্তও মিলিয়াছে, ধার্মিক মত-পথের প্রচারও কম হয় নাই, কিন্তু কিছুই এ জাতিটার অধঃপতনের গতিমুখ ফিরাইতে পারিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না। ১৯১৫ সালে

প্রবর্তক পত্রিকা প্রকাশের কৈফিয়ৎস্বরূপ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার অন্তর্গত-পত্রে উক্ত হইয়াছে: “ক্ষুদ্র ‘প্রবর্তক’ কি করিবে? নূতন ভাবের ভাবুক করিবে—নূতন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিবে—নূতন মস্তিষ্ক দীক্ষা দিবে। যাহা না থাকিলে ঘরে ঘরে হাহাকার উঠে—যাহা না থাকিলে মাহুষ স্বার্থপর হয়, বিষের জ্বালা অনুভব করে—প্রবর্তক সেই অমূল্য বস্তু গঠনের সহায়তা করিবে। সেটি কি? চরিত্র। এই চরিত্র অভাবেই আমরা এত নীচ হইয়া পড়িয়াছি—ভাবের ঘরে চুরি করিতে শিখিয়াছি। আমরা উপরে সাধু, ভিতরে চোর, উপরে দেশহিতৈষী, ভিতরে নিজের পায়ে বড়ল মারিতে বসিয়াছি। এই চরিত্রের অভাব বশতঃই গুণীর আদর নাই—সর্বস্বত্যাগীর সম্মান নাই—উপযুক্ত লোকের কর্মক্ষেত্র নাই।” তারপর আশা করা হইয়াছে “বাঙালীকে দেবদুর্লভ পরিপূর্ণ চরিত্র লাভ করিতে হইবে। একবারে পুরাতন বনিয়াদ তুলিয়া ফেলিতে হইবে—সম্পূর্ণ নূতন ভাবে নূতন বনিয়াদ হইতে এই স্মাহান চরিত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা হইলেই বাংলার বিচ্ছিন্ন মহাশক্তি কেন্দ্রগত হইয়া সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন করিবে।”

বাঙালীর এই দেবদুর্লভ দিব্য চরিত্রগঠনের স্বপ্ন কতটা সফল হইয়াছে বা হইবে তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। কিন্তু এই ধুলির ধরণীতে কি সুন্দর, কত ভরসার সেই দৃশ্য যখন দেখি স্বপ্নদ্রষ্টা শ্রীমতিলাল সর্বস্বত্যাগ করিয়া, সত্যসর্বস্ব হইয়া এই স্বপ্ন রূপাষণের জন্ত গতাহ-গতিক শ্রোতে গা না ভাসাইয়া কথিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নির্বাণ, মোক্ষ না চাহিয়া উন্মাদ হইয়াছেন তাঁর কল্প-স্বপ্ন সিদ্ধি বজ্র। অফুরন্ত তুবড়ির মত এই একই লক্ষ্যে জলিয়া-জলিয়া জীবন তাঁর নিঃশেষ হইয়াছে। সেদিনের প্রবর্তকের ভাষায়ই বলি: “চিরযুগ এইরূপ উন্মাদের দ্বারাই বিশ্বের মহৎ কর্ম সাধিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নব-যুগের প্রবর্তক এইরূপ উন্মাদশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের পার্শ্বচর জনে জনে এইরূপ পাগল ছিলেন। মাহুষের লক্ষ্য বিচারযুক্তির আলোকে ইঁহার পাগল বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাঁহার স্বার্থের মাপকাঠিতে লাভালাভ মাপিয়া, হিসাব করিয়া চলেন না বলিয়াই বুঝি পাগল। কিন্তু সমগ্র জগৎ সম্মুখে চিরদিনই দেখিয়াছে—এই উন্মাদমণ্ডলীই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে—মাহুষের, জাতির জীবনসংগ্রামকে সফল সিদ্ধি বিমণ্ডিত করিয়াছে, অধর্মের অবসান করিয়া বিশেষ ধর্মযুগের প্রবর্তন করিয়াছে।”

সম্ভবতঃ ও তাঁর কায়বাহ প্রবর্তক সম্বন্ধে এই শুদ্ধ-সিদ্ধ জাতিগঠনের স্বপ্নবিশ্বের আশ্রয়ভাঙ্গা পাগলের দল। আর প্রবর্তক তার দিব্য প্রলাপের পতাকা মাত্র।

একচল্লিশ বর্ষ পূর্বে বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্য-দিনে একদা বিপ্লবী শ্রীমতিলালের জীবনে আর একটি অতি বড় বিপ্লব সংঘটিত হইল। তাঁর জীবনধারার সম্পূর্ণ বাক পরিবর্তন হইল। ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতির উপর ভাগবত জাতি গঠনের অগ্নি প্রেরণায় তিনি সত্য সত্যই উলঙ্গ উন্মাদ হইলেন। সমস্ত অতীতকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রীমন্দির আশ্রয় করিলেন। এই মন্দির-প্রাঙ্গণে আজও অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া শিক্ষা সমাজ, অর্থ, রাষ্ট্র, গ্রন্থিত জাতিগঠনমূলক সম্বন্ধ-স্বপ্ন রূপায়নের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে প্রবর্তক সম্বোধন ও জন্ম। প্রবর্তক পত্রিকার মর্মগাথাও এই অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের উদ্বোধন-সঙ্গীতেই বহাতিত:

বেদধ্বনি তোল, তোল সামগান
কোটি কণ্ঠে তোল শিবের বিষণ।
মোহমুগ্ধ জাতি লভিয়া চেনন,
শির তুলি’ আজি জাগ রে ॥
নাহি আজি ভয়, নাহিক সংশয়,
অমৃতের পুত্র, তোরা মৃত্যুঞ্জয়,
জ্ঞান, বীৰ্য্য, গতি সকলি অক্ষয়,
নব জন্ম আজি মাগ রে ॥
হৃদয়ে-হৃদয়ে জাগ নারায়ণ,
প্রতি জীব শিব হও সচেতন;
ঘরে-ঘরে ঘুরি ব্রহ্ম-নাম গাহি’
কত প্রেম-অনুরাগ রে ॥
বল জয়-জয়, ভারতের জয়,
মহা, গুরু, তীর্থ দেবতার জয়—
পুণ্য দেবভূমি, নমি তারে নমি,
ভাসি রে অমৃত সাগরে ॥

‘প্রবর্তক’-এর মূল সুর ও সাধনার স্রোতস্রুতার তার প্রথম প্রকাশের সঙ্কল্প-বাণী ও এই উৎসব-উদ্বোধন সঙ্গীতের মধ্যেই নিহিত। প্রবর্তক বিশ্বাস করে, সে একটা বিপুল শক্তির প্রতীক, বিরাট স্রষ্টার বীৰ্য্য—তাকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে পাপের বিরুদ্ধে, অসত্য আর অজ্ঞানের বিরুদ্ধে। বাঙালীর দিব্য জাতীয়তার সিদ্ধি আনিয়া সং ও সত্যের ভারত তথা জগৎকে গড়িয়া তোলাই তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য।

একটি রূপক গল্প

[প্রবর্তকের ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১৩২৩) হইতে উদ্ধৃত]

এক যে ছিল ছোট্ট দোয়েল পাখী। নীল অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তার প্রাণ পুলকে পুলকে নাচিয়া উঠিত। বক্ষ তার আনন্দে আনন্দে পোর।। সারাদিন তার গানের আর অন্ত ছিল না। অনন্ত গগনে উড়িয়া উড়িয়া তার আর ক্লান্তি ছিল না, শাখা হইতে শাখান্তরে, বৃক্ষশির হইতে বৃক্ষশিরে, লতামণ্ডপ হইতে লতামণ্ডপে তার নৃত্য করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া আর সাধ মিটিত না। এমনি ছিল দোয়েল পাখী।

একদিন সারাদিনের নৃত্য সারিয়া, গীত গাহিয়া, অনন্ত নীল গগনের ছুটাছুটি সাঙ্গ করিয়া যখন সে আপন ফুলায় ফিরিয়া চলিয়াছিল তখন তার সাক্ষাৎ হইয়া গেল একটি প্রাচীন গৃধের সঙ্গে। গৃধের তিন-কাল গিয়াছে এককাল আছে। গৃধ ক্ষুদ্র দোয়েলকে ডাকিয়া কহিল—“ওরে ক্ষুদ্রপাখী! আমার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন কর।” দোয়েল বৃদ্ধের কথা অগ্রাহ করিতে পারিল না, বিনীতভাবে গৃধের সম্মুখে গিয়া উপবেশন করিল। গৃধ কহিল, “ওরে ক্ষুদ্র, ওরে চপল চিত্ত, কোন্ ধ্বংসের পানে ছুটিয়া চলিয়াছিস? ওরে দুর্বুদ্ধি কোন্ দুরাশার আকাঙ্ক্ষায় আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছিস?” গৃধের কঠিন এবং কঠোর বাক্য শুনিয়া ক্ষুদ্র দোয়েলের বক্ষ দুঃ দুঃ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তার জীবনের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত পুলক কোন্ আশু বিষের সম্ভাবনায় অস্তিত্ব হইয়া গেল। সভয়ে এবং সম্মুখে কহিল—“প্রভু—” কিন্তু আর কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধুই কাঁপিতে লাগিল। গৃধ কহিল—“ওরে মুঢ়, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর—আজ আমি তোকে সত্যার্থে দীক্ষিত করিব। তোর অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস। শোন—তোর ঐ নৃত্য তোর জীবনকে শুধু পাপে পাপেই পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে—তোর সঙ্গীত অতি জঘন্য কার্য—আর তোর ঐ অনন্ত গগনে যে উড়িয়া বেড়ান—সেটা অত্যন্ত ভুল।” দোয়েল বলিয়া উঠিল—“ভুল প্রভু!” গৃধ কহিল—“ভুল—অত্যন্ত ভুল—আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত সমস্ত ভুল।

এমন ভুল জগতে আর কিছু নাই।” দোয়েল গৃধের সত্যার্থের সহিত আপনার জীবনকে কিছুতেই মিলাইয়া লইতে পারিতেছিল না, তাই তাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। কিন্তু ষাঁহার এত বয়স হইয়াছে, যিনি সংসারে এত বৎসর ধরিয়া বাস করিয়াছেন তিনি জ্ঞানবানই হইবেন মনে করিয়া গৃধের কথায় আস্থা স্থাপন করাই সমীচীন মনে করিল। তথাপি একবার প্রশ্ন করিল—“উড়িয়া যে আনন্দ পাই প্রভু!” গৃধ কহিল—“ঐ আনন্দই ত ভগবানের পথের অন্তরায়, বিঘ্ন।” দোয়েল জিজ্ঞাসা করিল—“ভগবান কি প্রভু?”

গৃধ কহিল—“হে বৎস, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ভগবান আনন্দময়। তিনি এই জগৎ-সংসার, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন।” গৃধের এই কথা শুনিয়া দোয়েলের প্রাণ অত্যন্ত হুট হইয়া উঠিল। দোয়েল কি বলিতে যাইতেছিল, গৃধ বাধা দিয়া কহিল—“কিন্তু জ্ঞানও বৎস, সেই এক ভগবানই সত্য আর এ জগৎ-সংসার ভুল।” ক্ষুদ্র দোয়েলের মন আবার দমিয়া গেল। জীবনে যাহা প্রেব বলিয়া মনে হইবে তাহাকেই বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে, কারণ ভগবান যিনি তিনি শ্রেয়, প্রেয় নহেন।”

দোয়েল বৃদ্ধ গৃধের কথা ভাল বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার কথায় তাহার মন-প্রাণ অত্যন্ত বিধাদিত হইয়া উঠিল। সে কহিল—“কি করিতে হইবে প্রভু?” গৃধ কহিল—“ভুল পথ পরিত্যাগ কর। আর উড়িও না।” দোয়েল জিজ্ঞাসা করিল—“প্রভু, আপনি কি কোনদিন উড়েন নাই?” গৃধ উত্তর করিল—“উড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু হায় আমাকে সহুপদেশ দিবার কেহ ছিল না। তোমার অতি সৌভাগ্য যে সহুপদেশ প্রাপ্ত হইতেছ।” দোয়েল পুনরায় বলিল—“পক্ষদ্বয় যে উড়িতেই চায় প্রভু।” গৃধ কহিল—“তাহার উপায় করিতে হইবে। শোন—আপন আলায়ে ফিরিয়া যাও। এবং তথায় কদলী-তরু দ্বারা রজ্জু নির্মাণ করিয়া পক্ষদ্বয়কে এমন করিয়া বন্ধন কর যেন আর উড়িতে না পারে। যাও বৎস, ভগবান তোমার মঙ্গল কক্ষন।”

দোয়েল ক্ষুধায় আপন আলেয়ে ফিরিয়া চলিল। তাহার চোখের আলোক নির্বাপিত। তাহার হৃদয় হইতে আনন্দের রশ্মি কে যেন ধীরে ধীরে কাড়িয়া লইল। দোয়েলের জীবন দুর্ভিক্ষ বোধ হইতে লাগিল। হায়! জীবন ত দুঃখময়ই। এ জীবন রাখিয়া লাভ কি? এ ব্রহ্মাণ্ড মুছিয়া যাওয়াই ত সুখকর। দোয়েল আপন কুলায় গিয়া আপনার পক্ষদ্বয়কে বেশ করিয়া বাঁধিল আর জপিতে লাগিল ভুল, ভুল, ভুল।

সে রজনীতে আর দোয়েলের ঘুম আসিল না। পক্ষদ্বয়ের যন্ত্রণায় এবং দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় তার মন ভাৱাক্রান্ত। সারা রজনী ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইয়া শেষ রজনীর দিকে যখন দোয়েলের চক্ষু একটু বুজিয়া আসিয়াছে তখন পূর্ব দিগন্তে অঞ্চল ছড়াইয়া অহনা দেবী সিঁদু-তরঙ্গের উপর দিয়া বীর-চরণ বিক্ষেপে ধরার আলস্ত জড়তা মুছাইয়া দিতে আসিয়াছেন। উষার স্পর্শে কাননে কাননে লক্ষকোটি কুল, গোলাপ আনন্দের আতিশয্য সহ করিতে না পারিয়া গালভরা হাসি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অলি গুজনের আর বিরাম নাই। হাজার বিহঙ্গের কর্ণগীতে আর ক্লান্তি নাই। দোয়েল চমকাইয়া চক্ষু চাহিল। মুহূর্তের জন্য সে আপনার পক্ষদ্বয়ের যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। দেখিল সেই অনন্ত উদাস্ত জুনীল গগন তেমন আছে, বাতাসের মাতামাতি, কুসুমের হাসাহাসি, সহস্র বিহঙ্গের ছুটাছুটি সেই সব। দোয়েলের চক্ষু অলক্ষিতে জলে ভরিয়া আসিল—হায় সে যে ভুল পথ পরিত্যাগ করিয়াছে—সে যে সত্যধর্ম আলিঙ্গন করিয়াছে।

এমনি করিয়াই দোয়েলের দিন কাটিতে লাগিল। এমন করিয়াই প্রতি উষায় সে চক্ষু মেলিয়া চাহে—এমনি করিয়াই তার বক্ষ কাঁপিতে থাকে, পক্ষদ্বয় চঞ্চল হইয়া উঠে, আর চক্ষু ছুটি জলে ভরিয়া যায়। দোয়েল মনে মনে বলে—হায় ভগবান, এমন নির্ভর কেন? এ জুনীল গগনে ছুটিয়া ছুটিয়া ভগবানকে মানা যে অনেক সহজ হইত। এই স্নিগ্ধ বাতাসে গলা ছাড়িয়া তাঁর নাম গাওয়া যে অনেক আনন্দের হইত। তবে এ দুঃখ কেন? যাহা চাই তাহা ভগবানের পথের অন্তরায় হইল কেন?

যাহা ভালবাসি তাহা মিথ্যা, ভুল কেন? হায় ভগবানের একি নির্মমতা, একি নির্ভরতা, একি দারিদ্র্যতা! কিন্তু অভ্যাसे কি না হয়। ধীরে ধীরে দোয়েলের পক্ষদ্বয় আড়ষ্ট হইয়া আসিল, হৃদয়ের উপর একটা ঘন ক্লম যবনিকা বিছাইয়া পড়িল, প্রাণের স্পন্দন মিশাইয়া গেল, জীবনে রহিল শুধু যাহা অতৃপ্তি, কঠিন দুর্ভিক্ষ জীবন-ভার আর বিরাট অক্ষমতার ঔদাসীন্ধ্য। দোয়েলের দিন কাটিতে লাগিল।

একে একে কত বসন্ত লতায় পাতায়, গন্ধে গানে, ফুলে ফলে ধরাকে সুসজ্জিত করিয়া আবার বিদায় লইল। একদা এক ফাস্তনের ফুল প্রভাতে দোয়েলের বোধ হইল যেন তাহার মর্ম্মতলে বহু দিনের রক্ত কপাট খুলিয়া গেল—সেখানে কোন একটি অজ্ঞাত লোকের পদ্ম-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার সমস্ত জীবনকে তাহারই সুরভিতে মোহিত করিয়া দিল—তাহার চক্ষে যেন কি এক অঞ্জন লাগিয়া গেল। আবার দেখিল এ জগৎ শুধু দুঃখময় নয়। এখানেও মাধুরী আছে, সৌন্দর্য্য আছে, আনন্দ আছে।

আর দেখিল এ জগতে জী দোয়েল অপেক্ষা সুন্দর আর কেহ নাই, আর কিছু নাই। কি এক রহস্যময় টানে দিবস রজনী সে তাহার দিকে আকর্ষিত হইতে লাগিল। দোয়েল মনে মনে বলিল—জী দোয়েলের সহিত হৃদয় মিলাইতে হইবে। দোয়েল গৃধের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল—“প্রভু! আমি বিবাহ করিব।”

“বিবাহ!” গৃধ আপনার কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—“কি বলিতেছ বৎস?” দোয়েল উত্তর করিল—“প্রভু, আমার বিবাহ করিবার বাসনা হইয়াছে।” গৃধ কহিল—“সে কি! এতদিন তোমাকে কোন ধর্ম্ম শিখাইলাম? শুন বৎস, জী অপেক্ষা মহাপাতকী এ জগতে আর কেহ নাই—ভগবানের পথে এমন বৃহৎ, কঠিন বিঘ্ন আর কিছু নাই—জীর সহিত গিলিত হইয়া অনন্ত নিরয়গামী হইও না।” দোয়েল জিজ্ঞাসা করিল—“প্রভু, আপনি কি কোনদিন বিবাহ করেন নাই?” গৃধ উত্তর করিল—“করিয়া-ছিলাম বটে। কিন্তু হায় আমাকে সত্বপদেশ দিবার

কেহ ছিল না। বৎস, আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিও। যাও, গৃহে ফিরিয়া যাও। বিবাহের কল্পনা পরিত্যাগ কর। ভগবান তোমার স্মৃতি দিন।”

দোয়েল হিমাদ্রিশরূপ পাষণ্ডার বক্ষে লইয়া আপন আলয়ে ফিরিয়া আসিল। হায় সে কি করিবে? সে যতই জী দোয়েলকে অধীকার করিতে চাহে ততই তাহার কমলীয় আলেখ্যটা তাহার মানস নমনে ফুটিয়া উঠে, ততই তাহার রমণীয় মাধুরিমা তাহার অন্তরে অন্তরে নীলিমারাশি বিচ্ছুরিত করিয়া যায়—আপনার মর্মে মর্মে কে যেন ডাকিয়া ডাকিয়া মিনতি করিয়া বিরাত আকাজ্জক স্বরে বলে—“আমি চাই গো আমি চাই”। সে যতই প্রাণপণে উচ্চারণ করিতে থাকে—ভুল, ভুল, ভুল—ততই কে যেন তাহার প্রাণে প্রাণে ঘোষণা করিয়া যায়—“আমি আছি গো আমি আছি।” হায় এ কি সমস্যা! একদিকে সে, অল্প দিকে ভগবান। জী যদি ভগবানের পথের অন্তরায়—তবে একি বিদ্রোহিতা জীবের! জীবের জন্ম কি শুধু চিরকাল ভগবানের সহিত বিদ্রোহিতা করিতে? নহিলে ভগবান যাহা চাহেন না, ভগবানের রাজ্যে যাহা ভুল—জীবের তাহারই প্রতি আকাজ্জক কেন? তাহাতেই তৃপ্তি কেন?

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। দোয়েলের আপনার সহিত আপনার সংগ্রামের আর অন্ত নাই। তাহার জীবনের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুধুই যেন নাচিতে লাগিল—বিরাত শূন্যতা, নিষ্ঠুর অকৃতার্থতা আর মর্মস্ফুটন। দোয়েল আর পারে না। দোয়েলের চক্ষে কালিমা পড়িয়াছে, জীবন উদ্বেগহীন মরণকাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দোয়েল গৃহের নিকট উপস্থিত হইল। কহিল—“আমাকে মুক্তি দিন প্রভু! আমাকে বিবাহের অমৃতদিন দিন।” গৃহ দোয়েলকে দেখিল ও বুঝিয়া কহিল—“যাও বিবাহ কর। কিন্তু দেখিও জীর সহিত সাবধান হইয়া চলিও। জীর প্রতি প্রণয়বান হইও না, জীসম্মুখে আনন্দ বোধ করিও না। জানিও তাহা হইলে চির জীবনের জন্ত ভগবানকে হারাইবে।” দোয়েল গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার জীবনে বহুদিনের

পর যেন মরা গাঙে বান আসিয়াছে। হৃদ-যমুনার আনন্দলহরী প্রাণের কিনারে কিনারে কল কল ছল ছল রব তুলিয়াছে। জীবনের সমস্ত ক্রান্তি সমস্ত অবসাদ মুছিয়া গিয়াছে। দোয়েল যেন আর দোয়েল নাই। সে যেন নবীন জন্মলাভ করিয়াছে—ক্রান্তিকে তাড়াইয়া শান্তিকে পাইয়াছে—ভ্রান্তির মাখে যেন সে আপনার জন্মস্বপ্ন অধিকার করিয়াছে। দোয়েল বিবাহ করিল।

কিন্তু দোয়েলের সমস্ত আর অন্ত নাই। একি পরিহাস জীবনের! একি সংগ্রাম জীবে আর ভগবানে! একি ভগবানের বিমর্ষ বদন আর জীবের যুগ যুগ ব্যাপী বিদ্রোহিতা! দোয়েল যখন জী দোয়েলকে বৃকে করিয়া অতুল সুখ, অতুল আনন্দে ডুবিত—প্রাণ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিত—ভগবানের অস্তিত্ব তাহার নিকট কতকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিত তখনই—তখনই সে কতকটা বুঝিতে পারিত। কিন্তু জ্ঞানীর উপদেশ এ আনন্দ এ সুখ যে তাহাকে নিয়গামী করিবারই সাহায্য করিতেছে—তাহাকে ভগবানের নিকট হইতে দূরে লইয়াই ফেলিতেছে। হায় হায় নিষ্ঠুর ভগবান! দরিদ্র ভগবান!

যাহা হউক কালক্রমে দোয়েলের অনেক সন্তানসন্ততি হইল। যথাসময়ে তাহারাও বিবাহ করিল। তাহাদের আবার সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু ইহারা কেহই আর উড়ে না—তাহাদের পক্ষ সব আড়ষ্ট—কেহই আর গান গায় না—তাহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ—কেহই আর খেলে না—তাদের হৃদয় আনন্দহীন। ইহারা সবাই আপন আপন কোটরে বাস করে আর যখন প্রতি উষ্ম পৃথিবী নব জীবন লাভ করে—যখন স্নিগ্ধ মন্ড পবন বহে—তখন সহস্র সহস্র বিহঙ্গের কণ্ঠ-কাকলিতে কানন-ভূমি মুখরিত হইয়া উঠে—যখন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কুন্দ গোলাপে পুষ্পবীধি হান্তময় হইয়া উঠে তখন বহু উর্দ্ধে উড্ডীয়মান ছুই একটি পক্ষীকে দেখিয়া, এরা একটু শুক হাসি হাসিয়া পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করে—“হা হা, কি ভুল পথেই ওরা চলিয়াছে—কোন ধ্বংসের পানেই ওরা ছুটিয়াছে।”

জাতিসংঘে এখন,



তিনিজনে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ভরসা করে খেললে আমাদের দেশের প্রাণহীন মাঠেও ম্যাচ দেখা যায়। তবে সে রকম খেলা কখনই বা খেলতে পারে? খেলা শেষে অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্যাপ্টেন রিচি বেনো বলে গেছেন যে, ভারতীয় দলে জয়সিংহা, বোর্দে, কুন্দ্রায় পাতৌদি হুম্বন্ত সিং-এর মত সুদক্ষ ব্যাটস্মানেরা আছে বটে, কিন্তু স্পোর্টিং উইকেটে না অভ্যাস করলে তাদের খেলাও খারাপ হয়ে যাবে। এবং এত সুদক্ষ খেলোয়াড় নিষেণ্ড ‘ফাস্ট পিচে’ ভারতীয় দল একেবটুরে নাজেহাল হয়ে যাবে। এইটাই মনে হয় আমাদের সব চেয়ে বড় শিক্ষা হওয়া উচিত, গত ইংলণ্ড দলের ও ভারতীয় দলের খেলার ক্লাফল থেকে।

বাই হোক এখন হকিতে আসা যাক। কলকাতার হকি লীগের গ্রহসন্ প্রায় শেষ হয়েছে। গ্রহসন কেন বলছি সেটা হয়ত পাঠকদের বুঝতে কষ্ট হবেনা খেলার ফলাফল থেকে। মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল এই দুই দল এতই শক্তিশালী হয়েছে যে অন্তান্ত দলকে ৪।৫ গোলে থেকে জয় করে ১৫ গোলে পর্যন্ত হারিয়েছে। এই খেলায় কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। আছে কেবল গোলের সংখ্যা এবং হ্যাটট্রিকের সংখ্যা নিয়ে ছুটি দলের মধ্যে রেষারেষি। একটানা জিত দেখে দেখে সকলে যেন ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাই হকির মাঠে বসে হকির চেয়ে অন্তান্ত খেলাধুলা, বিশেষ করে ফুটবলের আলোচনাতেই বেশী উৎসাহ দেখা গিয়েছে। কলকাতার হকি লীগ বন্ধ করে গোল্ডকাপ খেলতে গিয়েছে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও কাষ্টমস্। এখানকার মাঠে আর কোন লোক সমাগম নেই তখন। অবশ্য মোহনবাগান বাজিমাং করে এসেছে গোল্ডকাপ জয়ী হয়ে। অগণিত সমর্থকদের খুসীও করেছে। কিন্তু সত্যই কি তারা খুসী হয়েছে এই অভূতপূর্ব সাফল্যে? বাঙ্গলার টিমের তথা এই বৎসরের শ্রেষ্ঠ টিমের সর্বপ্রথম বিজয় কাছিনীর সঙ্গে

মিশিয়ে আছে এই দুঃখ যে, হায় আজকের অতি নিম্ন স্ব-
বাস্তবতার মোহনবাগানের দলে একটিও বাঙ্গালী
খেলোয়াড় নেই।

গোল্ড কাপের পর আগাখান্ কাপেও মোহনবাগান
যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে এবং শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব
পুলিসের সঙ্গে ফাইনালে সমান সমান ভাবে লড়ে টেসে
জয়লাভ করে প্রথম ছয়মাসের জন্য ট্রফি রাখবার
অধিকারী হয়েছে। বাঙ্গলার হকির দিক দিয়ে এ এক
অভূতপূর্ব ঘটনা।

বোম্বাই থেকে ফিরে এসে আবার পুরোদমে
কলকাতার হকি লীগ খেলায় যোগ দিয়েছে মোহনবাগান,
ইষ্টবেঙ্গল ও কাষ্টমস্। কাষ্টমস্ এখানে ঘুরে এসেই পর
পর দুটি খেলায় হেরে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের থেকে
অনেক পিছিয়ে গিয়েছে। বি. এন. আর. দল মোহন-
বাগানকে এক গোলে হারিয়ে মোহনবাগানের লীগ
বিজয়ের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে এবং নিজেদের
দলকে Fighting line এ নিয়ে এসেছে। কিন্তু এর
পরের খেলাতেই ইষ্টবেঙ্গলের কাছে এক গোলে পরাজিত
হয়ে লীগ বিজয়ের আশা ত্যাগ করতে হয়েছে তাদের।
এর পর যুদ্ধে থাকল ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এবং এই
দুই দলের খেলার কলাফলের জন্য অগণিত সমর্থকেরা
অপেক্ষা করে রইল রুদ্ধনিশ্বাসে। লীগের নিষ্পত্তি হওয়ার
পূর্বেই কিন্তু শেষ হ'ল বাইটন কাপের। এখানেও
মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল। ফুটবল খেলাও এসে গিয়েছে
এরি মধ্যে। ফুটবল বন্ধ করে হ'ল বাইটন কাপের
ফাইনাল খেলা। গত বৎসরের
চ্যাম্পিয়ন সেন্ট্রাল রেলওয়ের বিজিতা
মোহনবাগানকে আটকে রাখলো
ইষ্টবেঙ্গল দল এবং অতিরিক্ত
সময় খেলিয়েও খেলাটি অমীমাংসিত-
ভাবে শেষ হোলো, কোনও পক্ষেই
কোনও গোল না হয়ে। খেলার
শেষে টেসে জয়ী হয়ে মোহনবাগান-ই
বাইটন কাপ প্রথম ছ'মাসের জন্যে
রাখার অধিকারী হল। হকির তিন

মুন্ট যথা বোম্বাই-এর গোল্ডকাপ, আগাখান্ কাপ ও
বাঙ্গলার বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় জয়ী মোহন-
বাগানের জয় জয়কার হল চারিদিকে। চতুর্থবার বাইটন
কাপ বিজয়ী মোহনবাগান একই বৎসরে ত্রিমুন্ট বিজয়ের
এক অভূতপূর্ব রেকর্ড-এর সৃষ্টি করল।

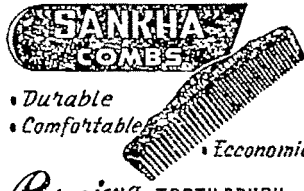
তারপর এলো সেই 'কালো দিন'—যেদিনের স্মরণায়
সকালে সুর হোলো হকি খেলার; শুধু হকি খেলা বা
বলি কেন, সব খেলাধুলার মৃত্যুপথের সঙ্কেত। লীগের
ফাইনাল খেলা পর্য্যবসিত হল দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তা-
রক্তিতে। ওষেটার্ণ রেলওয়ে ও মোহনবাগানের বাইটন
কাপের দাঙ্গা-মারামারির তাজা রক্তে ভেজা মাঠেই
আবার রক্ত বইল ১৪ই মে সকালে অস্থিহীত লীগের
অন্তিম খেলায়। হকি ষ্টিক মারণ অস্ত্রে পরিণত হল।
খেলোয়াড়দের মাথা হোলো বল। যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত
হোলো মোহনবাগান—সি. এক. সি. মাঠ। কেউ
হারবে না, ছ' দলকেই জিততে হবে। খেলার স্মহান
আদর্শ খুলিয়া করে দিলো ভারতের শ্রেষ্ঠ দুই দলের
খেলোয়াড়রা। লজ্জায় মুখ জুকালো ক্রীড়ামোদী
সমর্থকেরা। ১৯৬৪ সালের কলকাতা হকি লীগের
চরম খেলার এই শোচনীয় পরিসমাপ্তির সঙ্গে শেষ হল
মাঠের ডাঙাবাজির খেলা। এর জের কোথায় গিয়ে
হাজির হবে সে কেউ বলতে পারে না। ভারতের
জাতীয় খেলা হকির এই দিন অপমৃত্যু ঘটেছে বললেও
অত্যুক্তি করা হয় না।—১৮।৫।৬৪।



**POLYTHENE
PIPES**

- Light Flexible
- Non-Corrosive
- Acid Proof

P.V.C. PIPES.



**SANHUA
COMBS**

- Durable
- Comfortable
- Economic

Purvima TOOTH BRUSH

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

ESTD. 1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO. 10813

মহাজীবন

হে মহাজীবন — রচয়িতা : শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : অনগারিক ধর্মপাল জন্মশতবার্ষিকী কমিটির পক্ষে শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ। ৪।এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

বিগত শতাব্দীতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হবার পর এল খৃষ্টান মিশনারীর দল। যীশুর বাণী প্রচার করে, খৃষ্টধর্ম দীক্ষিত করে, এরা পাশ্চাত্য ভাবধারার বীজ রোপন করল জনমনে। সিংহলেও এর ব্যতিক্রম হল না। পাশ্চাত্যের শিক্ষা, ধর্ম ও আদব-কায়দা দেশকে গ্রাস করল। সিংহলের স্বাভাবিক, ধর্ম ও সংস্কৃতি তখন বিলুপ্তির পথে। ত্রিক এ সময় স্বতন্ত্রাচারের সিংহলের দিগন্তে দেখা দিল আলোর রেখা। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বরের রাতে যে শিশুর জন্ম হল, পরবর্তী যুগে বিশ্ব ভাকে জ্ঞানল বোদ্ধনেতা অনগারিক ধর্মপাল নামে। শৈশবে তাঁর নামকরণ হয় সে যুগের প্রচলিত কাব্যধা—ডু ডেভিড। শৈশব কেটেছিল বৌদ্ধধর্মপ্রাণী পিতামাতার রচিত পরিবেশে। শিক্ষালভ করলেন খ্রিস্টান স্কুলে। বর্মভাব ছিল তাঁর সহজাত। উত্তবোস্তব তাঁর ধর্মের পিপাসা বৃদ্ধি পেতে লাগল। বৌদ্ধধর্ম প্রচার করবেন এই হল তাঁর স্বপ্ন। সরকারী শিক্ষাবিভাগে চাকরীতে ইস্তফা নিয়ে মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন দেশ ও ধর্মের সেবায়। প্রথমেই বর্জন করলেন ইংরাজী অমুকরণে রাখা নিজের নাম। নাম গ্রহণ করলেন 'ধর্মপাল'। প্রবর্তন করলেন সিংহলের আধুনিক জাতীয় পরিচ্ছদ। এর পর তাঁর জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন কর্মের ইতিহাস। ধর্মপালের অঙ্গার পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হল ভাবতীর মহাবোধি সোসাইটি। বুদ্ধের দেশে যেসব বৌদ্ধতীর্থ এতদিন ছিল অনাদৃত তারা উদ্ধারলাভ করল। অনগারিক ধর্মপাল এ যুগের প্রথম বৌদ্ধ ধর্মব্রূত, যিনি সারা বিশ্ব পরিভ্রম্য করে প্রচারের জন্ত বিশ্বের ঘরবাড়ি ঘোর ঘুরণে আসন স্থাপন করে এলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের উনত্রিশে এপ্রিল এই মহাপ্রাণ নির্বাণ লাভ করেন।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীতারশঙ্কর আলোচ্য পুস্তকতে এই 'মহাজীবন' কাহিনী বিবৃত করেছেন। তাঁর অনুপম ভাষা-ভূষিত স্পর্শে এই মহাজীবনের সার্থক রূপ পাঠকের মনস্তক্ষে উদ্ভাসিত হয়েছে।

বাংলা-জীবনী-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'হে মহাজীবন' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আগামী বৎসর মহাপ্রাণ ধর্মপালের জন্ম-শতবার্ষিকী। এই উপলক্ষে অনগারিক ধর্মপাল-জন্মশতবার্ষিকী কমিটি পুস্তকটি সাধারণ্যে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করে সযত্ন জনসমাজের দৃষ্টিবাহারী হলেন। পুস্তকটি মূল্য পাঁচপাচোশোভন।

রতি বিলাপ—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। প্রকাশক—শ্রীঅশোককুমার ধর; ৯ ককিরচাঁদ মিড স্ট্রীট, কলিকাতা-২। মূল্য—দুই টাকা মাত্র।

উপজ্ঞাসটির পটভূমিকার আঁকে চিত্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকাল। সোমদেব, ভীষ্ম, বিদিশা আর হুমিতা—এ উপজ্ঞাসের প্রধান চরিত্র। এদের জন্মের সমস্তা আর জীবনের সমস্তা উপজ্ঞাসটির প্রধান উপজীব্য। উপজ্ঞাসকার হৃদয়ভাবে চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। হৃদয়বিশিষ্ট চরিত্রগুলির পরিণতি হুঁ।

বসন্তোৎসবের দিন বিদিশাকে দেখে মুগ্ধ হল সোমদেব। ওঁর ঘনিষ্ঠতা যখন চরমে তখন জানা গেল হুমিতা সোমদেবের বান্দবতা। শুক হল জীবনের বন্য। হুমিতা আর বিদিশা—কাকে সে বেছে নেবে জীবনসঙ্গিনী রূপে? উপজ্ঞাসকার অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনীকে পরিণতির পথে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তের প্রেম এ পরিণতিতে সাহায্য করেছে। হুমিতা চরিত্রটি ধীরেন্দ্রবাবু অনবদ্য। হুঁ। জীবন চরিত্রের মহৎ পাঠকে মুগ্ধ করে। লেখক হুমিপুত্র ভাষা-ভূষিকার সেকালের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। গতিশীলতা উপজ্ঞাসটির প্রধান গুণ। বিদিশা ও সোমদেবের মিলনের চিত্রটি আর একটু হৃদয়ভাবে বর্ণিত হতে পারত। উপজ্ঞাসটি হৃদয়পাঠ্য। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

বাজিমাৎ—লেখক : শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত। প্রকাশিকা : শ্রীমতী প্রতিমা দেবী। ৫১, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—১'৫০ ন.প.।

'বাজিমাৎ'-এর লেখক নিবেদন করেছেন তিনি ছেলেবেলা হতে সজ্ঞার কবিতা ও ছড়া পড়তে ভালবাসতেন। তাঁর এই ভালোবাসাই 'বাজিমাৎ' রচনার মূলে কার্যকরী হয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য—শিশুদের আনন্দদান করা। এ উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে সফল। প্রতিটি কবিতা ও ছড়া শিশুদের আনন্দ দেবে। প্রতিটি রচনার সাথে ছবি থাকায় কবিতাগুলি আরও উপভোগ্য হয়েছে। 'বাজিমাৎ' যে শুধু ছোটদের আসরে বাজিমাৎ করেছে তা নয়, বড়রাও পড়ে আনন্দ পাবেন। ছবিগুলি সুন্দর। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

ভারত শিল্প নিকেতন
আধুনিক ; সম্পূর্ণাঙ্গ ; নির্ভরযোগ্য
বুক বাইণ্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার বাবতীয়
বাঁধাই কাজ সস্তার ও সুলভে সম্পন্ন হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫৬ নং সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-২

ডি.রতন ও কোং

ফটোগ্রাফার্স

১১১, কলকাতা-১১, কলিকাতা

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

সাময়িক

প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়ী উৎসব :

একত্রিশে বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথি হইতে ৩২ তম বর্ষীয় প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী শুরু হইয়াছে এবং ১২ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত ইহা স্থায়ী হইবে। এবার প্রদর্শনী বিভাগে লিপি, তথ্য ও দৃশ্যযোগে 'মৃত্যু সঙ্কেত বাঙালী' শীর্ষক বাঙালী জাতির জীবন মরণ সমস্তার চিত্রটি উৎসাহিত হইয়াছে। বারান্তরে এই উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিতব্য।

ভারতমাতার পূজা :

ভারতজননীকে উদ্দেশ্য করিয়া বাংলাদেশে কবি-সাহিত্যিকের বর্ষ বন্দনামুখর হইয়াছে, কিন্তু মূর্তি গড়াইবা ও তাহাতে প্রাণসঞ্চার করিয়া নাড়ঘর পূজার আয়োজন এ পর্যন্ত কোথাও হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। গত ১৪ই মে অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ১৭ই মে পর্যন্ত কোরগর দেবসভ্য মঠে ব্যাপকভাবে নিবিড় নিষ্ঠার সহিত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে ভারতমাতার পূজা, হোম ইত্যাদি এবং সম্মানসমিতি অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দেবসভ্য মঠের প্রতিষ্ঠাতৃ-শ্রদ্ধাশ্রম নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর ধ্যান-সমাহিত চিন্তে ভারতমাতার মূর্তি উদ্ভাসিত হু। পূজার উদ্দেশ্য : এই পূজার "হোম শিখাই একদিন দাবানলেব ছায় শত সহস্র শিখার জলিয়া উঠিবে সমস্ত ভারতবাসীর অন্তরে অন্তরে ও বিবে।" জাগরণের শুভ ময়ে পুনঃ মায়ের বোধন করা হয়। আশা করা যায়, অনতিদূর আগামীকালে সরস্বতী পূজার স্থায় হিন্দু বাঙালীর ঘবে এই ভারতমাতার পূজা প্রবর্তিত হইবে।

মেঘ-কামান :

সম্প্রতি সোবিয়ৎ বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপারে তুষার বজা সৃষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহার ফলে অমর্যব জমিতে ফসল উৎপাদন সম্ভব হইবে। ইহা ছাড়া, তাহারা এমন একটি বিশেষ ধরণের কামান আবিষ্কার করিয়াছেন বাহা কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছুঁড়িয়া মরিয়া বিমান বন্দরের আকাশের মেঘপুঞ্জ ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে পারে। ইহার ফলে সকল ঋতুতেই বিমানসমূহের উড়ানামা সম্ভবপর হইবে।

প্রেম মন্দিরে অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা :

বাংলাদেশে অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের মূর্তি ও পূজা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। রিবড়া প্রেম মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতৃ-শ্রদ্ধাশ্রম সিদ্ধ সাধক শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্তিব কল্পনা ধ্যানে লাভ করিয়া গত ১১ই মার্চ, ১৩৭০ আনুষ্ঠানিকভাবে পুণ্যসলিলা জাহ্নবীতীরস্থ প্রেম মন্দিরে এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনদিন ব্যাপী প্রতিষ্ঠোৎসবে বখাশান্ত বেলোজ কল্লভা এবং শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতা, কুমারী, বটুক ও অস্ত্রাস্ত্র গ্রামদেবতার পূজার্তনাও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হু। দূরদূরান্তর হইতে বহু লোক সমাগমও হয়। এই প্রেম মন্দিরের অর্দ্ধনারীশ্বর বিগ্রহ বাংলাদেশে অজ্ঞতম দ্রষ্টব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, এ আশা করা যায়। প্রবর্তকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত রচনা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ :

বিলম্বিত হইলেও এই পরিষদের সাম্প্রতিক ৩২ তম অধিবেশন নানা কারণে উল্লেখ্য। গত ১১ই হইতে ১২-এ মাঘ এই ২ দিন ব্যাপী কলিকাতার ষারভাঙ্গা হল, ইন্ডেন্টস্ হল প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিশিষ্ট স্থানে ইহার ৩২তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বহু গুণী, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সব অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করেন। এই উপলক্ষে প্রদর্শনী, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন, জনশ্রিয় বক্তৃতা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা ছিল। আয়ুর্বেদকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার এই দীর্ঘ প্রয়াস নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। এই বিজ্ঞান পরিষদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আয়ুর্বেদকে বানিকটা যুগ-সজ্জিত দিতে পাবিয়াছে, ইহা বিনা বিতর্কে বলা চলে। কবিরাজগণ এখনও গভীরমুগ্ধক অনড়তা কাটাঁইবা ঐশ্যবদ্ধ হইতে না পারায় বিজ্ঞান-পরিষদের দ্ব্যর্থ প্রযুক্ত আশাভূত ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। পরিষদের অতিষ্ঠতা সভাপতি কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, ডঃ মৃণালীমোহন ঘোষ (অধ্যাপক, কবিরাজ) ও কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মলিক আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের প্রাণধরপ। তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিষ্ঠা ও শ্রম প্রতিষ্ঠানটিকে এ যাবৎ অগ্রবহ করিয়া লইয়া চলিয়াছে বলা যায়।

একটি দৃষ্টান্তস্থানীয় শ্রায় বিচার :

নবীশ-কুমুনগরে সার্কিট হাউসের ব্যাপার লইয়া স্থানীয় সাব জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে যে অশোভনীয় আচরণ দেখা গিয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে রায় বিধাছেন এবং আদালত অবমাননার দায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে কঠোরতম ভাষায় তিরস্কার করিয়া তাহাকে ১৫ দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অবশ্য তাহাকে সশরীরে জেলে গিয়া দণ্ড ভোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের এই রায় সম্ভবতঃ অকৃতপূর্ব। ইহা হাইকোর্টের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই বৃদ্ধি করিবে।

“সদীতশ্রী” “রবিদীপ্তি” ও “ছন্দশ্রী” :

বিগত ২৭শে এপ্রিল সোমবার প্রখ্যাত সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষারতন ছন্দগীতিকার ১৯৪০ সালের গবর্ণমেন্ট অম্বুমোদিত ডিপ্লোমা ‘সদীতশ্রী’ ও ‘রবিদীপ্তি’র অন্ত পত্রীকা ত্র্যক্ষরপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ‘সদীতশ্রী’ উপাধি পরীকার ১ম বিভাগে শ্রীমতী মীরা চক্রবর্তী, ২য় বিভাগে জয়শ্রী

উৎসব অনুষ্ঠানে -

ইন্দ্রবাসুদেব

অপরিত্যজ্য

৮৬, আমহার্ট স্ট্রীট কলি: ১ ফোন - ৩৫-১৩৮৩	৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২ ফোন - ৩৪-২৫৩৩
---	---

ভট্টাচার্য, রমু দাস, ইন্দিরা পাল ও প্রণতি চ্যাটার্জী, তৃতীয় বিভাগে হেনা কাল্লিলাল এবং “রবীন্দ্রপুত্রি” ডিমোমা পরীক্ষার ১ম বিভাগে রূপা মতিলাল ও ২য় বিভাগে গীতালি হোড় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষক হিসাবে সর্বশ্রী কমলা বসু, প্রফুল্লরঞ্জন রায়, হরহররঞ্জন রায়, হিমময় রায়চৌধুরী ও অধ্যক্ষ নরীমোপাল সিং উপস্থিত ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যাউতে পারে যে, এই বৎসরই প্রথম ছন্দনগীতিকার হইতে উপরোক্ত ছইজন ছাত্রী “রবীন্দ্রপুত্রি” ডিমোমা লাভ করিলেন। এ বৎসর কুমারী অমরতী বানার্জি নৃত্যে “ছন্দশ্রী” উপাধি লাভ করিয়াছেন। আমরা উত্তরোত্তর শিক্ষায়ত্তনের অগ্রগতি কামনা করি।

জর্দা শিল্প :

ভারতে বাণশাহী আমলের খোসমেজাজী স্থতি বহন করিয়া আজও যে কয়টি বিসাদোপকরণ শুধু ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়, জনপ্রিয়

হইয়া বিद्यমান তার মধ্যে জর্দা প্রধানতম বলা যায়। রকমারী জর্দা শিল্পের প্রধান কেন্দ্র কাশ্মীর। মাঝে ভারতের তীর্থ যাত্রীদের বাণেশ্বরী বিশিষ্ট ক্রয়যোগ্য বস্ত্র হইতেছে জর্দা। বাংলা দেশে কলিকাতা মহানগরীতে এই জর্দা শিল্পের সম্প্রতি কিছুটা প্রস্তুতি-উদ্যোগ দেখা গেলেও, পশ্চিম প্রদেশ বিশেষ কাশ্মীর ইহার আকর স্থান বলা চলে। বহু প্রতিষ্ঠান এই রকমারী জর্দা শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া ব্যবসারে রত। ইহার মধ্যে ১৮৯৫ সালে স্থাপিত বাদলরাম লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠানের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নানারকম সুগন্ধ ও ভেষজ অর্থাৎ সন্নিবেশে প্রস্তুত সূতি জর্দা, কিম্বা ও যাবতীর পানের মশলা বিশেষ উল্লেখ্য। আমরা ভারতের এই স্বকীয় শিল্পটির উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করি।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল, আলোয়ান ও হোসিয়ারী পোষাক বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা ফোন : ৩০-২৩০৩

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্ম

রামকানাই নেভিক্যান ষ্টোন্স

১২৮/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

আর মিদের

স্মারক

তিল তৈল



বিশুদ্ধ ও সুগন্ধিযুক্ত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃস্রোত অস্থিতীয়

সর্বপ্রকার রোগের উপর প্রতিকার

শ্রীবহ্নিমচন্দ্র সেন প্রণীত
গীতামাধুরী—১২-০০

(শ্রীমদ্ভাগবতের মত ও পঞ্চ
অম্বরপে সর্বপ্রথম গীতার
অম্বরপ ব্যাখ্যা)

জন্মমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে—
প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে
প্রাপ্তব্য।

এস. চন্দ্র এণ্ড কোং

সর্বরকম সঙ্গীতপুস্তক ও যাবতীয়
বাণ্যযন্ত্রের পাইকারী ও খুচরা
বিক্রেতা।

৪, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলি-১০

সম্পাদক : শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাকটোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণ্ঠরঞ্জন রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

প্রবন্ধ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

জীবনের আলো

গীতার ভগবান বলিয়াছেন—“ধর্ম সংস্থাপনার্থ্য সত্ত্বামি যুগে যুগে”—ইহা ধর্ম সংস্থাপনের কথা। ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ইহা নহে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর কণ্ঠে এই বাণী উচ্চারিত হওয়ায় যুদ্ধ জয়ে রাষ্ট্র লাভেরই কথা ছিল। সে রাষ্ট্রকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠা দিবার সঙ্কল্প লইয়াই যে গীতার ভগবান অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন—তাহা সহজেই অসম্ভব। এই ধর্ম হিন্দু ধর্ম কি হিন্দুত্বের জাতির ধর্ম—গীতার ভগবান তাহা বলেন নাই—তিনি শুধু ধর্মের কথাই বলিয়াছেন। অতএব আমরা যদি বলি, যে ধর্মের ভিত্তির উপর জাতি ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইবে তাহা নির্বিশেষ ধর্ম—তাহা হইলে বোধ করি অযৌক্তিক হইবে না। তথাপি প্রশ্ন উঠিবে—জাতিবৈষম্য থাকিতে ধর্ম নির্বিশেষ কেমন করিয়া হইবে? ধর্ম বলিতেই বা কি বুঝায়? ধর্ম বড় না জাতি বড়? ধর্ম বলিতে কি বুঝায় সর্বত্র তাহাই দেখা যাক—ধৃ+মন=ধর্ম, যাহা ধারণ করিয়া আছে। কাহাকে ধারণ করিয়া আছে? বিশ্বকে, বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ—মানব, মানবের জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র সব কিছুকেই। কি করিয়া ধারণ করিয়া আছে? গুরু, মন্ত্র ও প্রতিমা এই তিনটি বস্তুর সহায়ে। ইহা শুধু হিন্দুর সংস্কৃতি নয়, হিন্দুত্বের সকল জাতিরই ইহা আশ্রয়স্থল। মুসলমানেরও আছে—মহম্মদ গুরু, কোরাণ মন্ত্র, মুসলমান জাতি প্রতিমা। সেইরূপ খৃষ্টানজাতিরও যীশু, বাইবেল আর খৃষ্টানজাতি। ইহা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রযোজ্য। গুরু, মন্ত্র ও প্রতিমা তিন কোণ জাতি জাতিক্রমে দাঁড়াইতে পারে না। এই দিক দিয়া ইহা বিশেষিত ধর্ম হইলেও আসলে কিন্তু নির্বিশেষ ধর্মই। ইহা মনঃকল্পিত বাণী নহে—বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্য। তারপর ধর্ম বড় কি রাষ্ট্র বড়? যদি রাষ্ট্র বড় হয়, তবে রাষ্ট্রের জন্ত ধর্ম অবশ্যই পরিত্যক্ত। আর ধর্ম বড় হইলে রাষ্ট্রের বর্জনও বাঞ্ছনীয় হইবে। গীতার বাণী হইতেই পাওয়া যায়—“অধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ, পরো ধর্ম ভয়াবহঃ”। ধর্ম যদি বড় না হইবে, তাহার জন্ত মৃত্যু শ্রেয়ঃ বলা হইবে কেন? এই দিক হইতে ধর্মের জন্ত রাষ্ট্রের বর্জনই শ্রেয়ঃ মনে হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ কি দেখা যায়? রাষ্ট্র না থাকিলেও ধর্ম রক্ষা হয়। কিন্তু ধর্ম না থাকিলে রাষ্ট্র রক্ষা হয় না। সুতরাং ধর্ম বড় বলিয়াই ধর্মের জন্ত রাষ্ট্র গঠন সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। আর ধর্মরাষ্ট্র গঠনের প্রতিজ্ঞা ধর্মপ্রাণ জাতি মাত্রেরই অবশ্য গ্রহণ করা উচিত। দান, দয়া, ক্ষমা, সহনশীলতা, প্রেম, ঐক্য প্রভৃতি ধর্মের গুণগুলি যদি রাষ্ট্রজীবনে না থাকে, তাহা হইলে সে রাষ্ট্র তো আনুগতিক রাষ্ট্র নামে অভিহিত হইবে। গীতার ভগবান চাহিয়াছেন ধর্ম সংস্থাপন তথা ধর্ম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। গীতার দেশের মানুষ—গীতার ভগবানের বাণী-ধর্ম অন্তর দিয়া অনুভব করুক—জীবন দিব্য হইবে, ভাগবতময় হইবেই।

(পুরাতন প্রবর্তক হইতে)

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং । সপ্তত্রিংশৎ সূক্তং ।) নবমী ঋক্

(সঙ্কগুরু শ্রীমতিলালের ভীষনভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্তস্তুতীর্থ

স্থিরং হি জ্ঞানমেবাং বয়ো মাতুর্নিরেতমে ।

যৎসীমহু দ্বিতা শবঃ ॥ ৯ ॥

অর্থ—“এবাং” (মরুদেবগণের) “জ্ঞানং” (জন্মস্থান) “স্থিরং হি” (স্থির, নিশ্চল অর্থাৎ চলনরহিত) “মাতুঃ” (মাতৃস্থানীয় সেই জন্মস্থান হইতে) “বয়ঃ” (শক্তি বা তেজ পদার্থ) “নিরেতবে” (নির্গমন করিতে সমর্থ হয়) “যৎ” (যে) “শবঃ” (বল বা শক্তি) “হু” (যথাক্রমে) “দ্বিতা” (দ্বাবাপৃথিবী অর্থাৎ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে) “সীং” (সর্বতোভাবে) [পরিব্যাপ্ত আছে] ॥ ৯ ॥

সরলার্থ—মরুদেবগণের জন্মস্থান, স্থির, অচঞ্চল । মাতৃস্থানীয় সেই জন্মস্থান হইতে শক্তির আবির্ভাব । যে শক্তি যথাক্রমে স্বর্গ ও পৃথিবীতে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ॥ ৯ ॥

বিশদার্থ—“জ্ঞানং” পদটি ‘জাত হয় ইহাতে’ এই ব্যুৎপত্তিতে “জান” শব্দে অন্তরীক্ষ বুঝায় । আচার্য্য সায়ন ইহাকে আকাশ নামে অভিহিত করিয়াছেন । শাস্ত্রেও আছে—“আকাশঃ বায়ুঃ, বায়োরগ্নি, অগ্নেঃ আপঃ, অস্ত্যঃ পৃথিবী”—আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি অর্থাৎ তেজ, তেজ হইতে অপ্ অর্থাৎ জল, জল হইতে পৃথিবী—এই পঞ্চ মহাত্মকে সৃষ্টির বিলোমক্রম বলা হয় । অহলোমক্রমে বলা যায় “ক্ষিতাপতেজোমরুৎ-ব্যোম” । অহলোম ও বিলোম উভয় ক্রমেরই পাঁচটি তান্মাত্রিক গুণ আছে—তাহাদিগের নাম যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ । আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, তেজের গুণ রূপ, অপের গুণ রস এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ । এই পাঁচটি তান্মাত্রিক গুণ, পঞ্চ মহাত্মতে নিত্য ধর্মরূপে বর্তমান থাকে—ইহা আর্য্য ঋষিদের মত । আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মত নহে । আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত এই যে—“শব্দ আকাশের কোন গুণ নয়, পদার্থের অভিঘাতের ফলে বায়ুমণ্ডল হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় । স্পর্শ স্থূল পদার্থের সহিত স্তগিস্থিরের সংযোগে জাত । রস আশ্বাদনীয় স্থূল পদার্থের মধ্যে বস্তুকণারূপে থাকে । গন্ধও বস্তুকণা মাত্র । ইহারা কেহই সাক্ষাৎ তেজঃ প্রবাহ নহে । শুধু রূপনামক বিষয়কে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তেজঃ প্রবাহ বা রশ্মি প্রবাহ বলা যায় ।” আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মত যাহাই হউক—আমরা ভারতীয় ঋষিদের যোগ সাক্ষাৎকৃত সত্যকেই স্বীকার করিব । তাহাদের দৃষ্টিতে আকাশ ভূতচতুর্ভূতের জননী । কারণ আকাশ শূন্য পদার্থ নয়—ইহা অপ্রবাহিত তেজঃ পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ । ভারতীয় ঋষিরা এই তেজঃ পদার্থকেই “জসরেণু” নাম দিয়াছেন । “জস দীপ্তৌ দীপ্তিশীল রেণু—জসরেণু ।” জসরেণু প্রবাহধর্মী । এই ধর্ম্মাছুযায়ী শব্দ আকাশে নিত্য ধর্মরূপে অবস্থিত ; আকাশের এই শব্দগুণ হইতেই বায়ুর উৎপত্তি । ঋষি তাই বলিতেছেন—“এবাং” মরুতাম্ “জ্ঞানং” জন্মস্থানম্ আকাশং বা “স্থিরং হি”—এই সকল মরুদেবগণের জন্মস্থান যে আকাশ, সেই আকাশ স্থির, নিশ্চল । “বায়ুঃ মাতুর্নিরেতবে” মাতৃস্থানীয়া । সেই আকাশ হইতে নিত্য তেজঃ পদার্থসমূহ নির্গত হইতেছে । এই তেজঃ পদার্থ দ্বারা “দ্বিতা” দ্বাবা পৃথিবী সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের পদার্থ বিশ্লেষণে যাহা “পজিট্রন” (positron) নামে খ্যাত—ঋতির ভাষায় সম্ভবতঃ তাহাই তেজ বা অগ্নি নামে অভিহিত । এই তেজস বায়ুঃ হইতেই বাক্যসমূহ ও অপ্ সমূহের উৎপত্তি । কেমন করিয়া ? পরবর্তী মন্ত্রে তাহা ব্যক্ত হইবে ।



শ্রীনেহেরু-প্রশস্তিঃ

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

অল্পপমগুণরম্যং দিব্যভাবৈবকরেণ্যং
নিখিল-মহুজ-মাত্মং শান্তি সেবা-সুধতম্ ।
জগতি বিদিত কীর্ত্তিং সর্বদা সৌম্যমুত্তিং
নম নম জহরাখ্যং নায়কং ত্যক্তকায়ন্ ॥১॥

নেহেরুবংশতিলকং মতিমন্তুমার্যং
ভুলোকভূতিনিলায় প্রার্থিতং স্বকার্ষ্যে ।
পুণ্যং মহুষ্মনিকরার্চনকীর্ত্তিধন্যং
নেতারমাণ্ডবিভমং নম শান্তসৌম্যম্ ॥২॥

অমরনিলায়তং দিব্যদেহং প্রশান্তং
ভরত রচিত দেশস্তাচনেতারমাণ্ডম্ ।
জহরমতিমহুজং সর্বলোকেষু পূজ্যং
নম নম নম ভক্ত্যা মন্ত্রিণং মন্ত্রমুত্তিম্ ॥৩॥

জয়তু জয়তু পৃথ্ব্যাং শান্তিবাণী সুপূতা
দলতু দলতু হিংসাং বিশ্বমৈত্রী বরেণ্যা ।
প্রসরতু ভুবি পুণ্যা লোকসেবাতিথন্যা
হরতু জহরকীর্ত্তিঃ কল্মষং নো ধরায়াঃ ॥৪॥

নেহেরু নাই

শ্রীজগন্নাথ সাহা, এ্যাডভোকেট

২৭শে মে বুধবার বেলা দেড়টা। হাইকোর্ট বার
লাইব্রেরী হলে বসিয়া গল্পে মাতিয়াছি। অল্প বয়সী
একজন এডভোকেট আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—

—“খুব তো গল্প চলেছে—খবরটা জানেন?”

“হাসি থামাইয়া প্রশ্ন করিলাম—” কী খবর ভাই?—”

—“Neheru's condition grave”

তিনিয়া চমকিত হইলাম। কে খবর দিয়াছে, কে কোথায়
তিনিয়াছে—পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতেই মিনিট
পনের কুড়ি কাটিয়া গেল। একটু পরেই অপর একজন
এডভোকেট আসিয়া বলিলেন—

—“Neheru is sinking.”

চমকিয়া বললাম—“সে কি! কোথায় শুনলেন?”

—“এইতো P. T. I. office-এ—”

মনটা কেমন হইয়া গেল। থাকিতে পারিলাম না। কাগজপত্র গুটাইয়া P. T. I. অফিসের দিকে ছুটিলাম। দেখিলাম নিঃশব্দ জনশ্রোত। অগণিত মানুষের শব্দহীন ডেউ যেন P. T. I. অফিসের দরজায় আছাড় পড়িতেছে। আসিতেছে আরও আসিতেছে। সকলের দৃষ্টি অফিসের দরজার উপরের দিকে নিবদ্ধ। সকলেই নীরব। আমিও নীরবে উপরের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম ছোট একখানি কাগজে লাল পেন্সিলে লেখা—“Neheru dead.”

কী যেন হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া জনশ্রোতের পাশ কাটাইয়া ধীর মন্থর গতিতে বাড়ীর দিকে পা বাড়াইলাম। প্রিয়জন বিয়োগ ব্যথার এক নূতন অহুভূতি যেন সমগ্র মনটাকে আচ্ছন্ন করিল। টেলিপ্রিন্টারের শব্দের মত কে যেন বার বার কানে কানে বলিতে লাগিল—“Neheru dead, Neheru dead.” বেদনার এই কথাটা যেন কোনমতেই নিঃশেষ হইতে চাহে না। আজও ভাবিতেছি—এ কোন নেহেরু? কে এই নেহেরু? বাহার কথা চিরদিন সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় সাংবাদিকের লেখনী কতবার কত ভাবে প্রকাশ করিয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে আজ সেই সংবাদপত্রের অফিসের দরজায় দুইটা মাত্র কথা—

“Neheru dead.”

নেহেরুকে জীবনে বহুবার দেখিয়াছি। নেহেরুকে চিনি। আমার সেই পরিচিত নেহেরুই কি আজ মৃত? ১৯২৮-সালে কলিকাতা পার্ক সার্কাস ময়দানে দেখিয়াছি পণ্ডিত নেহেরুকে। এই কি সেই নেহেরু? ১৯২৯ সালে লাহোরে রাবী নদীর তীরে জাতীয় সভায় ভারতের পতাকা হস্তে যিনি দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—ব্রিটিশ-সম্পর্কশূন্য পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য—এই কি সেই নেহেরু? মন সায় দিল না। আরও এক বছর পরের স্মৃতিপট উন্টাইয়া দেখিলাম নৈনী তেলের কক্ষ-ভূমিতে শায়িত এক গৌরবর্ণ তরুণ—পণ্ডিত মতিলাল জালালার বাহিরে দাঁড়াইয়া বাহ্যকে দেখিয়া বিচলিত কণ্ঠে বলিতেছেন—Prince Jahar of India is lying

on the floor।” এই কি সেই নেহেরু? বাহার আকস্মিক মহাপ্রয়াণে সমগ্র জগৎ উদ্বেলিত হইয়াছে তিনি কি কেবল মাত্র চল্লিশ কোটি ভারতাবাসীর প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু? অথবা ভারত আবিষ্কারক পণ্ডিত নেহেরু? ২৭শে মে হইতে আজও ভাবিতেছি কে এই নেহেরু? কাহার মৃত্যু হইয়াছে? উত্তর আজও পাই নাই! উত্তর নাই বলিয়াই পাই নাই!

প্রধান মন্ত্রী প্রতি দেশেই থাকে। প্রতি দেশেই প্রধান মন্ত্রীর লোকান্তরও ঘটে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর লোকান্তরে রাজঘাটের যে ছবি সংবাদপত্রে দেখিয়াছি তাহা অবিস্মরণীয়। সম্মুখে অস্তিমশয়নে জহরলালের মরদেহ। তাহার পার্শ্বে বসিয়া লর্ড হোম, ডীন-রাস্ক, পামেলা, লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ইহাদের মুখগুলি দেখিয়া যেন মনে হইল ইহারা বুঝি পিতৃহীন হইয়াছেন! ইহাদের বুঝিবা মহাশয় নিপাত হইয়াছে! কেবিনেটের অস্থানিক পরামর্শের অপেক্ষা না রাখিয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রধান মন্ত্রী ছুটিয়া আসিয়াছেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন আসিয়াছেন ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজকীয় প্রতিনিধি হিসাবে। আসিয়াছেন রাশিয়ার সহকারী প্রধান মন্ত্রী, আসিয়াছেন বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কগণ। আমরা যে নেহেরুকে চিনিতাম তাঁহার তিরোधानে বিশ্ব-জগৎ এভাবে ছুটিয়া আসিবে তাহা আমরা জানিতাম না। অতএব P. T. I. অফিসের দরজায় বাহার সম্বন্ধে লেখা হইল “Neheru dead” তিনি যে কত বড় তাহাও জানিতাম না। তাঁহার মহাপ্রয়াণে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে বহু মানুষের ধারা প্রমাণ করিয়া দিল নেহেরু পণ্ডিত মতিলালের পুত্র ভারতের প্রধান মন্ত্রী ব্যারিষ্টার জহরলাল নেহেরু মাত্র নয়। তিনি আরও অনেক, অনেক কিছু—যাহা আমরা জানিনা, যাহা আমরা বুঝি নাই। তাঁহার সিংহাসন দিল্লীতে নয়—বিশ্বমানবের অন্তরে।

পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় ক্রমওষেল, নেপোলিয়নের মত বহু রাষ্ট্রনায়কের ছবি আমরা দেখিয়াছি। একজন রাষ্ট্রনেতা তাঁহার নিজের দেশে জনগণের এক বৃহৎ অংশকে কিছুদিনের জন্য পরিচালিত

করিয়াছেন ইহা আমরা জানি। কিন্তু একজন রাষ্ট্রনায়ক শুধু তাঁহার দেশের জনগণকে নয় সমগ্র বিশ্বের জনমনকে আকর্ষণ করিয়াছেন ইহা দেখি নাই—জানি না। রাজনীতির সংজ্ঞায় প্রবন্ধনার অর্থ কূটনীতি। হেন নীতি পরিচালন করিয়া সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ পৃথিবীর ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের মতো মহাপুরুষের পক্ষে মানুষকে পরকালের সন্ধান দিয়া আপন করিয়া লওয়া সহজ। কিন্তু রাজনীতির খেলাঘরে বিশ্বের কোটি মানুষকে এক আলিঙ্গনে আবদ্ধ করা অত্যাবশ্যিক। নেহেরুর জীবন এই নবীন প্রেমের নূতন দর্শন। ইহা আমাদের অভিভূত করে। তাই নেহেরু কী? ইহার উত্তর নাই।

নেহেরু এক পরম বিশ্বাসী। তাঁহার কর্মজীবন আরও বিশ্বাসাত্মক। বিশ্ব-রাষ্ট্রমঞ্চে দুই বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া শান্তির কথা বলিবার একমাত্র অধিকারী এই নেহেরু। মানুষ শান্তিকামী। যাহার বাহা আছে তাহা লইয়াই সে শান্তিতে বাঁচিতে চায়। এই বিশ্বের সাধারণ মানুষ আশায় বুক বাঁধিয়াছে

নেহেরুর দিকে চাহিয়া। তাহারা বিশ্বাস করিয়াছে নেহেরু থাকিতে বিশ্বের বুক ফুটবে দাবানল জলিবে না। আজ তাহারা মনে ভাবিতেছে—“Nehru dead” অর্থাৎ “Peace dead”—তাইতো এই বিয়োগ বেদনা!

নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? ইহার উত্তর—হিমালয় হইতে। নেহেরু তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? ইহার উত্তর—সমগ্র মানব জাতির অন্তর-উৎস হইতে। প্রেমিকের অন্তর, কবির মন, দার্শনিকের দৃষ্টি, বিপ্লবীর সাহস লইয়া গঠিত যে নেহেরু সেই জহরলাল আজ নাই। তাঁহার অমর আত্মাকে স্মরণ করিয়া এই বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করি—

“বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা

ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে ধারা

দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি—

সেখানে আমার প্রগতি দিলাম আনি।”*

* এই জুন শনিবার প্রবর্তক সাহিত্যক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত নেহেরু-স্মৃতিসভায় প্রদত্ত অভিজ্ঞাষণ।

নেহেরু ভগবানের বিশেষ বিভূতি

আচার্য্য শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু নাই। এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের তিরোধান। সারা দেশ সামগ্রিকভাবে শোকাচ্ছন্ন। সারা জগতে আলোড়ন। বিরাট কর্মবীরদের বহু গুণের সাথে দোষও অবশ্যই থাকে। বিশাল শক্তির সাথে কতক দুর্বলতাও থাকে। অনেক অসাধারণ কর্মের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তিও থাকে। ভগবানের বিধানই এতদ্রূপ। এসব মহান ব্যক্তি ভগবানের বিশেষ বিভূতি। এইসব ব্যক্তির দ্বারা জগতে ভগবান যেমন অনেক হিতকর কর্ম সংঘটিত করেন, তেমনি

অহিতকর কর্মও কতক কতক করান, Himalayan blunders-ও করান। কিন্তু মানব জাতির ইতিহাসে এঁরাই ভগবানের বিশেষ বিভূতি বলে গণ্য এবং চির-স্মরণীয়। এরপর দেশ ও জাতিকে ভগবান কোন্ পথে কোন্ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবেন এবং কাকে এমন বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন, তিনি জানেন। তাঁরাই ইচ্ছা জয়যুক্ত হবে। সব জাতির সব সভ্যতার, সব সম্প্রদায়ের উত্থান-পতনের তিনিই মালিক। (এ. কে. দত্তগুপ্তকে লিখিত ২১. ৫. ৬৪ পত্র হইতে সংকলিত)।

মহা প্রয়াণে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

জন্ম মৃত্যু হয় সকলের, মৃত্যু মানব ভুলেই রয় ;
মহান্ মৃত্যু হয় ক'জনের সবার যাতে দীর্ঘা হয় ?
দেশের ক'জন পুঙ্খ নারী মরলো শোকে, তোলার নয়।
পাঁচ মহাদেশ হয় শোকাকুল, সকল চক্ষু অশ্রুময়।

দুঃখদহন সইলো যেচে, হয়নি কিছু নশ্রশির ;
জীবিয়োগে, পিতৃশোকে, বন্দীশালায় গতিশির।
ভারতজাতি করলো গঠন, শিষ্যমহান্ গান্ধীজীর ;
নিরপেক্ষ বিশ্বপ্রীতি মন যাতালো ধরিত্রীর।

মানবজাতির বন্ধু পরম, গণতন্ময় মুখ্য প্রাণ ;
শৃঙ্খলিত দেশ-জাতিদের সহায় হয়ে হয় মহীয়ান্।
বৌদ্ধ কিংবা খৃষ্টান হোক হিন্দু কিংবা মুসলমান,
উচ্চ অধম, মজ্জুর কৃষাণ, সবার প্রতি সমান টান।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী আর জহরলাল—
এঁদের প্রভাব রইবে ভবে যুগ-যুগান্ত দীর্ঘকাল।
ঠিক সত্তেরো বর্ষ জওহর ধরলো রাষ্ট্রতরীর হাল ;
জবব্দন্ত দুশ্মনিতে হয়নি দীর্ঘ নাজেহাল।

প্রাচীনপন্থী নয় তো মোটেই কিংবা উগ্র আধুনিক ;
কর্ম্মে এতই রইতো মেতে পায়নি হ'তে কালনিক।
মর্ম্মে মানি' বিবেক-বাণী ধাইলো ধরার 'দিগ্দিগ' ;
ধ্যানের ভারতবর্ষ হোলো বিজ্ঞানে আজ সুনির্ভীক।

মৃত্যু কারুর কাম্য নহে, মৃত্যু তবু হয় সবার ;
আকস্মিক তার মৃত্যুতে হয় এই পৃথিবী অন্ধকার।
মহামৃত্যু হয় ক'জনের, হচ্ছে কোথায় এমন কার ?
বিশ্ব কাঁদে যাহার জন্ম, বরণযোগ্য মরণ তার।

ধর্ম্মলোভী নয় তো জওহর, চলো ধরে' পুণ্যপথ ;
লোকাচারের বার ধারেনি যুক্তিবাদী পরম সৎ।
একাই নিজের বুদ্ধিবলে চালিয়ে নিল রাষ্ট্ররথ।
যেই দেশে থাক্ যেমন মাহুয, সব্কে মানে আত্মবৎ।

জানিয়ে যেতে চরম কথা, থামাতে বাদ-বিসংবাদ,
ইচ্ছা-পত্রে প্রকাশ করে মনের গোপন অজ্ঞাতবাদ।
“শ্রদ্ধা আমার হয় না যেন, আত্মার হবে পরীবাদ।
গদা-ধারায়, দেশের ধূলায় মিশিয়ে ঘুচাও অবসাদ।”

“বাল্যাবধি বাসছি ভালো জাহ্নবী আর হিমাচল।
বাসছি ভালো গহন গভীর অরণ্যানী সমতল।
কেউ গোড়ো না মঠ মন্দির, কেউ ফেলো না অশ্রুজল।
চিত্তাভ্রম্ ক্রেতে ছড়াও, তাতেই পাবো কাম্যফল।”



ভারত-জহর

শ্রীমুখীর গুপ্ত

মহাত্মার অবদান শঙ্খ শুটি কত,
শুনাতে মানব-মন্ড-মন্ডিত মন্দিরে
ভারত-বিবেক-বাণী সংস্কৃত পৃথ্বীরে,
বিশ্ব বিবেকেরে সদা রাখিতে জাগ্রত।

একে একে সে শব্দেরা উদ্‌ঘাপিয়া ব্রত
মহাকাল-উদধির অতলাস্ত-নীরে
ধীরে ধীরে রহস্যের উৎসে যায় ফিরে ;—
তিমিরে ভারত ঘিরে নামে ব্যথা যত।

কাল-সিদ্ধ-লহরের অমূল্য জহর—
শব্দ শব্দ আচম্বিতে হারালো সাগরে ;
অশরীরি কণ্ঠ-কণ্ঠ হ'য়ে কালোস্তর
কহিবে অশাস্ত-বার্তা মানব-অস্তরে ;
এ খণ্ডিত ভারতের ভাগ্যে অতঃপর
বাকী শব্দ বাজে যেন বিশ্ব-প্রীতি-ভরে।



অনুপম নেহেরু

কৃষ্ণা মৌলিক এম. এ.

১৯৬৪ সালের ২৭-এ মে ভারতবাসীর কাছে হয়ে রইল চির অবিশ্মরণীয়। সেদিন সকালে কলকাতার বৃকে নেমে এলো ধন কুয়াসা—গ্রীষ্মকালের জ্যৈষ্ঠ মাসে অপ্রত্যাশিত, অমঙ্গলজনক। ঠিক তেমনি অপ্রত্যাশিত ভাবেই সেদিন ভারত ও সারা বিশ্বে নেমে এলো আমাদের পরম প্রিয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলালের শোকাবহ মৃত্যুর ছায়া। দশ দিক মুখরিত হয়ে উঠল “নাই”, “নাই” রবে। এই সংবাদ শোনার জন্ম মনের প্রস্তুতি ছিল না। আকস্মিক এই দুঃসংবাদ মর্মস্থলে দারুণ আঘাত হানলো। সারা ভারত মুহম্মান, মুখে নেই ভাষা, অন্তরে নেই স্তানন্দ। ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের মুখে-মুখে নেহেরুর কথা। সূর্য তার দীপ্তি নিয়ে যখন আকাশের বৃকে জেগে থাকে, তখন তো তার দিকে চাইবার কারও আগ্রহ থাকে না। কিন্তু সেই সূর্য যখন রাহগ্রস্ত হয়, তখন তার অভাব মানুষ অহুস্তব করে, তার জন্ম হয় ব্যাকুল। চির তারুণ্যের প্রতীক আমাদের প্রিয় নেতা নেহেরু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন বোধহয় এমন ভাবে ভারতের মানুষ তাঁর দিকে তাকায়নি। মৃত্যুর দেশে যখন চলে গেলেন, তখন তাঁর বিয়োগ-ব্যথা সকলের বৃকে বৃকে। আজ দেশবাসীর হৃদয়মুকুরে তিনি দীপ্তিমান।

নেহেরুজীর জীবনাবসান এমনি একটা ঘটনা যা সমস্ত পৃথিবীকে গভীর শোক ও নৈরাশ্রে উদ্বেলিত করেছে। বিশ্ব-রাজনীতির এই দুর্ভাগ্য ভেদাতাদের দিনে দেশ-জাতি নির্বিশেষে সার্বভৌম শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতির আসনে প্রতিষ্ঠিত মানুষ খুবই দুর্লভ। সেই দুর্লভ মানুষদের মধ্যে নেহেরু শুধু অস্বাভাবিক নন, দুর্লভতম। সারা বিশ্ব তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছে। এই পৃথিবীতে অনেক স্নন্দর স্নন্দর জিনিষ আছে কিন্তু সবচেয়ে স্নন্দর জিনিষ, সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার বস্তু মানুষের ভালবাসা। যে অপরিাপ্ত মানুষের ভালবাসা তিনি পেয়ে গেলেন তার তুলনা নেই। স্নেহ, ভালবাসা বিচ্ছেদ-বেদনার অশ্রুজল দিয়ে সাজানো



হল তাঁর অস্তিত্ব-যাত্রা। এইভাবে তিনি মৃত্যুর দেশে মৃত্যুকে করলেন জয়। কবিগুরুর ভাষায়—

‘এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।’

১৯৪৮ সালে মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণের পর সেই ঘোর অন্ধকার ক্ষণে অনির্বাক্য দীপ হস্তে দৃঢ় পদক্ষেপে যিনি জাতিকে পথ দেখিয়েছিলেন তিনি আর কেহই নন— তিনি আমাদের প্রিয় নেতা শ্রীজওহরলাল নেহেরু। অর্ধ শতাব্দী ধরে তিনি ভারতের ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজ করে আমাদের সমগ্র চেতনাকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করেছেন। মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় তাঁর জীবনের এক অবিশ্মরণীয় ও যুগান্তকারী ঘটনা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ তাঁর জীবনে অনুবাদিত। রবীন্দ্র-সাধনার যেন নেহেরু রাজ-নৈতিক ভাষা। এ হিসাবে সত্যিই রবীন্দ্র-শিষ্য ছিলেন নেহেরু। মহাত্মাজী ও বিশ্বকবির মতই তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক। মানুষ তাঁর কাছে ছিল পরম সত্য—তা সে যে দেশেরই হউক। মানুষের সহিত একাত্ম হয়েই নেহেরু মহৎ আর বৃহৎ।

এই অপূর্ব মানবপ্রেমই তাঁকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। করেছে স্মরণীয় ও বিশ্ববরণীয়। সর্বত্র মানুষের মুক্তি, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আনাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। তিনি বলেছিলেন—‘কাজ করে যেতে হবে শেষদিন পর্যন্ত। যতদিন না কাল এসে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে ধ্বংসসুপে।’ এই বৃহত্তর লক্ষ্যে কর্মস্বাহাই তাঁকে কর্মযোগী করে তুললো। তাই তিনি ঐশ্বর্য়ের মাঝে মানুষ হয়েও ঐশ্বর্য়ের প্রতি রইলেন উদাসীন এবং গৃহী হবোও সম্যাসীর মত সাংসারে ছিলেন নির্লিপ্ত। বার্ষিকা এসেছিল তাঁর দেহে, মনে নয়। তাইতো তিনি জীবনের শেষ ধাপে এসেও শিশুদের সঙ্গে শিশুদের মতই অবাধে মিশতে পারতেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন—‘দৃষ্টান্ত: সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্ন হলেও আসলে আমি ছেলেমানুষ ছিলাম।’

এই আত্মভোলা, কাজ-পাগলা উদার-জন্ম নেতাটি ছিলেন অদীম সাহসের অধিকারী। স্বামীজীর মতই তিনি দুর্বলতাকে পাপ বলে মনেপ্রাণে স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন—‘এই দুঃখকষ্টের পৃথিবীতে কেবল একটি জিনিষ আছে যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না—দেহ। অবিচলিত সাহসে সর্গোরবে নিজের জীবনের আদর্শকে অম্লসরণ করে চলা।’

অহরলাল নেহরু ছিলেন একজন মনে-প্রাণে আদর্শ গণতন্ত্রী। তিনি ছিলেন শাস্ত্রের পক্ষপাতী এবং সংঘাত ও সংঘর্ষের বিরোধী। সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল হৃদযাতাপূর্ণ। কাজের মধ্যে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও চিন্তার স্বচ্ছতা দেখতে পেলে তিনি সহজেই আকৃষ্ট হতেন। অহিংসা, সত্য ও শাস্ত্রের প্রতি নিষ্ঠাই ছিল গান্ধীজীর জীবনাদর্শ। নেহরুর জীবনেও সেই আদর্শের প্রভাব ছিল প্রভূত।

নেহরু ছিলেন কবিধর্মী চিন্তাবিদ। একদেশদর্শিতা তাঁর ছিল না। জিনিষের উভয় দিক দেখতেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত। তাই তাঁর মধ্যে গোঁড়ামি ছিল না। সংস্কারহীন মন ছিল তাঁর। রাজনীতিতে নৈতিকতা এনে রাজনীতির দুর্নীতিকে খানিকটা শুদ্ধ করেছিলেন। শাস্ত্রের বার্তাবহ ছিলেন নেহরু। তাঁর কর্মের পিছনে ছিল দর্শন। রাজনীতিক হলেও আসলে তিনি ছিলেন দার্শনিক, ঔপন্যাসিক।

এই অসাধারণ মানুষটি আজ মরদেহে নেই। তাঁর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর কীর্তি অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। তবুও বলি, তাঁর কীর্তির চেয়েও তিনি মহৎ। অল্পমম নেহরুর মৃত্যুর পূর্বের ইচ্ছাটিও অতুলনীয়। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দেহত্যাগ বিমান হ’তে ভারতের বৃকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আবহমানকাল হতে এমন চিন্তা কেউ কখনও করেনি। ভারতের পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, মাটি ও মানুষকে তিনি ভাল-বেসেছিলেন। জীবনে মানুষের কল্যাণ, সুখ শাস্ত্রের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। মরণে তিনি তাদের সঙ্গে মিশে একত্ব পেলেন। আগামীকালের সর্বসংস্কারযুক্ত, সকল বন্ধনহীন, দেশ-জাতি-বর্ণ-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে বৈজ্ঞানিক চিন্তাসম্পন্ন একজন বিশ্বনাগরিকের টাইপ কেমন হতে পারে, নেহরু-জীবন তারই দৃষ্টান্ত। তিনি এক বিশেষ ধরনের মানুষ বলেই এই অভিনব চিন্তাধারা তাঁর মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল।

তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। নেহরু শুধু আমাদের নয়, বিশ্বমানবের চিন্তে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁর পরলোকগমনে সারা বিশ্বের আঁখি অশ্রুসিক্ত। অনাগত কালের বিশ্বনাগরিকের কল্পপুরুষ নেহরু আজকের কালে ও পরিবেশে সত্যিই অল্পমম, অনির্বচনীয়।



“Back to the deep of Her loving bosom the Mother called Her darling child. Pandit Jawaharlal Nehru is no more. The Mother showered of Her grace most bountifully upon him. He was great, greater than greatness itself. Alas that greatness is forever gone out of Indian scene.” [*The Mother*, April '64]

Sri Sri Thakur Sitaramdas Omkarnath.

কবি জওহরলাল

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

জওহরলাল নেহেরু। বয়স তাঁর যাই হোক, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভাবের দিন থেকে মৃত্যুর দিন অবধি তিনি ছিলেন যৌবনধর্মী—বিজ্ঞানবাদী, বাস্তব-পন্থী, প্রগতিবাদী, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক। গান্ধীজীর প্রভাবের মধ্যে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা বিকাশ লাভ করে সত্য, কিন্তু গান্ধীজীর মত মিষ্টিক আধ্যাত্মবাদী তিনি হননি। আধ্যাত্মবাদ যখন বাইরের কয়েকটি ব্যবহারিক সংস্কারে রূপায়িত হয়ে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় মাতৃভূমিকে রক্তাপ্লুত করতে সচেষ্ট সেই সময় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন, এবং সতেরো বছরের কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে, সেই আদর্শকে সার্থকভাবে রূপায়ণ করে যেভাবে স্বাধীন ভারতকে সুসংগঠিত করে গেছেন, তা একমাত্র আব্রাহাম লিঙ্কনের সঙ্গে তুলনীয়। লিঙ্কনের মতই তিনি ছিলেন আশাবাদী। কূটনীতির চেয়ে মহুষ্যত্ববোধের সরল সহজ আদর্শবাদ বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়েছিল। এই সারল্য তাঁকে বর্তমান যুগের সকল দেশের সাধারণ মানুষের আপনাব জন করে তুলেছিল, তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবীর বহু দেশের বহু জন চোখের জল ফেলেছে, কেউ আবার আত্মীয়-বিরোগ বেদনায় জ্ঞান হারিয়েছে, আর চেতনা হারানি।

জওহরলাল ধনীর সম্ভান, সমৃদ্ধির মধ্যে লালিত। তাঁর যুগে তাঁর মত ধনীসম্ভান তো আরো অনেক ছিলেন কিন্তু তাঁর মত আর দ্বিতীয় ব্যক্তির তো দেখা পাওয়া গেল না। ক্যাম্ব্রিজ থেকে রসায়ন, ভূবিদ্যা, ও উদ্ভিদবিদ্যার ট্রাইপোজ্‌ নিয়ে তিনি বি. এন্সসি. পাস করেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের তিনি ছিলেন সতীর্থ। ব্যারিস্টার হয়ে এসে এলাহাবাদ হাইকোর্টে তিনি ওকালতি শুরু করলেন। কিন্তু এ পেশায় মন থেকে তেমনভাবে সাদা পেলেন না। তখন তিনি সাধারণের কাছে অপরিচিত। ১৯১৫ সালে প্রথম তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন এক সভায়—প্রেস আইনের প্রতিবাদ সভায় ইংরাজিতে ছোট একটি বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতার শেষে স্যার তেজবাহাদুর

সাপ্‌রু তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন—বাঃ, বেশ তো বলতে পার!

তারপর লখনৌ কংগ্রেসে পরিচয় ঘটলো গান্ধীজীর সঙ্গে। জওহরলাল এতদিনে মনের মত কর্মক্ষেত্রের সম্ভান পেলেন।

তারপরেই জওহরলালকে দেখা গেল অমৃতসহরে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গেছেন, জওহরলাল তাঁর সেক্রেটারি।

এবার জওহরলাল ভারতভূমিকে ভালভাবে চিনতে শুরু করলেন। অর্ধনগ্ন, অনাহারক্লিষ্ট শোষিত মানুষের দল, উদযাত্ত পরিশ্রম করেও জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত, আশা নেই, দিনে দিনে শুধু দিন যাপনের প্লানি সঞ্চয় করে চলেছে। মনে শঙ্কা জাগে, তিনি তো এঁদের লোক নন, এঁরা যে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে আছে, যেদিন এরা ভালভাবে তাঁকে চিনবে সেদিনও কি এইভাবে তাকাতে তাঁর মুখের পানে?—এই জিজ্ঞাসাই জওহরলালকে আত্মসমীক্ষা করে তুললো, জনকল্যাণে জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়েও তিনি রইলেন একক, নিঃসঙ্গ আত্ম-জিজ্ঞাসী। যা করতে চাই তা কতটা সাধারণের পক্ষে ফলপ্রসূ হবে? এই জিজ্ঞাসাই জওহরলালের ভাবুকতার উৎস। এই ভাবুকতাই তাঁকে দিনে পনেরো ঘণ্টা কাজে নিযুক্ত রাখে এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসাবে এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক-পদে। আবার কারাগারের মধ্যে আত্মবিশ্লেষণের অবকাশ দেয়। সেই মনঃসমীক্ষার পিছনে জেগে ওঠে ভাবুকতা—এই চল্লিশ কোটি দরিদ্র মুক জনগণের জন্ত তাঁর কৃতকর্মের সার্থকতা কতটুকু? ভাবতে ভাবতে জওহরলাল নিজেকে ছেড়ে দেন অন্তহীন আকাশের নীলিমায়, ভাসমান টুকরো টুকরো জলভারাক্রান্ত মেঘের নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে, কর্মী জওহরলালের মধ্যে জেগে ওঠে কবি জওহরলাল—“I preferred loneliness, ... pleasure to watch the changing clouds, like clime to clime. Oh! Sweet to lie and bless the luxury of time.”

কবি জওহরলাল চিরকালের যুবা,—‘I have escaped so far the accusation of age. though my hair have turned grey and my looks betary me.’ এই যৌবনই উদাস্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে—‘For myself I delight in warfare. It makes me feel that I am alive.’ কিন্তু অগণিত অল্পপায়ী উগ্ৰ আগ্রহের কথা ভেবে তখনই তিনি ভাবুকতার রাশ চেপে ধরেন, বলেন—‘My reputation as a hero is entirely a bogus one, and I do not feel at all heroic, and generally the heroic attitude or the dramatic pose in life strikes me as silly.’ এইখানেই জওহরলাল নেপোলিয়ন বা হিটলারের চেয়ে বড়, তাঁর মানসলোক উৎকর্ষিত। এই মানসলোকের আদর্শবাদ বুঝতে পেরেছিলেন মহাত্মাজী, তাই তিনি বলেছিলেন—‘We have had differences from the moment we became co-workers, and yet I have said for some years and say now that not Rajaji but Jawaharlal will be my successor.....And I know this that when I am gone he will speak my language.’ মহাত্মনীর এই ভবিষ্যৎদৃষ্টি মিথ্যা হয়নি, সত্যের বহুরের রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে, জওহরলাল কূটনীতির উদ্দেশ্যে সত্য ও অহিংসাকে সার্থকতা দিয়ে গেছেন।

কর্মের পিছনে থাকে ভাবনা। ভাবনা যখন আনন্দবাহী হয় তখনই তা কাব্য, তার রচয়িতার আখ্যা কবি। কর্মী জওহরলালের ভাবনা ছিল, কোটিকোটি মানুষের আনন্দবাহী—সেইজন্ত কর্মী জওহরলালের চেয়ে কবি জওহরলাল বড়। ‘Great men have come from age to age in this country and elsewhere to help mankind. But greater than any man is the idea which he has embodied.’ একথা তিনি জানতেন বলেই তিনি কূটনীতিক হতে পারেন নি, তিনি হয়েছিলেন রাজনীতিজ্ঞ। দেশপ্রেমের সঙ্গে মিশেছিল বিশ্বপ্রীতি, জাতীয় স্বার্থের সহযোগী হয়েছিল মানবতাবোধ।

সত্যপ্রিয় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ জওহরলালের এই কবি-মনকে চিনেছিলেন, সেইজন্তই জওহরলাল সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—‘পলিটিক্সের সাধনায় আত্মপ্রবন্ধনার পদ্ধতি আবর্তের মধ্যে নিজে থেকে তিনি কখনো হারিয়ে ফেলেন নি। সত্য যেখানে বিপজ্জনক সেখানে সত্যকে তিনি ভয় করেননি, মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক, সেখানে তিনি সহায় করেননি মিথ্যাকে। মিথ্যার উপচার আশু প্রয়োজনবোধে দেশপুঞ্জার যে অর্থে অসংকোচে স্বীকৃত হয়ে থাকে। সেখানে তিনি সত্যের নির্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি, কূট-কৌশলের পথে কললাভের চেষ্টাকে চিরদিন যুগান্তের অবজ্ঞা করেছে। দেশের মুক্তিসাধনায় তাঁর এই চরিত্রের দান সকলের চেয়ে বড় দান।’

কবির কাব্য জীবনবোধ থেকে উৎসারিত, যার মধ্যে মহত্তর জীবনবোধের প্রকাশ নেই সেই শিল্প এবং সেই কাব্য মূল্যহীন। জওহরলাল বলেছেন—‘Art if it does not spring up from the strength of our nation is a lifeless art. If it has no connection with the problems and realities of life, it is useless and dead.’

কবিচিন্তের ব্যক্তিত্ব রাজনীতিকের উদ্দেশ্যে তাঁর স্থান করে দিয়েছে। খ্যাতনামা মার্কিন ভাষ্যকার জন গাহার তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বলেছেন—‘He is a gentleman, worse, he is an English gentleman. He is certainly one of the finest characters in public life I have ever met.’ জওহরলাল উপলব্ধি করেছিলেন, আধ্যাত্মিক প্রসারতা সমস্ত রাজনীতিক দুর্বলতাকে বিলুপ্ত করে বিশ্বাত্মবোধ জাগাতে পারে। তিনি বলেছেন—‘All over the world today, behind the political and economic conflicts, there is a spiritual crisis, a questioning of old values and beliefs and a search for a way out of the tangle.’ এই সমস্তার সমাধানের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, প্রীতি ও সত্যতার পথে।

কবি স্বন্দরের পূজারী, অস্বন্দর তাকে বেদনা দেয়। ভারতের অগণিত জনগণের নিপীড়িত জীবনধারা তাঁকে বেদনার্ত করেছে, সেইজন্তই তিনি রাষ্ট্রনীতিক কর্মী। এবং দেশ ছাড়িয়েও বিদেশে যেখানে শোষণ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সেখানেই তাঁর দরদ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, কারণ—‘The immediate purpose of every human being should be to reduce this misery and to help in building up a better society, and a better society must necessarily aim at the elimination of all domination of one nation over another, of man over man. It must replace competition by co-operation.’

জওহরলালের মানবতাবোধ তাঁকে কোন ক্ষোভে যুক্ত করতে পারেনি, একদলে যোগ দিয়ে অপর পক্ষকে তিনি নিন্দা করবেন কেমন করে? যার যেটুকু ভালো তার সেটুকু গ্রহণ করতে হবে, যা নিন্দনীয় তা বর্জনীয়। সমগ্র মানবসমাজকে স্বন্দর করে তোলার সাধনায়, দলগত স্বার্থ ও মতবাদগত বিভেদ তো স্থান পাবে না। যা স্বন্দর, তা-ই সত্য, সেই সত্যের সন্ধানই সভ্যতার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে জওহরলালের মানস ছিল তমসামুক্ত। ‘Mankind must work for its own Justice.’ বর্তমানের জীবনধারাকে অস্বীকার করে সে কাজ তো সম্ভব নয়। ভাবুক মন, বিশ্লেষণ করতে বসলেন কার্য্যাকাষণ, বললেন—‘Politics led me to economics and inevitably it led me to science and the scientific approach to all our problems and to life itself. It was

science alone that could solve these problems of hunger and poverty, of insanitation and illiteracy, of superstition, and deadening custom and tradition, of vast resources running to waste, of a rich country inhabited by starving people.....I am convinced that the only key to the solution of the world's problems lies in socialism, and when I use this word I do so not in a vague humanitarian way but in the scientific economic sense.’

এই বিজ্ঞানকে জওহরলাল স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন—‘It is not enough to industrialize India, we must know for whose benefit we are going to industrialize the country. India means peasantry. And if the peasants do not stand to gain by the plans of reconstruction, let us stop the rot.’

জওহরলাল আর নেই, ভারত ও বিশ্বকে নিয়ে যে কাব্য তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন সেই মানবতার ভাবনা তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্ত। তাঁর চিত্তাভ্রম অস্তরীক্ষ থেকে বিকীর্ণ করার আকাজ্জক মধ্যে সেই কথাটাই হয়তো অন্তর্নিহিত রয়েছে, যে উদ্দেশ্য অসমাপ্ত তার প্রেরণা কণা কণা হয়ে পরিব্যাপ্ত হোক সমগ্র দেশের জনমানসে—তাঁর উত্তরসাধনা সম্পূর্ণ হোক কোটি কোটি মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে। কবি জওহরলালের এই শেষ কাব্য—ভাবুক আদর্শনিষ্ঠের পরম আশা।

নেহেরু বিয়োগে

শ্রীগণেশচন্দ্র সামন্ত

দুর্গম পথে মনোবল তুমি

ভারতমাতার হে বীর তনয়

শঙ্কাবিহীন চিন্তে তোমার

সকল বিষয় করেছ জয়।

হে নেহেরু তব বিয়োগ ব্যাখ্যায়

ঢেকেছে বিশ্ব আঁধার ছায়ায়,

তোমার বিহনে মৌনা ধরণী

ঝরিছে অশ্রু বিষাদময়।

একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি

শ্রীমদর্শন চক্রবর্তী

ঠিক একটি বছর আগে। ত্রাশতাল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে মেন-এর সপ্তম বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে গেছি নিউ দিল্লীতে। পয়লা জুন সভার উদ্বোধন করলেন অধ্বেষ মন্ত্রী শ্রীমন্তলালীলাল নন্দ। যখন জানানো হ'ল যে, আমাদের প্রিয় নেতা শ্রীজহরলাল নেহেরু আমাদের সঙ্গে কাল সকালে সাক্ষাৎ করবেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী ভবনে। তখন কি অব্যক্ত আনন্দে যে আমাদের প্রাণ ভ'রে উঠল তা আর কি বলব। অধীর আগ্রহে শুধু অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সকাল হবে।

পরদিন সকাল আটটায় আমরা তাঁর বাসভবনে যখন হাজির হলাম, তিনি ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। মাথায় গান্ধি টুপি, স্তম্ভ ক্রয়ুগল, ছুটি হাত বুকুর উপর সংযুক্ত। লম্বা কোটের বুকপকেটের উপরে চির বিরাজিত সেই লাল ছোট্ট গোলাপের কুঁড়ি। প্রশান্ত মুখের সেই সুপ্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে তিনি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন সাদরে গ্রহণ করলেন। আয়ত নেত্র দুটি যেন ধ্যানমগ্ন স্রুত্বের প্রতি নিবদ্ধ। স্বভাবসুলভ শাস্ত সমাহিত কণ্ঠে তিনি আমাদের আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'আমাদের ধ্যানের ভারত আজ শত্রুদ্বারা আক্রান্ত। আজ আমাদের অনেক কিছুই করবার আছে; আমরা আরও অনেক বেশী এর উন্নতি করতে পারি এখনও।'

ভারত-আত্মার মুর্ত্ত প্রতীক আমাদের প্রিয় নেতা শ্রীজহরলালের মুখে এ কথা শুনে আমরা যেন এক নতুন জগতের সন্ধান পেলাম। ঠিক এতখানি দরদ দিয়ে তাঁর মত গভীর ক'রে এ কথা ভেবেছি বলে তো মনে হ'ল না এতকাল। আমাদের চিন্ময় ভারতবর্ষকে যেন তাঁর সেই আশত চোখের মধ্যে নতুন ক'রে প্রত্যক্ষ করলাম সেদিন। যে প্রেরণা ও সদিচ্ছা নিয়ে সেদিন তাঁর জয় হিন্দ

শুনে মস্তমুগ্ধের মত ফিরে এলাম, জীবনে চলার পথে তা যেন এক অক্ষয় পাথের স্বরূপ অপূর্ব আলোকবস্তিকা। কত কি যে আমাদের বলার ছিল সেদিন, কিন্তু সবই যেন হারিয়ে গেল তাঁর সেই আন্তরিকতার স্পর্শে। নিজেদের করণীয়কে আমরা যখন আরও বেশী জন্মর করতে পারি, তবে কেন তা করিনি, এই আক্ষেপই সেদিন তুলিয়ে দিচ্ছে আমাদের আর সব। পরশমণির ছোঁয়ার মত তাঁর সান্নিধ্য আমাদের সেদিন যে কি ভাবে জানিয়ে দিল তা ভাবায় বোঝাতে পারব না।

আর আজ, ঠিক তার একটি বছর পরে, যে কথা ভাবতেও পারি না, সেই গান্ধী-শিষ্য তাবুক জহরলাল, সুভাষ-বন্ধু জহরলাল, রবীন্দ্রের ঋতুরাজ জহরলাল, রামমোহনের বিশ্বভ্রাতৃত্বের রূপদাতা জহরলাল, সারা বিশ্বের শান্তিপ্রেমের দিব্যদূত, বিশ্বের বিম্ময় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। এ যে আমাদের কতখানি শূন্যতা তা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

কণ্ঠ আজ বাকরুদ্ধ, নয়ন অশ্রু প্লাবিত, দৃষ্টি দিশাহারা, অন্তর ডুকরে কেঁদে উঠছে। কিন্তু তিনি নেই, তাঁর আদর্শ ত আছে। তাঁর আদর্শের মধ্যে তিনি অমর হ'য়ে থাকবেন আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত্তের ছোঁয়ায়। সেই হবে আমাদের নেহেরু তর্পণ। তাই তাঁর সমস্ত ফাইল দেখা ও সব কাজ শেষ ক'রে যে চ'লে যাওয়া তা আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক তাঁর টেবিলে নিজের হাতে লেখা মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রষ্টের একটি কবিতার সেই ছত্র কটি—যার বলাহুবাদ—

“স্নিগ্ধ বনানী আবলুস কালো গহন অন্ধকার

(তবু) পাড়ি দিতে হবে লক্ষ যোজন পথ;

—বিশ্রাম নেব,

সার্থক করে যা কিছু অস্বীকার।”



প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু একখানি অপ্রকাশিত চিত্র। শ্রীনেহেরু সঙ্গে আলাপ-আলোচনার এক হস্ত-
পরিহাসমুখ্য মুহূর্তে করমর্দনেরত শ্রবর্তকের সহকর্মী সাহিত্যিক চিত্র-পরিচালক শ্রীতারাশঙ্কর। মাঝখানে
দণ্ডায়মানা বর্ধমানের সহাবাসী অধিবাসী। হাসিখুশী প্রসন্ন বদন নেহেরুজীর এইরূপ চিত্র বিরল।

বিজ্ঞানধর্মী নেহেরু

শ্রীতারাশঙ্কর

দীর্ঘ সতেরো বছরের প্রধান মন্ত্রীত্বকালে দেশকে শ্রীনেহেরু অবদান সহজে কোনো স্থল্পষ্ট অভিযত ব্যক্ত করার আগে রীতিমতো চিন্তা করতে হয়। জনগণের জীবন-সমস্যা যে আজ সঙ্কটসঙ্কুল—এ কথা নিতান্ত মিথ্যাবাদী ছাড়া কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সমাজের ওপরতলার মুষ্টিমেয়দের ঘরে যতো তাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সংখ্যা বেড়েছে, ততোই হাহাকার স্তূপীভূত হয়েছে জনগণের ঘরে ঘরে। একদার সমাজতন্ত্র-অহুরাগী রাজনীতিবিদ শ্রীনেহেরুর পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সঙ্কচিত হ'য়ে আসার যে পরিণতি, ক্ষমাহীন ভাবেই তার বিচার বিশ্লেষণ করবে আগামী যুগের ইতিহাস।

অবশ্যই জনগণের প্রতি মানুষ শ্রীনেহেরুর সমত্ববোধ ছিলো অপরিণীম। দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণই ছিলো

তার জীবনের লক্ষ্য। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, স্বপ্ন, আদর্শ—এ সমস্তই ছিলো আদর্শ মানুষ শ্রীনেহেরুর জীবনে অফুরন্ত। কিন্তু তথাপি প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর রাজনৈতিক সফলতা তর্কাতীত নয়। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ শ্রীচার্চিলের চিন্তাধারা যে শ্রীনেহেরুর চিন্তাধারার মতো ভাব-আদর্শ-কাব্য-দর্শন ও স্বপ্ন-সম্পদে সমৃদ্ধ নয়, এ কথা সত্যের মুখ চেয়েই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যুদ্ধ-বিস্তৃত দেশের দুঃসহ্যতম দুর্দিনে বুদ্ধ শ্রীচার্চিলের প্রধানমন্ত্রীত্বে পুনরাবির্ভাব এবং তা'র আশ্চর্য সার্বিকতা সারা বিশ্বের বিশ্বয় সৃষ্টি করেছিলো। অহুরূপ বিশ্বয়কর অথচ বাস্তব অবদান প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর রাজনীতিতে আছে কিনা, সে কথা তর্কসাপেক্ষ। ভাব, আদর্শ ও স্বপ্ন থাকাটাই শেষ কথা নয়। তা'দের বাস্তব রূপায়ণের কৃতিত্বই

দেশ ও জনগণের জীবনে কল্যাণ আনতে পারে। যেমন গ্রেট ব্রিটেনে এনেছিলো। প্রধানমন্ত্রী চীচাচিলের যুদ্ধকালীন বাস্তব কার্যকলাপ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরর কার্যকলাপের বাস্তব পরিণতির কোথাও কি অল্পরূপ আশ্চর্য সার্থকতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়? অথচ শ্রীনেহেরর নির্মম সমালোচক সোশ্যালিষ্ট নেতার এ অভিমতকে সমগ্র দেশবাসী নিঃসংশয়েই স্বীকার করে যে “ভারতবর্ষে শ্রীবুদ্ধের পর সর্বাধিক ঐশ্বরিক অবদানসমৃদ্ধ পুরুষ শ্রীনেহেরুই।”

জাতীয় জীবনের একটি ক্ষেত্রে কিন্তু শ্রীনেহেরর অবদান দেশকে নিশ্চিত অগ্রগতির পথে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে। সে অবদান, বৈজ্ঞানিক সচেতনতা। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ যে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও অনগ্রসর ছিলো না, এ তথ্যের স্বপক্ষে বহু নজীর বর্তমান। বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে প্রয়োগবিচার সমুন্নতি সন্দেহাতীত। প্রাচীন ভারতের নৌশক্তির দুর্বীর অভিযানের স্বাক্ষর বিশ্বের বহুস্থানে পাওয়া গেছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে, বিশেষভাবে ভারতবর্ষে ঐশ্বরিক অভিযান ও আধিপত্যের পর থেকে বিজ্ঞান-মানসতা ক্রমে ক্রমে দেশ থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। ইংরাজ-অধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্তরে শুধু বৈজ্ঞানিক উন্নতি কেন, আমাদের কোনো উন্নতিরই প্রশ্ন ছিলো না। কারণ, আমরা তখন স্বদেশে বিদেশী শাসন-লাঞ্ছিত। অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশ্বের অগ্রসর সমস্ত জাতিই বৈজ্ঞানিক সমুন্নতির জন্ত মরণ-পণ ক’রে এগিয়ে চলেছিলো। যা’র ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গেলো যে, যুদ্ধের রীতি-নীতি, গতি-প্রকৃতি সবকিছুই আমূল পরিবর্তিত হ’য়ে গেছে। যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে আগবিক বোমার প্রতিক্রিয়া দেখে সারা বিশ্ব বিস্ময়াহত হ’য়ে গেলো। যুদ্ধোত্তর যুগেও বৈজ্ঞানিক সমুন্নতির ক্ষেত্রে বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতার অস্ত্র নেই। যা’র বিশ্বয়কর পরিণতি মানুষ কর্তৃক মহাকাশ-জয়। বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিচার পারদর্শিতা এক এমন শক্তি, যা দেশ ও জাতিকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, সুখ-সমৃদ্ধির স্বর্ণদ্বারের সন্ধান দেয়, কৃষি থেকে শুরু ক’রে যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত বিজয়ীর বরমাল্য অর্জন ক’রে আনে।

অথচ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত-সত্তা ছিলো নিতান্তই নিস্পৃহ ও উদাসীন। গান্ধীজীর জীবনদর্শনের প্রভাবে এই বিজ্ঞান-বিমুখতা ‘পিল্পেগাড়ী’ ক’রে বসতে পারতো আমাদের জাতীয় জীবনে। গান্ধীজীর পর একমাত্র শ্রীনেহেরু ছাড়া ভারতবর্ষের অল্প যে কোনো নেতা যদি ক্ষমতাসীন হ’তেন, তাহলে, নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে যে আজ যতোখানি বিজ্ঞান-সচেতনতা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এসেছে, তা কিছুতেই সম্ভব হ’তো না। অথচ গান্ধীজীর মানসপুত্র জহরলাল। কিন্তু শ্রীনেহেরর দুর্ধর্ষ অশ্রুতা এ ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অনতিক্রম্য প্রত্যাবর্তেও অতিক্রম ক’রেছিলো। তাঁর প্রগতিধর্মী মন উপলব্ধি ক’রেছিলো যে এ যুগে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিচার পারদর্শিতা ছাড়া জাতির সমৃদ্ধি ও শক্তি কোনোটাই সম্ভব নয়।

তাই শ্রীনেহেরর শেষ জীবনে আমরা কী সংসদ-ভবনের অভ্যন্তরে, কী উন্মুক্ত জনসভায় তাঁর প্রতিটি ভাষণে পরিচয় পেয়েছি বৈজ্ঞানিক সমুন্নতির জন্ত তাঁর আশ্রয় আকৃতি ও প্রবল প্রতিজ্ঞার। বিশেষ ক’রে চৈনিক আক্রমণের সূচনা থেকেই শ্রীনেহেরর ধ্যান-জ্ঞান হ’য়ে দাঁড়িয়েছিলো বৈজ্ঞানিক অগ্রসরতা ও প্রয়োগবিচার পারদর্শিতা। এই সময়ের মধ্যে আগার একাধিকবার সুর্যোগ লাভ হয়েছিলো অশ্রুতাভাস্বর পুরুষ শ্রীনেহেরর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ ও আলোচনের। সেই স্বল্প আলোচনের মধ্যেও তাঁকে বলতে শুনেছিঃ প্রয়োগবিচার ঔৎকর্ষ ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই উন্নতি সম্ভব নয়। এ তথ্য কী দেশরক্ষা, কী ইশ্তাহি, কী কৃষির ক্ষেত্রেও যেমন সত্য, তেমনই আপনার চলচিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রেও।

বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিচার সমুন্নতির জন্ত শ্রীনেহেরর আত্মার যে আকৃতি সেদিন ধ্বনিত হ’তে শুনেছিলাম তাঁর কণ্ঠে, তা’ দেশের অন্ত কোনো নেতার মধ্যে দুর্বল। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে যে বিজ্ঞান-সচেতনতা ও প্রয়োগবিচার সাধনা আজ দেশকে অগ্রসরতার সন্ধান দিচ্ছে, তা’র মূল উৎস প্রগতিধর্মী শ্রীনেহেরু। আর জাতির এই বিজ্ঞানমানসতাই দেশকে শ্রীনেহেরর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

প্রয়োগবিচার সমুন্নতিই কিন্তু শেষ কথা নয়। শেষ কথা হচ্ছে, মানব-কল্যাণে সেই বিচার প্রয়োগ। এ-ও শ্রীনেহেরুই মর্মকথা। বিহারে বহুভূগতদের সাহায্য-কল্পে আমার শিল্প-সৃষ্টি “আত্মপালী” চলচ্চিত্রের একটি সাহায্য-প্রদর্শনীর মাধ্যমে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ

ক’রে যখন শ্রীনেহেরু হাতে সেই অর্থ দেওয়া হ’লো, তখন তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন : কী বিজ্ঞান, কী প্রয়োগবিদ্যা, কী শিল্পকর্ম, সবকিছু তখনই সার্থক হয়, যখন তা’ মানুষের কল্যাণসাধনে প্রযুক্ত হয়।

সাহিত্যিক শ্রীনেহেরু

শ্রীঅমিয়া সেন

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন জ্ঞানী-শুণী-মনীষী ও সাহিত্যিক রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তাঁর পরে ভারত-শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন আন্তর্জাতিক লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সাধক দার্শনিক শ্রীরাধাকৃষ্ণণ। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী সাহিত্যিক শ্রীনেহেরু বিশ্ব-রাজনীতির উৎকৃষ্ট দৃষ্টির মধ্যমণিকপে বিগত সত্তের বৎসর ভারত-সত্তা আলো করে বিরাজমান ছিলেন।

শ্রীনেহেরুর রচনা যখন পড়ি, বিস্ময় হয়ে যায়। ভাবি, হায় পথিক! দেবী-ভাবতীর কমল-উপবন ছেড়ে কেন তুমি কাঁপ দিয়েছিলে পঙ্কিল রাজনীতির আবর্তে?

রাজনীতির জুতুগুহে এই আবেগোচ্ছল হৃদয়, কাব্য-ধর্মী মনের উদার বিহারভূমি কই? তোমার সৃষ্টিব ফুল বর্তমানের অঞ্জলি থেকে উপচে পড়ে ভবিষ্যৎকে কেন

আকীর্ণ করলো না? এ কি তোমার ভুল, না মহাকালের মহাবিভ্রম?

অভভেদী পৌরুষের নীচে সরমে মুখ লুকালো কমনীয় কবিসত্তা। তোমার ধ্যানমগ্ন অন্তর-প্রকৃতি থেকে থেকে চমক ভেসে জেগে উঠতো বাস্তবের রৌদ্রালোকে, আর স্বজনরঞ্জনীর স্বপ্নাবশেষের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে ভাবতে তুমি—‘ও আমি তো আমি নই, ও যে অন্ত’—‘যে আমি নিত্য আসে নিত্য যায়, কেবল রেখে যায় তার স্মৃতিটুকু—ও বুঝি সেই।

তবু মনে হয় বিবর্তনময়ী ধরণীতে আজকের এই রাষ্ট্র, পররাষ্ট্রনীতির সকল সাফল্যকে আড়াল করে দূর ভবিষ্যতে তুমি আশ্রয় হব শুধু সাহিত্যিক হিসেবেই। কিন্তু এই সেদিনের রাজনীতিতে নেহেরু প্রবল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন দক্ষ রাজনীতিক ছিলেন, সাহিত্যিক নন—সেই রাজনীতিক নেহেরু নাই।

জওহরলাল

শ্রীজলধর বিশ্বাস

অনিন্দ্য আর অপাপবিদ্ধ অজাতশত্রু জওহরলাল, দরদী হে বিশ্বপ্রেমিক, দেশের দীপ্ত বীর ছল্লাল। ভারতমাতার নয়নমণি—ভাষ্যরতায় প্রভাত রবি, স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ তাপস মন্ত্রিসিদ্ধ ‘মাতৈঃ অতীঃ’। ত্যাগের মহান আদর্শ এক বীর্যবান সে বন্দীবীর, মুক্তির অমল সাধনভূমি স্পর্শপূত বন্দীশিবির। জীবনটাই সাহিত্য তার সত্য-শিব-সুন্দরের, কলাকৃষ্টির প্রধান প্রতীক, পারিজাত সে নন্দনের।

বিজ্ঞানের এ বিশালতায় জনগণ যে অংশীদার, অবদান তা নেহেরুজীর, দেশের দৃঢ় কর্ণধার। দীন-দরিদ্র-মুচি-মেথর সবাই যে তার প্রাণের প্রাণ, তিলে তিলে তাদের তরে আত্মাহুতি করলে দান। মরুর পরে মরু আসে—যুগশ্রেষ্ঠ জওহরলাল, ঘোঁরাযোঁজে চিরজীব সে; কী করবে তার মহাকাশ? জওহরলালজী নিত্য, অমর করব না তো কোন শোক, জীবনবেদ তার মোদের মাঝে সত্যি করে সফল হোক।

কি পেয়েছি আর কি পাইনি

মনোজ দাস

বহু ভাবেই দুর্যোগ মানুষের উপর নেমে আসে। যথা—প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি), সামাজিক দুর্যোগ (ধর্মীয় বা সামাজিক অনাচারসমূহ) বা রাজনৈতিক দুর্যোগ (যুদ্ধ, রাজনৈতিক কুশাসন, শোষণ প্রভৃতি), দেশে দেশে নেতাগণ আবির্ভূত হয়ে এই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। উল্লিখিত অনাচারগুলির ভিতর রাজনৈতিক অনাচার প্রতিরোধ করাই সবচেয়ে শক্ত এবং বড় সোজা ধর্ম।

রাজনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে বহু লোক নিজেরাই রাজনৈতিক নেতা বনে গিয়ে শক্তির অপচয় করেছেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। এই প্রলোভনের হাত থেকে খুব অল্প সংখ্যক নেতাই নিজেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছেন। অন্ততঃ আমরা ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে; দ্বিধাহীন চিন্তে তা বলতে পারি।

রাজনৈতিক উপায়ে মানব সেবার পথে নির্ভর কষ্টপাথরে ধারা উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রেখেছেন জহরলাল নেহেরু তাঁদেরই একজন।

বিগত যুদ্ধের ধনী, অভিজাত এবং পাশ্চাত্য জীবন-ধারণ অভ্যস্ত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পুত্র হারোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ জহরলাল কিভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর পথ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তা সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। শুধু নিজে গ্রহণ করাই নয়, তিনি আরও বিশ্বয় সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর পিতা সেকালের বিখ্যাত আইনজীবী মতিলালকে দেশসেবার কাজে টেনে এনে।

যা হোক, জহরলাল রাজনৈতিক নেতা হলেন—সংগ্রামী নেতা—পেছনে সংগ্রামী সেনাদল। সংগ্রামী জনতাকে স্বশৃঙ্খল ভাবে চালানো নিপুণতার কাজ সন্দেহ

নেই। কিন্তু সংগ্রামের সময় সেনাদল ত্যাগে অভ্যস্ত হয়, দলীয় স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেয়—ভোগের বাসনা তখন মনে স্থান পায় না।

কিন্তু সংগ্রাম যেদিন শেষ হয় সেদিন জয়ী দলের ভাগ বাটোয়ারার দিন আসে। সেদিন মাংসলোভী শকুনিক দলে দলে এসে খাবারের আশেপাশে জড়ো হয়। ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। সেদিনও যে এই লোভ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এই লুক্কায়িত মানুষগুলোকে চালাতে পারে সত্যিকারের নেতা তো সেই-ই। জওহরলাল কি তা পেরেছেন? এই প্রশ্নের বিচার আমি এখন ভবিষ্যতের জন্তে রেখে দিচ্ছি।

জগতের নিয়ম হল লোকে কি পেয়েছে তা কেউ দেখে না—কি পায়নি সেটাই শুধু তাবা দেখতে চায়। যদি জওহরলালের নেতৃত্বাধীন ভারতের কথায় এসে জওহরলালের সমালোচক কোন নেতা বা লোককে জিজ্ঞেস করি বিগত ১৬ বছরে জহরলাল আমাদের কি দিতে পারেন নি। তিনি উত্তরে সেই না পাওয়ার তালিকা দিতে শুরু করবেন। হয়তো বলবেন—(১) পাকিস্তানকে শায়েস্তা করতে তিনি পারেন নি—(২) চীনের সাথে বন্ধে ভারতের সামরিক দুর্বলতা যে দেখা গেছে তার জন্তে তিনিই দায়ী—(৩) তাঁর নিরপেক্ষতা নীতির কোন শুভফল হয়নি (কেউ কেউ বলবে) (৪) তাঁর সৃষ্টি পঞ্চশীলের মুহূর্ত ঘটেছে চীনের হাতে (৫) ভারতের আভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন সফল হয়নি, বেকারত্ব ঘোচেনি এবং (৬) কংগ্রেসনেতাদের এবং সরকারী কর্মচারীদের ভিতর থেকে দুর্নীতি তিনি দূর করতে পারেন নি।

এই হল মোটামুটি না পাওয়ার তালিকা। কিন্তু তাঁর সময়ে ভারত যা পেয়েছে এবং শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি লাভ করেছে তা কি বহুগুণ বেশী নয়? এইসব অগ্রগতির

জহরলাল আবার আসিবে

শ্রীমুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী

বিরাট রাজনীতিক, বিরামহীন কর্মী, ভক্তি, স্নেহ, মায়ামমতার মূর্ত্ত বিগ্রহ জহরলালের তিরোধানে সমগ্র জগৎ আজ গভীর শোকাচ্ছন্ন। মরণেও ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরু জগতের চক্ষে ভারতের মর্যাদা সর্বতোভাবে বাড়াইয়া গেলেন। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অগ্র প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র সকলে নেহেরুর গুণগানে মুগ্ধ। যুগবিগ্রহ, হৃদয়কোলাহলের আবহাওয়ায় জঙ্ঘরিত বর্তমান পৃথিবীর সাময়িক পরিভ্রাতা বলিয়াও পৃথিবীর বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ কর্তৃক তিনি পরিগণিত। ভারতীষের এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে ভারতবর্ষের গৌরবের অবধি নাই।

সমগ্র পৃথিবীকে কালে কালে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাধনা, সত্যতা, শিক্ষাদানে ভারত বিরত থাকে নাই। ইতিহাসে এ সত্য চির জাজ্জল্যমান আছে ও থাকিবে। ইহার উপর আজ আবার ভারতীয় নেহেরুর জগতকে এই মহার্ঘ্য দান; জয় ভারতবর্ষ! জয় নেহেরু!

আজ মনে পড়িতেছে আমাদের রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার অগণিত বিশ্বস্ত অমুগামীদের নিদ্রিত ভারতকে উচ্চকণ্ঠে চারণ-সঙ্গীতে উদ্ভুদ্ধ করার কথা। মনে পড়িতেছে ঋষি অরবিন্দের সত্য প্রচারের অমোঘ অভিযানের কথা। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের অনৈসর্গিক

অভ্যুদয়ের কথা। আর মনে পড়িতেছে সুভাষচন্দ্রের নেতাজীরূপে স্বাধীনতা সংগ্রামে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার কথা। নেহেরুজী আজ দেহবিচ্ছেদের পরপারে। তিনি থাকিলে আমাদের মর্ম্মবাণীর মর্যাদা নিশ্চয়ই তিনি দিতেন। বিশ্বাস ইহা আমরা মরমে মরমে করি—তাঁহার প্রকৃত প্রকৃতির অমুভূতি আমাদের থাকিতে। তাঁহার সম্মুখে বিশ্বজোড়া এই ভাবের অমুভূতির কারণেই এই মহান মনীষী সকলের এত আপনার, এত মাননীয়, এত সম্মানার্থ। সুদীর্ঘ সতের বৎসরকাল প্রধান মন্ত্রী পদে তাঁহার বিরাজিত থাকার অভ্যস্তরেও এই সত্য বিরাজিত।

জহরলালের ইহজগত হইতে বিদায়গ্রহণ দৃশ্য আমাদের চ'খে ভাসিতেছে। কত প্রিয়, কত বিশ্বস্ত হইলেন লক্ষ লক্ষ লোকের বুকফাটা হাস হাস রব শ্রুতিগোচর সম্ভবে! যাও বীর, যাও মহাপ্রাণ, শাস্তি লাভ কর পরম পদে। দুঃখ করিব না, শোক করিব না, মনে প্রাণে জানি বলিয়া আবার তুমি আসিবে। আসিতেই হইবে, ভাবময় তোমার ভারত ছাড়িয়া তুমি থাকিতে পারিবে না। ততদিন তোমার চিত্তাত্ম মাখিয়া দেশ-বাসী আবাহন করিবে নিত্য।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

যে ফল আস্ত ভবিষ্যৎ আমাদের জন্তে রাখছে তা কি নগণ্য? আমরা না পাওযাটাও যেমন দেখবো পাওয়াটাও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

সবচেয়ে বড় জিনিষ তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন—তা হল একটি স্থিতিশীল সরকার এবং ঐক্য—যার ফলে জীনের মত একটা দুর্ধর্ষ সাময়িক শক্তি ভারতের দিক আর এগুতে সাহস পাষনি। তাঁর রচিত এই স্থিতিশীলতাই আজ তাঁর তিরোধানের পরও ঐক্য বজায় আর রাজনৈতিক কোন্দল ঝুলিতে রেখে এক সর্বসম্মত

সরকার গঠন করেছে। এই পরিণতি তাঁর শিক্ষার ফলেই হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর যখন দিল্লীর পটে রাজনৈতিক কোন্দলের খেলা চলছিল তখন শোকনস্ত্র দেশ অসহিষ্ণুভাবে তা দেখেছিলো। শান্তিপূর্ণ ভাবে তাঁর পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে দেশের লোক আজ ভৃগু এবং কৃতজ্ঞভরে প্রিয় নেতা জহরলালকে স্মরণ করেছে। তা না হলে আজ যদি অবস্থা অন্তরূপ হত তবে দেশের লোক সেই সব নেতাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারতো না।

পণ্ডিত নেহরুর আত্মজীবনী সম্বন্ধে দু'একটি কথা

হান্স ফ্রিডারিক ব্লঙ্ক*

অনুবাদক : ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে এবং ঠিক তার পরে বৈদেশিক শক্তির প্রাধান্যকালে অপর দেশে প্রকাশিত নতুন নতুন ভাল বই পাওয়া ও পড়া জার্মানদের পক্ষে যারপরনাই কষ্টকর ছিল। জর্নৈক আমেরিকান বন্ধু নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত পণ্ডিত নেহরুর লিখিত “স্বাধীনতার পথে” (নেহরুর আত্মজীবনী) আমায় পাঠিয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ার মহান মুক্তিদাতার এই পুস্তক সম্বন্ধে এবং তাঁহার অসংখ্য সহকর্মীদের খুব কম করে লিখতে গেলেও আরও একটি স্মৃতিগ্রন্থ গ্রন্থ হইয়া যায়। আমরা এখানে কেবলমাত্র তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব। তাঁহাকে সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য কোথায় তাহাই সর্বোপরি জানা দরকার।

গান্ধীজী যিনি তাঁর জীবন জাতির জন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন, যিনি ধ্বংসের বহু পূর্ব যুগের অহস্তত প্রাচ্যের স্মরণীয় আদর্শ দ্বারা ব্রিটিশ শক্তিকে পরাভূত করিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন—আমরা জার্মানীতে ভারতের মুক্তিদাতা বলিয়া তাঁকে জানি। তিনি কিন্তু কখনই প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজের সঙ্গে কোনও হিংসাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত হন নাই।

নেহরুজীও যথেষ্ট দুঃখ বরণ করিয়াছেন, তিনি তাঁর জাতির জন্ত কারাবরণ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন এবং তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় নানাতাবে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে কাটিয়েছেন। ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাকূলে তিনি সর্বদাই সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়িয়ে গেছেন—এমন মূর্খ কে আছে, যে স্বীয় অহুগামীদের ব্রিটিশ সিংহের মেসিন গানের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেবে? ইতিহাসে দেখা যায় যে, আইরিশ জাতি ব্রিটিশের সঙ্গে বারবার শক্তি পরীক্ষায় তাদের অর্ধেকেরও বেশী লোক হারাইয়াছে।

নেহরুর আইনাহুগ এবং ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে আস্থাবান হওয়ায় ঐ পথ পরিহার করিয়াছেন। ইংরাজেরা যদি বিচক্ষণতাবশে ঠিক সময়ে ভারত ত্যাগ না করত তবে হযত শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষেও সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হইত না। অবশ্য তিনি যদি তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার রাজনৈতিক কল্পের ইঙ্গিত ফললাভে উদগ্রীব হইতেন তবে তিনি সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে বিধা করিতেন না (মহাত্মাজীকে দেখেই আমরা যেন সমস্ত ভারতীয় নেতাদের সম্বন্ধেই ভুল না করি)। যুগপৎ দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের ফল প্রত্যক্ষ করার সময়ে তাঁহার মহান ব্যক্তিত্বের আর কোনও সাধী ছিল না।

তৃতীয় ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করিতেছি, তিনি সুভাষচন্দ্র বসু। ইনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অক্ষ-শক্তির বিজয়ে আস্থাবান ছিলেন এবং তাঁহার অহুগামীদের লইয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে এক সৈন্তদল গঠন ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। নেহরুর বলিতেন যে, জার্মানদের অসহিষ্ণু মনোভাবের জন্তই তাহাদের সহিত তিনি মিত্রতায় আবদ্ধ হইতে পারেন নাই। তবে তিনি এ কথা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার কল্পপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার ও ক্রান্ত সাফল্য লাভে আগ্রহী নেতাজী বসুর মতের পার্থক্য গভীরতর ছিল। একবার বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল এবং বেদ সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল। বন্ধুরা আমায় বলিয়াছিল যে, অল্প আলোচনা হইলে আমি শীঘ্রই তাঁহার উদ্দীপনায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম। বস্তুতঃপক্ষে নেতাজী বসু প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার দেশের স্বাধীনতা আনেন নাই, আনিয়াছেন সুবিবেচক নেহরুর অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া। ভারতের ভাগ্যপথে

* সম্ভ্রুতি পরলোকগত ডক্টর ব্লঙ্ক (Dr. Hons. Friedrich Blunck) বিংশ শতাব্দীর অগ্রতম বিখ্যাত জার্মান কবি ও সাহিত্যিক। ভারত-তত্ত্ববিদ (Indologist) হিসাবেও তাঁহার নাম আছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে এই লেখাটি তিনি আমায় পাঠিয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত আমায় ‘Progressive German Reader’-এ এ প্রবন্ধটি আছে। উৎসাহী পাঠক মূল জার্মান প্রবন্ধটি দেখিতে পারেন।

নেহেরু-জীবনের রূপরেখা

(সংগৃহীত)

[আদি বাস কাশ্মীরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পণ্ডিত নেহেরুর পূর্বপুরুষ রাজকাউল দিল্লীতে আসেন। দিল্লীতে তখন মোঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ। নেহেরুর প্রপিতামহ সে-সময়ে দিল্লীর একজন কোতোয়াল ছিলেন। ১৮৬১ সালে প্রপিতামহ পরলোকগমন করেন। পণ্ডিত নেহেরুর পিতার জন্ম ১৮৬১ সালের ৬ই মে। পিতা মতিলাল নেহেরুর সময় হইতে নেহেরু পরিবারের এলাহাবাদে বসবাস শুরু হয় (ইংরাজী সন তারিখ ব্যবহৃত)।]

১৮৮২ ॥ ১৪ই নভেম্বর এলাহাবাদে জন্ম।

১৯০৫ ॥ মে মাসে অধ্যয়নের জগু বিলাত যাত্রা।

১৯০৭ ॥ কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি।

১৯১০ ॥ রসায়ন, ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্সদহ ডিগ্রী লাভ।

১৯১২ ॥ ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ। দেশে প্রত্যাবর্তন। এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ। ঝাঁকীপুর কংগ্রেসে যোগদান।

১৯১৩ ॥ যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেসে যোগদান।

১৯১৫ ॥ সংবাদপত্র-দলনবিষয়ক নতুন আইনের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ জনসভায় প্রথম বক্তৃতা দান।

১৯১৬ ॥ কমলা কাউরকে বিবাহ ও লক্ষ্মী কংগ্রেসে গান্ধীজির সহিত প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯১৭ ॥ হোমরুল আন্দোলনে যোগদান। ১৯শে নভেম্বর কল্যা ইন্দিরার জন্ম।

১৯১৮ ॥ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ লাভ।

১৯১৯ ॥ পাঞ্জাবের দাদা সম্পর্কে বেসরকারী তদন্তের জগু দেশবন্ধুর সহযোগিতা।

১৯২১ ॥ ৬ই ডিসেম্বর ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত সফর উপলক্ষে হরতাল পালন সম্পর্কে ইস্তাহার বিলির অপরাধে প্রথম কারাদণ্ড।

১৯২২ ॥ ওরা মার্চ জেল হইতে মুক্তি লাভ। ১১ই মে বিলাতি কাপড় বর্জন আন্দোলন পরিচালনার অপরাধে পুনরায় কারাদণ্ড।

১৯২৩ ॥ ৩১শে জানুয়ারী জেল হইতে মুক্তিলাভ।

২৩শে সেপ্টেম্বর রাজ্য-পরিত্যাগ আদেশ অমান্য

এমন একজন মহান রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ মিলিয়াছে যিনি ঠিক মধ্য-পন্থা বাছিয়া লইতে পারিয়াছেন। স্বাধীনতার জগু ভারত বহু শতাব্দী ধরিয়া অপেক্ষার পরে প্রায় বিনা রক্তপাতে এবং মোটামুটি শান্তির মধ্যে সাক্ষ্য লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ না হইলে ভারত বিনা রক্তপাতে স্বাধীন হইতে পারিত না। অনেক ইউরোপের বর্তমান সর্বাঙ্গীন দুর্গতির জগু আমাদের উপর দোষারোপ করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ইংলণ্ড একটির পরে একটি দেশ হারাইতেছে এবং তজ্জনিত ক্ষোভে ক্রিষ্ট হইতেছে।

নেহেরুর বই পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি সমগ্র মানব-জাতির হিতাকাজী এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিশ্বস্ত বন্ধু, বিশেষতঃ আমাদের জাতির। এই নিঃসঙ্গ মহান ব্যক্তি যিনি দীর্ঘজীবনব্যাপী সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতার ফলে

ঈশ্বরের করুণায় তাঁহার দেশবাসীর এবং সেই সঙ্গে তাঁহার অন্তরের স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমাদের সম-কালীন ব্যক্তিদের মধ্যে শীর্ষতম স্থানে উঠিয়াছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পারাও অতীব আনন্দের বিষয়। এই আদর্শ আমরা বিশ্বস্ত ইউরোপে শত অভাবের মধ্যে ভুলিয়া থাকিব ততদিন যতদিন না পৃথিবীর ইতিহাসে আরও নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়।

আমরা নেহেরু ও তাঁহার রচিত গ্রন্থকে অভিনন্দন জানাই। যখন ইউরোপে আমরা ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে যত্নের পথে আগাইয়া যাইতেছি তখন একাকী তিনিই মহান দৃষ্টান্ত হিসাবে দাঁড়াইয়া আছেন।*

* জার্মান হইতে সংকৃত ইংরেজী অনুবাদের সুপাঠ্য বঙ্গানুবাদ করার জগু সহকারী কেমিষ্ট শ্রীযুক্ত শ্রীমহেশ্বর চন্দ্র ভাটাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অপরাধে পুনরায় কারাদণ্ড। ৪ঠা অক্টোবর মুক্তি-
লাভ। এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি
নির্বাচিত ও নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের
সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৫ ॥ এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতির পদ-
ত্যাগ। কমলা নেহেরু মারাম্মক রোগে আক্রান্ত।

১৯২৬ ॥ পত্নীর চিকিৎসার জন্য মার্চ মাসে সুইজারল্যান্ডে
গমন। ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম ও
রাশিয়া ভ্রমণ।

১৯২৭ ॥ ফেব্রুয়ারীতে ব্রাসেলস্-এ যোগদান। স্বদেশে
প্রত্যাবর্তন ও অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের মাদ্রাজ
অধিবেশনে যোগদান।

১৯২৮ ॥ ২৯শে নভেম্বর লক্ষী সাইমন কমিশন বর্জন
উপলক্ষে শোভাযাত্রা। পুলিশ কর্তৃক লাঠি চার্জ।
ব্রিটিশ সরকারের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছেদনের
উদ্দেশ্যে ভারত স্বাধীনতা লীগ স্থাপন ও লীগের
সাধারণ সম্পাদক পদ গ্রহণ।

১৯২৯ ॥ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সমাজতান্ত্রিক
কর্মসূচি অনুমোদন। কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে
সভাপতিত্ব, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের
নাগপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব। 'Letter from a
father to his daughter' নামক পুস্তক প্রকাশ।

১৯৩০ ॥ ১৪ই এপ্রিল লবণ আইন অমান্যের জন্য ৬ মাস
কারাদণ্ড। ১৭ই অক্টোবর মুক্তিলাভ। এলাহাবাদ
কৃষাণ সমিতিতে যোগদান উপলক্ষে ২১শে অক্টোবর
পুনরায় ২ বৎসরের জেল কারাদণ্ড।

১৯৩১ ॥ ৩১শে জানুয়ারী মুক্তিলাভ। ৬ই ফেব্রুয়ারী
পিতার মৃত্যু। এলাহাবাদ ত্যাগের আদেশ অমান্য
উপলক্ষে পুনরায় ২৬শে ডিসেম্বর ২ বৎসরের জন্য
কারাদণ্ড।

১৯৩৩ ॥ মাতার অসুস্থতার জন্য ৩০শে অক্টোবর জেল
হইতে মুক্তিলাভ।

১৯৩৪ ॥ জানুয়ারীতে বিহারের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চল
পরিভ্রমণ ও দুর্গতদের জন্য সাহায্য দানের ব্যবস্থা।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতিত্বের জন্য ১৯৩৪

ফেব্রুয়ারী তারিখে ২ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড।
পীড়িতা পত্নীকে দেখার জন্য ১১ই আগষ্ট মুক্তিলাভ।
সরকার বিরোধী বক্তৃতার জন্য পুনরায় ২১শে আগষ্ট
গ্রেপ্তার। 'Glances of world History'
পুস্তক প্রকাশ।

১৯৩৫ ॥ আলমোড়া জেলে ১৪ই ফেব্রুয়ারী আত্মজীবনী
গ্রন্থ সম্পাদনা। পীড়িতা পত্নীকে দেখার জন্য ৪ঠা
সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ ও কন্যা সহ ইয়োরোপ যাত্রা।

১৯৩৬ ॥ ২৮শে ফেব্রুয়ারী পত্নীর মৃত্যু। লণ্ডন ও রোম
ভ্রমণ। ২৩শে এপ্রিল লক্ষী কংগ্রেস অধিবেশনে
সভাপতিত্ব। ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের
আইন অনুসারে নির্বাচনে যোগদান সিদ্ধান্ত।
নির্বাচন উপলক্ষে সারা ভারত পরিভ্রমণ। কৈজাবাদ
জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব।

১৯৩৮ ॥ মাতা স্বরূপরায়ণীর মৃত্যু। জাতীয় পরিকল্পনা
কমিটির সভাপতিত্ব গ্রহণ। গৃহযুদ্ধরত স্পেন
পরিদর্শন।

১৯৩৮ ॥ চীন পরিভ্রমণ।

১৯৪০ ॥ একক সত্যগ্রহের অপরাধে ৩১শে আগষ্ট
৪ বৎসরের জেল সশ্রম কারাদণ্ড।

১৯৪১ ॥ ডিসেম্বর মাসে জেল হইতে মুক্তিলাভ।

১৯৪২ ॥ ভারতের সমস্তা সমাধানের জন্য ষ্টাফোর্ড
ক্রিপ্সের সহিত আলোচনা-আলোচনা। কংগ্রেস
কমিটিতে 'ভারত-ছাড়' প্রস্তাব উত্থাপন। ৮ই আগষ্ট
গান্ধীজি ও কংগ্রেস সদস্যগণসহ গ্রেপ্তার হইয়া
আমেদাবাদ জেলে অবস্থান।

১৯৪৪ ॥ ১৩ই এপ্রিল "ডিস্কভারি অব ইণ্ডিয়া" লেখা
আরম্ভ।

১৯৪৫ ॥ ১৫ই জানুয়ারী জেল হইতে মুক্তি লাভ। ২৫শে
জুন সিমলায় ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা।
ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের
বিচারকালে আইনজীবী হিসাবে তাহাদের পক্ষ
সমর্থন।

১৯৪৬ ॥ মার্চ মাসে "ডিস্কভারি অব ইণ্ডিয়া" প্রকাশ।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ। পুনরায় কংগ্রেস সভাপতি

নির্বাচন। ১৪ই আগস্ট অস্বর্ভূর্ত সরকারের উপ-সভাপতির আসন গ্রহণ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভ্রমণ। কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব আলোচনার জন্ত বিলাত যাত্রা। গণপরিষদে দেশের শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা।

১৯৪৭ ॥ দিল্লীতে ভারতীয় (৩রা জাহুয়ারী) বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব। ১৯শে আগস্ট স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ। ৩১শে আগস্ট লিষাকত আলী, সর্দার পেটেল সহ পাঞ্জাবে দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন।

১৯৪৮ ॥ ১৭ই ফেব্রুয়ারী গণপরিষদে ভারতের নূতন গোষ্ঠী নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি বর্ণনা। ১২ই এপ্রিল হীরাবুদ বোধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। ২০শে আগস্ট পারমাণবিক কমিশনে প্রথম বৈঠকের ভাষণ দান। ৪ঠা অক্টোবর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক কমিটির বৈঠকের উদ্বোধন। ৬ অক্টোবর লণ্ডনে কমনওয়েল্‌থ প্রধানমন্ত্রী সম্মিলনে যোগদান। ৩রা নভেম্বর প্যারিস রাষ্ট্রসংজ্ঞার সাধারণ অধিবেশনের বিশেষ বৈঠকে ভাষণ দান। ১০ই নভেম্বর নয়া দিল্লীতে আন্তর্জাতিক আবহ সংস্থার আঞ্চলিক অধিবেশন উদ্বোধন।

১৯৪৯ ॥ ইন্ডোনেশিয়ার ওলন্দাজ অত্যাচারের নিষ্পত্তি করাব জন্ত এশিয়ায় ১৯টি জাতির সম্মেলনে যোগদান। ২৪শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ভারতের সহিত 'যুদ্ধ নয়' (No war) চুক্তিতে যোগদানে আহ্বান। ৭ই অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাত্রা। ১৯শে অক্টোবর মার্কিন কংগ্রেস ও রাষ্ট্র-সংজ্ঞার সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ। ২৪শে অক্টোবর মার্কিন সংসদে ভাষণ। ৬ই নভেম্বর নিগ্রোদের সেবার জন্ত মার্কিন স্পিরগার্ড পদক লাভ।

১৯৫০ ॥ ১২ই জাহুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দান। ২৮শে জাহুয়ারী ভারতের সুপ্রিম কোর্ট উদ্বোধন। পরিকল্পনা কমিশন গঠন। নেহেরু লিষাকত চুক্তি সম্পাদন, ২৬শে এপ্রিল করাচী গমন, ১৪ই জুলাই কোরিয়ায় যুদ্ধ

অবসানের জন্ত বিশ্বের তিনটি বৃহৎ শক্তির উদ্দেশ্যে আবেদন।

১৯৫১ ॥ কায়রো, স্কেনেভা, লণ্ডন, প্যারিস, নেপাল পরিভ্রমণ। ৯ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সম্মিলনে ভাষণ। হায়দ্রাবাদ সালাজং যাদুঘরের উদ্বোধন।

১৯৫২ ॥ ভারত সিরিয়া চুক্তি সম্মেলন। সাঁচীতে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মিলনে যোগদান।

১৯৫৩ ॥ বিশ্ব গান্ধী আলোচনা চক্রে যোগদান। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকে যোগদান। করাচী গমন। রাষ্ট্রীয় বিমান কর্পোরেশন উদ্বোধন। কলকাতা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের উদ্বোধন।

১৯৫৪ ॥ ইন্সটিটিউশন অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উদ্বোধন। সিংহল সফর। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে ২৫শে জুন অভ্যর্থনা ও যুক্তভাবে পঞ্চাশীল নীতি ঘোষণা। অক্টোবরে চীন সফর। যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটোকে অভ্যর্থনা। ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় পরিদর্শন।

১৯৫৫ ॥ রাষ্ট্রসংজ্ঞার সেক্রেটারী মিঃ দাগ হ্যামারশীল্ডকে নয়া দিল্লীতে অভ্যর্থনা। কমনওয়েল্‌থ সম্মিলনে যোগদান। ক্যান্টোভিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স নরোদম সিংহাঙ্ককে অভ্যর্থনা। ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ হুকে অভ্যর্থনা। মিশরের প্রধানমন্ত্রী নাসেরের সহিত সাক্ষাৎ।

বান্দুংয়ে অ্যাক্রোশ এশিয়া অধিবেশনে যোগদান। সৌদি আরবের প্রধান মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা। দিল্লীতে জাতীয় যাদুঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী ও প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইক্বান্দার মির্জার সহিত আলোচনা। রাশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, ইটালী ও মিশর ভ্রমণ। ভারতবর্ষ লাভ। প্রেসিডেন্ট স্কর্গের সহিত সাক্ষাৎ। লাওসের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রীর সহিত যুক্ত বিবৃতি দান। বাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান মেসিন টুলস্ কারখানার উদ্বোধন। ভারতে

সোবিয়ত প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগেনিন ও সোবিয়ত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চফ্কে অভ্যর্থনা। সৌদি আরবের রাজা সৌদিকে অভ্যর্থনা। শাগাজু'ন সাগর পরিকল্পনার ভিত্তিস্থাপন।

১৯৫৬ ॥ মার্চ মাসে বৃটিশ, মার্কিন, ফ্রান্স পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সোবিয়ত উপপ্রধান মন্ত্রির সহিত বৈঠক। বোম্বাইয়ে পরমাণবিক রিয়েক্টর স্থাপনের জন্য কানাডার সহিত চুক্তি সম্পাদন। লণ্ডনে কমনওয়েলথ-এ যোগদান। আয়ারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস, মিশর, সিরিয়া ও লেবানন পরিদর্শন, প্রেসিডেন্ট টিটোর সহিত বৈঠক, স্লোভাকাল বিরোধ মীমাংসার জন্ত শক্তিপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী। সৌরাস্ট্রে জীপ ছুঁটিনার নিষেধ। রাষ্ট্রসভ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার নবম অধিবেশনে ভাষণদান। মিশর সম্পর্কে আলোচনার জন্য কলম্বো চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রধানমন্ত্রীদের এক সম্মিলন আয়োজন। চীন প্রধানমন্ত্রির সহিত সীমান্তবিরোধ সম্পর্কে আলোচনা। ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপ ভ্রমণ। মিঃ চৌ এন লাই ভারত সফরকালে তাঁহার সহিত আলোচনা— (৩০শে ডিসেম্বর হইতে ২রা জানুয়ারী)।

১৯৫৭ ॥ বুদ্ধদেবের ২৫০০তম মহানির্বাণ দিবসে অমৃতানাদির চূড়ান্ত ব্যবস্থার জন্ত দালাইলামা ও পাঞ্চেন লামা সহ নালান্দায় গমন। হীরাবুদ পরিকল্পনা উদ্বোধন। বোম্বাইতে এশিয়ায় প্রথম রিয়েক্টরের উদ্বোধন। সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের সহিত আলোচনা। সোভিয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল জুকভকে অভ্যর্থনা। অস্থায়ী প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভার গ্রহণ। নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণ। সিরিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন ভ্রমণ। লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মিলনে যোগদান। হল্যান্ড, মিশর, ইরাম, ভূটান, জাপান ভ্রমণ। ২রা ডিসেম্বর কমনওয়েলথ সংসদীয় সম্মেলনে ভাষণদান।

১৯৫৮ ॥ চেকোস্লোভাকিয়া প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সি. ম্যাকমিনলনের সহিত

আলোচনা। আফগানিস্তানের রাজা জাহির শাহের সহিত যুক্ত বিবৃতিদান। রুম্যানিয়ার প্রধানমন্ত্রির সহিত অমুরূপ যুক্ত বিবৃতি প্রদান। ভূটান পরিদর্শন।

১৯৫৯ ॥ ঘানার প্রধানমন্ত্রী এনক্রুমাকে সংবর্দ্ধনা। আন্তর্জাতিক জুরী কংগ্রেস উদ্বোধন। পূর্বজার্মান প্রধান মন্ত্রী ও যুগোস্লাভাকিয়া প্রেসিডেন্টের সহিত আলোচনা। বাঙ্গালোরের বিজ্ঞান ইনস্টিটিউশনের স্তূবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে ভাষণ। আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা। দালাই লামার সহিত সাক্ষাৎ। নেপাল পরিদর্শন। জব্বলপুর ট্রাক নির্মাণ কারখানা উদ্বোধন। ভারত পাকিস্তান বিরোধ সম্বন্ধে পাক প্রেসিডেন্টের সহিত আলোচনা। আফগানিস্তান সফর। ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রির সহিত আলোচনা।

১৯৬০ ॥ দিল্লীতে চৌ এন লাইয়ের সহিত ভারত সীমান্ত সম্বন্ধে আলোচনা, ক্রমে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা। লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মিলনে যোগদান। প্যারিস, মিশর, তুরস্ক ও লেবানন পরিদর্শন। পাকিস্তানের সহিত সিন্ধুর জল বন্টন সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদন। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতাক্রমে রাষ্ট্র-সভ্যের শীর্ষ সম্মিলনীতে যোগদান। সোভিয়েত ও মার্কিন সম্পর্ক উন্নতির আবশ্যিকতা বিষয়ে অভিমত প্রকাশ। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের উদ্বোধন। প্যারিস পরিদর্শন। দক্ষিণ আফ্রিকার সার্লেনশিল ও লঙ্কা হত্যাকাণ্ডের নিন্দা। মিশর, তুরস্ক, নেপাল, সিরিয়া ও পশ্চিম জার্মান পুনরায় পরিদর্শন। পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সহিত আলোচনা। বিশ্বশান্তি প্রয়োজনীয়তায় রাষ্ট্রসভ্যের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দান।

১৯৬১ ॥ বোম্বাইয়ে কানাডা ভারতীয় পারমাণবিক রিয়েক্টরের উদ্বোধন। চীনের ভারত সীমান্তে প্রবেশের সংবাদ সংবাদিক সম্মিলনে ঘোষণা। কাশ্মীর সীমানা সম্পর্কে পাকিস্তানের সহিত চীনের আলোচনায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার অধিবেশন উদ্বোধন। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট রেজনেভকে স্বাগত জ্ঞাপন।

১৯৬২ ॥ আসামে ছুনমাটি তৈল সংশোধনাগার উদ্বোধন। ভারতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৯তম অধিবেশন উদ্বোধন। ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উহু-র সহিত সাক্ষাৎ ও কমনওয়েলথ শিক্ষা সম্মিলনে উদ্বোধন। ভারতের তৈয়ারি নিশান গাড়ীর উদ্বোধন। তৃতীয় নির্বাচনের পর নতুন মন্ত্রিসভা গঠন। নেপাল মহারাজ মহেন্দের সহিত সাক্ষাৎ। জাতীয় সংহতি পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব। লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মিলনে যোগদান। প্যারিস ও কোয়েটা পরিদর্শন। প্যারিসে রাষ্ট্রসভ্যের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার বৈঠকে ভাষণদান। রুম্যানিয়া রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা। চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্ত ২২শে অক্টোবর তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে আহ্বান। ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বকার স্থানে কিরিয়ানা গেলে ভারত কোনও আলাপ আলোচনা যোগদান করিবে না, এই মর্মে ২৭শে অক্টোবর তারিখে চীন প্রধান মন্ত্রিকে এক চিঠি প্রেরণ। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সেই সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট বাণী প্রেরণ। মালয়ের প্রধান মন্ত্রী টিঙ্গু আবদুল রহমানকে স্বাগত জ্ঞাপন। সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা। অস্ট্রায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ। সকল বিরোধ মীমাংসার জন্ত ৩০শে

নভেম্বর পাক প্রেসিডেন্ট আব্দুস খানের সহিত এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান।

১৯৬৩ ॥ চীন ভারত বিরোধ মীমাংসার জন্ত কলম্বো প্রস্তাব অমুমোদন সাপেক্ষে ২৩শে জাভয়ারী সংসদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন। গ্রামীন স্বেচ্ছাবাহিনী উদ্বোধন। লেবাননের প্রধান মন্ত্রী ও কাবোডিয়ায় প্রিন্স সিনহাবুককে অভ্যর্থনা। ভারতে নির্মিত প্রথম বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের উদ্বোধন। অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রসভ্য কর্তৃক শ্রীনেহের প্রস্তাব অমুমায়ী ১৯৬৫ সনকে সহযোগিতার বৎসর বলিয়া গৃহীত। ভাকারা বাঁধের উদ্বোধন। সিন্‌হাবুককে অভ্যর্থনা। আফ্রিকার দেশগুলির রাষ্ট্রদূতদের সম্মিলন আহ্বান। জর্ডনের রাজার সহিত সাক্ষাৎ।

১৯৬৪ ॥ উড়িষ্যার টিকার পাড়া বাঁধের উদ্বোধন। ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় অগ্নিস্ফোটা বোম্ব। ফেব্রুয়ারী মাসে নয়াদিল্লীতে ব্রহ্মদেশের বিপ্লব পরিষদের সভাপতি জেনারেল নে উইনের ও সিঙ্গাপুরের প্রধান মন্ত্রির সহিত সাক্ষাৎ। কোশি ও গণ্ডক পরিকল্পনার ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে নেপালের মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ। সুদানের প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা। ২৩-২৬শে মে দেরাডুনে অবকাশ বিনোদন। ২৬শে মে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন। ২৭শে মে অপরাহ্ন ১-৫৫ মিঃ পরলোকগমন।

অমর জওহর

শ্রীশুশমা মৈত্র

জাতির জনক গান্ধীশিষ্য অমর জহরলাল !
গগনচুম্বী হিমালয় সম বিরাট কীর্ত্তিমান !
অরণীয় হয়ে রহিবে ভারতে সে যে শাশ্বতকাল !
বিশ্বভূবন ভুলিবে না কভু তাঁর মহা অবদান !

পৃথিবীর সেরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করি'
জগৎ সভায় ভারত মাতাকে দিয়েছে উচ্চাসন !
সব ভেদভেদ দলিয়া চলিল নতুন পছা ধরি'
বিশ্ব মৈত্রী আনিল ধরায় জীবন করিয়া পণ !

পিতামাতা বধু নিজেও জহর সয়েছে কারাক্লেশ,
ইতিহাস তার ঘোষিবে কীর্ত্তি, অতি সুমহান্ সে যে !
বিশ্বহিতের চিন্তায় আঁখি রহিত নির্ণিমেষ !
জাতির ঈশ্বর অপमानে হৃদয়তন্ত্রী উঠিত বেজে !

তাঁর কাছে ছিল আরাম হারাম, এমনি কর্ম্মবীর !
বিশ্ব মানব মানিত তাঁহারে আপনাদের জন বলি' !
সারাটা জীবন কার্য্য করিল উন্নত রাখি শির !
তাঁহার প্রয়াণ অতি দুঃসহ আঁখি ওঠে ছলছলি' !



মহামৃত্যু :

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর পরলোকগমন ইদানীংকালে অতাবিত ছিল না। কিন্তু ইহার অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতা এই বিষোগ-বেদনাকে তীব্রতম করিয়া তুলে। একটি মাহুষের মৃত্যু শুধু আদমুদ্র-হিমাচল ভারতের প্রতি-প্রত্যন্তের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিন্তা নয়, সারা দুনিয়ার দিক-দিগন্তের জাতি-ধর্ম-দল ও মতবাদ নির্বিশেষে মাহুষের মনকে এমন ব্যাপকভাবে নাড়া দিতে পারে তাহা নেহেরুর জীবিতকালে কল্পনার বাহিরে ছিল। মাহুষের ইতিহাসেও বুঝিবা এমন দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়টি নাই। বিগত বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যু বিশ্ববাসীকে স্তব্ধ বিমুগ্ধ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাও ঠিক এমন ব্যাপক, এত সার্বভৌম ও সার্বজনীন ছিল না।

ঠিক দুই বৎসর পূর্বে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের মৃত্যুতে বাঙালীকে অভিভাবকহীন অসহায়তায় মুহমান হইতে দেখিয়াছি। পণ্ডিত নেহেরুর পরলোকগমনে আজকের দিনের রাজনীতিকেন্দ্রিক নিখিল ভারতবাসীর সমষ্টিগত অবচেতনে একটা নিরাশ্রয় নিরাবলম্বতার বোধ এই সার্বজনীন শোকবিস্মলতার হেতু, ইহা হ্রাসিত। মহাত্মাজীৱ মৃত্যুর পরে ছিলেন নেহেরু এবং আরও নির্ভরশীল স্বাধীনতা সংগ্রামের হৃদয় সৈনিক। নেহেরুর অভাবে বহু বিপদজাল বেষ্টিত, বিচিত্র সমস্যাপিড়িত ভাবতের আর তেমন উন্নত শির, বলিষ্ঠ, দ্রুতিষ্ঠ, নির্দ্বাণনিষ্ঠ, সংকল্পদৃঢ়, হিমালয়-সদৃশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্বপ্নবিভোর দরদী মাহুষ চোখে পড়ে না, ষাঁর উপর সহজ নির্ভরতা আসে, ষাঁকে কেন্দ্র করিয়া সান্ত্বনা মিলে আর মিলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা। জ্ঞানে-অজ্ঞানে নেহেরুর সমালোচক বা সমর্থক যাই হোক, তাঁর মুখ চাহিয়া খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিল বা থাকি যাইত, ইহা অনস্বীকার্য।

কিন্তু ব্যক্তিজীবনে মৃত্যুরও একটা মহেজ্ঞা আছে। আছে আশীর্বাদ। গান্ধীজীর জীবনে মরণের ক্ষণ ও

ধরণ তাঁর জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছে। করিয়াছে বিশ্ববরণীয়। নেহেরুর মত উত্থান-পতনের মুহূর্ত্ত সম্ভাবনাপূর্ণ পক্ষিল পিচ্ছিল রাজনীতির ক্ষুরধার পথের আজীবন-যাত্রীর এমন গৌরবময় মৃত্যু রাজনৈতিকের জীবনেতিহাসে অতি বিরল। নেহেরু-জীবনের সূচনা, সমাপ্তি ও ব্যাপ্তি সবই পরম সৌভাগ্যমণ্ডিত। বিধাতার বরপুত্র ছিলেন তিনি। ক্ষণজন্মা পুরুষের দৃষ্টান্ত জহরলাল। মৃত্যুর অমোঘ হস্ত তাঁকে গৌরবের চরম শিখরে উপনীত হইবার সজ্জাধনে মহাকালের অজ্ঞাত গর্ভে ঠেলিয়া দিয়া তাঁর জীবনের সার্থক চরিতার্থতা আনিয়া দিল। মৃত্যুর এত বড় আশীর্বাদ খুব কম নেতৃ-পুরুষের বিশেষ রাষ্ট্রনেতার ভাগ্যেই ঘটয়া থাকে। ভারতের আত্মস্বত্বী রাজনীতিতে অথবা বহির্বিশ্বের আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে নেহেরুর যে সফল ভূমিকা তার অভিনয়ের এক সঙ্গী-সঙ্কট সময়ে নেহেরু-জীবন-নাট্যের উপর মরণের এই যবনিকা-পতন নিশ্চয়ই সৌভাগ্যসূচক। অন্ত্যায় হয়তো অনতিদূর আগামীকালের রাজনৈতিক হুঁহুগের মধ্যে হুঁহুগের সূচনাও হইতে পারিত। ভাগ্যবিধাতারই ইহা অমোঘ বিধান। উপরিচর মানসের কাছে হয়তো আমাদের এই মন্তব্য ক্রটি শুনাইবে। কিন্তু ষাঁরা বিশ্বাস করেন, যে অলক্ষ্য বিশ্বচৈতন্য-শক্তির অমোঘ ইঙ্গিত ছাড়া গাছের একটি শুকনো পাতাও খসিয়া পড়ে না, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের এই মন্তব্যের মর্ম বুঝিবেন। রাজগৌরবময় মরণ নেহেরু-জীবনে সত্যই শ্রাম সমান—পরম সৌভাগ্য-স্বরূপ। মৃত্যু তাঁকে অতিমৃত করিল। গৌরবের মধ্যাহ্ন-মুহূর্ত্তে এই মৃত্যু নেহেরু-জীবনকে অক্ষয় করিল ভারত তথা বিশ্বচিন্তের চিরস্মরণের মাঝে।

মৃত্যুর আর একটি দিক আছে। সে দিকটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “মৃত্যু যে কেবল হরণ করে তা নয়, মৃত্যু জীবনের ভূমিকা। জীবনের অনেক জিনিষ দেখতে পাইনে তার নিজের আলোর মধ্যে, মৃত্যুর কালো পটের মধ্যে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। * * * বিজয়া দশমীর বিসর্জনের বেদনাতেই আমরা দেবতাকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করি।”

জীবিতকালে বহু বৈষম্যের মাঝে নেহেরু ব্যক্তি বা ভারতের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কি এবং কতখানি ছিলেন

তাহার পুরোপুরি অহুধাবন সম্ভব হয় নাই। তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে নেহেরুর সত্যকার স্বরূপটি আমরা চিনিলাম। বিসর্জন দিয়া জহরলালকে আমরা জানিলাম, বুঝিলাম। সুদীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি মুছিয়া সতের বৎসরের সদ্য স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের মর্যাদা বিশ্বের আঙ্গিনায় তিনি কিরূপ মহামহিমোচ্ছল করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহার পরিচয়ও মিলিল তাঁহার লোকান্তর গমনে।

২৭শে মে বুধবার অপরাহ্ন ১-৫৫ মিঃ পণ্ডিত নেহেরু তাঁর নয়াদিল্লীর তিনমূর্ত্তিমার্গ বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই এই দুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়ে সারা ভারতে এবং ভারতের সীমানা ছাড়াইয়া বহির্বিষে। লাদক হইতে কতাকুমারী ভারতের প্রতিটি নরনারীই শুধু শোকবিহ্বল হয় নাই, পাকিস্তান, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা দূরদূরান্তের প্রতিটি দেশের সরকারী বেসরকারী মানুষের মনে যে অভাব, যে শূন্যতা সৃষ্টি করে তা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সারা দুনিয়ার দেশ-জাতি-বর্ষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নরনারীর কাছে অলঙ্ঘ্য, হয়তো বা তাঁরও অজ্ঞাতে, কেমন করিয়া কবে নেহেরু এমন আপনজন, এত আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন তা তাঁর মৃত্যুর পরে সম্পষ্ট হইয়া উঠিল। সমস্ত দেশের সংবাদপত্রে ও রেডিওতে নেহেরুর মৃত্যু-সংবাদ পরিবেশনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শ্রীনেহেরুর তিরোধান সংবাদ শুনিয়া প্রায় সমস্ত দেশের রাজধানীতে (পিকিং ও লিদবন ব্যতীত) শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এবং নেহেরুর অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া উপস্থিত থাকিয়া শেব শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্ত প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র হইতে নয়াদিল্লীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। স্বয়ং ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী শ্রী অ্যালেক ডগলাস হিউম, রাগী এলিজাবেথের নিজস্ব প্রতি-
নিধি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ও তাঁর কন্যা, মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডীন রাঙ্গ, রুশের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন, যুগোস্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীপিটার স্ট্যাখালিচ, ইরানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, নেপালের মন্ত্রীসভার সভাপতি ডাঃ তুলসী-গিরি, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ হোসেন সফি, সিকিমের মহারাজা, পাকিস্তানের

পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীভূটো, সিংহলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক প্রমুখ বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শ্রীনেহেরুর অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন।

একটি মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া তেইশ ঘণ্টার মধ্যে পৌরাণিক ইন্দ্রপ্রস্থে, ঐতিহাসিক দিল্লীতে এইরূপ বিশ্ব-নেতৃসঙ্ঘ, এমন শোকোচ্ছল বিরাট জনসমাবেশ ইতিপূর্বে ভারতে আর কখনও ঘটে নাই। বুঝিবা বিশ্বেও ইহা অভূতপূর্ব।

ভারত রাষ্ট্রে প্রধান মন্ত্রীর লোকান্তরগমন উপলক্ষে বারোদিন রাষ্ট্রীয় শোকতিথি (ব্রাহ্মণোচিং দ্বাদশদিন অর্শোচ) পালন হইয়াছে এবং এই সময়ে রাষ্ট্রীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত রাখা হইয়াছিল। বিশ্বের অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রেই নেহেরুর মৃত্যু উপলক্ষে সাতদিন (সংযুক্ত আরব রিপাবলিক) হইতে দুই দিন (যুগোস্লাভিয়া) অধিকব্যবস্থা অবলম্বনের মধ্যে দিয়া শোকপ্রকাশ করা হয়। পৃথিবীর প্রায় সর্ব দেশেই মন্দিরে-মসজিদে-গীর্জায় নেহেরুর বিগতাস্মার শাস্তি ও উদ্ধগতির জন্য প্রার্থনা করা হয়।

বিশ্বের চারিদিক হইতে সমাগত, ভারত, দিল্লী ও দিল্লীর আশপাশ হইতে আগতপ্রায় ২০ লক্ষ নরনারীর (সাধারণ জনতা হইতে রাজা-মহারাজা, বহু প্রধানমন্ত্রী, প্রিন্স, বৈদেশিক বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক, কূটনীতিক প্রভৃতি) সমাবেশে অনুষ্ঠিত নেহেরুর রাজকীয় অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া, শুধু ঐতিহাসিক নয়, অভূতপূর্বও বটে, এ কথা চিন্তা করিতেও কেমন বিষয়ে উল্লাসে অভিভূত হইতে হয়।

দীর্ঘ পরাধীন ভারত, শোষিত নিপীড়িত, দরিদ্র ভারত! মাত্র সতের বৎসর খণ্ডিত বিস্তৃত ভারত স্বাধীন হইয়াছে। এই স্বল্পকালের মধ্যে এমন কি সাধনার মহিমা তার, যার জন্য এই মর্যাদা, এই সম্মান, বিশ্বের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার অধিকারীত্ব সে অর্জন করিল! ইহার জন্য ব্যক্তি-নেহেরুর কৃতিত্ব কতখানি? নেহেরু-নীতিরই বা দান কতটুকু? নেহেরুর জীবন, রাষ্ট্রনীতি ও দর্শন অভিযোগবর্জিত নহে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কালো পটের মধ্যে একটা জিনিষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, তিনি জাতি ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাইতে পারিয়াছেন। পারিয়াছেন ভারতকে বিশ্ব-

জাগতিকতার সংসারে সংস্থাপন করিতে। বিশ্বের বিচিত্র রাষ্ট্র ও জাতিসমূহকে তিনি ভারতের আঙ্গিনায় টানিয়া আনিতে পারিয়াছেন। নেহেরুর জীবন ও তাঁর নির্বিশেষ মানবতাবোধ বিশ্বমানুষকে একসূত্রে গাঁথিবার পক্ষে নিশ্চয়ই ইঙ্গিতগর্ভ। নেহেরু ইতিহাসের সন্তান। মানব ইতিহাসকে তিনি প্রগতির পথে অগ্রবহ করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন। বিশ্বের এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে নেহেরুর শান্তির ভূমিকা, তাঁর স্মহান ব্যক্তিত্ব, তাঁর জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, তাঁর অক্লান্ত শান্তি-প্রচেষ্টা ও যুদ্ধ-বঞ্চিত স্মন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন আজকের সর্ববিশ্বংসী যুদ্ধকে স্থগিত রাখিবার অনিশ্চিত সহায়ক হইয়াছে। সমসাময়িক কালে কেনেডি, নেহেরু, ক্রুশ্চেভ এই ত্রয়ী নেতৃত্ব বিশ্বের যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছিল তা অবধারিত বিঘ্নিত হইয়াছে পর পর একই বৎসরের মধ্যে কেনেডি ও নেহেরু মৃত্যুতে। নেহেরুর অভাব বিশ্ব চিন্তকে এই দিক দিয়া আশঙ্কিত করিয়াছে। নেহেরুর মৃত্যু অনাস্থীব্যবস্থার মধ্যে ক্রুশ্চেভকে সর্বাংগে উদ্বিগ্ন ও একাকী করিয়াছে।

নেহেরুর জীবন ও নীতির মূল্যায়নের সময় এখন নহে। আগামীকালে ঐতিহাসিকের নির্মম নিরীক্ষায় নিশ্চয়ই ইহা বিশ্লেষিত হইবে। কিন্তু ইহা অনিশ্চিত যে, যে-ভুবনে নেহেরু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে স্মন্দরতর রূপ দিবার স্বপ্নে বিভোর হইয়া বিরামহীন, শ্রম তিনি দিয়া গিয়াছেন—নিজেকে উৎসর্গ করিয়া—ছিলেন। স্বপ্ন তাঁহার ছিল। এ স্বপ্ন ছিল মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, ষ্টালিনেরও। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন ইহা। সেই বিরোট জ্ঞানধন বিশ্ববিধাতার কল্পস্বপ্নের সুরহারা এ স্বপ্ন। এ স্বপ্ন ছন্দের গতি দ্বন্দ্বিক—ডাইয়ালেক্টিক (dialectic)। দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের মধ্য দিয়া ইহা অন্ধকারে পথ-হাতড়ানো। বিশ্বকর্মার অখণ্ড মনের যে কল্পস্বপ্ন ও উৎস্রজন তাহা হইতে বিযুক্ত খণ্ড মনের যে স্বপ্ন ও সৃষ্টি তাহা কখনই সিদ্ধ, সম্পূর্ণ ও শান্তির হেতু হইতে পারে না। ভারত সত্যতার অন্তরতম সত্য হইতেছে এই সংযুক্তি। ঋষিকবির ভাষায় “নিজের শক্তিতে যাহা আমরা সৃষ্টি করি অর্থাৎ যাহাতে আমাদের

আত্মপ্রকাশ তাহার 'পরেই আমাদের পূর্ণ অধিকার। * * * যেখানে আমাদের আত্মপ্রকাশ বাধাহীন সেখানেই আমাদের মুক্তি।”

নেহেরু-যুগের বৃহত্তম অবদান গণতন্ত্র ও তাহার স্বায়িত্ব। এ যুগের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রকার ও প্রকরণ অ-ভারতীয় অমুকরণে এতই বিকৃত যে, ভাবতবর্ষের মৌলিকত্বকে ইহার মধ্যে জানা-চেনা যায় না। মনীষী H. G. Wells তাঁর 'Guide to New World' গ্রন্থে নূতন পৃথিবী রচনার কোন আলো ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে না পাইয়া! দুঃখের সঙ্গেই মন্তব্য করিয়াছেন: “I come to find what your vast sub-continent has to contribute to the world problems and I find nothing fresh, nothing new, nothing really Indian at all, nothing but stale echoes of the west misapplied.” বস্তুতঃ ভারতবর্ষের অমিশ্র আত্মাভিব্যক্তির পথ, মত ও কল্পসত্য ইহা নহে। নেহেরু বাহির হইতে ভারত-সত্তায় আসিয়া লগ্ন হইয়াছেন। ভারতকে তিনি খোলা চোখে দেখেন নাই—দেখিয়াছেন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সত্যতার রঙীন চশমার মধ্য দিয়া।

নেহেরু-যুগ তাই পুণ্য ভারতভূমিতে চূড়ান্ত নহে—লক্ষ্য-ক্রমের একটি পর্যায় মাত্র। তবুও ইহা দিব্য শক্তিরই তীর্থ্যক প্রকাশ। এই অবস্থান্তর বিধাতারই অনিবার্য বিধান—নেহেরু নিমিত্ত মাত্র। বিরোট পুরুষ জওহরলাল এই পরিবর্তন যুগের জন্ত চিহ্নিত। অনিশ্চিত তিনি ভগবদ্ বিভূতি। গীতার ভগবানেরই ইঙ্গিত:

যদ্ যদ্বিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা।

তত্ত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশ সত্ত্ববম্ ॥

এই বিশ্বসৃষ্টিতে যেখানে যাহাই শ্রী-ঐশ্বর্যযুক্ত আর প্রভাবশালী তাহা সেই পরমেরই তেজোহংশসম্মত। সেই বিশ্বশক্তিরই বিশেষ প্রকাশ। এত বিপুল জনসংখ্যাকার চিন্তাকর্ষক, এমন অজস্র প্রশংসা-বন্দনার অধিকারী যে বৃহৎ মানুষ তাঁর মধ্যকার সেই পরমা শক্তিকে আমবাও প্রণাম করিব এবং আশা করিব ভারতের আগামী যুগান্তর সংস্থাপনে নাম-রূপ বদলাইয়া শক্তির বরপুত্র এই নেহেরুরই আবার পুনরাবির্ভাব ঘটবে।



শিল্পীমন

— শ্রী ব্রজ নাথ ঝাং

(পূর্বাহ্নবৃত্তি : বৈশাখ, ১৩৭১ সংখ্যার পর)

হৃদয়ের মধ্যেও যখন বিন্দন ফিরলো না, তখন দেব-কুমার আর অপেক্ষা করতে পারলো না, ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সামনে নাটমণ্ডপের মাহুঘুলি শুয়ে পড়েছে, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, গ্রামের পথ অন্ধকার। ঝাঁঝি পোকাকার অবিরাম ডাক ছাড়া আর কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই। বিন্দন গেল কোথায় ?

দেবকুমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল আরো কিছুক্ষণ। তারপর পায় পায় এগিয়ে গেল গ্রামের পথে। কিন্তু কই কোথাও তো কেউ নেই। মাহুঘটা কি উবে গেল নাকি ?

চীৎকার করে ডাকতে সঙ্কোচ হয় আবার ঘর ছেড়ে বেশি দূর যেতেও মন চায় না, বিন্দন যদি ইতিমধ্যে অস্ত পথে ফিরে আসে।

কিন্তু বিন্দন ফেরে না। রাত্রি প্রথম প্রহরের শেষালের ডাক শোনা যায়। ঘরের পিদিমের তেল শেষ হয়েছিল, পিদিমটা বুক অবধি জ্বলে নিভে গেল। অন্ধকার ঘরখানির পানে একবার তাকিয়ে দেবকুমার কি করবে ভেবে পেল না। পরম্পরেই সব সঙ্কোচ কাটিয়ে

পুরোহিতের গৃহের দিকে চললো—বিন্দনের নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে, ভাল করে সন্ধান করা দরকার !

ইদারা পার হয়ে গিয়ে একটি ছোট বাগান, তার মাঝেই পুরোহিতের ঘর। ইদারার পাশেই বাগানের মুখে একটা প্রকাণ্ড আমগাছ এমন ঘন হয়ে উঠেছে যে তার নীচে দিয়ে যেতে রাতের অন্ধকারে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিছুই ঠাহর পাওয়া যায় না। আনমনা দেব-কুমারের চোখেও ঠাহর হয়নি যে সেই অন্ধকারে আরেক-জন মাহুঘ সামনে রয়েছে। হঠাৎ মুখোমুখি কথা শুনেই সে চমকে উঠলো।

—কোথা যাচ্ছিস ?

দেবকুমার সহসা কোন জবাব দিতে পারলো না। আরো জোরে প্রশ্ন হলো—যাচ্ছিস কোথা ?

এবার দেবকুমার ঠাহর পেল, সামনে দাঁড়িয়ে এক সন্ন্যাসী।

—কী ? কথা বল ?

কিন্তু কি বলবে দেবকুমার ভেবে পেল না।

—যে চলে গেল, তার পিছনে আর ছুটছিস কেন ? সে তোরে কেউ নয়।

এবার দেবকুমার কথা খুঁজে পেল, বললো—চলে গেল মানে ?

—যার প্রয়োজন সে তাকে ডেকে নিয়ে গেল।

—কোথায় ?

—উপস্থিত প্রতিষ্ঠানে।

—আমি জানলাম না, আর তাকে প্রতিষ্ঠানে নিয়ে গেল ?

সন্ন্যাসী এবার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো।

দেবকুমার এবার চিনলো, বিস্ময়ে বলে উঠলো—ভৈরব !

হাসি থামিয়ে ভৈরব তার কাঁধে একখানি হাত রাখলো, বললো—আয়। বাজে ঘুরিস নে।

সে স্পর্শে কি ছিল কে জানে, দেবকুমার কোন কথা না বলে ভৈরবের অহুসরণ করলো।

সারা রাত পথ চলতে চলতে উষার আলো ফুটলো। সূর্যোদয়ের পূর্বেই এক ক্ষীণতোয়া নদীর কিনারায় এসে ভৈরব থামলেন। বললেন—নে, এবার এখানে

হাতমুখ ধুয়ে খানিক জিরিয়ে নে, তারপর ওদিকের গ্রামে যাবো।

দেবকুমার হাতমুখ ধুয়ে নিল। তারপর জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে রেখে কিনারায় একখানি পাথরের উপর বসলো। এবার সে অনুভব করলো দীর্ঘ পথচলার ক্লান্তি ও গত রাত্রে অনাহারে থাকার অবসাদ।

একটু পরেই দেখা গেল ভৈরব নদীতে গিয়ে নেমেছেন, হাঁটু-প্রমাণ জলে নেমে তিনি সোজা টান হয়ে শুয়ে পড়েছেন, পা থেকে মাথা পর্যন্ত জলের স্রোত বহে যাচ্ছে।

স্নান সেরে এসে ভৈরব বললো—বসে বসে ভাবছিচ্ছি কি, স্নান সেরে নে। মন প্রশুভ হবে।

—এখন থাক, পরে স্নান করবো।

—ওই মেয়েটার কথা তুই মন থেকে ঝেড়ে ফেল দিকি, যে তোর নয়, যে তোকে টেনে নামাতে চাইছে, তুই তাকে নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

—যে আমার ভরগায় এলো, তার উপর আমার একটা কর্তব্য তো আছে!

—ওইখেনেই তোদের ভুল। জীবনে কত জন আসবে আবার চলে যাবে, তোকে তোর পথ ধরে চলতে হবে। এক একবার জন্মাচ্ছিস এক একটা কাজ শেষ করে যা, যত এদিক-ওদিকে টলুবি ততো সমস্যা যাবে, এক একটা কাজ শেষ করতে দু-জন্ম তিন-জন্ম লাগবে, তাহলে মুক্ত হবি কখন? বন্ধনে যত জড়াবি, ততই এগিয়ে যাবার বাধা, যতই বাধা কাটিয়ে যাবি ততই তোর লাভ।

—আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না, তাহলে তো কর্তব্য বলে কিছু থাকে না, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাই ভাল।

—মামুষের লক্ষ্য কি জানিস তো,—মুক্তি। আর কর্তব্য হলো সব কিছুকে পাশ কাটিয়ে সেই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছানো। বাকি যা কিছু করবি সবই অ-কর্তব্য।

—তাহলে জগতে অকর্তব্যই তো বেশী।

—সে তো সত্যি। ওইখেনেই তো মহাশক্তির খেলা, ওকেই বলে মায়া। যার দৃষ্টি খুলে গেল সে-ই

মায়া কাটিয়ে উঠলো, সে-ই হলো তখন মুক্তির অধিকারী। বড় কঠিন কথা, জন্ম-জন্ম সাধনার কথা, সবাই তো পারে না, পারে না বলেই মামুষ এতো রকমারী জগতের প্রকাশ এত বিচিত্র। তাই তো বলি পথের বাধা কটিয়ে আয়, যা করতে এসেছিস করে যা—কর্ম ক্ষয় করে।

খানিক তাকাতে নদীর ওপারে কয়েকজন রমণীকে দেখা গেল, সেদিকে তাকিয়ে ভৈরব বললেন—ওসব কথা পরে হবে, চল এবার ওপারে গ্রামে যাই।

ভৈরব দেবকুমারকে নিয়ে নদী পার হলো। জল কোথাও হাঁটু ছাড়িয়ে উঠলো না। কিছুদূর গিয়েই গ্রাম। গ্রামে ঢুকতেই পথের পাশে মন্দির ও নাটমণ্ডপ। মন্দির দ্বার খোলাই ছিল। মধ্যে শিবলিঙ্গ। ভৈরব সামনে এসে দাঁড়ালো। উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করলো—

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্মু-

র্ষ ইমাং লোকাগীনাং ঈশনীতিঃ।

ভগীশ্বরগাং পরমং মহেশ্বরম্

পতি পতীনাং পরমং পরস্তাং ॥ [খেতাস্তরোপনিষৎ]

তারপর নাটমণ্ডপে উঠে এসে, একপাশে যে খণ্ডের গাদা ছিল, তারই খানিক টেনে নিয়ে ছড়িয়ে দিল। একপাশে নিজে বসে পড়লো, বললো—নে তুই এবার এপাশে শুয়ে খানিক ঘুমিয়ে নে। বড় ক্লান্ত হবে পড়েছিস।

সত্যিই দেবকুমার খুব অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, সে শুয়ে পড়লো।

পান্নাগড় ও সৎনামগড়ের পথে প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাতে তাদের পক্ষকাল লেগে গেল। তিন চারদিন আগেই তারা আসতে পারতো কিন্তু মাঝে ক'দিন আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না। বৃষ্টি সামনে রেখে ভৈরব আর পথে বেরোন নি। বলেছিলেন—কোন রাজকাজের তাড়া তো নেই। সুবিধামত গিয়ে পৌঁছানো নিয়ে কথা।

দেবকুমার বলেছিল—দেবী হলে ষ্ট্রানকে ধরতে পারবো তো?

—আমি তো বলেছি তার সঙ্গে তোর দেখা করিয়ে দোব, তবে তুই ভাবছিস কেন? তবে মনে রাখিস সে

রাতের লগুন

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মিঃ রাজগুরুর কাছে ইতিপূর্বে অনেকবার গিয়েছি। তখন দেখা পেতাম। ইদানীং যে কা হয়েছে, গেলেও আর দেখা হয় না।

লগুনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান ষ্টাডিস্-এর বাড়ি। সেখানের একটি বিভাগে মিঃ রাজগুরু শিক্ষাব্রতী। শেষ যেদিন গেলাম, সেদিনও সেই মুখচেনা আফ্রিকান ছাত্রটির সঙ্গে দেখা। হোস্টেলের সভ্য। ইতিপূর্বে তাকে অনেকবার বিরক্ত করেছি—মিঃ রাজগুরুর সম্মান চেয়ে। এদিনও জিগ্যেস করলাম। ছাত্রটি হেসে জবাব দিলে, তিনি তো আউট। তুমি মেসেজ (message) লিখে যেতে পার। এলে তিনি পাবেন।

বললাম, যদি বসি খানিকক্ষণ?
বসতে পার।

এদিনও ছাত্রটি সেই পূর্বপরিচিত ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। অত্যন্ত ইংরেজ ছাত্রেরা তখন তাস খেলছে। অবশ্য খুব আস্তে আস্তে। বাঙালী ছাত্রদের মতো হজা করছে না। একটি খবরের কাগজ নিয়ে বসলাম। কিন্তু আরামে শরীরটা যেন অবশ হয়ে এল। বাইরে যখন অসহ্য ঠাণ্ডা—ঘরের মধ্যে সুন্দর উত্তাপ। এক পাশে প্রজ্জ্বলিত গ্যাসের উত্তুন।

কাগজে মন বসল না। অনেকটা সময় নষ্ট হল বন্ধুবরের অপেক্ষায় থেকে। শেষ কালে আর কি করি?

তোর যুগ্মাঙ্গা নয়। সে তোকে তোর সাধনভূমি থেকে টেনে নামিয়ে আনতে চায়। ওরাই মায়া, ওদের পাশ কাটিয়ে এগোতে হবে। পারিস্ ভালো, না পারিস্ জন্ম-জন্ম ঘুরবি এই চাকায়। তোর মন সাধকের মন, তাই সাবধান করে দিই। টলেহিস্ কি ডুবেহিস্।

দেবকুমার কোন কথা বললো না।

ভৈরবও তার মুখের পানে তাকিয়ে আর কিছু বলেন নি।

ভৈরব দেবকুমারকে বলেছিলেন, প্রতিষ্ঠানে বিন্দনের সঙ্গে তার দেখা হবে। সেই জন্তই দেবকুমার ভৈরবের

একটা মেসেজ লিখলাম। যে বোর্ডে মিঃ রাজগুরুর নাম ছিল, তার বিপরীত দিকে সেটা আটকে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

রাত্রি দশটা বেজে গিয়েছে। কিন্তু এখানে রাত্রি নয়, সবে সন্ধ্যা। রাত্তায় সেইমাত্র দিনের আলো নিবেছে। রাত্রের নিয়ন আলোশুলো জলে উঠেছে। নির্জন পথে সে-এক গোলকবাঁধা।

একটা বাসে উঠলাম। পাছে ভুল হয়ে যায়—সেই ভয়ে কন্ডাক্টরকে জানালাম, অলডুইচে যদি দয়া করে নামিয়ে দাও.....

বাসের কন্ডাক্টর অবশ্য পুরুষ নয়—মেয়ে। ঠোঁটে চমৎকার লিপষ্টিক, মুখে পাউডার, গালে রক্ত, চোখে সূর্য্য, মাথায় সোনালী চুল। কন্ডাক্টর না হয়ে সে যাত্রী হলেও অসুবিধা ছিল না।

যখন বাস অলডুইচে এল, মেয়েটি একগাল হেসে অভিবাদন জানালঃ গুড্ নাইট...

এরকম মেয়ে কি রাতের লগুনে আর চোখে পড়েনি? কেন পড়বে না? সেদিনই তো হাইড্ পার্কে...

সাহো, ইস্ট এণ্ড্—এসব জায়গায় অবশ্য রাত্রের দিকে বড় একটা যাই না। শুনেছি, জায়গাগুলি ভালো নয়। সময় সময় গুণ্ডগোল হয়। খুন-জখম লেগেই থাকে। পুলিশ আসে। জনকয়েককে ধরে নিয়ে চলে যায়।

ইংলণ্ডের পথঘাটই কী কম সুন্দর? রাত্রের দিকে

সঙ্গে প্রতিষ্ঠানে এসেছিল। অবশ্য রাজ্যাভিষেক দেখার যে ঔৎসুক্য ছিল না, তা নয়, তবে সম্পর্কে আকর্ষণ ছিল তার চেয়ে বেশী। এই কয়েকটি দিনের মধ্যে বিন্দন যে এমনভাবে তার মন দখল করে ফেলেছিল তা সে আগে বোঝেনি। বিন্দনের অদর্শনই সেটুকু বুঝিয়ে দিল।

ভৈরব বলেছিলেন—মায়া তোকে বাঁধতে চাইছে। মায়া মিথ্যা। বিন্দন তোর কেউ নয়। তোর যুগ্মাঙ্গা অমৃত আছে। যেদিন তাকে খুঁজে পাবি, সেদিনই তোর সিদ্ধি। (ক্রমশঃ)

বাসে গেলো সেটা নজরে পড়ে। কত মনিহারি দোকান। যদিও সেগুলি থাকে বন্ধ, তবুও কাঁচের শার্সি দিয়ে ভিতরের সবকিছু দেখা যায়। আলো জ্বলে। কোনো-কোনো দোকানের শো-কেসে পাহারা দেয় বিড়াল! তারপর কত ব্যাক, বাড়ি, লাল বাস, গির্জা! এত পার্ক—গুনে শেষ করা যায় না। পার্কগুলিতে যেন সবুজ ঘাসের জাক্জিম বিছানো। গাছ-পালার সৌন্দর্যও অপরিণীম। আর সে কত রকমের গাছ: অ্যাশ, এম, ওক, স্কটস পাইন, লাইম, পপলার, বীচ, চেন্টনাট, মালবেরি, টাইবার্ণ, উইপিং উইলো...

পথ কোথাও উঁচু, কোথাও গোড়েন। রাস্তার দু পাশে আলো জ্বলে। সিনেমা, থিয়েটার, নাচঘর, নাইটক্লাব, বিশেষ বিশেষ হোটেল, মদের দোকানে কত ভিড়! আবার কোনো-কোনো অঞ্চল একেবারে নিস্তব্ধ। কোনো রাস্তার ফুটপথে হয়তো একটি যুবক, পাশে যুবতী। পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে মুখ আনছে এগিয়ে।

লগুনে এসে প্রথম যখন এক্সজিটার স্ট্রিটের বাসায় স্থান পাই, রাত বারোটোর পর গুনি—কত কী-ই নাকি ঘটে! নিচে একটা গ্যারেজ ঘর। তার গভীরে ঢুকে যায় মেয়ে ও পুরুষ। তারপর তারা কতক্ষণ পরে ক্লাস্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। অত্যাশ্চর্য বন্ধুরা ভিড় করে দেখতে যেত। দেখতে গিয়ে অনেকে আবার ভিড়েও পড়ত। আমার সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য জানি না, সে-সুযোগ গ্রহণ করবার আগেই আমাকে বাসা বদল করতে হবেছিল।

হিলগ্রোভ রোডের বাড়িতে গরমেব রাতে কতদিন ঘুম হত না। কাঁচের জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতাম। রাত তিনটের সময়ও দেখেছি, কোনো মেয়ে হয়তো একাকিনী মোটর-বাইক হাঁকিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে যেন একটা জ্বলন্ত রূপোলী বিদ্যুৎ।...

তারপর সেই হাইড পার্ক।—

দিনের কর্মময় জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করে রাত দশটার সময় এখানে এসে বসেছি। বাইরে বজ্রতার

স্রোত। পার্কের নিবিড়ে কিন্তু অত দৃশ্য। এলো-মেলো অসংখ্য চেয়ার পাতা আছে তৃণাচ্ছাদিত মুস্তিকায়। কোনোটা গছ। কোনোটা আরাম কেদারা। গ্রীষ্মকালে মাঘ মাসের মতো মাঠে শীত। পথের তলায় বাস। একটি শীতল অথচ মনোরম পরিবেশ। প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে গেলে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না। কে বলে গড়ের মাঠ বড়? এরকম শত শত গড়ের মাঠ ইংলণ্ডের পেটের মধ্যে। কিন্তু গড়ের মাঠে আজকের দিনে যে-দৃশ্য দুর্লভ, এখানে তারই আশ্চর্য প্রাচুর্য। মাত্র পঞ্চাশ গজের মধ্যে কত যে জোড়া জোড়া মেয়েপুরুষ শুয়ে শুয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে। যে না দেখেছে, তাকে কী করে বোঝাব? সে কি মিনিট পাঁচেকের ব্যাপার? ও-রকম কত মিনিট পাঁচেক পার হয়ে গিয়ে ঘণ্টার ঘরে কাঁটা ঘুরে আসছে। সঙ্ঘার অন্ধকার যত ঘনীভূত হয়, দূরে দূরে ল্যাম্পপোস্টগুলির আলো হয়ে ওঠে কুয়াশা আর মেঘলায় অস্পষ্ট, এদের সোহাগও তত দীর্ঘায়ু হতে থাকে। ঘুরে ফিরে ছড়িয়ে-গড়িয়ে এ যেন বিষধর শব্দচূড়ের শবন লীলা। কালো স্কার্ট বা অলেন্ডারের ভিতর থেকে কারো পাকা আমের মতো ছুটি স্তন্যর হাত বা পা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেখব না বললেই কি না দেখে থাকা যায়? চোখকে বন্ধ করলে কি হবে—মনের যে হাজারটা চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে এ দৃশ্য দেখবার জন্য! দেখো ক্ষতি নেই, কিন্তু যাদের দেখছ, তারা তোমাকে গ্রাহ্যই করবে না। আফ্রিকান তত্ত্বালোকের সমস্ত দেহ কালো পোশাক-পরিচ্ছদে ঢাকা। গলার কলারটি দুধ-শাদা। এখানে সাদা-কালোর সান্নিধ্যে কোন বাধা নেই। আশ্চর্য লগুনের রাত আর তার নির্লজ্জ সত্যতা!

এই ঘটনার আগে—এমন কতকগুলি মেয়ে থাকে, যারা নিঃসঙ্গ পুরুষের কাছে এসে প্রস্তাব করে: *Will you have a nice moment with me?*...

বাস-কন্ডাক্টরের মতো কাকেই বা দেখতে নয়?

কিন্তু যা বলছিলাম।—

রাজগুরু একদিন দেখা পেলাম। হাইড পার্ক-সংলগ্ন কেনিংটন গার্ডেন্সের ধারে একটা মোটর

দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। সে-মোটরে শুধু রাজগুরু ছিল না, ছিল আরো একটি বাঙালী মেয়ে। বর্ষার রাত...হয়তো এগারোটা। কিম্ব কিম্ব করে বৃষ্টি পড়ছে। লতায় পাতায় সে বৃষ্টির জল গলে গলে পড়ছে। সামনের হ্রদে যেন অসংখ্য ফুল ফুটছে। রাজগুরু আর মেয়েটি এক সময় উঠে বসল। মেয়েটির খোঁপা খুলে গিঁথে চুল ছড়িয়ে পড়েছিল পিঠের উপর। আর সহসা বিহ্যন্তের আলোয় মেয়েটিকে দেখে কী চিনতে পারলাম?

কলকাতার একটা বাড়িতে বছর পাঁচেক আগে আমরা ভাড়া থাকতাম। সে-বাড়ির একটি ক্ল্যাটে দুটি বড় মেয়ে ছিল। দু'বোন। সুমিত্রা আর সুচিত্রা। সুমিত্রা বড়। বয়সে এক বছরের তফাৎ। দুজনেরই স্বাস্থ্য, গায়ের রঙ আর মুখশ্রী ছিল সুন্দর। দুজনকেই প্রায় এক রকম দেখতে ছিল। বড়র ঠোঁটে ছিল তিল। ছোটর সেটি ছিল না। খুব সামনে থেকে এটা না লক্ষ্য করলে বোঝা যেত না। দু'বোনই আই. এ. পড়ত।

বাড়িতে পড়াতে আসত সুমিত্রাকে একটি যুবক অধ্যাপক। নাম অসিত মজুমদার। অসিত প্রায়ই লক্ষ্য করত, সুমিত্রার পড়াষ তেমন মন নেই। সে সময়, হয় সে পাড়ার কোনো বর্ষা ছেলের সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছে, নয়তো কোনো ফাংশনে।

অসিত বলত, তাহলে আর মাইনে দিয়ে আমাকে রেখে লাভ? যদি তুমি নাই পড়—ছেড়ে দাও।

কেন, হিংসে হচ্ছে নাকি? সুমিত্রা অসিতের দিকে কোঁড়কের সঙ্গে চাইত। বলত, বেশ তো আপনিও তো আমাকে নিয়ে যেতে পারেন—যেখানে আপনার খুশি!

অত রাগ করেন কেন মশাই? বলেছি, কোনো দিন যাব না?

পুরুষের মন! কতদিন আর নির্লিপ্ত থাকতে পারে? সুমিত্রার বাবা-মা বৃদ্ধ। তাঁরা থাকতেন অল্প ঘরে। সেদিন সুচিত্রাও বাড়িতে ছিল না। বর্ষা নেমেছে নিবিড় হয়ে। মেঘ-মেহুর আকাশ...

সুমিত্রা অসিতের সামনেই দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। বললে, নিন, এবার কী চান আপনি বলুন। পড়বার সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কী দেখেন বলুন তো?

অবশেষে সুমিত্রার বিয়ে হয়ে গেল একদিন অসিতের সঙ্গেই।

অসিতের কেউ কোথাও ছিল না। যেস থেকে ওই বাড়িতে এসেই সে পাকাপাকি ভাবে উঠল।

বিয়ের কয়েক মাস পরেই সুমিত্রা একটা চাকরি পেলে এক বড় লোকের টেটে। এক অবিবাহিত কুমার বাহাদুরের কাছে, দক্ষিণ কলকাতায়।

অসিত আপত্তি করেছিল। সুমিত্রা শোনেনি। দশটা পাঁচটার কাজ! আপত্তির কি আছে?

সুমিত্রা বলেছিল, আমি তো তোমারই আছি রাক্ষবেলা। আবার কথা কি? দেখছ, করসেটগুলো কেনন ছোট হয়ে যাচ্ছে...?

ছ'মাস পরে সুমিত্রা বলেছিল, অসিত, আমাকে এবার একটা নার্সিং হোমে যেতে হবে। কুমার বাহাদুরের ইচ্ছে নয় যে আমি যা হই। আমাকে চিরকুমারী দেখতেই তিনি বড় বেশি ব্যস্ত।

কুমার বাহাদুরের ইচ্ছেটাই সব? অসিত ক্রুর-হাসি হেসেছিল।

সুমিত্রা নার্সিং হোমে যতদিন ছিল, কুমার বাহাদুর সমানে তাকে দেখতে যেতেন। রাজে দু'ঘণ্টা বসে চুরট যেতেন। রোগিনীর সঙ্গে গল্প করতেন। অসিতকে যেতে দেখলেই চটে উঠতেন। বলতেন, কেন তুমি একে বিরক্ত করতে আস বলো তো? তোমার কি কাজ নেই নাকি হে?

অনেক রাজে কুমার বাহাদুর বাড়ী কিরতেন নিজের গাড়িতে। তখন তিনি প্রায় বেহাশ। তার আগে নার্সিং হোমের ডাক্তারের সঙ্গে বেশ কয়েকবার গেলস ঠেকা-ঠেকি করে নিতেন।...

উৎসব অনুষ্ঠানে - ইব্রাহিম সান্দেগ অপরিহার্য!

৮৬, আমহার্ট স্ট্রীট কলি: ১
ফোন-৩৫-১৩৮৩

৬, নটবর দস্ত রো, কলি: ১২
ফোন-৩৪-২৫৩৩

অসিতের এক দূর সম্পর্কের ভাই ফিল্ম ডিরেক্টর। সোপান মজুমদার। থাকত বোম্বাই। কেউ-ই কারো কোনোদিন খোঁজ নিত না। একদিন সে সহসা অসিতের কাছে এসে হাজির। কোথায় উঠবে? অসিতের তো স্বস্তরবাড়ি রয়েছে। সুমিত্রারও তাকে দেখে খুব পছন্দ হল। বললে, ঠাকুরপো, আপনি অতঃ কোথাও উঠতে পারবেন না—যতক্ষণ আমরা এখানে আছি।

সোপান একটা দামী হার কিনে এনে উপহার দিল সুমিত্রাকে। তারপর—দিন নেই, রাত নেই, সুমিত্রাকে নিয়ে ট্যাক্সি-ভ্রমণ। সারা কলকাতা, ব্যারাকপুর, ডায়মণ্ডহারবার চষে বেড়ানো।...

অসিতের মনে হয়, কতদিন সে সুমিত্রার ছাড়া মাড়ায় নি।

কুমার বাহাদুর সুমিত্রাকে ছুটি দিয়েছিলেন কিছুদিনের মতো। কারণ সুমিত্রার মতো আরো মেয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী। তাদের দিকেও চাওয়া দরকার। একা সুমিত্রাকে নিয়ে তো পড়ে থাকলে চলবে না! তা ছাড়া সুমিত্রা তাঁর কাছে আজ নতুন নয়। কুমার বাহাদুর উটকামণ্ড বেড়াতে গেলেন কয়েকটা বাছা-বাছা স্বাস্থ্যবতী মেয়ে নিয়ে।

অধ্যাপক অসিতের সহসা একদিন হুপুরে কী-একটা দরকার পড়েছিল। কলেজ থেকে বাড়ি এসে দেখে—তার ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে খিল খাঁটা। একটা ছোট জানলার আড়াল থেকে যা দেখতে পেল, তাতে মনে হল সে এখনই পড়ে যাবে।

এত যে ঘটনাবলী এর পাশে কিন্তু সূচিরা ছিল যেন পক্ষে পদ্রফুল। বড় বোনের জীবনের কোনো ধারাকেই সে অবলম্বন করেনি। তার মতো স্থির, আদর্শচরিত্র বুদ্ধিমত্তী মেবে যেন ও-বাড়ির বৈচিত্র্য। কতদিন সুমিত্রা বুঝিয়েছে, জীবনকে দেখতে শেষ, কী হবে তোর পড়াশুনা করে? পাঁচজনের সঙ্গে মিশবি না, বড় সমাজের সঙ্গে খেলবি না, আমোদ-আহ্লাদ করবি না—তো মেয়েহলে হয়ে জন্মেছিস কেন? আমাকে দেখেই তো শিখতে পারিস। চারধার থেকে কত ডাক, আজ এখানে, কাল সেখানে। এম.এ. পাশ করে লোকে একটা চাকরি পায না, অথচ আমাকে চাকরি দেবার জন্যে কত মালিক

লালায়িত! এ গাড়ি দিতে চাইছে, ও বাড়ি দিতে চাইছে, ও ছবিতে হিরোইন করতে চাইছে, ও টেলিফোন দিতে চাইছে, একটু স্থির হয়ে বসে যে কারো কথা হৃদয় ভাবব, সে সম্বন্ধে হাতে নেই। আর তুই? তুই কি বিদ্যাসাগর হবি? এমন রূপ-যৌবনটা নিয়ে তুই কী করবি—তুনি?

সূচিরা যেন অতঃ জগতের মেয়ে। এসব কোনো কথাই তার মনে বেখাপাত করে না। দিদির কথা এক কান দিয়ে শোনে, আর এক কান দিয়ে বার করে দেয়।

তখন শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে সুমিত্রা: তা ছাড়া তুই কি আনিস না, আমরা কার মেয়ে? যার পেট থেকে পড়েছিস সে তো বাড়ীর ঝি! আসল গিন্নী মরে যাবার পর কতী একে নিয়েই থাকে। এরই ঔরসে তো আমাদের জন্ম। কেন আমরা দুদিনের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলব না তুনি? কাকে ভয় করব?

* * *

মি: রাজগুরুর সঙ্গে দেখা একদিন হলই। ইণ্ডিয়া হাউসে হুপুরবেলা সে লাঞ্চ খেতে এসেছিল। দেখা হতে সেই প্রপল্টাই তুলেছিলাম: তোমার যে মেয়েবন্ধু, ওর নাম সুমিত্রা?

রাজগুরু আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। তাকিয়ে থেকে জিগ্যেস করেছিল তুমি ওদের চেন নাকি?

চিনতাম এককালে। একসাথে ভাড়া থাকতাম এক বাড়িতে।

তাই বলছিল বটে ও।...আরে যা-তা মেয়ে। আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে...বিলেতে এসেছে আট শিখতে না ছাই।

মি: রাজগুরু একটু দম নিয়েছিল, সিগারেট ধরিয়েছিল, তারপর বলেছিল সুমিত্রা তো বেঁচে নেই। সে খুন হয় বোম্বে গিয়ে। তার স্বামীও শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেছে। এর নাম সূচিরা। সুমিত্রার ছোট বোন।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারত বুঝি বা লগুনের পথে। কিপলিং-এর কথা মিথ্যে করে দিয়ে পূর্ব পশ্চিম হাত মিলাচ্ছে, কিন্তু কোন অবরত্তরে?



சென்னை, 19/11/2023



লিয়োঁ (Lyons)-তে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি টুর্নামেন্টের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের পক্ষে এই পরাজয় অতীব শোচনীয়। বাই হোক, জবল-পুরের পরাজয়ই মনে হব আমাদের খেলোয়াড়দের একটু সজাগ করে তুললো, কেননা তার পরের কলকাতায় লক্ষ্মীতে এবং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৩টি খেলাতেই ভারতীয় দল নিঃসন্দেহে তাদের থেকে ভাল পেলেন যথাক্রমে এক গোল, তিন গোলে জয়ী হয়েছে। এরই মধ্যে দুটি খেলায় রেল দলের কাছেও দুবার পরাজিত হয়েছে কেনিয়াব দল। হঠাৎ খেলোয়াড়দের ছুটি না থাকার অজুহাতে শেষের কয়েকটি খেলা না খেলেই কেনিয়ার দল দেশে ফিরে গিয়েছে চুক্তিবদ্ধ খেলার কয়েকটি বাকী থাকতেই। এই নিষে কিছু অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে হকি-মহলে, কেননা এর সঙ্গে খরচের হিসেবও কিছু জড়িয়ে আছে। কেনিয়ার সঙ্গে খেলে ভারতীয় দল গঠনের কিছু সুযোগ হয়েছে এইটেই আমাদের সবচেয়ে বড় ভাল।

ফুটবল খেলা প্রায় এসে পড়েছে। এসে পড়েছেই বা বলি কেন—ফুটবল ত আজকাল প্রায় সম্বৎসরেরই খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনকার লীগ খেলা ও আই-এফ-এ শীল্ড-এর খেলা শেষ হতে না হতেই রোটার্স ও ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতা। তারপরে আস্ত:রাজ্য সংস্থার ট্রফি এবং অগ্রান্ত আরও কিছু। শেষ হতে ফেব্রুয়ারী মাস কাবার। আবার এপ্রিল মাস থেকে নূতন বৎসর শুরু। এই বৎসর Pre-Olympic খেলার দরুণ আরও কিছু বেশী খেলতে হয়েছে আমাদের দলকে। গত ডিসেম্বর মাসে সিংহলের সঙ্গে দুটি খেলাতেই ভারতীয় দল সহজভাবেই জয়ী হয়েছে এবং তারপরের প্রতিদ্বন্দ্বী লেবানন্ অলিম্পিক থেকে ফুটবল দলের নাম কাটিয়ে নেওয়ায় এখন ভারতীয় দলকে ইরানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। তার দরুণ কতকগুলি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় খেলোয়াড়দের কলকাতায়

অমূল্যবোধের বন্দোবস্ত করা হয়েছে গত ২৪শে এপ্রিল থেকে। ক্র্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ স্পোর্টসের মনোনীত সুদক্ষ 'কোচ' এইচ. ই. রাইট ও শৈলেন ঘাস্মার তত্ত্বাবধানে এই অনুশীলন চলছে। সামনের জুন মাসেই ইরানের সঙ্গে দুটি খেলা হবে। একটি তেহেরানে এবং একটি কলকাতায়। এই খেলায় জয়ী দল টোকিওর অলিম্পিকে যোগদান করার অধিকার লাভ করবে।

আরও একটি আন্তর্জাতিক খেলা এই বৎসরের ফুটবল তালিকায় আছে সেটি হোলো এশিয়ান ফুটবল কাপ টুর্নামেন্ট। প্রতিযোগিতার খেলা অনুষ্ঠিত হবে ইস্রায়েলে ইংরাজি যে মাসেই। পূর্ব zone (অঞ্চল) এবং বিজয়ী রিপাব্লিক অফ চায়না, মধ্য zone (অঞ্চল)-এর বিজয়ী হংকং; দক্ষিণ কোরিয়া (পূর্ব বৎসরের বিজয়ী), ইস্রায়েল (Host) ও ভারত পশ্চিম zone (অঞ্চল)-এর বিজয়ী এই পাঁচটি দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ দল নির্বাচনের জন্য। ১৯৬২ সালের জাকার্তার এশিয়ান গেমসের বিজয়ী দল ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যেই ফাইনাল খেলা হবে বলে আমার বিশ্বাস। ভারতীয় দলের পূর্বে পূর্বেকাব এশিয়ান কাপের খেলার ইতিহাসে কোনও সাফল্যের নজীর না থাকলেও এই বৎসরের সুপরিচালিত প্রস্তুতি-পর্বের জন্যই এই বিশ্বাস আমার মনে স্থান পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক খেলার হিড়িকে কিন্তু কলকাতার জনপ্রিয় ক্লাবের কর্তৃপক্ষেরা মাথাব হাত দিয়ে বসেছেন। অলিম্পিক ক্যাম্পে মোহনবাগান ক্লাবের সেরা খেলোয়াড় আটটি, ইন্টারন্যাশনাল দশটি, বি. এন. আর.-এর তিনটি ও ইন্টারন্যাশনাল দুটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এখানকার আগতপ্রায় লীগ খেলায় এরা কেউ অংশ গ্রহণ করতে পারবে না ইরান ও ভারতের খেলা সমাপ্তির পূর্বে। ইরানের সঙ্গে জয়ী হলে অলিম্পিক ক্যাম্পে যোগদানকারী খেলোয়াড়রা অন্যান্য খেলাতেও যোগদান করতে পারবে না, অবশ্য মাকখানের সময়টুকুতে অর্থাৎ কলকাতার লীগের দ্বিতীয়ার্ধে এবং আই-এফ-এ শীল্ড খেলায় এরা হয়ত খেলতে পারবে। কাজে কাজেই এই

সব খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে কি করে দল গঠন করা যায় সে চিন্তাতেই কলকাতার বড় ক্লাবেরা ব্যস্ত হয়ে আছে এবং মনে মনে আশা পোষণ করছে যে, ক্যাম্পে অন্তর্ভুক্ত খেলোয়াড়দের সকলেই যেন ভারতীয় দলে নির্বাচিত না হয়।

টেনিস খেলায় ভারতীয় দলের পক্ষে সবচেয়ে অভাবনীয় ঘটনা হোলো যে, এ বৎসর বায়ানাম্বু আর কৃষ্ণকে বাদ দিয়েই তাদের খেলতে হয়েছে ডেভিস কাপে। এশিয়ান জোন-এর খেলায় পাকিস্তান ও ভিয়েটনামকে প্রায় অনায়াসেই পরাজিত করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত ফিলিপাইনস্-এর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে জয়দীপ মুখার্জি ও প্রেমজিৎ লালকে। পাকিস্তান ও ভিয়েটনামের সঙ্গে খেলা দেখে একবার মনে হয়েছিল যে কৃষ্ণ ছাড়াও এরা দু'জন এবার এশিয়ান জোনের ফাইনাল খেলায় ফিলিপাইনস্কে হারিয়ে দেবে। কিন্তু আমাদের সে বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়েছে জয়দীপ ও প্রেমজিৎ অতি নিশ্চয়ভাবে। যে ভাবে ৪৩ বৎসর বয়সের ফিলিপিনো খেলোয়াড় Ampon (এ্যাম্পন) তাদের দু'জনকে পরাজিত করেছে তা দেখে মনে হয় যে, এদের দু'জনকে নিয়ে ভারতের টেনিস ভবিষ্যতের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা হচ্ছিল তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। বাহাদুরি দিই Ampon-কে—যে এই প্রাপ্ত বয়সেও সে তার চেয়ে অর্ধেক বয়সের খেলোয়াড়কে একেবারে নাকানি-চুবানি খাইয়ে পরাজিত করেছে ৬-৪, ৬-১, ৬-১ সেটে। জয়দীপ তাদের এক নম্বর খেলোয়াড় জোস্কে হারিয়ে এবং প্রেমজিতের সঙ্গে জুটিতে ডাবলস্ খেলা জিতে ফ্রণিকের আশার সঞ্চার করেছিল আমাদের বুকে যে এইবার ফিলিপিনোদের তাদের দেশের মাঠে হাবাতে সক্ষম হবে নিশ্চয়। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যিই ঘটলো তাদের পরাজয় Ampon-এর হাতে। কৃষ্ণ ভারতীয় দলে খেললে নিঃসন্দেহে জিততো আমাদের দল এই ফাইনাল খেলায় এই কেবল রইলো আমাদের সান্দ্রনা। কিন্তু কৃষ্ণ-এর পর কোথায় খুঁজে পাব সেই সান্দ্রনা? (১৮. ৫. ৬৪)।

সাময়িকী

যোগেশ্বরনাথ গুপ্ত :

প্রবর্তকের পরম হৃদয় ও শুভাকাঙ্ক্ষী যোগেশ্বরনাথ গুপ্তের গত ৩১-এ মে ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমনে একটি কল্পনিত জীবনের অবসান হইল। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হইল তাহাও সহজে পূরণ হইবার নয়। স্বদেশী যুগের যে সাধন-নিষ্ঠা শ্রীগুপ্তের মধ্যে আজীবন বিজ্ঞান ছিল তা এ-যুগে বিরল। বাংলা ও বাঙালীর জাগরণযুগের মানুষ ছিলেন তিনি। ঢাকা-বিক্রমপুরের ইতিহাস বিখ্যাত শ্রীগুপ্ত বাঙালীর আত্মপরিচয় উদ্ঘাটনের পথ দেখান। তাঁর 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'ভারত মহিলা', 'সাধক রামপ্রসাদ', 'মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া বাংলাব জীবনী-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। শ্রীগুপ্তের অগ্রণীষ সাহিত্যবীর্ষি দশ খণ্ডে শিশু-ভারতী সম্পাদন। ইহা ছোটদের উপযোগী বিখ্যাত বিশেষ। এই ছোট্টই যোগেশ্বরনাথ শিশু-সাহিত্যিক বহিরা সাধারণতঃ পরিচিত। অসাময়িক মজলিসী মানুষ ছিলেন তিনি। নিরহঙ্কার মধুর ব্যবহার তাঁকে সর্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। আমকের সাহিত্যিকদের অগ্রজ হিসাবে যোগেশ্বরনাথ প্রচুর সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার উর্ধ্বমতি কামনা করি।

ভারতে মোট বার্ষিক পুস্তক প্রকাশের সংখ্যা :

জাতীয় গ্রন্থাগারের এক হিসাবে জানা যায়, ১৯৬১-৬২ সালে সারা ভারতে সর্বমোট ২১,৭৬টি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে হুই বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৫৯-৬০ সালে যথাক্রমে ১৮,৮২৩ ও ২৪,৮৫৬খানি নব প্রকাশিত পুস্তক গ্রন্থাগারসমূহে গৃহীত হইয়াছিল। পুস্তকগুলির মধ্যে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যাই সর্বাধিক। সংখ্যা হিসাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান যথাক্রমে হিন্দী ও বাংলা পুস্তকের। এই তিন বৎসরে বাংলা পুস্তকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫৪৩, ১৩২২ এবং ১৭৫২। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের মোট ভাষাভাষীর জনসংখ্যার অনুপাত বাংলায় মাত্র ৭.০ শতাংশ (২.৫১ লক্ষ)।

অস্ত্র ও সরঞ্জাম নির্মাণ :

ভারতের প্রতিরক্ষা প্রয়োজনে বর্তমানে অস্ত্র-কারখানাগুলিতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, ফিল্ডগান, রকেট লঞ্চ, মর্টার, ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী অস্ত্র, বিমান-বিধ্বংসী কামান, গ্রেনেড, বোমা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করা হইতেছে। গত পাঁচ বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে

উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৮ কোটি টাকা, ১৯৫৭-৫৮ সালে ছিল ১৮ কোটি ৬ লক্ষ টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালে ছিল ১২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, ১৯৫৯-৬০ সালে ছিল ২৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ৩৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬১-৬২ সালে ছিল ৩৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬২-৬৩ সালে ছিল ৪১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। অস্ত্র কারখানাগুলি এখন উৎপাদন ক্ষমতার দীর্ঘ পৌছিয়াছে এবং চলতি বৎসবে ১০০ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভাবত-সরকার দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা দৃঢ়তর করিবার জন্ত দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচি অমুযায়ী কল্প আরম্ভ করিয়াছেন। চালু অস্ত্র-কারখানাগুলি সম্প্রসারিত করা হইতেছে এবং আধুনিকভাবে পুনর্গঠন করা হইতেছে। শীঘ্রই আবও ছাট কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

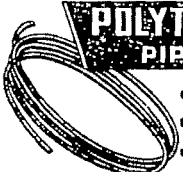
সরকারী মহিমা :

অল্প কিছুদিন আগের সংবাদ। পশ্চিম বাংলার ঘবে ঘরে যখন দাক্ষণ হাছাকাট, চাইলের দাম যখন গগনম্পর্শী, রাজ্যের কাতর আবেদনেও যখন কেন্দ্রের মুষ্টি খুলে নাই, সেই নিরাশ্রয় পরিস্থিতিতে জানা গেল বেড় কোটি টাকারও অধিক শস্ত লোশাট হইয়াছে পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় সরকারের খাণ্ডেব ভরাসগুলি হইতে। তথ্যভিত্তক মহল সম্বন্ধ করেন যে, অসাধু 'ফ্রাণ্ডলিং এজেন্ট', দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীর বড়ঘস্ত, কার্য পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটিবিচুতি, এক শ্রেণীর প্রদত্ত অফিসারের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ জাতীয় সম্পত্তি এই অপচয়ের জন্ত দায়ী। সর্ব্বক্ষেত্রেই এমন 'ব্রুট চম্পেব' সৃষ্টি হইয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে কতিপয় সৌভাগ্যবান ছাড়া সাধারণের অভাব মিটিবার কোন আশা বা আলো দেখা যায় না।

চামের খবর :

নারিকেল বাগানে অস্ত্র ফসলের চাষ করিয়া কিস্যবে বেশি আবেব পণ করা যায় সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় চাষ ও খাদ্যমন্ত্রীর দপ্তর হইতে যে সংবাদ সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা আমরা এখানে প্রকাশ কবিলাম :

"নারিকেলের চাষ যাঁরা করেন তাঁরা চারা লাগানোব পরে প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত নাবকেল বাগানে অস্ত্র ফসলের চাষ করে অতিবিস্তৃত 'আয়ের



**POLYTHENE
PIPES**

- Light Flexible
- Non-Corrosive
- Acid Proof

P.V.C. PIPES.



**'SANKHA'
COMBS**

- Durable
- Comfortable
- Economic

Purnima TOOTH BRUSH

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

ESTD. 1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO.-10813

পথ ধোলা রাখতে পারেন। নিরমায়ুসারে নারকেল চারা ২৫ থেকে ২৮ ফুট ব্যবধানে লাগানো হয়ে থাকে। নারকেল চারা যথেষ্ট বড় না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি চারার অন্তর্গত বর্গে স্থানে কিছু আরকর কসলের চাষ স্বল্পস্বে হতে পারে। সুবীর্ণ চার-পাঁচ বছর ধরে ঐ পাছের কলের জন্ম অনর্থক অপেক্ষা করে না থেকে ঐ সময়ে নারকেল বাগানে ট্যাপিংকা, মিষ্টি আলু, কলা, ওল, কচুন্দী, ধান, রাপী, বজরা, বরশিল, আনারস প্রভৃতি মানা ধরনের শস্তের চাষ করা যেতে পারে। তবে এই সকল কসলেয় মিশ্র চাষ করতে হ'লে জমিতে অতিরিক্ত সার দেওয়া উচিত যাতে ঐ চাষের ফলে জমির উৎকর্ষ কমে গিয়ে প্রধান ফসল নারকেল চারার যেন কোন ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে।"

চিকিৎসক সম্মানিত :

কলিকাতার আর. বি. কং মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের ডিরেক্টর বিশিষ্ট চিকিৎসক ও ডাঃ বিশেষজ্ঞ ডাঃ চারুচন্দ্র সাহা প্রাসগৌ ব্রহ্মল কলেজ অফ ফিজিয়ানস্ ও সার্জেন্স এবং ফেলো (এফ. আর. সি. সি.) নির্বাচিত হইরাছেন। প্রাক্রাতক ও রাতকের ছাত্রদের

মেডিসিন, ডাঃ ও মানসিক রোগের শিক্ষক হিসাবে ডাঃ সাহা বিশেষ জনপ্রিয়। তিনি ইণ্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটির একজন প্রাক্তন সভাপতি।

শিক্ষার আলোকবর্তিত এক লক্ষ শিশু :

কলিকাতা মহানগরীর ছয় হইতে বার বছর বয়সের প্রায় তিন লক্ষ ছেলেমেয়ের মধ্যে এক লক্ষের প্রাথমিক শিক্ষার কোন সুযোগ নাই। দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া অন্ততঃ দেড় লাখ ছাত্রছাত্রীর অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশন ও রাষ্ট্র সরকারের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। কিন্তু এখনও তাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। আর্থিক সম্ভাবনা না থাকার ১৯৫০ সাল হইতে কর্পোরেশন তাঁহাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্ভারনমূলক কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রতি বৎসর বহু ছাত্রছাত্রীকে বিফল হইয়া ফিরিতে হইতেছে। যে-কোন রাজ্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত লক্ষ্যজনক ঘটনা।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্ম

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল, আলোয়ান ও হোসিয়ানী পোষাক বিক্রেতা

রামকানাই বামিনী রঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাস্থা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা ফোন : ৩০-২৩০৩

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক ; সম্পূর্ণ ; নির্ভরযোগ্য
বুক বাইন্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয়
বঁধাই কাজ স্বল্প ও মূল্যে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫৬ নং হর্যা সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-২

ডি.রতন ঞ্জ কোং

ফটোগ্রাফার্স



২২১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাকটোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীশঙ্কর রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

প্রবন্ধ

আষাঢ়, ১৩৭১

জীবনের আলো

ধূসর আকাশ। নবীন নীলিমায় দ্যুতিময়। বনে বনে স্বর্গের কুসুম প্রসুটিত। মধু-গন্ধে বাতাস তারি হ'য়ে উঠেছে। প্রভাতের চারু স্নিগ্ধতায় চিত্ত প্রফুল্ল। উল্লাসে প্রাণের নৃত্য। স্রষ্টি উৎসবময়। প্রভু বিশ্বপ্রকৃতির সবধানি উদ্ভাসিত করে আছেন—আনন্দে প্রকৃতি তাই ভোর হয়ে আছে। পাখীর কণ্ঠে জয়গান। তোমার কণ্ঠ নীরব কেন? গাও উচ্চৈশ্বরে দৈবরসের মহিম্ব স্তুতি। প্রভাত-বন্দনা গাহিয়া নগর পরিক্রমণ কর—“ভোরের পাখী ডাকার আগে মানব কণ্ঠে উঠুক গান, অগুণ ধরা জাগার আগে, জাগিয়া উঠুক দেশের প্রাণ।” বক্ষ বিস্ফারিত কর। শির উন্নত হোক। মস্ত স্পষ্ট করেই আজ উচ্চারণ করতে হবে। সম্মুখে তাল পাকিয়ে যে বাধা—কুহেলিকা তাহা। নির্ভয়ে অগ্রসর হও। পথ অবোধ, মুক্ত। যাত্রা স্তম্ভিত হবে না। প্রতিজ্ঞা কয়, একটি পদক্ষেপও বিপক্ষে পড়বে না। পথেরথা আজ আর অস্পষ্ট নয়। কোথায় প্রাণশক্তির আহুতি দিতে হবে; তাহা আর অবোধ্য নহে। সম্মুখে দেশমাতৃকার জীবন্ত বিগ্রহ। নিঃসংশয়ে হৃদয়ের অর্থ অর্পণ কর। পরিতৃপ্তিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হোক। জীবন সার্থক কর। জীবন স্বপ্ন নয়, স্পষ্ট দিনের মত সমুজ্জ্বল। অন্ধকার নাই। চক্ষু তোমার নিমিলিত—বিস্ফারিত—নেত্র সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত কর। উৎসাহের জ্বালামালায় সর্বদিক উদ্ভাসিত; প্রসন্ন দৃষ্টির লক্ষণ। হস্ত, পদ, কটি, বক্ষ সঞ্চারণ করে নাও। বহুদূর তোমায় ধেতে হবে—দীর্ঘ যাত্রা। তর্কের প্রয়োজন নাই। দিশারী তোমার অগ্রে। পথের অর্থ নিপ্রয়োজন। অহুসরণ কর। পথ তোমার চলার আগেই প্রস্তুত। অগ্রসর হও—নির্বিবাদে নিঃসন্দেহে। স্বাস্থ্য, বীৰ্য্য, উৎসাহ, আনন্দ হোক তোমার সম্পদ। ভয় নাই। হে ভারতের অমৃতের সম্ভান। অমৃতই তোমার ভোগ। অচ্ছ ভোগ পরিহার কর। দেহভোগে বিরত হও। স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে না—ইহা ফলিত জ্যোতিবের দ্বায় সত্য। যদি বীৰ্য্য রক্ষিত হয়, শরীরের তৃপ্তি, মনের শান্তি, হৃদয়ের উৎসাহ, দৃষ্টির প্রতিভা অমান থাকবে। দৃষ্ট প্রমাণ—যুক্তির প্রয়োজন নাই। সকল যুক্তিতর্ক দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করে অগ্রসর হও মাতৃব্রতী সম্ভান। মায়ের মহিমময়ী মূর্তি গড়ে তোল। যুক্ত করে মায়ের কাছে প্রার্থনা কর—“বন্দিতাম্ভি যুগে দেবী সর্ব-সৌভাগ্যদায়িনী। রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দিশো জহি।” (১৯৩৫-এর দিনলিপি হইতে)।

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । সপ্তত্রিংশং যজুঃ ।) দশমী ঋক্

(সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবনভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্তস্তুতীর্থ

উচ্ছ্রোত্মো নুনবো গিরঃ কাষ্ঠা অজ্জমেঘত্নত

বাশ্রা অভিজ্জু ঘাতবে ॥১০॥

অর্থ—“তো” (প্রসিদ্ধ মরুদেবগণ) “গিরঃ” (বাক্যসমূহের) “নুনবঃ” (উৎপাদক) [তো—তাহারা]
“অজ্জমেঘ” (গমন সময়ে) “কাষ্ঠা” (অপ্ সমূহকে) “উচ্ছ্রো” (উৎকর্ষের দ্বারা) “অত্নত” (বিস্তৃত করিয়াছিলেন)
“বাশ্রা” (শব্দযুক্ত কিরণসমূহ) “অভিজ্জু” (অভিমুখে) “ঘাতবে” (ধাবমান) ॥ ১০ ॥

সরলার্থ—প্রসিদ্ধ মরুদেবগণই বাক্যসমূহের উৎপাদক । তাহারা গমন সময়ে অপ্ সমূহকে উৎকর্ষের
দ্বারা বিস্তৃত করিয়াছিলেন এবং তাহারা “বাশ্রা” অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশদার্থ—ঋষি বলিতেছেন—গতিশীল মরুদেবগণের মধ্যে যাহারা স্থিতিশীল, তাহারা যখন প্রবাহিত
হইতে হইতে কণ্ঠ ও ওষ্ঠাদিতে সঞ্চরণ করেন, তখনই বাক্যসমূহের উৎপত্তি হয় । আবার ঐ মরুদেবগণই
অপ্ সমূহেরও উৎপাদক । কেমন করিয়া ? ঋষির ভাষায়—“বাশ্রা অভিজ্জু ঘাতবে ।” “বাশ্রা” শব্দের অর্থ
আচার্য্য সাধারণ করিয়াছেন, “হাশ্বারবোপেতা গা” অর্থাৎ শব্দোচ্চারণকারী কিরণসমূহ । মরুদেবগণ ঐ
শব্দোচ্চারণকারী কিরণসমূহের অভিমুখে ধাবমান হইয়া অপ্ সমূহেরও উৎপাদন করিয়াছেন । ঋষিকণ্ঠে ইহা
মন্ত্ররূপে উচ্চারিত হইয়াছে, ভাষা তাই সংক্ষিপ্ত । বিষয়টি একটু স্পষ্ট করা যাক ।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, আকাশ ঘন অগ্নিরাশি বা জসরেণু দ্বারা পরিপূর্ণ । শব্দই আকাশের বিশিষ্ট
গুণ । এই শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশই মরুদেবগণের জননীস্থানীয়া । আকাশে নিরন্তর যে শব্দসমূহের উৎপত্তি
হইতেছে, সেই শব্দ অভিমুখে মরুদেবগণ স্বভাববশেই নিত্য ধাবিত হইতেছেন । অন্তরীক্ষগত ধাবমান মরুদেব-
গণের মধ্যে গতিশীল যাহারা, তাহারা তৈজস বায়ু নামে অভিহিত । কারণ দীপ্তিশীল তেজোময় জসরেণু
হইতেই ইহাদের উৎপত্তি । এই তৈজস বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইয়াই চলে, আবার কখন কখন
প্রবাহিত হইতে হইতে স্থিতিশীল মরুদেবগণের সহিত মিলিত হয়, তখনই বজ্র ও বিদ্যুতের সৃষ্টি ; এই
বজ্র ও বিদ্যুতের সম্মেলনেই অপ্ বা অণুসমূহের উৎপত্তি । ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত । আধুনিক বিজ্ঞান মতে
বজ্রকে Proton আর বিদ্যুতকে Electron বলা যায় । উভয়ের সংযোগে গতি-গমন-জগৎ অর্থাৎ বস্তুর
উৎপত্তি । আমাদের দৃকসিদ্ধ আর্ধ্যঋষিরা হৃদয় আরণ্যক যুগে তাহাদের যোগদৃষ্টিবলে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন
যে, মরুদেবগণ যদি শুধুই গতিশীল হইয়া চিরদিন অন্তরীক্ষে প্রবাহিত হইত—তাহা হইলে এই স্থূল জগৎ গড়িয়া
উঠিত না । কারণ গতিশীল মরুদেবগণ কখনও অন্তরীক্ষে অতিক্রম করে না । অন্তরীক্ষগত গতিশীল
মরুদেবগণের মধ্যে স্থিতিশীল স্বভাববিশিষ্ট যাহারা তাহারা এই আপোময় স্থূল জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে ।
কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে পরবর্তী ঋকে ঋষি নিজেই তাহা ব্যক্ত করিবেন ।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পুরকায়স্থ

প্রত্যেক দেশের এক বা একাধিক রাষ্ট্রভাষা আছে। স্বাধীন ভারতেরও নিদ্বন্দ্ব রাষ্ট্রভাষা থাকা উচিত। ভারত বহুভাষী দেশ, তাহার জনসংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটির মত।

এদেশে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার পিছনে এক ইতিহাস আছে। আমাদের শাসনতন্ত্র গঠনকারী সংস্থার (Constituent Assembly) যখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার আলোচনা হয়, তখন উহার পক্ষে ও বিপক্ষে সমপরিমাণ ভোট হয়। তখন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি হিসাবে দ্বিতীয় ভোট (casting vote) দিয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন। ইহাতেই বোঝা যায়, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব ঠিক ভুলভাবে গৃহীত হয় নাই। হিন্দী ছাড়া আরও তেরটি ভাষা—প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষারূপে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—(১) আসামী, (২) বাংলা, (৩) গুজরাটি, (৪) উর্দু, (৫) কানাড়া, (৬) কাশ্মিরী, (৭) মালয়ালম, (৮) মারাঠি, (৯) উড়িয়া, (১০) পাঞ্জাবী, (১১) সংস্কৃত, (১২) তামিল এবং (১৩) তেলেগু।

আমাদের শাসনতন্ত্রের ৩৪৩ ধারায় বলা হইয়াছে—
দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গৃহীত হইবে, পনর বৎসরের অনধিক কাল পর্যন্ত ইংরেজী আমাদের রাষ্ট্রভাষারূপে চলিবে। ৩৪৪ ধারা অনুযায়ী গঠিত ভাষা কমিশন বলিতেছেন—১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজী রাষ্ট্রভাষারূপে চলিতে পারে। ইহার সহজ অর্থ, ভাষা সম্পর্কে ইতিমধ্যে অত্র কোন ব্যবস্থা না করিলে ১৯৬৫ সালের পর কেন্দ্রীয় সরকারের সব কাজে, পার্লামেন্ট পরিচালনায়, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ও অন্যান্য সর্বভারতীয় কাজে আমাদেরকে হিন্দী ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার কলে অহিন্দীভাষীদের যে ভীষণ অসুবিধা হইবে, সেই কথা বিবেচনা না করিয়াও, আমরা একটা প্রশ্ন করিতে পারি—হিন্দী কি ইতিমধ্যে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিয়াছে ও বিদেশীদের সঙ্গে কি হিন্দীর

মাধ্যমে কাজ চালান যাইবে? উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার উপযোগী পরিভাষা কি হিন্দীওয়ালারা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন? একশুরামি ও পায়ের জোরে আর যাহাই হউক, ভুল ভাষার সৃষ্টি করা যায় না। আর দ্বিতীয়তঃ, দেশের বর্তমান জাতীয় সঙ্কটে, অহিন্দী ভাষীদের উপর জোর করিয়া হিন্দী ভাষা চাপাইলে, দেশে বিরাট বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে। দক্ষিণ ভারতে স্থানে স্থানে যে উগ্র হিন্দী-বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশপ্রেমিক মাজেরই ভাষা-প্রচারের ব্যাপারে সাবধানতা, ধীরতা ও বিবেচনার সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত।

১৯৫১ সালের লোক-গণনার সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন ভাষার আপেক্ষিক অবস্থা নিম্নে দেওয়া গেল :

ভাষার নাম	ভাষাভাষীর জনসংখ্যা	ভারতের জনসংখ্যার শতাংশ
(১) হিন্দী, উর্দু, হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী	১৪,২২ লক্ষ	৪২.০ শতাংশ
(২) তেলেগু	৩,০০ "	২.২ "
(৩) মারাঠী	২,৭০ "	৭.৬ "
(৪) তামিল	২,৬৫ "	৭.৪ "
(৫) বাংলা	২,৫১ "	৭.০ "
(৬) গুজরাটি	১,৬৩ "	৪.৬ "
(৭) কানাড়া	১,৪৫ "	৪.১ "
(৮) মালয়ালম	১,৩৪ "	৩.৮ "
(৯) উড়িয়া	১,৩২ "	৩.৭ "
(১০) আসামী	৫০ "	১.৪ "

এখন হিন্দীভাষীদের সঙ্গে অন্যান্য ভাষাদের একত্র দেখান হইয়াছে, তাদের সংখ্যা এইরূপ :

ভাষার নাম	জনসংখ্যা
(১) উর্দু	২৫ লক্ষ
(২) মৈথিলী	৫০ "
(৩) ভোজপুরী	৪,০০ "
(৪) পাঞ্জাবী	৮০ "

মোট ৫,৭৫ লক্ষ

হিন্দী, উর্দু, হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীদের সম্মিলিত জন-সংখ্যা—১৪,৯৯ লক্ষ হইতে, এই শেষোক্ত ৫,৫৫ লক্ষ বাদ দিলে, খাঁটি হিন্দীভাষীদের সংখ্যা দাঁড়ায়—৯,৪৪ লক্ষ। ইহা ভারতের মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ, প্রথমোক্ত হিসাবে দেখানো ৪২ শতাংশ নয়।

হিন্দীভাষীদের ধারণা—ভারত এখন স্বাধীন রাষ্ট্র, তার একটা রাষ্ট্রভাষা থাকা দরকার; ইংরেজী বিদেশী ভাষা, সুতরাং ইহাকে সরাইয়া হিন্দীকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা দরকার। কিন্তু হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা আছে কিনা, তাহা তাহারা তলাইয়া দেখেন না, সাহিত্য ও ভাষাসম্পদে হিন্দী এখনও অতি দুর্বল। বাংলাভাষা তার তুলনায় অতি সমৃদ্ধ। তাই বলিয়া আমি বাংলাভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার দাবী করিতেছি না। আমার বক্তব্য সব বিষয়ে বিবেচনা করিয়া ভাষা সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ভারত সরকারের স্বীকৃতি অনুসারে বর্তমানে এদেশে চৌদ্দটি প্রধান ভাষা আছে। তার মধ্যে উত্তর ভারতে প্রচলিত হিন্দী, বাংলা, পাঞ্জাবী, আসামী, উড়িয়া, গুজরাটি ও মারাঠি ভাষা সংস্কৃতমূলক। বিবেচনার সহিত অগ্রসর হইলে ইহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা মিলন ও সহযোগিতার ভাব গড়িয়া তোলা সম্ভবপর; কিন্তু উগ্র হিন্দীবাদীদের ইচ্ছা—অনুযায়ী তাড়াতাড়ি অল্প ভাষাগুলির কঠর স্বাক্ষর করিয়া যেনতেন প্রকারে হিন্দীকে সকলের উপর চাপাইয়া দিতে হইবে, এই নীতিতে চলিলে দেশে মিলনের চেয়ে বিভেদই বেশী সৃষ্টি হইবে। হিন্দীওয়ালাদের আর একটা ভ্রান্ত ধারণা যে, অহিন্দী ভাষাগুলির প্রসার হিন্দীর পরিপন্থী। তা যদি হইত, তাহা হইলে হিন্দীওয়ালারা বাংলা বইগুলির অনুবাদ করিতেন না এবং তাদের লেখাও বাংলা সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হইত না। বাংলাভাষায় লিখিত দুইটা সঙ্গীত—“বন্দে মাতরম্” ও “জনগণ-মন-অধিনায়ক”, ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপেও গৃহীত হইত না।

তারপর দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলুগু, কানাড়া ও মালয়ালম্ ভাষার সঙ্গে উত্তর ভারতের ভাষাগুলির বিশেষ মিল নাই। দক্ষিণ ভারতীয়দের দেখিতে হইবে

তাহারা সবাই মিলিয়া কোনো সাধারণ ভাষার উদ্ভাবন করিতে পারেন কিনা। যতদিন তাহারা এইরূপ কোনো স্থানীয় ভাষা উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না, ততদিন তাঁদের অঞ্চলে ইংরেজী ভাষা উঠাইয়া দেওয়া উচিত হইবে না।

ভারতের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষা। তাই একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের আওতা বজায় রাখিয়াও এক প্রকার আধুনিক সহজ ও সরল সংস্কৃত ভাষা উদ্ভাবন করা যাইতে পারে, যাহা উত্তর ও দক্ষিণ ভারত—এই উভয় অঞ্চলের গ্রহণীয় হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি এত উদাসীন ও বিরূপ যে, এই বিষয়ে তাহারা কোন প্রকার চেষ্টা বা সহযোগিতা করিতেও প্রস্তুত নহেন। তাহাদের ধারণা, কোন প্রকার সংস্কৃত গ্রহণ করিলেই আমাদের জাতীয় বিকাশের ধারা সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। ইহা একটা ভ্রান্ত ধারণা। রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত প্রাচীন সাহিত্যের ভাবধারা দেশ বিদেশে প্রচার করিয়া ভারতের সম্মান ও সমাদর বহু পরিমাণে বাড়াইয়াছেন। তাই বলি, এই বিষয়েও আমাদের যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে হইবে।

একটু চেষ্টা করিলেই উত্তর ভারতের সকলের গ্রহণযোগ্য একটা ভাষা উদ্ভাবন করা কঠিন হইবে না, উহাকে দেবনাগরী অক্ষরে লিখা যাইতে পারে। উহাকে হিন্দী নামে অভিহিত করিতে আমার আপত্তি নাই। বর্তমানে প্রচলিত হিন্দী ভাষার লিঙ্গ ও ধাতুরূপের নিয়মাবলী অতি উদ্ভট। উহাকে সহজ ও সরল করিয়া অহিন্দী ভাষীদের গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। যদি উগ্র হিন্দীপন্থীদের ইহাতে আপত্তি থাকে, তাহারা প্রাচীন হিন্দী নিষা থাকুন। আমরা পরিবর্তিত হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষারূপে পরিচালিত করিব। হিন্দীভাষায় কোন ক্রীবা লিঙ্গ নাই। বিশেষ্য পদকে হয় পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গরূপে পরিগণিত হইতে হইবে—ইহা এক ধাঁধা। হিন্দীতে লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়ার পবিত্বন হয়, কিন্তু সংস্কৃত বা বাংলায় এরূপ কোন নিয়ম নাই। তাই হিন্দী ব্যাকরণের নিয়মাবলী সহজ করিয়া হিন্দীভাষী ও অহিন্দীভাষী এই

উত্তর সপ্তদশের সহযোগিতায় নূতন হিন্দীকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। এইজন্ত একটা বেসরকারী বোর্ড গঠন করিতে হইবে। বোর্ডের সমপরিমাণ হিন্দী-ভাষী ও অহিন্দীভাষী সভ্য থাকিবে। প্রতি ছয় মাসের জন্ত এক এক দল হইতে একজন করিয়া সভাপতি মনোনীত করিতে হইবে।

একইভাবে দক্ষিণ ভাষাতেও একটা বেসরকারী ভাষা বোর্ড গঠন করিতে হইবে। ইহাদের প্রধান ও প্রাথমিক কর্তব্য হইবে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর জন্ত একটা সাধারণ ভাষা উদ্ভাবন করা।

প্রতি বৎসর একবার করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বোর্ডের সভ্যগণ একত্র মিলিত হইয়া ভারতের ভাষা-সমস্যার আলোচনা করিবেন, তারপর দশ বৎসর পর একটা বৃহত্তর সভা ডাকা হইবে। সেই সভায় বোর্ডের সভ্যগণ ছাড়া দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও ভাষাবিদদের আমন্ত্রিত করা হইবে। সেই সভায় ভাষা সম্পর্কে কর্তব্য নির্ধারণ করা হইবে। তখন যদি দেখা যায় সকলের সহযোগিতায় পুষ্টি-হিন্দীভাষা যথেষ্ট বিকশিত হইয়া রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা অনেক পরিমাণে অর্জন করিয়াছে, তাহা হইলে যেসব ক্ষেত্রে ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দী প্রবর্তন করা সম্ভবপর বিবেচিত হইবে, সেই সব স্থলে হিন্দী ভাষা চালু করা হইবে। কিন্তু দশ বৎসর পরেও ইংরেজীকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারিব বলিয়া আমি মনে করি না। পররাষ্ট্র ব্যাপারে ও উচ্চ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায়, বিশেষতঃ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার ব্যাপারে ইংরেজী তখনও আমাদের কাছে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে ভবিষ্যতে আমরা কোন ভাষা ব্যবহার করিব—ইহা এক জটিল সমস্যা। বর্তমানে ইংরেজীভাষার মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভাববিনিময় চলিতেছে। দক্ষিণ ভারতের একটা নিজস্ব সাধারণ ভাষা উদ্ভাবিত হওয়া দরকার, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কবে এবং কিভাবে উহা উদ্ভাবিত হইবে, তাহাও এক চিন্তনীয় ব্যাপার। তারপর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংযোগের মাধ্যম কি

হইবে? এই ব্যাপারে ইংরেজীকে চিরদিন ব্যবহার করা যাইতে পারে বা ব্যবহার করা উচিত হইবে না। দক্ষিণ ভারতীয়েরা এখনও হিন্দীকে প্রসঙ্গমনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন, অতীতে উত্তর ও দক্ষিণের সংযোগের বাহন ছিল সংস্কৃত। এখন কি আবার সরল ও সহজবোধ্য সংস্কৃত দ্বারা সেই কাজ চালানো যাইতে পারে? এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী নিয়া ভারত রাষ্ট্র গঠিত। ইহা দৃশ্যীয় বা অস্বাভাবিক নয়। রাশিয়া বাদে ইউরোপের জনসংখ্যা, মোটামুটি ভারতের সমান, সেখানে বহু রাষ্ট্র ও বহু ভাষা। পৃথিবীর মধ্যে আমরা একমাত্র ভারতবাসীরাই গণতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীকে একত্র নিয়া চলিতেছি। বাধা বা অসুবিধা প্রথম প্রথম আমাদের হইবেই। কিন্তু জাতীয় মৌলিক ঐক্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি আমরা দৃঢ়তা ও বিবেচনার সহিত অগ্রসর হই কোন বাধাই আমাদের কাছে অনতিক্রম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কানাডা, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে একাধিক রাষ্ট্রভাষা আছে। ভারতের যে কেবল একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা থাকিতে হইবে, এমন ত কোন কথা নাই। প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা একাধিক রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করিতে পারি। একই জাতীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়া আমরা এক জাতি বা জাতি হিসাবে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব—ইহাই আমাদের প্রধান কাম্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। এক ভাষা না হইলে এক জাতি হয় না, ইহা কোন কাজের কথা নয়। আমরা যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতকে একটা সর্বল ও সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করিতে পারি, জাতি হিসাবে তাহাই হইবে আমাদের পরম ও অভূতপূর্ব গৌরবের বিষয়। রাশিয়া বা চীন কেহই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন নাই। ইহার জন্ত দরকার অপক্ষপাতপূর্ণ ও সর্বভারতীয় উদার নেতৃত্ব। সাময়িক লাভের মোহ ত্যাগ করিয়া জনসাধারণকে এই বিষয়ে সর্বদা সতর্ক ও জাগরুক থাকিতে হইবে।

ভারতীয় ভৈষজ্যবিজ্ঞান (Pharmacy)

শ্রীশৈলদেব বিদ্যাবিনোদ

১

আমরা একখানি অতি উপাদেয় স্মারকগ্রন্থে (souvenir) উপহার পাইয়াছি। ১২৬৩ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতায় শ্রামাদাস বৈষ্ণবশাস্ত্র-পীঠভবনে ঔষধ-কলা বিজ্ঞান চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রদর্শনী সম্ভবতঃ ভারতে এই প্রথম। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পশ্চিম বঙ্গ কার্ণমেসি কাউন্সিলের সভাপতি প্রসিদ্ধ ডাক্তার পি. কে. সামন্তাল। তাঁহারই নির্দেশে বিখ্যাত চিত্রকর কর্তৃক চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল এবং এই প্রদর্শনী উপলক্ষে একখানি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল—যাহাতে চার হাজার বৎসর পূর্বের চিকিৎসা-শাস্ত্র ও ঔষধপ্রকরণবিদ্যার এবং ঐ বিষয়ে অতি আধুনিক বিবরণের তুলনামূলক পাঁচটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ডাক্তার সামন্তালের লিখিত সুদীর্ঘ ও সচিত্র প্রবন্ধটির নাম 'A few pages of History of Pharmacy of India'—ভারতীয় ভৈষজ্য বিজ্ঞানের কয়েক পৃষ্ঠা। আমাদের এই আলোচনা প্রধানতঃ এই প্রবন্ধ লইয়াই। ভারতে আয়ুর্বেদ, ইউনানী, অ্যালোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা ও ঔষধের ইতিহাস ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, অবশ্য অন্ত্রোপচার বা শল্যবিদ্যা বাদ পড়ে নাই। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধ বড় একটা দেখা যায় না। চিত্রগুলি অতি চমৎকার। আমাদের আলোচনা মানে মুখ্যতঃ এই প্রবন্ধের সার সংকলন করিয়া পাঠককে উপহার দেওয়া। আমরা আশ্চর্যবিশ্বস্ত আতি, তাই পুরাতন প্রসঙ্গ—অদূর অতীতে আমাদের কি ছিল—যতই আলোচিত হইবে, ততই আমাদের মঙ্গল।

প্রবন্ধকার প্রথমেই লিখিয়াছেন, সম্ভবতঃ আমাদের ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে চিকিৎসার অতি প্রাচীন পদ্ধতি আজও পালিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র হয়ত ৪,০০০ কি তদধিক বর্ষ হইতে চলিয়া আসিতেছে—সত্যতা ও সামাজিকতার এত পরিবর্তন

সম্মুখে। রোগ উপশম করিতে সেই একই ঔষধ একই রোগে আজ হাজার-হাজার বৎসর যাবৎ সমানে প্রয়োগ করা হইতেছে। কিন্তু আশিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, পারস্য, গ্রীস, রোম ও আরববাসীদিগের এবং ইহুদীদের সেই সুপ্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞান আজ কোথায় লুকাইল?

১৮২৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া জাহাজ হইতে কলম্বোর পদার্পণ করিয়াই তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় বক্তৃতা নিষেধে বলিয়াছিলেন—যাহার পদতলে মেদিনী কম্পমান হইত, যাহার নাম মাত্র উচ্চারণে ভূমিকম্প হইত, সেই প্রাচীন গ্রীক, সেই প্রাচীন রোমান জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। 'But we live, and if Manu came back today he would not be bewildered, and would not find himself in a foreign land... To the other nations of the world, religion is one among the many occupations of life,... But here in India, religion is the one and the only occupation of life.'

আর ১৪ বৎসর পরে ১৯১১ সালে সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছিলেন—

‘পূর্বপক্ষের’ প্রশ্ন আশুরীয়েরা, শকেরা, যবনেরা (Ionians) এবং রোমকেরা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল কেন? সনাতন ধর্মবাদীদিগেরও সেইরূপ দশা যে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? একটু প্রাধিকান করিলেই উত্তর পাওয়া যায়। ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করেন। হিন্দু এবং ইহুদী বহু নির্যাতনেও কেবল ধর্মবলে এখনও জীবিত আছেন।... কেননা তাঁহারা উভয়েই স্বধর্ম পরায়ণ ও সদাচারনিষ্ঠ।’

বিষ্ণুর ষোড়শ নাম স্তোত্রের মাত্র প্রথম ও শেষ শ্লোকটি স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

ঔষধি চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দনম্।

শয়নে পদ্মনাতকং বিবাহে চ প্রজাপতিম্॥

জলমধ্যে বরাহক পর্বতে রবুনন্দনম্।

গমনে বামনঈশ্বর সর্বকর্মেষু মাধবম্॥

ভুলিলে চলিবে না—ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রও যে ধর্ম-গ্রন্থ। ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময়ে, ঔষধ সেবন করিবার সময়ে শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিবার প্রথা একমাত্র ভারতেই প্রচলিত ছিল (‘ছিল’ লেখাই সমীচীন)।

এখন ভারতে আয়ুর্বেদ তিন ইয়ুনানী (হাকিমী), অ্যালোপ্যাথী এবং হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা ও ঔষধ চলিতেছে। বলা বাহুল্য, ইয়ুনানী ও অ্যালোপ্যাথী চিকিৎসা পরাক্রান্ত মুসলমান ও ইংরাজ সরকারের প্রত্যাপে প্রবর্তিত হয়। এখনও ভারতের প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে এবং তাহারা অধিকাংশই আয়ুর্বেদের ওপর নির্ভর করে, তবে অল্পবয়স্ক বিদেশী চিকিৎসাও পল্লীগ্রামে চলে বটে।

ভারতে আয়ুর্বেদের প্রচলন যে কোন সময়ে প্রথম হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে আয়ুর্বেদ যে অথর্ব বেদের অন্তর্ভুক্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে বিশেষবিশেষ ভিষক্, যক্ষা ও কুষ্ঠব্যাদির উল্লেখ আছে; জল ও উত্তিদের রোগনিরাময়-শক্তির প্রশংসা আছে, একটি স্কন্ধে কুস্কুস্ সংক্রান্ত কয় (tuberculosis) রোগের ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। বিবিধ কারণবশত বিবিধ রোগ নীরোগ করণার্থ অনেক স্কন্ধ ও মন্ত্র অথর্ব বেদে আছে। হৃৎপিণ্ডে জল জমার কারণে পায়ের গোড়ালি ও চোঁটের সম্মুখভাগ ক্ষীত হওয়ার বর্ণনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, শুধু যে সেই প্রাচীন যুগে শারীর বিধান শাস্ত্রে (Anatomy) ও নিদান তত্ত্বে বৈদ্যদের প্রগাঢ় জ্ঞান ও গবেষণা ছিল তাহা নহে, অতি উন্নত

বিজ্ঞানেও তাহারা কৃতবিদ্য ছিলেন। তখন চিকিৎসা-বিদ্যা এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে, চিকিৎসকগণ তাহাদের নৈপুণ্যমুসারে তিন শ্রেণীভুক্ত হইতেন—শল্যবৈদ্য (অস্ত্রোপচারক), তিদক্ (রোগচিকিৎসক) এবং ভিষগাথর্বস্ (ঔষাহারা দৈব ও মন্ত্রশক্তির দ্বারা রোগ উপশম করিতেন)। ক্রমে হইল চিকিৎসকগণের দুইটি প্রধান দল—আজ্ঞেয় (পুনর্বসু) সম্প্রদায় ও ধষত্তরি-

সম্প্রদায়। আজ্ঞেয় সম্প্রদায়ের প্রধান ভিষক্ অগ্নিবেশ, তাহার লিখিত অগ্নিবেশ তন্ত্র বিখ্যাত গ্রন্থ। বহুকাল পরে চরক ও দৃষবল এই তন্ত্রের সংস্কার করিয়াছিলেন। গ্রীকেরা এই তন্ত্র হইতেই ভারতীয় ঔষধে অতিষ্ঠ হয়। আর ধষত্তরি সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সুশ্রুত—ধষত্তরির শ্রেষ্ঠ শিষ্য। এই সুশ্রুত ও চরকের কালনির্ণয় লইয়া নানা মত প্রচলিত আছে, আমরা তাহার মধ্যে চুকিব না; তবে ইহা আজ সর্বজনসম্মত যে, সুশ্রুত সংহিতা চরক সংহিতার কয়েকশত বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল এবং উভয়েই বৃদ্ধদেবের ও ঋগ্বেদের বহুশতক পূর্ববর্তী ব্যক্তি।

চরক ছিলেন দেশবরেণ্য ভিষক্ ও প্রগাঢ় দার্শনিক; তাহার গ্রন্থও বিপুলকায় ১২০টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই সকল অধ্যায় পথ্য, ঔষধ, বিষপ্রতিষেধক ভেষজ, চিকিৎসা-সংক্রান্ত যজ্ঞাদি প্রভৃতির বিবরণ ও ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। ইন্ডেক্সগনের সূচ (সূচিকান্তরপম্), বমন-কারক ভেষজ, বিরোচন বা জ্বোলাপ এমন কি মুথুস্ (ডুস ও এবিমা) প্রভৃতির বিশদ বর্ণনাও পাওয়া যায়। হাসপাতাল, প্রসূতি-সদন ও শিশুবিভাগ নির্মাণবিষয়ক উপদেশ সুস্পষ্টভাবে চরকে দেওয়া আছে।

আর সুশ্রুত ছিলেন প্রসিদ্ধ শল্যবৈদ্য বা সারুজেন। তাহার গ্রন্থ প্রধানতঃ অস্ত্রোপচার বিদ্যা-সংক্রান্ত হইলেও, শারীরবিধান (Anatomy), প্রত্নতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞা (Biology), নিদানশাস্ত্র, চক্ষু-বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা বাদ পড়ে নাই। তাহার সময়ে cesarian operation—পেট চিরিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণনিষ্কাশন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। প্রমাণ আছে, তিনি দস্তান্ত্র দিয়া বহুমূত্র রোগ নিরাময় করিতেন।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে যে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র হইতেই ইউরোপ নাসিকার ওপর অস্ত্রোপচার এবং বিকৃত নাসিকাকে পুনরায় স্বাভাবিক আকার প্রদান-করা বিদ্যা (rhinoplasty) শিক্ষা করে; সমগ্র plastic surgery (অঙ্গের বিকৃত অংশ জোড়াতাড়া দিয়া, নূতন তাজা স্বকের সহিত জোড়কলম করার অস্ত্রোপচার) এবং তাজা মাংস কাটিয়া লইয়া অস্ত্র

বসাইয়া দিবার বিজ্ঞাশিক্ষাও ভারতীয় পদ্ধতি হইতে ইউরোপে যায়। চোখের ছানি কাটাও সম্পূর্ণ ভারতীয়। গ্রীস, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন দেশে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। বসন্তরোগ-প্রতিষেধক টিকা দেওয়া (Vaccination) যন্ত্রের অবগত ছিলেন।

সুশ্রুতের সময় হইতে অস্ত্রোপচারের জন্ত দুই শ্রেণীর যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইত—যন্ত্র ও শস্ত্র; যন্ত্রের সংখ্যা ছিল ১০৫ এবং শস্ত্রের ২০।

অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে রোগীকে অচেতন করা (anesthesia) সুশ্রুত ও চরক বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন, যন্ত্রণা অমুভূত না হইবার জন্ত নানাবিধ স্রুরির প্রয়োগ তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। চেতনা ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে সিদ্ধির ধোয়া এবং অস্ত্রাঘাত ঔষধ ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক জীবক ভোজরাজের মাধার পুত্রির ওপর অস্ত্র-প্রয়োগ করিয়া, মস্তিষ্কের মধ্য হইতে রোগযন্ত্রণার প্রধান কারণ ঠিক উৎখাত করিয়াছিলেন—রোগীকে অচেতন করা হইয়াছিল 'সম্মোহিনী'র দ্বারা এবং পুনরায় চেতনা আনয়ন করা হইয়াছিল 'সজীবনী'র দ্বারা। খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়ান (Arrian) ভারতে সর্পদংশন চিকিৎসার উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতাক্রমণ সময়ে আলেকজান্ডারের সৈন্তগণ মধ্যে স্নানির্গুণ চিকিৎসকগণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্পদংশন চিকিৎসা জানিতেন না; তখন পঞ্চাবে সাপের দোরাঙ্গা প্রবল ছিল; আলেকজান্ডারকে প্রায়ই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক শরণ লইতে হইত, তাহাদের চিকিৎসায় সর্পদংশ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিত।

পারা, সৈকো, তামা, লোহা, সীসা, সোনা প্রভৃতি খনিজ পদার্থের (mineral) প্রয়োগব্যবস্থা আয়ুর্বেদে বহুপূর্ব হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ৩ম শতক হইতে নাগাজুন ও তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায় পারদবটতি নানা প্রকার ঔষধ প্রচলিত করেন। তখন হইতে ভেষজ রসায়ন (Pharmaceutical Chemistry) স্রষ্টৃত্বাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালে নাগাজুন ছিলেন শ্রেষ্ঠ-রাসায়নিক। তাঁহার অনেক পরে চক্রপাণি দত্ত

খনিজ দ্রব্যের সহিত উদ্ভিজ্জ ও জৈব পদার্থ মিশ্রিত করিয়া ঔষধের শক্তি বাড়াইয়া দেন। পরে রসায়নবিদ নাগাজুনের নির্দেশানুসারেই প্রজননশক্তিবর্ধক নানা প্রকার রসায়ন এবং দীর্ঘায়ুকারক কায়কল্প সম্বন্ধীয় ভেষজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। এই দুইটি রসায়নই আয়ুর্বেদের আবিষ্কৃত ও বহু ব্যবহৃত প্রসিদ্ধ ঔষধ। অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস, আরব দেশীয় ইউনানী বিজ্ঞান প্রজননশক্তিবর্ধক, রসায়নের প্রবর্তক, কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। তবে ভারতে মুসলমান আমলে অধিকাংশ নবাবের বহু সংখ্যক বেগম থাকিত বলিয়া এই রসায়ন মুসলমানদের সময়ে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১২শ শতকে বল্লাল সেনের সময়েও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের জন্ত চার প্রকার শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল—(১) ঠাকুরের সম্মুখে বলি প্রদান, (২) বর্শাবিক্ষেপ করিয়া হত্যা অথবা শুলে দেওয়া, (৩) হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় দণ্ড করা, (৪) জীবন্ত ব্যক্তিকে মাটির মধ্যে পুতিয়া ফেলা। এই ২য় ও ৩য় শ্রেণীর শাস্তি, সমর্থ, সুস্থ ও বলবান ব্যক্তিকে রাজারা 'রোম্‌থ' রূপে (Romtha) দণ্ড চিকিৎসকগণের হস্তে সমর্পণ করিতেন—তাহাদের দেহে নানা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ঔষধের গুণাগুণ নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে। স্তন্য-বায়ু, এই প্রথা এখনও আমেরিকার স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। ডাক্তার সান্যাল লিখিয়াছেন, এখন তাই ইদুর গিনিপিগ প্রভৃতি ছোট-ছোট প্রাণীর ওপর ঔষধ পরীক্ষিত হয়, তখন মানবদেহে হইত। তাই মনে হয়, সেই সুপ্রাচীন গবেষকগণ বর্তমান গবেষকগণ অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ছিলেন।

সুশ্রুত ৭৬০ সংখ্যক উদ্ভিদের—গাছাগছড়ার সাধারণ গুণ-নির্ধারণ করিয়া উহাদিগকে ৩৭টি শ্রেণীতে সাজাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরে আরও অনেকে এই তালিকায় গ্রন্থের উদ্ভিদ যোজিত করিয়াছেন। এইভাবে হিন্দুদের তৈজ্যবিজ্ঞান (materia medica) তৈয়ার হয়। এইখানে একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়া গাছগাছড়াকে চিনিবার বা সনাক্ত করিবার কোম

পদ্ধতি, প্রণালী বা উপায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তথা কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই। আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞা ও উদ্ভিদবিদ্যায় শত শত জীব ও উদ্ভিদের মাত্র দুইটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়—একটি বড় শ্রেণী বা genus (ইহাকে জাতি বলা যাক) এবং অল্পটি ছোট শ্রেণী বা species (ইহাকে ‘বর্গ’ বলা যাক)। এই শ্রেণী বিভাগ করা হয় মুখ্যতঃ কল ও ফুল পরীকার দ্বারা। যেমন—বট, অশ্বখ, পাকুড় হইল একই জাতি-ভুক্ত *ficus*, আর ইহার তিনটিই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট বর্গ-ভুক্ত—*indica*, *reli* ও *venosa*; কাজেই বটের বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম হইল *ficus indica*। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইতে শুধু জানিতে পারা যায় যে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে তাহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও তাহাদিগকে আমাদের বাঙ্গালার বট, অশ্বখ ও পাকুড় বলিয়াই চিনিতে পারিব। দার্জিলিং-এ বটগাছ নাই বলিতে গেলে বলিব *ficus indica* নাই, তা সে যেখানে যে নামেই অভিহিত হউক না কেন। এইরূপ বিজ্ঞান-সম্মতভাবেই উদ্ভিদের সনাক্ত (identification) করা হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা গুণাগুণ জানিবার কোন উপায় নাই। আমরা এই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানি আলু, বেগুন ও লঙ্কা অথবা গুড়ো চিংড়ি, গলুদা চিংড়ি ও কাঁকড়া একই জাতিভুক্ত, কিন্তু এই বিভাগ দ্বারা ইহাদের গুণাগুণ কিছুই জানিতে পারা যায় না।

তাই বলিতেছিলাম, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ভৈষজ্যধণ্ডে ব্যবহৃত যে শত-শত উদ্ভিদের উল্লেখ আছে, তাহাদের চিনিব কিরূপে? গুরু শিষ্যকে গাছটি দেখাইয়া উহাকে ‘অপামার্গ’ বলিয়া চিনিয়া দিয়াছিলেন এবং উহার গুণাবলী শিখাইয়া দিয়াছিলেন, কাজেই গুরুশিষ্য-পরম্পরায় ভৈষজ্যরূপে অপামার্গের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু যতক্ষণ না ঐ অপামার্গ আমাদের বাঙ্গালার পরিচিত ‘আপাং’ বলিয়া নিশ্চিতরূপে অবগত হইতেছি, ততদিন আপাংকে ঔষধরূপে প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। উদ্ভিদের সনাক্ত করিবার অর্থাৎ এই উদ্ভিদটিই যে শাস্ত্রোক্ত বিশেষ উদ্ভিদ, তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় আবিস্কৃত বা উদ্ভূত না হইলে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উন্নতি

হইবার কোন উপায় নাই—আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রধান ঔষধই হইতেছে পঁচন, বিভিন্ন গাছগাছড়া সিদ্ধ জল।

অতঃপর কথায় কাজ কি? ‘পলাণ্ডু-ই যে ‘পিন্নাজ’ কে বলিল? মনু রত্নন, গাজর, পিন্নাজ ও কোড়ক অভক্ষ্য বলিয়া একই শ্লোকে নির্দেশ করিয়াছেন।

লন্তনং গৃহ্ননৈব পলাণ্ডুং করকপি চ।

অভক্ষ্যপি বিজাতীনামমেধ্য প্রভাবাণি চ ॥ ৫।৫

কিন্তু রত্নন, গাজর, কোড়ক, পিন্নাজ এইগুলিই যে পর পর লন্তন, গৃহ্নন, পলাণ্ডু ও করকের সংহিতায় উক্ত সংস্কৃত নাম কে বলিল? দাক্ষিণাত্য, পাঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে অতি নিষ্ঠাবান, সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী ব্রাহ্মণ ও পলাণ্ডু, লন্তন খান।

আর এক কথা! আমাদের শাস্ত্রে বিভিন্ন বস্তু তিন তিন তিথিতে ভোজন করা বা সন্তোষ করার নিষেধ আছে। প্রতিপদে—কুম্ভাণ্ড, দ্বিতীয়ায়—বৃহতী, পূর্ণিমায় ও অমাবস্য়ায়—তৈল প্রভৃতি। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কুম্ভাণ্ড কি বিলিতি কুমড়ো, বা ছাঁচি বা চালকুমড়ো? বৃহতী কি কণ্টকারী বা কটিকারী, সে যে উৎকট তৈতো, ইহাই কি সেকালে খাইবার রীতি ছিল? নতুবা তিথি-বিশেষে অভক্ষ্য কেন? তৈল—কী তৈল, সরিষা, নারিকেল, না তিলের তৈল? মাদ্রাজীদের তিলের তৈল ছাড়া রান্না হয় না। বৃহতী, কণ্টকারী প্রভৃতির স্তায় বহুতর গাছগাছড়ার সনাক্ত লইয়া কবিরাজ মহাশয়দের মাথা কাটাফাটি ভারতের সর্বত্র প্রায় একশত বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে।

আয়ুর্বেদের আলোচনা এই পর্যন্ত—ইয়ুনানী, আলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথীর আলোচনা করিলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। তবে পুঁথি বাড়িয়া গেলেও একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ দরকার। গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় ওজনের তিনটি শব্দ—তোলা, মাষা, পাও (পোয়া) ভিন্ন অল্প কোন স্থলে কোনও শব্দে বর্ণ-উচ্চারণ-সূচক চিহ্ন (diacritical sign) ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু হওয়া খুবই উচিত ছিল।

এইবার হবিগুলির সম্বন্ধে দুইচার কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। ডাক্তার সান্তালের প্রবন্ধে আছে

৬খানি অতি সুন্দর একাধিক বর্ণের বড় এবং ৬২খানি একরঙ্গা হাকটোন ব্লকের ছোট ছবি। এই ৬২খানির মধ্যে আছে—আত্রেয়ী কর্তৃক শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার, চোখের ছানি কাটার, বিভিন্ন ঋতুতে গাছগাছড়ার ও গাছের রস এবং আঠা ও ছালের সংগ্রহের; সূক্ষ্মতে উক্ত বহুপ্রকার যন্ত্র, শাস্ত্র, শলা, শলাকাদের, ক্ষার তৈরীর, বীজ হইতে তৈল বাহির করার, পারা শোধন করার, মকরধ্বজ ও বিস্তৃত সৈকো তৈয়ার করার, নানা যন্ত্রের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর দেহে ঔষধ প্রয়োগ করার, ভাবমিশ্র-কর্তৃক উপদংশ বা গরমি বা ‘ফিরক’ রোগে (syphilis) পারা প্রয়োগের যুক্তি-প্রদানের* ছবি। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ভিষক্ মংক (মানক্য) বাগদাদে হাকন-অল-রশিদের নাড়ী পরীক্ষা করার ছবিও আছে।

এইবার ৬খানি রঙ্গীন চবির উল্লেখ করিতেছি। (১) মহেঞ্জদারো যুগে (খৃ. পূ. ৩,০০০-৪,০০০) ভিষগাচার্য একটি সুন্দরী যুবতীর নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন, (২) অস্ত্র-চিকিৎসক জীবক মাথার খুলিতে অস্ত্রোপচার করিতেছেন, (৩) আলেকজান্ডার ও জর্জেনক গ্রীক-চিকিৎসক দেখিতেছেন—হিন্দু ভিষক্কে একজন সর্পদষ্ট গ্রীকের চিকিৎসা করিতে, (৪) একজন হকীম রোগী দেখিতেছেন। (৫) দিল্লীর সিকান্দার শাহ্ লোদীর সমক্ষে মদহুশ্-সিক-ই-সিকান্দার শাহি (সিকান্দার শাহ্কে উৎসর্গীকৃত নিরাময়ত্বের আকর) রচিত হইতেছে—যাহা সংস্কৃত হইতে অনূদিত ও সংকলিত এবং (৬) হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ডাক্তার হোনিগ্-

বারগার (Honigberger) মহারাজ রঞ্জিং সিংহের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ বই পড়িতেছেন।

এই ছবিগুলির সুখ্যাতি লিখিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের দুর্ভাগ্য প্রদর্শনীতে আসল চিত্রগুলি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। কেবল ১নং ছবি সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন আছে। এই চিত্রে দেখি, সেই আবিষ্কৃত ব্রহ্মে গড়া মানবের মাথাটি চিকিৎসকের স্বন্ধে স্থাপিত, সেই সুপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ গলকষলবিশিষ্ট বঁাড়, সেই পাথরের কুপ ও পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি সবই হুবহু ঠিক ঠিক আছে—দেখিলেই মনে হয়, ইহা মহেঞ্জদারোর সময়কার ছবি বটে—চমৎকার, মনোহর, যথাযথ দৃশ্যপট, কিন্তু একটু কিছু আছে।—সেই ৫৬ হাজার বর্ষ পূর্বে কি স্বাস্থ্যবতী যুবতীদের বন্ধের কোন আচ্ছাদন ছিল না? না, তখনকার লোকেদের ধারণা ছিল যুবতী রমণীর বক্ষঃস্থলে লঙ্কাজনক কোন বস্ত্র নাই—সেই কোন্ সুপ্রাচীন যুগের অরণ্যগুহাবাসিনী অসভ্য স্ত্রীলোকের জায়।

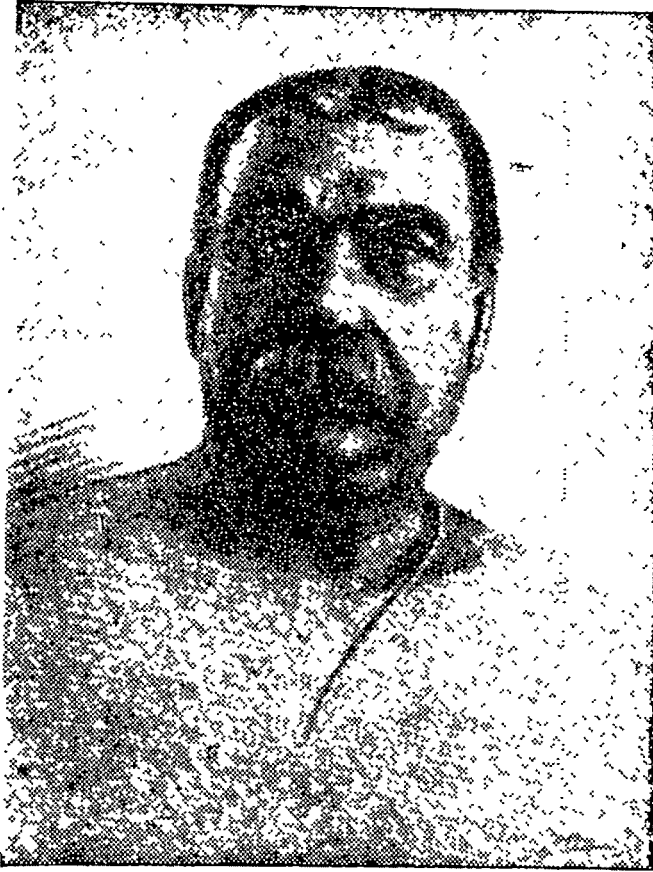
এ বয়সে এ আর্ট বুঝিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। সত্যে জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি Art for Art's sake-এর নমুনা? ব্লকের ওপর একখানি সূক্ষ্ম ওড়না আঁকিয়া দিলেও কি আর্টের মাথা কাটা যাইত? আমাদের মনে হয়, দিলে ভালই হইত—অমরশিল্পী ভবানীচরণ লাহার আঁকা ‘সদ্যঃস্নাতা’র চিত্র অপেক্ষা সুন্দরতর হইত এবং ‘লাজে পলাইল লাজ’ হইত না। তবু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, এ চিত্রের কলঙ্ক। এই অল্পপম রচনার জন্ত এবং চিত্রে ভৈষজ্যতত্ত্ব প্রদর্শনের ব্যবস্থার জন্ত আমরা ডাক্তার সান্যালকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।

* উপদংশ রোগ ভারতে ছিল না, ফিরিস্তি বাই এ-দেশে আনয়ন করে, তাই আয়ুর্বেদে ইহা ‘ফিরক’ রোগ নামে অভিহিত হইয়াছে।

পুরুষ-সিংহ আশুতোষ

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

আশুতোষ ছিলেন বাঙালীর শিক্ষাগুরু। বাঙলা ভাষাকে তিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতালিকায পাংক্তেয় করেন নি, সর্বদিকে সর্বস্তরে যাতে মাতৃভাষার সমৃদ্ধি ঘটে সেদিকেও তাঁর নজর ছিল। সারা জীবন তিনি যুগ - ভগীরথের মতন সাধনা করে গেছেন। তাঁর সাধনায় পথে অনেক বাধা এসেছে— এসেছে অনেক বিপত্তি। তবু অমিত-তেজা আশুতোষ অটল ধৈর্য নিয়ে সে সব বাধা-বিপত্তি পার হয়েছেন। তিনি বলতেন : “জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা আবশ্যিক। বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য্য।” বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন বাঙলা ভাষার মাধ্যমে



শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তখন প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত-পণ্ডিতরা বললেন—এতে শিক্ষা প্রসারের কাজ ব্যাহত হবে। তাঁরা যুক্তি দেখালেন যে, বাঙলা আজও শব্দ-সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে নি। সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি শাখায় বাঙলা ভাষার মৌলিক কোন রচনা নেই। আশুতোষের মন প্রাচীনপন্থীদের এই সব যুক্তিতে টলল না। ইংরাজীনবীশরা নাক কুঁচকে বললেন যে,

এতে দেশের সমৃদ্ধি ক্ষতি হবে। বাঙালী ছাত্রেরা বিশ্বের দরবারে আর স্থান পাবে না। বিজ্ঞানে-দর্শনে সাহিত্যে তারা পিছিয়ে পড়বে। ইউরোপের বিজ্ঞান-মানসের সঙ্গে ইংরাজীর মাধ্যমে বাঙালী-মানসের যে যোগস্বত্র

রচিত হয়েছিল তা' এই বাঙালিপনার জন্ত ছিন্ন হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বুঝিবা একটা দেশীয় প্রাইমারী বিদ্যালয়ে পরিণত হবে! আশুতোষ অটল। তিনি বললেন : “দশভুজার পাদপদ্মে রক্তজবার অর্থাৎ মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃ-পদের অযোগ্য...।”

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে আশুতোষের সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। নিজে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চল রত্ন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান লাভ করেন ও বৃত্তি পান। শারীরিক

অসুস্থতার জন্ত এফ-এ পরীক্ষায় ভাল ফল না দেখাতে পারলেও ১৮৮৪ সালে আশুতোষ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। গণিত শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ মেধা ছিল। কলেজে পড়বার সময় আশুতোষ ইউক্লিডের জ্যামিতির একটি উপপাদ্যের বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন ও কেম্ব্রিজের গণিত পত্রিকায় তাঁর সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়

আশুতোষ ১৮৮৫ সালে এম-এ পরীক্ষা দেন এবং গণিতে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। পরের বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বিষয় নিয়ে এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হলে আশুতোষ গণিত, মিশ্রগণিত ও ফিজিক্সে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হলেন। তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করলেন ১৮৮৬ সালে। আশুতোষ কেবল গণিতশাস্ত্রেই মেধাবী ছিলেন না, তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্ত তৈরী হলেন। কিন্তু পরীক্ষক ইলিয়ট সাহেব আর তাঁকে পরীক্ষা দেওয়ার অহুমতি না দিয়ে বললেন যে, আশুতোষের মতন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র যে-কোন বিষয়ে পরীক্ষা দিলে প্রথম স্থান অধিকার করবেন। কিন্তু তাতে অস্ত্র ছাত্রদের উপর অত্যাচার করা হবে। ১৮৮৮ সালে আশুতোষ সিটি কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি আইন-ব্যবসায় সুরু করেন। ১৮৯৩ সালে ডক্টর অব ল ও অনার্স ইন ল উপাধি লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষ ১৮৮৯ সালে সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর এক কাকা ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য। তাই ছাত্রজীবন থেকে সেনেটের আলোচ্য বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিস্তারের সমস্যা এবং তার সমাধান সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা ধারণা জন্মেছিল। কাকার সঙ্গে তিনি এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা করার ইচ্ছা তাই স্বাভাবিক ভাবে তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল। তিনি একসময় বলেছিলেন : “শৈশবাবধি আমি দুইটি বিষয়ের স্বপ্ন দেখিতাম। প্রথম—আমি বড় হইয়া হাইকোর্টের জজ হইব; দ্বিতীয়—আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিব।” আশুতোষ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তাঁর দ্বিতীয় কামনাকে সফল করে তোলেন। দীর্ঘকাল সেনেটের সদস্য আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয় নিয়ে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাঁর সারগর্ভ মতামত জানিয়েছেন। পরাধীন দেশের সমস্যা তো একটা নয়—বহুতর। বণিক ইংরাজ

যেদিন থেকে ভারতবর্ষের রাজদণ্ড মুসলমান নবাব আর বাদশাহদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল তখন থেকে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কি করে সোনার ভারতবর্ষকে আরও আরও বেশি করে শোষণ করা যায়। ভারতবর্ষের সম্পদে ছিল তার লোভ তাই সেই লোভ চরিতার্থ করার জন্তই ইংরাজ সরকার এদেশে একদল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করতে তৎপর হল। দেশ থেকে ইংরাজ যুবক এদেশে নিয়ে এসে কাজ-করাবার চালাতে গেলে লাভের অঙ্ক কমে যায়, আর তা’ সম্ভবও নয়। তাই বণিকরাজ ইংরাজদের ইচ্ছা ছিল কিছু ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়ে এদেশেরই যুবকদের দিয়ে তারা তাদের শোষণের কাজ বজায় রাখবে। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ঘটায় বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের প্রতিভাধর একদল মানুষ সারা দেশে ভাবগঙ্গার পবিত্র স্রোত নিয়ে এলেন। রামমোহন থেকে সুরু হল বাঙালার নবজাগরণের কাল। শোষণদলের সাহায্য-কারীষের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের মনোবৃত্তি সীমিত রইল না। বরং শিক্ষার আলোক তাঁদের মনোজগতে ভাববিপ্লব সৃষ্টি করল। শিক্ষা চাই, প্রতিষ্ঠা চাই—চাই অধিকার। পরাধীনতার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠা ও অধিকার ভোগ করা তো সম্ভব নয়। তাই মূল আদর্শ স্বাধীনতা অর্জন। বিশ্ববিদ্যালয় হ’ল আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের মিলনস্থল। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে জাতীয়তার আদর্শ প্রচারের, জাতীয় শিক্ষা প্রসারের পথে নানা বাধা-বিপত্তির উদ্ভব হতো। শাসকসম্প্রদায় বার বার আইন-কানূনের নাগপাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধারাকে বাঁধতে চাই-ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব করে তাকে সরকারী দণ্ডের পরিণত করাই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্ত প্রয়োজন যথেষ্ট অর্থ—কিন্তু কে দেবে সে অর্থ? দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু বিদেশী সরকার অর্থের অভাবের অজুহাতে হাত গুটিয়েছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এই সমস্যাপুলো বারবার প্রকট হয়ে উঠেছে ও রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ মনীষীরা

শিক্ষা-প্রসারের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং যার ফলে বাঙলাদেশের দিকে দিকে বাঙালীদের মধ্যে যে শিক্ষা অর্জনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তা' ব্যাহত হয়েছে। এই শিক্ষা-সংকটের আঘাত এবং সেই সংকট মোচন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত ইতিহাসের অনেকখানি।

আশুতোষ দীর্ঘকাল ধরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত থেকে বিরোধী শক্তিগুলোর সঙ্গে লড়াই করেছেন—সমস্যার সমাধান করে ও উন্নততর ব্যবস্থার প্রবর্তন করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়রূপে তিনি গড়ে তোলেন। ১২০৬ সালে আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইন্স চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন। এবার আর সেনেটের সদস্য নয়, একেবারে উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ভার তাঁর উপর। সেনেটের সদস্য হিসাবে এতদিন ভাল-মন্দ বিচার করেছেন, সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু এবার সব দায়িত্ব যে তাঁর স্বন্ধে। পুরুষসিংহ আশুতোষকে উপাচার্য হিসাবে লাভ করে বাঙালী বন্য হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে নূতন জোয়ার এল। শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় ইংরাজীর ছিল একমাত্র স্থান। আশুতোষের প্রচেষ্টায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা বাংলা ভাষায় নেওয়ার ব্যবস্থা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করেছিলেন আশুতোষ। একটির জায়গায় পঁচিশটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হল। আর তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় চব্বিশটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পঠনের পরীক্ষারও ব্যবস্থা হল—ইংরাজী, সংস্কৃত, পালি, আরবী, ফার্সী, ভারতীয় ভাষাসমূহ, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, গণিত, অর্থনীতি, ফলিত গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পঠনের ব্যবস্থা হওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষের নাম ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আর এর জন্যে আশুতোষ কেবলমাত্র সরকারী অর্থের আশায় বসে থাকেন নি, তিনি বেগরকারী সাহায্য সংগ্রহ করেছেন। শুধু অর্থ থাকলেই

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলে না। শিক্ষার উচ্চমান অর্জন করতে এবং ব্যাপকভাবে শিক্ষা-প্রসারের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক। এদিকেও আশুতোষের নজর ছিল। জহরীর মতন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিত-রত্নদের আনিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নবরত্নের সভা বসান—ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, অধ্যাপক সি. ভি. রমণ, ডক্টর ব্রজেননাথ শীল, অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ, অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, অধ্যাপক আগরকর, আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—এঁরা ছিলেন সেই রত্নমালিকার এক একটি উজ্জ্বল রত্ন। আর সর্বোপরি ছিলেন নিজে আশুতোষ। কি শিক্ষায়, কি মেধায়, কি সংগঠন-শক্তিতে—তিনি ছিলেন এক অমিততেজী পুরুষসিংহ। বহর মধ্যে বিশেষ একজন।

আশুতোষের জীবনের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হলেও এতকাল এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কেবল-মাত্র ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান কর্ম ও দায়িত্ব। ১২০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বলা হল যে, অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে বিজ্ঞান-শিক্ষা, বিজ্ঞান-চর্চা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা হবে।

কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্ত প্রয়োজন উপযুক্ত গবেষণাগার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ত কোন আলাদা ব্যবস্থা ছিল না, ছিল না কোন উন্নত গবেষণাগার। স্নাতকোত্তর বিভাগ তো দূরের কথা—মাধ্যমিক শিক্ষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্ত যে গবেষণাগার দরকার তেমন কোন ভাল গবেষণাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ছিল না।

আশুতোষের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক শ্রেণীতে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তিত হল ১২০৭ সালে। কয়েক বছর পরে বি. এসসি পাঠক্রম গৃহীত হল। এম. এসসির পাঠক্রমও বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হল—কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন উপযুক্ত গবেষণাগার ছিল না, তাই প্রেসিডেন্সী কলেজে এম. এসসি পড়ান হতো।

এই সমস্যার সমাধান করার জন্ত আশুতোষ সরকারী অর্থের জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে আবেদন জানালেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে ভারত সরকার রাজী হলেন না। বিখ্যাত দানবীর স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষ বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে কয়েক লক্ষ টাকা দিবেছিলেন। আশুতোষ সরকারী বড়কর্তাদের কাছ থেকে বিমুখ হয়েও এতটুকু নিরাশ হলেন না। বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্ত স্যার তারকনাথ পালিত আপার সার্কুলার রোডে যে জমিটুকু দিবেছিলেন সেখানে ১৯১৪ সালে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। ১৯১৭ সালে এখানে নব নির্মিত ভবনে বিজ্ঞান কলেজের কাজ শুরু হল। পদার্থবিজ্ঞা ও রসায়নশাস্ত্রের পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের দুই কৃতী পুরুষ—অধ্যাপক সি. ভি. রমণ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আশুতোষ একেবারে একান্ত হয়ে মিশে গিয়েছিলেন। পাঁচবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনীত হন। এই দীর্ঘকাল ধরে বাঙালী মাঝেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বুঝতেন আশুতোষকে। Sir Ashutosh was in fact the University and the University was Sir Ashutosh.

১৯১৭ সালে ভারত সরকার ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা পর্যালোচনা ও উন্নতি-বিধান করার জন্ত এক কমিশন গঠন করেন—স্যাডলার কমিশন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্রা ছিলেন এই কমিশনের সদস্য। আশুতোষ স্যাডলার কমিশনের সভ্যরূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসেন। বাঙালী হলেও এবং আজীবন বাঙলার সেবা করলেও তাঁর মন ছিল প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও যাতে সেই প্রদেশের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় আশুতোষ সেই মত পোষণ করতেন। তিনি লিখেছেন : “কেহ কেহ বলেন, সমগ্র ভারতে এক

ভাষার প্রচলন আবশ্যক, কেননা ভাষাভেদে মনোভেদ, স্মরণাত্মক মতভেদ অনিবার্য, তাই তাঁহাদের মতে অন্তত : হিন্দী ভাষা সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত, আমি কিন্তু এ মতের সমর্থন করিতে পারি না; যে কারণে ইংরাজী ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দী বা অথ কোন একটা নির্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সার্বজনীন ভাষা হইতে পারে না।” তারপর তিনি লিখেছেন যে, তাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা নিজের নিজের জাতীয় ভাব ও সংস্কৃতির ধারাকে বিস্মৃত হবেন। তাতেই বরং ভারতের জাতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হবে। সম্প্রদায়ালী প্রাদেশিক ভাষাগুলোর গৌরব ন্যূন হবে।

দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত থাকায় আশুতোষ বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অসীম। জাতীয় জীবন ও জাতীয়-মানস গঠনের কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা মুখ্য। তাই এক সমাবেশ সভায় তিনি বলেছিলেন : No human institution is so permanent as a University. Dynasties may come and go, political parties may rise and fall, the influences of men may change, but the Universities go on for ever as seats of trust and power, as free fountains of living waters and as undefiled alters of inviolate truth. বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এমনই উচ্চ ধারণা ছিল আশুতোষের মনে। কিন্তু ভারত সরকার যখন ১৯২৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি অধিকার খর্ব করতে চাইলেন—তখন আশুতোষ এই সরকারী অপচেষ্টার প্রতিবাদ জানালেন। লর্ড লিটন ১৯২৩ সালের ২৫শে মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে অহরোধ জানিয়ে এক পত্র লিখলেন। ‘বাংলার বাধ’ আশুতোষ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং উপাচার্যের পদে ইস্তফা দিয়ে পত্রের জবাবে লিখলেন : “আমার পূর্ববর্তী ভাইস্ চ্যান্সেলরগণ কেহই গভর্নমেন্টের ইচ্ছাধীন হইয়া কাজ করেন নাই। আমি তাঁহাদেরই পথে চলিয়াছি।

তবে আমি কখনও লাটসাহেবের বা তাঁহার মন্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্ত তিলমাত্রও চেষ্টা করি নাই।...এদেশে একুশ একজন ভাইস্ চ্যান্সেলার পাওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না, যিনি আপনাদের স্বাধীন হইয়াই আদেশ প্রতিপালন করিবেন এবং মিনেটে গুপ্তচরের কাজ করিবেন, তিনি সহজেই আপনার অন্তরঙ্গ হইবেন।”

ব্যবহারিক জীবনে আশুতোষকে অনেক সাহেব-স্ববোর সম্পর্শে আসতে হয়েছে। সরকারী উচ্চ আমলাদের অনেকের সঙ্গে তাঁকে মিশতে হয়েছে কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্যকে বিলিয়ে দিয়ে কোনদিন তিনি উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষদের সঙ্গে হৃদয়তা করেননি। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে স্বাধীনতার পূজারী। যেখানে স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার এতটুকু আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, সেখানেই মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করেছেন। কর্ম-জীবনে আশুতোষ ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। প্রায় বিশ বছর ধরে তিনি বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন, কিন্তু কোনদিন অসত্যের পথ অবলম্বন করেন নি। ক্ষুরধার বিচারশক্তি ছিল আশুতোষের—নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যা’ একবার তাঁর কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হতো তা’ তিনি গ্রহণ করতেন। যাকে সত্য বলে মনে করতেন তা’তেই তাঁর মন নিবিষ্ট হত।

হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণের পূর্বে আশুতোষ স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায়ের রত হন। আইন ব্যবসায়ের তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও দানবীর স্যার রাসবিহারী ঘোষের কাছে। অল্পকালের মধ্যে তিনি আইনব্যবসায়ের খ্যাতি অর্জন করলেন। প্রভুত অর্থ তিনি অর্জন করতেন। কিন্তু বিচারপতির পদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বাধীন আইন ব্যবসায় ছেড়ে দিলেন। বিচারপতির পদ অতি সম্মানজনক পদ। পিতৃবন্ধু দ্বারকানাথ মিত্রের মতন বিচারপতি হওয়ার ইচ্ছা তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। উত্তরকালে তাঁর সেই ইচ্ছা সফল হল। ১৯০৪ সালে চল্লিশ বছর বয়সে আশুতোষ হাইকোর্টের বিচারপতি হন এবং ১৯২৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২০

সালে কিছুদিনের জন্ত তিনি প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। বিচারে পক্ষপাতহীন রাযদানের জন্ত আশুতোষ সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। আর সেই জন্ত তাঁর সম্পাদিত রাযগুলো আজও নজীর হিসাবে গ্রহণীয়। তিনি ভ্রাম-নীতির এবং প্রচলিত আইনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাই আইনের ক্ষেত্রে আজ তাঁর শারীরিক অবস্থান না থাকলেও আছে তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি-নিঃসৃত রাযগুলো। এগুলো আজ নজীর হিসাবে অমরত্ব লাভ করেছে।

পরিবেশ মাহুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। মহান শিক্ষাব্রতী আশুতোষের জীবনী আলোচনা করলে এ সত্য সম্যকভাবে হৃদয়স্থ করা যায়। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ভবানীপুরের মুখ্য পরিবারের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন নামকরা চিকিৎসক। আর তাঁর কাকা রাধিকাপ্রসাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য ছিলেন। পূর্ব ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে জানা যায় যে, যুগ্মে পরিবারের আদি নিবাস ছিল নদীয়া জেলার কুলিয়া গ্রামে। কবি কুস্তিবাস ওঝা এবং রাযগুণাকর ভারতচন্দ্রের সঙ্গে এই বংশের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে।

একশ বছর আগে ১২৭১ সালের (ইংরাজী ১৮৬৪ সাল) ১৫ই আষাঢ় কলিকাতার মলঙ্গা লেনের একখানা বাড়ীতে আশুতোষের জন্ম হয়। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ তখনও মেডিকেল কলেজের ছাত্র। পরবর্তীকালে গঙ্গাপ্রসাদ ভবানীপুর অঞ্চলে এসে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন।

ছাত্রজীবনে আশুতোষ মহাপ্রাণ শিবনাথ শাস্ত্রীকে শিক্ষক হিসাবে লাভ করেন। তিনি তখন সাউথ সুবার্বন স্কুলের ছাত্র। মাত্র পনের বছর বয়সে ১৮৭৯ খ্রষ্টাব্দে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এক-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৮১ খ্রষ্টাব্দে। বি-এ পরীক্ষায় আশুতোষ বৃত্তিলাভ করেন। আশুতোষের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ১৮৮৮ খ্রষ্টাব্দে। যুবক আশুতোষের গণিতে অসাধারণ মেধার কথা ভারতের বাহিরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদেশের বহু সংস্থার

তিনি সদস্যপদ লাভ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন ফিজিক্যাল সোসাইটির, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের গণিত সোসাইটির, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সিসিলির গণিত সোসাইটির ও প্যারিসের ফিজিক্যাল সোসাইটির তিনি সভ্যপদ লাভ করেন। শিক্ষার জন্য কিম্বা দেশভ্রমণের জন্য অথবা সরকারী মুখপাত্র হিসাবে আন্তোভোষ কোনদিন ভারতের বাহিরে পদার্পণ করেন নি। কিন্তু বাহিরের জগতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, বিচারশক্তি এবং পাণ্ডিত্য তাঁকে ইউরোপের বিজ্ঞানের সভায় তাঁকে পরিচিত করেছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আন্তোভোষ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। তবে আন্তোভোষের কর্মজীবন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিচারপতি হিসাবে হাইকোর্টের সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। আর এই দুই স্থানে তিনি বিরাট সাফল্য অর্জন করেন।

জজ্বিত্য থেকে অবসর গ্রহণের পর আন্তোভোষ আবার আইন ব্যবসা শুরু করেন। হাইকোর্টে আইনের সম্পর্কেই এতদিন ছিলেন—সুতরাং পসার জমতে দেবী হল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাঙলার, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আন্তোভোষ ডুমুরাওন রাজ্যের এক মামলা নিয়ে পাটনায় গিয়েছিলেন। সেই তাঁর শেষ যাত্রা। ২৪শে মে অকস্মাৎ পাটনায় আন্তোভোষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বাঙলার এক মহাপ্রাণের কীর্তিকালের অবসান ঘটল।

প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে, এ যাকে স্পর্শ করে তাকেই মহান করে তোলে। আন্তোভোষ ছিলেন এক অনন্তসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। জীবনের সর্বদিক তিনি তাঁর মহান কীর্তিতে উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাইকোর্ট তাঁর কীর্তির জয়স্তুম্ব। জজ্বিত্য এবং উপাচার্যগিরি করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বাঙলা-সাহিত্যের সেবা করেছেন। তাঁর সে সাহিত্যসেবা বকিমচন্দ্রের মতন উন্নত স্তরে পৌঁছাতে না পারলেও তা আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

মাতৃভাষা বাঙলা কি করে একটা প্রধান ভাবার স্তরে উন্নীত হবে এই ছিল আন্তোভোষের সর্বশ্রেণের ধ্যান-

জ্ঞান। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাই বাঙলা-ভাষাকে পাণ্ডুক্ষেয় করেছিলেন। লেখার মাধ্যমে তিনি বললেন : “বঙ্গ সাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিরাট সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের অন্ততম প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমনভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে হইবে। কিছুই অসম্ভব নহে। চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে এই সংসারে স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা যায়। কাল অনন্ত এবং পৃথিবী বিশাল, সুতরাং ব্যস্ততার কারণ নাই।” বাঙালী জাতি প্রাচীন আর্যজাতির বংশধর। আদি ভাষা সংস্কৃত থেকেই বাঙলাভাষার উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং বাঙলা ভাষাতে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করবার আহ্বান জানিয়ে আন্তোভোষ লিখেছেন : “যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই বা নিজের জাতীয় ভাষা নাই, সে জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙালী ভারতের যে প্রাচীন মহাবংশের ভ্রাতাংশ, সেই প্রাচীন আর্য জাতির ভাষা এবং সাহিত্যভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙালীকে নিজের জাতীয় সাহিত্য গঠনে সম্পূর্ণরূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই।” বাঙলা সাহিত্য প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক। সেই ঐতিহ্যের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : “বহু কাল বহু শত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কৃষ্ণিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ষিত ভূমির উর্বরতা বর্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন।” এই কর্ষিত ভাষারূপ জমি বীজ বপনের উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু কোন্ বীজ বপন করলে উপযুক্ত ফল ফলবে? কোন্ কোন্ রত্নসম্ভারে তবে জাতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে হবে? আন্তোভোষ সে প্রশ্নে তাঁর সারগর্ভ মতামত জানিয়েছেন : “কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্তাশাস্ত্র, সমাজ-নীতি—সর্বপ্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যিক। সর্ববিধ কলার বিস্তার জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।”

রামায়ণ মহাকাব্য সংস্কৃত পণ্ডিতদের সীমার মধ্যে

সীমিত ছিল। কুস্তিবাস বাঙলা পদ্যে রামায়ণ রচনা করে বাঙালীর হৃদয় জয় করেছিলেন। ঘরে ঘরে তাই কুস্তিবাসের নাম অমর হয়ে রয়েছে। তাঁর প্রগড়ে আশুতোষ বলেছেন : “কুস্তিবাস জানিতেন যে, বাঁহাদের ক্ষমতা তিনি কাব্য লিখিয়েছেন, তাঁহারা কি চান, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত, কিরূপ আলেখ্য তাঁহাদের নয়ন-রঞ্জন হইবে। কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইরা তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্বদা এই মন্ত্রে স্মরণ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জন্মিয়াছে।”

তখনও রবীন্দ্র-কাব্যের ভাস্বরচ্ছটায় বাঙলা সাহিত্যের আকাশ উজ্জ্বলভায় ভরে যায় নি—মধুসূদন তখন সাহিত্যাকাশে দেবীপ্যমান স্বর্গ্য-সম অবস্থান করছেন। বাংলার জাতীয় কবির আসনে মধুসূদন অধিষ্ঠিত। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আশুতোষ লিখেছেন : “মৌলিক ভাষায় অল্পটুকু ছন্দের প্রবর্তনের ভ্রায় বহুভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিয়া মধুসূদন বাঙালী কবিতার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বাঙলা ভাষা ও বাঙালী জাতি থাকিবে—ততদিন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইবে।”

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যে যোগস্বত্র-রূপ আশুতোষ তাঁর পাণ্ডিত্যে ক্ষুরধার বুদ্ধিতে এবং প্রতিভার আলোকে বাঙালীর হৃদয় জয় করেছিলেন। তাঁর নাম তাই আজও বাঙালীর ঘরে ঘরে। যতদিন বাঙলা ভাষা, বাঙালী জাতি থাকিবে ততদিন তাঁর নামও বাঙালী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। ইংরাজ সরকার তাঁকে নাইট এবং সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করেছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ ‘সরস্বতী’, ঢাকার পণ্ডিতসমাজ ‘শাস্ত্র-বাচস্পতি’ এবং বৌদ্ধসংঘ তাঁকে ‘সমুদ্রাগম চক্রবর্তী’

উপাধি দিয়ে নিজেই গৌরবান্বিত হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছিল ডি, এসসি ও পিএইচ, ডি. উপাধি। কিন্তু জ্ঞানতপস্বী আশুতোষের কাছে এসব উপাধির কোন মূল্য ছিল না। তিনি কর্মের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রেখেছিলেন। সারা জীবন জ্ঞানের সমুদ্রের তীরে হুড়ি কুড়িয়েছেন। তাই তাঁর মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিধি ছিল অসীম।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আশুতোষকে ‘বিদ্যার সারথি’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে স্মৃতি-তর্পণ করে তিনি বলেছেন : “তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্তে পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার করে দিয়ে আশুতোষ এখানে গবেষণা বিভাগ স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয় বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকূলতা কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশ্রয়শ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এইখানেই। তার প্রধান কারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ আপন করে দেখতে পেরেছিলেন, সেই অভিমানেই এই বিদ্যালয়কে তিনি সমস্ত দেশের আপন করে তোলবার ভরসা করতে পারলেন।”

আশুতোষ মনেপ্রাণে ছিলেন বাঙালী, কোট চাদর আর ধুতি ছিল তাঁর পোষাক। এই পোষাকে তিনি হাইকোর্ট থেকে সভা-সমিতি সর্বত্র যেতেন। বাড়ীতে ঝাঁজল গায়ে তিনি থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, ‘বামুনের ছেলে ঝাঁজল গায়ে পৈতে পরে থাকতে লজ্জা পাইনে।’ চটজুতো পরে থাকাটা তিনি বেশী পছন্দ করতেন।

কর্মে-চিন্তায়-পোষাকে-ব্যবহারে এই বাঙালীপনা ছিল আশুতোষের বিশেষত্ব। আশুতোষ আজও বাঙালীর হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর!



ছোটলোক

শ্রীপ্রমদাকান্ত আচার্য্য

গৃহস্থের বাড়ী। কুকুর আছে আবার বিড়ালও আছে। কুকুর বাইরে পাহারা দেয়। বিড়াল ঘরে মহড়া দেয়। কুকুর উচ্চৈঃস্বরে ডেকে গৃহস্থের ঘুম ভাঙায়। বিড়াল ঘুমের ঘোরে ঘুসুর টেনে গৃহস্থকে ঘুম পাড়ায়। কুকুর শোয় ছাইয়ের গাদায় বাইরে আঁদাড়ে। বিড়াল বিহার করে গৃহিণীর কোমল শয্যায় বা গৃহস্থের আর একপাশে। কুকুর—কুকুর ছোটলোক, অস্পৃশ্য। স্পর্শ করলে স্নান করতে হয়। বিড়াল মা বগীদেবীর বাহক, উচ্চশ্রেণীর জীব; যার ভজনা করে বক্ষ্যা গৃহিণী পূত্রবতী হন।

যে বাড়ীর কুকুর বিড়ালের কথা হচ্ছে তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। বড়লোকের বাড়ীর ব্যবস্থায় আধুনিক কালে কুকুরের মর্যাদা অনেকই বেড়ে গিয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে অনেকদিন থেকে; বোধহয় ইংরাজের পদার্পণের পব। কুকুর সেই বিপ্লবে পা বাড়িয়ে সামাজিক মর্যাদার খানিকটা উন্নতি করলেও কুকুর বিড়ালের ব্যবধানটা সমানই রয়ে গেছে।

গৃহস্থের বাড়ীর কুকুরটা বিড়ালটাকে ডাকে মাসী। কেন ডাকবে না, তার চেয়ে জন্তু-জগতের মত মহামাছু ব্যক্তিবর্গও ত বিড়ালকে মাসী বলে ডেকে কৃতার্থ হয়। আত্মকাল অবশ্য মাসী সম্পর্কের প্রচলন যত মানুষের সমাজে বেড়েছে, পশুর সমাজে তত বাড়েনি। তারা আদিম ও অকৃত্রিম সংসার সম্পর্ক পালন করে দিনাতিপাত করতে কষ্টবোধ করে না, মানুষ বুদ্ধিজীবী—তার অস্বস্তি অনেক।

জীবজন্তুর মধ্যে আপন আপন ভাষায় ভাবের আদান প্রদান চলে। একদিন তাই কুকুর বিড়ালীকে বলে—মাসী বেলা তো গড়িয়ে যায়, ক্ষিদেয় মরি—কিছু খেতে দিতে পারিস? গৃহস্থের হ'লো কি! একমুঠো ভাত তো আমাকে আঁদাড়টার পাশে রোজ দেব। আজ তো দিল না! মাসী বলে—রাখ বাপু, একটু দেখে নি। শেষে বলবোখন—এই বলে মাসী মাজাটা ছলিয়ে

আঁচলটা অর্থাৎ লেজটা নেড়ে রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হতে থাকলো। কুকুর তার পিছন পিছন অমুনম্ব বিনয় করে চললো। হঠাৎ বাড় বাকিয়ে বিরক্তি সহকারে মাসী বলে—আরে বাপু, কি আক্কেল তোর। আস্তে আস্তে আমার ঘাড়ের পর—ছুঁস না যেন দেখিস। কুকুর স'রে গেল। বিড়াল রান্না ঘরে ঢুকলো।

টুং টাং টুং টাং শব্দ হ'তে থাকলো। কুকুর মনে করলো মাসী তার জন্তে ভাত বাড়ছে। সময় যায় ক্ষিদেয় মরে, কুকুর উঠে এল বারান্দার দোর গোড়ায়। বিড়াল মুখ মুছতে মুছতে—বললে বাপু, কোথাও তো কিছু দেখিনি। খোঁজতো তোর জন্তেই করছি। তোর বড় লোভ। কথায় কথায় জিবটা সোয়া হাত বের ক'রে দিস। একটু দাঁড়া না। শব্দ পেলে. যে গৃহস্থ মারমুখে হ'য়ে উঠবে।

কুকুর দেখলো মাসী সব খেয়ে সাবাড় ক'রে দিল। তার আর তবু সয়না। সে এখন ঘরে ঢুকবে। একখানা পাও বাড়িয়ে দিল ঘরের মধ্যে। ভয়ে সে আড্ডট। তবু লেজটা শুঁজে, কান দুটো নীচু করে মরিয়া হ'য়ে সে অগ্রসর হ'লো। ভাত দুটো না হ'লে যে তার প্রাণ যায়। এদিকে বিড়ালী করলো কি, তার একেবারে লোমহর্ষণ হ'য়েছে। কি আশ্চর্য্য বিধিনিষেধের গুণী মাড়িয়ে ছোটলোক কুকুর যে একেবারে ঘরে ঢুকতে চায়। সে এক লাফে এসে কুকুরকে রুখে দাঁড়ালো। লেজ ফুলে সোজা, চোখ দুটো লাটা, পিঠ ধহুকের মত বাঁকা; গোঁফ কাঁটা দিয়ে উঠেছে একেবারে সোজা। আট পাটি দাঁত বের ক'রে মাসী উচ্চৈঃস্বরে আঁও আঁও ক'রে গালি পাড়তে থাকলো। কুকুরও যথাসম্ভব অসংযতভাবে ভাগ ভাগ ক'রে বিড়ালীকে উপেক্ষা করতে থাকলো। দোরগোড়ায় একটা খণ্ডযুদ্ধ হ'য়ে গেল। কুকুরের সাহস না হ'লেও বিড়ালী কিন্তু তাকে প্রায় দু'তিনটা চপেটাঘাত করে ছিটকে পড়ে জলের ঘটি ঢেলে, লবণের পাত্র উপড় করে, তেলের বোতল গড়িয়ে দিয়ে সব একাকার ক'রে ফেললো। শেষে

ঝিটা খেয়ে দরজাটা আধাবন্ধ রেখে আঁচাতে গিয়েছিল, ছুটে এল সে। ঘরে গিয়ে দেখে ভাত মাছ ছব সব খেয়ে বিড়ালী ঘরের কোণে শুয়ে হাঁপাচ্ছে। সে এসেই দিক্-বিদিক্শূন্য হ'য়ে বিড়ালীকে একটা ধা দিল। বিড়ালী বিকৃত স্বর বের ক'রে পিঠ কুঁজো ক'রে দৌড়ে একটা গাছে গিয়ে উঠলো। কুকুর আর কি ক'রে—এক পা ছ'পা ক'রে এসে আবার তার জায়গায় শুয়ে পড়লো। গৃহিণী চোখ মুছতে মুছতে উঠলেন। সব শুন্লেন ও বুঝলেন—ঐ কুকুরটারই সব বোষ। সে বোষ হয় বে-আইনী ভাবে ঘরে ঢুকেছিলো। তাই বিড়ালের সঙ্গে ঝগড়া। বিড়ালতো কোনদিন হেঁসেলের কোন কিছুতে মুখ দেয় না। আজ দেবে কেন।

ইতিমধ্যে এলো ঝড়ু, বাড়ীর পাশের রাম বাগ্‌দীর ছেলে। বলে—মাসিমা, একপাখ চাল আমাদের ধার দিতে পারেন? মা পাঠিয়েছেন। আমাদের আজ খাওয়া হয়নি। কাল রাতে শুধু আমি খেয়েছিলাম। মা বাবার জন্ম আর ছিল না। গৃহিণী ঝড়ুর দিয়ে বলে উঠলেন—কি জানি বাপু, তোদের এই নিত্য মরার সাথী কে হ'বে, আমি বুঝি না। সেই যে ছোটো টাকা ক'দিন হ'লো দিয়েছিলাম তাওতো দিলি না। এই রকম না খেয়ে থাকার কথা শুনেইতো দিয়েছিলাম। টাকা ছোটো আজই দিয়ে যাসু। আর চাল কোথেকে দেবো। আমাদের চাল বাড়ন্ত। ঝড়ু একেবারে যেন বিবর্ণ হ'য়ে গেল। তার চোখ ভরে জল এলো। সে এক পা ছ'পা ক'রে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লো।

কুকুর গাছের তলে শুয়ে বিড়ালকে ইজিত, করে কি বড়মানুষের মেয়ে, ঝি মাগী মুখটা ভাল করে ছেঁচে দিয়েছে তো? বিড়ালী বলে, আরে যাঃ ছেঁচুক না—চোপা মারুক না ঝি, তবু তো আমি মেঝে শালের ঠাকুরঝি। আর তুই কে ভেবে দেখতো—আধপেটা খেগো ছোটলোকের পো, শেয়াল শকুন তাড়িয়ে আদাড়ে গিয়ে শো।

গৃহিণী ভুবনেশ্বরী দেবী মাখায় হাত দিয়ে কি ভাবছেন। এমন সময় ঝড়ু এসে ছটি টাকা দিয়ে গেল। তার গা হাত পা কাঁপছে ক্রোধায়। মার কানের সমান্ত সোনাটুকু সাড়ে তিন টাকার বিক্রী ক'রে ছ' টাকা

এই দেনায় দিল। বাকী দেড় টাকার চাল ভাল কিনে দিয়ে এসেছে। সমস্ত দিন উপবাসের পর তারা আজ ছটি অন্ন গ্রহণ করবে। গৃহিণী বলেন—ওরে ঝড়ু, একটা কাজ কর দেখি—আমাদের চাকরটা কোথায় গিয়েছে তার পাত্তা নাই। তুই বাপু আমার গরুর জাবটা একটু মেখে ঠিকঠাক করে দিয়ে যাতো। আর কাকেই বা বলি। ঝড়ুর পিস্তবুদ্ধি হেতু বমি আসছিল। শরীর কম্পমান, কথাটি না বলে মাসী-ঠাকরুণের কাজটুকু সযত্নে করে দিয়ে গেল।

কিছুদিন পরে গৃহস্থের একটি ছোট ছেলের ডিপথিরিয়া হ'লো। ডাক্তার এসে দেখে বললেন—শীগ্‌গির করে হাসপাতালে নিয়ে যান। আপনাদের বাড়ীতে বিড়াল আছে কি? বিড়াল থেকে এই ব্যারামটা আসে। কোনদিন বিড়ালে খাওয়া কোন-কিছু খেতে দিয়েছিলেন কি? গৃহিণী জবাব দিলেন—না তো, আমাদের বিড়াল তেমন নয়। অতি ভাল, কোন কিছুতে মুখ দেয় না। কুকুরটার পরে গৃহিণী ভারি বিরক্ত। সে ছেলেটার সঙ্গে খেলতে আসে। তার ভারি ভয় করে। তিনি শুনেছেন, তার ননদীর দেবরের পিসি-স্বাস্তীদীর খুড়তুতো ভাস্করকে বাড়ীর কুকুরে একটা আঁচড়ে দেয়। পরে সে হাইড্রো ফোবিয়া হ'য়ে মারা গেল। গৃহিণী তাই কুকুর সম্পর্কে বড় হ'শিয়ার। কিন্তু বিড়াল সম্পর্কে এরূপ কথা তো তিনি শোনেন নি। ডাক্তাররা ও রকম কত কিছু বলে থাকেই। যাক, ঝড়ু বাগ্‌দীর সহায়তায় রাত দুপুরে ছেলেটাকে হাসপাতালে পাঠানো গেল। যথা সময়ে ছেলেটি ভাল হয়ে বাড়ী এলো। বিড়াল সর্গোরবে গৃহস্থের দ্বিতীয়া অঙ্কলক্ষী হয়ে সে বাড়ীতে বিরাজ করতে থাকলো।

এক বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ হলো। লোকে খেতে পায় না। চাউলের ভীষণ দর। খাদ্যবস্তু নিত্যশূন্য ও দুপ্রাপ্য। তেমনি আবার মহামারী দেখা দিল। বাড়ী বাড়ী কলেরা, বসন্ত নানারূপ রোগ। বিনা চিকিৎসায় লোক মরতে লাগলো। কেঁ কাকে দেখে। গরু বাছুর মানুষ বিড়াল খাদ্যভাবে মরতে লাগলো। ভুবনেশ্বরী দেবীর স্বামী অগম্যাবাব রোগাক্রান্ত হ'য়ে হাসপাতালে।

ছেলেমেয়েরা অসুস্থ। নিজেও রোগশয্যায়। চাকর চাকরাণীও ছেড়ে গিয়েছে। অন্ন চলে না। ভীষণ দুঃখ। চাউল কণ্ট্রোল করে বিক্রয় হয়। কালো-বাজারী চাল মিললেও কোথায় বা পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে তাই ঝড়ু বাগদীকে গৃহিণী ডাকেন। সে যা পারে ক'রে দিবে যায়। এই হলো ত গৃহস্থের অবস্থা। আর কুকুর বিড়ালের কে খোঁজ করে। কুকুরটি আজ ক'দিন হলো কোথায় চলে গিয়েছে। রাজিতে আর ডাকাডাকি করে না। ইতিমধ্যে গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি হ'লো। চোরে একরকম বা-কিছু ছিল সব নিয়ে গেল। এখন উপবাস, অচিকিৎসা এই চলতে থাকলো। নিতান্ত অসহায় অবস্থা। বিড়ালী মৃতপ্রায়, কিছু খেতে পায় না। এমন সময় একদিন কুকুর বাড়ী এল। তার শরীরটা কেমন জ্বলন্ত নাহুস-মুহুস। যেন গায়ে তেল বেয়ে নামছে। বিড়ালী মৃতপ্রায় যেন তাকে কি বলে। দেশেতো মহামারী লেগেছে। মৃতদেহ খেয়ে কুকুর আর পারে না। তার সেদ বুদ্ধি হ'বেছে। কুকুরটা খানিক বমি করলো। বিড়ালী গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে গাছ থেকে নেমে একটু শুঁকলো। কুকুর বাধা দিল। বোধ হয় বললে—মাসী ওকাজটা করো না বাপু। দেখ আমি

ছোটলোক। আমার উচ্ছিষ্ট কি তোমার খাওয়া ভাল দেখায়। চল, আমি তোমাকে নিয়ে অক্লান্ত যাই। বিড়ালী কুকুরের পিছনে পিছনে কোথায় উধাও হয়ে গেল। বোধ হয় বনে ছোট পাখী পোকা তেঁক ই'দুর ধরে খেয়ে বেঁচে ওঠার শেষ স্বপ্ন দেখেছিল সে।

ভুবনেশ্বরীর চুলো জ্বলে না কয়েকদিন। ঝড়ু খোঁজ-খবর নেয়। আজ এসেছে এক ডোল কাঁকড়া নিয়ে—‘মাসী কাঁকড়া খাবেন’? ভুবনেশ্বরী কাঁকড়া চিংড়িকে বড় ঘৃণা করতেন। আজ তার কাঁকড়া দেখে আনন্দ হ'লো বটে, কিন্তু কি দিয়ে খাবেন! বজ্রেন—চাল নেই ত বাবা ঝড়ু। ঝড়ু বাড়ী গিয়ে তারা যে ফ্রী র্যাশন পেয়েছে তার থেকে কিছু চালও এনে দিল। আজ আবার কয়েকদিন পরে বাড়ীতে চুলো জ্বললো। ঝড়ু বলে গেল—মাসিমা, কোন কষ্ট করবেন না যেন। যে সময় যা দরকার আমাকে বলবেন। কোন ভয় নেই। ভুবনেশ্বরী মাখায় হাত দিয়ে সেকাল ও একালের কথা তাবতে লাগলেন। তাঁর চোখে জল। দুস্তর সংসার বৈতরণীতে পাড়ি জমাবার শেষ উৎসাহ তাঁর বুকে।*

* বিগত ৩ই জুন প্রবর্তক ভবনে অনুষ্ঠিত এবর্ষক সাহিত্যচক্রের অধিবেশনে গঠিত।

ভুলের স্বর্গ

শ্রীকুলদারপন মজুমদার

স্তম্ভ দেশ ভাগে পেয়ে স্বাধীনতা,
বিভেদ বজায় রাখি'
পূব পশ্চিম মিলনে যে বাধা
দেখে তাও শিখি নাকি?
ভাইএর সঙ্গে “লড়কে” যাহারা
গড়েছে আপন স্থান,
ব্রাহ্ম-প্রীতির কবরে করেছে
প্রেম ভালবাসা ম্লান!
পূব হতে এলো পশ্চিমে যারা
পশ্চিম হতে পূবে,
যারা রয়ে গেল নাহি গেল এলো,
তারা কি মরিবে ডুবে?

জতুগৃহে যেন করিতেছি বাস
ভাগ্যভাগি করি দেশ,
বিষেবানলে পুড়িয়া নিয়ত
উভয়ে হতেছি শেষ।
এ আগুন কভু নিভিবার নয়
দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ে,
পদ্মার লহ লহরী উতাল
দুকুল ভাঙিয়া পড়ে।
বাধার বাঁধন ভেঙে ওরে আয়,
আগুনে দিস্না প্রাণ,
মন্দির আর মসজিদে তোলা
আজ্ঞানের আশ্রয়।

রচিতে স্বর্গ গড়েছি নরক

বুঝিবার মহাভুলে,

যাদের শিরায় যাদের শোণিত

বাক্য স্বাভাবিক ভাবে।

একখানি চিঠি

(প্রবর্তক-সম্পাদককে লিখিত পত্র)

শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ

প্রেমাস্পদেষু,

ভাই রাধারমণ, আশা করি ভগবৎকৃপায় সর্বদীন কুশল। আমার নিজের শরীর ভাল নাই—খুবই দুর্বলতা। তা'ছাড়া স্বাধীনতা পাইবার পর যে রকম দুর্নীতি বাড়িয়াছে, তাহাতে এতটুকুও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার উপায় নাই। ইংরাজ যাইবার সময় কি সর্বনাশটাই না করিয়া দিল! ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি ভারত সন্তান কতদিনে যে আবার অমুরাগী হইবে, ভগবানই জানেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থা আদৌ ইহার অমূলক নয়। কোন উৎসাহই পাই না।

তবে তোমার এবারকার 'প্রবর্তকে' (বৈখাণ '৭১') প্রচেষ্টা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার দাদা মহাশয়ের লেখাটি পড়িয়া খুবই উৎসাহ পাইয়াছি। বলিতে গেলে তিনিই এ বিষয়ে সর্বপ্রায়ে আমাদেরও টানিয়া নামাইয়াছেন। তাঁহার 'দেবভাষা পরিষৎ' প্রতিষ্ঠা এক যুগান্তকারী ঘটনা। সমস্ত প্রাদেশিকী ভাষার জননীস্বরূপা সংস্কৃত ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে না পারিলে যে দেশের কল্যাণ নাই, একথা কতদিন পূর্বে যে তাঁহার মাথায় চুকিয়াছিল—তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। বলিতে কি, তিনি বোল্‌তার চাকে বসিয়াই চাকে ঢিল ছুঁড়িয়াছিলেন। বহু হিন্দীওয়ালাকে তিনি তাঁহার সমর্থক পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিরোধীর দলই ছিল সংখ্যাতেও বেশী, প্রভাবেও বেশী। একবার তো তামলপুত্র সভার সব ঠিকঠাক করিয়াও বিরোধীদের ধাক্কা সব বন্ধ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এ বড় বেশী দিনের কথা নয়।

স্বাধীন হওয়ার ঢের পূর্বে হইতে—এমন কি ইংরাজীর প্রবল যখন বোল্‌বোলাও—তখনও সাহস করিয়া এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিটির যে চেষ্টা সূত্র হয়, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। ইহাই তাঁহার প্রতি সংস্কৃতকে সব চাইতে বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল। সংস্কৃত নিজেও তো ঠিক এই ভাবেরই ভাবুক ছিলেন। তিনি নিজে বেশ রক্ষিয়াছিলেন যে, ভারত স্বাধীনতালভ করিলেও, সে

স্বাধীনতা বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সারা ভারতে একমাত্র এই সংস্কৃত ভাষারই প্রাধান্য স্থাপিত করিতে হইবে। হিন্দী কোনোদিনই নিখিল ভারতে সমস্ত মানুষের সমাদর পাইতে পারে না। জোর করিয়া হিন্দী চালাইতে গিয়া দাক্ষিণাত্যে দারুণ ঘা খাইতে হইয়াছে। দিব্যদৃষ্টি দ্বারা যেন সংস্কৃত মহাশয় এই অবস্থাটা দেখিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সমারম্ভ সমস্ত কাজের মধ্যে এই সংস্কৃত প্রচারের কাজকে অত্যন্ত গুরুত্ব দান করিতেন। ভারতকে শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ ও সংস্কৃতিমান করিতে একমাত্র এই সংস্কৃত ভাষাই যে সমর্থ একথা তিনি অসঙ্কোচে অকুণ্ঠ কণ্ঠে বহুবার বলিয়াছেন।

তারিখটা ঠিক লেখা নাই, তবে তিনি নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন, অত্যন্ত আবেগপূর্ণ হৃদয় লইয়া। নব্য-ভ্রাম্যপ্রস্থতি মা যে আমার প্রেমাবতার প্রস্থতিরূপেও সমগ্র বিশ্বের এক বিষম হইয়া আছেন, ইহা সংস্কৃত মহোদয়ের দৃষ্টি এড়ায় নাই। নবদ্বীপের সাধারণ গ্রন্থাগারে তাঁহাকে যে সম্বর্ধনা জানানো হয়, তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলেন, প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর তাহা শ্রবণ করা উচিত। প্রচেষ্টা মজুমদার মহাশয়ের 'স্মৃতি-কথা' পড়িয়াই সেই নবদ্বীপের সেদিনকার স্মৃতিকথা যথাজ্ঞান জানাইয়া রাখিতেছি। ভবিষ্যতে অনেকের হয়তো কাজে লাগিবে।

সংস্কৃত ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বাধা যখন বর্ণনা করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, ভাষা যেমন ওজস্বিনী, কণ্ঠস্বর তেমন চিত্তাকর্ষক। বেশ মনে আছে তাঁহার সেই দৃষ্ট ভাবণ :

“আমি নবদ্বীপে তীর্থযাত্রীরূপেই আসিয়াছি। নবদ্বীপ যে ভারতীয় সংস্কৃতির পুণ্যধারাকে ধরিয়া রাখিয়াছে! এই নবদ্বীপেরই এক দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান রঘুনন্দনের অনুশাসন কেমন করিয়া যে ময়মনসিংহ হইতে মেদিনীপুর, মানডুম হইতে চট্টগ্রাম—সারা বাংলা আজও মাথা পাতিয়া মানিয়া চলিয়াছে, ইহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এই নবদ্বীপেরই নব্যভ্রাম্য সমগ্র ভারতকে

বাংলার বুক টানিয়া আনিয়াছে, নবদ্বীপকে গুরুস্থানে পরিণত করিয়াছে। তত্ত্বসাধনায় বাঙ্গালীকে বীৰ্য্যবান করিয়াছে, আবার প্রেমাবতার শ্রীগোরাঙ্কের প্রেমবত্নায় উচ্চনীচ ব্রাহ্মণচণ্ডাল মান-অভিমান কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। নবদ্বীপ ছিল বলিয়াই বিজ্ঞাতীয় বর্ধরতা বাঙ্গালীর সংস্কৃতির স্বর্ণপ্রতিমা চূর্ণ করিতে পারে নাই। মৃন্ময়ী মূর্তি ভাঙিয়াছে, কিন্তু চিহ্নময়ী মূর্তিতে মা আমার সদাঙ্গাশ্রিতা হইয়া রহিয়াছেন।”

গত প্রবল বত্নায় পতিতোদ্ধারিণী মা গদা দয়া করিয়া অতর্কিতভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার সব সংগ্রহ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন। নতুবা সংঘগুরু নবদ্বীপকে যে কত ভালবাসিতেন, তাহা তাঁহারই লেখা হইতে দেখাইতে পারিতাম।

কথাটা আর একবার তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সংঘগুরুর স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত স্থানই হইল নবদ্বীপ। কলিকাতা ইংরাজী সভ্যতার মস্ততায় ভরা। চন্দননগরও ফরাসীদেরই গৌরবের ধ্বংসাবশেষ। এখানকার সৌধমালায় কোন ঐতিহ্যকুহলের স্মৃগন্ধ নাই। স্বাধীনতার সংগ্রামের দিনে ইংরাজের শাসন-কলঙ্কিত অঞ্চলের বহির্ভূত স্থান হিসাবেই মাতৃমঙ্গসাধনার শুদ্ধভূমি হিসাবে তখন চন্দননগরকে বাছিয়া লইতে হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দকেও তাই শেষ পর্য্যন্ত পণ্ডিতচেরীতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাহার পর এই সেদিন আবার শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতিমন্দির সেই নবদ্বীপেই নিদয়ার ঘাটে ফিরিয়া আসিয়াছে। অদ্বৈত মধুদাদা (শ্রীস্বরেন্দ্রমোহন ঘোষ) সেদিন এই প্রতিষ্ঠা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন আমার কানে কানে কি মর্ম্মস্পর্শী কথা বলিয়াছিলেন জানো? বলিয়াছিলেন—একবার এই নিদয়ার ঘাট দিয়াই “নবদ্বীপ ঐহাকে বিদায় দিয়াছিলেন, সেই প্রেম-সম্পূট আবার এই নবদ্বীপেই ফিরিয়া আসিল।”

কথাটার মানে ভাল করিয়া বুঝিও।

সপরিবার গৌরসুন্দর আবার এই নবদ্বীপেই তাঁহার হাটপশুন না করিলে ভূষিত বিশ্ব শান্তির সন্ধান কোথায় পাইবে? তাই রে, এখনও সব ভাল করিয়া বুঝিয়া

দেখিও। সমগ্র বিশ্ব আজ কাঙাল হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মস্কো হইতে ফিরিয়া অদ্বৈত পণ্ডিতবর শ্রীদুর্গাপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ‘Hindusthan Standard’ (10.11.68) পত্রের Russian ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার মূলগত সাম্য দেখাইয়া বাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে সংঘগুরুর প্রাণের বাসনার কথা নিশ্চয় তোমাদের মনে পড়িবে। তোমাদেরও খুব আনন্দ হইবে বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা হইতে কিম্বদংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

If I were asked what two languages of the world resembled each other most, I would reply without any hesitation: ‘Russian and Sanskrit.’ * * It is the surprising resemblance of the word structure, the style and syntax coupled with yet closer relationship of grammatical rules of Sanskrit and Russian which command the serious attention of all those who have some fascination for linguistic matters and an intellectual curiosity to know more about the close ties that existed between the people of the USSR and India a long time ago.

আরও একটু উদ্ধৃত করার প্রলোভন সঘরণ করিতে পারিতেছি না। সত্যই খুব আনন্দ পাইবে।

“When I went to Moscow, the manager of my hotel gave me the key for room No. 234 and said ‘Dwesti Tridsat chetire.’”

For a moment I could not decide whether I was standing before a pretty girl in Moscow or I was in Banaras or Ujjain of our classical period of some 2000 years ago. In Sanskrit 234 is ‘Dwisat Truishat chatwari.’ Could there be closer relationship anywhere? There would hardly be any two different languages that have preserved the ancient heritage, so similar in pronunciation, to this day.”

এইটুকু উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছ। আজ আর সংস্কৃতের গবেষণা শুধু তামিল তেলুগু হিন্দী উড়িয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতেছে না—



শিল্পীঘন

— শ্রী বীৰেন্দ্র মোহন দত্ত —

(পূর্বাহ্নবৃত্তি : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ সংখ্যার পর)

ভৈরব যুগ্মাস্ত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন দেবকুমারের কাছে।

আনন্দের মধ্যেই এই বিশ্বের সৃষ্টি। সৃষ্টির আদিযুগে আত্মা আপনাতেই আপনি পূর্ণ ছিলেন। তখন পুরুষ নিজের মধ্যেই ছিলেন পূর্ণ আনন্দ। তারপর স্রীতগবানের

নির্দেশে হিরণ্যগর্ভ হুভাগে বিভক্ত হলেন—নর ও নারী।

তখন আর একের মধ্যে আনন্দের পূর্ণতা রইল না।

হুইয়ের মিলনের মধ্যে রইল আনন্দ। এই আনন্দ-

অমৃতভূতির নাম প্রেম। এই প্রেমের মধ্যেই বিশ্বের

অমৃতভূতিলাভ ঘটে। প্রত্যেক আত্মাই তাই দ্বিধা

বিত্ত—এক পুরুষ, অপরটি নারী। প্রথমে তারা মিলিত

ছিল, তারপর কর্মফলে জন্মে-জন্মে তারা বিচ্ছিন্নভাবে

জীবনের নানান্তরে ঘুরে বেড়ায়। সত্যকারের প্রেমাত্মভূতি

পাবার আকাঙ্ক্ষায়, জন্মে-জন্মে বহুজন্মের সঙ্গে মিলিত

হয়, কিন্তু বাসনার তৃপ্তি হয় না। আদি জন্মের যে

যুগ্মাত্মা, তার সঙ্গে মিলিত হবে যে আনন্দের অমৃতভূতি

লাভ ঘটেছিল, সেই স্মৃতি অবচেতন মনের স্বপ্ন সংস্কারে

স্মৃতিরূপে রয়ে গেছে, অমৃতজন্মের মধ্যে মিলনে সে স্মৃতি

তো তৃপ্ত হয় না। অতৃপ্তি নিয়ে মানুষ তাই এগিয়ে

চলে জন্ম থেকে জন্মান্তরে। কর্মফল কখন তাকে উন্নত

করে, কখন করে অবনত। যারা বাসনাকে সংযত করতে

পারে না, তারা স্তরে স্তরে নামতে থাকে, আর যারা

সংযত হয় তারা জন্মে-জন্মে আত্মোন্নতি করে, হারিয়ে-

যাওয়া যুগ্মাস্ত্রের জ্ঞান সে শান্তভাবে প্রতীক্ষা করে।

তারপর সেদিন তাকে খুঁজে পায়, সেইদিন তার

সাধনায় সিদ্ধি, সেদিন আবার হু'জ্বনের মিলনে ভগবদ্-

প্রেমের আনন্দের আনন্দ সে পায়। সেইখানেই সে

মানবজীবনের চরম সার্থকতা লাভ করে। তাত্ত্বিক

আজ একটা International demand জাগিয়াছে।

এই গবেষণা মন্দির অপেক্ষা সংস্করণ কি এমন বড়

স্মৃতিসৌধ কল্পনা করা যায়? আর সংস্কৃত ও সংস্কৃতির

এই মন্দিরটি নবদ্বীপ ছাড়া আর কোথায় হইতে পারে—

ভাবিয়া দেখ তো? টাকার জোরে সর্বত্র বড় বড়

অটালিকা তোলা যায়, কিন্তু নবদ্বীপে পোড়ামার

গাছতলার গৌরব তার চাইতে কত বড় বল তো?

যাতায়াতের সুবিধা ধরিলেই তো আর কাজ হয় না।

বাবা তারকনাথকে কলিকাতায় বসাইলে যাতায়াতের

ঝামেলা কমে সন্দেহ নাই, কিন্তু তারকেখরধাম হইতে

তারকনাথকে সরাইতে কি প্রাণে সাড়া দেয়?

সংস্করণ তোমাদেরই সন্দেহ নাই, কিন্তু—আমরাও

তাঁহাকে কম ভালবাসি না, তাহাও তোমরা জানো।

বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে নবদ্বীপেই তাঁহার স্মৃতিমন্দির,

বিশেষ সংস্কৃতানুশীলন ও গবেষণাগার স্থাপিত করার কথা

পূর্বেও বলিয়াছি—আজও বলিলাম। ধীরভাবে সকলে

ভাবিয়া দেখিও। প্রবর্তক সম্বন্ধে পরিচালকমণ্ডলী

আশা করি আমার এই আকৃতি মর্ম দিয়া বুঝিবেন ও

বিচার করিবেন।

তোমাদের প্রেরিত মুদ্রিত গুরুমন্দির সম্পর্কিত

আবেদন-পুস্তকাদি পাইয়াছি।

আমার সপ্রেম শুভাশীর্বাদ নাও। ইতি

নবদ্বীপ

২৭/৬/৪৪

ভট্টাচার্য্যায়ী

তোমাদের গোপেন্দ্রনাথ।

সম্যাদীরা সেইজন্ম সাধনা করেন। সাধনার মাধ্যমে তাঁরা যুগ্মাস্থার সন্ধান কবেন। ব্যভিচারী হষে বাসনার পাকে পাকে কর্মফলে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে তাঁরা সংসার ত্যাগ করেন। এবং বাসনার ভ্রান্তিকে সহজে জয় করার আগ্রহে তাঁরা শ্মশানবাণী হন, বাসনাব শেষ অঙ্ক—এক একটি জন্মের সমাপ্তিকে তাঁরা অহঃরহ প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্যময়মকে জাগিয়ে রাখেন।

তন্ত্রশাস্ত্রের এই তত্ত্ব দেবকুমারের জানা ছিল না।

ভৈরব বললেন—ভগবান এই জগতের স্রষ্টা, তিনি এক অদ্বিতীয় শিল্পী। তুইও জন্ম-জন্ম আত্মোন্নতি করতে করতে সেই মহাশক্তির এক কণা লাভ করেছিস্। তুইও তাঁর শিল্পকর্মের ভিতর দিয়ে আনন্দের অল্পভূতি ছড়িয়ে দিতে চাস্ অস্ত্রের মনে। এই শক্তির সাধনা করে তোকে আরো উন্নত হতে হবে, তুই যদি এখন একটি ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে কর্মের পাকে-পাকে জড়িয়ে পড়িস্—আত্ম-অবনতি ঘটাস্—আমি তা চোখের সামনে দেখি কেমন করে? তাই তোকে আমি রুখতে চাই।

দেবকুমার বললো—ঝিন্দনও তো শিল্পী, ওতো স্রষ্টার মধ্যে দিয়ে আনন্দ ছড়িয়ে দেয় অন্যের মনে।

—হ্যাঁ—ভৈরব বললেন—জন্মজন্মান্তরের সাধনায় ভগবৎ-আনন্দের এককণা সে নিজের মধ্যে পেয়েছিল সে শক্তিকে আরো জাগ্রত না করে—আত্মোন্নতি না করে বাসনার আর্ষতে সে ডুবে গেল। তোকেও ডোবাতে চাইল।

—ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে অবস্থার দাস হয়েছিল।

—না। মনের গভীরে বাসনা না থাকলে সে তাঁর অবস্থার দাস হতো না, বিবাগী হয়ে যেতো। সে তাঁর সমস্তরের আত্মা নয়। তুই ঘর ছেড়েছিস্ শিল্পের জগত, আর সে শিল্পকে অবলম্বন করে একজনের ঘর ছেড়ে আরেকজনের ঘরে এসে উঠছে। তাও যদি সে যুগ্মাস্থা হতো, বুঝতাম—এ টান আত্মার টান। কিন্তু সে তাঁর যুগ্মাস্থা নয়।

—কি করে বুঝলেন সে আমার যুগ্মাস্থা নয়?

—সাধনার চোখ থাকলে তুইও বুঝবি। হু'খানা মথ পাশাপাশি পড়লেই দেখবি এক মুখের ছাপ রয়েছে

আর এক মুখে—কোমলে কঠোরে অপূর্ব মিল। কথায় মিল, চলন-বলনে মিল, ভাবে-ভঙ্গীতে মিল, আকারে-ইঙ্গিতে মিল—একজন যে আরেকজনে যুগ্ম তা আর বলে দিতে হয় না। আদিকালের যোগ ধরা পড়ে যায়। তাঁর সঙ্গে ওর যে মিল নেই।

প্রবীণ তত্ত্বদর্শীর সাধনালব্ধ বিশ্বাস নিয়ে কোন তর্ক চলে না। দেবকুমার ভৈরবের মুখের পানে তাকিয়ে চূপ করে থাকে। তারপরে কোন একসময় বলে—তবু তাঁকে একবার খুঁজে দেখা আমার কর্তব্য।

ভৈরব মাথা নেড়ে বললেন—তাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হবে, তবে সে দিনটা তাঁর বড় দুঃখের দিন।

দেবকুমার এ কথাঁর কোন অর্থ খুঁজে পেল না।

গঙ্গায়মুনার সম্মতীর্থ প্রয়াগ। পীতাভ ও নীল জল যেখানে এসে মিশেছে, সেই সেই স্রোত-মিলনের সামনে ত্রিকোণ ভূমির উপর বিশাল পাষাণ প্রাচীর-ঘেরা প্রতিষ্ঠান দুর্গ। দৈত্যের মত পিছনের জনপদকে সে সদাজাগ্রত প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছে। এই দুর্গ বহু প্রাচীন। উত্তরাপথে ইন্দ্রপ্রস্থ দুর্গ ছাড়া এতো বড় দুর্গ আর নেই। পুরাকালে এই দুর্গ এমন বৃহৎ ছিল না, সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত জল ও স্থলবাহিনী পরিচালনার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র দেখে এই সমুদ্র-দুর্গের উপযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং দুর্গের বিস্তার ও দৃঢ়তা সম্পাদন কবেছিলেন। তিনিই প্রথম উত্তরাপথে একটি সুদৃঢ় নৌবাটের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, এবং তাম্রলিপ্ত থেকে নৌবিদ সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানে এক বলিষ্ঠ নৌবাহিনী গড়ে তোলেন, এবং প্রয়াগ থেকে সমতট অবধি স্বাধিকার জুগম কর্তে তোলেন। পরের যুগে মগধ থেকে সমতট বিচ্ছিন্ন হষে যায়, মগধের নৌবাট তখনই দুর্বল হয়ে পড়ে। গঙ্গার তীরে পাষাণ প্রাকারের গায় নৌকা বেঁধে রাখার জন্য আজও বড় বড় লোহার আংটার সারি বর্তমান, এখন সেগুলিতে যাত্রী নৌকাই বাঁধা থাকে। প্রতিষ্ঠান দুর্গের নৌবাটের পূর্ব-গৌরব আর নেই। তা না থাক,

তবু প্রতিষ্ঠান দুর্গ মগধ সম্রাটদের আত্মনির্ভরতার শ্রেষ্ঠ ভিত্তি। এখানকার মানুষ তাই কথায় কথায় বলে—

মগধের দুই মুখে দুই দৈত্যস্থান

পূর্বপথে চরণান্ত্রি পশ্চিমে প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠান দুর্গের পূর্বদিকে গঙ্গার তীরে প্রশান্ত প্রান্তর।

মকরসংক্রান্তির সময় এখানে সাধু সমাগম হয়। যুদ্ধযাত্রার সময় এখানে বহিরাগত বাহিনীর শিবির সমাবেশ ঘটে। দুর্গের পিছন থেকে শুরু হয়েছে জনপদ। ষাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেন বারাণসীর পরে এমন জনবহুল সমৃদ্ধ নগরী এ অঞ্চলে আর নেই। পাটলিপুত্রও এমন নয়। বড় বড় শ্রেণীরা এখন পাটলিপুত্র ছেড়ে প্রয়াগে এসেই ব্যবসায়ের পত্তন করছেন।

গঙ্গাতীরে দুর্গমধ্যে এক মন্দির আছে। সকালে সেই মন্দির দ্বার কষেক দণ্ড উন্মুক্ত থাকে পুণ্যার্থীদের দর্শন ও পূজার্তনার জন্য। বাহিরে দুর্গসংলগ্ন পাহাশালায় যাত্রীরা অবস্থান করতে পারেন। দ্বিপ্রহরে যাত্রীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা আছে।

ভৈরবের সঙ্গে দেবকুমার যেদিন সকালে গঙ্গাতীরে এসে পৌঁছিলেন সেদিন গঙ্গাপার হয়ে প্রতিষ্ঠানের ঘাটে আসার আর উপায় ছিল না। দুর্গের মাঠে তখন বিশাল সেনাবাহিনীর সমাবেশ হয়েছে। দলে দলে হস্তীবাহিনী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনার সমাবেশ হয়েছে। সমস্ত নৌকা সেনানীদের নিয়ে ওপারের ঘাটে অপেক্ষা করছে। এপারে একখানিও নৌকা নেই যা ওপারে নিয়ে যাবে।

এমন বিপুল জনসমাবেশ দেবকুমার কখনও দেখেনি, এপার থেকে যতটা নজরে আসে, তা দেখেই সে থ' হয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ভৈরব হেসে বললো—দেখহিস্ কি, নতুন রাজ্য যুদ্ধে চললো।

—যুদ্ধ কোথায়?—দেবকুমার প্রশ্ন করলো।

—কনৌজে।

—কনৌজে লড়াই হচ্ছে?

—হচ্ছে নয়, হয়ে গেছে। এবার সেখানে আরেক

লড়াই হতে যাচ্ছে।

—শুনছিলাম কনৌজের রাজারা এঁদের জামাই।

—ষাঁর জামাই ছিলেন তিনি গত হয়েছেন, এখন শালক যাচ্ছেন।

—শালা-ভগ্নীপতির লড়াই হবে?

—তুই বড় বোকা। শালা ভগ্নীপতির লড়াই হবে কেন? ভগ্নীপতি খুন হয়েছে, শালা যাচ্ছে তার শোধ নিতে।

—ভগ্নীপতিকে কে খুন করলো?

—উজ্জ্বিনীর গ্রহবর্মা?

—মহারাজ গ্রহবর্মা? তাহলে লড়াই হয়েছে বলুন?

—আরে, লড়াই মানেই তো খুনোখুনি। একজন যেখানে খুন হয় সেটা হয় নরহত্যা, আর হাজার হাজার যেখানে খুন হয় সেটা হয় লড়াই। একটা নরহত্যা বরং ভালো, তার পিছনে কারণ থাকে—ব্যক্তিগত আক্রোশ, কিন্তু লড়াইয়ের মধ্যে যারা খুনোখুনি করে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কোন কারণ থাকে, রাজার জন্য লড়তে আসে—একটা রাজার কারণে শতসহস্র নরহত্যা হয়, অথচ সেই অপরাধের রাজার তো কোন বিচার নেই।

—রাজার বিচার কে করবে?

—আর করবেই বা কেমন করে। একটা হত্যাকাণ্ডের জন্য শাসনবিধিতে একবার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা আছে, শতসহস্র খুন হলে এক রাজার তো শতবার শিরশ্ছেদ করা যায় না। সেইজন্য রাজারা এতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধাতে সাহস করে।

—আপনি কি বলছেন, যুদ্ধ হবে না?

—না।

—অন্য রাজা এসে যখন রাজ্য কেড়ে নেবে?

—কেড়ে নেবে কেন? যে নিতে আসবে তাকে ছেড়ে দিয়ে যাবে? রাজ্য না থাকলেই বা ক্ষতি কি?

—আপনি বলছেন—রাজারা সব সম্যাসী হয়ে যাক?

—সেইটেই তো আসল পথ। মন রয়েছে, বুদ্ধি রয়েছে, তাদের ঠিক কাজে ঠিকমত লাগিয়ে দাও, যেজন্য মানবজন্ম, তাকে সার্থক কর—নিজেকে উন্নত কর!

—রাজা রামচন্দ্রও তো লড়াই করেছিলেন?

—রামচন্দ্র কে বলত? রাবণ কে? সে লড়াই

জীবাস্মার সঙ্গে দশ-ইন্দ্রিয়ের লড়াই। সীতা হলেন সৎ—
দিব্যজ্ঞান, এই জ্ঞানের সঙ্গে জীবাস্মার যোগাযোগ করে
দিলেন হুমান অর্থাৎ ভক্তি। দশ-ইন্দ্রিয় দিব্যজ্ঞানকে
আবৃত্ত করছে, জীবাস্মা তাদের পরাজিত করে দিব্যজ্ঞানকে
ফিরে পেলেন। এ লড়াই তো অস্তরের লড়াই রে!
স্বর্ণলঙ্কা তো মনে, হুমান সেই লঙ্কা দহন করলো, ভক্তি
দিয়ে বাসনা কামনা সব পুড়িয়ে ছাই কর, তখন সীতার
উদ্ধার হবে—দিব্যজ্ঞান ফিরে পাবি। আমরা প্রত্যেকেই
তো রাজা রামচন্দ্র, জন্ম-জন্ম ধরে শুধু লড়াই করে যাচ্ছি
সীতাকে ফিরে পাবার জন্য। তাই তো তোকে বলি,
ভুল পথে যাস্ নি, কর্মফল বাড়াস নি।

ভৈরব ধীরে ধীরে আপন মনে আবৃত্তি করে
উঠলেন—

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিন্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্র জিহ্বে ন চ ঘ্রাণেন্দ্রে।
ন চ ব্যোমভূমি ন তেজো ন বায়ু
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥

দেবকুমার সংস্কৃত জ্ঞানে না, তবে এই শ্লোক যোগিনী
মন্দিরে সে বছবার শুনেছে। এর ব্যাখ্যাও সে জানে।
শৈবরা এই ‘শিবোহম্ শিবোহম্’ বলেই শিবলিঙ্গের
মাথায় বিদ্যপত্র চাপায়। তবে ভৈরবের মুখ থেকে সে
এখন রামায়ণের যে ভাষ্য শুনলো একথা সে এর আগে
কখনও শোনেনি। রামচন্দ্র বলে কেউ ছিল না আর
তাকে নিয়েই অন্তবড় রামায়ণখানা রচিত হলো, এ
কি সত্যি?

ভৈরব তার মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,
কি ভাবছি? মনে খটকা বেধেছে বুঝি?

—ভাবছি রামচন্দ্রের চৌদ্দ বছর বনবাসের কথা।

—যখনই সত্যকে রক্ষা করে দিব্যজ্ঞানের অধিকারী
হতে চেষ্টা করবি তখনই তো কুহ সাধন শুরু হলো, শত
বাসনা কামনা থেকে মনকে একান্তে সরিয়ে নিতে হচ্ছে,
সেই তো বনবাস। তখন তো আর সামাজিক জীবন
চলছে না। ক্ষুরস্ত্র-ধারা নিশিতা ছুরত্যা হুর্গম পথন্তঃ
কবয়ো বদন্তি।

দেবকুমার আরো দু’ একটা কথা জিজ্ঞাসা করতো,

কিন্তু ইতিমধ্যে ওপার থেকে শব্দ ও দামামার শব্দ ভেসে
এলো। হাতী, ঘোড়া, নৌকা চলতে শুরু করলো,
যুদ্ধ যাত্রা শুরু হলো। সেদিক পানে তাকিয়ে সে সব-
কিছু ভালভাবে ঠাহর করতে চাইল।

হুর্গ-তোরণ থেকে প্রথমে বেরিয়ে এলো অশ্বারোহী
বাহিনী। কালো ঘোড়ার সারি, পিঠে গৈরিক-ধারী
যোদ্ধা, মাথায় পিতলের শিরজ্ঞাণ, পিঠে পিতলের
পৃষ্ঠজ্ঞাণ, মাথার উপর বর্ষা ফলক। সূর্যালোক ঠিকরে
পড়ছে তাদের গায়। কালো ঘোড়ার পিছনে ধূসর
ঘোড়ার দল, তারপর সাদা ঘোড়া। তারপর হাতী।
প্রথম হাতীর উপর সোনালী রাজহুজ। রাজহুজের নীচে
বসে আছেন রাজা, দু’পাশে ক’জন রক্ষী। রক্ষীদের
আড়াল থেকে রাজাকে ঠাহর করা যায় না। তাঁর পিছনে
শুধুই হস্তীর সারি। প্রতিটি হস্তীর পিঠে চারজন করে
বল্লমধারী সেনা। হাতীর পিছনে আবার ঘোড়া-সওয়ার।
তবে এবার সব ঘোড়াই কালো। তারপর পদাতিক।
গৈরিক বদন, কোমরবন্ধে তলোয়ার, কাঁধে ধনুক, পিঠে
তুণ। বিশাল মিছিল, কষেক হাজার সেনা। তাদের
শেষ অবধি দেখতে দেখতে দেবকুমারের ক্রান্তি জাগলো।
কোন এক সময় গন্ধার তীরেই সে বসে পড়লো।

শোভাযাত্রা শেষ হতে বেলা দুই প্রহর কেটে গেল।
এবার দেখা দিল নৌকা, একখানির পর একখানি নৌকা
খাদ্য ও মাল বেঝাই হয়ে এগিয়ে চললো সারি দিয়ে।

ভৈরব উঠে পড়লেন, বললেন—আর দেখার কিছু
নেই, এখন কত নৌকা যাবে কে জানে। পারাপারের
নৌকা আজ আর পাওয়া যাবে না, আজ রাতটা
এপারেই কাটবে। ওদিকে এক গ্রাম আছে, চলো,
ক্ষুধা শান্তির চেষ্টা করা যাক।

ক্ষুধার কথা উঠতেই দেবকুমার অহুত্বব করলো—
সত্যই ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। বললো—সত্যি
ক্ষুধার কথা এতক্ষণ মনে ছিল না।

ভৈরব বললেন—দেহ থেকে মন সরে গিয়েছিল,
অমনিভাবেই মনকে সংসার থেকে তুলে নিয়ে ভগবানের
চিন্তায় ডুবিয়ে দিতে হবে। তখন আর ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ
ধাকবে না। জীবন আনন্দময় হয়ে উঠবে।

চৌরঙ্গী রাস্তা

শ্রীরাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

খৃষ্টীয় প্রথম শতিকা পুরুষপুর বা পুন্ড্রাবতীর (প্রাচীন কাম্বাহার রাজ্যের রাজধানী, বর্তমান পেশোয়ারের সন্নিকটে) রাজা শকাব্দা সন প্রবর্তক শালিবাহনের জ্যেষ্ঠপুত্র নাথযোগী-সিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথের রূপা প্রাপ্ত হইয়া যোগ-সিদ্ধি লাভ করেন এবং চৌরঙ্গী-নাথ নামে প্রখ্যাত হন। তাঁহার বহু শিষ্যপ্রশিষ্যগণ কর্তৃক নাথযোগী-সম্প্রদায়ে চৌরঙ্গীপন্থ নামে একটি পৃথক পন্থ বা গোষ্ঠী প্রবর্তিত হয়। এই গোষ্ঠীর যোগিগণ চৌরঙ্গী যোগী নামে পরিচিত হন।

প্রাচীন কালে বঙ্গদেশে নাথযোগী সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। হগলীর মহানাদ ও সাগরসঙ্গমে তাঁহাদের

ছইটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন কালীপীঠের সন্নিকটে গঙ্গার তীরবর্তী অরণ্যবহুল স্থানে চৌরঙ্গী-যোগিরা একটি কেন্দ্র স্থাপন করে, এবং ঐ স্থানের কয়েক মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে গোরক্ষপন্থী যোগিরা আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করে। প্রথম কেন্দ্রস্থানটি চৌরঙ্গীদের বন বা চৌরঙ্গীবন এবং দ্বিতীয়টি গোরক্ষ-বাস্তলী নামে পরিচিত হয়। প্রাচীন-কালীন কলিকাতা অঞ্চলের লোকেরা কালীঘাটে বাইবার সময় চৌরঙ্গী বনের মধ্য দিয়া একটি সরু রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিত; ঐ রাস্তা চৌরঙ্গী রাস্তা বা চৌরঙ্গী পন্থ নামে পরিচিত হয়।

ইংরাজাধিকৃত হওয়ার পর, চৌরঙ্গীবনের একাংশে

—সমস্ত গরীব-দুঃখীকে এই বিদ্যেটা শিখিয়ে দিলে তো তাদের উপকার হয়।

—সবাই পারে না। অধিত সংস্কার চাই। তাছাড়া সাধন করে কর্মফল ফল করার মত অবকাশ থাকা চাই। সংসারে দশজনকে খাইয়ে যারা যায় তারা অবকাশ পাবে কোথায় শিল্পী হবার ?

—শিল্পী হবে কেন ?

—শিল্পই যে সাধনার প্রথম সিঁড়ি। একটা মূর্তি গড়তে, কি একটা চিত্র আঁকতে একাধি মনে তন্ময় হয়ে যেতে হয়। তা থেকেই একাগ্রতার অভ্যাস আসে। সেইজন্যই বৌদ্ধবিহারের স্থবিরেরা তিস্কুদেরকে শিল্পকর্ম শেখায়। বুদ্ধ মূর্তি গড়তে গড়তে বুদ্ধ চিন্তার মন তন্ময় হয়ে যায়। সেই তন্ময়তা থেকেই আসে সাধনা ও সিদ্ধি। তাই তোকে বলি, তুই অনেকখানি এগিয়ে এসেছিস, এখন আবার নতুন কর্মের জালে জড়িয়ে পড়িস নে। ছ'চারটে শিব মূর্তি খোদাই কর, তোর মন শিবময় হয়ে যাবে—তখন আর তোর মূর্তি রোখে কে ?

—কিন্তু ঠাকুর দেবতার মূর্তি আঁকতে যে আমার ইচ্ছা করে না।

—ওইখানেই তো মায়া, তিস্কুরা ওকেই বলে ‘মার’।

ওই ‘মারের’ মার জয় কর তাহলেই সিদ্ধি। তা না পারলেই ‘মার’ তোকে মেরে দিল, ঘুরিয়ে মারলো জনম জনম।

বুদ্ধদেবের জীবন-কথা দেবকুমার ভালভাবেই জানতো। মা ষখন মৃত্যুশয্যা তখন মামা এসেছিলেন সঞ্চয়ী (সাঁচী) বিহার থেকে। অল্প বয়সে বাপ-মাকে হারিয়ে ছোট বোনটিকে তিনি কোলেপিঠে করে মাহুস করেছিলেন। তারপর বোনের বিবাহ দিয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। সঞ্চয়ী বিহারে অধ্যয়ন করে তিনি সেখানেই অধ্যাপনার কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। বোনের অস্তিম মুহূর্তের কথা তিনি যোগবলে টের পেয়েছিলেন। শেষ দেখা দেখতে এসেছিলেন বোনকে। বোনের মৃত্যুর পর কয়েকদিন তিনি দেবকুমারের গৃহে ছিলেন। তখন তিনি দেবকুমারের কাছে বুদ্ধের জীবনের নানা গল্প বলতেন। বুদ্ধের জন্ম-জন্মান্তরের অনেক কাহিনীও দেবকুমার শুনেছিল তাঁর কাছে। সেই সব গল্প এখন ভীড় করে এলো দেবকুমারের মনে।

নীরবে আর কিছু পথ এসে ছ’জনে জনপদে পৌঁছালো। মন্দির খুঁজে পেতে দেবী হলো না।

(ক্রমশঃ)

দুর্গ স্থাপিত হয়; তখন যোগিরা সেই অঞ্চল ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়া অন্তর চলিয়া যায়। তখনও কিন্তু সমগ্র অঞ্চলের অরণ্য পরিষ্কৃত হয় নাই; সুতরাং যোগিরা চলিয়া যাওয়ায় এই অঞ্চলে চোর ডাকাতির প্রাচুর্য দেখা দেয়, এবং চোরদ্বী রাস্তা দিয়া কালীঘাট-মন্দিরে যাতায়াত-কারী যাত্রীদের উপর প্রায়ই জুলুম হইত। Reedyard Kipling এই রাস্তার ভাংকালীন অবস্থা দৃষ্টে ইহাকে “the wickedest street in the world” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কলিকাতা নগরীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চোরদ্বীপন পরিষ্কৃত হইল, এবং প্রাচীন ক্ষুদ্রায়তন কালীঘাট যাত্রীর অরণ্য-পথটি একশ ফিট প্রশস্ত রাজপথে রূপান্তরিত হইল। চোরদ্বী যোগিদের কুঁড়েঘরের স্থানে আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হইল। কিন্তু বিদেশী ষষ্ঠধর্মী ইংরাজরা নাথযোগী চোরদ্বীনাথের স্থিতিটি মুছিয়া না ফেলিয়া ঐ রাস্তাটির নামকরণ করিলেন Chowringhee Road. গোরক্ষী-পন্থীর আশ্রম গোরক্ষ-বাস্তলী বিরাট মঠ, মন্দির ও প্রচুর ভূসম্পত্তি সহ অদ্যাপি দমদমের নিকট বিরাজমান আছে। সেখানে গোরক্ষনাথের প্রস্তরমূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। চোরদ্বীপন্থীদের স্থিতি শুধু ঐ রাজপথটিতে অক্ষুণ্ণ আছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা পৌরসভা এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, চোরদ্বী রাস্তার পূর্বনাম মুছিয়া ফেলিয়া উহা কবিগুরু ৮রবীন্দ্রনাথের নামানুসারে করা হউক। তখন একপক্ষ হইতে এই বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছিল যে, আধুনিক কবিগুরুর স্থিতি দ্বারা প্রাচীন-কালীন একজন সিদ্ধা-যোগিগুরুর স্থিতি অপসারণ করা উভয় মহাত্মার প্রতি অপমানকর। শেষ পর্যন্ত পৌরসভা তাঁহাদের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

সম্প্রতি আবার কলিকাতা পৌরসভা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, চোরদ্বী রাস্তাকে বিখণ্ডিত করিয়া ধর্মতলা হইতে পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত অংশে ৮জওহরলাল নেহরুর স্থিতিকে স্থান দেওয়া হউক, এবং পার্ক স্ট্রীট হইতে এলগিন রোড পর্যন্ত বাকী অংশ লইয়া—প্রাচীন কালীন সিদ্ধাযোগী সন্তুষ্ট থাকুন।

প্রস্তাবটি এক হিসাবে মন্দ নয়। ৮জওহরলাল নেহরুও আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধা। সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহের (গৌতম বুদ্ধ) চিত্তাবশেষ মাত্র আটভাগে বিভক্ত হইয়া বৃজিদের আট রাষ্ট্রে বিলান হইয়াছিল এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রে ঐ চিত্তাবশেষের উপর মঠ নির্মিত হইয়াছিল। পরে ঐ ধাতুর কিছু কিছু অংশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও সিংহলে নীত হইয়াছিল। নেহরুর চিত্তাবশেষ ভারতের সকল রাষ্ট্রে, সকল প্রধান নদীতে এবং আকাশে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে তিনি জীবিতকালেও যেমন, মৃত্যুর পরও—ভূমি-পুরুষ, তিনি পরমসিদ্ধা। সুতরাং প্রাচীন কালীন রাজপুত্রসিদ্ধা চোরদ্বীর পদাঙ্করঞ্জিত রাজপথে আধুনিক রাজনৈতিকসিদ্ধা জওহরলাল নেহরুর পদচালন খুবই যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব। ইহাতে নাথযোগিদের গৌরব অহতব করা উচিত যে,—মৃত্যুর পর জওহরলাল নেহরু নাথ-সিদ্ধা সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হইল,—ভূমিপুরুষ তথা বিশ্বমানব নেহরুর স্থতিরক্ষার্থ একটি রাস্তার ষণ্ডিতাংশ কেন? পূর্বাঘ্র কিছু পাওয়া গেল না কি? রাস্তা, উপরাস্তা প্রভৃতির সহিত মহাপুরুষ বা বীরদের নামের স্থিতি জড়িত করা আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারা। প্রাচীন ভারতে হিন্দু মুসলমান যুগে ঐরূপ পুরুষদের স্থতিরক্ষা করা হইত—দীঘি, সরোবর, গড়, দুর্গ, সহর, নগর, রাষ্ট্র প্রভৃতিতে। কমলা সাগর, প্রতাপগড়, হায়দারাবাদ, মুজফরপুর, আউরঙ্গাবাদ প্রভৃতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বোধের বিশ্ব-বিমান ঘাঁটির নাম সাণ্টা-ক্রুজ। নাথযোগী-সিদ্ধার সাম্রাধ্য প্রধান কাম্য হইলে পূর্বোক্ত গোরক্ষ-বাস্তলীর গাজসংলগ্ন-বিশ্ব বিমানঘাঁটি দমদম—জওহরলাল—নেহরুর স্থতিরক্ষার উপযুক্ততম স্থান; ইহার “নেহরু-ধাম” নাম করিলে মহামানবের স্থতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে বলিয়া মনে হয়। তদুপরি যে বেরুবাড়ীর প্রিয় পরিকল্পনাটি তিনি জীবিতকালে কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই, উহারও “নেহরু-বাড়ী” নামকরণ করিলে বোধ হয় মন্দ হয় না।

রাষ্ট্রনীতির কুটিল গতি

শ্রীতারাকিশোর বৰ্মন

রাষ্ট্রনীতির গতি ও প্রকৃতি চিরকালই কুটিল ও বিভ্রান্তিকর। আদর্শ ও বিভ্রান্তি রাষ্ট্র-জীবনে পাশাপাশি অবস্থান করে। ১৯৩৯ সালে হিটলার যখন পশ্চিম দিক হইতে পোলশু আক্রমণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে বসলেন, প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টালিনও পূর্বদিক হ'তে পোলশু আক্রমণ করলেন। পোলণ্ডের স্বাধীনতা-রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানীর বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু সে যুদ্ধ ষ্টালিনের বিপক্ষে নয়। হিটলার পররাষ্ট্র আক্রমণকারী, সাম্রাজ্যলোভী দস্যু, সে পৃথিবীর মূর্তিমান বিভীষিকা অথবা একটা অন্তত দৈতের মত ধরায় অবতীর্ণ। একদিকে ইংরাজ, ফরাসী, আমেরিকা ও অল্পদিকে বিশ্বের সমাজতন্ত্রী সম্প্রদায় তাহার দ্বিধারে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠলেন। এটুকু হিটলারের জ্ঞাত্য প্রাপ্ত তা আমরা বুঝতে পারি। তবুও একই অপরাধের জন্ত হিটলার নিম্নিত হ'লেন কিন্তু ষ্টালিনের বিপক্ষে কেহ একটা বাক্য উচ্চারণ করলেন না। হিটলার ইউরোপের কয়েকটি দেশ জয় করলেন, ষ্টালিনও পোলশু, ল্যাটভিয়া, লিথুনিয়া, এস্টোনিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানীয়া, হাঙ্গেরী অধিকার করলেন যদিও ঐ সমস্ত দেশ রুশিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধরত ছিল না এবং তাদের জনসাধারণও কম্যুনিজম চাইতেছিল না। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের না হয় বুঝতে পারি হিটলারের বিপক্ষে স্বার্থসিদ্ধির অল্পকূল ব'লে তাঁদের গ্রাণ্ড স্ট্রাটেজি (grand strategy) হিসাবে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করেও তাঁরা ষ্টালিনকে সমর্থন করবেন কিন্তু সর্বদেশের সমাজতন্ত্রীগণ, যাহারা গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণবাদে বিশ্বাসী (আমাদের জহর-লালজী ও জয়প্রকাশ নারায়ণজী সহ) তাঁরা এ প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা করলেন কি করে? এটা কি তাঁদের আদর্শ না বিভ্রান্তি?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে হিটলার রুশিয়ার অভ্যন্তরে ষ্টালিনগ্রাড পর্যন্ত প্রায় এক সহস্র মাইল অগ্রবেশ করলেন। বিপন্ন ষ্টালিন তখন "ট্যাঙ্ক চাই, আরও ট্যাঙ্ক

চাই" আওয়াজ তুলেছিলেন। আমেরিকা তখনও যুদ্ধরত ছিল না। আমেরিকাই তখন ষ্টালিনের অগ্ররোধে পারস্যের মধ্য দিয়া অজস্রধারায় সমর সস্তার রুশিয়াতে প্রেরণ করেন, যা হিটলারের পরাজয়ের প্রধান কারণ। অর্থাৎ এক কথায় শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী রাষ্ট্রের ঘোরতর দুর্দিনে পূঁজিবাদী শ্রেষ্ঠ আমেরিকাই তা'কে রক্ষা করেছিলেন। নতুবা বিশ্বের ইতিহাস অত্যাধিক লিখিত হ'ত। অথচ সেই সাহায্যের ফলে ষ্টালিন পূর্ব ইউরোপে তাঁহার সাম্যবাদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এদিকে ভারতে ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী "ভারত ছাড়" আন্দোলন করেন। নেতাজীর আজাদ হিন্দ-বাহিনী ভারতের বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হয়েছিল। কিন্তু ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি তখন বৃটিশের ছত্র-ছায়ার আরামে বসে আন্দোলন বান্চাল করতে চেষ্টা করে এবং গান্ধিজী ও নেতাজীকে কুৎসিতভাবে আক্রমণ করতে থাকে। শুধু তাই নয় ঐ সময় তাঁরা মুসলিম-লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে প্রচারকার্য আরম্ভ করে দেয়। স্বাধীনতার পরেও তাঁরা "ইয়ে আজাদি বুটা হ্যায" "নেহেরু সরকার ফ্যাসিষ্ট হ্যায" এসব জিগীর তুলতে থাকে। এসব কি রাজনৈতিক আদর্শ অথবা নীতিহীন বিভ্রান্তি?

বিশ্বের আর একটা প্রধান ঘটনা এই যে, ষ্টালিন এখন রাশিয়াতে মরদেহ পরিত্যাগ করলেও মাওসে তুং-এর দেহ অবলম্বন করে চীনদেশে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সে দেশে ঐ সময় একশতটি ফুল ফুটেছিল কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই তার নিরানন্দইটাই শুকিয়ে যায় এবং যে একটা ফুল অবশিষ্ট রইল তার অতি-বুদ্ধিতে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। তিব্বত, কোরিয়া, ভিয়েৎ নামের ব্যাপারগুলো তাঁর সাক্ষ্য বহন করছে। এবারে ভারতের পালা আরম্ভ হয়েছে। ভারতের ভাগ্য ভাল যে, ষ্টালিন রুশিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং সে দেশ আজ ক্রুশ্চেভের কবায়ত্ত। ক্রুশ্চেভের সাহায্য ছিল জওহরলালজীর পররাষ্ট্রনীতির একটা প্রধান অবলম্বন।



নেহেরু ও নেহেরু-উত্তর ভারতবর্ষ :

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতার পরিচয়, ভারতবাসী যে কি ধাতুতে গড়া আর কতখানি সভ্য, তার মনের বাঁচটি কি তা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে নেহেরুর পরলোক-গমনের পর। বিশ্ববাসীর সংশয়, আশঙ্কা ও ধারণা মিথ্যা করিয়া ভারতবর্ষ প্রমাণ করিয়াছে যে, তার রাজ-নীতিক পরিপক্বতা ক্ষণভঙ্গুর নহে, রাষ্ট্র-পরিচালনায়ও সে অর্ধাচীন নহে।

ভারতবর্ষে নেহেরুর পর কে এবং কি হইবে—ইহা লইয়া ইদানীংকালে পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গবেষণার অস্ত্র থাকে নাই। নেহেরু-ব্যক্তিত্বের অবসানের পর অরাজকতা আসিবে এমনটি ধারণা হওয়াও অমূলক ছিল না। এ্যাফ্রো-এশিয়ার দেশসমূহ সম্পর্কে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ইহাই। ভারত-বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান, চীনের কমিউনিষ্ট ডিক্টেটরশিপ, মিশর হইতে ইন্দোনেশিয়া কোন দেশেই পার্লামেন্টারী

গণতন্ত্রের পরীক্ষা সফল হইতে পারে নাই। প্রায় সব দেশেই সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। প্রায় হাজার বৎসর ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল। মাত্র সত্তর বৎসর স্বাধীন হইয়াছে। সকল ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একমাত্র ভারতবর্ষেই গণতন্ত্র সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ভারতের মানস গঠনে, তার সংস্কৃতি ও সাধনায় বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য-দর্শনের একটা স্বতঃসিদ্ধি আছে যাহাই, প্রকার ও প্রকরণে বিজাতীয় হইলেও, বর্তমান গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্টকে ভারতের মাটিতে স্থায়িত্ব দিতে পারিয়াছে। এ কথা বলিলে অত্যাক্তি হইবে না যে, বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসে, এমন কি ইংলণ্ড আমেরিকায়ও, ইহার তুলনা মিলিবে না। ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের এই গণতন্ত্রকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠা দিতে যে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হইয়াছে ভারতবর্ষে তাহার প্রয়োজন হয় নাই। রাতারাতি একরকম বিনা প্রস্তুতিতেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর ভারতের প্রথম সার্কজনীন প্রাপ্তবয়স্ক গণভোটের নির্বাচন-সাফল্যও বিশ্ব রাজনীতিতে অদ্বুতপূর্ব। নেহেরু-

“হিন্দি-চিনি ভাই ভাই” জিগীরও তা’র সঙ্গে পঞ্চাশের মিহি-স্বতার বন্ধন ডাগনকে তো আটকান গেলই না বরঞ্চ এ দিকে চীনাদের সময়সজ্জা ও অপরদিকে ইমার্জেন্সির মোতাত্ত এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ও ছর্নাতির বহর আর কতদিন চলতে থাকবে কে জানে? মাওসেতুং-এর সঙ্গে ক্রুশ্চেভের মতানৈক্য ক্রমশঃ পরিস্ফুট হ’চ্ছে এবং বিশ্বের সর্বদেশেই (ভারত-সহ) কম্যুনিষ্ট পার্টি দুই ভাগে বিভক্ত হবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এদেশে চিন্ময়গণের গ্রেফতারের পর হ’তে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদর দফতর ডাঙ্গে মহাশয়ের করতলগত। তিনি এখন কংগ্রেসের চীন-নীতির সমর্থক সেজেছেন। সংক্ষেপে এই হচ্ছে কম্যুনিষ্ট আদর্শের চিত্র। এক্ষণে ডাঙ্গে মহাশয়কে ২টা প্রশ্ন করবঃ (১) “ষ্টালিন যখন নানা কৌজের সহায়তায় পূর্ব ইউরোপ গ্রাস করেন তা’ আপনি সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এখন মাওসেতুং-এর ভারত-আক্রমণ তো ষ্টালিন নীতিরই পরিপূরক, তবুও আপনি মাও-

নীতিকে আগ্রাসী-নীতি বলায় ভারতবাসী আপনার আন্তরিকতায় সন্দিহান হ’লে আপনার বক্তব্য কি? (২) কৃষিয়া যদি ঘটনাধীনে ভারতের বিপক্ষে যুদ্ধরত হয় তখন আপনি কি করবেন?” শিক্ষিত সমাজের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, কমিউনিজ্‌ম বিশ্বমানবের মুক্তি-সাধনার জন্ত একটি মতবাদ। এটা মার্কসিয় “ইতিহাসের আধিভৌতিক ব্যাখ্যা” নামে অভিহিত-একটা দার্শনিক যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই জাতীয়তাবাদ, স্বাধাতি প্রেম, স্বদেশাশ্রয়, ধর্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি বুর্জোয়া-জ্বলভ ভাবধারা তাদের আদর্শের বিরোধী। সুতরাং চীন-ভারত বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোনও কমিউনিষ্টের মুখে স্বাদেশিকতার বাণী শুনা যায় তাহলে সেটা তার আদর্শ বা মতলব সিদ্ধির কৌশল তা যাচাই করে নিতে হবে।

বারাস্তরে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

ব্যক্তিই যে, ভারতীয় ঐক্য ও সংহতির মূল কারণ, পাশ্চাত্য বা পোঁড়া কংগ্রেসী রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরদের এই ধারণা আংশিক সত্য। সত্যের সবখানি নহে।

নেহেরুর মৃত্যুর পরে, ভারতের শাসনতান্ত্রিক ঐক্য ও শৃঙ্খলার নমুনা দেখিয়া পাশ্চাত্যের এই ধারণা বদলাইতে হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতের গণমানসের মধ্যেই ইহার বীজ নিহিত।

নেহেরু জীবনের সর্বপ্রধান অবদান ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং গণমনে গণতান্ত্রিক মনোভাবের সৃষ্টি। ভারতের ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছিতেই লোহমানব প্যাটেল ও নেহেরুর মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষদ্বয়কে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ পাইয়াছিল নেতা হিসাবে ও রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে। অস্ত্রধায হয়তো বা ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের পর ভারত রাষ্ট্রের সংহতি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে পারিত অথবা অন্তান্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মত সামরিক ডিক্টেটরশিপের কবলে গিয়া পড়িতে পারিত। এত দীর্ঘদিনের পরাধীনতার পরে ভারত যে গণতন্ত্রের পথে নির্ঝঞ্জে চলিতে পারিয়াছে তাহার প্রধানতম কারণ নেহেরুর সম্মত অপ্রতিদ্বন্দী ব্যক্তিত্ব। সচ স্বাধীন রক্তাপ্লুত ভারতবর্ষে নেহেরুর মত উদারচেতা আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান পুরুষের প্রয়োজন ছিল এবং সে প্রয়োজন মিটাইয়াছে ভারতেরই সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক সাধনা ও ঐতিহ্য। ভারতীয় পার্লামেন্টে সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক নীতির এতটুকু ব্যত্যয় না করিয়াও, জহরলাল ছিলেন ডিক্টেটর। এবং নেহেরু এই অল্পপম গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়া আজ ভারতে গণতন্ত্র স্বাধিক লাভ করিয়াছে এবং তাঁর পরবর্তীকালেও নিরাপদ শৃঙ্খলায় এই গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সংগঠিত হইতে পারিয়াছে। পণ্ডিত নেহেরুর যে কতখানি গণতান্ত্রিক দূরদর্শিতা ছিল, ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-কল্পে তিনি যে কতখানি জাগ্রত সচেতন ছিলেন তাহা তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ‘কামরাজ প্ল্যানের’ কার্যকারিতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কামরাজ প্ল্যানের মাধ্যমে যদি কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট হইতে মোরারজী,

পাতিল প্রমুখ বিরুদ্ধ মতবাদীদের অপসারণ না ঘটত তাহা হইলে নেহেরুর উত্তরাধিকারী নির্বাচন ঘন্থে একটা বিপর্যাস সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল, এমন কি গণতন্ত্রেরও দিক্ পরিবর্তন হইতে পারিত। নেহেরুর এই দূরদর্শিতা গণতান্ত্রিক ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

নেহেরুর পরে ভারতরাষ্ট্রে দুইটি লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথম ব্যক্তি-নেতৃত্বের স্থলে যৌথ-নেতৃত্ব আসিয়াছে। দ্বিতীয় এই নেতৃত্ব উদ্ভব হইয়াছে জনগণের মধ্য হইতেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মরণ হইতে নেহেরু পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়াছে অভিজাত, বিদ্বান ও ইংরাজী-ঐতিহ্যসম্পন্ন ব্যক্তি ও পরিবার। সে-দিনের সংগ্রামী পরিবেশে ইহার প্রয়োজনও ছিল। আজকের ভারত-রাষ্ট্রতরীর কর্ণধার শাস্ত্রী ও কামরাজ ইহার ব্যতিক্রম। শাস্ত্রী ভারতের প্রধান মন্ত্রী। কামরাজ মন্ত্রী-স্রষ্টা। ভারতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সত্যতা ও যোগ্যতা সর্বরকম মাপকাঠিতেই ইহার উপযুক্ততার প্রমাণ ইতিমধ্যেই দিতে স্মরণ করিয়াছেন।

নেহেরুর মৃত্যুর দিনকয়েক আগে, গত ১১ই জুন ইংলণ্ডের প্রখ্যাত সংবাদপত্র গ্যান্‌চেষ্টার গার্ডিয়ানে প্যাটিক কীটলি লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা আমরা এখানে (‘যুগবান্ধু’ হইতে) উদ্ধৃত করিলাম : “কীটলি বলিতেছেন যে, শাস্ত্রী যখন তাঁহার সামনে আসিলেন তখন মনে হইল যেন তিনি মানুষ নহেন, একটি পারী, তা আবার বাজ পাখী নহেন, ছোট চড়াই পাখী। কিন্তু যখন তিনি করমর্দন করিলেন, তখন বোঝা গেল এক পাকা মুষ্টিযোদ্ধার হাতের থাবা তাঁর হাত জড়াইয়া ধরিয়াছে। মনে হইল হাতটি বৃষ্টি পিষিয়া যায়। তারপর কীটলির মন্তব্য, যে-মানুষ নিজের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ও দৃঢ়চিত্ত এই হইল তাহার করমর্দন। পঞ্জিটিত—নিজের মন নিজে জানেন। ভারতের প্রয়োজন একজন শক্ত লোক এবং শক্ত লোক ভারত পাইয়াছে। এই মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন, রুগ্ন নেহেরু যাহা এড়াইতে চাহিয়াছেন তিনি তার সম্মুখীন হইয়াছেন। তাঁর চোখের কোণে রহিয়াছে কর্তৃত্বের ঝলক। অন্তরে

রহিয়াছে, আত্মবিশ্বাস। মানুষটি সন্তদয়, কঠোর এবং জ্ঞানপরাধ। প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত শক্ত মানুষ।”

নেহেরুর পরে ঐতিহাসিক কৃতিত্বসম্পন্ন মানুষ হইতেছেন কামরাজ—যাহা কামনা করেন তাহাই দৃঢ়চিত্তে সিদ্ধ করেন। কামরাজ বিজাতীয় তাবমুক্ত দ্বিতীয় নেহেরু। স্ব-মহিমাই তিনি অতি অল্প সময়ে নিখিল ভারত-চিন্তে নেহেরুর পর প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। তাঁর দুর্লভ অধিনায়কত্ব ভারতের রাষ্ট্র-তরঙ্গকে ছুঁধোগের মধ্যে স্থির লক্ষ্যভিমুখী রাখিয়াছে। এই দীর্ঘদেহ, বিশালকায় লৌহ-দৃঢ় ব্যক্তিটি মাত্র এক সপ্তাহে অসাধ্য সাধন করিলেন। চমৎকৃত বিশ্ব জ্ঞানিল নেহেরুর উত্তরাধিকারী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ‘কামরাজ’ প্রানের অধিকর্তাও ইনিই। ইংরাজী-অনভিজ্ঞ, তামিলভাষী, দক্ষিণী নাডার বরের সন্তান কামরাজ। পায়ে চপ্পল, গায়ে চাদর, গ্রাম্য মানুষ।

শাস্ত্রী ও কামরাজ উভয়েই ভারতের অবিকৃত মাটির মানুষ—উভয়ের মাটিও সনাতন ভারতের আদর্শ গ্রাম্য-জননী। নেহেরুর পরে ভারতীয় জীবন-ধারার দিক-পরিবর্তনেরই ইহা স্বচক। ভারত আপনাতে আপনি, স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠা পাইবার দিকদর্শন স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। পরিবর্তন যুগের চিহ্নিত মানুষ নেহেরুর বিশাল ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে যেখানে যতটুকু অন্ধকার বাগা বাঁধিয়াছিল তাহা এখন আলোর সম্মুখীন হইয়া ভাঙিতে সুরু করিয়াছে। এবং আশা করা যায়, অনতিদূর আগামী কালে ভারত রাষ্ট্র জঞ্জালমুক্ত হইবে।

গান্ধীজীর উত্তরাধিকারী হইয়াও যেমন নেহেরু ঠিক গান্ধীবাদী ছিলেন না, তেমনি নেহেরু-উত্তর ভারতরাষ্ট্র পরিচালনার ভার খাদের উপর জুস্ত হইয়াছে তাঁহারাও বর্তমানের উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও, নেহেরু-নীতি ও জীবন-দর্শনের হুবহু অমুদ্রণকারী হইতে পারেন না। ব্যক্তি-জীবনের নীতি ও আদর্শ অনেকখানি শিক্ষা, দীক্ষা, পরিবেশ, ধারণা ও ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে। নেহেরুর ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও মানস যে দেশ, কাল, পরিবেশ ও ঐতিহ্যের দ্বারা গঠিত তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারীর নহে। নেহেরুর যতটুকু রাষ্ট্রনীতিক ব্যর্থতা

তাঁহার প্রধানতম হেতু এই যে, তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবাদর্শকে রাষ্ট্রনীতির উর্দ্ধে না রাখিয়া, বিশাল জনসমষ্টির ভাল-মন্দের হেতু যে রাষ্ট্র ও রাজনীতি তাহাতেই নির্দিষ্ট প্রয়োগ করিতে গিয়াছেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীর জীবন ও জীবনচর্যা দেখিয়া অসুমান করা যায় যে, নেহেরুর বিজ্ঞানী পাশ্চাত্য-প্রভাবিত ভাবাদর্শ ভারতের নিজস্ব মৌলিক ঐতিহ্যের দ্বারা মার্জিত হইবে। নেহেরুর মধ্যে ভারতবর্ষ উঁকি-ঝুঁকি যারিয়াছে, কিন্তু স্ব-মহিমায় প্রকাশ হইতে পারে নাই। নেহেরুর পরিচয় নেহেরু নিজেই দিয়াছেন: “I have been a queer mixture of East and West, out of place everywhere, at home nowhere. Perhaps my thought and approach to life are more akin to what is called western than Eastern, but India clings to me...and behind me lie somewhere in the subconsciousness racial memories of a hundred generations of Brahmins.”

কমলার মন্ডল যেমন শত ধোঁতেও মুছিবার নয়, ব্যক্তি, বংশ ও গোষ্ঠীর দীর্ঘ পুঞ্জীভূত সংস্কার ও সাংস্কৃতিক প্রবৃত্তি বুঝি তেমনি বিলুপ্ত হইবার নহে। নেহেরুর রক্তধারার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের বোধ সংগঠিত ছিলই। নেহেরু বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণ-পর্বেই শেষতম পুরুষ। বিগত শতাব্দীতে বিবেকানন্দ অলস তমসাক্ষর ভারতবাসীকে ধাক্কা দিয়া জাগাইবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন “চালিত যন্ত্রের জায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন চিন্তা ও চৈতন্য শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর।” এই স্বাধীন সক্রিয় চিন্তারও চরম এবং পরম পরিণতি আমরা নেহেরুর মধ্যে দেখিতে পাই। ভারতের বহুকালসেবিত জাতি-বর্ণ-ধর্ম প্রভৃতি সব সংস্কারকে না-মানিবার একটা উৎকট উচ্ছ্বল প্রয়াস উনিশ শতকের বাংলায় জাগরণ জোয়ারের মুখে ভাসিয়া আসে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মজীবনীতে (১৮৪৬ এ) লিখিয়াছেন “যেদিন প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সেদিন বিস্কট ও শেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিবিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্তই উহা করা হয়।” বর্তমান যুগেও

জাতীয় উন্নতি বা অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরাকরণের ক্ষমতা যে বৈষয়িক ও অর্থসংক্রমণ নীতি গ্রহণ করা হইতেছে তাহার মধ্যেও এমন একটা যুগধর্মের প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয়। ইহা জাতীয় জাগরণের নেতিমূলক দিক।

ভারতের স্বকীয় সংস্কৃতি-ভিত্তিক একটা ইতিমূলক দিকও আছে। ইহার শিকড় এত গভীর ও ভারতের অস্থি-মজ্জা-রক্তের মধ্যে এতই সুদৃঢ় অস্থিত যে, তাহা একেবারে নিরসিত হইবার নহে। এই প্রকৃতি, এই সংস্কারবৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষকে সহস্র সহস্র বর্ষের বিজাতীয় সংঘাত-সংঘর্ষ হইতে শুধু বাঁচাইয়া রাখে নাই, অবিকৃত ও স্বস্থ রাখিয়াছে। ইহাই ভারতকে আপন অন্তর-মণিকোঠায় আশ্রয় রাখিয়াছে। পণ্ডিত নেহেরুর দৃষ্টিতেও এই ভারতবর্ষ ধরা পড়িয়াছে। তিনি অশুভব করিয়াছেন : “আপাতঃ দৃষ্টিগোচর না হইলেও একটা অলঙ্ঘ্য অখণ্ড এমন সুদৃঢ় গ্রন্থি আছে যার বেটনীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনেক কিছু এই ভারতে একত্র বাঁধা পড়িয়াছে। বারবার অভিভূত হইলেও ভারতের আত্মিক তেজ কেউ পরাস্ত করিতে পারে নাই।” শ্রীনেহেরুরই কথা ইহা।

আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, বিগত শত বৎসরে সহস্র ধাত-প্রতিঘাত উত্থান-পতন দুঃখ-দৈন্ত-দুর্ঘ্যোগের মধ্যেও বাংলায় বিজয়কক, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, অরবিন্দ প্রমুখের তাব ও তাবনার মধ্যে যে খাঁটি অমিশ্র ভারতীয় সুরটি ধ্বনিত, পোষিত হইয়া আসিতেছে তাহা রাষ্ট্রে, সমাজে, অর্থে, শিক্ষায়, পুষ্পাযিত ফলাইত

হইবার কাল আসন্ন হইয়া আসিতেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই বিস্তৃত ভারত জাতীয়তারই বেদীমূলে নিজেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁরই কথা : “নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারতমাতার পদাশুজে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করিব এবং এই আত্মাত্মিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া পূর্ণতার জীবন লাভ করিব— এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। স্বদেশ সেবা বা রাজনীতি আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করি নাই।” নেতাজীর ধ্যানের এই ভারত কোন্ ভারত? শুধুই কি রাজনৈতিক অথবা অর্থ-সংক্রমণ বৈষয়িক ভারত।

যুগময় সত্যেন্দ্র শ্রীমতিলাল এই ভারতমাতার পূজা ও সিদ্ধ জাতি সাধনার একটা সুস্পষ্ট দিক্‌দর্শন দিয়াছেন : “অধ্যাত্মসাধনার ন্যায় জাতিসাধনাতেও সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, জাতিকেই প্রতীক গ্রহণ করিয়া ‘আমি জাতিস্বরূপ’ এই সিদ্ধ ভাবেই তপস্যা করিতে হইবে। দেশ হিমালয়-মুকুট ও সাগরচুম্বিত ভৌগোলিক রূপটুকু নহে, ইহার মধ্যে আছেন যে বিরীচ দেশাত্ম। সেই ভারত সত্যই আমাদের পূজ্য ও উপাসনার কেন্দ্র। এই ভারতেরই নিখুঁত রূপ আমাদের জীবন-সাধনায় অভিভূত ও প্রকট করিয়া তুলিতে হইবে।”

নেহেরু-উত্তর ভারতবর্ষের সাধ্য ও সাধনা হইবে ইহাই। সেই সিদ্ধ শুদ্ধ ভারতই পশ্চৎ হইতে মহাশক্তি উজ্জীবনের রাজপথ দেখাইতে পারে এবং সেই ভারতই হইবে বিশ্বের গুরু ও সম্পূজ্য।



**POLYTHENE
PIPES**

- Light Flexible
- Non-Corrosive
- Acid Proof

P.V.C. PIPES.



**"SANKHA"
COMBS**

- Durable
- Comfortable
- Economic

Purnima TOOTH BRUSH

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

ESTD. 1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO.-10813

সংযোগ

গঠনের পথে ভারত—সম্পাদনা : অম্বিকা গুপ্ত
ও হিরণ্ময় গুপ্ত। প্রকাশক : ইউনাইটেড স্টেটস
ইনফর্মেশন সার্ভিস।

১৯৫১ সালে ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সহযোগিতার যুক্ত হয়।
তৎপরে ষাটসকটকালে ভারতকে মার্কিন গম সরবরাহ করে। সেই
সহযোগিতা আজও অব্যাহত। দীর্ঘকাল পরিকল্পনার মাধ্যমে দুই
দেশের মৈত্রীবন্ধন বৃদ্ধি হয়েছে। গড়ে উঠেছে ভারতের অর্থনৈতিক
বনিয়াদ। বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূলে মার্কিন
অর্থবান উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে বলতে গেলে ভারতের পরিকল্পনার
এমন কোন শাখা নেই যা মার্কিন সাহায্যপুষ্ট নয়। আলোচ্য বইটিতে
বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে মার্কিন সাহায্য
দেওয়া হচ্ছে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিকা ও অপরদিকে
নির্ভরমান ভারতের রপ্তানুপকরণে পরিণত। সাধারণ লোকের
কাছেও বইটি সমাদর লাভ কববে। বিভিন্ন তথ্যসম্বলিত চিত্রাবলী
পুস্তকটির মূল্যমান বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। তথ্যসম্বলিত কালে
পুস্তকটি অপরিহার্য। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। প্রচ্ছদটি মনোরম।

জীবন-জ্যোতিঃ—চন্দ্রকুমার। প্রকাশক : শ্রীঅনিল-
কুমার বোষ। ভাগীরথী প্রকাশনী। কালনা (বর্ধমান)।
মূল্য : ১৫০ পঃ।

পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের
জীবনালেখ্য অবলম্বন করে জীবন-জ্যোতিঃ নাটকটি রচিত। নাটকটি
সুসংগঠিত। অপেশাদার নাট্যসংস্থার পক্ষেও এ নাটক অভিনয় করতে

তেমন কোন অসুবিধা হবে না। প্রতিটি চরিত্র চিত্রিত যথাযথভাবে
হয়েছে। সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।
নাটকটিতে কয়েকটি গান আছে। নাটকের গতিপথে এই সুরচিত
গানগুলির অবদান কম নয়। নাটকের প্রস্তাবনা অংশটি সুন্দর।
তবে মনে হয়, এ অংশটি যদি বাংলায় রচিত হত—তাহলে সাধারণ
দর্শকের সুবিধা হত। বিশেষতঃ গ্রাম-বাংলার মানুষের রসগ্রহণে
বাধা ঘটতো না। আশা করছি নাটকটি নাট্যমোদী সমাজে
আদরপ্রিয় হবে।

ইতি তোমারই—লেখক : মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশক : শ্রীবেণীমাধব শীল। অক্ষয় লাইব্রেরী, ৪০
গরাগহাট স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য : দুই টাকা।

বাংলা সাহিত্যের বাজারে এ শ্রেণীর উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্ত
কম নয়। বিজ্ঞান, উর্পা ও দুর্গেশ হালদারের মত চরিত্র সাহিত্য-
পাঠকের অপরিচিত নয়। 'ইতি তোমারই' গ্রন্থটির কাহিনী কোন
কোন ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের বিরাজ বো-এব কাহিনীর কথা স্মরণ করায়।
বিরাজ-এর মতই উর্পা তার স্বামীকে ভালবাসত। স্বামী অভুত
থাকবে—এ কথা চিন্তা করেই উর্পা রাত দশটার গিয়েছিল চাল
সংগ্রহ করতে। যখন ফিরে এল, স্বামী তখন তার প্রতি সম্বন্ধ—
তার চরিত্রে কলক আরোপ করে তাড়িয়ে দিল তাকে ঘর হতে।
গ্রন্থের শেষদিকে দেখতে পাই নোনাঘরের মত বিজ্ঞানও অমৃতপু—
তার ভুল ভেঙেছে—উর্পার পাত্তিত্ব সে উপলব্ধি করেছে। উপন্যাসটি
বিরোপাস্তক। উর্পা ও বিজ্ঞানের মিলন ঘটেনি। একথা সত্যি,
উপন্যাসটির কাহিনীর মধ্যে নতুন কিছু নেই; কিন্তু রচনার বুনানী,
সহস্রতর বলার, ভঙ্গীটিতে বচসিতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। চরিত্রগুলি
হৃদয়ঙ্গম ও সম্পূর্ণ। ভাষা সাবলীল ও স্বচ্ছ। গ্রন্থটির নামকরণ
করেছেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীলক্ষ্মী গম্ভূরদাস

তার মিত্রের

স্মারক

তিল তৈল



বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাযতীয় শিরধারণ উপযুক্ত

অন্য সকলের জন্মের উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন প্রণীত
গীতামাধুরী—১২-০০
(শ্রীমদ্ভাগবতের মত ও পথ
অনুসরণে সর্বপ্রথম গীতার
অনুবাদ ব্যাখ্যা)
জগদ্বৈরাগীর সঙ্কলনে—৩
প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে
প্রাপ্য।

এস. চন্দ্র এণ্ড কোং
সর্বরকম সঙ্গীতপুস্তক ও যাবতীয়
বাস্তবজ্ঞানের পাইকারী ও খুচরা
বিক্রেতা।

৪, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলি-১৩

সাময়িক

শ্রীশ্রীসঙ্ঘজননীর আবির্ভাবোৎসব :

চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘে গত ৬ই আষাঢ় নিবিড় নিষ্ঠা ও নিরাক্ষর সঙ্ঘের অধ্যাক্ষজননী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীর ৭৫তম আবির্ভাবোৎসব অন্তরঙ্গভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আশেরদিন সন্ধ্যার সম্মুখস্থির সমবেত উপাসনা, মাতৃসঙ্গীত ও মাতৃপ্রদর্শন করেন সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ সভ্য-সম্ভার। ৬ই আষাঢ় প্রাতঃকালে সমবেত প্রাতঃরূপাসনান্তে যথারীতি মাহুপূজা, ভোগ ও মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ করেন সঙ্ঘের সমস্ত ও শুভমণ্ডলী। এইদিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট সমারসেবিকা ও সাহিত্যিক শ্রীমতী পাকল ভট্টাচার্যের সভানেত্রীত্ব মাতৃসঙ্গ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন মাতৃসঙ্গীত করেন শ্রীমতী বিমলা রায়। কুমারী অলকা, মনিকা, আশ্রনা, সুরভী ও মমতা মায়ের বিভিন্ন বিক বোথাইয়া রচনা পাঠ করেন। সভানেত্রী শ্রীমতী ভট্টাচার্য গৌরাণিক যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতনারীর এক বৃহত্তম পটভূমিতে সঙ্ঘজননীর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে যে চিত্তাগর্ভ ভাষণ দেন তাহা এমন স্বচ্ছ, সুন্দর, সাবলীল, মনোজ্ঞ ও রূপরিবেশিত ছিল যে, উপস্থিত সকলেরই বিস্ময়-বিমুগ্ধ অন্তর স্পর্শ করে। সঙ্ঘ সহ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত উল্লেখিত অন্তরাবেগের সঙ্গে বক্তব্য প্রদান করেন।

শ্রীমাদ্রসাদের মৃত্যুবার্ষিকী :

গত ২৩শে জুন ভারতীয় জনসঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে ডঃ শ্রীমাদ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একাদশতম মৃত্যুবার্ষিকী দিবস উপলক্ষে এক সভার আয়োজন হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'অসীম সাহস ও দুর্জয় শক্তি লইয়া শ্রীমাদ্রসাদ ছিলেন একজন পুরুষসিংহ। ছেলেবেলা হইতে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মাধ্যমে দেখিয়াছি সাধারণ মানুষের ক্ষত্র তঁাহার হৃদয়ে অসীম দয়দ, কর্তব্যজ্ঞান

ও মেহ চিরকাল সঞ্চারিত ছিল।' তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, শ্রীমাদ্রসাদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক চিঠিপত্র ও অন্যান্য দলিল অবিলম্বে সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। কেননা, ইহা জাতীয় জীবনের দলিলস্বরূপ। বাঙালীর এদিকে উদ্ভোগী হওয়া বাহনীয়। এই সভার সভাপতিত্ব করেন শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

শিক্ষাবিদ আদিত্যকুমার মৈত্র :

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী নীরব কর্মী, আদিত্যকুমার মৈত্র পরিণত ৮০ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল কলিকাতার গোপালগঞ্জের বেথুড়ী গ্রামে। বেশবিভাগের পরে তিনি কলিকাতায় গাইকপাড়া আসিয়া নিজ বাড়িতে বসবাস করিতে থাকেন। সারা জীবন সনিষ্ঠায় তিনি স্বগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া পল্লীসেবার আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। দে যুগে বেথুড়ী গ্রামের উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়টি তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের অধি তিনি দেবত্র সম্পত্তি হিসাবে দান করেন। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন বোর্ড, ষালবিল সংস্কার, জী-শিক্ষা প্রভৃতি জনহিতকর কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া আদিত্যকুমার পল্লী-উন্নয়নের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সে কালের মানুষ হইবাও যুগ-প্রগতির সঙ্গে চলিয়াছেন। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনেও শ্রীমৈত্র যোগ দিয়াছিলেন। আজীবন শিক্ষাবিদ আদিত্যকুমার শিক্ষাবিত্তারের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বহু দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের তিনি স্ব-বাটীতে রাখিয়া পড়াশুনার সুযোগ দিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর তৃতীয়া কন্যা কবি ও সাহিত্যিক শ্রীমতী সুধমা মৈত্র বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে হলেখিকা বলিয়া পরিচিত। প্রবর্তক পত্রিকাও শুভাকাঙ্ক্ষী লেখিকা। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার সঙ্গতি কামনা করি।

বিদেশে ভারতীয় মহিলার সম্বন্ধনা :

সম্প্রতি ফরাসী ভাষায় শ্রীমতী উবা চ্যাটার্জির একখানি পুস্তক প্যারিসের 'দ' নামক বিখ্যাত প্রকাশনা ভবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকটির নাম 'দ্য ল্যাংগুয়াজ অফ দ্য ভারতীয় নারী' (ভারতীয় নারী) গ্রন্থটি শ্রীমতী চ্যাটার্জির ফরাসী ভাষায় লেখা চতুর্থ পুস্তক। পুস্তকটি প্রকাশিত

উৎসব অনুষ্ঠানে -
ইন্দ্র'র সন্দেশ
অপরিহার্য!

৮৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট কলি: ২
ফোন-৩৫-১৩৮৩

৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২
ফোন-৩৪-২৫৩৩

হইবার পর ফরাসী নিয়ম অনুযায়ী একটি সাক্ষাৎস্থানে নিমন্ত্রিত সাহিত্যিক, সমালোচক ও পাঠকদের সম্মেলন রচয়িত্রী প্রস্তুত থাকার দান করেন। এই উপলক্ষ্যে বহু প্রতিশ্রুতি ফরাসী সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটে।

তৎপরে পর ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী উষা চ্যাটার্জি ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া বশবিনী হইয়াছেন। শ্রীমতী চ্যাটার্জির পূর্বপ্রকাশিত তিনটি পুস্তকের নাম—‘লা দাস এঁহ’ (ভারতীয় নৃত্য) ‘কমপ্রন্দর লা এর’ লিভ্রিও এঁহ (হিন্দু ধর্ম বুঝতে হলে) ওমেতব এঁদিশিপল (স্ত্রী-শিক্ষা)। এতিমি গ্রন্থই সমালোচক কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। আমরা লেখিকাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার :

গত ২২শে ও ২৩শে মার্চ দুইদিনব্যাপী হুগলী জিলায় গরলগাছা সাধারণ পাঠাগারের যুগ্ম-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় বিজ্ঞানচর্চা জাতীয় অধ্যাপক শ্রীমতেশ্বনাথ বসু পতাকা উত্তোলন, Text Book Library ও উৎসব মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীবসু বলেন, “হুগী প্রতিমাকে আমরা যে নির্ভর ও ভক্তিসহকারে সজ্জিয়ে পূজা করি সেইরূপ দেশমাতৃকাকেও উপযুক্তভাবে সজ্জিত করে তুলতে সাংস্কৃতিক প্রাণকেস্বরূপে পাঠাগারকে গড়িয়া তোলার চেষ্টা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। উৎসব মণ্ডপে একটি আকর্ষণীয় পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। যুগ্মজয়ন্তী উৎসবের এই দিনের বিতীয় অধিবেশন বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীকেশবচন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করেন এবং অধ্যক্ষ, শ্রীমোহননাথ শাস্ত্রী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বিশিষ্ট গুণীজ্ঞানী উপস্থিত হয় এবং অংশ গ্রহণ করেন। বিতীয় দিবসে স্থানীয় ‘মৌসুমী’ নাট্যসংস্থা কর্তৃক একটি নাটক অভিনীত হয়।

নজরুল জন্ম-জয়ন্তী :

সুসাহিত্যিক শ্রীপত্র প্রমোদাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গত ২৪শে জুন নজরুল জন্ম-জয়ন্তী কমিটি আয়োজিত দুইদিনব্যাপী জন্ম-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় কবি নজরুল সম্বন্ধে হৃদয় একটি মন্তব্য করেন : নজরুল এতিমি

দীর্ঘদিন ধরিয় একটি চিরগোষ্ঠীতে লুকায়িত আছে। তাই মানুষের আশা পূর্ণ হয় নাই। প্রত্যাশিত বিকাশ একটি অত্যন্ত বেনারস মতো ধাঁড়িয়া আছে।’ অত্রান্ত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমুদ্রাকর আহমেদ, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র।

ও. আর. সি. এল. লিঃ

বাংলা দেশের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সাধারণ ক্ষেত্রে শালিকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এন্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ অত্যন্ত সমৃদ্ধিত প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানীর ‘কুমারেশ’ ঔষধের আরও ‘কুমারেশ হাউস’ও সর্বজনবিদিত। গত ১৭ই মে কুমারেশ হাউসে প্রতি বৎসরের মত এবারও এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উদ্ভিটার বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীরাধানাথ রথ মহাশয় এই অনুষ্ঠানে সভাপতির ও ডাঃ স্বধীরচন্দ্র বসু প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ আরও আপ্যায়নের মধ্যে অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সকলেরই উপভোগ্য হয়। পরিচালক সমিতির পক্ষে শ্রীরাধারমণ মিত্র সবাইকে সাদর আহ্বান জানান।

ভিটামিন-বাতিক :

আজকের দিনের বিষয়াদি পরিবেশ মানুষকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। এত প্রাচুর্যের মধ্যে বাঁচিয়া থাকার এমন সমস্ত আর কোনও কালে দেখা যায় না। অর্থোপার্জনের নতুন নতুন কন্ডী ও ব্যাপক বিজ্ঞাপন মানুষকে বিশেষহার করিয়াছে। এই সবের মধ্যে বিচিত্র ভিটামিন বাতিক অত্যন্তম। সম্ভ্রান্তি ভিটামিনের কুফল ও ইহার বিষক্রিয়া সম্পর্কে পাক্ষাত্য পণ্যবণায়ত করেকজন বিজ্ঞানীরা একটি বিবৃতি দিয়াছেন। প্রকাশ, একজন তরুণ যুগের ত্রণ সারািবহার জন্ম প্রচুর ভিটামিন ‘এ’ ব্যবহার করে। তরুণটির মাথাবাধা হ্রাস করে ও চুল উঠিতে আরম্ভ করে। তার মাথায় টিউমার হইয়াছে অনুমান করিয়া চিকিৎসকেরা চিকিৎসা স্থগিত করেন। ভিটামিন ব্যবহার বন্ধ করায় তাব উপসর্গ কমিয়া যায়। কিন্তু দেখা যায় ভিটামিন ‘এ’ ব্যবহার পুনরায় হ্রাস করিলে রোগের পুনরাবির্ভাব হইতে থাকে। চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, ভিটামিন-এরই ইহা কুফল। সহজপ্রাপ্য বিশিষ্ট ভিটামিন যথেষ্ট ব্যবহার করা সম্বন্ধে সাবধান হওয়া কর্তব্য।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল, আলোয়ান ও হোসিয়ানী পোষাক বিক্রেতা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা ফোন : ৩০-২৩০৩

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্ম

রামকানাই মেডিক্যাল স্টো

১২৮/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রকর্তক প্রিন্টিং এন্ড হার্ডস্টোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণবাবু বাব কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

প্রবন্ধ

শ্রাবণ, ১৩৭১

জীবনের আলো

যে ধর্ম ব্যর্থ হয় না, সেই ধর্মই গ্রহণীয়। কেহ কি বলিতে পার—শাক্যসিংহ ব্যর্থ হইয়াছিলেন, আচার্য্য শঙ্কর ব্যর্থতার কাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন, খ্রীষ্টচৈতন্যের মর্মবাণী মিথ্যা, দক্ষিণেশ্বর একটা মিথ্যার অভিনয় ? বলিতে পার না। কেননা ধর্মই মনুষ্যজাতির একমাত্র আশ্রয়; নিরাপদ ভিত্তি। চিরযুগ একদল মানুষ আছে, যারা ধর্মকে অস্বীকার করে; কিন্তু দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমাদি গুণ যদি ধর্মের অঙ্গ হয়—এই গুণাদিবর্জিত মানুষের কোন মূল্য থাকে কি ? মূল্যতঃ ধর্মামুরাগী প্রতি মানুষ তর্কতঃ ভাষা নিয়ে যে সংগ্রাম, তাহা বিচার, যুক্তি-বিতণ্ডার কোলাহল। সত্যই নিখিল মানবজাতি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তবে দেশ, কাল এবং পাত্রামুযায়ী ধর্মচার ভঙ্গী ভেদে বিচিত্র—স্বরূপতঃ এক। এমন একদিন ছিল—এক ধর্মের আচারেই জাতি বিশেষের সৃষ্টি হইয়াছিল। সে আচারের অধিকারী বলিয়া সকলকে গণ্য করা হইত না। সে আচার পালন বরাও বিশেষ শিক্ষা ও দীর্ঘদিনের অভ্যাস ব্যতীত সিদ্ধ করা সম্ভবপর হইত না। ভারতে এমন আচার, এমন বিজ্ঞান আবিস্কৃত হইয়াছিল বলিয়াই তাহাকে আশ্রয় করিয়া ধর্মামৃত লাভ হয়। কিন্তু কিসের অভাবে, কোন ক্রটিতে আমরা আত্ম এই ধর্মামৃতের আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হইতেছি—আজ তাহার অন্বেষণের প্রয়োজন হইয়াছে। আমার মনে হয়, মানুষ অমিশ্র ভোগ অথবা অমিশ্র ত্যাগ এই দুই বস্তুর একটিও গ্রহণ করে নাই। সে চাষ সামন্ত, বিদ্যামৃতের মিশ্রণ। অসমর্থ সে এইখানে। অব্যভিচারী নিষ্ঠা ব্যাপ্তিচরিত্রেই দেখা যায়—একটা সমষ্টি চৈতন্যে কোন যুগে তা বিধৃত হয় নাই। এমনকি কুরুক্ষেত্রের যুগে বলভদ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মতানৈক্য ছিল। হস্তভদ্রা হরণ লইয়া ভাতৃ-বিরোধ, স্তম্ভক মণি লইয়া সে বিরোধের মাত্রা বাড়ে। কুরুক্ষেত্রে ভাতৃ-বিরোধ—সে কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। চৈতন্যযুগেও আমরা নিত্যানন্দকে মূল ধর্মপ্রবাহে শেষ দিন পর্যন্ত অবহিত থাকিতে দেখি না। ব্যাপ্তিই উন্মাদ হইয়াছে ধর্মামৃতে—সমষ্টি প্রাণ অতীতে কোথাও উদ্ভূত হয় নাই। এই যে অনৈক্য, এই যে অপ্রেম—ইহার মূল কারণ কামনা ও অহঙ্কার। কামনা ও অহঙ্কারের পুঁটুলী এক অঞ্চল জাতি চেতনায় উৎসর্গ করিয়া যদি সর্বস্ব পণ করিয়া বাংলার তরুণদল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, তবেই ভারত আবার ধর্মামৃতের আশ্রয়ে নবজীবন লাভে সমর্থ হইবে। ইহাই অব্যর্থ বেদ বাণী। অন্তথা হইবার নহে।

সত্যেন্দ্র শ্রীমতিলাল
(১৯৩৫-এর দিনলিপি হইতে)

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । সপ্তত্রিংশৎ স্তবঃ ।) একাদশী ঋক্

(সম্বৎসর শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

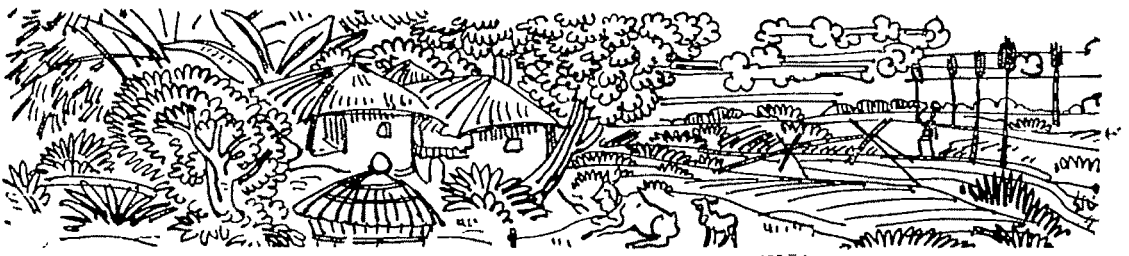
ত্যাং চিদ্ ঘা দীর্ঘং পৃথুং মিহো নপাতমমৃধং ।

প্রচ্যাবয়ন্তি যামভিঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—“ত্যাং চিৎঘ” (প্রসিদ্ধ যে মেঘ, সেই মেঘকে) “আ” (সর্বতোভাবে) “যামভিঃ” (স্বকীয় গমনের দ্বারা) “প্র-চ্যাবয়ন্তি” (প্রকৃষ্টরূপে গমন করাইয়া থাকেন) [সে গমন কেমন? কীদৃশং গমনং?] “দীর্ঘং” (বিস্তৃতিসম্পন্ন) “পৃথুং” (তির্য্যকভাবে বিস্তৃত) “মিহ নপাতং” (সেচনীয় জলের অববর্ষণকারী) “অমৃধং” (কাহারও হিংসনীয় নহে) ॥ ১১ ॥

সরলার্থ—প্রসিদ্ধ যে মেঘ, সেই মেঘকে মরুদেবগণ স্বকীয় গমনের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে গমন করাইয়া থাকেন। মেঘ কি প্রকার? দীর্ঘ অর্থাৎ বিস্তৃতিসম্পন্ন; পৃথু—তির্য্যকভাবে বিস্তৃত। সেচনীয় জলের অববর্ষণকারী এবং অহিংস ॥ ১১ ॥

বিশদার্থ—পূর্বে ঋকে ঋষি “বাপ্রা” শব্দে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন—এই ঋকে তাহাই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন। আকাশে বা অন্তরীক্ষ লোকে দীপ্তিশীল জসরেণুসমূহ নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে। এই গতিশীল দীপ্তিময় জসরেণুসমূহের মধ্যে বাহারা আকাশের শব্দগুণকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে স্থিতিশীল জসরেণুর সহিত সহসা মিলিত হয় তাহারাই বজ্র ও বিদ্যুৎ নামে অভিহিত হয়—এ কথা পূর্বে ঋকে বলা হইয়াছে। এই ঋকে তাহারই অল্পবৃদ্ধি করিয়া ঋষি বলিতেছেন—এই বজ্র ও বিদ্যুৎ কিন্তু বর্ষণকারী নহে, ইহাদের রূপের ঝলক আছে বটে, তবে তাহাতে কাহারও ক্ষতি হয় না—“মিহো নপাতমমৃধং”। তবে ইহাদের দ্বারা কি হয়? ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াই বলি—“ত্যাং চিদ্ ঘা”—এই অহিংস ও দ্ব্যতিমান বজ্র ও বিদ্যুতের সংমিশ্রণে যে অমুরাশির উৎপত্তি—তাহাই “আ যামভিঃ” সর্বতোভাবে স্বকীয় গমনের দ্বারা অন্তরীক্ষলোকে বিস্তৃত হইয়া এক বিরাট “বিশ্বমেঘের” সৃষ্টি করে। আচার্য্য সায়ন এইজন্তই এক কথায় “ত্যাং চিদ্ ঘা” শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“প্রসিদ্ধয়ো মেঘস্তদপি মেঘ”। আচার্য্যদেবের অর্থ যথার্থই হইয়াছে—কেননা, আপোময় স্থল জগৎ গড়িয়া তোলার স্থল উপাদান কারণ ঐ “বাপ্রা” শব্দযুক্ত কিরণসমূহ অর্থাৎ বজ্র ও বিদ্যুৎ। যে বজ্র ও বিদ্যুৎ “দীর্ঘং” বিস্তৃতিসম্পন্ন আবার “পৃথুং”—বিস্তৃত বটে তবে ঋজুভাবে বিস্তৃত নয় তির্য্যকভাবে বিস্তৃত। ইহা এত বিস্তৃত হয় যে সমস্ত অন্তরীক্ষলোকেই আবৃত করিয়া ফেলে—এইজন্তই ইহাকে “বিশ্বমেঘ” বলা হইয়াছে। এই “বিশ্বমেঘ”—ই কালে প্রাকৃতিক নিয়মামুযায়ী যখন অত্যধিক ঘন হইয়া উঠে, তখনই প্রবল বর্ষণে এই আপোময় স্থল জগৎ গড়িয়া তোলে।



বেদোক্ত গৌতম-অহল্যা ও ইন্দ্র

আচার্য শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী

ইন্দ্র ও অহল্যা বিষয়ে পৌরাণিক অপরাধমূলক ও দেবত্বের হানিসূচক কথার অবতারণা দ্বারা শরীরধারী ইন্দ্র বৃত্রাসুর যুদ্ধের একটি আখ্যায়িকায়ুক্ত দৃষ্টমত প্রচারিত আছে যে, দেববান্ধ ইন্দ্র গৌতম ঋষির স্ত্রী অহল্যার সহিত জারকর্মে (ব্যভিচারে) প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদা গৌতম স্বচক্ষে তাহাদের ব্যভিচার দেখিয়া ক্রোধবশতঃ ইন্দ্রকে সহস্র ভগযুক্ত শরীর এবং অহল্যাকে পাষাণী হইয়া থাক—এই কথা বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন ইত্যাদি। বেদে এ বিষয়ে রূপকালঙ্কার-যুক্ত যে বর্ণনা আছে, তাহারই বিকৃতার্থরূপে ঐ অপরাধ-মূলক দৃষ্টমত প্রচারিত হইয়াছে। বেদোক্ত ইন্দ্র, গৌতম ও অহল্যা সম্বন্ধে রূপকালঙ্কারযুক্ত অর্থ এই যে—

এষ এবলো য এষ তপতি (শতঃ ১।৬।৩।১৮)।

“ইন্দ্রঃ সূর্যো য এষ তপতি ভূমিস্থানপদার্থাংস্ প্রকাশয়তি তন্ত্রেজ্জ্যোতি নাম পরমৈশ্বর্য প্রাপ্তোহেতুত্বাৎ” অর্থাৎ সূর্য পরমৈশ্বর্য প্রাপ্তির হেতু এবং সমুদায়ের প্রকাশক; এ জন্ত ‘ইন্দ্র’ শব্দে সূর্য বুঝায়। এইরূপ দিনের লয় হয় বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা ও অত্যন্ত বেগশালী হেতু চন্দ্র গৌতম সদৃশ হইয়া থাকে। এস্থানে রূপকালঙ্কার মতে রাত্রিকে চন্দ্রের স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

র্যেতঃ সোমঃ—(শতঃ ৩।৩।৫।১)।

“স চন্দ্রমা সর্বাণি ভূতানি প্রমোদয়ন্তি স্বস্তিযাহল্যয়া সুখয়তি” অর্থাৎ চন্দ্র আপনাদের স্ত্রীর সহিত রাত্রিকালে সকল প্রাণীর আনন্দদায়ক হইয়া থাকে।

রাত্রিরাদিত্যোদয়েহস্তধীমতে (নিরুক্ত ১২।১১)।

জার আভাগঃ জারইব ভগমাদিত্যোহত্রজার

উচ্যতে রাত্রৈর্জরয়িতা—(নিঃ, ৩য় খণ্ড)।*

এই রাত্রিকালের জার—আদিত্য অর্থাৎ সূর্য হইয়া থাকে। কারণ সূর্যের উদয় হইলেই রাত্রির অস্তর্ধান হইয়া যায়, অর্থাৎ চন্দ্রকে ছাড়িয়া দেয়; বিশেষতঃ সূর্যকে রাত্রির জার এজন্ত বলা যায় যে, সূর্যের আগমনেই চন্দ্রের সহিত রাত্রির শৃঙ্গার ভঙ্গ বা নষ্ট করাইয়া দেয়; এজন্ত

রাত্রি, চন্দ্র ও সূর্য ইহারা স্ত্রী পুরুষ ও জারকর্তারূপে রূপকতালঙ্কার দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপ স্ত্রীপুরুষ একত্র থাকে, তদ্রূপ রাত্রি ও চন্দ্র একত্রিত হইয়া থাকে।

সূর্যরশ্মিচন্দ্রমাগচ্ছর্ব ইত্যপি নিগমো ভবতি,

সোহপি গৌরচ্যতে—(নিরুক্ত ২।৩১)।

“গচ্ছতীতি গৌরতিশয়েন গৌরতি গৌতমচন্দ্রঃ”— অর্থাৎ চন্দ্রকে এজন্ত গৌতম বলা যায় যে, উক্ত চন্দ্র অত্যন্ত বেগশালী হইয়া থাকে। যজুর্বেদে ‘সূর্যরশ্মি’ ইত্যাদিকে ‘গৌঃ’ শব্দে আদিষ্ট হইয়াছে। রাত্রি অহল্যা কস্মাদহর্দিনং জীয়েতেহস্তাং তস্মাদ্রাত্রি অহল্যোচ্যতে” অর্থাৎ রাত্রিকে অহল্যা এই কারণে বলা যায় যে, ঐ রাত্রিতে দিবস লয় হইয়া যায়; আবার সূর্যই রাত্রির নিবৃত্তিকারী; এজন্ত সূর্যকে (ইন্দ্রকে) রাত্রির (অহল্যার) জার (শৃঙ্গারকর্তা) বলা যায়। এইরূপ রূপকালঙ্কার মতে বেদোক্ত ইন্দ্র বৃত্রাসুর যুদ্ধ প্রসঙ্গও হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে পুরাণের গল্পকথা প্রচলিত আছে।

ইন্দ্রো যোচনো দিবি দৃচানি দৃহিতানি চ

শ্বিরানি ন পরামুদে—(ঋক্, ২।১৪।২)।

ইন্দ্রো বৈ দৃষ্টা—(ঐতরেয় ব্রাঃ, ৬।১০)।

বীর্ঘং বৈ বজ্রঃ—(শতঃ, ৭।৪)।

বজ্রো বৈ দণ্ডঃ—(শতঃ, ৩।১।৫।৩২)।

বজ্রো বৈ বশট্কারঃ—(ঐতরেয় ব্রাঃ ৩।৮)।

বশট্ করোতি স বজ্রঃ—(গোপথ ব্রাঃ, উঃ ৩।৩)।

সূর্যলোক স্বীয় প্রকাশস্বরূপ রশ্মি (কিরণ) দ্বারা চন্দ্রাদি অগ্নাত্ত লোক (গ্রহ) ও পৃথিব্যাদি লোককে আকর্ষণ শক্তিবলে একরূপ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রহিয়াছে যে, তাহারা কক্ষচ্যুত হয় না। ‘ইন্দ্র’ অর্থে দৃষ্টা অর্থাৎ সূর্য এবং বৃত্র অর্থে অস্ত্রের সংস্কৃত মেঘ। “স্বকিরণ জন্ত বিহ্বাৎ প্রক্ষিগতি” অর্থাৎ সূর্য নিজ কিরণ দ্বারা বৃত্রকে (মেঘকে) হনন করিয়া থাকে; উহা বজ্র এবং বজ্রই দণ্ড। এইরূপে রূপকালঙ্কারযুক্ত কথা বিকৃত হইয়া শরীরধারী ইন্দ্র বৃত্রাসুর যুদ্ধের অবতারণা দ্বারা গল্পকথা প্রচলিত আছে।

উইলিয়াম সেকস্পীয়র

শ্রীশ্রীমাদাস দে

চারশ' বছর ধরে যে মানুষটিকে নিয়ে ইংল্যান্ডের অহঙ্কারের অস্ত্র নেই, Coleridge ঝাঁকে বলেছেন— 'myriad minded' (অসংখ্য-মনা মানব), Carlyle-এর মতে ইংরেজ জাতি ঝাঁকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চেয়েও নির্দিষ্ট বর্ণনীয়তর বৃক্কের মানিক রূপে আঁকড়ে রেখেছে, ঝাঁর সঙ্ঘর্ষে লিখে লিখে—আজও গবেষণার অবসান হয়নি, বিশ্ব-সাহিত্যের সেই প্রবর্তারকা হলেন উইলিয়াম সেকস্পীয়র।

"Of Shakespear's merits as playwright & poet it is difficult to write, for all Superlatives sum inadequate. He is, of course, immeasurably the greatest of all English writers.. Greatest of Shakespear's gifts was the faculty of drawing characters an art so perfect that his creations often seem more real than the reader's own flesh and blood acquaintances". (Editorial : Careers and Courses—May 1964)

মাত্র ৫২ বৎসরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি লিখেছেন ৩৮খানি নাটক, ২টি দীর্ঘ কবিতা আর ১৫৪টি সনেট। ১০,৬০০৭ লাইনে ৮,১৪৭৮০টি শব্দের সাহায্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন ১২৭৭টি চরিত্র। মাত্র বাহ্যিক বৎসর তিনি এই পৃথিবীর মাটিতে বিচরণ করেছেন আর হুঁচোখ ভরে' দেখেছেন শুধু সেদিনের পৃথিবীকে নয়, শুধু সেদিনের মানুষগুলিকে নয়; দেখেছেন অনন্ত ভাবীকালের অন্তহীন জনশ্রোতকে। তাইতো তাঁর সৃষ্টির মাঝে আজকের পৃথিবী অল্পপস্থিত নয়, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি আজও অবাধ সাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়ায় আমাদের মাঝে। তারা অমর। পাঠকচিস্তে তারা চির ভাস্বর।

শব্দচন্দ্রের তিরোধানে আমাদের কবি লিখেছিলেন :

দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি

দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।

সেকস্পীয়রের তিরোধানকালেও যদি সে দেশে আমাদের কবির মত কোন প্রতিভা বেঁচে থাকতেন, তিনিও লিখতেন :

বিশ্বের মাটির থেকে নিল যারে হরি

বিশ্ব হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।

বস্তুত: বিশ্ব-হৃদয় যে তাঁকে ধরে রেখেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল গত এপ্রিলে সেকস্পীয়রের বিশ্বব্যাপী চতুঃশতবার্ষিকী উৎসবে। গত ২৩শে এপ্রিল (১২৬৪) পৃথিবীর প্রায় ১২৫টি দেশের পতাকা অবনমিত হল এই মহামানবের জন্মস্থান স্ট্রাটফোর্ড-অন-এ্যাভনে। ডিউক অব এডিনবারার নেতৃত্বে সমস্ত দেশের এম্বাসাডারগণ শ্রদ্ধানত নীরব শোভাযাত্রায় এগিয়ে চলেই তাঁর হেনলী স্ট্রাটের আবাস ভবন থেকে কবর অভিযুগে। পতাকা অবনমন এবং আহুতদিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন ডিউক অব এডিনবার্গ। বিশ্ব ব্যাকের প্রাক্তন সভাপতি মিঃ ইউগিনি ব্লাক সেইদিনই নূতন সেকস্পীয়র সেন্টার ভবনের উদ্বোধন করেন। কবির জন্মস্থানের অনতিদূরেই এই বৃহৎ প্রাসাদে নাট্যকার-কবি সেকস্পীয়রের রচনাবলীর একটি পূর্ণতম সংকলন, তাঁর যাবতীয় নথিপত্র, সমস্ত 'বিশেষ্ট্রিক্যাল মেটেরিয়ালস্' ইত্যাদি সংরক্ষিত করা হল। ২৩শে এপ্রিল ব্রিটিশ ডাকবিভাগ পাঁচখানা সেকস্পীয়র স্মরণ টিকেট 'ইস্যু' করলেন। ব্রিটিশ ডাকটিকেটে এই প্রথম রাজার মুখের পাশে আর একখানা মুখ ছাপা হ'ল; সে মুখ উইলিয়াম সেকস্পীয়রের।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে, পর্দায় সেকস্পীয়রের নাটক। সমস্ত দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মুখে, লেখনীতে, রেডিও টেলিভিশনে, একমাত্র আলোচ্য বস্তু সেকস্পীয়র। সেকস্পীয়রীয় মহাপ্রাবনে বিশ্ব চরাচর যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। আবার হঠাৎ শুরু হবে নতুন করে গবেষণা, হয়তো জানা যাবে আরও কিছু এই বিচিত্র মানুষটির রহস্যবৃত্ত জীবন সঙ্ঘর্ষে।

সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই যে আশ্চর্য মানুষটি, এ'র ব্যক্তিগত জীবন-কথা আজও তমসাস্কন্ন। অনেক মাটি খোঁড়া হয়েছে, অনেক ধূলো ঝাড়া হয়েছে গত তিন তিনটে শতাব্দী ধরে, আরও নিশ্চয় হবে, কিন্তু

সেকস্পীয়রের সমগ্র জীবন হয়তো থেকে যাবে সেই তিমিরেই। কারণ তিনি ছিলেন আত্মসমাহিত সাধক। প্রচার-প্রয়াসী মন থাকলে কি একলক্ষ লাইনের মধ্যে দু'চারটে লাইনেও নিজের কথা কিছু লিখে যেতেন না। কবি সেকস্পীয়র, নাট্যকার সেকস্পীয়রই তাঁর সৃষ্টির মাঝে উজ্জ্বল। মানুষ সেকস্পীয়র তার আড়ালে আত্মগোপন করে থেকে আজও হয়তো লুকোচুরি খেলার নাটকীয় আমোদ উপভোগ করছেন। তিনি মনে প্রাণে নটশ্রেষ্ঠ বলেইতো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

মানুষ সেকস্পীয়র সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে সেইটুকুই বলব আজ। তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনাব অনধিকারী আমি, সেবশ্য অকুণ্ঠ চিন্তেই স্বীকার করছি।

২

সেকস্পীয়রের সঠিক জন্মতারিখ আজও অনিশ্চিত। বহুজনস্বীকৃত তারিখের ১৫৬৪-র ২৩শে এপ্রিল। এবং এই তারিখই আজসর্বজনগ্রাহ্য। আশ্চর্য, মৃত্যুর দিনটিও ২৩শে এপ্রিল ১৬১৬। জন্মদিনে মৃত্যু দিনে এই আলিঙ্গন, এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা।

পিতা জন সেকস্পীয়র বেশ গণ্যমান্ত ব্যক্তি ছিলেন। এক সময় তিনি স্থানীয় সহরের মেয়রও হয়েছিলেন। তাঁর পরিচয়ও বিচিত্র। কেউ বলেন তিনি ছিলেন পশুচর্য বিক্রেতা, কেউ বলেন চর্মকার। আবার খাণ্ড শস্তের ব্যবসায়ী, কাঠের গোলার মালিক ইত্যাদি পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষটি তিনি যে খুব খুশ মেজাজী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাংসারিক ব্যাপারে মোটেই হিসেবি ছিলেন না, কিন্তু মালী-মোকদ্দমায় মাথা খুলত বেশ। কোর্ট কাছারী অঞ্চলে ঘোরাকেরা করতে ভালবাসতেন, আর কেউ মামলার পরামর্শ চাইতে এলে আহ্বার নিত্রা ভুলে যেতেন। মাতা মেরী আর্ডেন ছিলেন ওয়ার উইকসায়ারের এক অভিজাত জোৎদারের মেয়ে।

সেকস্পীয়রের স্কুলের পাঠ বন্দুর হয়েছিল, তা নিয়ে নানা মূনির নানা মত। তবে বেন জনসনের সেই বিখ্যাত অভিমতটি: 'সামান্য ল্যাটিন আর কিছু গ্রীক' স্বীকার করে নিতে বাধ্য নেই। তাঁর নাটকে, কবিতায় প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাব স্পষ্ট। এটুকু নিঃসন্দেহে বলা

যায় যে, মস্ত পণ্ডিত না হলেও তিনি ল্যাটিন সাহিত্য প্রচুর পড়েছিলেন, এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যও পড়েছিলেন ল্যাটিন অনুবাদে।

উইলিয়াম-এর পাঠ্যাবস্থায়ই তাঁর পিতার পদচ্যুতি ঘটে, ফলে প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি একেবারে ধুলোয় লুটোলো, এবং তাঁকে কারারুদ্ধও হতে হল। সংসার ভেঙ্গে পড়ল আর সম্ভবতঃ সেই কারণেই বালক উইলিয়াম স্কুলের পাঠ শেষ না হতেই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হল পিতার অবস্থা বৈশিষ্ট্যে।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে মাত্র আঠার বছর বয়সে এ্যানি-হাথ্‌য়ে নামে যে কৃষককন্যাকে সেকস্পীয়র বিবাহ করেন তাঁর বয়স তখন ছাব্বিশ বছর। হাথ্‌য়েদের খামার বাড়িটা আজও মনোরম পরিবেশে সুরক্ষিত হয়ে আছে, ট্রাট্‌ফোর্ডেরই পাশের গ্রাম স্টারীতে। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই তাঁদের প্রথম কন্যা সুমানের জন্ম হয়। ১৫৮৫-তে যমজ পুত্র-কন্যা হ্যামনেট আর জুডিথ-এর জন্ম। এর পরে লওনে একাধারে নট ও নাট্যকাররূপে তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সাত বৎসর সম্বন্ধে ইতিহাস আজও গুরু। এই কাকটুকু জোড়াতালি দেবার ব্যাপারে নানা প্রবাদ প্রচলিত। কেউ বলেন, এ সময়টা কোথাও তিনি স্কুল মাষ্টার ছিলেন, কেউ বলেন চর্মকারের শিক্ষাবীশ, কেউ বলেন উকিলের মুহুরী। প্রত্যেকেই তার মতের সমর্থনে যুক্তিও দেখিয়েছেন প্রচুর। পণ্ডিত-গণের গবেষণার শেষ হয়নি আজও। তবে আইন কানূনের ব্যাপারে পিতার চেয়ে পুত্রের মাথাও কম সরেস ছিলনা তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নাটকের কোর্ট-মীন-গুলির নিখুঁত এবং দক্ষ আইনজ্ঞতাবর্ণনা থেকে। উকিলের মুহুরীগিরি না করেও জন্মগত অধিকারেই এ আইনজ্ঞতা অতবড় একটা প্রতিভার পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়।

মঞ্চের সাথে কি ভাবে তাঁর প্রথম সম্পর্ক গড়ে উঠল সে সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তা-ও জনশ্রুতি, ইতিহাস নয়। তিনি নাকি মঞ্চদ্বারে প্রেক্ষাগৃহগামীদের অশ্রবক্ষক ছিলেন। অভিনয় সেকালে একটা অভ্যুজ্জ্বল সম্ভাবনাময় নতুন ব্যবসা। তাড়ানী আর পাঁচালী স্তর অতিক্রম করে

নাট্যশিল্প অভিজাতশ্রেণীর মনোরঞ্জে এগিয়ে এসেছে। অভিনেতাদের স্থান তখন ত্রাত্যাবস্থা থেকে অনেকটা উচুতে উঠেছে। নাটক করা, নাটক লেখা তখন কাঁচা পয়সা উপার্জনের একটা পাকা সড়ক। তাই সংসারের দৈন্ত ঘুচাবার প্রেরণায়, নাকি আস্তর প্রেরণায় তিনি এই ব্যবসাতে জড়িয়ে পড়লেন, সে প্রশ্নের উত্তর আজ আর পাওয়া যাবে না।

লণ্ডনে এসে প্রথমে তিনি প্রাচীন নাটকগুলিতে নতুন পালিশ দিতে শুরু করেন। পরে এক সময় শুরু করেন নিষ্কণ্ট নাটক রচনা। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে তিনি নাট্যকার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বহুল সমালোচিত। স্বপক্ষে বিপক্ষে তখন সমালোচনার ঝড় বয়ে চলেছে, আর সেই ঝড়ের মাঝে অবিচলিত অটল সেকস্পীয়র। লিখে চলেছেন একের পর এক অবিস্মরণীয় নাটকগুলি। একদল বলেছেন শিখি-পুচ্ছ-শোভিত বায়স, অস্ত্র দল বলেছেন মার্জিতরুচি মরমী নাট্যকার। পরবর্তী দু'বছরে প্রকাশিত হল তাঁর দুটি দীর্ঘ কবিতা *Venus and Adonis* আর *Lucrece*। দুটিই উৎসর্গ করা হল আর্ল অব সাদামুটনকে। উৎসর্গ বাণীতে হুজনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের পরিচয়। অর্থাৎ চাষার ছেলে এবার জাতে উঠেছেন। লাভ করেছেন অভিজাত সমাজের প্রীতি। ১৫২৪-তে তাঁকে দেখা গেল নবগঠিত লর্ড চ্যান্সারজেন কোম্পানীর সভ্যরূপে। অর্থাৎ পুরোপুরি অভিজাত।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সেকস্পীয়রের জীবনের প্রথম পারিবারিক আঘাত এল পুত্র হামলেটের মৃত্যুতে। কিন্তু এই বছরই সামাজিক প্রতিষ্ঠার সাফল্যের নিদর্শনও পাওয়া যাচ্ছে যখন তাঁর পিতাকে সম্মানিত করা হল একটি বহুমূল্যের বর্ম উপহার দিয়ে। পিতা ফিরে পেয়েছেন জ্ঞাত সম্মান, সংসারে ফিরে এসেছে সচ্ছল্য। স্ট্রাটফোর্ড-অন-এভনে সেকস্পীয়র পরিবার এখন সম্ভ্রান্ততম সমৃদ্ধতম সুখী পরিবার। এবার ১৫২৭-এর ৪ঠা মে তিনি তাঁর স্বগ্রামের অনুন্নতম বাড়িটি 'New place' বাট পাউণ্ড মূল্যে কিনে ফেলেন। পরবর্তী বৎসরই অর্থাৎ ১৫২৮-তে তাঁকে *Palladis Tarnio* নামক সাহিত্য

পত্রিকায় Francis Meres ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে সম্মান জানানেন।

লণ্ডনের গ্লোব থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫২৯ খৃঃ, এবং সেকস্পীয়র পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম। ১৬০০ খৃঃ রাজা জেমস্ এ প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং পরিচালকগণকে রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তির সম্মান দেওয়া হয়। শুধু পঞ্জীগ্রামের সম্পত্তি বৃদ্ধি নয়, এবার লণ্ডন সহরেও কিছু সম্পত্তি করে ফেলেন সেকস্পীয়র। পরবর্তী কালের সমালোচকদের মতে সেকস্পীয়র এ সময়ে এমন রাজার হালেই থাকতেন যে, তাঁর বছরে ব্যয় হত প্রায় হাজার পাউণ্ড। সেকালের হাজার পাউণ্ড মানে যে কত বড় একখানা তালুকদারী তা কল্পনা করতে গিয়ে একালের নাট্যকাররা হয়তো হিংসায় ফেটে পড়বেন। শুনলে মনে হয় তিনি যতো না মরমী নাট্যকার ছিলেন তার চেয়ে বেশী ছিলেন বাহু নাট্য-ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীকেও তো ক্রেতার মন বুঝতে হয়, বুঝতে হয় বাজারের হাল-চাল, আর ঠিক হাওয়াটি বুঝে পাল তুলতে পারলে পাড়ি জমাতে আর ভাবনা কি। সেকস্পীয়র শুধু তাঁর কালের নয় বুঝেছিলেন সর্বকালের সকল মানুষের মন, তাই পাড়িও জমিয়ে গেছেন কালজয়ী অতুলনীয় নৈপুণ্যে।

১৬০১-এ পিতার মৃত্যু। মাতার মৃত্যু হয় ১৬০৮-এর সেপ্টেম্বরে। ১৬১১-এ লণ্ডন থেকে অবসর গ্রহণ করে ফিরে আসেন তিনি মাস্‌ভুমি স্ট্রাটফোর্ডে। ১৬১৩-এ 'অষ্টম হেনরী' অভিনয়কালে 'গ্লোব' অগ্নিদগ্ধ হয়ে ধ্বংস হয়, আর সেই অগ্নিলীলায় ধ্বংস হয়ে যায় সেকস্পীয়রের হাতে লেখা সমস্ত 'Acting copy' গুলি।

১৬১৬র মার্চে তিনি দুই কন্ঠার মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করে উইল করেন। জীবনের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দেবার দিনটি যে আসন্ন তা হয়তো তাঁর সেই মনো-দর্শন-দক্ষ চোখে ধরা পড়েছিল। তারপর আর ক'টা দিন! পরের মাসেই ২৩শে এপ্রিল তাঁর জীবনাবসান ঘটে। একটি সফল জীবনের শান্তিময় সমাপ্তি। জ্ঞী তারপরও বেঁচে ছিলেন সাত বৎসর। এবং তারও কয়েকমাস পরে তাঁর প্রথম রচনা সংকলন প্রকাশিত হয় 'ফাষ্ট ফলিও' নাম দিয়ে।



শিল্পীঘন

—শ্রী ব্রজলাল ঘোষ—

(পূর্বাত্মবৃত্তি : আষাঢ়, ১৩৭১ সংখ্যার পর)

সেদিন মধ্যরাত্রি থেকেই আকাশে ছুঁধোগ দেখা দিল। মাঘ মাসের এই সময়টা ছ'চারদিন বৃষ্টি হয়। এই বর্ষণ ফসলের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ। তবে এই সময় নতুন করে যে শীতের আমেজ দেখা দেয়, তা হয় অসহনীয়। শেষ রাতটুকু আগুন ছাড়া গৃহস্থ টিকতে পারে না। ঘরে যখন থাকা কষ্টকর বাইরে তখন তো কথাই নেই। মুক্ত নাটমণ্ডপে দেবকুমার বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলো না। ভৈরব আগে থেকেই ধূনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েকটা কাঠ-কুটো দিয়ে আগুনটাকে জোরালো করে দেবকুমার তাঁর পাশে বসলো।

ভৈরব হেসে বললেন—তুই তো পাহাড়ী দেশের মানুষ, তোরও এতো শীত ?

—আপনার শীত লাগছে না ?

—শীত গ্রীষ্ম তো মনের বিকার মাত্র।

—তবে আজ ধূনী জ্বলেছেন কেন ?

—তোর জন্তে। তখন লোক ছিল, ধূনী জ্বালবো

বলতেই কাঠ পৌঁছে দিয়ে গেল। এখন চাইলে কাউকে পেতিস্ ?

কথাটা সত্যি, শীতের হাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্ত গৃহস্থরা সকলেই দরজা জানালা বন্ধ করে নিদ্রামগ্ন। এখন ডাকাডাকি করলে সহজে কারও সাড়া মিলতো না।

অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে ছুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে দেবকুমার যতটা সম্ভব ঘুমিয়ে নিতে চাইল।

সামনেই গঙ্গা। রাত যত শেষ হয় সেই ঝিলঝিলের বৃষ্টির মধ্যে গঙ্গার হাওয়া তত তীক্ষ্ণ হয়ে গিয়ে এসে বিধতে থাকে। দেবকুমার ধূনীর আগুন জোরালো করার জন্ত আরো কিছু কাঠকুটো তাব উপর চড়িয়ে দেয়।

কোন এক সময় ভৈরব বলে উঠলেন—নদীর দিক থেকে কোন শব্দ পাচ্ছি ?

দেবকুমার কয়েক মুহূর্ত কান পেতে শুনলো, তারপর বললো—না। দম্কা বাতাসে গাছের পাতার শব্দ হচ্ছে।

—ঠিক আছে, তুই বোস, আমি নদীর দিক থেকে একবার ঘুরে আসি।

ভৈরব কোন কথার অপেক্ষা না রেখে, সেই বৃষ্টির মধ্যেই নাটমণ্ডপ থেকে নেমে গেলেন।

মন্দির পার হয়ে ছ'পা গেলেই গঙ্গা। ঘাটের পাশেই ছুটি বহু প্রাচীন বটগাছ। একটি গাছের নীচে এসে ভৈরব দাঁড়ালেন। আকাশের মেঘে একটা অতিমূহু আলোর আভাষ ছিল, সেই আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, কিনারা থেকে একটু তফাৎ দিয়ে সারি সারি নৌকা চলেছে—ছিপ নৌকা। ভৈরব ভালো করে ঠাহর করলেন। এসব গোড় রাজ্যের শতী ছিপ। বাংলার নৌ-বাহিনী এই ছিপেই যুদ্ধযাত্রা করে। এক এক ছিপে পঞ্চাশ থেকে একশো অবধি পাইক থাকে। পূর্ব থেকে ছিপগুলি চলেছে পশ্চিমে, গোড়ের নৌবাট চলেছে যুদ্ধে।

যতক্ষণ ছিপগুলি গেল, ভৈরব একভাবে দাঁড়িয়ে রইল গাছের নীচে।

ভৈরব যখন ফিরলো তখন তার সর্বাঙ্গ থেকে বৃষ্টির জল ঝরছে।

ধূনীর কাঠগুলো ঠেলে দিয়ে আগুনটা গন্থনে করে দিয়ে সে বসে পড়লো। দেবকুমার বললো—একেবারে ভিজ্জে গেছেন যে ?

—ও কিছু না, এখনি একটু তাপ পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—গা-টা মুছে নিন্।

—দরকার হবে না।

এমন তাক্ষল্যভাবে ভৈরব কথাগুলো বললেন যেন এই ভিজ়ে দেহটা তাঁর নয়, অন্য জনের।

খানিক পরেই দিনের আলো ফুটলো, কিন্তু মেঘলা দিনের সকালে পল্লীগ্রামে তেমন ভাবে জীবনের সাড়া জাগলো না। পাখীর সাড়া আগে না, পথে মানুষ দেখা যায় না। নিষ্কুম বিষন্নতায় সব ধুমধাম করে।

কোন এক সময় ভৈরব দেবকুমারকে ডেকে বললেন—
সাঁতার জানিস্ ?

—জানি।

—গঙ্গা পার হতে পারবি ?

—এই গঙ্গা সাঁত্রে ওপারে যেতে হবে ? এখন ?

—হ্যাঁ।

—পরে নৌকা করে গেলেই তো হবে।

—কখন নৌকা পাওয়া যাবে ঠিক নেই, সব নৌকো কাল যুদ্ধের রসদ নিষে চলে গেছে।

—এখানকার মানুষ কি তাহলে কেউ ওপারে যাবে না ?

সে খবর জানি না, আমাকে এখন ওপারে যেতে হবে, তুই তাহলে এপারেই থাক্, যখন নৌকা পাবি তখন যাবি।

—আপনি সাঁত্রে যাবেন ?

—হ্যাঁ। আমার কাজ আছে।

—আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে কি করে ?

—সঙ্গমের ঘাটে আমায় পাবি। আমি চললুম।

ভৈরব আর কোন কথা বলার অবকাশ না দিচ্ছে সোজা রওনা হয়ে গেল।

এমন কি প্রয়োজন হলো যে, এই প্রত্যাষে বৃষ্টির মধ্যে মানুষটি ভিজ়তে ভিজ়তে পথে নামলো, শীতের সকালে সাঁত্রে গঙ্গা পার হয়ে যাবে। দেবকুমার কিছুই বুঝতে পারলো না। মানুষটি সাধক সত্যি, কিন্তু তার মনের তল পাওয়া সহজ নয়, কার্যক্রমের ধারা বুঝতে যাওয়া আরো কঠিন। তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা সাধারণ মানুষ দেবকুমারের কর্ম নয়। তবে দেবকুমার

আবার একা হয়ে পড়লো, এই যা কথা। পথে আবার কত সঙ্গী মিলবে। আর যদি নাই মেলে, তাতেই বা কি, সঙ্গীর ভরসা করে সে তো পথে নামে নি। ভৈরবের চিন্তা ছেড়ে, ধূনির উত্তাপে আরেকটু ঘুমিয়ে নেবার উদ্ভোগে দেবকুমার আবার চোখ বুঁজলো।

আকাশ পরিষ্কার হতে লাগলো। পুরো দুটি দিন। বর্ষণ থামলো, মেঘ কাটলো, রোদ ফুটলো।

পুরোহিত বললেন—আজ একটু ঘাটের দিকে নজর রাখবেন, আজ ওপারে যাবার নৌকা পাবেন। আনাজের নৌকা যা যাবে বেলা এক প্রহরের মধ্যেই চলে যাবে।

দেবকুমার তখনই দেববিগ্রহ প্রণাম করে পথে নামলো। এই দুদিন একভাবে নাটমণ্ডপে পড়ে থেকে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল, একটা কথা বলার মানুষ অবধি দুদিন ছিল না। সকাল-সন্ধ্যা শুধু পুরুতঠাকুরের দেখা মিলেছে, তিনিও দু-এক কথায় কর্তব্য শেষ করেছেন। বাঁড়ী থেকে বেরিয়ে আজ অবধি এমন নিঃসঙ্গভাবে দেবকুমারকে কখনো পড়তে হয়নি। একা একা পথ চললেও আনন্দ আছে, কিন্তু এক জাঘগায় পড়ে থাকার মত কষ্টকর আর কিছু হয় না। পথে নেমে দেবকুমার স্বস্তি পেল।

অদৃষ্ট প্রসন্ন ছিল। ঘাটে আসতে না আসতেই একখানা নৌকা মিলে গেল। চিঁড়ের নৌকা ওপারে চলেছে। মাঝি বললো—পারে যাবে তো পয়সা দিতে হবে।

—পয়সা তো নেই।

—তবে সাঁত্রে যাও।

—শুক্রদেব সাঁত্রেই চলে গেছেন, আমার শরীরটা ভালো নেই বসে আছি।

—তুমি কি সম্যসী নাকি ?

—আমি শঙ্কর ভৈরবের চেলা।

—ভৈরব বাবা ? সঙ্গমের শ্মশানে যিনি থাকেন ?

—হঁ।

—সে কথা আগে বললেই পারতে, এসো—এসো তোমাকে আর পয়সা দিতে হবে না। ভৈরব বাবা মন্ত মানুষ।

মাঝি দেবকুমারকে নৌকায় তুলে নিল। একখানি পাটাতনের খানিকটা গামছা দিয়ে মুছে বললো—বসুন।

তারপর শুরু করলো নানা কথা। ভৈরব বাবার কত অলৌকিক কাহিনী সে শুনেছে। তিনি হাত বুলিয়ে ছরারোগ্য রোগ সারান। পক্ষাঘাতের রোগীকে তিনি সবল করে তুলেছেন। ধূনীর ছাই মাখিয়ে কুষ্ঠ সেরেছেন, পাগলের মাথায় জপ করে দিয়েছেন, উন্মাদ স্থির হয়েছে। তিনি রাজসভায় প্রবেশ করলে মহারাজ প্রভাকর বর্ধন সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

ভৈরবের এইসব পরিচয় দেবকুমারের অজানা ছিল। সে চূপ করে গোনো, শুনতে শুনতে এপারের ঘাটে এসে নৌকা লাগে।

নৌকা থেকে নেমে দেবকুমার বরাবর চললো দুর্গ-তোরণের দিকে।

সামনেই গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম, হলুদ ও নীল জল এসে মিশছে স্পষ্ট দেখা যায়। একটা সরল রেখা যেন নদীর দুটো মুখকে ভাগ করে দিতে চাইছে। তারপরেই মিশে এক হয়ে যাচ্ছে। এতবড় দুটি নদীর এমন মিলন এর আগে দেবকুমার আর দেখেনি। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

কোন এক সময় একটি লোক পাশে এসে দাঁড়ায়। ভালো করে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নেয়, তারপর বলে ওঠে—আর্য, কতদূর থেকে আসছেন?

দেবকুমার কথকের মুখের পানে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললো—খাজুরাপুরী থেকে।

প্রয়াগে স্নান ও পিতৃ-তর্পণ করতে এসেছেন বুঝি?

দেবকুমার প্রশ্ন করলো—তর্পণে কিরূপ ব্যয় হয়?

—বিশেষ কিছু খরচ নেই। সামান্য তিল, ফুল ও একখানি গামছা কিনতে হয়, তারপর পুরোহিতকে ভোজন ও দক্ষিণা দিতে হয়। অনেক সময় চুক্তি করে সওয়া পাঁচ আনাতেই সব হয়ে যায়।

দেবকুমার বললো—আমার কাছে পয়সা নেই।

—সেজ্ঞাত কী? কিছু পয়সা উপার্জন করে নিন।

—কি করে উপার্জন করবো?

—অস্ত্রবিদ্যা জানা আছে? রাজদরবারে নতুন সৈন্য নেওয়া হচ্ছে।

—অস্ত্রবিদ্যা মানে?

—অসি চালনা, তীর চালনা, বল্লম চালনা ইত্যাদি।

—না, ওসব কোন শিক্ষা আমার নেই। আমরা ভাস্কর বংশের লোক, শৈশব থেকে ছেদনী ও হাতুড়ি নিয়েই কাজ করতে শিখেছি।

—এ তো আরো ভালো কথা। সামনে শিবরাত্রি আসছে, কিছু পাথরের শিবলিঙ্গ তৈরী করে ফেলুন। সেদিন সব বিক্রী হয়ে যাবে, একটি পয়সা খরচ নেই, শুধু গায়-গতরে খাটুনী।

—এখানে পাথর পাব কোথায়?

—সে সব ব্যবস্থা আমি করে দোব। এখানে এখন আছেন কোথায়? যাত্রী নিবাসে?

—এইমাত্র ঘাটে এসে উঠেছি, এখনও কোথায়ও কিছু ঠিক করিনি।

—সে জন্তু কি, চলুন, আপনাকে আমি রাজার যাত্রী নিবাসে পৌঁছে দিয়ে আসছি। থাকা খাওয়ার কোন অহবিধা হবে না, ছপুরে এক সময় এসে আপনাকে আমি নিয়ে যাবো পাথরওয়ালার কাছে। আজ থেকেই কাজে লাগিয়ে দোব।

—কিন্তু এখানে একজননের সঙ্গে যে আমার একবার দেখা করার দরকার।

—কে? কোথায় থাকে?

—শঙ্কর ভৈরব।

—কেন? কোন পীড়া আছে নাকি?

—না, তিনি আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন।

—আগে থেকে পরিচয় আছে বুঝি?

—পথে পরিচয় হয়েছে।

মাঝুঘটি দেবকুমারের মুখের পানে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলো, তারপর বললো—ওই মাঝুঘটিকে আমরা ভয় করি। শ্মশানচারী তান্ত্রিক, ঠাঁর সঙ্গে বেশী মেলামেশা করলে আপনার ক্ষতি হবে। যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলবেন, কখন কাকে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন

বোঝা শক্ত। দু-এক কথাতেই জ্বলে ওঠেন। যাকে যা শাপ দেন, তার তা-ই হয়।

নব পরিচিত সাড়ম্বরে ভৈরবের শাপাশাপির ছু-চারিটি কাহিনী ব্যক্ত করলেন। শেষে বললেন—সাধারণ মানুষের কথা ছেড়ে দিন, মহারাজ প্রভাকর বর্ধন মালব জয় করতে বেরুছিলেন, মালবের গ্রহবর্মা ভৈববের শিষ্য, ভৈরব নিবেদন করলেন, বললেন, ‘আমি বলে দিচ্ছি, এই যুদ্ধে যাত্রা করলেই আপনার মৃত্যু ঘটবে।’ ঘটলোও তাই। সেই গ্রহবর্মাই আজ কনৌজ আক্রমণ করে রাজ-জামাতাকে নিহত করে কনৌজ দখল করে বসেছে। নতুন রাজা সেখানে সৈন্য নিয়ে গেছেন, ভৈরব আবার এখানে এসেছেন, রাজ-জামাতাকে কি বোঝাচ্ছেন কে জানে। এবার এক মহা অশান্তির স্বরূপাত হবে।

সঙ্গমের সামনে দিয়ে দুর্গ তোরণের কাছে জ্বলবে এসে পড়লো। কয়েকটি বটগাছ তারা পার হয়ে এলো, কিন্তু কোথায়ও ভৈরবকে দেখা গেল না। পাশেই অতিথিশালা, লোকটি দেবকুমারকে নিয়ে অতিথিশালায় প্রবেশ করলো।

অতিথিশালায় তখন তিল ধারণের স্থান নেই। কয়েক শত যুবক সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। মৌখারীদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে, মহারাজ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করছেন। যাদের কিছু অস্ত্রবিদ্যা জানা আছে, তারাই রাজদরবারে কাজের জন্ত এসেছে। দূরদূরান্তর থেকে তারা এসেছে। দুর্গ-সংলগ্ন এই অতিথিশালাটিই সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান, আহাৰ্যের কোন ব্যয় নেই। সকলে সেই কারণে এখানে সর্বোপায় স্থান সংগ্রহের চেষ্টা করে। বৎসরের সর্বসময়েই এই আবাস-কেন্দ্রটি পূর্ণ থাকে, বিশেষ কারণ ঘটলে তো আর কণাই নেই।

সব দেখে শুনে লোকটি বললেন—এখানে তো স্থান নেই, তার চেয়ে চলুন আমার গৃহে, কোন অসুবিধা হবে না।

তখনকার দিনে একজন হিন্দু আরেকজন হিন্দুকে স্থান দিতে ইতস্ততঃ করতো না। বাসগৃহের পরিসর ছিল যথেষ্ট, আহাৰ্যেরও কোন অপ্রতুল ছিল না, সর্বোপরি ছিল মনের উদারতা। ভারতবাসী তখনও সঙ্গীর্ণচেতা হয় নি। পরবর্তী যুগে ভারতবাসীর চিত্তে যে হীনমন্ত্রতা দেখা দেয়, তা পাঠান, মুঘল, পতুগীজ ও ইংরেজের অবিশ্বস্ততা ও অনাচারের প্রতিক্রিয়া মাত্র।

দেবকুমার বিনা বিধাঘ আনন্দের সঙ্গী হলো। এই নবলব্ধ বন্ধুটির নাম আনন্দ।

আনন্দের বাড়ীখানি ছোট, খান তিনেক ঘর। সামনে চওড়া বারান্দা। বারান্দায় একখানি মাহুর বিছিয়ে আনন্দ দেবকুমারকে বসতে দিল। জল এনে দিল হাত-মুখ ধোবার। তারপর একটি ছোট চূপড়িতে চিড়ে-ভাজা ও গুড়পাটালি এনে দিল—একটু জলযোগ করো, ইতিমধ্যে আমি আহাৰ্যের ব্যবস্থা করি। হাট থেকে দু-একটা তরি-তরকারী নিয়ে আসি। খাওয়া হলে ভিতরে গিয়ে ইন্দারা থেকে জল তুলে পান করবে। আমাদের জল অচল।

দেবকুমার প্রশ্ন করলো—তোমরা কোন্ জাতি?

—অছুং বলতে পারো।

দেবকুমার বললো—আমার মামা সঞ্চরী বিহারের অধ্যাপক। তিনি বলেন ‘মানুষ সবাই সমান; অছুং নিজেবাই সৃষ্টি করেছে’। ছেলেবেলা থেকেই আমি তাই ওসব মানি না। বানো মানতেন না, এজন্ত গোষ্ঠীপতি সমাজের মাঝে বাবাকে কত কথা বলেছেন। কিন্তু বাবার মন টলাতে পারেন নি।

আনন্দ হেসে বললো—তুমি না মানলেও, আমি মানি, আমি যা সঙ্গত বলে মনে করি না, সেটা আমি করি কেমন করে?

আনন্দ চলে গেল। দেবকুমারের যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল, দেবকুমার চিড়ার চূপড়ি নিয়ে বসলো।

সে সময়কার মানুষের দেহের শক্তি সামর্থ্যও যেমন ছিল, আহাৰ্য ও হজমশক্তিও ছিল তার সমতুল। তাছাড়া দেবকুমারের কোন স্বরা ছিল না। ধীরে ধীরে চূপড়ি শেষ করতে দেবকুমারের হৃদয় সময় লাগলো। গড়িমসি করে শেষ অবধি সে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লো। সোজা প্রাঙ্গণের শেষে ইন্দারার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। গাছ-কলে বান্ধি বাঁধা ছিল। জল তুলে পান করতে কোম কষ্ট হলো না। দাওয়ায় ফিরে আসতে আসতে দেখলো তিনখানি ঘরেরই দরজা বন্ধ। বাড়ীতে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ নেই।

সহসা খিড়কির দরজার পানে নজর পড়তেই সে চমকে উঠলো। দাঁড়িয়ে কে? বিম্বন!

(ক্রমশঃ)

আষাঢ় প্রথম দিবসে

ইন্দু গুপ্ত

পুরাতন কথা ভুলে যেতে হবে।
আষাঢ় প্রথম দিবসে,
আলোরা সব মরে এসেছে,
স্তানাটোরিয়ামের ঘণ্টা বাজছে দূরে,
আর নারকেল গাছের লম্বা ছায়ায় ছলছে
হে কালিদাস, দীর্ঘায়মান তোমার স্মৃতি।
—বালির উপর দাগ কেটে,
বিশ্বচরাচর আস্ত শিখিল হয়ে,
একদৃষ্টে চেয়ে আছে—গভীর কুয়াশা ঘেরা
অতীতের সমুদ্রে।

তুমি মেঘদূত লিখেছিলে,
লিখেছিলে মুহূর্তের জন্তে মুহূর্তের কামা।
অঙ্ককার মাঠের মধ্যে শুয়ে,
হল্লে রঙের রোদ-বিস্তৃত
বেলাভূমির উপর শুয়ে,
হয়ত বা অশুভব করেছিলে
অশুভাপের একাক একখানি নাটক।
পূর্ব মেঘ থেকে উত্তর মেঘে
তোমার অপূর্ব সে উত্তরণ
—আজ কিসের তরে জানি না থমকে দাঁড়িয়েছে,
ট্রাম লাইনের চাকার তলায়।

তোমার স্মৃতির কবর খুঁড়ে
ভাঙনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, জানি,
কিন্তু তবু তা সময়ের কাহিনী হয়েই
বিলীন হয়ে যাচ্ছে—
জীবনের সর্বশুদ্ধ বিড়ম্বনার মধ্যে।

হে কালিদাস, তোমার বিনীত রাত্রে
নিদ্রাহরণকারী মেঘদূত
এখন আর কেউ পড়বে না।
কেন না তোমার কাল এখন আর নেই,
তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ
বোধ হয় দয়া করেই বহুকাল আগে

ভুলতে অবসর দিয়েছ মর্মান্বিত আমাদের
সেই ক্ষণ-শাশ্বতীর মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য।
তান-প্রধান রীতিতে বিশ্বাসী
অবিশ্বাসীর দল হয়ত আবার লিখবে,
লিখবে তোমার আশ্চর্য বিরহের অবিশ্রান্ত কান্না,
বর্ষা হয়ত নামবে তখন
“ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে”।
বিংশ শতকের মহানগরী
ইফিয়ে উঠবে গরম আবহাওয়ায়
জীরা ক্যানের স্পীড্ বাড়িয়ে
আরামের শয্যা শয়ন করবে।
স্বামী বেচারাদের কপাল পুড়বে, দেহও পুড়বে।
(অবশ্য কারো অভিলাষে নয়,
নিজেদেরই জঠরের জ্বালায়)
তখন হয়ত বর্ষা নামবে।
জনপদ বধুর জনারণ্যে তখন হয়ত
লিখবে কেউ নূতন মেঘদূত।
বার্তাটুকু খামে এঁটে ভাসিয়ে দেবে গঙ্গার জলে
এই সংসারের অন্তরালে।
আকাশ কালো হয়ে উঠবে,
ইম্পাতের মজবুত লাইনে
ভারী ইঞ্জিনের মেঘমল্লার স্তনে
যক্ষ ভাববে নূতন যক্ষ হয়ে
তার যক্ষ-প্রিয়ার কথা।
মৃত্যুকে অহসরণ করে হাঁটবে সে,
স্তোত্র রচনা করবে সে, প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করবে
মৃত্যুরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

আষাঢ় প্রথম দিবসে
সেদিনের সেই কালিদাসকে
আজ আমি আভূমি প্রণত হয়ে
আত্মান জানাই
ডাক দিয়ে বলি জু-স্বাগতম্।

কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

বুটিশিংহ তার প্রতাপ ও প্রভাব ধীরে ধীরে হারাচ্ছে—সাম্রাজ্যবাদের জরাজীর্ণ খোলসটা তার দেহ থেকে একটু একটু করে খসে পড়ছে। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা কুৎসিৎ সিংহের কঙ্কাল। কিন্তু তবু ইংলণ্ডের রাষ্ট্রধুরন্ধররা এই সিংহের প্রতিকৃতিকে সামনে রেখে শোষণের বেড়াঙ্কালখানা আবার বিছাবার চেষ্টা করছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, বুটিশ গায়ানা, দক্ষিণ রোডেশিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে তারই নগ্ন-রূপ দেখা যাচ্ছে। একদিকে—আফ্রো-এশিয়ার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর প্রধান মন্ত্রীদের কর্তে উপনিবেশবাদের সমাপ্তি ঘোষণার এবং অগ্রদিকে বুটিশ-রক্ষণশীলদের এই জ্ঞাত জনমতকে ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা—এই হচ্ছে এবারকার কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের বিশেষত্ব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এশিয়া-আফ্রিকার উপনিবেশিক জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং যে আন্দোলনের রেশ আজও রয়েছে তারই ফলে ইংরাজ-সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে একে একে পরাধীন রাষ্ট্রগুলোর কর্তৃত্ব দেশের জনসাধারণ ছিনিয়ে নিচ্ছে। এতদিন ধরে বুটিশ-সরকার উপনিবেশগুলোর সম্পদ শোষণ করেছে, তার বৈষয়িক ও আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করেনি। ফলে দেশগুলো অল্পমত থেকে গেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এমন অবস্থায় সামগ্রিক উন্নয়নের জন্ম প্রয়োজন আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য। প্রয়োজন অল্পমত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন গড়ে তোলা। এই যে গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল এশিয়া-আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর মধ্যে তারই ফলে জন্ম নিয়েছিল কমনওয়েলথ রাজ্য সম্মেলন। বুটিশ কমনওয়েলথভুক্ত রাজ্যগুলোর মধ্যে এই যে ঐক্য-প্রচেষ্টা তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কেননা, এককভাবে কোন রাজ্যের পক্ষে আজ আর অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়।

কমনওয়েলথভুক্ত স্বাধীন রাজ্যগুলো এই সংগঠনের

মাধ্যমে ইংলণ্ডের সঙ্গে ঝাঁটছড়া বাঁধলেও তাতে তাদের স্বাধীনতার অধিকার সঙ্কুচিত হয় নি। দেশীয় শাসন ব্যাপারে এবং বৈদেশিক ব্যাপারে এই রাজ্যগুলো শর্তহীন স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে সনদ অমুযায়ী এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো পরস্পরকে আক্রমণ করতে পারে না। অপর কোন দেশ কমনওয়েলথভুক্ত কোন দেশকে আক্রমণ করলে প্রতিরক্ষার জন্ত সেই দেশকে সর্বরক্ষম সাহায্য করতে কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশ প্রতিশ্রুত। এ ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য-ব্যাপারে এই দেশগুলো পরস্পর সহযোগী।

পাঁচটি মহাদেশের এগারটি দেশ নিয়ে কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছিল—বুটেন, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, সিংহল, মালয়, সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জ্যামাইকা। বুটেনের রাণী কমনওয়েলথের সর্বসর্বা; কিন্তু ১৯৬০ সালের কমনওয়েলথভুক্ত এই এগারটি দেশের প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলনে অনেকগুলো গুরুতর বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল—তার মধ্যে প্রধান ছিল কাশ্মীর, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য-নীতির প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও বিভিন্ন আফ্রিকান দেশগুলোর স্বাধীনতা। পরের বছর ১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কমনওয়েলথ রাষ্ট্রজোট ছাড়ল। শেতাঙ্গ নীল রক্তের আভিজাত্যের স্পর্ধায় স্পর্ধিত দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার বর্ণবৈষম্য-নীতি প্রত্যাহার করল না—তাই ছাড়তে হল কমনওয়েলথ। ১৯৬২ সাল ছিল বুটেনের পক্ষে অগ্নিপরীক্ষার কাল। ইউরোপের সাম্যবাদ-বিরোধী রাষ্ট্রগুলোকে একজোট করে জ্ঞাপন তৈরী করল এক খোলা বাজার। খোলা বাজারের সভ্য রাষ্ট্রগুলোর সেই বাজারে অবাধ অধিকার, সমান স্বার্থ। সে বাজারে ইংলণ্ডের ঢোকবার অধিকার নেই। তার অর্থ সারা ইউরোপের বাজারে ইংলণ্ডের পণ্য অপাংক্তেয়। রাশিয়া ও তার অমুরাগী পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে ইংলণ্ড আগেই প্রবেশাধিকার হারিয়েছিল। এবার ফ্রান্সের দ্য-গলের চক্রান্তে ইংলণ্ড

কোণঠাসা হয়ে পড়ল। এর প্রভাব কমনওয়েলথ রাষ্ট্র-
গুলোর উপর পড়লো। কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর
পণ্যও ইউরোপের ষোলা বাজারে বিক্রীত হওয়ার
অধিকার হারাল। নূতন এক বৈষয়িক ও আর্থিক
বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল গ্রেটব্রিটেন ও কমনওয়েলথভুক্ত
রাষ্ট্রগুলো।

প্রথম সম্মেলনে গৃহীত সনদে স্থির ছিল যে, বছর
দেড়েক অন্তর-অন্তর কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর
প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন ডাকা হবে। প্রত্যেকটি দেশ
নিজ নিজ সমস্যায় বিজড়িত। এমন অবস্থায় মাঝে মাঝে
সম্মেলন বসলে ও দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক
আলোচনার সুযোগ ঘটলে তা' বিভিন্ন দেশের সমস্যা
সমাধানে সাহায্য করবে। কিন্তু গোটা তেষটি সাল
কোন সম্মেলন বসল না। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল নানা
অজুহাতে এই সম্মেলনের প্রস্তুতি পূর্বক বান্চাল করে
দিচ্ছিল।

ইতিমধ্যে আফ্রিকার মানচিত্রে এক বিশাল পরিবর্তন
ঘটে গেছে। নিত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রেটব্রিটেনকে এই
পরিবর্তন মেনে নিতে হযেছে। ভয়ঙ্কর আফ্রিকার
জাগ্রত জনতা ব্রিটেনের হাত থেকে তাদের স্বাধীনতা
হিনিয়ে নিতে পেরেছে—ঘানা, কেনিয়া, উগাণ্ডা,
ট্যাঙ্গানিকা, নাইজিরিয়া, সিরিষা, লিওন, মালয়ি—
কোন দেশ আর পরাধীন নয়। এই সদ্যস্বাধীন সাতটি
দেশও এবার থেকে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের
সভ্য। গত বছর আফ্রিকার প্রত্যেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র
আদ্বিস আবাবায় মিলিত হয়ে আফ্রিকার বুক থেকে
সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করবার জন্ত আহ্বান
জানিয়েছিল। আর তা' ব্রিটেন সরকারের অজানা
নয়। আফ্রিকার বুক দু'-দুটো খেতাজ রাষ্ট্র আজও
ইংরাজ বংশধরদের আধিপত্য—দক্ষিণ আফ্রিকা ও
রোডেশিয়া। ভেরউড এবং সেলুসবারী ব্রিটেনের
রক্ষণশীল সরকারের সমর্থনপুষ্ট হয়ে আফ্রিকার বুকে বর্ণ-
বৈষম্য-নীতিকে বজায় রেখেছে। সেখানে মহুঘৃষের চরম
অবমাননা করা হচ্ছে। কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে
আফ্রো-এশীয় অশ্বেতকায় রাজ্যগুলোই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আফ্রিকায় খেতাজ অত্যাচার বন্ধ করার দাবী স্মরণে
স্বাভাবিকভাবেই এই সম্মেলনে অগ্রাধিকার পাবে।
রক্ষণশীল ব্রিটিশ সরকারের সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় ভয়।
আর আফ্রিকার গণতান্ত্রিক নেতারা নয়, কয়েকজন
খেতাজ নেতাও বর্ণবৈষম্য-নীতির বিরোধী। স্মরণে
প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে স্যার ডগলাস হিউম এই
সম্মেলন আহ্বান করার কাজকে কিছুটা ব্যাহত
করছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি ব্রিটেনকে
নূতনতর সমস্যার সম্মুখীন করতে রাজী হচ্ছিলেন না।

কিন্তু কয়েক মাস পরেই ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন।
শ্রমিকদল নূতন আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে সারা
ব্রিটেনে এবং রক্ষণশীল দল যে আজ ব্রিটেনকে কমনওয়েলথ-
ভুক্ত দেশগুলোর সামনে হের করে তুলছে সে-কথা
বলতে তুলছে না। বর্ণবৈষম্য-নীতি আজ ব্রিটেনের
সাধারণ মানুষও আর সমর্থন করছে না। হ্যারল্ড
উইলসনের নেতৃত্বে শ্রমিক দলের এই আন্দোলন রক্ষণ-
শীল দলকে ভীত করে তুলেছে। ফলে কমনওয়েলথ-
ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্রিটেন-বিরোধী মনোভাবকে দূর
করবার জন্তই বিগত বুধবার ৮ই জুলাই থেকে মার্লবারো
হাউসে সম্মেলন বসেছিল।

এই সংগঠনের অন্ততম প্রবক্তা ও শাস্তির অগ্রদূত
ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল মারা গিয়েছেন। তাঁর
অস্থপস্থিতি এবারকার সম্মেলনে উপস্থিত প্রধান মন্ত্রীরা
অস্থভব করেছেন। অস্থস্থতার জন্ত ভারতের প্রধান মন্ত্রী
লালবাহাদুর শাস্ত্রীজী অস্থপস্থিত ছিলেন। তাঁহার
জায়গায় গিয়েছিলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী ও
তথ্য ও বেতারমন্ত্রী নেহেরু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।
সাইপ্রাসের প্রধান মন্ত্রী মিঃ গ্যাকারিয়স এবং জ্যামাইকার
প্রধানমন্ত্রী মিঃ বৃশ্ণমস্তুি এবার সম্মেলনে অস্থপস্থিত।

মার্লবারো হাউসের প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন শেষ হয়ে
গেছে। কিন্তু অনেক দিক দিয়ে এই সম্মেলন নজীর সৃষ্টি
করেছে। আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন রাজ্যগুলির প্রধান
মন্ত্রী এই সম্মেলনে দাবী তুলেছিলেন যে, রোডেশিয়ার
সংখ্যাগুরু আফ্রিকানদের স্বাধীন সরকার গঠন করবার
সুযোগ দিতে হবে। খেতাজ স্কাল্‌সবেরীদের হাতে

কবি করুণানিধানের কথা প্রসঙ্গে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

জীবনে আমি দুজন দুঃস্থ কবিকে অন্তরঙ্গভাবেই পেয়েছিলাম—একজন ডাঃওয়াল-জয়দেবপুরের প্রবীণ কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, আর একজন শান্তিপুুরের কবি, কোলকাতাবাসী করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। গোবিন্দ-দাস প্রসঙ্গে যা বলা দরকার, তা তাঁর বিনা-চিকিৎসায় ঢাকার ‘নারিন্দা’ পত্রীতে ১৩২৫ সনের ১৩ই আশ্বিন মৃত্যুর পর, ১০০ হাজার ষে-দীর্ঘ কবিতাটি ময়মনসিংহের ‘সৌরভ’ পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁর জীবনীলেখক ডাঃ হেমচন্দ্র চক্রবর্তী “স্বভাবকবি গোবিন্দদাস” গ্রন্থে যা আত্মস্ত উদ্ধৃত করেছেন, তাতে এবং কয়েক মাস পর সৌরভের গোবিন্দ স্মৃতি-সংখ্যা প্রসঙ্গে সব কথাই খুলে বলেছি। কিন্তু অগ্রজতুল্য করুণানিধান সম্বন্ধে কিছুই অদ্যাপি বলার সুযোগ হয়নি। আজ প্রাক্তন কথা প্রসঙ্গে কিছু বলবো।

করুণানিধান ঝরা ফুল, প্রসাদী, শান্তিফল, ধান-হুর্দী ও হিন্দোলা প্রভৃতি খানপাঁচেক কবিতার বই লিখেছিলেন। প্রসাদী ও হিন্দোলা চোখে দেখিনি। ঝরা ফুল, শান্তিফল ও ধান-হুর্দী তিনি আমাকে ‘কবিভাতা’, ‘কবি-বন্ধু’ লিখে সানন্দে উপহার দিয়েছিলেন। আমাকে অত্যন্ত স্নেহভাজন ভাইয়ের মতোই দেখতেন তিনি। এতো যে দারিদ্র্য, তবু আমাকে নেমস্তন্ন করে’ বৌদিকে দিয়ে পরিবেশন করিয়ে খাওয়াতেন। সে কী

আন্তরিকতা! তাঁর অতিরিক্ত ব্যয় নিবারণের জন্ত চা, মিষ্টি মাঝে মাঝে খেলেও, অন্নাহার একদিনের বেশী করিনি। দারিদ্র্য তাঁকে কুড়ে’ থাকে, বেশ দেখতে পেতাম। ফর্সা চেহারার জীর্ণশীর্ণ বৌদিদি, কতকগুলো রোগাটে ছেলে, নিজের নেহাৎ অকবি গোছের শরীরও ঠিক তরুণ! কষ্টে-মুটে যে সংসার চলছে, তা পোষাক-পরিচ্ছদ, বিছানা, বালিস ইত্যাদি দেখেই বুঝতাম। শোবার জোড়া তক্তাপোষের ওপর আমাকে বসিয়ে, তাঁর সন্তরচিত অপ্রকাশিত কবিতাদি পড়ে শোনাতেও এবং মতামত জ্ঞানতে চাইতেন। এভাবে সদ্যরচিত অনেক কবিতাই তাঁর মুখে সবার আগে শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কখনো কখনো আমার ‘দিল্লদরিদ শর্মা’ ছদ্ম নামে লিখিত অনেক কবিতা, তিনি আমার মুখে শুনে’, হাসি-মুখে সংশোধন করে’ দিতেন। আবার তা ‘ভারতবর্ষে’ ও ‘নায়কে’ ছাপতে দেওয়ার সময়, হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গে যেতেন।

তিনি স্কটিস চার্চ কলেজের পেছনে, ডাফ্-স্ট্রীটের মাঝামাঝি একটি পুরোনো একতলা বাড়ীতে যখন থাকতেন, তখন সেই ১৩২২/২৩ সনের প্রথম ভাগে, নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের একজন প্রিয় বন্ধু পিতৃপ্রতিম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আমাকে করুণানিধান, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিত

ক্ষমতাপ্রাপ্তের জন্ত ক্ষেদ করলে সারা আফ্রিকায় বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন জলে উঠবে। এ দাবীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন সিংহল-ভারত-কানাডা প্রভৃতি দেশ। এই যুক্ত দাবী রোডেশিয়াকে চক্রান্ত-মুক্ত করতে পেরেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য-নীতির বিরুদ্ধে এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কিন্তু যুক্তভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বয়কট করবার নীতি গৃহীত হয়নি। পাকিস্তান এই সম্মেলনে কাশ্মীর সমস্যা তুলে ভারত-বিরোধী নীতি গ্রহণে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। মালয়-এশিয়ার প্রধান মন্ত্রী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাম্যবাদী

অনুপ্রবেশের সমস্যাকেও উত্থিত করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু যুক্ত ইস্তাহারে তা স্থান পায়নি। একদিকে সফলতা এবং অন্যদিকে অসফল্য এই সম্মেলনে সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি বয়ে আনবে। ভবিষ্যতে এই সংগঠনে একটা বিরাট রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। বুটেন যদি তার রক্ষণশীল মতবাদ ত্যাগ না করে এবং পাকিস্তান ভারতবিরোধী প্রচেষ্টা না থামায় তা’ হলে এই সংগঠন ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিক দিয়ে এবারকার আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

করান। মর্টন স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামকৃষ্ণ কথামৃত লেখক পরম ভক্ত শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মশায়ের কাছেও ইনি আমাকে নিয়ে যেয়ে পরিচিত করিয়েছিলেন। এই সুগভীর স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য। সেদিন ঋষিভুল্য এই শ্রীয—আমার ‘পাকাটির প্রতি’ একটি প্রকাশিত কবিতা পড়ে’ বলেছিলেন—“তুমি এই বয়সে যেরকম দার্শনিক কবিতা লিখছো, যশস্বী হবে বাবা! ভাত পাবে না কিন্তু।” তাঁর অর্ধ শতাব্দীর আগেকার ভবিষ্যৎ বাণী ফলেছে। যাক সে-সব কথা।

করুণা-দাদা তাঁর পরবর্তী কালের দক্ষিণাড়ার ভাড়াটে বাড়ীতেও আমাকে বহু কবিতাই পড়ে’ শুনিয়েছেন। তাঁর কবিতার শব্দ যোজনা খুব সতর্কতার সাথে করতেন। বারংবার কোনো-কোনো ছত্র পড়তেন এবং কবিতার কোনো-কোনো ছত্রের কোনো-কোনো শব্দ বারংবার কেটেকুটে পরিবর্তন করতেন। আবৃত্তি করতেন আর কান দিয়ে নিজে তা শুনতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত লাগু শব্দ না পেতেন ততক্ষণ কেবলি আবৃত্তিই করতেন এবং আমাকেও মন দিয়ে শুনতে বলতেন। এতখানি হুঁসিয়ার হয়ে আমরা কেউ লিখি না: খুব ভাবগভীর কবিতায় মহাপ্রাণ শব্দ যোজনা করতেন। কেন এই শব্দটি যোজনা করলেন, জিজ্ঞেস করলে, তা বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর “শাস্তিঞ্চল” পুস্তকের ‘শ্রীক্ষেত্রে’ কবিতাটি পাঠ করলে, আমার বক্তব্যটা বুঝতে সহজ হবে। তাবটি যেন শব্দেতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ‘ভো মহার্গব, নীল ভৈরব গর্জ্জন্-জলভদ্রে’,—এখানে কতগুলো মহাপ্রাণ শব্দ বসিয়ে সমুদ্রের গর্জ্জনটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ‘মর্ম্বর অগ্নি’ কবিতাটির প্রথম ছত্রটি কী চমৎকার! ‘বান্ধীর রাগিণী মূরছি’ হয়েছে মর্ম্বর রূপ ধরি’—! শব্দ-চিহ্নদ্বনে তিনি ওস্তাদ। তাঁর ‘সম্মাতায়া’ আলো-আবছায়া ভাব, মস্তকের মতো, ইঙ্গিতেই অনেক বেশী বলে।

তিনি সমসাময়িক কবি সত্যেন্দ্রনাথের মতো, ছন্দ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাননি। অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও মাত্রিক ছন্দেই তাঁর সব কবিতা লিখে গেছেন তিনি। অল্পই লিখেছেন; কিন্তু রসোত্তীর্ণ শাস্ত্রত কবিতাই রেখে গেছেন বেশী। মহাকালের দরবারে তাঁর আসনটি

স্বরক্ষিত থাকবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস! ভক্ত, ভগবৎ-বিশ্বাসী, ভাবুক কবি তিনি। রাজনীতির ধার ধারতেন না। রাজনীতি নিয়ে লেখা কবিতা নেই বললে ভুল হবে না আমার। পক্ষান্তরে কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ ষষ্ঠে রাজনীতিপূর্ণ কবিতা লিখেছেন। গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল, বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি কবিরূপের ছায় কবির করুণানিধানও স্বীভাগ্যে মৌত্যাগ্যবান্। এঁদেরকে দেখেছি ও জেনেছি বলেই বলছি।

বড় সভাসমিতিতে করুণা-দাদা কবিতা পাঠ শুনেনি বলে’ মনে পড়ে না; সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর আগেকার কথা। স্বরচিত কবিতা বাড়ীতে যা পড়ে শোনাতে, তাতে মনে হয়, আবৃত্তি ভালোই করতেন। রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত কবিতা, গান, বক্তৃতা স্বকণ্ঠে খুব ভালোই শুনেনি। অভিনয়ের সংলাপও রবীন্দ্রনাথ খুব ভালোই করতে পারতেন। সভা-সম্মিলনে অনেকেই উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করতে পারেন না; স্বরচিত কবিতা-প্রবন্ধাদিও পরিবেশন করতে জানেন না। শ্রোতার বিজ্ঞপ, সমালোচনায় উপহাসাস্পদ করে’ তোলে—এ কথা বেশ ভালোভাবে জেনেও অনেকেই তা সংশোধন করেন না। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যবিশারদ, চিন্তাঞ্জন প্রমুখ বিশ্বখ্যাত বক্তাবৃন্দের বক্তৃতা শুনে-শুনে, এইটুকুই শিখেছি যে, ছোটবড় সভা-সমিতি-সম্মেলনে, স্পষ্ট ভাষা, উচ্চ কণ্ঠে, ভাব পরিবেশন একান্তই কর্তব্য। নচেৎ দণ্ডায়মান হয়ে নিজেকে ধিকৃত করার চাইতে, কিছু না-পড়া, না-বলাই শ্রেয়:। নিখিল-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মুন্সীগঞ্জ অধিবেশনে বুদ্ধদেব বসু যখন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য শাখার সভাপতিত্বে, স্বরচিত কবিতাটি পড়তে পারছিলেন না এবং তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনাই যাচ্ছিল না, তখন সভাপতি কর্তৃক অনুরোধ হ’য়ে, তৎকালীন মাইক-বিহীন সভায় সেদিন আমিই কাংশকণ্ঠে বুদ্ধদেবের কবিতাটি স্পষ্টভাবে পরিবেশন করেছিলাম। বর্তমান কালের ক্ষীণ কণ্ঠ লেখক-লেখিকা, কবি ও সাহিত্যিক-বৃন্দকে একটু অবহিত হবার জম্বে প্রসঙ্গতঃ এ কথা এখানে বলতে বাধ্য হলাম।

১৯২৫ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ বাবার কলেরা রোগাক্রান্ত হওয়ার তার-বার্তা পেয়ে, কোলকাতা ছেড়ে যাবার পর, তাঁর অকাল মৃত্যুতে বিরাট একান্তবস্তী সংসারের বোঝা যখন ঘাড়ে চাপে তখন পিতৃব্য মমমনসিংহ-গৌরীপুরের দানবীর স্বদেশপ্রাণ ক্ষমিদারের আদেশ-উপদেশ বাধ্য হয়েই তাঁর বিপুল এষ্টেটের সদর ডিহি কাছারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করি এবং সবাইকে নিয়ে গৌরীপুরে থেকে যাই।

পিতৃদেব তাঁর অকাল মৃত্যুর ক্ষণ্ট আমার কোলকাতাষ থাকি এবং মেটপলিটন কলেজে পড়া বন্ধ হয়ে গেল। যখন হুদ্র মফঃস্বল শহর গৌরীপুরের জীবন একঘেয়ে মনে হতো, তখন সময় সময় কার্যব্যাপদেশে কোলকাতা এসে কিছুদিন কাটিয়ে যেতাম। কবিশেখর কালিদাসের কাছে একবার যেয়ে আনলাম—কল্পণাদার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়েছে এবং হাজরা রোডের তাঁর এক উকিল বন্ধুর বাড়ীতে থাকেন তিনি।

কল্পণানিধান প্রসঙ্গে তৎকালীন একটি বড় কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি ৪৬টি ছত্রে টেলিগ্রাফের ভাবার মতো অতি সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদহীন ভাষায় এক নতুন ধরণের ইঙ্গিতময় Epigrammatic কবিতা লেখা তখন আরু করি। সর্বপ্রথমে ঐ চণ্ডের কবিতা ‘তোড়া’ ‘ভারতী’ পত্রিকায় ছাপাবার বাসনায় চারুদাকে (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) দেখাই। তিনি পড়ে সন্তুষ্ট হয়ে কবিতাটি মণিলাল গাঙ্গুলীকে দেখতে দেন এবং পড়ার পর সত্যেনবাবুকেও মণিলালবাবু পড়তে দেন। সত্যেনবাবু হেসে মণিলালের হাতে ফেরৎ দেন। মণিলাল ‘আসছে মাসে ছাপাবো’ বলে হেমেন্দ্রকুমার রায়কে রেখে দিতে বললেন। আশাবিত্ত হয়ে আমি চলে এলাম সেদিন। এক মাস যায়-যায়, এমন সময়ে চারুদা গোপনে আমাকে একদিন বললেন—“তোমার কবিতাটি ‘ভারতী’তে ছাপা হবে না শীগ্গির! সত্যেন ঐ নতুন চণ্ডটা আয়ত্ত করার পর তার কবিতাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হ’লে শেষে তোমার ‘তোড়া’ কবিতাটি ছাপা হতে পারে, এটা বিশেষভাবে জেনেছি! তুমি যদি ২১ দিনের মধ্যে তোমার এই নতুন চণ্ডে লেখা আর একটি

নতুন কবিতা লিখে দাও, তবে সর্বপ্রথম তোমার কবিতাটি আমি এই মাসের ‘প্রবাসী’তেই ছাপাবো।” কথাটা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—“এতো ভারী মজার ব্যাপার! এর মূলে কে আছেন?” তিনি বললেন—“তোমার এসব জেনে দরকার নেই। তুমি হেমেন্দ্রকুমারের কাছ থেকে কবিতাটি চেয়ে নিয়ে আমাকে দাও যদি, তবে এই ‘তোড়া’টাই প্রবাসীতে আগে ছাপাতে পারি।” আমি একদিন পর যেয়ে ভারতীর কর্মকর্তা হেমেন্দ্রকুমার রায়কে কবিতাটি ফেরৎ দিতে বলায়, তিনি কিছুতেই তা ফেরৎ দিলেন না। তখন নতুন একটা কবিতা লিখে প্রবাসীতে ছাপাবার জন্ত ২১ দিন মধ্যে দেবো ঠিক করে’ চলে এলাম।

ঐদিন রাতেই কি বিষয়ে লিখবো তাই ভাবতে লাগলাম। মহাকবি কালিদাসের “ঋতু সংহার” নামটা হঠাৎ মনে জাগলো এবং ছয়টি ঋতু সম্বন্ধে অল্প কয়েকটি ছত্রে এক-একটি ঋতুর বিশেষত্ব, ইঙ্গিতময় ক্রিয়াবিহীন টেলিগ্রাফের ভাষায় লিখে শেষ করলাম। আনন্দে রাতটা ঘুমের ঘোরে কোনো রকমে কাটিয়ে, ভোর হলে পর, “ঋতু সংহার” কবিতাটি বারংবার পড়ে সতর্কতার সাথে দু’একটি শব্দ পরিবর্তন করে’ কবিতাটি নিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশের গলিটাতে, প্রবাসী কার্যালয়ে গেলাম। দেখলাম—দরোজার কাছেই একখানি চেয়ারে ঋষিভুল্য সৌম্যমুগ্ধি সম্পাদক মহোদয় উপবিষ্ট। তাঁকে চারুদার কথা জিজ্ঞেস করা মাত্র বললেন—“ওপরে যান।” ওপরতলায় যেয়ে দেখি—তিনি দস্তুরমাফিক মাসের প্রথমেই প্রবাসী প্রকাশিত করবার জন্তে বিশেষ ব্যস্ত। দেখেই জিজ্ঞেস করলেন—“কবিতাটি এনেছ?” আমি তাঁর হাতে আমার “ঋতু সংহার” কবিতাটি দিয়ে চুপ করে রইলাম। তিনি নিবিষ্ট চিত্তে কবিতাটি পড়ে’ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং মুদ্রাকরকে ডাকিয়ে এনে তক্ষুনি ছাপতে দিলেন।

অল্প কিছুদিন উৎকণ্ঠিত থাকার পর, একদিন দেখি প্রবাসীতে আমার ঐ নতুন চণ্ডের কবিতাটি “ঋতু সংহার” প্রকাশিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় কবিসাহিত্যিকদের স্তুতি আকর্ষণ করেছে।

তার কয়েকদিন পর, একদিন দুপুরের পরেই, আমাদের তৎকালীন বাসভবন ৫৩ নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ীতে এসে আত্মভোলা কবি করুণানিধান হাজির। আমাকে বললেন—“বীরবল তোমাকে আজই ল-কলেজে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন। চলো আমার সঙ্গে!” কবির অহুগমন করলাম। বীরবল তখন কলেজে ছাত্রদের সমক্ষে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আমাদের দু'জনকে দেখেই হাত দিয়ে ইঙ্গিতে একটু দাঁড়াতে বললেন। বক্তৃতা শেষ করার পর, আমাদের কাছে বাইরে এসেই জিজ্ঞাস্য নৈত্রে চাইবামাত্র করুণানিধান তাঁকে বললেন, “যতীনকে এনেছি।”

আমি নমস্কার জানালে পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—“প্রবাসীতে আপনার ‘ঋতু সংহার’ কবিতাটি পড়লাম, চমৎকার নতুন চণ্ডের কবিতা, ছোট্ট হলেও খুব ইঙ্গিতময়। আপনি কি জাপানী কবি নোঙচির কবিতা পড়েছেন?” আমি বললাম—“না, পড়িনি।” “তবে এ-নতুন চণ্ড কোথায় পেলেন এবং কিতাবে আপনার মনে জাগলো? দেড় গজ দু-গজ দীর্ঘ বাঙলা কবিতার বদলে আপনি এই নতুন চণ্ড কবিতা লিখলে, খুব সুন্দর হবে। আপনি এই চণ্ডেই কবিতা লিখে চলুন। বালীগঞ্জে একদিন আমার বাড়ী গেলে সম্ভষ্ট হবো।”

এই নতুন চণ্ড কিতাবে আমার মনে জাগলো সলজ্জ-ভাবে বললাম—আমহাষ্ট স্ট্রিটের পূব ও পশ্চিম দিকের দুইটি বাড়ীর ছাদের ওপরকার দুটি যুবতীর সংক্ষেপে কথা বলার চণ্ডটা বুঝিবে বললাম। পূব দিকের কিশোরীকে চোখে দেখা যায় না, কারণ আমিও পূবদিকের পাশের বাড়ীতে তেতলায় ছিলাম। কিন্তু তার কথা বেশ শুনছিলাম। পশ্চিম দিকের কিশোরীকে বিপরীত দিকের রাস্তার অপর দিকের বাড়ীর ছাদের ওপর বেশ দেখছিলাম। মেয়েটি বলছিল—“আজ বিকেলে, ইডেন গার্ডেনে, দাদা, আমি আর তুই, হ্যাঁ!”

“আমি এই কয়েকটি ক্রিয়াপদহীন শব্দ শুনেই, এইরূপ নতুন চণ্ডে শব্দযোজনা করে, টেলিগ্রাফের ভাষায় কবিতা লেখা যায় কিনা, চেষ্টা করেছি মাত্র।”—বলে চুপ করলাম।

বীরবল হাসতে হাসতে বললেন—“বেশ চমৎকার উদ্ভাবন। খুব ভালো লেগেছে আপনাব ‘ঋতু সংহার’ কবিতাটি। আপনি এই চণ্ডে খুব লিখবেন।”

আমি নমস্কার জানিয়ে করুণানিধানের সাথে চলে এলাম। কিন্তু বালীগঞ্জে আর যাওয়া হয়নি আমার। এই চণ্ডের অনেকগুলো কবিতা বহু মাসিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত করবার পর, “ছায়াপথ” নামে গ্রন্থাকারে ছাপিয়ে একখানি তাঁর কাছে গৌরীপুর থেকে রেজেষ্ট্রী করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি বইখানি পড়ে সম্ভষ্ট হয়ে পত্রোত্তর প্রদানে আমাকে পরম আপ্যায়িত করেছিলেন। “ছায়াপথ” উৎসর্গ করবার বাসনা ছিল আমার। কিন্তু ভেবে দেখলাম—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তা না পেলে আমার এই নতুন চণ্ডের কবিতা, কর্তৃকর্তা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সেরেস্তার কাগজপত্রের তলায়, না-জানি কতকাল চাপা পড়েই থাকতো! তাই “ছায়াপথ” চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের করকমলে উৎসর্গ করে দত্ত মনে করেছিলাম। পঞ্চাশ বছর আগেকার এই ঘটনাটা, যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, প্রকাশ করে যাওয়ার তাৎপর্য আছে বৈকি! হ্যাঁ, এখানে বলে রাখা ভালো, সর্বপ্রথম প্রবাসীতে “ঋতু সংহার” কবিতাটি বেরোবার পর, পরে “ভারতীতে” “তোড়া” কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এবং অন্যান্য অনেক মাসিক পত্র-পত্রিকায় কয়েক বছর ঐ নতুন চণ্ডেই কবিতা লিখেছি আমি। সাহিত্য-সম্পাদক জুরেশ সমাজপতি মশাইও তারিফ করেছেন এই চণ্ডের কবিতাকে। তাঁর সাহিত্য-পত্রিকার তৎকালীন “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” শ্রষ্টব্য।

তারপর, কবিশেখর কালিদাসের কথামত করুণা-দাকে তাঁর উকিল বন্ধুর ঐ হাজরা রোডের বাড়ীতে যেয়ে খোঁজ করলাম আমি। করুণা-দা আমার কথা শুনে অন্ধের মতো দেয়াল ধরে ধরে হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে আমার কাছে এসে অতিকষ্টে দাঁড়ালেন। প্রণামান্তে কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করতেই, সর্বপ্রথম আমায় বললেন—“তোমার বৌদিদি আর নেই; ছেলেরা সেয়ানা হয়েছে, বিষেও করেছে, যে-বার সংসার নিয়ে সরে পড়েছে, চাকুরী করছে! আমাকে বন্ধুরা ছাড়া দেখবারও কেউ নেই।

আর চোখে দেখিনে, গায়ে বল নেই, আর বাঁচবারও আশা করিনে। এই তো সংসার।” সরলভাবে সত্যকথা সব বললেন। আমি চেয়ে রইলাম পলকহীন চোখের দিকে। পরে হাত ধরে চেয়ারে বসলাম—দেখলাম অর্ধনিম্নলিখিত চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

ঈশ্বর শাস্ত হয়ে, হাতের তেলো দিয়ে চোখ মুছে বললেন—“তোমার সেই কণ্ঠস্বর শুনেই চিনেছি তোমায়। আর আমার দেখবে না, এই তোমার শেষ দেখা।”

হ্যাঁ, সেই আমার শেষ দেখা!

বড়ই শাস্ত সরল মায়াবী মানুষ ছিলেন করুণানিধান। হাওড়ার কোনো একটি স্কুলে শিক্ষকতা করবার সময়, তাঁর সাথে প্রথম আমার আলাপ-পরিচয়। পরে স্তার আশু-তোষের অহুগ্রহে, কোলকাতার কলেজগুলোর হোষ্টেল ও মেম্পরিদর্শকের কাজে পেলেন। মোটামুটি একটু সুখের মুখ দেখেছিলেন কিছুদিন। জীবনে একমাত্র সিগারেটের ধূমপান ছাড়া আর কোনো নেশাই ছিল না তাঁর। স্ত্রীর প্রতি অপরিসীমা প্রীতি-প্রণয় ছিল। মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকেই, কবিতা আর লিখতেন না তিনি। শাস্তিপুরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বরে জন্ম, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে এই ক্ষেত্রঘারীতে শাস্তিপুরেই মৃত্যু তাঁর। ৭৭ বছর ২ মাস ১৬ দিন বেঁচে ছিলেন। বি-এ পাশ করেছিলেন তিনি। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে কবিতা লেখা ছেড়ে দিলে, একদিন আমি তাগিদ দিলে বলেছিলেন আমার—“চল্লিশের পর কবিতা আর আসে না আমার। তোমার বয়েস আমার মতো হলেই টের পাবে তখন।”

কবি করুণানিধানের সম্বন্ধনায়, একটি কবিতা লিখে শাস্তিপুরের সম্বন্ধনা-সভার কর্তৃপক্ষীয়দের কাছে, আমি সুদূর ময়মনসিংহ-গৌরীপুর থেকে ডাকে পাঠিয়েছিলাম। কবিতাটি সভায় পঠিত হয়ে সেখানকার কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তবু আমি ময়মনসিংহের সাপ্তাহিক ‘ভাস্কর’ পত্রিকায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৩শে মার্চের সংখ্যায় পুনঃ প্রকাশিত করেছিলাম।

মদনমোহন কুমার নামে কোনো উচ্চশিক্ষিত ধনী অধ্যাপক ১৬১২, রামকান্ত বসু স্ট্রীট থেকে দুদিন আমার কাছে এসে, কবির সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে লিখে নিয়ে গেছেন। সুনলান, তিনি কখনো চোখে দেখেননি, শুধু কবিতা পাঠেই তাঁর জীবনী ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্ম প্রয়াসী হয়েছেন। বাঙলা ও বিহারের যেখানে যেখানে কবি বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়কাল অতিবাহিত করেছেন, সেই সকল স্থানে যেয়ে গ্রন্থ প্রকাশের মাল-মসজিদ স্থানীয় বৃদ্ধদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। শাস্তিপু্রে যেয়েই তিনি প্রথম আমার খোঁজ পেয়েছেন এবং যে-সব পত্র-পত্রিকায় আমি কবিতা লিখে থাকি, তাঁদের কাছ থেকে আমার ঠিকানা জেনে আমার কাছে এসেছিলেন। এই শ্রেণীর গুণগ্রাহী স্বভাবের এখনো বিশেষ অভাব হয়নি। তবু দুঃখের সহিত বলছি—কবির বড়ই দুর্ভাগ্যবান, বিশেষতঃ দরিদ্র কবির। কবি করুণানিধানের জীবনী কখনো বেরবে কিনা, তা কবির ভাগ্যবিধাতাই বলতে পারেন!

মরমী কবি করুণানিধান স্মরণে

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

করুণাধারায় গলিত তোমার তাব-বন্যার তটিনী
তারি তরঙ্গে নাচিয়াছে তব কবিতা-কম্যা নটিনী।
কঠিন মাটির মরু-মরীচিকা
তোমার জীবনে শুধু প্রহেলিকা,
রসের উৎস ঢেলেছ সেখায় সে কথা কভু ঘেরটিনি।

ক্লীণ অবসরে নয়ন-পদ্মে করুণা-বিন্দু ঝরিছে
তাব ও ভাবনা অলকানন্দা এক সাথে যেন ঝরিছে।
‘ঝরাফুল’ দিয়ে ‘প্রসাদী’ তোমার,
‘শাস্তিঞ্জল’-এতে দিলে উপহার,
‘ধান-ধূরা’য় আশীষ দিয়েছো তাইতো চিস্ত ভরিছে।

‘হিম্মোলা’ মনে আনিয়াছে দোলা মুক্ত বিহগী মনেতে,
আকাশে উদার আচ্ছাদন শুনে বন্ধ রহে না বনেতে।
তব গান আজি করি উদগীত
স্মরণ-তীর্থে হবো উপনীত—
হে মরমী কবি করুণানিধান, স্মরিছ পুণ্য ক্রণেতে।

পুণ্যতিথি পূর্ণিমা

শ্রীতারশঙ্কর

সভ্যতার ক্রমবিকাশের বৈচিত্র্যময় পথ বেয়ে মহাকাশ জয়ের এই অধুনাতম যুগে যে কয়টি কল্যাণাদর্শ মনুষ্যত্বকে মহিমান্বিত করেছে তাদের অন্যতম হলো : গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা, শ্রেণী-বৈষম্যহীন সমাজ-ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ, যুদ্ধ নয়—শান্তি এবং মৌলিক মানবাধিকার অর্থাৎ Fundamental Human Rights. এই সব আদর্শবাদের স্রষ্টা, প্রচারক কিম্বা পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবে সহস্রায়ে সকল মনীষী ও প্রতিষ্ঠানের কথা মনে পড়ে, তাঁরা সকলেই এ যুগের। “যুদ্ধ নয়, শান্তি”-র আদর্শ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর চিন্তাশীল মনীষীদের মর্মবাণী। আর মৌলিক মানবাধিকারের আদর্শও যুদ্ধোত্তর প্রতিষ্ঠান ইউ-এন্ ও-র মাত্র সেদিনের রচনা।

কিন্তু সত্যই কি তাই ?

না ! তা নয়।

সুদূর অতীত দিনে যখন পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশই ছিলো আদিমতার কালিমায় অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সাম্প্রতিক যুগের মহাকাশজয়ী জাতগুলো যখন জন্মলাভও করেনি, আড়াই হাজার বছর আগের সেই প্রাচীন যুগে, যে জুমহান জীবনদর্শন এই ভারতবর্ষের মাটি থেকেই মহামানব বুদ্ধ প্রথম প্রচার করেছিলেন, তার মধ্যে আমরা এই কল্যাণাদর্শের সব কয়টি, এমন কি তার চেয়ে অনেক বেশী কিছুই দেখতে পাই। এ তথ্য ঐতিহাসিক সত্য যে, নিজের জীবন-কালেই পৃথিবীর গণ-আন্দোলনের প্রথম নেতা বুদ্ধ ভারতবর্ষের মাটিতে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ-কৃত্রিম-বৈশ্ব-শুদ্ধের বৈষম্যের বিনাশ করে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাম্যবাদী বুদ্ধ। মানুষের প্রতি মানুষের মৈত্রী ও জীবমাত্রেয় প্রতি করুণাই ছিলো করুণাঘন বুদ্ধের জীবনদর্শনের মর্মকথা। হিংসা ও যুদ্ধের অবলুপ্তি এবং শান্তির প্রতিষ্ঠাই যে শান্তির অগ্রদূত বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ছিলো তা’র বাস্তব প্রমাণ

রেখে গেছেন বুদ্ধাহুগামী সম্রাট অশোক যিনি খ্রী এইচ. খ্রি. ওয়েলসের মতে পৃথিবীর আদ্যোপান্ত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ছয়জন মনীষির অন্যতম।

১৯৬৩ সালে এফ. এ. ও-র ঘোষণা : ক্ষুধা মানুষের শ্রেষ্ঠ ব্যাধি। আর সমসাময়িক কালেই ইউনেস্কোর বক্তব্য : অজ্ঞতা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অতিশাপ। কিন্তু বৌদ্ধ জীবনদর্শন অহুশীলনে-দেখা যায় যে, হুবহু এই সব সত্য ও তথ্যের প্রথম আবিষ্কারক আড়াই হাজার বছর আগে আবিভূত মহামানব বুদ্ধ।

বাস্তববাদী বুদ্ধ জীবনের রূঢ় বাস্তবতাগুলোকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে, তা’দের আঘাত থেকে বিশ্রান্ত মানুষকে আড়াল করবার জন্য যে বাস্তবভিত্তিক জীবন-দর্শন রচনা করে গেছেন, তা সর্বকালের, সর্বদেশের, সকল মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই সাম্প্রতিক পৃথিবীর উগ্র আধুনিকতা, বাস্তব যুক্তিবাদ আর বিজ্ঞানাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী বহু ধর্মের অলৌকিক বুনিয়েদের তত্ত্বকে সংশয় ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখলেও, সত্যদ্রষ্টা বুদ্ধের “বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়...” জীবনদর্শনের বিচারে তা’রা নিঃসংশয়িত। বিজ্ঞানের অক্স অবিদ্যমান আবিষ্কার সত্ত্বেও এবং বাস্তবভিত্তিক আধুনিকতার দুর্জয় অভিযান সত্ত্বেও বৌদ্ধ জীবনবেদ আজও স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পৃথিবীও এই মহান জীবন-দর্শনকে শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে স্বীকার করে।

সেই জীবনদর্শনের রচয়িতা সত্যদ্রষ্টা বুদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমার শুভলগ্নে দু’হাজার পাঁচশো আট বছর আগে মর্ত্যের মাটিতে, মানুষের মাঝে আবিভূত হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে আর এক বৈশাখী পূর্ণিমায়ই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। আর তারও পরে আর এক বৈশাখী পূর্ণিমায়ই তিনি মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। তাই বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে সেই পরমপুরুষকে প্রণাম নিবেদন করে আজো বিশ্ববাসী প্রার্থনা জানায় :

“করুণাঘন ধরণীতল করো কলকশূন্য।”

একটি সন্ধ্যায়

শিল্পাধ্যক্ষ শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

আমার কোষাটীর থেকে দামোদর বেশি দূর নয়, খুব জোঁর মাইলখানেক হবে। তবুও শিক্ষা-নিকেতনে (নবকলাগ্রাম, বর্ধমান) এসে পর্যন্ত দু-ছোটো বর্ষা চলে গেল—দামোদরের পূর্ণ যৌবন রূপ দেখবার সুযোগ ঘটেনি। বর্ষায় দামোদরের যে চেহারার বর্ণনা এক সময় বাংলাদেশের মানুষ শুনেছে আজও সে উন্নত রূপ থাকলেও “ক্যানেল” পরিকল্পনার পর থেকে আজ স্বাধীন ভারতের রাজ্যে দামোদরের জলশ্রোত বিভিন্ন দিকে খাল কেটে প্রবাহিত করা হয়েছে। দামোদর আজ যেন অনেকটা পিঞ্জরাবদ্ধ।

তবুও এই বর্ষায় পল্লীর শ্রামল রূপের মাঝ দিয়ে হু’পাশে গ্রাম রেখে দামোদর একে-বৈকে ঢুকুল বেষে চলেছে দূর হতে দূরান্তরে। ভাল লাগে সে রূপ দেখে। সে রূপ দেখে কল্পনায় অনেক মনের কথা আসে, সন্ধ্যায়— নিশ্চর রাত্রির মাঝে।

শিক্ষা-নিকেতনে কারিগরী বিদ্যালয়ের নূতন অধ্যক্ষ এসেছেন কিছুদিন হলো। শিক্ষিত, বিলাত ফেরৎ মানুষ। বয়স হ’লেও উদ্যম যথেষ্ট মনে। প্রস্তাব এলো তাঁরই তরফ থেকে দামোদর দেখতে যাওয়ার।

আমাদের পাশের কোষাটীরে সাহিত্যিক রণজিৎ শুট্টাচার্য, উদ্যম উদ্যোগ তাঁর যথেষ্ট। “টেকনিক্যালের” শিক্ষক আমি নই, তবুও শিল্পী হিসাবে তাঁদের বন্ধুত্বের, ভালবাসার অভাব নেই। স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে সত্যিই আমি বাঁধা। কাজেই দলের সঙ্গে আমারও যাওয়ার ব্যবস্থা। যথাসময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলাম দলবলের অনেকেই বেরিয়েছেন। হু’একজনের জন্ত অপেক্ষা করছি। ছাত্রদের হু’চারজন সঙ্গে আছে।

আর সঙ্গে নেওয়া হয়েছে বড় একটা টিন। সুনলাম আছে মুড়ী ও শশা—আরও কিছু খাবার জিনিষ।

সামনের একটা মাঠ পেরুতে হবে প্রথম। এ মাঠ নিতান্ত ছোট নয়—বেশ বড় মাঠ। দল বেঁধে পাশাপাশি চলার উপায় নেই এই আলপথে। কাজেই লম্বা লাইন দিয়ে একে একে চলতে হচ্ছে।

স্যাণ্ডেল পায়ে চলেছি একা, আগেই চলেছি। পিছু ফিরে এক একবার দেখছি কে কে আসছে। পিছনে কয়েকজন ছাত্র, তারপর রণজিৎ, তার অনেক পিছনে সুনীলবাবু, তারপর আরও অনেকে।

আকাশে মেঘ থাকলেও সকাল থেকে বৃষ্টির নাম নেই। কাজেই আল রাস্তা হ’লেও বেশ চলছি। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখি একি! এ যে বৈতরণী! উপায় নেই। স্যাণ্ডেল খুলে জলে নামলাম। ছপাং ছপাং জলে চলা। কাদা আর জলের দাগ কাপড় জামায়। কিন্তু এরকম জল পার হওয়া এক জায়গায় নয়, আরও হু’জায়গায়। পিছন ফিরে দেখি পিছনে কোলাহল। অনেকের জুতা খেলার ব্যবস্থা।

পাল্লাগ্রামের মধ্যে এসে গেলাম। এটা হলো পশ্চিম পাল্লাগ্রাম। পাল্লাগ্রাম তিনটি—পূব পাল্লা, মাঝ-পাল্লা ও পশ্চিম পাল্লা। বাসিন্দা বেশী নেই। তবু কয়েক ঘরের সবুজ পল্লী-মাঠের একধারে বসবাস। ধান চাষ জীবিকা, কিছু আলু-কপির চাষও আছে। এই গ্রামের প্রান্তে হয়েছে ক্যানেলের নূতন পুল। অনেকটা খাড়াই এই পুল। গোরুগাড়ী যেতে পারে না। মানুষ আর সাইকেল যেতে পারে এই পুল দিয়ে। পা ধুবে স্যাণ্ডেল পরে এই ব্রীজের উপর এসে দাঁড়লাম। ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়লাম আমি আর রণজিৎ। অপূর্ব দৃশ্য এর চারপাশে। পশ্চিম আকাশে রক্তরাঙা রবির আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়েছে নিচের ক্যানেলের জলে, মাঠে, অসংখ্য গাছের মাথায়। অসংখ্য তালগাছ এখানে। সারি সারি উঁচু নিচু জমি, অনেকটা বীরভূমের মিল আছে এই তালগাছের সারিতে। দাঁড়িয়ে দেখছিলাম শুধু পশ্চিম আকাশের রূপ। কত রঙ, কত আলো। মিলিয়ে নিচ্ছিলাম কত রং যে মিশে কত রঙ হয়েছে, পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম কাগজও নেই কলমও নেই। মাঠের দৃশ্য ধরে রাখবার ইচ্ছা মনে মনে।

কিন্তু হু’চোখ দিয়ে সে রূপ দেখা ছাড়া আর ধরে রাখা গেল না। ছটপুট করে পিছনের সকলে এসে পড়লেন।

আবার চলতে হলো সামনের দিকে। কিন্তু পিছন থেকে একজন হেঁকে বললেন “সামনে নয়, পাশ দিয়ে নামুন”। চেয়ে দেখলাম পুলের শেষে পাশ দিয়ে সরু পায়ে চলা রাস্তা নেমেছে নিচের রাস্তার উপর। আন্তে আন্তে নেমে পড়লাম।

এবার সারি সারি চলা নয়—হু’ একজন নিয়ে পাশা-পাশি চলা যাচ্ছে। মাঝপাল্লায় এসে পড়েছি। দামোদর আর বেশী দূর নয়। গ্রামের মাহুঘের সঙ্গে দেখা মাঝে মাঝে। ষাঁদের পরিচিত হু’ একজনের দেখা পাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে হু’ এককথায় আলাপ আলোচনা। মামুলি কথা, “কেমন আছেন? চাষ শেষ হলো?”

এমনি ছোট ছোট হু’ একটা প্রশ্ন। আমি দেখছিলাম চেয়ে চেয়ে এদিক ওদিক। গ্রামের পুকুর, বড়ীঘর, মাহুঘের দিকেও চাইছিলাম বৈকি? এরা সব গ্রামের মাহুঘ, হট করলেই এদের কোলকাতা যাওয়া-আসা নেই। বড় জোর ধান, চাল আর আলু বেচতে যাওয়া নিকটের কোন আধা-সহরে।

চেয়ে দেখছিলাম গ্রামের চেহারা। বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমাদের এই গ্রাম। লক্ষ্মীশীলা গ্রামবধূদের এদিক দেখে ওদিকের পথে চলাফেরা, সলজ্জভাবে ঘোমটা টানা। কোথাওবা পুত্রসহ গৃহদ্বারে দাঁড়ান। বেশভূষায় আভিজাত্যের বলাই নেই। নিতান্তই সাদাসিধে। চেহারায় জোলুঘ নেই, নিতান্ত যেন কঙ্কাল-সার। তবুও এরা গ্রামের মাহুঘ। সমস্ত জীবন কাটবে হয়তো এই গ্রামে—কখনও সুখে কখনও দুঃখে।

এদের সুখ দুঃখের কথা মনে আসে। বছরে ধান ধরে উঠলেই মোটামুটি একরকম সুখ। নইলে দুঃখের অন্ত নেই। জীবনে অন্নসংস্থানের জন্ত কাজের মধ্যে আসল আনন্দ। এদের পুঁথির শিক্ষাও নেই, তার গর্বও নেই। ধনীর আভিজাত্যের গর্ব এদের তো নেই-ই। এরা তবুও মাহুঘ—সাধারণ গ্রামের মাহুঘ। চলতে চলতে আর ভাবতে ভাবতে কেমন যেন একটা তন্নয় ভাব, চিন্তায় যেন মন জড়িয়ে যায়। সামনে মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম কখন আমি পিছিয়ে পড়েছি সকলের পিছনে। উদ্যম আনন্দে ছাত্রদল এগিয়ে চলেছে দামোদরের পাড়ের

দিকে। কিন্তু আমি তখনও ষাঁধের পাকা রাস্তায় চলেছি মন্থরগতিতে, আকাশের দিকে চাইছি। দেখছি মেঘের চলাচল। কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের কোলে বলাকার উড়ে যাওয়া। কবির কল্পনা মনের মাঝে রূপ লেখা হয়। চিত্রকলার সৌন্দর্যের কথাও মনে আসে বৈকি? নীচে অশান্ত নদী, উপরে উন্মুক্ত আকাশ, আশেপাশে শ্রামল বনানী, দূরে দূরে পল্লীগৃহ, সামনে পাশে অসংখ্য তালীবৃক্ষ। পল্লীবধুর জল আনা, কৃষক, কৃষাগীর গৃহে ফেরা, দিনান্তের ক্লান্ত রবির অন্ত যাওয়া। এপারে খেয়ার নৌকায় মাঝি হাঁকে “কে পারে যাবে গো”। এ দৃশ্য কার না মনকে চঞ্চল করে? কে না চেয়ে থাকে একদৃষ্টে দূরে-বহুদূরে, নদীর ধারে ধারে যে বনানীর সীমারেখা মিশেছে আকাশের দিগন্তে? এ দৃশ্য শুধু দেখে সাধ মেটে না। মনে হয় এর মাঝে যেন আরও কি পাই, আরও কিছু চাই। এ হয়তো ভাবের কথা, কিন্তু তবুও তা সত্য। আর সে সত্য উপলব্ধি করে যারা—শুধু বাস্তবের টাকা-আনা-পাইয়ের সঙ্গে নয়, প্রকৃতির রূপের সঙ্গে পরিচিত। অনন্ত বিশ্বের স্রষ্টার প্রতি ষাঁধ শ্রদ্ধা—আত্মনিবেদন।

তন্ময় হয়ে দেখছিলাম প্রকৃতির সেই অপরূপ শাস্ত, সাক্ষ্য-মূর্তি। যে দিকে চাই শুধু সবুজ—সবুজের সমুদ্র। সমুদ্রে দিগন্ত-বিস্তৃত দামোদরের জলরাশি। মাঝে মাঝে বিস্তৃত চর একে বেকে গিয়েছে এদিক ওদিক।

কিন্তু ও কারা? সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে সারা মাঠে, নদীর জলে। লোকগুলো এসে পড়লো আমাদের কাছে। কারও হাতে লঠন, কারও হাতে লাঠি। একজনকে কাঁধে নিয়ে হু’জনে ধরাধরি করে চলেছে। সন্তর্পণে—নদীর ধারে ধারে। “এই দাঁড়াও দাঁড়াও। কে তোমরা?” আমাদের দল হেঁকে উঠলো।

কালো কালো মাহুঘগুলো দাঁড়াল কাছে এসে। নামিয়ে দিল কাঁধের মাহুঘটাকে নীচে মাটিতে, কিন্তু বসবার ক্ষমতা তার নেই। সেই ঘাসের উপর শুয়ে পড়লো। লোকটা ধুকছে।

কি হয়েছে? প্রশ্ন আমাদের তরফ থেকে।

আবছা অন্ধকারে মুখগুলো ভাল দেখা যায় না।

জোয়ান ছোকরা বললে, “আমার বাবা, অস্থখে ভুগছে তিন মাস। কথা শুনেক না। এসেছিল কাজ করতে—মাঠে”।

এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম। এবার বললাম “অস্থখ করেছে তবে মাঠে এসেছে কেন?”

ছোকরা যেন আঘাত পেলে মনে। কি ভেবে মাথা ঝুলিয়ে, বেশ স্পষ্ট করে বললে, “তাতো বটেই, কেনে মাঠে আসবে। আরে আমরা কি তুদের মত আছি, আবাদ না হলে খাওয়া হবেক না যে”।

সাঁওতাল দল আবার লোকটাকে কাঁধে নিয়ে চলে গেল। পারের নৌকা খেয়াঘাটে। পারে যাবে ওরা। সঙ্গে ছ’জন জীলোকও রয়েছে। বুকের কে হয় কে জানে।

লজ্জা পেলাম। সাঁওতাল যুবকের কথাটা যেন মনের মধ্যে কাটার মত বিধলো।

“আমরা কি তুদের মত আছি”। কেমন যেন গভীর হয়ে গেলাম। প্রকৃতির যে রূপের ছবি মনের মাঝে আঁকা হয়েছিল কিছু আগে—তা যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। চারদিকে চেয়ে মনে হ’লো, শুধু ফাঁকা আকাশ, কালো মেঘ। গাছ-বন-জঙ্গল, নদীর জল আর চরা। মানুষগুলো কঙ্কালসার—এর মধ্যে সৌন্দর্য কোথায়? জ্বলন্তের ছোঁয়া? আবার মনের মাঝে চিন্তা, কঠিন বাস্তব আর প্রকৃতির রূপ, দুয়ে মিলে ঘন। মন বেচারী নিঃসহায়, চঞ্চল, কেমন যেন ভাবাবেশ।

কিন্তু সে শুন্ময়তা কাটলো দূরের সেই সাঁওতাল রমণীর কান্নার স্বরে। বুকভাঙা সে কান্নার সুর—করণ। বুদ্ধ বোধ হয় মারা গেল। রাজির অন্ধকারে নিস্তব্ধ

মাঠের মাঝে নদীর চরে সে কান্নার করুণ সুর শুধু মাহুষের বৃকে বেদনা দেয় না—বনানীর শ্রামল রূপও বুঝি মলিন হয়। দামোদরের কলকল ধ্বনি বুঝি কান্নার মত শোঁনায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। শুধু আমার নয় সঞ্জের অনেকের। নিকটের দূরের সব কিছু মিলে যে অপরূপ রূপের ছোঁয়া লেগেছিল মনে সে রূপ গেল মন থেকে। বিস্তৃত দামোদরের জলের দিকে একবার চাইলাম। ওপারের ঘন বন—গাছপালা কিছুই দেখা যায় না। মনে হয় শুধু একটা কালো রেখা দূরে বহুদূরে জোনাকির মত আলোর নিশানা—কিসের আলো কে জানে।

পারের নৌকা ছেড়ে দিল এপার থেকে। কলরব উঠলো যেন ক’জনের।

নদীর তীর ছেড়ে রাস্তায় উঠে পড়লাম। তখনও কানে আসে জল-কল্লোল। নৌকার দাঁড় ফেলার ঝপ ঝপ শব্দ। আর সেই কান্নার সুর।

পথ চলি। পিছু থাকে খেয়ার পথ।

এতক্ষণে আকাশে চাঁদ উঠলো। সে আলোয় কালো কাপড় ছেড়ে প্রকৃতি সাজলো আবার অপরূপ। অসহায় মন চেয়ে থাকে আকাশের দিকে—চাঁদের পানে। ছুঁখের মাঝে আবার রঙের ছোঁয়া লাগে মনে। চাঁদের আলোয় সারা দেহ বলবল। কিন্তু সে দেহের ছায়া চলেছে আমারই পাশে পাশে। সে ছায়া অন্ধকার। মনে আসে ভাব, আলো ও অঁধার, সূর্য ও ছুঁখ, জন্ম ও মৃত্যু। প্রকৃতির মাঝে চিরন্তন সত্য।

দৃশ্য পরিচয়

রাজকুমার লাহিড়ী

বিষম সন্ধ্যায় শুনি সমুদ্রের গান

শত ক্ষিপ্ত গর্জন অণুপরমাণু হ’য়ে বিস্তারিত

দিগন্তের বেলা বুঝিবা ফুরায় মন ছোঁওয়া দেহাতীত ক্ষণে

অতর্ক্য নয়নে তোমারে খুঁজিয়া ফিরি বুধা অশ্বেষণে।

অবিশ্রান্ত প্রবাহেতে অনন্ত কাহিনী—

কোঁথায় সোনালী রোদ ঢিলের ডানায়

মাঠের ধানতে মৃদু দোলা দিয়ে যায়,

আবার ধূসর ছায়া বালির রঙেতে

ছায়া ফেলে আঁধার ঘনায়।

অন্ধহীন ছায়া-নাট্যে দৃশ্য পরিচয়—

খাঁটুক খুঁজিয়া ফিরি সাগর বেলায়।

আবাল্য জানি বলেই বলছি

শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী

আবাল্য বন্ধু আমার। মানুষটি বড় হয়ে কেমন হবে, বাল্যেই তার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। ইংরাজিতে প্রবাদ আছে 'Morning shows the day'. একটা অনড় নীতিনিষ্ঠা তার জীবনের প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি। আজ সে পদস্থ। অনেকেই অনেক কথা বলে থাকেন। কানে আসে, কিন্তু জানি বলেই মন সায় দেয় না। এই আবাল্যেই মানুষটির জীবনের খুঁটিনাটি ছ'একটি ঘটনার মাত্র উল্লেখ করবো।

মাত্র সে-দিনের ঘটনা। বন্ধুর খুবই অস্থস্থ। কবিরাজ চিকিৎসা করছেন। পথ্য দিয়েছেন পোরের ভাত, স্কৃত ইত্যাদি। "লোককে আটা খেতে বলবো, আর আমি ভাত খাব, তা হতে পারে না" বলে বন্ধুর বঁকে বসলেন—কারও কথায় চিড়ে ভিজল না।

আর একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। বন্ধুবরের জন্মতিথি। ঘর ভরে গেছে উপঢৌকনের নানা জিনিসে। কয়েকটা বড় ঝুড়ি-ভরা নানা টাটকা ফল। পরের দিন সকাল বেলা ছোট বোন এসে দেখে সব ঘর শূন্য। অথচ ভাইটি অস্থস্থ। ফলের প্রয়োজন। শুনা গেল উপঢৌকনের সব ফলই নাকি জমা হয়েছে কংগ্রেস অফিসে। কে যে কি করল সে খবরও বন্ধুর রাখেন না। নিজে কিছুই তার স্পর্শ করেন নি। অগত্যা ছোট বোনটি বেদনা। কিনে এনে রস করে দিল ভাইকে।

আজকে তাঁকে বিরে গায়ে-পড়া শুভাকাঙ্ক্ষীর ভীড়। তাঁর আওতায় থেকে অনেকে অনেক কিছু সুবিধেও যে না করেছে হলপ করে এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু বন্ধু আমার যে ভিখারী সেই ভিখারীই রয়ে গেছে। হস্তরেখায় তার সম্যাসের লক্ষণ ছিল। এ নিয়ে কৈশোরে কত কথাই না হয়েছে! আনুষ্ঠানিকভাবে সম্যাসী সে হয়নি, কিন্তু গীতার নিকাম কর্মফলত্যাগ যদি সম্যাসের মর্ম হয় তবে বন্ধুর আমার সম্যাসী নিশ্চয়ই। তার ত্যাগবৈরাগ্য কঠোরতা দেখে অন্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। মনে-প্রাণে গান্ধীজীর অমুসরণ-কারী সে। একটা ঘটনা বলি। বেশীদিনের কথা

নয়। বন্ধুবরকে শুনী করার জন্ত কয়েকজন মিলে তাঁর একটা জীবনী ছাপার ব্যবস্থা করেন। বন্ধুবর জানতে পেরে নিজে প্রেসে গিয়ে ছাপার কাজ বন্ধ করে মস্তব্য করলে: "Let me die unwept unhonoured and unsung."

জীবনের পথে বন্ধুবরের কোন সংস্থান নেই। নিজের বা স্বজনের জন্ত কোনদিনই কিছু করে নি তিনি। তবিষ্যতের বিষয়ে ভাবনামুক্ত—নির্দিষ্ট। এ বিষয়ে তার পালিত জনের আশা-আশঙ্কা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে উত্তর দিতে শুনছি: "লক্ষ লক্ষ আমার ভাইবোন পথের ভিখারী হয়ে ঘুরছে, তোমরাও তাদের দলে যোগ দেবে, এ আর বিচ্ছিন্ন কি?" চির উদাসীনের কঠোর কথাই বটে!

ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুবরের বিশেষত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার বাবা ৬গোপালচন্দ্র সেন ছিলেন বঙ্গারে District Board-এর Overseer. ঠিকাদারেরা ঘোড়ার জন্ত মাঝে মাঝে বস্তা-বস্তা ছোলা দিয়ে যেতো। আমাদের প্রতিবেশী গরীব ভাইবন্ধুরা অনেকে ফ্যানভাতই জোটাতে পারতো না। তাই উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে শরীর দুর্বল হয়ে থাকতো। বন্ধুবর কৌশল করে তাদের ছোলা দিতেন যাতে ভিজিয়ে রেখে সকালে আদা ছোলা দিয়ে খেতে পারে।

গঙ্গার ঘাটে স্নান সাতারের মহড়া চলতো। একদিন ছোটভাই অমূল্য ও আর একটি বালক স্নাতের জলে পড়ে ডুবতে থাকে। দেখেই বন্ধুবর সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজে সাতার জানে না, তবু প্রাণের কোন মায়া নাই, পরিণামের ভয় নাই। অল্প এক বন্ধু শেষ পর্যন্ত সকলকে কিনারে টেনে নিয়ে তোলেন।

পিতা একজন তাঁর বন্ধুর ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন পড়াশোনার জন্ত। একদিন খেতে বসে একটি অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। মা পরিবেশনের সময় নিজ সন্তানের অর্থাৎ বন্ধুবরের পাতে মাছের ছইখানি টুকরো ও অল্প ছেলেটির পাতে দিয়েছেন এক টুকরো। বন্ধুবর মাছের

বীরবালা চম্পা

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

বড় বড় রাজপুত্র নরপতি সম্রাট আকবরের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু করেননি শুধু একজন। তিনি হচ্ছেন মেবারের মহারাণা প্রতাপ সিংহ। স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রতাপের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু যার কথা আমি লিখছি, তাঁর নাম হয়ত অনেকেই শোনেন নি। নাম তার চম্পা—মহারাণা প্রতাপের প্রাণপ্রিয়া দুহিতা। স্বাধীনতা রক্ষায় প্রতাপের এই অবিচল আত্মগৌরবের মূলে বীরবালা চম্পার প্রেরণা কম নয়।

সম্রাট আকবর চিতোর অধিকার করেছেন এবং রাজ্যহারা হয়ে মহারাণা প্রতাপ পালিয়ে গেলেন আরাবলী পর্বতে। সেই বিজন গিরি কান্তারের গুহায় গুহায় তিনি দিন কাটাতে লাগলেন স্ত্রীপুত্র সহ। দেশের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষার জন্ত অসীম দুঃখ বরণ করলেন তাঁরা। এই ভাবেই কেটে গেল অসীম পঁচিশ বৎসর। দিন তাদের কাটত খুব কষ্টেই। সারাদিন পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে হত খাবারের সন্ধানে। বিছানা বলতে ছিল কতকগুলি চাটাই। তাতেই কেটে যেত তাদের রাত। আর খাওয়া বলতে ঘাসের রুটি, তাও কোনদিন জুটত, কোনদিন জুটত না।

চম্পার বয়স তখন এগার বৎসর। চার বছরের ছোট ভাইটিকে নিয়ে খেলতে গেছে নদীর ধারে। বেশ খেলছে তারা মনের সুখে। কিন্তু কতক্ষণ আর খেলবে? ছেলেমানুষ, ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। চম্পা বড় হয়েছে

বাটিতে হাত না দিয়ে খেয়ে উঠে গেল, মায়ের কোন সাধ্য-সাধনাই কার্যকরী হল না। এইভাবে কয়েক মাস মাছই খেলে না। শেষে ছেলেটির অনুরোধে পুনরায় মাছ খেতে আরম্ভ করলে। বাল্যকাল থেকেই জ্ঞাননিষ্ঠা ও বন্ধুপ্রীতি ছিল তার অসাধারণ।

বন্ধুর সঙ্গে অঙ্ক নিয়ে লাগলো বগড়া। একটা কঠিন অঙ্ক দেওয়া গেল। মেধাবী ছিল সে, বিশেষ

এখন। বাপের অবস্থা ভাল রকমই বোঝে। চার বছরের ছোট ভাইটির কি অত বুদ্ধি হয়েছে! ক্ষিদে পেতেই সে কঁদে কঁদে বলতে লাগল, 'দিদি ক্ষিদে পেয়েছে। খেতে দাও।' মুন্সিঙ্গে পড়ল চম্পা। সত্যিই ত! সকাল থেকে ছোট ভাইটি আজ কিছুই খায় নি। তাকে ভোলাবার জন্তই সে নিয়ে এসেছে কোলে করে। শুধু আজ বলে নয়, প্রায়ই সে এরকম করে। ছোট ভাইয়ের জলভরা মুখটি দেখে তার যেন প্রাণটা ফেটে যেতে লাগল। আহা! ক্ষিদেয় তার মুখটি শুকিয়ে গেছে। আচ্ছা ভাইটি, বাড়ী গিয়ে খাবে'খন। মালা পরবে? মালা? এই দেখ, কেমন, সুন্দর সুন্দর ফুল কুড়িয়েছি, কেমন গন্ধ, দ্যাখ দ্যাখ। আচ্ছা মালা গাঁথে দি.....এই ভাবে এ কথা সে কথায় ছোট ভাইকে ভুলাতে চেষ্টা করে সে। আর কাদতে কাদতে শিশুর চোখে নেমে আসে ক্লান্তির ঘুম।

* * * *

বাবা, কি ভাবছ এত? চম্পকে উঠলেন প্রতাপ। গভীর চিন্তায় ঘুমের মতই তাঁর চোখ দুটি বুজে এসেছিল। চেয়ে দেখলেন, চম্পা, কোলে চার বছরের ছোট ভাইটি।

হ্যাঁ মা, চিন্তায় পড়েছি খুব, বললেন তিনি, চিতোর থেকে একজন অতিথি এসেছেন, কিন্তু এমন কিছুই নেই যে খেতে দিই। মা, অতিথি ফিরে যাবে।

চম্পার কচি মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিছুক্ষণের

অঙ্কে। সকাল ৯টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চললো তার অঙ্ক কষা। না কষে কিছুতেই উঠবে না। শেষ পর্যন্ত রাত্রি ১০টার অঙ্কের সঠিক সমাধান করে করে তবে গেলো নাইতে-খেতে। বাবা-মা হাজার বলেও সমস্ত দিন খাওয়াতে পারেন নি। এই দৃঢ়তা প্রথম থেকেই সূচনা করেছিল একটা মহৎ জীবনের। সেই বন্ধুবর প্রফুল্ল সেনই আজ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

জন্ম। বললে, বাবা তুমি ভেবো না কিছু, অতিথি ফিরে যাবে কেন ?

—সে কি মা, ঘরে ত কিছুই নেই।

—আছে বাবা, কাল আমাদের যে দু'টো রুটি দিবেছিলে, সে রুটি আমি খাই নি, রেখেছিলুম ভাই খাবে বলে, বড় খাই-খাই করে জ্বালাতন করে। তা সেত ঘুমিয়ে পড়েছে। বলতে বলতেই চম্পা পাশের কুটিরের গিয়ে নিয়ে এল সেই রুটি আর একটু চাটুনি।

আর তাই দিবেই হল অতিথি সংকার।

না খেয়ে-খেয়ে চম্পার মুখটি শুকিয়ে গেছে। নিজের ভাগের রুটি নিজে না খেয়ে ভাইকে খাওয়ায়, নিজে খায় খুব কর্মই। আজও সে রুটি রেখেছিল এইভাবে। কিন্তু সন্দেরও সীমা আছে। ক্ষুধার কাতর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল সেইদিন।

দুঃখের শেষ নেই প্রতাপের, আর সন্দেরও সীমা প্রায় অতিক্রান্ত। অতিথি সংকার হল ঠিক, কিন্তু কন্ডার এই কষ্ট দেখে তিনি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। বললেন, মা, এই কষ্ট আর সহিতে পারি না।

* * * *

পত্র লিখতে বসেছেন মহারাণা প্রতাপসিংহ। শেষ পর্যন্ত মাথা বুকি আর উঁচু রইল না। পিতা হয়ে তিনি আর দেখতে পারছেন না সন্তানের অনশনশুক মুখ। তাই চিঠি লিখতে বসেছেন আকবরের রাজসভায়।

বশুতাই একমাত্র পথ। একদিকে স্নেহময় সন্তানবৎসল প্রতাপ জনক, আর একদিকে উদ্ধতশির বীরশেখর স্বাধীনতার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতাপ। লেখনী চলছে খস-খস শব্দ করে, আর প্রতাপের অন্তর-প্রাঙ্গণে এই দুই স্বরূপের মধ্যে চলেছে তুমুল সংগ্রাম। বড় বড় চোখ দুটি জলে ভরে আসছে ক্ষণে ক্ষণে।

বাবা, কি লিখছ তুমি ? চম্পা এসে দাঁড়ালো কোলের কাছে। এ কি বাবা, তোমার চোখে জল কেন ?

—না মা কাঁদিনি, বলে চোখ মুছলেন প্রতাপসিংহ। বললেন, চিঠি লিখছি দরবারে, তোদের শুকনো মুখ আর দেখতে পারছি না।

—সেকি বাবা, এ তুমি কি বলছ ? সামান্য প্রাণের জন্ম মাথা নত করবে ? আমরা কি চিরকালই বেঁচে থাকব বাবা ? মরব না কোনদিন ? আর মরতেই যদি হয় তবে মাথা উঁচু করে মরাই ভাল নয় কি ? আমার দিব্যি দিয়ে বলছি, তুমি কখনো এমনটি করো না।

* * * *

মহারাণার বশুতামূলক পত্র পৌঁছল আকবরের দরবারে। তাই শুনে পৃথ্বীরাজ পুনরায় প্রতাপসিংহকে পত্র লিখলেন বশুতা অমুচিত। সংকল্পও বদলে গেল আবার প্রতাপের। তাঁর স্বাধীনতার মন্দিরে দুঃখের প্রদীপটি অনিবার্ণ হয়ে জ্বলতে লাগল। ধন্য বীরবাল! চম্পা। কন্ডার এই মহাপ্রাণতায় এত দুঃখের মধ্যেও কয়েক ফোটা অশ্রু উজ্জ্বল মুক্তার মত চোখ দিয়ে ঝরে পড়লো প্রতাপের।

উপলব্ধি

চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ঢাকা নগরীতে বাঙলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় ছাত্রমণ্ডল রুখে দাঁড়াল। পূর্ব পাকিস্তানের এক প্রান্ত হতে অপর দিগন্তে চিরস্থায়ী যৌবন গর্জে উঠল। জাতীয়বঙ্গও গর্বভরে আলোচনা চলল সেই রক্তরাঙা ঘটনা সম্পর্কে।

কাঁধির গরীব শিক্ষক অনাদি আদক সঙ্ক্যাষ বাড়ী ফিরলেন। স্তনতে পেলেন, তাঁর পুত্র অমূল্য পড়ছে—

‘বাম হাতে যার কমলার ফুল ; ডাহিনে মধুক মালা...’

জনতার ব্যথা কখনো ভাবেন না, একান্ত নিজস্ব নানা সমস্যায় জর্জরিত ; তবুও হঠাৎ আজকে ভাবলেন, কেন মহাবনে আগুন লাগল ; কমলাবাগানে অস্তর চুকল ? চিন্তায় ছেদ পড়ল। গিন্নী ডাকলেন, ভাত বেড়েছি ; তাড়াতাড়ি এসো।

আহারান্তে নিলেন বিছানা। আপন মনে ভাবতে লাগলেন, শহীদগণের স্বদেশে স্বর্ষোদয় কি হবে না ?

ক্লান্ত দেহে আন্তে-আন্তে এলিয়ে পড়লেন নিদ্রাময়ীর কোলে।

অনাদিবাবু ঘুমের ঘোরে দেখলেন, গঙ্গাতীরে বঙ্গমাতা বিশ্বকমলা রূপে উদ্ভিত। জাহুবীর সৈকতে কতই না শিল্পের প্রতিষ্ঠায় সাফল্য পেয়েছে বঙ্গপ্রাণে স্বষ্টিশক্তি। ভুবনমোহিনীর পাট দেখে মুগ্ধ হলেন। পুনর্বার দেখতে লাগলেন ; পদ্মাকূলে বঙ্গজননী মহাকালী বেশে আবির্ভূত। কীর্তিনাশার সৈকতে বঙ্গজীবন প্রলয় ঘটতে প্রমত্ত। কৈবল্যদায়িনীর মূর্তি দর্শন করে আতংকে জাঁতকে উঠলেন।

চিংকার শুনে গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বুকি স্বপ্ন দেখেছ ; বোধ হয় ভয় পেয়েছ। তিনি জ্বাবে বললেন, আমি দেবীকে দেখলাম ; আগামীর ইঙ্গিত পেয়ে গেলাম।

অন্তরাল পদ্য

শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এস যাত্রি, আমাদের যাত্রা শুরু হোক,
আনন্দের নিধি
দুঃখ তাপ বিমুক্ত জীবনে
প্রাণের ক্রন্দন তরে নিয়ে
মণিকাঞ্চনময়—মনেতে লিপ্ত কর্দম
এস ধূয়ে ফেলি ;
আনন্দের উজ্জ্বল সাগরে ।
তারপর চলি ;
চলি শুধু হাতে—হাসি গান নিয়ে
স্পর্শ বিমুক্ত বেদনায় মাঝে মাঝে
নয়ন বিন্দুর মুক্তা ছড়িয়ে ।
ভিজ্জা ভিজ্জা মনের মৃত্তিকা—
সেখানে আনন্দ বীজ
পথে বা কুড়াই
সেগুলি ফুল হয়ে কোটে ;
পলাশেবর্ণ, যুথির স্নগন্ধে
রাধা-পদ্মের রূপ নিয়ে
মৃদু সমীরণে দোল খেয়ে ।
মাঝে মাঝে বিস্ময়
হতবাক নিবুদ্ধিতা ঘিরে ধরে
যেন ভুল করি,
তাসের নাগাঙ্গিন, বর্ণ লোহিতে
সুবর্ণের হেম দীপ্তি ভাবে,
শুধু স্থির সত্যের সমীপে যেয়ে
শুষ্ক হওয়া নয়—
যেখানে যত মায়া প্রহেলিকা আছে
সত্যের অল্পরূপ আশাতে,
সেখানেই অঞ্জলী পাতি
দু'বাহু বাড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে
তীব্র যান্ত্রিক নয়নে
রূপ দেখে ললনার মুখ
যদি সত্যের পিপাসা মিটাই
তবে সে বরবর্ণিনী আনন

সে যে কি ঘৃণ্য বিকট অস্থিময় আয়স গহ্বর
সত্য কি ঢাকা নয় মায়ায় মায়ায়
সে মায়া সরিয়ে দেখা নয়
আমরা চলব মায়ার অঞ্জন মেখে পথ
মায়াবী মনের সন্ধানে ;
সেখানে হলনা
ফাঁদ পাতা হয়তো মিথ্যার মকরন্দ মধুতে
তা হাক ক্ষতি নেই—
কোন কুণ্টলের পল্লব ভাঙ্গা নয়
এই তো জীবন প্রতিজ্ঞা ।

হে রূপের দেবতা !
আমি তব অন্তরের
ব্যাকুল বিশ্বাস বুঝি নাই,
আমি তব বিশ্ব ভুবনের
ছড়ানো পদচিহ্নের ইঙ্গিতে
পথে চলেছি কোথায়

তুমি আছ তোমারে দেখিনি
তোমারে হৃদয়ে লুকিয়ে
মোর মায়া তোমার বয়ান হান্ত
তাও কি বুঝেছি
শুষ্ক ভ্রম নিপল্লব হাতে কত প্রযতন !
কত যুগ হতে
তোমারে খোঁজার বিলাস !
ভগবান আমি এ জীবনে সন্ন্যাসী হব না
আমার কামনার কুটীরে
তুমি হও আমার বসন্তের সখা
যেমন গোপনে লুকিয়ে আছ রাত্রি দিন
তোমারে উদ্ঘাটিত করা
সে যে পরিত প্রমাণ পদ্মকলির দলকে মাড়িয়ে
মত্ত হস্তী দিয়ে

তুমি যেমন থাকতে চাও
সেই ভাবে থাক—
আমার চির মধুর অজানা ।

ভেজিটেব্ল যি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

কলিকাতা সহর ও তার চারি পাশে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সরিষার তেল দুপ্রাপ্য হয়েছে। সরিষার তেলের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু বেশী দাম দিয়েও বাজারে যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে সরিষার তেল যত আছে, তার সঙ্গে তেজাল আছে তার চেয়েও বেশী। সরিষার তেলের দাম দিয়ে ক্রেতা পাচ্ছেন তিসির তেল, তামাক তেল, কোন কোন ক্ষেত্রে মোবিল অয়েলও আছে, তেল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে অনেকে, মারাও গেছে হয়তো, তা সত্ত্বেও এই তেজালদাতাদের কোন গুরুতর কঠোর শাস্তি ব্যবস্থা হয়নি। অনেকে এখন অসুস্থতার ভয়ে তেলের পরচ কমিয়ে ভেজিটেব্ল যি খাওয়া শুরু কবেছেন। এই সুযোগে ভেজিটেব্ল যিও তার দাম কিছু বাড়িয়ে দিয়েছে। তেজাল তেলের বদলে এই 'নকল যি' আমরা খাচ্ছি। এই নকল যি স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা উপকারী সেই সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা হওয়া ভাল।

ভেজিটেব্ল যি সম্পর্কে ধরনের কাগজে নানা রকম বিজ্ঞাপন প্রায়ই চোখে পড়ে। তাতে প্রচার করা হয় এই নকল যি আসল ঘিয়ের মতই পুষ্টিকর। বিজ্ঞাপন-ছাপানো টাকার ব্যাপার, কিন্তু সেই বিজ্ঞাপন অহুযায়ী জিনিষটির গুণাগুণ আছে কিনা তা পরীক্ষা ও গবেষণার ব্যাপার। বিকল্প-খাত হিসাবে যে বস্তু বাজারে চলে তা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই আমি আজ পুরানো কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি।

সে ১৯৪৭ সালের কথা। জোসেফ কর্ণেলিয়াম কুমারাপ্পা 'নকল যি' সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করেন। আলোচনা প্রকাশিত হয় গান্ধীজীর 'হরিজন' পত্রিকায়। সময়োপযোগী বলে তারই বাংলা সংস্করণ থেকে আমি এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

“কচি ছেলেকে ভুলাইবার জন্য মা তাহার মুখে চুবি-কাঠি দেন। গুস্তপান করিতেছি ভাবিয়া শিশু খুসী হয় কিন্তু উহাতে তাহার দেহের পুষ্টি হয় না। বনস্পতি যি বাহারি খান, তাঁহাদের ওই অবস্থা—চুবিকাঠি মুখে শিশুর

মতই বাহ্যতঃ তাঁহার। একটা জিনিষ খাইবার আনন্দ পাইতেছেন, কিন্তু তাহাতে দেহের পুষ্টি হইতেছে না।... কেবল চুবিকাঠি দেওয়ার সঙ্গে ইহার প্রভেদ এই যে, মা চুবিকাঠি দিয়া শিশুর কাছে তো কোন দাম আদায় করেন না, কিন্তু বনস্পতিওয়ালারা ক্রেতাদের নিকট হইতে বেশ লাভ আদায় করিয়া ক্ষীণ হইতেছেন। দুগ্ধজ যুতের মধ্যে যে 'এ' খাতপ্রাণ, তাহার সমতুল্য কোন কিছু বনস্পতি ঘিয়ে নাই; অতএব ইহা মোটেই বিনয়। যতক্ষণ না ঘিয়ের মত ঘন হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বনস্পতিকে হাইড্রোজেনেশন করা হয়—ফলে উহাকে বড় জোর একটা অপাচ্য উদ্ভিজ্জ তৈল বলা চলে।...জনসাধারণের নিকট উহা স্বচ্ছন্দে বিক্রয় করা তো জনসাধারণের সঙ্গে জুয়াচুরি করা।...হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ায় একটা ঘটক দ্রব্য (ক্যাটালার্টিক) লাগে,—বনস্পতির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ উহা নিকেলের দ্বারা সাধিত হয়।...মানব দেহে নিকেলের কোন প্রয়োজন নাই, তাই খুব অল্প পরিমাণে গ্রহণ করলেও, পরিণামে উহার ফলে শরীরে বিষক্রিয়া হইতে পারে। কুমুর নিউট্রিশন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিনায়ক ডক্টর ডি. এন. পটবর্ধন গত মাসে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভায় উল্লেখ করেন যে, তাঁহার অহুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, জন্তুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও প্রজননশক্তি বনস্পতির ব্যবহারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।...”

[—বাংলা হরিজন, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭]

“বোম্বাই হফ্‌কিন্স ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর শ্রী এস. এস. সেথে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, হফ্‌কিন্স ইনস্টিটিউটে হাইড্রোজেনেটেড তৈলের পুষ্টিগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে :

১। হাইড্রোজেনেটেড তৈল খাইলে শরীরের বৃদ্ধি নষ্ট হয়।

২। এই জাতীয় তৈল খাইলে শরীরে ক্যালসিয়াম গ্রহণকার্য বাধা প্রাপ্ত হয়।

৩। এই জাতীয় তৈল গ্রহণের দ্বারা শরীরের চর্বির অংশের হানি হয়।

সম্প্রতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কাউন্সিল অফ স্টেটের এক অধিবেশনে বলিয়াছেন যে, ইচ্ছিত নগরের রিসার্চ ইনস্টিটিউট এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে যে, স্বাস্থ্যের পক্ষে বনস্পতি ক্ষতিকর এবং ইহা দৃষ্টিশক্তির পক্ষে অপকারক। ইহুরকে এই তৈল খাওয়াইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তিন পুরুষ পরে ইহুর অন্ধ হইয়া যায়। এই সব বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল দেখিয়া আশা করা গিয়াছিল জনসাধারণের কল্যাণকামী যে কোনও গবর্ণমেন্ট বনস্পতির প্রচলন বন্ধ করিয়া দিবে, এবং বনস্পতি প্রস্তুতকারীদের সমাজের শত্রু হিসাবে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবে।...যুক্তি দেওয়া হয় যে পাশ্চাত্য দেশে তো মার্গারিণ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সে যুক্তি আমাদের দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।...ধনী ব্যক্তিরা যদি বনস্পতি শিল্পের প্রচলন একান্ত বজায় রাখিতেই চাহেন, সে ক্ষেত্রে খাদ্যের সহিত উহা গ্রহণ করিয়া নিজেদের পাকবস্ত্রের ক্ষতিসাধন না করিয়া বনস্পতির টিন কাটিয়া তিতরের মাল সোজাপুষ্টি আবর্জনা স্থানে ফেলিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত কাজ হইবে।...আমরা বিশ্বাস রাখি যে, আর সময় নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে এই ব্যবসায় বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।”

[হরিজন, ১৩ই এপ্রিল ১৯৪৭]

“জনসাধারণকে বিজ্ঞাস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বনস্পতি উৎপাদনকারীরা বহু খরচ করিয়া ব্যাপক প্রচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাহারা বনস্পতিকে মার্গারিণের সহিত তুলনা করিতেছে। এ তুলনা চলিতে পারে না। ফলে পেয়া তুলার বীজের বা চীনা বাদামের তেলে বনস্পতি প্রস্তুত হয়, মার্গারিণ সব সময় এরূপ নিকৃষ্ট তেলে প্রস্তুত হয় না। সাধারণতঃ ইহা কোমল জৈব চর্বি হইতে কিংবা জৈব চর্বি ও বীজ তৈল একত্র করিয়া তাহাতে দুগ্ধ মিশাইয়া একসঙ্গে মাখন করিয়া বরফে ঠাণ্ডা করা হয়। এই প্রণালীতে ‘দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত’ ভাবটা বজায় রাখা হয়। এই জৈব চর্বি হইতে প্রস্তুত মার্গারিণ যুরোপ ও আমেরিকায় বহু ব্যবহার করা হয় বলিয়া এবং বিচক্ষণ গবেষকগণ উহা যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া ইহা প্রমাণ হয় না যে, নিকৃষ্ট তৈল

হইতে উষ্ণ প্রণালীতে প্রস্তুত বনস্পতিরও এইরূপ পুষ্টিগুণ আছে।...কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্যবহারকারীরা ‘ডিফেন্স কন্স’ অহুসারে মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্ত ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া উৎপাদনের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিতে পারেন। আমাদের বিবেচনায় বনস্পতি উৎপাদকগণের কর্তব্য এই যে, যতদিন পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, যে ইহা মোটেই ক্ষতিকারী নয়, ততদিন পর্যন্ত বনস্পতি উৎপাদন বন্ধ রাখা।”

[বাংলা হরিজন ১৮ই মে, ১৯৪৭]

শ্রীমদ নারায়ণ আগরওয়ালা লিখছেন :

“কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই মহাত্মা গান্ধী হরিজন পত্রিকায় বনস্পতি ঘৃত বিক্রয়ের কঠোর নিন্দা করেন এবং উহার বিক্রয়কে জনসাধারণের উপর ঘোর কারসাজি বলিয়া অভিহিত করেন। বৈজ্ঞানিক দিক দিয়াও এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইয়াছে যে, বনস্পতি ঘৃত স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী।...এই সম্পর্কে গত বৎসর বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাংগালোর অধিবেশনে বনস্পতি ঘৃত সম্পর্কে যে বৈঠকী আলোচনা হইয়াছিল তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া ভাল।

“...এই ব্যবসাতে লিপ্ত শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ধনকুবেরদের চক্রান্ত বনস্পতি ঘৃতের সম্পর্কে অনেক খবর চাপিয়া রাখা হয়, কারণ, সে সব জানাজানি হইলে তাহাদের কারবারের লোকসান হইবে।...বোম্বাইয়ের ডাক্তার ডি. এন. পটবর্ধন এক বৈঠকী বক্তৃতায় বলেন যে... পরীক্ষাগারে দেখা গিয়েছে খাণ্ডে স্নেহ জাতীয় অপর কিছু না দিয়ে শুধু বনস্পতি ঘৃত দিয়ে ইহুর ছানাদলে মৃত্যু ঘটিতে থাকে এবং যে দু-একটি বাঁচে, তাহারাও ভালভাবে পুষ্ট হয় না।...অথচ এই বনস্পতি ঘৃত লোকের মধ্যে বিপজ্জনকভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে।...জনসাধারণকে শোষণ করিবার নিকৃষ্টতম পন্থাগুলির মধ্যে বনস্পতি ঘৃত চালানো অন্যতম। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া উহার বিক্রয় সীমাবদ্ধ করা কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর আন্তর্জাতিক কর্তব্য। এমনকি উদ্ভিজ্জ তৈলকে হাইড্রোজেনেশন করিবার পথই রদ করিয়া দেওয়া উচিত। বনস্পতি ঘৃত স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী



বৈজ্ঞানিক সত্যতা বনাম মানবিকতা :

বর্তমানের যে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার আমরা বড়াই করি তার নাকি ভিত্তি মানবিকতা, যার গালভরা গৌরবে শিক্ষিতজন মুখর এবং যাহা নাকি আজকের মানুষকে সভ্য করিয়াছে। বিজ্ঞানী সভ্যতা যেখানে চরম রূপ প্রকট করিয়াছে সেই মার্কিনী-মুস্কের কালোয়-খলায়ের নগ্ন হিংস্রতা, সিঙ্গাপুরের পীতাদ্রী মালয়ী-চীনার রক্তাক্ত সংঘর্ষ, ব্রিটিশ গিয়ানায় কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো-ভাবতীয়দের রেষাରେবি, সাইপ্রাসের খেতাব তুর্কী-গ্রীকের নির্লজ্জ হানাহানি বৈজ্ঞানিক সভ্যতারই ফলশ্রুতি। এই সভ্যতা ও তার তন্ত্র শান্তিবাদী বৌদ্ধধর্মীর দেশ চীন, বর্মা, সিংহল বুদ্ধের জন্মভূমির মানুষ ভারতবাসীকে উৎখাত করার তাণ্ডবলীলা জুড় করিয়াছে। স্বাধীনতার পর সারা দুনিয়া হইতে ভারতবাসীকে খেদাইয়া নিঃস্র করিয়া ভারতে ফিরাইয়া দিবার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। ইহাও বৈজ্ঞানিক গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রেরই উপহার। এই উপহাসকে

উদার ভারত সরকার নির্বাক হজম করিয়া এই সভ্যতারই জন্মধ্বনি দিতেছে।

এত দূর-দূরান্তের কথা না হয় নাই তুলিলাম। সম্প্রতি অর্থাৎ এই চলুতি বছরের গোড়ার দিকে একদা এই বঙ্গেরই অঙ্গদেশ পূর্ব পাকিস্তানে হিংস্র উন্নত মানুষেরই নৃশংস পশ্চাদম কুকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। সকল সভ্য দেশের চোখের সামনেই ইহা ঘটিল। সরকারী হিসাবে ইহারই ফলে গত ১লা জাম্মারী হইতে ৬ মাসে চার লক্ষাধিক নরনারী পথের ভিখারী হইয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে এবং এখনও এই আগমনেব শ্রোত সমানেই চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকা, সাধারণ পথের মানুষ হইতে নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সৈ-সময় এইসব সর্বহারার সম-বেদনায় যে উত্তেজনা, আক্রোশ, আক্ষালন দেখাইল তাহাতে সরল মানুষের মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল, বুঝিবা মানবতার ছুঁখে ইহাদের বুক ফাটিয়া যাইতেছে। সেই বাঙালী শরণার্থীর ছুঁখের এখনও ইতি হয় নাই, এখনও তাহারা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বাসহীন হইয়া হেথা-হোথা ঘুরিতেছে মরিতেছে, কিন্তু আজকের উত্তেজনাময় ভাষাভোলের বাজারে, ইহাদের কথা ইতিমধ্যেই আড়াই

সংবাদ পত্রে এই ধরনের ভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনগুলিও বন্ধ করিয়া দেওয়া চাই।...বনস্পতি ঘৃত প্রচারের মত সমাজদ্রোহী পাপকার্যের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনমত যেন কঠোর প্রতিবাদ করিতে পারে।”...

[বাংলা হরিজন, ২৩শে মার্চ ১৯৪৭]

১৯৪৭ সালে যে যে বস্তুর প্রস্তুতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই অভিমত হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, স্বাধীন ভারতের সতেরো বছরে সেই প্রক্রিয়া কিছু অদল বদল হয়েছে কি? যদি পূর্ব ব্যবস্থাই চালু থাকে তাহলে ভেজিটেব্ল ঘি়ের ক্ষতিকারিতাও যথারীতি বর্তমান আছে। আজ সরিষার তৈলের অভাবের সময় এই নকল ঘি সম্পর্কেও আমাদের সাবধান হওয়ার তাহলে প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশ, ভেজালের দেশ। পৃথিবীতে আর কোন সভ্যদেশে খাদ্যবস্তুতে

ভেজাল চলে না। বনস্পতি ঘি়ে ভেজাল দেওয়ার এক পাকাপাকি রীতি হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে বনস্পতি রং করে বাজারে বিক্রী করার কথা উঠেছিল, কিন্তু আজ অবধি তা কার্যকরী করা হয়নি। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছেন—প্রদেশে আছেন, কেন্দ্রেও আছেন, কিন্তু খাড়ে ভেজাল ও অখাদ্য প্রতিরোধ করার কোন কঠোরতা নেই। সর্ষের তেলে যেভাবে ভেজাল চলছে, এই ব্যাপার সোভিয়েত রুশিয়ায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইংলণ্ডে অথবা ফ্রান্সে ঘটলে, ভেজালদাতাদের অবস্থাটা কি হতো? ওই সব দেশের আদর্শেই তো আমরা সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও পলীমেন্টারিয়া-নিইজম্-এর কথা বলি, কিন্তু ওইসব দেশের শাসন-নীতির আদর্শবাদ থেকে আমরা কত পিছনে পড়ে আছি তা আজকের এই ভেজাল তন্ত্র দেখলেই কি তা বুঝা যায় না?

কোটি বাঙালী বেমালাম ভুলিয়াছে। ইহারই একটা নিখুঁত রূপ চিত্র আঁকিয়াছে মরমী 'কম্পাস' সম্পাদক। উচ্ছ্বাস নাই, আকোশ নাই। মস্তব্য এত মর্মস্পর্শী, এত দরদপূর্ণ এবং সক্রিয় মানবিকতাবোধময় যে পড়িলেই চিত্ত বিগলিত হয়, সমবেদনা হৃদয় উদ্বেলিত করে। আমরা এখানে 'কম্পাস'-এর সম্পূর্ণ সম্পাদকীয় ভাবনাটি উদ্ধৃত করিলাম।

॥ সর্বকালের শরণার্থী ॥

যত শরণার্থী এবারে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদিকে এসেছে তার শতকরা ৫৪ জনই নাকি বাংলার বাইরে যেতে প্রস্তুত নয়। ইতিমধ্যেই দণ্ডকারণ্য ও নানা ক্যাম্প থেকে অনেকে ফিরে এসেছে। হাওড়া স্টেশনে ও আশে-পাশে ভিড় জমাচ্ছে।

এই ভিড়ের প্রকৃতি অবশ্য শিয়ালদহের উদ্বাস্তুদের মত নয়। বছরের পর বছর ধরে যারা সেখানে পড়েছিল, তারা মহাশয়ের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, একটা নোংরা অবস্থার মধ্যে নিজেদের খাপ খাওয়াতে গিয়ে নিজেরাও নোংরা ভিক্ষুকে পরিণত হতে চলেছিল। ওরা অবশ্য এখন শিয়ালদহতে নেই—ওদের অন্তর্য সন্নিবেশ নিয়ে গেছে বিশ্ব গীর্জা পরিষদ। ওদের দায়িত্ব নেওয়া হবে না—যেহেতু তারা ক্যাম্প-পলাতক, এই বলে সরকার বছর দশেক পর্যন্ত ওদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত ওদের অস্তিত্বকে যখন স্বীকার করল, ওদের মহাশয়ের কতটুকু বাকী ছিল কে জানে! যেমন কলকতা থেকে খাটাল সন্নিবেশ দেওয়া হয়, তেমনি হযত ওদের নোংরাপট্টিকারী পশুজ্ঞানেই একদিন সন্নিবেশ দেওয়া হয়েছে—তাও বিদেশী পাত্রীদের সহায়তায় ও সাহায্যে।

হাওড়া স্টেশনে ও অন্তর্য আশ্রয় বেসব অভিভাবকহীন সত্ত্ব আগত দণ্ডকারণ্য শরণার্থীদের ভিড় জমাচ্ছে, তারা এখনও পশু হতে পারেনি। এক দেশ থেকে তাড়া খেয়ে তারা ভারতের আশ্রয় খুঁজতে এসেছিল—তারা তাদের জন্মজন্মান্তরের দেশ ভারতভূমিতে আশ্রয় পেতে এসেছিল, হিন্দুদের কাছে এসেছিল হিন্দুধর্ম রক্ষা করতে,

কিন্তু তাদের জন্ত এখানে ঠাই নেই, কেউ দেখবার নেই। উদাস বিষম তাদের দৃষ্টি, সে দৃষ্টি কোন হৃদয়বান লোক সহ করতে পারে না। কাজেই, তাদের কাছে কেউ যায় না, না পুলিশ, না সরকার, না কোন জন-সংস্থা। কোন জনসংস্থাও যেতে হয়ত সাহস পায় না, পাছে এই ক্যাম্প থেকে পলাতক শরণার্থীদের সাহায্য করলে উদ্ভানিদাতা হিসাবে অভিযুক্ত হতে হয়। চোখ ফিরিয়ে নিজেদের বিবেকবুদ্ধিকে ফাঁকি দিয়ে যে যার কাজে চলে যায়। কেউ একটা কথাও জিজ্ঞেস করে না, তারা এখন যাবে কোথায়।

শতকরা ৫৪টি শরণার্থী যেখানে যেতে চায় না, অথবা যেখানটা ছাড়াতে চায় না—পাঁচ লক্ষের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষই যেখানে বলে যে তাহার জন্ত যে-ব্যবস্থা করা হয়েছে তা অব্যবস্থা বই কিছু নয়—এই বিপুল সংখ্যক লোকের বক্তব্য ও ইচ্ছার কি কোন পুনর্বিচার হতে পারে না? সরকারের নীতিতে ভুল থাকতে পারে বলে সন্দেহ করার কোন অবকাশ থাকে না? যাদের তোমরা এদেশে বসাতে চাও, নতুন জীবনে আশ্রয় করতে চাও—তাদের মতামত-টাকে একদম অগ্রাহ করে তাদের বসানো চলে? তাদের ইচ্ছাটাকেও তৈরী করতে হবে তো? তাদের অপরাধী বলে এমন উপেক্ষা করা কেন? এরা কি জেলখানার কয়েদী? আজকাল জেলখানার কয়েদীদের জন্তও পঞ্চায়েৎ করা হয়েছে, তাদের মতামত ইচ্ছা-অনিচ্ছারও কিঞ্চিৎ মূল্য দেওয়া হয়। কিন্তু পাঁচ লক্ষ শরণার্থীর জেলের কয়েদীর অধিকারও থাকবে না! তাছাড়া মানুষকে তার স্বাধীন চিন্তা করার অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত করা হয়, তবে তারা এত পরনির্ভর ও অসহায় হয়ে পড়ে যে, তাদের নিজেদের উত্তম ও দায়িত্ববোধটাও নষ্ট হয়ে যায়।

এরা কি অপরাধ করে এসেছে? এরা কি ধনী, না চোর, না অসৎ, না পরিশ্রমবিমুখ কতকগুলি ভিক্ষু? এরা ওদেশে খেটে খেতো না? এদের অপরাধ এরা হিন্দু ছিল, এবং শত নির্যাতনের মধ্যেও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে চায়নি, তাই ভারতে ছুটে এসেছিল আয়ুবশাহী অবশ্য এদের মুসলমান বানাতো কোন চেষ্টা করেনি, কেননা হিন্দু থাকলেই ভারতের সঙ্গে

সংগ্রাম করতে তাদের সুবিধা হয়—সব মুসলমান হয়ে গেলে তাদের হাতের একটা অস্ত্র ফুরিয়ে যায়। কিন্তু এই সব পাকিস্তানী হিন্দুরা নিজেরাই নিজেরদের ধন-প্রাণ বাঁচাবার অস্ত্র হয়তো মুসলমান হয়েই যেতে পারত, কিন্তু তারা তা আজ্ঞা করেনি—কেন তা এদেশের হিন্দুরা একটু ভেবে দেখতে পারে।

যাঁরা হরদম চিংকার করে বেড়াতেন, ভারতের ছয়ার খুলে দাও, পাকিস্তানকে চাপ দাও যাতে সব হিন্দু চলে আসতে পারে—তারা আজ কোথায়? যে সব খবরের কাগজ প্রতিদিন ফলাও করে বীভৎসতার নগ্নমূর্তি প্রকাশ করত, হিন্দু শরণার্থীদের জন্ত বিনিদ্র রজনী কাটাতো বলে মনে হয়, সে সব খবরের কাগজ আজ নীরব কেন? মোট তো পাঁচ লক্ষ এসেছে—আরও নব্বুই লক্ষ আসবে কি? খবরের কাগজ কি বলে?

মনে হয় মিথ্যে আমাদের শোক, মিথ্যে আমাদের দরদ। আমরা সত্যই কারও ক্ষেপে কাঁদি না, সত্যই রাগ করতেও পারি না। মুসলমানকে ঠেঙালেই মনে করি হিন্দুকেই ভালবাসি, অথবা হিন্দুকে ঠেঙালেই মনে করি মুসলমানকে ভালবাসি। আমরা ঘেঁষ সিংসাতাকেই মনে করি ভালবাসি। আমরা হিন্দুকে রক্ষা করার নামে তাদের বিপদে ফেলি মাজ, যেমন পাকিস্তান মুসলমানকে রক্ষার নামে এদেশের মুসলমানদের বিপদে ফেলে মাজ। আমাদের তাবালুতা এত কপট, এত হাঙ্কা যে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

আমাদের কপট সহানুভূতির আরও একটু নমুনা হলো এই যে, সমাজ ও দেশের দায়িত্ব সবটাই সরকারের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। সমাজতন্ত্রের যুগ যে! কাজেই, সরকারই তো সব করবে, জনসাধারণের কারো কিছু করার নেই—সরকারকে দায়িত্বটা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া। জনসাধারণ অবশ্য আমাদের দেশে আজ নিজেরাই জীবন সংগ্রামে ক্রান্ত—কারো হাতে উদ্ধৃত্ত বিশেষ কিছু নেই। তা হলেও জনসাধারণ কি কিছুই দিতে পারে না, কোন প্রকারে এতটুকু সাহায্যও করতে পারে না, একদিন সিনেমাতে না গিয়ে সে-পয়সাটাও দিতে পারে না, একটাও চ্যারিটি শো করতে পারে না? এতে অবশ্য

বিরাট বিপুল শরণার্থীদের স্তমন কোন সাহায্য হয় না, কিন্তু আমরা আমাদের অন্তরের সত্যিকার দরদটা কার্যতঃ প্রকাশ করে আমাদের নিজেরদের মহানুভূতাও প্রমাণ করতে পারি।

আর এ পোড়া দেশেও যথেষ্ট ধনী আছে, এবং তাদের ধনবল-জমিজায়গা-বুদ্ধি কোন কিছুই অভাব নেই, তারা কি কিছুই করতে পারে না? কাজকর্ম সৃষ্টি করতে, কিছু লোকের দায়িত্ব নিতে পারে না? প্রত্যেক গ্রাম কি হু'চারটি উদ্বাস্ত পরিবারের জন্তও স্থান করে দিতে পারে না? জোতদারেরা কি পোড়ো জমিগুলিও ছেড়ে দিতে পারে না?

ব্যক্তিগত সব দায়িত্ব সব দয়াধর্মবোধ থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেয়েছি—ধন্য আমাদের সমাজতন্ত্র—ধন্য আমাদের ধর্ম—ধন্য আমাদের ঈশ্বর। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও কি ব্যক্তিগত কোন দায়িত্ব থাকে না নাকি?

আর, বিশাল বৃহৎ পুঞ্জির যারা মালিক তারা যদি এই জাতির দুর্দিনেও সাধারণের কোন সাহায্যে এগিয়ে না আসে তবে তাদের সম্পত্তির পক্ষে কোনও 'নৈতিক' সমর্থন থাকা সম্ভব? একটা জাতির চরম দুর্দিনেও তাদের বিলাসপ্রিয়তা ও নির্ভুর উদাসীনতার কি কঠিন মূল্য একদিন তাদের দিতে হবে, সে কথা কি তারা বোঝে?

হাওড়া স্টেশনে হু'চারজন শরণার্থীর কাছে ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভয় এই জন্য যে, নিজের তেতর একটা অপরাধ বোধ করছিলাম, মনে হচ্ছিল ওদের ধোঁকা দেবার জন্য যেন আমরা সবাই অপরাধী, অন্ততঃ ওদের প্রতি প্রাথমিক কর্তব্যটুকুও আমরা পালন করিনি। ভুল রাজনীতির শিকার ও বলিদান এরা, এর জন্যেও আমরা অপরাধী। জিজ্ঞেস করলাম, এবারে কী করবে, কোথায় যাবে? কিছু বলতে পারে না। "হয়ত দেশেই ফিরে যাব, কর্তা," বললে একজন—"তবে ছুটি সন্তান এখানেই হারিয়ে গেলাম—বাকীটাকে যদি শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।" দেখলাম মেয়েরা এ কথায় এখনও সাড়া দিতে পারছে না, তাদের বুকের আতঙ্ক এখনও থেমে যায় নি। কেউ বলল—এখানেই মরব, আর

ফিরব না। জিজ্ঞেস করলেম, তোমাদের কেউ উষ্মে দিয়েছে সরকারী ক্যাম্প থেকে ফিরে আসতে? বললে, “বাবু, আমাদের কাছেও কেউ খেঁবেনা, কোন কথাও জিজ্ঞেস করে না।”

‘পরের দিন গিয়ে দেখি স্টেশনের মধ্যে কেউ নেই, বাইরে যে যেখানে পারে দলে দলে বসে আছে—এক গ্রামের লোক এক এক জায়গায় ডিড় করে—টিক আতঙ্কিত পশুযুগের মত—শূন্যদৃষ্টি, শীর্ণকায়, উদাস।

ফেরার পথে একদলকে দেখলাম মহাত্মা গান্ধী রোড দিয়ে (মহাত্মাজীর পথই বটে!) শিবালদহের দিকে চলেছে—লাইন দিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে। তারা কোথায় চলেছে? “শিবালদহে তো যাই।” বেশি কথা বলতে চায় না। আজ কারও কাছে ওদের বলবার কিছু নেই। ওরা—অন্ততঃ ঐ সস্তর পঁচাত্তর জন নর-নারী ও শিশু চলেছে আবার পূর্বপাকিস্তানের দিকে। ওদেশ থেকে মার খেয়ে এসেছিল, প্রাণ ও ইজ্জৎ রক্ষা করার জন্য। এদেশ থেকে আমাদের নির্মমতার ও উদাসীনতার মার খেয়ে আবার ফিরে চলেছে। ওদেশে গিয়ে ওরা ওদের চরম পরাজয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে হযতো, আর পাকিস্তানের কাছে তাদের নিজেদের পালিয়ে আসার অপরাধের জন্য কঠিন মূল্য দেবে। সে মূল্য কত? ভারত অথবা হিন্দুস্থানের জন্য কতটুকু শ্রদ্ধা বজায় থাকবে—আর কতটা ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাদের হবে?

এখান থেকে যেসব মুসলমান আতঙ্কে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, তারাও একে একে ফিরছে—হযত একই ব্যবহার পেয়ে। হায়! আসা—যাওয়া! ছিল একটি দেশ, হলো দুটি—কিন্তু জাতি হ’ল তিনটি—তৃতীয়টি হ’ল যাদের কোন দেশ নেই—যারা এখন সর্বকালের শবণার্থী—দেশ খুঁজে বেড়ায়, পায় না—আত্মীয় খুঁজে বেড়ায়, পায় না—তাই খুঁজে বেড়ায়, পায় না—ধর্ম খুঁজে বেড়ায়, তা কোথাও দেখে না (কম্পাস : ১৩শ সংখ্যা ২৭।৬।৬৪)।

॥ নব দিগন্ত ॥

উদাস্ত সমস্তা একটা রাজনৈতিক সমস্তা ধরিয়। সেই দৃষ্টিকোণ হইতে গলাবাজী বা কলমবাজি এতদিন করা

হইয়াছে। ইহা নিছক কথার কথা থাকিয়া যায় যখন ইহা সাংবাদিকের বা নেতৃবৃন্দের পেশাগত প্রাত্যহিক কর্তব্য সম্পাদন মাত্র হয়। চোখা-চোখা উত্তেজক বাগাড়ম্বরের ভোজবাজি উপরিচরের সস্তা হাততালি বুড়াইতে পারে, ভাসা-ভাসা মনের স্ফুটনস্বরূপ কারণ হইতে পারে, কিন্তু এই কথার মালা নিষ্ক্রিয় প্রাণকে সক্রিয় সজাগ করিতে পারে না, পারে না ব্যক্তির বেদনাবোধকেও সঞ্চার করিতে। মানুষের মূর্চ্ছিত সন্তাকে নাড়া দিয়া জাগাইতে পারে, মহৎ আদর্শ সিদ্ধির জন্ত উন্মাদ করিতে পারে, এমন আত্মভোলা উৎসর্গীকৃত দরদী নেতৃবৃন্দের অভাবই আজকের দিনের বড় ট্রেনেজি। অন্তর্ধাতু এত পত্র-পত্রিকা, এত নেতা, এত সচিত্র বাণী পরিবেশন সম্বন্ধে সমাজ-মানুষ এমন নিপ্রাণ, নিষ্ক্রিয়, চরিত্রবলহীন কেন? কেনই বা এমন ঔদাসীন্য, এত নির্ভুর নির্মমতা ও আত্মপরোভবতার অতলে তলাইয়া যাইতেছে! আজকের দিনে সর্বগ্রাসী অর্থ-গৃহতা ব্যক্তি, দল, সমষ্টির চিন্তা ও চেষ্টনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই হেতুই সবাই সবজাত হইয়াও ব্যক্তির ক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষের অভাব থাকিয়া যাইতেছে। ধর্ম, অর্থ, সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রেই এই ব্যক্তিগত চারিত্রিক ত্রুটি প্রবল ও স্পষ্ট। এই প্রশ্ন আজকের চিন্তাশীল ব্যক্তিমানেরই মনে জাগা স্বাভাবিক।

সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রবিষয়ক আলোচনা সভার উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞানের ভূমিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন : “বৈজ্ঞানিক বিচার জাহাজ হওয়াটাই বড় কথা নয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চয় অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ, বৈজ্ঞানিক মেজাজ ও বিজ্ঞানপ্রবণতার অধিকারী হওয়া আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।” ডঃ রাধাকৃষ্ণন আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে, “ভারত এবং আর যে সব দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সবে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, একমাত্র বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিচার মাধ্যমেই তাহাদের জীবন যাপনের মান উন্নীত হইতে পারে।”

রাষ্ট্রপতির এই মন্তব্য আংশিক সত্য। সত্যের সবখানি নহে। জীবন-যাপনের মানোন্নয়ন বলিতে শরীর ধারণের

অর্থাৎ জৈব প্রয়োজনের চরিতার্থতাই বুঝায় তাহা আমরা মনে করি না। অস্তিত্ব: ভারতবর্ষ তার অর্থ, সমাজ, শিক্ষা; সংস্কৃতি, রাষ্ট্র প্রভৃতির ভাবনা ও বিজ্ঞানের মূলে ইহাকে মুখ্য স্থান কখনও দেয় নাই।

সাধক দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ ইহা ভালভাবেই জানেন। ইহা ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কথা—সাধক দার্শনিক রাধাকৃষ্ণাণের নহে।

মানব প্রকৃতির দিব্য রূপান্তরের পরম লক্ষ্যে সমাজ-মাহুষের জন্মগত পশুধর্মের অন্তত: মনুষ্যত্বে উজ্জীবন-আত্মকূল্যমূলক হওয়া বাহ্যনীয় ব্যক্তি ও সমষ্টির চিন্তা-চেতনা, তার শিক্ষা, সমাজ, অর্থ, সমাজতন্ত্র সব-কিছুই। জীবন-ধারণের জন্য গ্রাসাচ্ছাদন পশু ও মানুষ উভয়েরই প্রাথমিক প্রয়োজন। কিন্তু মাহুষের জীবনযাপনের প্রণালীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার এই জন্য যে, তার জন্মগত পশুধর্মের স্বভাব-সংস্কারকে সাধনা ও সংযমের দ্বারা মনুষ্যত্বে উন্নীত করিতে হয়। জীবনের চরিতার্থতা-মূলক এই বৃহৎ ঋতময় লক্ষ্যটি সমাজের সামনে না থাকিলে একান্ত ভোগ্যবস্তু-সচেতনতা তথা অর্থ-গুরুত্ব সমাজকে হিংস্র স্বাণদসকুল অরণ্যের চেয়েও যে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলে তা আজকের ভারতের কদর্য চেহারা দেখিলেই বুঝা যায়। যে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার আমরা গর্ব করি তার উন্নতির চরম শীর্ষে পৌঁছিয়াও আজকের সভ্যজগতে মাহুষের প্রতি মাহুষের, জাতির প্রতি জাতির অ-মাহুষিক ব্যবহার, শোষণ আর পীড়ন দেখিলেই উহার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও ক্রটি ধরা পড়ে।

মাহুষের-স্বথ, শান্তি, বাঁচা ও বাড়ার নিরাপত্তা ও জীবনযাপনের নিশ্চিততার ভরসা যে ভুলে বা বাদে যত অধিক সেই ততই তত বেশী জনপ্রিয় ও সমাদরণীয়। কেবলমাত্র গগনচারী আদর্শ হিসাবে কোন তত্ত্বই সকল হইতে পারে না। আদর্শ ও বাস্তবের স্পর্শ সামঞ্জস্য ও মিলনই মর্ত্য-মাহুষের কল্যাণের হেতু হইতে পারে। তন্ত্রধারক ও বাহকের ব্যক্তিগত বোধ ও প্রকৃতির উপর তন্ত্রের সফল-কফল নির্ভর করে। কেবলমাত্র প্রবৃত্তির পরিমণ্ডলে অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য আসিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্ব স্পষ্ট ও পুষ্ট হইতে পারে না। ভারতবর্ষ তাই বস্ত্র ও বাস্তবকে ভৌম আদর্শের আহুগত্যে আনিয়া ইহার বিষদাতটি ডাকিয়াছে। অর্থাৎ বুদ্ধিগত বৈজ্ঞানিকতাকে হৃদগত করিয়াছে। হৃদয়ের ধর্ম বোধ, বেদনা, চেতনা এক কথায় প্রেম। প্রেমের জন্ম একান্তবোধে—শুধু মাহুষের সহিত নয়, স্বাভাব-জগদম সামগ্রিক সৃষ্টির সহিত ঐক্যবোধ। প্রেমই ধর্ম—যাহা ধারণ করিয়া আছে বিধৈক্য। ধর্ম নাই অথচ মাহুষে-মাহুষে, জাতিতে-জাতিতে প্রীতি আর ঐক্যবোধ আসিলে এমনটি হইতে পারে না। এই ধর্ম ভূমা ও ভূমির মিলন, মনুষ্যত্ব উজ্জীবনের রাজপথ। ইহা সার্বজনীন—নির্বিশেষে। ভারতবর্ষ এই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থ সংগঠন করিতে চাহিয়াছে—যাহা বিশ্বকে আলো আর অমৃতের দিশা দিতে পারে—অতীতে দিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও দিবে। বর্তমান একটা পর্যায় মাত্র। ভারতের এই মিশন সম্পর্কে ভারতবাসী সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হইলেই বর্তমানের অন্ধকারে আলোর পথ খুলিয়া যাইবে।

উৎসব অনুষ্ঠানে -

ইন্দ্র'র সান্দেপ

অপরিহার্য!

৮৬, আমহার্ট স্ট্রীট কলি: ২

ফোন - ৩৫-১৩৮৩

৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২

ফোন - ৩৪-২৫৩৩

শ্রীমদ্রাহা প্রভু বলেছেন—

“এই তো কহিলুঁ তক্তির দিগ্‌দরশন
ইহার স্বরূপ মনে করহ ভাবন।”

আত্মদান করুন

মহাপ্রভুর মহাহুযায়ী গীতার

ভক্তি ব্যাখ্যা

ভক্তিতারতী শ্রীবদ্ধিম সেনের

গীতা-মাধুরী—১২'০০ ও

জীবন-মুহুর্ত্যর সজ্জিশ্বলে—৩'০০

প্রকাশক : শ্রীরাইমোহন আচার্য্য

৭ ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা—৩

সহস্রাব্দ

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা—
ভক্তির আন্তরিকতা ভট্টাচার্য সম্পাদিত। প্রকাশক—
শ্রীমহাশয় ভট্টাচার্য। সি. আই. টি. বিল্ডিংস, জি ৩।
ফ্লটফার রোড, কলিকাতা-১৪। কলিকাতা বুক
হাউস, কলেজ স্কয়ারে প্রাপ্য। মূল্য: ছয় টাকা।

যতাবধি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রোক্তর যুগের জীবিত কবি-
গোষ্ঠীর অন্যতম। কিশোর বয়স থেকেই আরম্ভ করে' আজ পর্যন্ত
কবির অল্প কবিতা ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। সেগুলি হীরক খণ্ডের
মতো উজ্জ্বল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক,
ভক্তির আন্তরিকতা ভট্টাচার্য কবির বিভিন্ন সময়ের লেখা মাত্র একশতটি
নিরে এই কাব্য সংকলন করার রসিকসমাজের ধন্তবার্হ হইছেন।

কবি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ
প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। এই কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলি নির্বাচিত
করে' দেন শ্রবণ কবিতার রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব যতীন্দ্রপ্রসাদ
বাংলার পদাধীশ্বরের প্রাত্যহিক দুঃখ-বেদনার স্বাভাবিক প্রতিধ্বনি নিঃসৃত
উপলব্ধি লাভ করেছিলেন, কাব্যকে সার্থক করে' তুলেছিলেন অগভীর
মানব প্রেম। সমাজ-সচেতন কবি-মানসের জীবনদর্শন ছিল গভীর-
গতিকতা মুক্ত নিঃস্বপ্ন আত্মোপলব্ধির গভীর প্রত্যয়। কবির অল্প
কবিতার এই প্রত্যয়ের স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে, যেগুলি বাংলা সাহিত্যের
শুধু গৌরব নয়, সম্পদ।

মানুষ হিসাবে কবি শিশুর মতো সরল। অথচ তিনি অস্ত্রায়ের
বিরুদ্ধে রূপে ঠাঁড়তে, লাহিত, অপমানিত ও অবহেলিতের প্রতি
সহানুভূতি প্রকাশ করতে এতটুকু পিছপা হননি কোনো দিন। তাঁর
পূজারী মন শুধু পূজা কবেই কাণ্ড হয়নি, পূজার ছলে পূজাকে নামিয়ে
এনেছেন আত্মার আত্মীয়রূপে।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি কবি সত্যেন দত্তের
অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার ব্রত নিয়েছেন। ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষার
মধ্যে তাঁর কাব্য সাধনার একটি বিশেষ গতি-প্রকৃতি বাংলার ছন্দ

ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা ছন্দেব প্রাণধর্মের উৎস সন্ধান উৎসাহী
হয়ে "সংস্কৃত ছন্দের বাংলা রূপ" শীর্ষক প্রবন্ধে পাঁচাত্তর প্রকার বাংলা
ছন্দের নিদর্শন প্রবর্তক পত্রিকায় বেধে গেছেন, যা গবেষণার বিষয় বস্তু।

দেশ, সমাজ, মানুষ, পল্লী, প্রকৃতি প্রভৃতি নিয়ে বহু কবিতা
লিখেছেন কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ। তাঁর কবিতার হস্তরসেরও অপ্রতুলতা
নেই। তাঁর "বেচর", "রাষ্ট্র তন্ত্র" প্রভৃতি কবিতায় যে জেগে ও বসায়
আছে, তা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলন
বলতে যা বোঝায়, এই সংকলন গ্রন্থটি তাই। একমাত্র সংকলক
ডাঃ ভট্টাচার্য প্রশংসাহ। বাংলা কাব্যরসিক সমাজে গ্রন্থখানি সমাদৃত
হইবে বলিয়া প্রত্যয় করি।

ইন্দু গুপ্ত

কল্যাণ—('শ্রীকৃষ্ণবচনামৃত' বিশেষ সংখ্যা)।

সম্পাদক—হুম্মানপ্রসাদ পোদ্দার, চিন্ময়লাল গোস্বামী
এম. এ. গোরখপুর গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা
সংখ্যা—৬২২+১২। মূল্য: ৭.৫০ পঃ।

ভারত-সংস্কৃতি ও ধর্মপরিবেশনে হিন্দী কল্যাণ পত্রিকাখানির
তুলনা নাই। এই কল্যাণ বিগত সাঁইত্রিশ বৎসর একাধিক্রমে ভারত-
শাস্ত্রের অমৃত-সুধা পরিবেশন করিয়া আসিয়াছে। আটত্রিশ বৎসরের
সূচনা সংখ্যায় এই পত্রিকাটি শ্রীকৃষ্ণবচনামৃত লইয়া উপস্থিত। অভিনব
সহজ সরল প্রাঞ্জল হিন্দীতে অপূর্ব ভাবে মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-
প্রদর্শন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতকে মনন করিয়া
বে সুধা কল্যাণ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছে তাহার আবার
পাঠকবর্গকে কৃতকৃতার্থ কবিবে। মহাভারত, হরিবংশপুরাণ, পদ্মপুরাণ
গরুড়পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, গর্গসংহিতা, বোণবিশিষ্ট, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ
প্রভৃতি এই অমৃত ধারার উৎস। এক ও বহুবর্ণের বহুল চিত্র সমাবেশে
কল্যাণের এই বিশেষ সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণা মৌলিক

বঙ্গপথিক—(২য় সংস্করণ) চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মূল্য—৫০ পঃ। যুগসাহিত্য মন্দির। ৬, বেনিয়াপুকুর
লেন, কলিকাতা-১৪

'মরা কথার হাটে জ্যোত্স্না ব্যাক্ত শুনলে যে আনন্দ হয়—চুনীলাল
গঙ্গোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত আত্মাকে সে উল্লাস এনে দিয়েছে।'

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব ৮-৮৭ (নূতন তথ্য সংযোজনায় সমৃদ্ধ সংবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ);
অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র রায় ॥ বাংলা পড়ানোর নূতন পদ্ধতি ২-৫০; শিক্ষার ইতিবৃত্ত (স্কুলের ইতিবৃত্ত সিরিজ,
পশ্চিম খণ্ড) ৭-০০; সত্যনারায়ণ লাহিড়ী ॥ ক্রয়েড ও বর্তমান চিন্তাধারা ১-০০, বার্নার্ড'শ—১-৫০;
অধ্যাপক ফিডুসন বিশ্বাস ॥ ইতিহাস পড়ানো—৩-০৭ (ছোটদের ইতিহাস পড়ানোর দুই সমগ্রার সমগ্রা)।
অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর ॥ সাহিত্যিকী ২-০০ ॥ অধ্যাপক শ্যামপ্রসাদ আচার্য ভারতীয় অর্থনীতির সমগ্রা ৩

L. M. Mitra ॥ The Danes In Bengal 2-50; Guide to Precise Writing & Drafting
(2nd Ed.) 4-50; Prof. S. Bhattacharjee M. A. ॥ Society & Education 2-50.

প্রবর্তক পাবলিশার্স: ৬১, বিপিনবিহারী গান্ধী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সামগ্রিক

শ্রীচৈতন্য গবেষণা মন্দির :

মহানগরীর বৃক, দক্ষিণ কলিকাতার রাসবিহারী এভিনিউতে 'শ্রীচৈতন্য গবেষণা পরিষদ' প্রতিষ্ঠা মারাপুর গোড়ার মঠের প্রশংসনীয় কীর্তি। সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই মঠের শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীচৈতন্যধর্ম ও দর্শনের প্রচার ও প্রচাৰ করার জন্য গোড়ার মঠ চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এদিক দিয়া গোড়ার মঠ এ-মুগে গোড়ার বৈকব ধর্মের জন্য চিহ্নিত মনে হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। সামগ্রিক বিশ্ব মানুষের সর্বাঙ্গিক উজ্জীবন শ্রীচৈতন্যের ধর্মের মধ্যে নিহিত। গত ২২-এ জুন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন। পরিষদের সভাপতি জিহ্মী স্বামী ভক্তিবিনোদ তীর্থ মহারাজ রাষ্ট্রপতি ও উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রমুখ অনেক গণমান্য ব্যক্তি এই উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি ১০ মিনিট স্থলে প্রায় ২০ মিনিট ভাষণ দেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের মূল মর্ম ছিল : 'সামগ্রিক বিশ্ববিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের বিবর্তন, যুগ-যুগে সত্যের আবিস্কার ও প্রয়োগ, বিজ্ঞান বর্জিত ধর্ম হইতে পারে না ইত্যাদি।' রাষ্ট্রপতির ভাষণ একটু অপ্রাসঙ্গিক ও রাসনীতি-বোঁধা মনে হইল। যুগ-যুগে অচাৰ এবং আচরণের কিছু পার্থক্য হইলেও, শ্রীচৈতন্যধর্মের মর্ম প্রেমভক্তি চিরকালের অপরিবর্তনীয় সত্য ও সনাতন এবং সকল ধর্মেই বিনিয়াদ। বিবৈক্য ও বিষণ্ণতায় ইহা ভিত্তি অনিশ্চিত।

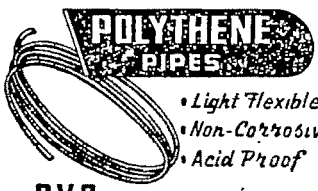
ডক্টর বতীন্দ্রবিমল চৌধুরী :

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় সংস্কৃত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ডঃ বতীন্দ্র-বিমল চৌধুরীর আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পরলোকগমন অত্যন্ত সন্দ্বিগ্ন ও দুঃখের। এ ক্ষেত্রে ডঃ চৌধুরীর অসুখের কারণ হইল তাহা ভাবিলে নৈরাশ্র্যই জাগে। সংস্কৃত ভাষা প্রচারের দিক দিয়া

ডঃ চৌধুরীর অনাবিল আন্তরিকতা ও অবিচল প্রেমের আর ইহানীকালে তুলনা মিলে না। সংস্কৃতকে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সর্ব আন্দোলন তিনি করেন নাই, কিন্তু তিনি নীরবে ইহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া যাইতেছিলেন। এমন তপস্বীর মৃত্যুও দেখা বাধে না। গত ১০ই জুলাই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সংস্কৃত বিষয়ে বক্তৃতা দিতে দিতেই অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেহরক্ষা করেন। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মহাজাতি সদনে ১৪ই জুলাই এক সম্ভার আয়োজন করেন এবং আমন্ত্রণ পত্রাদিও বিলি করেন। কিন্তু কাজটি আর তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না। যৌবনে বিলাতের শিক্ষা সমাপন করিয়া বাংলার প্রত্যাগমন করার পর হইতে ডঃ চৌধুরী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি, প্রসার ও প্রচারে আত্মনিবেশ করেন এবং ব্রত হিসাবে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই মহৎ সঙ্কল্পই সাধন করিয়া গিয়াছেন। মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তাঁর পরলোক গমন দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। 'বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদ' ও 'প্রাচ্যবাহী মন্দির' ডঃ চৌধুরীর অমর কীর্তি। স্বামী-স্ত্রী ডঃ চৌধুরী ও ডঃ বমা চৌধুরীর মরিকাক্ষন সংযোগ এই প্রতিষ্ঠানকে ভারতে জনপ্রিয় করিয়া তুলে। উভয়ে মিলিয়া বহু প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদন ও পুনর্মুদ্রণ এবং প্রায় ৫০ বানি নতুন সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে ডঃ চৌধুরী ব্রত এমন নম্র, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, সংস্কৃতিপারায়ণ ব্যক্তি এ যুগে বিরল। প্রবর্তক পত্রিকা তথা প্রবর্তক সম্বন্ধে এই শুভাকাঙ্ক্ষী অন্তঃকরণের অকাল প্রয়াণে আমরা আত্মীয় বিরোগ ব্যাধা অনুভব করিতেছি।

অভিযাত্রী সম্বন্ধের রূপকুণ্ড অভিযান :

শ্রীমুনীল চৌধুরীর নেতৃত্বে অভিযাত্রী সম্বন্ধে সাতজন সদস্য দুর্গম রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ডে সকল অভিযান কবিরাগত ওরা জুন কলিকাতার ফিরিয়াছেন। ১৮ হাজার ফিট উচ্চ হইলেও এই কুণ্ড দুইটি এতই দুর্ভাগ্যময় ও বিপদসঙ্কুল যে, ইতিপূর্বে অনেককেই প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। সপ্ত সংখ্যক মধ্যমিত বাঙালী ও রূপ—মুনীল চৌধুরী, বৈদ্যানাথ রক্ষিত, জ্যোতি পাল, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভাষ রায়—অত্যন্ত অগ্রচুর সাজসজ্জা ও রসদ লইয়া যে



**POLYTHENE
PIPES**

- Light Flexible
- Non-Corrosive
- Acid Proof

P.V.C. PIPES.



**'SANKHA'
COMBS**

- Durable
- Comfortable
- Economic

Purnima TOOTH BRUSH

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

ESTD. 1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO. 10813

॥ শ্রীবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ.
পি. আর. এস. ॥
শব্দার্থ তত্ত্ব ৫-০০ শব্দ তত্ত্ব ১৫-০০
জাতিভেদ ১ বেদ ও
কোরানের সাদৃশ্য ১
॥ পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ॥
শ্রীশ্রীনামানুত ২-২৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০
॥ কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥
পরার্থকথা ২-২৫

প্রবর্তক পাবলিশার : কলিকাতা-১২

হুমসাহসিক অভিব্যক্তির নজীর স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বাঙালী-মাত্রেই গর্ব অনুভব করিবে। ছাশের বিষয় বাংলার সংবাদপত্রসমূহ এ সম্পর্কে আশামুগ্ধরূপে যথাযোগ্য সংবাদ প্রথম-প্রথম প্রচার করেন নাই। অভিব্যক্তী দলের নেতা হুমীল চৌধুরী লেখক এবং সাহিত্যিক হিসাবে প্রবর্তক পাঠকদের নিকট পরিচিত।

পরলোকে ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত :

খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক এবং জনপ্রিয় অধ্যাপক ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত বিগত ২১শে জুলাই মঙ্গলবার বেলা ৩টার সময় তাঁর চার এভিয়ার বাড়ীতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর মাত্র ৫৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী, একমাত্র পুত্র অমিতাভ ও কন্যা সম্মতিদ্বীকে রাখিয়া গিয়াছেন। ১৯১২ সালে বরিশালের চন্দ্রহারগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হইতে বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

ডঃ অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ. ডি. ও পি. আর. এস ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ১৯৩১ সালে ইউনেস্কো আয়োজিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। ১৯৩২-এ ডঃ দাশগুপ্ত ভারতের শক্তিসাধনা ও শাস্ত্র সাহিত্য গ্রন্থ রচনার জন্ত বাংলা সাহিত্যে একাদমী পুরস্কার লাভ করেন।

ডঃ দাশগুপ্ত ছিলেন অনাড়ম্বর, নিরহঙ্কার। তাঁর সারল্য ও অস্বাভাবিকতার তুলনা নাই। বিদ্যা বিনয় দান করে, দাশগুপ্তকে দেখিলে তাহা বুঝা বাইত। প্রবর্তকের তিনি অমুরাণী হৃদয় ছিলেন। বদভাবা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়াও তাহার বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না। আত্ম প্রচারের যুগে আত্মপ্রচারবিমুগ্ধ লাজুক প্রকৃতির এই বিদগ্ধ অধ্যাপকের অকাল মৃত্যুতে বাংলাভাষার ও সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার মতে, এবং এই মানুষটির স্থান শূন্যই থাকিয়া বাইবে।

কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য :

মাত্র ৬০ বৎসর বয়সে কবি অপূর্বকৃষ্ণ গত ২৯-এ জুন তাঁহার কলিকাতা শোভাবাজারের বাসবাড়ীতে পরলোকগমন করেন। ২৪ পরগণা গোবরডাঙ্গা-গৈপুর্ন গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও চার কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ কবি হিসাবে তিনি সুবিদিত হইলেও, সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। 'প্রথম প্রণাম', 'উনিশে আবার', 'তৃতীয় মঙ্গ', 'নুতন বিমের কথা', 'ভয় নীড়', 'অন্তরীপ' প্রভৃতি ১৪ খানা গল্প-উপন্যাস গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মধুসূদন', 'দীপাবলি', 'নিরাশ্রয়', 'সাব্যস্তনী' প্রভৃতি পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদৃত। জ্যোতিষশাস্ত্রেও অপূর্ববাবুর বিশেষ দখল ছিল এবং এ বিষয়ে তিনি বহু লিখিয়াও গিয়াছেন। মন্দাকিনী হ্রদে অপূর্ববাবু বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রবর্তকের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। এখনও প্রবর্তকের দপ্তরে তাঁর অপ্রকাশিত কবিতা কবির স্মৃতি বহন করিয়া বিচক্ষমান।

পরলোকে ডাঃ আবু হাট :

ডাঃ আবু হাট বাংলাদেশে সহ শিক্ষার প্রবর্তক হিসাবে সুপরিচিত। তিনি ১৯০৮ সালে রশ্মনের অধ্যাপকরূপে অট্টল চার্চ কলেজে প্রথম যোগদান করেন এবং ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ঐ কলেজেরই প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। এ ছাড়া ১৯২৮ সাল হইতে তিনি আর তিন বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইয়াছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে ভারতকে ভালবাসিতেন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রকাশ্যে তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। এই মনবী ভারতবর্ষ ৮৭ বৎসর বয়সে কল্যাণের এক গ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্ম

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল, আলোমান ও হোসিয়ারী পোষাক বিক্রয়

রামকানাই শামিনীলুঙ্গন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা ফোন : ৩০-২৩০৩

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পবিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাক্‌টোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকমলেশ্বর দাস কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৯ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

প্রবন্ধ

ভাদ্র, ১৩৭১

জীবনের আলো

এ দেশ, এ জাতি মৃত্যুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। জীবনের উত্তাপটুকু রক্ষা করাই ভগ্নাত্ম। যদি এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়াও, অসংখ্য মৃত্যুকীটে তোমার সর্কাদ আচ্ছন্ন হবে, রক্ত চুষে খাবে। তাই অবিরাম ছুটে চল জীবনের স্রোতনায়—ঐ শোন বেদ বাণী—“চরৈবেতি।” উর্দ্ধলোকে তাকিয়ে দেখ—আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী সবাই ছুটে চলেছে অবিরাম গতিতে। গতিই জীবন। গতিহীনতাই মৃত্যু। তুমি কি স্বেচ্ছায় মরণের তুষারশীতল বাহুগুলের মধ্যে ধরা দেবে? না, মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের মত জীবনের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বলবে—“আমার প্রয়োজন আছে, আমার জীবনের দাবী আছে; সে প্রয়োজন আমিই সিদ্ধ করব। আমার দাবী আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেই পূর্ণ করব। আমি তাই সৃষ্টিশক্তির বিশ্বকর্মা। আমি পৃথিবীর বুকে হাঁটু গেড়ে ধন সঞ্চয় করব। আমার কণ্ঠে ভীম-ভৈরব নাদ—দাও ধন, দাও যশ, দাও জয়। এ চাওয়া করুণ মিনতি নয়; প্রার্থনা, নিবেদন নয়—দাবী, জীবনের দাবী।” কে উপেক্ষা করবে তোমার এই বস্তুতন্ত্র জীবনের দাবী? তুমি যদি এই দাবী নিয়ে মাথা তুলে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পার, বিশ্বের নরনারী সন্ন্যাসপের মত বুকে হেঁটে পৃথিবীর বুকে আর নড়াচড়া করবে না—মেরুদণ্ড খাড়া করে, উন্নত শিরে তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে। তখন প্রত্যেকের কণ্ঠেই উঠবে ভৈরব গর্জনে এই দাবীর মহারব। তুমি যে আছ, তোমার যে বস্তুতন্ত্র মুক্তি আছে; মুক্তিকা গর্ভে পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত তাহা অহুভব করবে। জীবনের দুর্কলতা পরিহার কর। ভীকৃত, অক্ষমতা অস্বীকার কর; যদি বেঁচেই থাকতে হয়, হিমাদ্রির মত বিপুল ভার নিয়ে বিপুল কলেবরে বিগ্ৰহমান থাক। জয়ের মহিম্ন সঙ্গীত তোলা। হও তুমি গৃহী, ব্রতী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী—কেহ পরমুখাপেক্ষী কাহারও হইও না। গৃহী ধন সঞ্চয় করবে, সন্ন্যাসী নহে—কেন? তোমার গর্ভ ও মহিমা তোমার নিজের হিসাবের উপর নির্ভর করে। অন্তের কটিপাথরে তোমার বিচার নয়। তুমি তোমার শ্রদ্ধার পূজার প্রতিমা। তুমি সর্কতোভাবে আত্মস্থ হয়ে ভগবানের জয় দাও। তোমার জয়ের কণ্ঠ বিশ্ব কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুলুক। হে বাংলার তরুণ, তোমরা জনে জনে বিশ্বকর্মা হও। আত্মজ্ঞানী, শক্তির পুরুষ হও। প্রেমে, ঐক্যে নবজাতি গঠন করে জগদীশ্বরের সৃষ্টি প্রেরণার মূল চাওয়াটি অহুভব কর। জীবনের আলোয় দশ দিক উদ্ভাসিত হোক।

সজ্ঞানুরু শ্রীমতিলাল

(১৯৩৫-এর দিনলিপি হইতে)

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । সপ্তত্রিংশৎ সূক্তং ।) ছাদশী ঋক্

(সঙ্ঘগুরু শ্রীমত্তিলালের জীবন-ভাষ্য অম্বসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

মরুতো যর্দ্ধ বো বলং জনাং অচূচ্যবীতন্

গিরীরচূচ্যবীতন্ ॥ ১২ ॥

অর্থ—“হে মরুতঃ” (হে মরুদেবগণ) “যং” (যে কারণ হেতু) “বঃ” (আপনাদের) “বলং” অস্তি (বল আছে) তস্মাৎএব “হ” (সেই কারণ বশতঃই) “জনাং” (প্রাণী জগৎকে) “অচূচ্যবীতন্” (পরিচালিত করেন) “গিরিঃ চ” (এবং মেঘ সমূহকে) “অচূচ্যবীতন্” (প্রেরণ করিয়া থাকেন) ॥ ১২ ॥

সরলার্থ—হে মরুদেবগণ ! যে বলে আপনারা বলীয়ান, মেঘসমূহও সেই বলেই বলীয়ান, সেই বলেই প্রাণী জগৎও পরিচালিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বিগদার্থ—এই ঋকে ঋষি বিজ্ঞান বাঁহার নাগাল পায় নাই, সেই পরমেশ্বর দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন—পৃথিবী সৃষ্টির স্থূল উপাদান কারণ যাহাই হউক—সবের পশ্চাতে একজন আছেন—যিনিই সবের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ । তিনি যদি না থাকিতেন ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ লোক, জল, বায়ু, অগ্নি, ব্যোম, কিছুই অস্তিত্ব থাকিত না । তারই অঙ্গুলি হেলনে সবকিছু শাসিত, পরিচালিত—সেই এক মহাশক্তি সূক্ষ্মাকারে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সবের মধ্যেই অমুখ্যত । যে শক্তিতে মরুদেবগণ শক্তিমান, সেই একই শক্তি দ্বারা আকাশের মেঘও “বিশ্বমেঘে” পরিণত হইয়া প্রাণী জগৎকে সৃষ্টি ও নিষ্পত্তি করিতেছে । সেই একই নিখিল বিশ্বের মালিক, তাই নিখিল বিশ্ব সেই একেরই শক্তিতে শক্তিমান—“একেষু নিখিল বিশ্ব মগন” ।

৫

ভারত জাতীয়তার ভিত্তি

“ভারতের জাতীয়তা রাষ্ট্রে নাই, শিক্ষায় সমাজে নাই—আছে বেদে । জাতির দুর্ভাগ্য যে, বেদ দুর্কোষ্য বলিয়া অবজ্ঞাত । বেদপাঠের অধিকারও ব্রাহ্মণের জাতির নাই । পতনের কারণ ইহার মধ্যেই নিহিত । জাতির ভিত্তি যদি বেদ হয়, তাহা হইতে জাতিকে বঞ্চিত রাখা কত বড় মূর্খতা, তাহা বুঝাইয়া বলার নয় । যদি আমরা বেদ বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকি, ভারতের মৌলিক জাতীয়তা হইতে ক্রমেই দূরে পড়িব । এইজন্য আমি ভারতের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই শুধু নয়, প্রতি নর-নারীকেই বলিব—নিষ্ঠার সহিত তপস্বীপুরুষ প্রত্যেকে বেদাধ্যয়ন কর । বেদের মধ্যেই এ জাতির ইতিহাস, বিজ্ঞান ও আত্মমুহূর্তির সঙ্কেত অসংবদ্ধভাবেই লিখিত আছে । এই বেদ হইতেই স্মৃতি ও ত্রায়ের উৎপত্তি—বেদকে লইয়া যাহা প্রামাণ্য নামে অভিহিত । আবার বেদের মধ্যেই সাধনার বিজ্ঞানও সুলিখিত হইয়াছে, এই হেতু ষড়দর্শনের এত সমাদর । জাতি যদি এই বৈদিক সংস্কৃতির উপর গড়িয়া না উঠে, তাহার অস্তিত্ব কোনদিন সম্ভবপর হইবে না” ।

সঙ্ঘগুরু শ্রীমত্তিলাল

৫

মহাভারতের বিহুর

শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ

“বিহুরের খুদকুড়ো”—এই কথাটিকে কেন্দ্র করে বাঙালী আমরা জেনে আসছি—মহাভারতের বিহুর ছিলেন পর্ণকুটিরবাসী, সত্যবাদী, ধর্মনিষ্ঠ এক সাধুপুরুষ। এই বিহুরকেই ভারতের অল্প অংশে, কাজে ও সাহিত্যে আরও ছোট ক’রে দেখানো হয়েছে। উত্তর-প্রদেশের মীরট জেলায়, গঙ্গার ধারে যে হস্তিনা, তারই কিছু দূরে বিহুরের এক আশ্রম তৈরী করেছেন ভাববিলাসী মানুষ। ঐ মানুষদের ধারণা এই-ই ছিল কুরুজাঙ্গল রাজ্যের রাজধানী হস্তিনা। রাজধানীর অদূরে, অরণ্যে বিহুরের আশ্রম ছিল—এই তাঁদের ধারণা। কল্পনার গড়া আশ্রমে ‘বিহুরের খুদকুড়ো’ রেখে সরল অল্প লোকদের ঠকানো হচ্ছে আজও। ধর্মের নামে অনেক কিছুই তো এদেশে হয়ে থাকে। আবার মধুবিলাস পুস্তকালয় থেকে যে মহাভারতখানি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মুদ্রিত একটি ছবিতে দেখা যায়, সাধু বিহুর মাটিতে ব’সে, পার্শ্বসারথি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ সেবা করছেন। এ-ছাড়াও পত্র-পত্রিকায় শিল্পীর বিকৃত কল্পনার নিদর্শন দৃষ্টিপথে এসে পড়ে। অকাল বোধনে রামচন্দ্র দুর্গাপূজা করলেন কি না, তা বাঙ্গালীকি রামায়ণ থেকে যাচাই না করেই শিক্ষিত সম্প্রদায় যেমন সীতাহারা রামের শারদোৎসব ব’লে দুর্গাপূজাকে নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, তেমনি তাঁরা চর্চিতচর্চণ করা বিহুরকে এনে দাঁড় করালেন অল্পপ্রায় দেশবাসীর বুদ্ধির সামনে। এমন ভুলের মাস্তুল যোগানোর ফলে সাহিত্য ও শিল্প যে হীনতার বরণ করেই চলেছে, দেশের পণ্ডিতমহলের চোখে কেন যে তা পড়ছে না, এ সত্যই আশ্চর্য তথা হুঃখের বিষয়। দেশ ও দেশের হিতার্থেই এসব ভুলকে আরও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়। অজ্ঞাত বাস্তব বিষয়ের মতই এবার আমাদের দেখতে হবে বিহুরেরও সত্যকারের রূপ কি।

অলৌকিকত্ব বাদ দিয়ে, বাস্তব দিক থেকে পর্যালোচনা করার সময় আমরা মহাভারতের আদি পর্বে পাই—“স যজ্ঞে বিহুরো নাম কুরুদৈপায়ণাশ্রজঃ। ধৃতরাষ্ট্রস্ত বৈ ভ্রাতা পাণ্ডোশ্চৈব মহাম্মনঃ।” (১০৬ অধ্যায়, ২৮ শ্লোক)।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর মত বিহুরও কুরুদৈপায়ণের আশ্রজঃ; বিহুর—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ভাই। কিন্তু বিহুর ‘পারসব’—“পারসবত্বাৎ বিহুরঃ”। শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণজাত সন্তানই—পারসব। মহাভারতে ‘কন্তা বিহুর’ পাঠও আছে। ধর্মশাস্ত্রে ‘প্রতিলোম সঙ্করকে’ ‘কন্তা’ বলা হলেও, মহাভারতকার ‘অম্ললোম সঙ্কর’ বিহুরকে ‘কন্তা’ আখ্যা দিয়েছেন।

মহামতি বিহুর সম্বন্ধে মহাভারতীয় তথ্য কী?—ভীষ্মদেব এই তিন ভাইকেই অপত্য-নির্বিশেষে মানুষ করেন। ধৃতরাষ্ট্র দেহবলে বিখ্যাত, পাণ্ডু ধর্মবিচাষ, পারদর্শী ও বিহুর ধর্ম এবং রাজনীতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু যেমন শাস্ত্রজ্ঞানও লাভ করেন, বিহুর তেমনি যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদও হয়েছিলেন। আদি-অনুক্রমণিকা পর্বে আছে—“বিস্তরং কুরুবংশস্ত গান্ধার্য্যা ধর্মশীলতাম। কন্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যাঃ সম্যগ্দ্দৈপায়ণোহব্রবীৎ॥” এখানে কন্তা-বিহুরের অসাধারণ প্রজ্ঞাই স্বীকৃত হ’ল। তখন বিহুরের মত বিদ্বান জিলোকে কেউ ছিলেন না। তিনি সর্বতত্ত্বজ্ঞ হওয়ায় গান্ধাররাজ সুবলের মেয়ে গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের ও মদ্ররাজের মেয়ে মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ দেবার ইচ্ছা হ’লে ভীষ্ম তাঁর মত জ্ঞানতে চেয়েছিলেন। পিতামহ ভীষ্মের মত মনীষী ব্যক্তি যখন বিহুরের সঙ্গে উক্ত বিষয়ে পরামর্শ করলেন, তখন বুঝতে হবে, বিহুর কত বড় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

ভীষ্মদেব বিহুরেরও বিবাহ দিলেন—রাজা দেবকের হুন্দরী পারসবী কন্তার সঙ্গে।—“অথ পারসবীং কন্তাং দেববাস্তু মহীপতেঃ। রূপধোবনসম্পন্নাং স শুশ্রাবাপগাঃ স্ততঃ॥ ততস্ত বরয়িত্বা তামানীয় ভরততর্ষতঃ। বিবাহং কারয়ামাস বিহুরস্ত মহাপতেঃ॥” (আদিপর্ব—১১৪ অধ্যায়)। রাজার রূপবতী তরুণী মেয়ের সঙ্গে মহামতি বিহুরের বিয়ে দিয়ে ভীষ্মদেব বধুকে হস্তিনায় নিয়ে এলেন, যেমন এনেছিলেন গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রীকে। বিহুরের সন্তানও ছিলেন—“তস্তাঙ্কোৎপাদয়ামাস বিহুরঃ কুরু-

নন্দনঃ। পুত্রান্ বিনয়সম্পন্নানাম্বনঃ সদৃশান্ শুণৈঃ ॥”—
আদিপর্ব—১১৪ অধ্যায়। পুত্রেরা পিতার যোগ্য পুত্রই
হয়েছিলেন। কিন্তু মহাভারতকার এই জ্ঞী ও সন্তানদের
কথা বেশী বলেন নি। তার প্রধান কারণই হয়তো ধর্মনিষ্ঠ
বিহুরের সংসার-নির্লিপ্ততা। অত্যাশ্চর্য বৃহৎ চরিত্রগুলি
বিকশিত করতে গিয়ে মহাভারতকার হারিয়ে ফেলে-
ছিলেন এঁদের, এ-ও হ'তে পারে। বধু উর্মিলাও তো
'কাব্যে উপেক্ষিত'।

দৈব-দুর্ঘটনায় পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যু হ'লে, শতশৃঙ্গ
পর্বতের ঋষিরা, চারণ ও গুহ্যবাদের সহায়তায়, মৃতদেহ
আনলেন হস্তিনাপুরে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তখন ঐ
মৃতদেহ সংকারের ভার দিলেন বিহুরকে—“পাণ্ডোর্বিহুর
সর্বাণি প্রেতকার্ধাণি কারষ। রাজ্যবদ্ রাজসিংহস্ত
মাত্রাশ্চাপি বিশেষতঃ ॥”—সম্ভবপর্ব, ১২৭ অধ্যায়।
শ্লোক ১।—‘রাজসিংহ পাণ্ডু ও মাদ্রীর সকল প্রেতকার্ধ
তুমিই কর, বিহুর।’—বিহুর পিতামহের সাহচর্যে
ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশমত কাজ করলেন।

কিন্তু এত গুণ থাকলেও, পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, বিহুর
রাজা হলেন না, রাজা হলেন ধৃতরাষ্ট্র, যদিও বিকলাঙ্গ
হওয়ায় তিনি রাজনীতি-শাস্ত্রমতে রাজা হবার অযোগ্য।
কেন বিহুর রাজা হলেন না? তিনি পারসব ছিলেন
এবং পারসবের রাজা হবার অধিকার ছিল না। সর্ব-
দোষমুক্ত পুরুষই রাজা হতে পারতেন। অন্ধ হওয়ায়
ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন বিকলাঙ্গ অর্থাৎ দোষযুক্ত; তাই পাণ্ডুর
জীবিতাবস্থায় তিনি রাজা হতে পারেন নি।

এখানেই বিহুরের কথা শেষ নয়। তিনি ছিলেন
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী—“বিদ্বান্ বিহুরং
মন্ত্রির্মুখ্যম্বাচেদং ধৃতরাষ্ট্রো নরেন্দ্রঃ ॥”—(সভাপর্ব,
অধ্যায় ৫৬, শ্লোক ২৩)।

সভাপর্বেই আছে—“ক্ষত্ৰা মন্ত্রী মহাপ্রাজ্ঞঃ স্থিতো
যশস্মি শাসনে। তেন সঙ্গম্য বেৎসামি কার্যসাম্ভ
বিনিশ্চয়ম্ ॥ স হি ধর্মং পুরস্কৃত্য দীর্ঘদর্শী পরং হিতম্।
উভয়োঃ পক্ষযোযুক্তং বক্ষ্যত্যর্থ-বিনিশ্চয়ম্ ॥”—অধ্যায়
৪৪, শ্লোক ৪৪।—মহাপ্রাজ্ঞ ক্ষত্রা মন্ত্রীর শাসনেই আমি
স্থিত; তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমি তোমার

(দুর্ঘোষণ) প্রস্তাবের যুক্তি বিবেচনা করবো। দীর্ঘদর্শী
বিহুর তাই বললেন, “যা ধর্মতঃ দু'পক্ষেরই হিতকর।”—
দুর্ঘোষণ পাশা খেলার প্রস্তাব করলে ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে এই
কথাই বলেছিলেন।

বিহুর নিজ বুদ্ধিবলে যাকে ধর্ম বলে স্বীকার ক'রে
নিয়েছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাকেই স্বীকৃতি
দিয়ে গেছেন। ধর্মনিষ্ঠ তিনি; তাই মন্ত্রিস্থের যুগকাঠে
বিবেককে বলি দেননি এবং সেইজন্তই ধৃতরাষ্ট্রের মুখ্য-
মন্ত্রী থাকলেও বিহুর পাণ্ডবদের কল্যাণ কামনা সর্বদা
করেছেন। কুন্তী প্রভৃতি সকলেই তাঁকে পরম শ্রদ্ধাপদ
ভেবে পরামর্শ চেয়েছেন; বিহুরও তাঁদের কল্যাণ-পথই
দেখিয়েছেন। বিহুরের শুভেচ্ছা সক্রিয় থাকাতোই বড়-
গৃহ দাহের ফলে পঞ্চ পাণ্ডবের মৃত্যু হয়নি। পঞ্চ পাণ্ডব
বিহুরকে পিতার মতই শ্রদ্ধা করতেন। পাণ্ডবদের এত
কল্যাণকামী হলেও বিহুর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বদাই
নিজের ছায়ায় রেখেছেন। এও যে এক ধর্ম। ধৃতরাষ্ট্রের
সঙ্গে তিনি বনেও গেলেন—পাণ্ডবদের কাতর আহ্বান
উপেক্ষা ক'রে। ধর্মপথে থেকে তিনি বিশ্বাসকে পোষণ
ক'রে গেছেন। এ এক দুর্কহ কাজ। অসাধারণ
পণ্ডিত ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন বলেই বিহুর তাঁর
জীবনের এই কঠোর ব্রত উদ্ঘাপন করতে পেরেছিলেন।
সভাপর্বেই ধৃতরাষ্ট্র দুর্ঘোষণকে বলেছেন—বিহুর
সাধারণ ব্যক্তি নন। দেবর্ষি বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে শাস্ত্র
শিখিয়েছেন সেই নীতিশাস্ত্রে বিহুরের সম্পূর্ণ অধিকার
আছে।...বাদবৃদের মধ্যে উদ্ভব যেমন, কুরুদের মধ্যে
বিহুরও তেমনি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

বংশের অকল্যাণকারী পুত্র দুর্ঘোষণকে ত্যাগ করার
কথা বিহুর বারবার জ্ঞানালে, ধৃতরাষ্ট্র জুঁক হয়ে বলেন—
“পৃথিবী ও শহর পালনের জন্ত আর আমি তোমার সাহায্য
চাই না। যাতে তোমার শ্রদ্ধা আছে, তুমি সেখানে
যাও ॥” অপমানিত বিহুর চলে গেলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।
বিহুর যেতেই ধৃতরাষ্ট্র নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন
হলেন। বিহুরশূন্য রাজসভায় প্রবেশকালে তিনি
জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফেরার পরই তিনি
সজয়কে বললেন,—বিহুর আমার ভাই, আমার বন্ধু—

সাক্ষাৎ ধর্ম—“ভাতা মম স্তব্ধচৈব সাক্ষাদ্ ধর্ম ইথাপর।” তার ব্যাখ্যা মনে হ’তে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তুমি আমার ধর্মজ্ঞ ভাইকে শীঘ্র নিয়ে এস—“তমানয়স্ব ধর্মজ্ঞঃ মম ভাতরমাস্তু বৈ।” আমার অপ্রিয় কাজ বিহুরকে খুবই আঘাত দিয়েছে; ঘৃণায় হয়তো তিনি আত্মহত্যাই করেছেন। যদি বেঁচে থাকেন, সঞ্জয়, তুমি তাঁকে নিয়ে এসো।—“গচ্ছ সঞ্জয় জানীহি ভাতরং বিহুরং মম। যদি জীবতি রোষণে ময়া পাপেন নিধুতঃ” (বনপর্ব, অধ্যায় ৬, শ্লোক ৮)।—“বিহুর না এলে আমি প্রাণত্যাগ করবো।”

সঞ্জয় কাম্যক বনে গেলেন, বললেন সবই বিহুরকে। বিহুর ফিরে এলেন। তিনি যে এক রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের সেবাই তাঁর মুখ্য কর্তব্য—রাজা তাঁর কাছে উপলক্ষ্য মাত্র। তা ছাড়া এও তিনি জানতেন যে, পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে অপমান করলেও, জন্মান্ন ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে স্নেহ করেন, সম্মান দেন।

বিহুর দরিদ্রও ছিলেন না। তিনি অসাধারণ ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, একথা সত্য; কিন্তু ছিলেন না তিনি পর্ণকুটিরবাসী সন্ন্যাসী। প্রধান মন্ত্রী থাকতেন প্রধান মন্ত্রীর মতই। রাজার মত বিদ্রোহীই ছিলেন বিহুর। মাদ্রীকে বিবাহ করবার একমাস পরে পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে

যান। বহু ধনরত্ন নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। সেই ধনরত্ন তিনি দিয়ে দিলেন—ভীষ্ম, সত্যবতী ও বিহুরকে। “ভীষ্মায় সত্যবতী চ মাত্রে চোপগহার সঃ। বিহুরায় চ বৈ পাণ্ডুঃ প্রেষয়ামাস তদ্বনম্॥” (সম্ভবপর্ব, অধ্যায় ১১৪)।

এই ধনরত্ন তো কম ছিল না। আবার বিহুর যথেষ্ট বিদ্রোহী ছিলেন বলেই শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বাড়িতে গেলেন, তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে সবরকম কল্যাণাহুষ্ঠান দ্বারা অভ্যর্থনা করলেন। পরে বিহুর খুব পবিত্র ও উত্তম অন্নপানীয় এনে অতিথি সংকার করেছিলেন।—“ততঃ ক্ষাতান্নপানানি শুচীনি গুণবন্তি চ। উপহারদনেকানি কেশবায় মহান্বনে। (উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৯১)।

কৃষ্ণ ভোজনান্তে ‘স্বসংস্পর্শ’ শয্যায় শুলেন।...“শয়নে স্পর্শশিষ্যে যত্নস্বখাবহঃ”। (অধ্যায় ৯৩)।

রাজৈশ্বর্যশালী লোকের পক্ষেই অতিথি সংকারের এরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর। পিতামহ ভীষ্মেরও যিনি পরামর্শদাতা, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের যিনি মুখ্যমন্ত্রী, রাজ-জামাতা যিনি, আমাদের উর্বর মস্তিষ্কের কাছ থেকে তিনিই পেলেন পর্ণকুটিরবাসী সাধু-সন্ন্যাসীর রূপ। শিল্পে ও সাহিত্যে এমন ভুলের চাষ-আবাদ আর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

শ্রীসত্যেন জানা

এস শ্রীকৃষ্ণ মুরারি, সন্তাপহারী, ভব-দুখ-ভয়ভাতা
এস পার্শ্ব-সারথি, পাণ্ডব-সাধী, রণে বরাত্তমদাতা!
এস স্তুদর্শনধারী, অরিন্দম-হরি, অম্বর-নিধন শক্তি
এস ভক্ত-পালক, জগত-কারক উচ্ছল পরা-ভক্তি।

এস করুণা-নিধান শ্রীরাধা ধোয়ান, হর্ব-মুখর চিহ্ন
এস ব্রজের রাধাল, যশোদা-হুলাল, মাতৃ-পরায়ণ বিদ্রু!
এস ননীচোরা-কাহ্ন—পায়ে ঝগুঝুহু—হুপূর ছন্দে হাসি
এস গোপী-মনোহারী যমুনাবিহারী ফুকারে শ্রামের বাশি!

এস বিহুর-কুটীরে স্তুদ চাহিবারে ভিখারীর রাজবেশে
এস অনন্ত, সৌম্য শাস্ত্র, শ্রামলিমা হাসি হেসে!
এস পতিত-পাবন, মুনি-ঋষি-ধ্যান সত্যম্ শিবম্ স্তম্ভরম্
এস নিগুণ-আনন্দ, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মব্যাগু জ্যোতি ওম্!

বাংলাভাষা প্রসারের অন্তরায়

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

গত ৩রা নবেম্বর জার্মান এমবাসির অধ্যাপক শ্রোয়েটার (Schroeter) সঙ্গীক আমার সিঁথির নব-নির্মিত বাসভবনে বেড়াতে এসেছিলেন। কার্তিক মাসে প্রস্তুত অস্ত্র গাঁদাফুল, টাইগার লিলি, দোলনচাঁপা, বৃহৎ পঞ্চমুখী জবা প্রভৃতি ফুল, গাছে বেগুন, মাচায় চালকুমড়ো, ধুঁধূল প্রভৃতি দেখে ওঁরা খুবই প্রীতিলভ করেন। ওঁদের আসার কথা জেনে বরানগর পৌর-সভার অধিকর্তা শ্রীযুক্ত তিনকড়ি যৈজ্ঞ মহাশয় পার্শ্ব অগম্য রাস্তাটিও সাময়িকভাবে গম্য করে দিয়েছিলেন। ছাত্রবন্ধু শ্রীমান জয়ীকেশ সরকার প্রফেসার Schroeter চালিত গাড়ীতে ওঁদের পথপ্রদর্শক হয়ে সিঁথিতে নিয়ে আসেন।

নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনার পর জানলাম ওঁরা উভয়েই বাংলাভাষা শেখার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। ওঁরা নাকি খাতার পর খাতা অ আ—ক খ ইত্যাদি লিখে চলেছেন কিন্তু বর্ণমালার এত অধিক সংখ্যক অক্ষর এবং ৷, ি, উ-কার ও কার ইত্যাদির ছড়াছড়ি এবং যুক্তাক্ষরের বহর দেখে হতাশ হয়ে পড়ছেন। ওঁদের এই কথা শুনে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তারই কিঞ্চিৎ আভাস এস্থলে দিতে চেষ্টা করছি।

আমরা ছাত্রাবস্থায় শুনেছিলাম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় রোমান হরফ প্রবর্তন করে বিদেশীদের জন্য বাংলা শেখার পথ সুগম করে দিতে চেষ্টা করছেন। অতঃপর এ বিষয়ে কতদূর অগ্রগতি হয়েছে তা আমার জানা নেই। আমার ত মনে হয় গোঁড়ামি বা সংস্কার একটু ফুল্ল করেও জ্ঞাত পরিবর্তনশীল জগতে রোমান হরফ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন। এতে করে যে শুধু বিদেশীরাই সহজে বাংলা শিখতে পারবে তাই নয় বরং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর-দেরও অনেক প্রশংসা হবে। আপাততঃ যদি নিতান্তই মন না মানে তবে পাশাপাশি উভয় হরফই চালু রাখা যেতে পারে। জার্মানদেরও পৃথক হরফ ছিল যদিও সংখ্যায় ২৬টিই তবু রোমান হরফ জার্মান হরফের মধ্যে

পার্শ্বক্য কম ছিল না—যেমন পার্শ্বক্য ওড়িয়া ও বাংলা হরফের মধ্যে বিস্তারিত। এখন জার্মানদের প্রায় সমুদয় পুস্তকই রোমান হরফে ছাপা হচ্ছে। এতে করে বিদেশীদের পক্ষে ঐ ভাষা শিক্ষা করা খানিকটা সহজ হবে পড়েছে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি সমান সাইজের হরফে লিখিত জার্মান ভাষার বইএর মধ্যে রোমান হরফে লিখিত বই তাড়াতাড়ি পড়া যায় এবং চোখের ক্লান্তি (strain)ও তাতে অনেক কম হয়।

জার্মানদের উচ্চারণ পদ্ধতিতে বাংলা শব্দ লিখলে ওদের পক্ষে পড়া খুব সুবিধার হবে। ওরা ঙ-কে বলে আ—ইংরেজদের মত অ্যা বলে না—কাজেই ওদের পক্ষে Baba (বাবা) Mama (মামা) বলা খুব সহজ। ০ মাঝখানে থাকলে অ এবং ০-এর পরে একটি মাত্রা consonant থাকলে উহা ওর মত উচ্চারিত হয়; একারণ Nobin (নবীন) Kolikata (কলিকাতা) ওরা অক্লেশে উচ্চারণ করতে পারে; Rom (রোম), Mon (মোন) ইত্যাদি। জার্মানেরা ট এবং ত উচ্চারণ করতে পারে। t যদি ট, t যদি ত ধরা যায় তবে tupi (টুপি) tumi (তুমি) ইত্যাদি ওরা নিতুল উচ্চারণ করবে। জার্মান u-এর সর্বদাই উ উচ্চারণ। সামান্য কয়েকটি হরফের প্রদর্শিত মত হেরফের করে নিলেই যথার্থ বাংলা উচ্চারণে বাধা হবে না। কয়েকজন ভাষাবিদ একত্রে বসে ইহা স্থির করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে মনে করি না।

কেবলমাত্র বিদেশীদের সুবিধার্থেই নয়, পরন্তু আমাদের দেশের অন্ততঃ উত্তর ভারতের বাংলা, ওড়িয়া, গুজরাটি, হিন্দী প্রভৃতি সমুদয় ভাষাই যদি রোমান হরফে লিখার প্রবর্তন করা যায় তবে আমাদের পরস্পরের ভাষা শিখতে আদৌ কোনও অসুবিধা হবে না—যেমন ওলন্দাজ বা সুইডিস্ ভাষা শিখতে ইংরেজ বা জার্মানদের এবং স্পেনীয় (Spanish) এবং বেলজিয়াম বা ইটালীয়ান ভাষা শিখতে ফরাসীদের আদৌ তেমন বেগ পেতে হয় না।

সাহিত্যসাধক শ্রীশুরেশচন্দ্র

ডঃ কমলকৃষ্ণ বসু, এম. এ., পিএইচ. ডি.

সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও প্রবন্ধকার; মাতৃতীর্থ, পূজার অর্থ্য, রাজা গণেশ, মহারাজা সীতারাম ও শক্তিমন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা; ভারত জননী, নমো নমো জন্মভূমি, বঙ্কিম-বন্দনা ও রক্তপূজায় পূজিব চরণ প্রভৃতি দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত রচয়িতা এবং নিখিল ভারতীয় দেবভাষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নীরবে ও নিভৃতে অক্লান্তভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে সাধনা করিয়া চলিয়াছেন তাহার কথা সম্যকরূপে প্রচারিত হইলে জাতির অশেষ কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত দিকপাল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু মনীষী এবং দেশের প্রথিতনামা বহু সংবাদ ও সাময়িক পত্র উচ্চকণ্ঠে তাঁহার লেখার প্রশংসা করিলেও, নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্ত তাঁহার পুস্তকাবলী জনসাধারণের মধ্যে সম্যক সমানর লাভ করে নাই। বঙ্গজননীর সন্ধান হইয়াও শুরেশচন্দ্র সুদীর্ঘ কর্মজীবন বিহার ও উত্তর প্রদেশে অতিবাহিত

করিয়াছেন এবং কর্ম হইতে অবসর লইবার পরও বাংলার বাহিরে ভাগলপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন; ফলে বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রের সহিত সম্যক সংযোগ রক্ষা সম্ভব না হওয়ায় তাঁহার কয়েকটি মুদ্রিত বড় গল্প ও বহু মুদ্রিত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই এবং কয়েকখানি উপন্যাস ও নাটক পাণ্ডুলিপি আকারেও রহিয়া গিয়াছে। বার্লকের নানা ব্যাধি ও ক্ষীণদৃষ্টির জন্ত আজ তিনি কর্মশক্তিও অনেকাংশে হারাষ্টয়াছেন, সুতরাং দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-প্রেমিক মনীষিগণের এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডগুলির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট না হইলে বাংলা সাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদগুলি সম্ভবতঃ চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াই যাইবে। পক্ষান্তরে তাঁহার এইসব গ্রন্থ ও কবিতাবলী সমগ্র বা আংশিকভাবেও পাঠ্যপুস্তক ও রেডিওর মধ্যে বিধৃত হইয়া থাকিলে নিশ্চয়ই দেশের বহু কল্যাণ সাধিত হইবে। তাঁহার মাতৃতীর্থ, রাজা গণেশ ও মহারাজা সীতারাম দেশের সর্বত্র পঠিত হওয়া উচিত, একথা বহু সংবাদ ও সাময়িক পত্রই

আমি নিজে ওড়িয়া ভাষার খবরের কাগজ ও কয়েকখানি বড় বই পড়েছি। বুঝতে কষ্ট নাই শুধু বর্ণমালা আয়ত্ত করতে যা অসুবিধা। অবশু হরফগুলির অবিকাংশই বাংলা হরফেরই মত—তফাতেব মধ্যে মাথার মাত্রা বা পাগড়ী অসম্ভব জটিল বা জড়ানো। ভাষা মোটের উপর একই, কাজেই একই রোমান বর্ণমালায় লিখিত হলে ওড়িয়া বই যে কোনও বাঙালী অক্লেশে বুঝতে পারবেন।

জাতীয় সরকার অশেষ প্রতিকূলতার সন্মুখীন হয়েও ওজন, মাপ ও টাকাপয়সার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি প্রচলন (weight, measure and coinage) সম্বন্ধে যে দূরদর্শিতা প্রদর্শন করে প্রত্যেক ভারতবাসীরই সত্যিকারের উপকার সাধন করেছেন—তাঁরা ঐরূপ

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে রোমান হরফ চালু করলে ভারতীয় ভাষাগুলি পরস্পরের শেখার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হবে এবং এই ভাষাগুলি আয়ত্ত করা বিদেশীদের পক্ষেও অত্যন্ত সহজসাধ্য হবে বলেই আমার স্চিহ্নিত হৃদয় অতিমত।

গত একশত বৎসরে অসংখ্য নম্র প্রতিভাধর বাঙালী মনীষীর একনিষ্ঠ সাধনায় বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য অবদানে বাংলাভাষা আজ পৃথিবীর অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেশবিদেশের বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অমূরত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন এই ভাষা শেখার জন্ত অগ্রহাস্থিত হয়ে উঠেছেন তখন প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সমীচীনতা সম্বন্ধে কোনও প্রগতিকামী বাঙালীর বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকার কথা নয় বলেই আমার একান্ত বিশ্বাস।

দৃঢ়কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন; এবং তাঁহার ভারতজননী, নমোনমো জন্মভূমি ও বঙ্কিম-বন্দনা প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি ইতিমধ্যেই ইংরাজী ও অষ্ট্রাভা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। স্মরণ্য এগুলি পাঠ্যরূপে যাহাতে গৃহীত হয় তাহার জ্ঞান চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুরেশচন্দ্র অর্থ বা যশের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া মনুষ্যত্ব-বর্দ্ধক শাস্ত্র সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে তাঁহার এই রচনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আজিকার এই দুর্দিনে তাঁহার রাজা গণেশ, মহারাজা সীতারাম ও দিল্লী-দলন নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলে দর্শকগণ কেবল বিস্ময় আনন্দই নহে, দেশপ্রেমের স্ফূর্তিতে অতিবিস্তৃত হইয়া হৃদয় ও মনের উৎকর্ষতা লাভও করিবেন।

সুরেশচন্দ্রের ‘পুষ্কার অর্থ’ গল্প পুস্তকের প্রত্যেকটি গল্প সহজ, সরল, সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। এগুলির পাঠে তৃপ্তি ও আনন্দে হৃদয়-মন পূর্ণ হইয়া উঠে। উদাহরণ স্বরূপ অমিয়কুমার, বিবাদ প্রতিমা, অপরাধিত, পল্লীবিরাগ ও সতীরাণী প্রভৃতি গল্পের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের সবগুলি বা যে কোন একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে। তাঁহার সমস্ত গল্প এবং সমগ্র মাতৃভূমি উপন্যাস এমনই নির্দোষ ও উচ্চভাবোদ্দীপক যে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী ও স্ত্রী, কল্যাণ সকলে একসঙ্গে বসিয়া এগুলি পাঠ করিতে পারে।

সুরেশচন্দ্রের ‘ভারতজননী’ গীতিকবিতা এবং উহার সংস্কৃত ও ইংরাজী অনুবাদ পাঠে মুগ্ধ হইয়া পাতনা ও রাঁচীর সুধীবর্গ তাঁহাকে সর্কাস্ত্র করণে অভিনন্দিত ও সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার ‘নমো নমো জন্মভূমি’ এবং ‘বঙ্কিম-বন্দনা’ প্রভৃতি কবিতাও অল্পরূপ সম্ভাবনাপূর্ণ ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়। তাঁহার অপ্রকাশিত বীরত্ব প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অষ্ট্রাভা গল্পগুলিও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে; দেশের কল্যাণের জন্তই তাঁহার সমগ্র রচনাবলী সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন একথা দৃঢ়কণ্ঠেই

আবার আমরা বলিব। দেশের সাহিত্যরসিক জনসাধারণের দৃষ্টিও এদিকে আমরা আকর্ষণ করি।

তাঁহার সমগ্র রচনাবলী সম্বন্ধে এক কথায় ইহাই আমরা বলিতে পারি যে, এগুলি চটুলতাপূর্ণ লঘু সাহিত্য নহে; সমাজ ও দেশের কল্যাণকর এবং সুরক্ষিতপূর্ণ ও বিস্ময় আনন্দরস-সম্বদ্ধ নানা বিষয়ের অবতারণা এই রচনাগুলির মধ্যে করিয়া সুরেশচন্দ্র বঙ্গসাহিত্য ও দেশের মহত্বপূর্ণ সাধন করিয়াছেন।

বাল্যকালেই তিনি বঙ্গভারতীর অর্চনায় ত্রুতী হইয়াছিলেন, আজ তিনি বার্ককো দৈহিক শক্তি হারািয়াও মনের বল হারান নাই এবং এখনও বাণী-অর্চনার পূর্ণ্য-ব্রত সমান উৎসাহে পালন করিয়া যাইতেছেন।

সুরেশচন্দ্রের রাজা গণেশ, মহারাজা সীতারাম ও দিল্লীদলন এই তিনখানি নাটকই ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া বিরচিত এবং গভীর স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক ও জাতি গঠনের সহায়ক। আজিকার দুর্দিনে এই নাটকগুলির অভিনয় বা কেবল আবৃত্তি ছাড়াও প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও স্বদেশপ্রেম দর্শক ও পাঠকের মনে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিবে। পাটনার কদমকুঁয়া নাট্যসমাজ ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে মহাসমারোহে রাজা গণেশ নাটক অভিনীত এবং নাট্যমঞ্চে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

‘শক্তি-মন্ত্র’ সুরেশচন্দ্রের ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তক; কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব ইহা অসাধারণ। সত্য ও নৈতিক বলের দ্বারা সিদ্ধ হয় না জগতে এমন কার্য নাই, ইহাই এই পুস্তকের মূল কথা। ইহার শেষ বাক্যটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। “অবিশ্বাস করিওনা, হে বিশ্বাসী, এই মন্ত্রেই তোমার সিদ্ধিলাভ অনিবার্য; ইহাই তোমার সাধনতত্ত্ব, ইহাই তোমার শক্তিমন্ত্র।”

সাহিত্য, দর্শন, সমাজ ও ইতিহাস সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্রের বহু মূল্যবান প্রবন্ধ দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত এবং নানা সাহিত্য সভায় পঠিত ও সমাদৃত হইয়াছে; এগুলি সুরক্ষিত ও দেশের সর্বত্র পঠিত হইলে দেশের নিশ্চিতই কল্যাণ হইবে।

দেবতা বা সংস্কৃতির মাধ্যমে ভারত-সংহতি সাধন



শিক্ষামণি

— শ্রী বীরাঙ্গন লোকে ধীর —

(পূর্বাহ্নবৃত্তি : শ্রাবণ, ১৩৭১ সংখ্যার পর)

দেবকুমার শুরু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। বিন্দন কয়েক পদ এগিয়ে এলো, বললো—বেশী কথা বলার অবকাশ নেই, গবাক্ষ থেকে তোমাকে দেখতে পেয়ে আমিই আনন্দকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম। তুমি এখন ক’দিন এখানেই থাকো। শিবরাত্রির রাতে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। পলায়নের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রাখবে। যদি অর্থ না থাকে এই আমার কঙ্কণটি রাখো, বেচে অর্থ সংগ্রহ করে নিও।

বা খণ্ড ভারতে মহাভারত প্রতিষ্ঠার ব্রত লইয়া স্মদীর্ঘ ৪২ বৎসর পূর্বে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি মুষ্টিমেয় কয়েকজন সঙ্গীকে লইয়া নিখিল ভারতীয় দেবভাষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অব্যবসায় ও দুর্জয় মনোবলের দ্বারা সিদ্ধির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই দেবভাষা পরিষদের ইতিহাস যেমনই ঘটনা-সমৃদ্ধ তেমনই বিস্ময়কর। একজন অতি সামান্ত মাহুষ হইয়াও তিনি ভারতের সর্ব প্রদেশের মনীষি-গণের বিশেষতঃ মহামনা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য,

বাম হাত থেকে একগাছি সোনার কাঁকণ বিন্দন খুলে ফেললো। বললো নাও।

দেবকুমার ইতস্ততঃ করে বললো—টাকা আমি জোগাড় করে নেবো।

—কোথায় জোগাড় করবে? এখানে কে তোমায় ধার দেবে? এ ছ-এক টাকার কাজ নয়—এই কাঁকন তুমি রাখো, উপযুক্ত মূল্যে বিক্রী করে টাকা রাখবে। শিবরাত্রির দিন সরে পড়ার কোন অসুবিধা যেন না হয়।

কঙ্কণটি দেবকুমারের হাতে গুঁজে দিয়ে বিন্দন বললো—আমি চললাম।

—কোথায় আছ?

—জানার চেষ্টা করো না, জীবন বিপন্ন হবে। শিবরাত্রির রাতে দেখা হবে।

—কোথায় দেখা হবে?

—সেখানে আনন্দ তোমাকে নিয়ে যাবে। ও সব জানে, ও আমার বিশেষ অঙ্গুত। অর্থ দিয়ে ওকে বশীভূত করেছি। যাক, আমি চলি—

খিড়কির দরজা দিয়ে ক্ষুরিতপদে বিন্দন বেরিয়ে গেল। দেবকুমার সেইদিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু দরজার মুখে আসতেই দেখা গেল, সামনে আনন্দ দাঁড়িয়ে আছে, হেসে বললো—কী, দেখা হলো?

—তুমি তো আগে আমার কিছু বলনি?

—দেখাই যখন হবে তখন বলার কি আছে?

—ও কোথায় থাকে?

—বলতে নিজেই আছে। আপনার যদি কোন সংবাদ থাকে তো বলবেন পৌঁছে দেবো, ছাবাবও নিয়ে আসবো।

শ্রী আর. এস. নারায়ণ স্বামী, শ্রী আনন্দশঙ্কর বাপুভাই ক্রব, স্বামী পূর্ণানন্দ, মহামহোপাধ্যায় হারানচন্দ্র শাস্ত্রী ও বিধুশেখর শাস্ত্রী, এবং প্রবর্তক সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী এই সব সাধনার মধ্যে যে গভীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা বর্তমান তাহা হইতে নবীন জাতি নিশ্চয়ই অশেষ অমুপ্রেরণা লাভ করিতে পারে। দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে এদিকে আকৃষ্ট হউক, একান্তভাবে এই কামনাই আমরা করি।

দেবকুমার আনন্দের মুখের পানে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো, কিছু বললো না।

আনন্দ দেবকুমারের মনের ভাবটা বুঝলো, বললো—জটিল কাজে মস্তস্তপ্তির দরকার আছে। এ রাজ্যে হারিয়ে-যাওয়া স্ত্রীকে ফিরে পাওয়া আজ সহজ কথা নয়। বাবা বিশ্বনাথের রূপা না হলে এমব হয় না। এখন যদি ভালয়-ভালয় বউ নিয়ে সরে পড়তে পারেন তো আপনি ভাগ্যবান। আগে থেকেই তাড়াহড়া করে একটা গোলযোগ পাকাবেন না। তবে যাবার দিন আমার বখশিশ্বের কথাটা ভুলবেন না, পুরো দশটি তংকা চাই। যথাসময় আমি সব ঠিক করে দেবো, এখন ক’দিন এখানে বিশ্রাম করুন।

আনন্দ বরাবর রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে গেল। কয়েকখানি চেলা কাঠ নিয়ে উনানে আগুন দেবার উদ্যোগ করল।

দেবকুমার বললো—গৃহে আর কেউ নেই?

আনন্দ বললো—মা আছেন, মন্দিরে গেছেন দ্বিপ্রহরের আগে ফিরবেন না। ততক্ষণে আপনার আহাতিদি শেষ হয়ে যাবে। আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন, স্বপাক করতে হবে।

—স্বপাক করতে হবে?

—হ্যাঁ, আমি তো বলেছি, আমি আপনার অঙ্গুল স্পর্শ করবো না।

—আমি তো বলছি আমি ও সব মানি নে।

—আমি যা অসম্মত মনে করি তা করি কেমন করে! আর সামান্য ভাত ফুটিয়ে নেওয়া তো কোন কঠিন কর্ম নয়, একবার হাঁড়ীটা উনানে চড়ানো আর একবার নামানো। এ নেহাৎ বালকেও পারে।

—কিন্তু এই সামান্য কাজটুকু আপনি করতে পারেন না?

—আমি যে অছুৎ! আমার ছোঁয়া অঙ্গুল তো আপনার চলবে না।

—চললে কি হবে? লাল রক্ত নীল হয়ে যাবে?

—কিসে কি হয় আমি কি জানি! পণ্ডিতেরা বিধান দিয়েছেন, সবাই মানে আমিও মানছি। আনন্দ হাসলো।

বললো—এখনি উঠুন জাঁচ লাগবে, আপনি আসুন, চাল ধুয়ে নিয়ে হাঁড়ীটা চাপিয়ে দিন।

আনন্দ ধুচনি করে চাল বের করে আনলো, কুশাতলায় ধুচনিটা বসিয়ে দিয়ে বললো—নিন।

দেবকুমার অপ্রসন্ন চিন্তে চাল ধুতে বসলো। জীবনে এই প্রথম সে স্বপাক রাখছে। পিতৃবিয়োগের পর গৃহে যখন একা ছিল তখনও কোনদিন তাকে নিজে রান্না করতে হয়নি, ছাতু চিঁড়ে কিনে খেয়েছে। পরে রুটি জুগিয়েছে নিরাল। কয়েকদিন পরে আজ নিরালাকে মনে পড়লো।

দেবকুমারের দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই, একটুখানিক বিশ্রাম করেই সে বেরিয়ে পড়লো। আনন্দকে বললো—নগরটি একবার ঘুরে দেখে আসি।

—কখন ফিরবেন?

—তৈরবের সঙ্গে দেখা করে আসবো। সন্ধ্যা হবে।

—ভাস্করের কাজের সন্ধানে যাচ্ছেন?

—দেখি এখনও কিছু ঠিক করিনি।

—সন্ধ্যার পর কিন্তু আমার আর পাবেন না। আমার জ্ঞান অপেক্ষা করবেন না। আমি সব জোগাড় রেখে যাবো, নিজে স্বপাক করে নেবেন।

—আপনার মা তো থাকবেন?

—তিনি যাবেন মন্দিরে কথকতা শুনতে...ফিরবেন এক প্রহর কাটিয়ে। আর আমার ফেরার বালাই নেই। আমার হাতে হাতে তাহুল ও তালরস যোগান দিয়ে যেতে হবে। বাবুবা যতক্ষণ না টলে পড়বেন, ততক্ষণ অবকাশ নেই। ভাল গান বাজনা জমলে কোন কোনদিন রাত তিন প্রহরও কেটে যায়। সেদিন আর ফিরি না, ওখানেই শুয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে শরীরে কুলায় না, তবে রাজা মহারাজার ব্যাপার—মাইনে যাই হোক, বখশিশ্ব পুষিয়ে যায়।

—গানের আসর বুঝি?

—হ্যাঁ, সামস্ত রাজা শঙ্করনাথের ঘরোয়া আসর। সেখানে আবার ছোট রাজা মাধবগুপ্ত প্রতিদিন উপস্থিত থাকেন। ছুজনেরই গান বাজনার বড় সখ। ভালো

গাইয়ে আর নাচিয়ে খবর পেলে আর রক্ষে নেই।
আসরে হাজির করবেই। সেনিক থেকে আশ মিটিয়ে
গান শুনেছি আর নাচ দেখেছি। এসব সুর তাল মানের
সামান্য ঘড়বড় হলেই কানে বাজে।

—কিন্তু কি ওইখানেই আছে? দেবকুমার কস
করে প্রশ্ন করে বসলো।

—কার কথা বলছেন?

—সকালে যে মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করে গেল।

—তিনি কোথায় আছেন, বলতে নিষেধ করেছেন।

আমি বিশ্বনাথের নামে অঙ্গীকার করেছি, বলতে পারবো
না। তবে আপনার যদি খবর থাকে তো বলুন, তার
কাছে পৌঁছে দেবো।

—না, আমার কোন খবর নেই বলে দেবকুমার
বেরিয়ে পড়ল।

বারোশত বছর আগেকার প্রথাগ। এখনকার মত
এতো জনবহুল না হলেও এখনকার প্রধান সড়কগুলি
তখনও ছিল। পথগুলি ছিল আরও প্রশস্ত। বাড়ীগুলি
এমন গায়ে-গায়ে ঘিঞ্জি ছিল না। অধিকাংশই একতলা
বাড়ী, কেউ কেউ দোতলাও করেছিল। বাড়ীর সামনে
অনেকখানি করে রোয়াক, চৌমাথা ও তার আশেপাশের
বাড়ীগুলিতে এই রোয়াকের উপরেই বিপনি সাজানো
হতো। উত্তর ভারতের সব জায়গায় সব রকম জিনিষই
তখন প্রয়াগের 'চক' পাওয়া যেতো। বারাণসীর
রেশম, গোড়ের কার্পাস, পঙ্কনদের পশম, মগধের বেলে
পাথর, নর্মদার ছুধ পাথর, কোশলের কাঠের খেলনা,
মথুরার প্রস্তরমূর্তি, মিথিলার হাতে লেখা রামায়ণ
মহাভারত সব কিছুই মিলতো প্রয়াগের চকবাজারে।
পাটলিপুত্রের গৌরব নষ্ট হবার পর থেকে বারাণসী ও
প্রয়াগের মর্যাদা বেড়েছে। সম্রাট প্রভাকর বর্ধনের
বলিষ্ঠ শাসনে প্রয়াগই এখন উত্তরাপথের সবসেরা
বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। মকরসংক্রান্তির মেলায়
সময় সমতট থেকে মাঝিরা নতুন নৌকা ভাসিয়ে আনে
সকলের ঘাটে বিক্রী করার জন্য। তখন গঙ্গার তীরে

হাতী ও ঘোড়ার হাট বসে, ছ' একটা বাঘের বাচ্চাও
দেখা যায়।

নগরটি গঙ্গার ধার দিয়া প্রায় এক যোজন বিস্তৃত।
দুর্গ তোরণ থেকে বারাণসী যাবার যে প্রশস্ত পথটি
বরাবর পূর্বমুখী চলে গেছে, নগর শেষে সেই পথের
দুপাশে কয়েকটি উদ্যান ভবন আছে। এই হৃদয় উদ্যান
ভবনগুলিতে ভিন্ন দেশাগত রাজ-অতিথিরা অবস্থান
করেন। তার পিছনে আছে রাজকীয় প্রমোদ কানন।
এই কাননটি এক ক্রোশ ব্যাপে আছে। মাঝে মাঝে
পরিখা দিয়ে ঘেরা জায়গায় হরিণ ও ময়ূর রাখা হয়েছে।
একপাশে মস্ত ক্রীড়াঙ্গন আছে, রাজপরিষদেরা কখনো
কখনো এখানে ঘোড়ায় চড়ে গণ্ডকী (গল্ফ) খেলেন।
একপাশে মল্লভূমিও আছে, মল্লক্রীড়া ও শক্তিসামর্থ্যের
পরিচয় সেখানে প্রদর্শিত হয়। সাধারণ প্রজাদের
সুবিধার জন্য ছ'পাশে মাটি দিয়ে ঢালু করে দেওয়া হয়েছে,
ঘাপে ঘাপে দর্শকেরা অনেকখানি উঁচু অবধি উঠে যেতে
পারেন। সেই টিলা ছুটির মাথাষ ছুটি মঞ্চ আছে
সেখান থেকে কেলা অবধি দেখা যায়। গঙ্গার পাশ
দিয়ে প্রমোদ উদ্যানের পুষ্পবীথির সারি দেখতে চমৎকার
লাগে। দেবকুমার নগর পরিক্রমা করে অপরাহ্ন বেলায়
এখানকার একটি টিলার উপর উঠে বসে থাকে। হু হু
করে বাতাস বহে যায়। দেবকুমার দিবা প্রশান্তি
অনুভব করে। নর্মদা তীরে ছুধ পাহাড়ের কথা মনে
ওঠে, কিন্তু যোগিনীঘাটের জনপদ এই প্রয়াগের তুলনায়
একেবারেই গণ্য নয়।

সূর্যাস্তের পর দেবকুমার নগরে ফিরে এলো। বরাবর
সঙ্গম ক্ষেত্রে এলো ভৈরবের শোঁজ করতে। এবার
ভৈরবের সঙ্গে দেখা হলো। ভৈরব যথানির্দিষ্ট একটি
বটগাছের তলে বসেছিলেন। বললেন—বোস্।

ভৈরবের সামনে আরো ক'জন বসেছিল, ভৈরব
খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তাদের পানে একবার
রক্তচক্ষু তুলে তাকালেন—তারপর ধূনী থেকে একখানি
জলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন—কি
দেখলি—যা—

জলন্ত কাঠের বাড়ি খাবার ভয়ে যারা দাঁড়িয়েছিল,

তারা তাড়াতাড়ি সরে গেল। ভৈরব কাঠখানি ধুনিতে রেখে আবার চূপ করে বসলেন। এবার দেবকুমারকে একা পেয়ে বললেন—যুবরাজের সঙ্গে কাল আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। ফিরে আসতে বিলম্ব হবে। তুই ততদিন এখানে থেকে একটা কাজ কর, তোকে একটা কাজ দিবে যাবো।

কাজের কথাটা শোনার ক্ষণে দেবকুমার উন্মুখ হলো।

ভৈরব বললেন—দুর্গমন্দিরের মধ্যে বড় বড় কয়েকখানি পাথর আছে। ওই পাথর একখানি নিয়ে তুই এই কদিনে মহাকালের এক তাণ্ডবমূর্তি খোদাই কর। মূর্তি খোদাই করতে করতে মনের একাগ্রতা আসবে, সাধনার পথে খানিকটা এগিয়ে যাবি।

—দেবমূর্তি তো আমি কখনো খোদাই করিনি।

—তোর মধ্যে রয়েছে পূর্বজন্মের সংস্কার, তুই একাগ্রতা নিয়ে যে মূর্তি গড়বি তাই হবে। তোর মনটা বড় দুর্বল, চিন্তাস্থির করারও প্রয়োজন আগে। পিছিয়ে যাবি কেন, এ-জন্মে খানিকটা এগিয়ে যা। রমণীর উপর থেকে মন ভুলে নে, পরমাত্মার পানে লক্ষ্য রাখ। ভালবাসতে হয় তো ছোটকৈ ভালবাসবি কেন, বড়কৈ ভালবাস, একটি রমণীকে ধরবি কেন, যিনি জগতের সব রমণীকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে ধর।

ভৈরব দেবকুমারের মুখের পানে তাকালেন। দেবকুমারের মনে হলো সেই দৃষ্টি দিয়ে ভৈরব যেন তার অন্তর অবধি দেখে নিতে চাইছেন, সে শঙ্কিত হলো। তাড়াতাড়ি বললো—আপনি যখন আদেশ দিচ্ছেন তখন আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো।

—আবার ধিধা কেন? মানুষের সাধের কোন শেষ আছে? মানুষ একান্তভাবে যা চায় তাই করতে পারে, কায়মনোপ্রাণে যখন ডাকে তখন ভগবানকে নেমে আসতে হয় ভক্তের কাছে। যা করবি তাঁকে স্মরণ করে করবি, তিনিই শক্তি ষোগাবেন, তাঁর মহিমা তিনি প্রকাশ করবেন, তুই তো নিমিত্তমাত্র। সব কিছু নিজের করছিস বলে ভাবিস কেন? নে, চল, তোকে এখন সব বুঝিয়ে-

হুঝিয়ে দিয়ে আসি—কাল সকালে বোধ হয় আর সময় পাবো না।

ভৈরব উঠে পড়লেন।

সামনেই প্রতিষ্ঠান দুর্গপ্রাকারের একটি ছোট তোরণ। তার ভিতরে প্রবেশ করে এক পুষ্পোদ্ভানের মধ্যে কিছুটা গেলেই একটি দোতলা মন্দির। পাথরের মন্দির। নীচের তলে সারি সারি নানা পাথরের মূর্তি—নারদ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কপিল, কশ্যপ, জহ্নু, দধীচি, ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি যত মূর্তি। গর্ভগৃহ মধ্যে একটি বিরাট শিবলিঙ্গ। তারপর দোতলায় উঠে এলে, তিনপাশে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার প্রতিটি খিলানের নীচে এক একটি দেবমূর্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, গণেশ, কার্তিক, দুর্গা ইত্যাদি। গর্ভগৃহের মধ্যে মহেশ্বরের ধ্যানমূর্তি। সারি সারি বিয়ের পিদিম জ্বলছে, তাতে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। তবে যা দেখা যায়, তাতেই দেবকুমার বুঝতে পারে এখানকার স্তম্ভ ও খিলানের কারুকাজ খাজুরাপুরীর মত সুসমামণ্ডিত নয়।

সব দেখিয়ে শুনিয়ে ভৈরব বললেন—কয়েকটি খিলানের নীচে এখনও মূর্তি বসেনি ওখানে আমি কয়েকটা মহেশ্বরের মূর্তি বসাতে চাই। সব কটাই তুই করবি, এখন তাণ্ডব দিয়েই স্তম্ভ কর। তা তা ঐ ঐ তাণ্ডব নাচ, প্রলয়ের নৃত্য নাচে নটরাজ।

ভৈরব উল্লসিত ভাবে দেবকুমারের কাঁধে একটা কাঁকানি দিবে বললেন—কাল থেকে লেগে যা, ধিধা রাখিসনে, সিদ্ধি-মার্গে এগিয়ে যা—এ জন্ম ব্যর্থ হতে দিসনে। 'রমণীর মোহ থেকে মুক্ত হ', জগৎ-প্রপঞ্চকে কাটিয়ে ওঠ। সন্দেহ রাখিস্ নি, বিশ্বাস রাখ—মহেশ্বর তোঁর সহায়।

তারপর দেবকুমারের হাত ধরে ভৈরব মন্দিরের বাইরে উদ্ভানের একপাশে নিয়ে গেল, যেখানে অন্ধকারে কয়েক খণ্ড বড় বড় পাথর পড়ে আছে। ভৈরব বললো—এই তোঁর উপকরণ, এই অরূপ পাথরকে তুই জীবন্ত রূপ দিবি। এখানে বসেই তুই কাজ করবি, আমি সে ব্যবস্থা করে যাবো।

(ক্রমশঃ)

খেলার মাঠের স্মৃতি

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী

কাজ না করে কালক্ষয় করা কৈশোর হতে কচ্ছা বিজলীর আকস্মিক অন্তর্ধানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মনে করতে পারিনা যে এক মুহূর্তও বুধা কালহরণ ক'রবার দুর্ভাগ্য হয়েছে। চৌদ্দ বৎসর বয়সে আই-এফ-এ শীল্ড খেলিবার মত খেলি। এটা ঐতিহাসিক ঘটনা—বাঙালীর ইতিহাসের—এর জন্ম প্রস্তুতি, শ্রম ও ধৈর্য্যসাপেক্ষ। দশ বৎসর বয়সে অন্নগ্রহণের অহুমতি চিকিৎসকদের নিকট পেয়ে চৌদ্দ বৎসর বয়সে ক্রীড়াক্ষেত্রের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতায় সামর্থ্যের সহিত অংশ গ্রহণ করার প্রস্তুতি কথার কথা নয়। শুধু এই নয়, ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙালীর কুশলতা উত্তরোত্তর উন্নত করার তোড়জোড়ও হয় এরই সঙ্গে। ফলে এই দলের নেতাক্রমে গোলা ছুটাইয়া তা' রোধ করবার শক্তি কুলায়নি কলিকাতায় বা কলিকাতার বাহিরের কোনও দেশীয় শক্তিমানের। পরদেশী শক্তিমানেরাও হিম্‌সিম্‌ খায় ১৯০৮-এ, আর এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

খেলুড়াদের নিয়ে যখন আমি ক্রীড়াক্ষেত্রে, সেই সময়ে উপযূর্যপরি সংবাদ পৌছায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ফৈরাজ কর্মচারীদের তৃতীয় শ্রেণীর মেয়ে কামরায় পশুবৎ আচরণের। আবেদন নিবেদনের ধার দিয়াও বাই নাই আমরা কখনও। সরাসর রেল বড়-কর্তার নিকট উপস্থিত হ'য়ে বলি, পশুদের সাযেস্তা করবার শক্তি যদি তাঁর থাকে, বহু আচ্ছা। নতুবা সাযেস্তা করবার ভার আমাদের দেওয়া হ'ক, একমাসে সিধা ক'রে দেবার কৌশল আমরা জানি। সৌভাগ্য-বশতঃ কর্মকর্তা খেলার মাঠের দৌলতে ভাল ক'রেই জানতেন আমাদের। বললেন তিনি কি ক'রে ক'রবে তোমরা? বললাম তাঁকে আমাদের programme। শুনে তা' যাবপর নাই খুশী হয়ে ব'ললেন, I make necessary arrangement immediately. হাওড়া থেকে আসানসোল পর্যন্ত সব স্টেশন মাঠারদের যথাবিহিত নির্দেশ তিনি দিলেন।

পরদিন হ'তে খেলুড়াদের বারোজন ক'রে দল বেঁধে বিপজ্জনক প্রতি ট্রেনে ডিউটি দিতে শুরু ক'রল আপ্‌ ও ডাউন্‌ লাইনে। ফৈরাজ অপরাধীদের কেউ পুলিশ সোপর্দ হল, কেউ চাকরী খোয়ালে, কেউ দূর দূরান্ত স্টেশনে বদলী হ'ল। সত্যই একমাসের মধ্যে অবস্থার উন্নতি হল অভাবনীয় ভাবে, আর আমাদের ফৈরাজ দমন-পন্থা অবলম্বিত হ'ল রেলকর্তৃপক্ষ কর্তৃক। হ'ল এ রেবারেখি, বাকুবিত্তা কিছুমাত্র না ক'রে।

খেলার মাঠের একটা শোচনীয় নিম্নজ্জ ঘটনা। ক্যান্‌কাটা ক্লাবের পাশের মাঠে খেলত মহামেডন্‌ এথলেটিক ক্লাব। সেই মাঠে খেলা হচ্চে মহামেডনের মোহনবাগানের সঙ্গে। খেলতে খেলতে হয় ভীষণ কাণ্ড যার ফলে মোহনবাগানের শিবদাস প্রভৃতি প্রায় উলঙ্গ হ'য়ে পালিয়ে আসে আমাদের কাছে। এসে খবর দেয় শৈলেনবাবুকে (তাদের হাফ ব্যাক) মেরে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি বাই আমরা ঘটনাস্থলে। গিয়ে দেখি শৈলেন ব্যানার্জী মাঠে ভাসছেন যেন রক্তের ওপর। তাড়াতাড়ি ফিটন্‌ আনিয়ে তাঁকে হাসপাতালে পাঠাই। তখনও দলবদ্ধ গুণ্ডাদের কি খিস্তি বিখিস্তি!

ফিরে এসে ভাবছি, এবদ্ধ করবার উপায় কি? দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবেই বা কে আর করলে ফলই বা কি? ক'জনে পরামর্শ করে ঠিক হল, গুণ্ডাদের ভাতে মারতে হবে। তখন কোনও মাঠে গ্যালারী ছিল না। বড় উঁচু প্যাকিং বাক্স-এর ওপর দাঁড়িয়ে দর্শক মোটা টাকা দিবে খেলা দেখত। পরদিন সকলে দেখে সব মাঠের প্যাকিং বাক্সগুলো পুড়ে ছাই। তার স্থলে নতুন এলে তারও অবস্থা হল তাই। এর তিনদিনের মধ্যে এল মুর্শিদাবাদের নবাব প্রমুখ কয়েকজন পদস্থ ভদ্রলোক। এসে আমাদের বললে—এর একটা ব্যবস্থা করান। ব'ললাম, আমরা কি করে করাব, আমরা তা' কিছু জানি না। সকাতরে একজন বললে—আপনাদের Influence এ হ'তে পারে, কিছু দেখুন না। বললাম সস্তম

সহকারে—আচ্ছা তিনদিন বাদে দয়া করে আসবেন, দেখি কি করা যায়।

এলে বললাম, দেখুন চেয়ে চেয়ে যা বুঝলাম, স্বাভাবিক অবস্থায় সবকিছু আনতে হ'লে কঠোর হতে হবে, আপনাদের ও আমাদের সকলকে।—কি ? কি ? সাগ্রহ প্রশ্ন। উত্তরে ব'ললাম—Mohammedan Athelatic Club is to be disqualified for good from the I. F. A. and their play ground is to go out of their hands. The box walls may go on with their business provided each and everyone of them is recommended by respectable persons.

সর্গাবলী, সকলেই বললেন, খুব জায়সঙ্গত। আমরা কথা দিয়ে যাচ্ছি এর প্রত্যেকটি প্রতিপালিত হবেই হবে। মিটে গেল গোল। আমাদের সময়ে মাঠে কাটে সকলের স্বচ্ছন্দে। আমাদের চলে আসার পরে যা ঘটবে জানে তা' সকলেই।

আর একটা ঘটনা—ওই খেলার মাঠেই। কেবল থেকে গোরা পঙ্গপালের মত জড় হয়। তাদের জ্বালায় আর কারও খেলা দেখা দায়। বিনা কারণে মারে ছিপটি। হৈ হৈ ক'রে তেড়ে যায়। মহা মুন্সিল। আসানের উপায় পরামর্শ করে স্থির হল, প্রত্যেক দর্শক ছাতা রাখবে কাছে। গোরারা হৈ হৈ ক'রলেই প্রত্যেকে গুঁটাবে ছাতা। প্রতি-আক্রমণ গোরারা করলেই, পুলিশ আসতে বাধ্য। তাদের Arrest করবার এক্সার পুলিশের নেই। তবে তাদের এক্সার আছে গোরাদের ঘিরে কেবল March করে নিয়ে যাবার। হুবহু তাই ঘটল। দু'এক দিন এ ঘটতেই ফোর্টের হুকুম হল, তাদের Match থাকলে তেরজনের বেশী গোরা মাঠে যাবে না। এই ভাবে মাঠ হ'ল গোরাবর্জিত।

বিলেতে গিয়ে ছুঁগাপুজা করিয়েছি, ভাইফোঁটা,

সরস্বতী পূজা করিয়েছি, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকাতে পূজা-পার্কণ করিয়েছি। বিলাত থেকে ফিরে Bengal Ambulance কোরের গোড়াপত্তন করিয়েছি, Bengali Regiment করিয়েছি, নবভাবে বাদলা নববর্ষ করেছি। সেই আমি, বিজলীহারা হবে হয়েছি দিশেহারা। কল্যাণশোকাচ্ছন্ন সতী নিজের বুক পেতে দিয়ে আগলেছে শোকোন্মাদ স্বামীকে। 'বিজলী' রচনায় তন্ময় স্বামীকে চ'খের আড়াল করেনি। হিতবাদী, প্রবর্তক প্রভৃতি স্বামীর কাছে আসাতে ও তাদের সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি স্বামীর দেওয়াতে সতী হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। বুখা কালক্রম করার হাত থেকে বেঁচেছি আমিও।

'বিজলী' লেখার পূর্বে বাংলা লেখার বার আমি ধারিনি—খেলুড়ে সাংবাদিক ও হিতবাদীর অহুকুল মুখোপাধ্যায়কে সাহায্য করা ভিন্ন। হিন্দু পেট্রিয়ট (দৈনিক), ইণ্ডিয়ান মিরর, ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার প্রভৃতিতে লেখা অবশ্য আমার চলিয়াছে বহুকাল পূর্ব হইতে। 'হিতবাদী' প্রভৃতির অমুরোধে বাংলা প্রবন্ধাদি লিখতে-লিখতে স্থির করি আমি ইংরাজী না লিখিয়া বাংলাই লিখিব এবং আরম্ভ করিব খেলাধুলা বাংলায় লিখিতে। তাহা লেখাতে বাংলা সাংবাদিক ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়। খেলাধুলার আদি কথা হইতে ইহার ক্রমবিকাশ নিয়মিত প্রকাশ হইতে থাকে বহুকালাবধি। আমাকে অহুসরণ করে এ জাতীয় অনেক লেখক দেখা যায় ক্রমে ক্রমে। জীবিকার্জনের এ নূতন পথ অনেককে দেখিয়ে দিতে পেরে খুবই আনন্দিত আমি।

সাংবাদিক ক্ষেত্রে বলতে শুনেছি এবং লেখাও পড়েছি যে, হেমেন্দ্রপ্রসাদের পরে পুরাতন কথা বলিতে সর্বাধিকারী ভিন্ন আর কেহ নাই। এর সত্যাসত্য ফলেন পরীচীযতে।



ভারতীয় কৃষ্টি ও সনাতন ঐতিহ্য

দার্শনিক শ্রীনিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য

আলোচ্য বিষয়টি বড়ই কঠিন ও গভীর। কৃষ্টি বলিতে গেলে আমরা কোন বিশেষ দেশ বা দেশের অধিবাসীর কৃষ্টি বুঝি। যেমন ব্রিটিশ কৃষ্টি, আমেরিকান কৃষ্টি, সোভিয়েট কৃষ্টি, সৌদি আরবীয় কৃষ্টি, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতীয় কৃষ্টি কিন্তু কোন ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে সীমায়িত নহে। ভারতীয় কৃষ্টির ব্যাপকতা সমগ্র বিশ্ব লইয়া। তাই এক কথায় ভারতীয় কৃষ্টি বলিতে বিশ্ব কৃষ্টিকেই বুঝায়। ভারতে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বিভিন্ন আদর্শবাদী বহু জাতির বসবাস। এই বৈচিত্র্যময় ভারতের সনাতন ঐতিহ্য আজ পর্যন্ত আছে ও চিরকাল থাকিবে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই—ভারত ঐটি সমন্বয়বাদী। ইহাই ভারতীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। গৌরীশঙ্কর বলেন—“Cultural synthesis not exclusiveness is the soul of Bharat”. এই সমন্বয়বাদের বাণী এ যুগে বাঙ্গালীই প্রথম সমগ্র জগতকে স্তনাইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় হইতে বিবেকানন্দ পর্যন্ত আমরা এই স্রেরের প্রতিনিধি পাইতেছি। প্রাচ্য ও প্রাচীণ সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন একমাত্র বাংলার প্রতিভায় সম্ভবপর হইয়াছে। গৌরীশঙ্কর বলেন—“The meeting point of East and West was discovered by the genius Bengal.” বাংলার সাধনা আজ পর্যন্ত চলেছে বিশ্ব বিজয়ের পথে। বাঙ্গালী এক দুর্দ্বর্ষ প্রগতিশীল, ধী-সম্পন্ন মহাজাতি। এই মহাজাতি তার বৈশিষ্ট্য যতদিন অক্ষুণ্ণ রাখিবে, ততদিন বিশ্বের সমগ্র বিরুদ্ধশক্তি একত্র হইয়াও বাংলার সনাতন ঐতিহ্যকে নষ্ট করিতে পারিবে না। বাংলায় বীর বিবেকানন্দ কষুর্কর্ত্তে জগদ্বাসীকে স্তনাইয়াছেন,—“We, the Hindus do not merely tolerate, we unite ourselves with every religion, praying in the mosque of the Mohamedans, worshipping before the fire of the Zoroastrian and kneeling to the Cross of the Christians. We know that all religions are alike, from the lowest fetishism

to the highest absolutism, are but so many attempts of the human soul to grasp and realise the infinite. So we gather all these flowers, and binding them together with the cord of love, make them into a wonderful bouquet of worship.”

মহাশক্তির সিদ্ধ পীঠস্থান বাংলা। আজও আগাদের সকলকে স্তনাইতে হইবে—নূতন যুগের নূতন বাণী। আমরা চাই যুগশ্রষ্টা তরুণ-তরুণী ও যুগদ্রষ্টা মনস্বী সমাজ যারা চুরমার করে' এই ঘুনে-ধরা সমাজকে ভেঙ্গে দিয়ে উন্নত মস্তকে বলতে পারবেন, “Ring out the old and ring in the new.” ভারতীয় সংস্কৃতির জিগীর তুলে' যারা ভারতবাদীকে অন্ধকার হইতে অধিকতর অন্ধকারে লইয়া যাবার জগ্ন স্বকোশলে জ্বাল বিস্তার করিতেছেন, সে জ্বাল কাটিয়া আমাদের মুক্ত বাতাসে বাহির হইতে হইবে। আজ মানবজাতি যে পথে চলিয়াছে, সে পথে কোন জটিল সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। কারণ বর্তমানের সভ্যতা কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছে। ঋষি-ভারত ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া সকল সমস্যার সমাধানের ঋজু পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা সকলেই চলিয়াছি বক্রপথে। ঋষিদের মূলমন্ত্র ছিল “সত্যমেব জয়তে নানৃতম্”। তাঁরা জানিতেন—সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়। যদিও মিথ্যা আপাত দৃষ্টিতে জয় লাভ করে এবং অধর্মই সাময়িকভাবে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া গৌরব ঘোষণা করে, একটা মহাজাতির ঐতিহ্যে ইহা ক্ষণস্থায়ী। বাঙ্গালী যখন সে কাজে অবতীর্ণ হইয়াছে, তখন সে মহাশক্তিকে “মা” “Dynamic absolute” বলে' ঋষিপ্রদর্শিত পথে উপাসনা করে' তাঁরই ইঙ্গিতে মানব সমাজের অভ্যুত্থানের আলোড়ন তুলিয়াছে। আজও বাংলার এই ছুদিনে এত ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্যে মহাশক্তির সাধক বাঙ্গালী নীরবে মহামাষার অবতরণ আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে প্রার্থনা করিতেছে। বাঙ্গালী মহাশক্তিকে লইয়া খেলা করে না, তার বাহুপূজা মাটির মৃতিতেই পর্যাবসিত হয় না—কারণ

যে মা সদাসর্বদা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পালন করিতেছেন, সে মাকে ঋণিকের অস্ত্র বিসর্জন দেওয়া চলে না। তথাপি বর্তমান বাংলায় শারদীয়া দুর্গাপূজা এক তামাসায় পর্যাবসিত হইয়াছে। যে রাজসিক ও তামসিক পরিবেশে আমরা দুর্গার পূজা করি, সেই পূজায় মা আমাদের সাড়া দেন না। কারণ সে পূজা প্রাণহীন ও প্রজ্ঞাহীন। আমরা যতদিন না মহামায়াকে আমাদের হৃদয়-কন্দরে বসাইয়া পূজা করিতে পারিব, ততদিন আমাদের প্রকৃত শক্তি জাগিবে না।

ঋষিরা বলেছেন—“মহাসরস্বতী চিতে মহালক্ষ্মী সদাশ্রিকে, মহাকাল্যানন্দরূপস্তে তত্ত্বজ্ঞান সুসিদ্ধয়ে অমুসম্বন্ধমহে চণ্ডী বয়ং স্বাং হৃদযায়ুজ্ঞে।” দার্শনিক ভাষায় আমরা ‘Dynamic Absolute’ বা মা বলতে কি বুঝি। এই “মা” কি বস্তু তাহা ভাল করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণা করা উচিত। ঋষি-ভারতের এই মাকে উপলব্ধি করার যে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত লুক্কায়িত রহিয়াছে কতিপয় অজ্ঞাতনামা মহাপুরুষদের মধ্যে তাহা আমাদের আবিষ্কার করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণে প্রয়োগ করিতে হইবে। বাঙালী সেইদিন নির্দীর্ঘ্য ও গতিহীন হইবে, যেইদিন সে মহামায়াকে অস্বীকার করিয়া পশুবলে মগ্ন হইয়া এক নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে চাহিবে। বর্তমান ভারত তথা জগতে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করেছে “Politics”। গান্ধীজিও বলেছিলেন—“Politics is best part of my life.” তিনি আরও বলিয়াছেন—ভার সমস্ত কার্য ও চিন্তার মধ্যে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে লাভ করা। আজ বড়ই পরিতাপের সঙ্গে বলিতে হইবে যে, যারা নিজেকে গান্ধীপন্থী বলিয়া প্রচার করেন, তাঁরা গান্ধীজির এই মূলমন্ত্রটি আদৌ গ্রহণ করেন নাই। গান্ধীজি যে শক্তির বলে জাতিকে আগাইয়া লইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হইয়া গিয়াছেন তাহার পিছনে ছিল ঐশীশক্তি ও চারিত্রিক বল। বর্তমান জগতের ঘৃণ্য Politics-কে রবীন্দ্রনাথও অতি সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন এবং তাহাতে যে বিশ্ব-সংস্কৃতি ও বিশ্বশান্তি গড়িয়া উঠিতে পারে না তাহার ইঙ্গিত

তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি দিয়া গিয়াছেন তাঁর “সভ্যতার সঙ্কট” (“The crisis in civilisations”) নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিব “deceptive diplomacy” যতদিন জগতে চলিবে, ততদিন মানব-গোষ্ঠী শান্তিতে ও নির্বিঘ্নভাবে বসবাস করিতে পারিবে না। যে দেশে এক প্রগতিশীল জাতিকে টুটি চেপে মারার চেষ্টা করা হয়, সে দেশের মহারথীরা co-existence (সহাবস্থান) নীতি প্রচার করিয়া আর জগৎকে কতদিন বিভ্রান্ত করিবেন? বিশ্বের মনস্বী সমাজ কি এতই বুরবক যে, তারা পলিটিক্যাল ধাঙ্গাবাজি কিছুই বুঝেন না। মহাত্মা গান্ধী পাশ্চাত্য Politics-কে লক্ষ্য করিয়া ভীত হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় Politics-কে কিভাবে জনকল্যাণে নিয়োগকরা যায়, তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন এক সোজা কথা—“Spiritualise politics.” তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে ভগবান যদি ভারতবাসীকে স্মৃতি না দেন, তবে ভবিষ্য ভারতের ইতিহাস কলঙ্কময় ও অন্ধকারময় হইবে। তাঁর প্রার্থনার মূলমন্ত্র ছিল—

“রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতারাম।
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম,
সবকে স্মৃতি দে ভগবান।”

সত্যি কি আজ ভারতবাসী ভগবানের কাছ থেকে স্মৃতি প্রার্থনা করেন? মহারথীদের মুখে সদাই আমরা groupism, castism, communalism-এর বিরুদ্ধে মৌখিক জেহাদ ঘোষণা করিতে দেখি, কিন্তু সকলেই নিজের group লইয়াই ব্যস্ত। আজ ভারতের সুধী-সমাজ ও চিন্তানায়কেরা কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, groupism বর্তমান ভারতকে মানসিক জগতে খণ্ড খণ্ড করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর একেত্র পথে কিরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।

আমরা স্পষ্ট ভাষায় আজ ভারত তথা বিশ্ববাসীকে জানাইতে চাই যে, ‘politics cannot build up a world community.’ বিশ্বব্রহ্মের বিশ্বকে আজ খণ্ড খণ্ড করছে politics। ঋষিরা বলেছেন—বিশ্বপতির প্রজ্ঞা আমরা সকলে—তিনিই একমাত্র সকলের নিয়ন্তা—

“বয়ং প্রজ্ঞাপতে: প্রজ্ঞা অভূমঃ”। আজ জগতে চলেছে হাহাহানি, মারামারি, কাটাকাটি এবং তার পিছনে রহিয়াছে aggressive Nationalism, fanaticism, knavery & duping. আজ—আমরা বাঙ্গালী যারা সত্যের উপাসক, জাতির ঐক্য ও সংহতিসাধনে দেশ-বানীকে এই মহামন্ত্র বলিতেছি, “দৈবর ধর, পলিটিক্স ছাড়। ব্রিটিশ মনস্বী Johnson-এর কথা,—“politics is the last resort of scoundrels.” ব্রিটিশ শিক্ষাবিৎ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের আমরা শ্রদ্ধা করি; কিন্তু কুটনৈতিক Mountbatten-এর আমরা শিষ্য নহি। আমরা অখণ্ড বঙ্গের ব্যবচ্ছেদের ভগ্ন জিন্না সাহেবকে দায়ী করি না। আমরা দায়ী করি কুটনৈতিক বিদেশী ধুরন্ধরগণকে, যারা বাংলা ও বাঙ্গালীর চিরশত্রু। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের সময়ে যখন বঙ্গভঙ্গ হয়, তখন বাংলার চিন্তানেতারা চারিত্রিক বলে settled factকে untsettle করিয়াছেন। আজও বাঙালী জাতি তাহা করিতে পারেন; কারণ বাংলার সংস্কৃতি ও বাংলাভাষা মুসলিম সংস্পর্শে আসিয়া হোসেন শাহার আমলে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। যিনি ষাঁট মুসলিম, তিনি ষাঁট হিন্দুর ভাই; কিন্তু যে মুসলিম নিজের সংস্কৃতি জানেনা এবং যে হিন্দু নিজের সংস্কৃতি জানেনা, সেখানে হিন্দু-মুসলিমের মিলন অসম্ভব। Political চালাকি দ্বারা হিন্দু মুসলিমের মিলন কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। পূর্ববঙ্গে যে সব ষাঁট উচ্চশিক্ষিত দৈবরপরাষণ মুসলিম আছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে যে সব চিন্তানায়ক অখণ্ড বাংলার বাস্তব রূপ দেখতে চান, তাঁরা জানেন একমাত্র স্বজাতির ইঙ্গিতেই সকল শয়তানী ব্যুহভেদ করিয়া তাহা সুসিদ্ধ হইবেই। আজ চাই বাংলার কঠোর সাধনা, অজলন্ত আত্মবিশ্বাস, নির্ভীক চরিত্রবল, স্পষ্টবাদিতা, অদমনীয় উৎসাহ ও সংবেগ। ঋষি বলিয়াছেন, “তীব্র সংবেগানাং আসন্ন”। অর্থাৎ তীব্র সংবেগই সুনিশ্চিত সিদ্ধি আনয়ন করে। মধ্যপ্রাচ্যে এক মহাপ্রাণ সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তিনি খোদার পরশে বলিয়া উঠিলেন, “গোফ তায়ু গোফ তা মনস” অর্থাৎ আমার ভিতর হইতে যে কথা বাহির হইতেছে, তাহা খোদারই

—কারণ আমার মধ্যে কোন অহং ভাব নাই। জীবভাবে বা অংহভাবে পরিচালিত হইবে যখন মানুষ কার্য্য করিতে যায়, তখন সাগাচ্চ বাধায় সে নিরস্ত হয়, কিন্তু যিনি দৈবর বা খোদাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁর শক্তির কোন ক্ষয় বা সীমা নাই। তিনি যদ্বনং প্রভুর আদেশ মাত্র পালন করিয়া চলেন। তাই বলি মুসলমান তাই—আজ এই ধাপ্লাবাজির দিনে তোমরা খোদার প্রকৃত বান্দা হও। জঙ্গাইয়া তোল তোমাদের মধ্যে বিশ্বালোড়ন-কারী আল্লার মহাশক্তিকে। আল্লাই আমাদের নেতা—মানুষ-নেতার কাজে আর আমরা মাথা নত করিব না। মানুষের সকল অহমিকা চূর্ণ করিবা আজ আল্লা আমাদের প্রাণে জাগ্রত হউন—আজ আমরা সমবেত কণ্ঠে যেন এই মন্ত্র উচ্চারণ করি, “বিছমিল্লা হের রহমান রহিম”। এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য আমাদের শিরায় শিরায় স্পন্দিত হউক। আল্লা আমাদের ভিতরে সকল শক্তির উৎস। আল্লা—তিনি দয়ালু। অতএব সমগ্র বাংলার ভূগতিতে আজ আল্লার আসন টলাইতে হইবে—এই দৃঢ়সঙ্কল্প বাঙ্গালী মুসলমানকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা বাঙ্গালী—আমাদের এক খোদা-নির্দিষ্ট মিশন আছে। এই মিশনকে বাধা দেয় এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নাই।

আজ আমরা সমগ্র বাংলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—সজ্জগৎ মতিলাল রায় মহাশয়ের দীপদর্শনে। এই মহাপুরুষ যে চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি খ্রীষ্টোত্তম মহাপ্রভু সদৃশ ব্রাহ্মণের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিলেন। যে তথাকথিত ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম আজ জাতির কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই তথাকথিত সনাতন ধর্ম্মের মূল উৎপাটন করিয়া মহাপ্রভুর আদর্শে প্রেমের প্রতীক হইবা যে নব জাতি ও নবযুগের অভ্যুত্থান প্রজ্ঞানেত্রে দেখিয়াছিলেন, তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। ষাঁরা দ্রষ্টা, ষাঁরা জগতের সত্যিকারের হিতৈষী, ষাঁরা দৃঢ়ব্রতী, তাঁদের সঙ্কল্প অব্যর্থ। যে নবযুগের ও অখণ্ড মহম্মদজাতির সংহতিমূর্ত্তির ভাবমূর্ত্তি তিনি দর্শন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবে পরিণত হইবেই—সেইদিন আজ সমাগত। হিন্দু বাঙ্গালী ও বাঙ্গালী

বিলেতের পশুশালা

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কোন্ এক জাহ্নবারীর ১লা তারিখে আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখে গিয়েছিলেন। সেই স্ত্রে একটি জেব্রাশিশুর নাম দিয়েছিলেন—কিরণ। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুও একটি গুয়ারিণী-বাচ্চার নামকরণ করেছিলেন—স্নেহ। সেই স্নেহ নাকি এখন বড় হয়েছে!

এই স্নেহ আর কিরণের বংশধরদের বিদেশেও দেখলাম। মানে বিলেতের পশুশালায়। রিজেন্ট পার্কের ধারে প্রাচীরঘেরা বিরাট London Zoo.....সেইখানে। এসব পশুদের কেউ কোনো নামকরণ করেছেন কিনা জানি না। বিলেতের চিড়িয়াখানাষ চুকতে হু' শিলিং ছ' পেন্সের টিকিট কাটতে হয়। বিশেষ কষেকটি বিভাগের জন্ত স্বতন্ত্র টিকিটের ব্যবস্থা। ভিতরে রেষ্টুরেন্ট আছে। সস্তার চায়ের জন্ত তাঁবু, চিনেবাদাম, চকোলেট, আলুর দম, পোটাটো চীপস্ আর শিশুদের উপযোগী নানা খাদ্যসম্ভার সহজলভ্য। বিক্রি করে ইংরেজ ফেরিওয়াল।

হৃদ আছে। সে-হৃদের শোভাবর্ণন করে নানা জাতের ভাসমান মরালের দল। যাত্রীদেব ভাডাকরা নৌকা। মুক্ত আকাশের তলায় লোহার গারদঘরে লেহন করে পশুরাজ-সিংহ তার সঙ্গিনীর ঐবাদের। সবুজ ঘাসের টিলায় পেখম মেলে ময়ূরের দল। এলবিজায়া রিচার্ডিয়ানার ডালে শোনা যায় টিয়াজাতীয় পাখির কলকাকলি।

মুসলমানকে আজ ক্ষুদ্র পরিহার করিয়া ঐশীশক্তিতে বলীয়ান হইয়া বীরদর্পে উভয়কেই politice ছাড়িয়া প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা ও দীক্ষা লইতে হইবে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঋষিতুল্য মনীষীদের নিকট। যেমন একদিকে প্রাচ্যে মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দু মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ও তাঁদের চিন্তাধারা নবযুগগঠনে অপরিহার্য, তেমনি পাশ্চাত্যেও অনেক ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁদের চিন্তাধারা উদীয়মান বাঙ্গালী জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

সম্ভবতঃ শ্রীমতিলাল বিবেকানন্দকে প্রশংসনীয় দিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁর মধ্যে একাধারে ব্রহ্মা-

কেজান্ট গ্রুপের খেচরদের কলকঠ। ভল্লকের রোগগর্জন। হাতিদের মধ্যে ফুসমালা, শাহারজাদী, বিজয়ী ও শেখরী নামধারী হয়তো কেউই এখানে নেই, কিন্তু এমন অনেকেই আছে—যারা ছেলে-মেয়েদের পিঠে বসিয়ে পরিভ্রমণ করে আনে তাদের নির্দিষ্ট পরিধিটুকু।

ফুলের কেয়ারী ও লতাগুল্লের অগণিত ঘর ক্রান্ত যাত্রীদের পরম বিশ্রামস্থল।

শুনলাম, সিম্পাজি সাহেবের টেবিলে ডিশে করে খাবার দেওয়া হয় ক্লেপে-ক্লেপে। ছটা সিঙ্গাপুরী কলা, ছ'পিস পাউরুটি, ছটা কমলালেবু, ছটা আপেল, চারটে খেজুর, বারোটো আঙুর, এক ছটাক কিসমিস, একটা মুরগির ডিম সিদ্ধ, দু'কাপ কফি, আরো হয়তো অনেক কিছু!

ক্যাডার আর এমু, রিয়া, কাসুয়ারী প্রভৃতি উট-পাখির দলও এখানে ছলভ নয়। আছে মাগয়ের এক বিশেষ ধরনের কাঠবিড়ালী। অষ্ট্রেলিয়ার এডিসনের প্ল্যাটিপাস। সাজ্জাক, কেরানি পাখি, সেক্রেটারি পাখি, ভৌদড, ওরাওটাং, পেঙ্গুইন আর হাজার কয়েক জলচর, স্থলচর, খেচর প্রভৃতি জাতের প্রাণী। এরা ভালো করেই চেনে—কে এদের খেতে দেয়। সে-লোকটির একদিনের অস্থপস্থিতি এরা নীরবে লক্ষ্য করতে পারে

প্রতিভা ও ক্ষাত্রশক্তির অপূর্ণ সমাবেশ হইয়াছিল। একদিকে বিবেকানন্দ যেমন ব্রহ্মজ্ঞানে ডুবিয়া থাকিতেন, অপরদিকে তাঁর সমস্ত সংগঠনমূলক কর্ম শোষিত, পদদলিত দরিদ্রনারায়ণের সেবায় নিয়োজিত ছিল। তিনি তথাকথিত Fashionable Vedantist ছিলেন না। তিনি কর্মজীবনে বেদান্ত পরিস্ফুট করিতে চাহিয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ শ্রীমতিলাল এই পথ অন্বেষণ করিয়াই তাঁর কর্মধারা আধ্যাত্মিক জীবনবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় কৃষ্টি ও সনাতন ঐতিহ্য বলিতে আমরা সেই বিশ্ব-সংস্কৃতি ও শাস্ত্র পথের বথার্থ সম্মানই দিতে চাই ভারত তথা জগৎসীকে।

কিন্তু প্রাণ করবার মতো ভাষা নেই। এক-এক রকম বিশেষ জীবের জন্ত এক-এক দেশের বিশেষ আবহাওয়াও সৃষ্টি করা হয়েছে। নইলে এইগুলিকে বাঁচানো শক্ত। কলকাতার আলিপুরের পশুশালায় চেয়ে কোনো কোনো বিভাগ এখানে বড়। আর ভিড়ও বেশি বিশেষ করে একটি জায়গায়। সেটি হচ্ছে সরীসৃপ-ডবন। অক্টোপাস, ময়াল, শকচূড়, ঢেমনা, গোথরো, গোসাপ, কালিবোড়া, লাউউগা, কালনাগিণী—কিছু-কিছু আছে, আর আছে আফ্রিকা ও অস্ট্রালিয়ার দেশ-বিদেশের বহু সাপ। ময়াল সাপকে দিতে হয় নাকি বড় একটা মুরগি। গোথরো খায় ব্যাঙ। কালনাগিণী খায় টিকটিকি। আরো কত রহস্য অপেক্ষমান—কে জানে!

চলতে চলতে হঠাৎ ঠিকরে পড়েছিলাম একটা বাঘের খাঁচার ধারে। বাঘহর কলার খোলায় পা পড়েছিল। ধরে ফেলল দেখি তিনজন লোক। কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে তাদের দিকে ফিরে চাইতে হল। দেখি পরণে মিলিটারি পোশাক। চোখে সূর্য। আমারই মতো কালো। হাতে প্রত্যেকের একটা করে ছোট লাঠি।

এরা সময়ে না ধরলে কী হত—বলা কঠিন!

জিগ্যেস করলাম, তোমরা ভারতীয়?

ছিলাম তাই।

এখন?

ডব্লু. পি. পি.। ওয়েস্ট পাকিস্তান পুলিশ। আসছি লাহোর থেকে। চলো, চা খাইগে যাই এক জায়গায় বসে! তবু ছোটো মনের কথা বলতে পারব। তুমি তো আমার দেশের লোক!

কি রকম?

একটা চাঘের দোকানে নিয়ে গিয়ে তুলল তারা আমায়। বললে, বিদেশে কালা মানুষ—ভারতীয়ও যা, পাকিস্তানীও তাই। দুজন দুজনকে দেখলে তখন আর ঘরের কেছার কথা মনে পড়ে না। পরস্পর পরস্পরকে আপনার লোকের মতোই ভাবে। এমন কি, দেশে যাকে বিশ্বাস করতে বাধা, বিদেশে সে-ই বড় বন্ধু। একদিন আমাদের দেশ ছিল অখণ্ড হিন্দুস্থান—এ বিষয়ে আর মত-ভেদ কি? দেশের সীমান্ত পেরুতে গেলে যারা বন্ধুক ছোঁড়ে, বিদেশের সীমান্তে এসে তারাই হাত মেলায়। তখন বন্ধুক তারা পরস্পরের উপর ছুঁড়বে না, পরস্পরের

হাতে তুলে দেবে নিজেদের দেশরক্ষার জন্ত। তখন দুজনের স্বার্থই যে এক।

তাই নাকি? সন্দেহ প্রকাশ করতে হল: দেশ-বিভাগের পর তোমরা কোথায় ছিলে?

লাহোরে। একজন পরিষ্কার জবাব দিল। একটু থেমে বললে, আমি নিজেই এক গুরদোয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী শিখদের উপর অমানুষিক গুলী চালিয়েছি। কম করে বিশটা মরেছে আমার গুলীতে।

সে কথা মনে এলে এখন কি মনে হয় তোমার?

মনে যা হবার—তাই হয় হজুর। লোকটার চোখে জ্বল: আমার জী অনেক আগেই হ'বছরের একটি মেয়ে রেখে মারা যায়। সে-মেয়েকে মানুষ করে আমার এক ভাই ডুনের এক মিশনারী বোর্ডিং-এ রেখে। মেয়ে যখন বড় হল, তার দিকে চাওয়া যায় না। এত তার রূপ! এত সুন্দর তার স্বাস্থ্য। মেয়ে কাকার কাছে বেড়াতে এসেছিল মুরিতে। সেখানে এক ইংরেজ-মিলিটারির নজরে পড়ে যায়। কী নাম যেন লোকটার—মি: নিকলসন! নিকলসন প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিল মেয়ের কাছে—রাতের দিকে পাঠিতে দেখা করতে। নিকলসনের ওপরওলার কাছে আমার মেয়ে জানিয়েছিল নালিস। ওপরওলা কি করেছিল জানি না, তার কয়েক-দিন পরেই এক গভীর রাত্রে ডাকাত পড়ে আমার ভাইয়ের বাড়িতে। ভাইকে কেটে রেখে চলে যায়। আর লুট করে নিয়ে যায় আমার একমাত্র মেয়েকে। পরে শোনা যায়, আমার মেয়ের দেহ টুকরো-টুকরো অবস্থায় পড়ে ছিল একটা খালের ধারে।

একি তোমার অদৃষ্ট বলে বিশ্বাস করো? একটু চুপ করে থেকে বললাম।

কী বলি হজুর? একটা দীর্ঘ নিখাস ফেলে লোকটি সহসা থেমে গেল।

একটা সিগারেট দিল হাতে। বললে, যেতে দাও ওসব কথা।

বললাম, মনটা খারাপ করে দিলে সেপাইজী!

এসব ভাবতে গেলে মন সকলকারই খারাপ হয় হজুর। লোকটি বললে, যতক্ষণ না পশুশালায় বন্ধন থেকে মুক্তি হচ্ছে—এ রকম হবেই। তাই কোনো শহরে ঢুকলে প্রথমে পশুশালাটা দেখে নিই। তারপর দেখি, সে দেশের মানুষগুলোকে।

নীরব কর্মী রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীকালিপদ মণ্ডল

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সব মনীষীদের আবির্ভাব হয়েছিল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বিজ্ঞান একখানি জাহাজ। রিপন কলেজের অধ্যক্ষরূপে তিনি দীর্ঘদিন বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেন এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখে অল্পদিনের মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, তত্ত্ব, বেদান্ত ও বেদশাস্ত্র তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়ই বাণীর পূজায় আত্মনিয়োগ করেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাধারণ কথা-বার্তার মধ্যে কখনো বুঝবার কোন উপায় ছিল না যে, তিনি ইংরেজী জানেন। তাঁর আচার, ব্যবহারে ও পোষাকে একজন খাঁটি বাঙ্গালীর পরিচয় মিলতো। মুর্শিদাবাদ জেলার জেমসকান্দিত্তে তাঁদের আদি বাস ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়ে এক সময় গভর্ণমেন্টের শিক্ষা বিভাগে চাকরীর জন্ত ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করেন। ডিরেক্টর তাঁকে দেখা করতে বলেন। যথাসময়ে তিনি ডিরেক্টর সাহেবের অফিসে উপস্থিত হলেন এবং চাপরাশি দিয়ে কার্ড পাঠিয়ে দিলেন। কার্ডটি ডিরেক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় সেই চাপরাশি তাঁর কাছে বকশিশ চায়। এই ব্যাপারে তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন, এবং মনে মনে ভাবলেন,—গভর্ণমেন্টের চাকরীর স্বরূপেই এই রকম, তারপর না জানি কত গোলমাল। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন উদার পণ্ডিত। এমন নিরহঙ্কার মাটির মানুষ খুবই বিরল। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত ও ধর্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলি তিনি কখনো বিনা বিচারে গ্রহণ করতেন না। তাঁর স্বল্প বিচারশক্তি দিবে তিনি তার বিচার করতেন এবং নিজস্ব মত প্রকাশ করতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। তিনি যদি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বাদ দিয়ে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সাধনা করতেন

তাহলে বিজ্ঞান জগতে হয়তো কোন নতুন সন্ধান দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি কোনদিন তাঁর দেশকে ভোলেন নি। সেইজন্ত এই নীরব কর্মবীর নিষ্ঠুর বসে দেশ ও জাতির সেবা আত্মনিয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার মৈত্রেয়, দীনেশ সেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও যজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক তাঁর কলিকাতাস্থ বাসভবনে যেসে নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। কবি তাই রামেন্দ্রসুন্দরকে বলেন : “হে রামেন্দ্রসুন্দর, তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর।”

১৯০৩ সাল থেকে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং দীর্ঘদিন এই পদ থেকে কলেজকে নানা বিপদ ও সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তার সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করেন। ছাত্রদের তিনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন এবং তাদের সমস্ত অভিযোগ, অভিযোগ ও আবেদন মন দিয়ে শুনতেন এবং তার যথাযথ সুর্যবস্থা করতেন। দরিদ্র ছাত্রদের প্রতি তাঁর খুব সহানুভূতি ছিল। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর কলেজে একটি ‘দরিদ্র ভাণ্ডার’ খোলেন। এই ভাণ্ডার থেকে অর্থ দিয়ে কলেজের দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করা হতো। এক সময় বীরভূম জেলার মহম্মদ ইস্‌মাইল নামে এক ছাত্র ইংলণ্ডের লীড্‌স শহরে বিদ্যাশিক্ষা করছিলেন। সেখানে তাঁর একান্ত অর্থান্ধ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েন। অবশেষে, কোন উপায়ান্তর না দেখে তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে পত্র লেখেন। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর এই পত্র পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁকে ‘তিনশ’ টাকা পাঠিয়ে দেন। সেই টাকা পেয়ে মহম্মদ ইস্‌মাইল লণ্ডন থেকে তাঁকে লেখেন :

My dear Gurudeb,

With proper regards I acknowledge the receipt of your kind aid of Rs. 300. It

has come to me in time of some need. Had it been a week later, I would have been in a most disgraceful condition . . . It is needless to mention that I owe you life long debt. . . . I shall then reverence you as my Guru or one who is like my own father. . . .

ৰামেন্দ্ৰসুন্দৰেৰ মত বিৰাট পণ্ডিত ও মনীষিকে দেশেৰ স্বেচ্ছাসমাজ আজও সম্যক উপলব্ধি কৰবাব হয়তো চেষ্টা কৰেন নি। ৰবীন্দ্ৰনাথৰ সঙ্গে তাঁৰ বহু পত্ৰবিনিময় হৈছিল—স্বদেশ ও বিদেশ থেকে। ৰবীন্দ্ৰনাথ তাঁকে যে কী গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰ চক্ষে দেখতেন, তাহা কবির একখানি পত্ৰে বেশ পৰিস্ফুট হৈছে ওঠে। কবি লেখেন :

“আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বললে কম বলা হয়, আপনার প্রতি আমার প্রীতি গভীর।” (ৰামেন্দ্ৰ সুন্দৰ : পৃষ্ঠা ২৭৭)।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৩০শে নভেম্বৰ সাড্‌লার কমিশন ৱিপন কলেজ পৰিদৰ্শন কৰতে আসেন। কমিশনেৰ কৰ্তা সাড্‌লার সাহেব ৰামেন্দ্ৰসুন্দৰেৰ বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানেৰ পৰিচয়ে গভীৰভাবে মুগ্ধ হন, এবং বিমুগ্ধচিত্তে বিশ্ব-বিদ্যালয়েৰ তৎকালীন কৰ্মকৰ্তাদেৰ জিজ্ঞাসা কৰেন—বিশ্ববিদ্যালয়েৰ পোষ্ট গ্ৰাজুয়েট ক্লাসে ৰামেন্দ্ৰসুন্দৰ জিবেদীৰ মত যোগ্য লোককে নিযুক্ত না কৰে কতকগুলি ছোকাৱা নিযুক্ত কৰা হৈছে কেন ? তিনি উত্তৰ শুনেছিলেন—“This is the fate of our country.”

ৰামেন্দ্ৰসুন্দৰ ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ’-এৰ পুৰোধা ছিলেন। এই পৰিষদ প্ৰতিষ্ঠাৰ সূৰু থেকেই তিনি এই প্ৰতিষ্ঠানেৰ সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। এই প্ৰসঙ্গে আমাৰা বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদেৰ প্ৰাথমিক ইতিহাসেৰ একটু আলোচনা কৰা সম্ভৱ মনে কৰি। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুলাই শোভাবাজাৰে ৰাজা বিনয়-কৃষ্ণেৰ ভবনে একটি সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। এই সভাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেৰ আলোচনা এবং তাৰ সৰ্বপ্ৰকাৰ ক্ৰমোন্নতিৰ প্ৰচেষ্টা কৰা। তখন এই সভাৰ নামকৰণ হৈছিল—‘Bengal Academy of Literature’ এবং সভাৰ যাবতীয়

কাজ ইংৰাজী ভাষায় কৰা হতো। কিন্তু ছ’বছৰ পৰে সভ্যদেৰ অনুমতিক্ৰমে এই সভাৰ নামকৰণ কৰা হয়—‘বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ’ এবং এৰ যাবতীয় কাজ-কৰ্ম বাংলা ভাষায় সম্পন্ন কৰা হলো। এই পৰিষদ তখন থেকে বাংলাৰ প্ৰাচীন সাহিত্য ও পুৰাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা সূৰু কৰেন এবং বাংলা ভাষায় মৌলিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাৰ জন্ত তৰুণদেৰ মধ্যে নতুন প্ৰেৰণা যোগান। ৰামেন্দ্ৰসুন্দৰ এই পৰিষদেৰ প্ৰথম বৰ্ষ থেকে কোন না কোন কৰ্মেৰ অধ্যক্ষৰূপে এবং কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সভ্যৰূপে পৰিষদেৰ ক্ৰমোন্নতিৰ জন্তে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰে গৈছে। সেদিন এই পৰিষদ ৰামেন্দ্ৰসুন্দৰেৰ মত পণ্ডিত, দূৰদৰ্শী ও অনন্তসাধাৰণ সমতাশালী মনীষীকে গেৰে ধস্ত হৈয়েছেন, তাঁৰ দান বঙ্গ-সমাজ আশাকৰি মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকাৰ কৰবেন। ৰবীন্দ্ৰনাথ ৰামেন্দ্ৰসুন্দৰেৰ গুণে মুগ্ধ হৈয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন : “সাহিত্য-পৰিষদেৰ সাৰথি তুমি এই ৱথটিকে নিরন্তৰ বিজয় পথে পৰিচালিত কৰিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কাৰ্য্যে তুমি অক্ৰোধেৰ দ্বাৰা ক্ৰোধকে জয় কৰিয়াছ, ক্ষমাৰ দ্বাৰা বিৰোধকে বশ কৰিয়াছ, বীৰ্য্যেৰ দ্বাৰা অবসাদকে দূৰ কৰিয়াছ, এবং প্ৰীতিৰ দ্বাৰা কল্যাণকে আমন্ত্ৰণ কৰিয়াছ। আমি তোমাকে সাদৰ অভিবাদন কৰিতেছি।” বলা বাহুল্য, বঙ্গীয় সাহিত্য-পৰিষদেৰ মাধ্যমে বাংলাদেশ তথা ভাৰতেৰ সৰ্বত্ৰ এই পৰিষদেৰ শাখা-প্ৰশাখা বিস্তৃত হৈছে এবং বৰ্তমান প্ৰতি বৎসৰ ভাৰতেৰ কোন না কোন শহৰে নিখিল ভাৰত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নানা কাজেৰ মধ্যে ডুবে থেকেও ৰামেন্দ্ৰসুন্দৰ তাঁৰ গৃহ-মন্দিৰে বসে নিভূতে সাহিত্য-সাধনা কৰেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁৰ অবদান চিৰস্মৰণীয়। তাঁৰ জ্ঞানেৰ পিপাসা কোনদিনই মেটেনি। সূৰেশচন্দ্ৰ সমাজপতিৰ ভাষায় তাঁকে বলতে হয় : “দৰ্শনেৰ গঙ্গা, বিজ্ঞানেৰ সরস্বতী, সাহিত্যেৰ যমুনা—মানবচিন্তাৰ এই ত্ৰিধাৰা ৰামেন্দ্ৰসুন্দৰে যুক্তবেগীতে পৰিণত হইয়াছিল।” ৰামেন্দ্ৰ-সুন্দৰ ছাত্ৰজীবন থেকেই সাহিত্য সাধনা ও সমাজচিন্তা সূৰু কৰেন। ১৯০১ সালে পৌষ মাসে “নবজীৱন” পত্ৰিকাৰ ৰামেন্দ্ৰসুন্দৰেৰ লিখিত “মহাশক্তি” শীৰ্ষক একটি

সংবাদ-পরিক্রমা

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

দ্বীপের নাম সাইপ্রাস :

নীলের মাঝে ছোট্ট সবুজ একটা টিপ্।

মাগরের মাঝে একটি দ্বীপ সাইপ্রাস। আয়তন মাত্র সাড়ে তিন হাজার বর্গ মাইল। লোকসংখ্যাও একেবারে নগণ্য—মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ। আগে ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশ। মধ্য এশিয়া থেকে ব্রিটিশ তৈলবাহী জাহাজগুলো এই দ্বীপ ঘেঁসে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকাতিকে পড়ত। যাতায়াতের পথে সাইপ্রাস ছিল ব্রিটিশ-ধনিক-স্বার্থের একটা শক্ত খাঁটি।

কিছু যুদ্ধোত্তর বিশেষ উপনিবেশের দিন ফুরিয়েছে। বহু বৎসর ধরে সাইপ্রাসবাসীরা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করেছেন। ব্রিটিশ-সৈনিকদের নির্বিচার অত্যাচার সে-আন্দোলন স্তিমিত করতে পারে নি। অবশেষে ১৯৬০ সালের ১৬ই আগস্ট সাইপ্রাসে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সাইপ্রাসবাসীরা তাদের প্রিয় নেতা ধর্মযাজক—রাজনীতিবিদ ম্যাকারিসসের নেতৃত্বে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে।

সাইপ্রাস-প্রজাতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তুর্কী মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ যেমন এখানে বসবাস করে, তেমনি গ্রীসদেশীয় খৃষ্টানদেরও জন্মভূমি এই সাইপ্রাস। সাতজন গ্রীক এবং তিনজন তুর্কী

মুসলমানকে নিয়ে সাইপ্রাস-সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ-ধনিক স্বার্থ সাইপ্রাসের বৃক্কে নিজেদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্তে সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাইপ্রাসের রক্তমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে আমেরিকা। মধ্য-এশিয়ার দেশগুলো থেকে পেট্রোল সম্পদ আহরণ করতে হলে সাইপ্রাস দখলে রাখা একান্ত ভাবেই অপরিহার্য। কেন না সাইপ্রাসের সামরিক ষাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটিশ এবং মার্কিন ধনিক স্বার্থ তাই তুরস্ককে সর্ব-রকমে সাহায্য করছে যাতে তুরস্ক সামরিক শক্তির সাহায্যে সাইপ্রাসকে তুরস্কের অঙ্গীভূত করতে পারে। আবার গ্রীসও চাইছে সাইপ্রাসকে দখল করতে—তবে গ্রীস এখনও পর্যন্ত সাইপ্রাসের উপর সামরিক অভিযান শুরু করে নি। কিন্তু তুরস্ক পিছিয়ে নেই। সাইপ্রাসের একদল মুসলমান অধিবাসী অন্তর্বিরোধ শুরু করে দিয়েছে। গ্রীক ও তুর্কী মুসলমানদের মধ্যে তাই গৃহযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে তুরস্কের বিমান বহর সাইপ্রাসের উপর অভিযান চালাচ্ছে।

সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তুলে ব্রিটিশ ও মার্কিন ধনিক স্বার্থ এইভাবে সাইপ্রাসের জনজীবনে এক দারুণ

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন তিনি বি. এ. পড়ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত “সাধনা” পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের “আকাশ তরঙ্গ”, “স্বপ্ন না দুখ”, “স্বার্থ ও পরার্থ”, “জগতের অস্তিত্ব”, “সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব”, “যুক্তির পথ” ও “বৈরাগ্য” প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “দাসী” পত্রিকায়ও তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ “সাহিত্য” পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ১৩০১ সাল থেকে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখতেন। এই পত্রিকায়

তিনি “বৈজ্ঞানিক সংবাদ”, “প্রকৃত স্রষ্টি”, “জীবন ও ধর্ম”, “ধর্ম্মপ্রবৃত্তি”, “ধর্ম্মের প্রমাণ”, “ধর্ম্মের জয়”, “মাধ্যাকর্ষণ” “প্রতীত্য-সমুৎপাদ” ও “মায়াপুরী” প্রভৃতি অনেক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহা ছাড়া তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত মানসী, বদ্বদর্শন, আর্য্যাবর্ত্ত, মুকুল, উপাসনা, প্রদীপ, পুণ্য, ভারতবর্ষ ও সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয়। বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে রামেন্দ্রসুন্দরের দান অনুল্লীষ, তিনি আজ নেই বটে, কিন্তু তাঁর স্মৃতি বাঙালীর জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সংকটের সৃষ্টি করেছে। এই সংকট সমাধানের দায়িত্ব সারা বিশ্বের প্রগতিশীল জনসাধারণের। একমাত্র বিশ্বের শান্তি ও প্রগতিকামী জনতার দাবীতে এই ধনিক স্বার্থের পরাজয় আশা করা যায়।

অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া :

সারা বিশ্ব আবার যুদ্ধের কিনারায় থমকে দাঁড়িয়েছিল। ঘটনাস্থল এবার টনকিন উপসাগর। বিরোধ বেধেছিল উত্তর ভিয়েতনামকে নিয়ে। প্রশান্ত মহাসাগরে টহলদারী আমেরিকার সপ্তম নৌ-বাহিনী সহসা টনকিন উপসাগরের নীল জলরাশি তোলপাড় করে তুলল। মার্কিন বহুর বোমা ফেলল হানঘের উপর। উত্তর ভিয়েতনামের মাহুঘের যুদ্ধ ভয়ে ভীত হয়ে উঠল।

এই বিরোধের মূল আরও গভীরে প্রোথিত।

অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রূপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

শেষে সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। যুদ্ধের আগে এখানে ছিল ফরাসী, ইংরাজ ও ওলন্দাজদের সর্বময় কর্তৃত্ব। এখানকার রবার, সেগুন কাঠ, টিন, আর আর ধান বিদেশী ধনিকস্বার্থের দখলে ছিল। ইউরোপের ধন-সম্পদের অকুরন্ত ভান্ডার ছিল এশিয়ার এই অঞ্চল। তারপর জাপানী সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের মধ্যে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃকে রাজ্য বিস্তার করল। কিন্তু সেও সাময়িক। যুদ্ধোত্তর এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জাগ্রত জনতা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করলো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও জনতার আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠল।

ফরাসী ইন্দোচীনের জনসাধারণও আন্দোলন করে স্বাধীনতা অর্জন করলো। কিন্তু সারা দেশটা চারটে ভাগে ভাগ হয়ে গেল—লাওস, কাম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর উত্তর ভিয়েতনাম। কিন্তু সব ক'টি অংশের সরকার এক চরিত্রের হ'ল না। লাওস আর কাম্বোডিয়াতে রাজতন্ত্রের সঙ্গে নিয়মতন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটলো। দক্ষিণ ভিয়েতনামে গঠনতন্ত্রের দিক দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার

গঠিত হলেও একনাশকত্বের ছদ্মবেশ জড়ান রইল এই সরকারের সঙ্গে। আর উত্তর ভিয়েতনামে গঠিত হল সাম্যবাদী সরকার। এদিক দিয়ে বিচার করলে প্রতিবেশী এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোন রকম মিল নেই।

ফলে এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সব সময় সংঘাত চলেছে আর তার জুযোগ নিচ্ছে প্রতিদ্বন্দী দুটি বিশ্ব শিবির। দুটি মত—গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ—মার্কিন সরকার ও রাশিয়া। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃকেও এই মতবাদের লড়াই আজ তীব্র হয়ে উঠেছে। তারই ফল টনকিন উপসাগরের আলোড়ন।

মার্কিন সরকারের সৈন্য বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃকে সাম্যবাদী অহুপ্রবেশ রোধ করবার জন্ত বহুপরিকর। তার জন্তে তার অহুগামী রাষ্ট্রগুলোতে সিয়াটোর ঘাঁটি তৈরী হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম মার্কিন-সরকারের অহুগামী রাষ্ট্র হুতরাং এশিয়ার এই অঞ্চল থেকে সাম্রাজ্যবাদকে খতম করার মানসে উত্তর ভিয়েতনামের সাম্যবাদী রাষ্ট্র জুযোগ পেলেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপর আক্রমণ চালায়। উত্তর ভিয়েতনামের বড় মুকুবী সাম্যবাদী চীন। ইয়ুনান অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চীনের সাহায্য আসছে হানঘে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের তেইশটি প্রদেশের মধ্যে বাইশটিতে সাম্যবাদী গেরিলাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। ফলে রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা দক্ষিণ ভিয়েতনামে। মার্কিন সরকারী প্রভাব ক্ষীয়মাণ। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সেই ক্ষীয়মাণ প্রভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্তই এই যুদ্ধের মহড়া। টনকিনের বিক্ষুব্ধ জলরাশিতে তাই বারুদের গন্ধ।

তার উপর রয়েছে মার্কিন যুক্তির আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এবার কে হবে মার্কিন-তরুণী কর্মধারী জনসন্ না গোব্দওয়াটার? রাজনীতির আবহাওয়াতে ডেমোক্রাটিক দলের অহুকূলে আনার জন্ত এমন যুদ্ধের মহড়ার নাকি অবতারণা করা হয়েছে বলে অনেকে সন্দেহ করেন। তবে বাই হোক টনকিনের জল আলোড়িত হয়ে উঠেছে।

নূতন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী

শ্রীতারশঙ্কর

স্বর্গত নেহেরু তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব-কালে পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব কারো ওপর অর্পণ করতে কোনোদিন ভরসা পেতেন না। ফলতঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রথম দিন থেকে দীর্ঘ সত্তেরো বছর অর্ধাং শ্রীনেহেরুর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর পূর্ণ দায়িত্বও তিনি নিজের বহন করে গেছেন। কিন্তু সে শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন চূর্ণ কর্মী প্রধানমন্ত্রীকে আশ্রয় দিতে পারেনি। তাঁর স্থলাভিষিক্ত সীমিত শারীরিক শক্তিসম্পন্ন শ্রীলালবাহাদুর সর্বসময়ের জন্য পররাষ্ট্রবিষয়ক একজন পূর্ণমন্ত্রী নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করলেন। এই সংক্রান্ত তাঁর নির্বাচন কিন্তু অত্যাধিক। স্বল্পখ্যাত সর্দার স্বরণ সিং বৃত্ত হলেন এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে।

শ্রীলালবাহাদুরের এই সিদ্ধান্ত অন্ততঃ পূর্বোক্ত প্রমাণ করে যে, দৈনন্দিক সামর্থ্যের দিক দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর যুগ্ম দায়িত্ব বহনে অক্ষম। কাশ্মীর সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নের স্মৃতি সমাধান শ্রীলালবাহাদুরের একান্ত কাম্য। আর বিশেষভাবে এই কারণেই তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন বলে বিবেচনা করেন। অথচ গোষ্ঠীনেতৃত্বের প্রভাবসম্পন্ন ক্ষুদ্রকায় প্রধান মন্ত্রী গত জুন মাসে যে 'হার্ট-এটাক'-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন তা' থেকে আরোগ্যলাভ আশাহীনরূপে ঘটা নিশ্চিত হয় নি।

এ অবস্থায় শ্রীলালবাহাদুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগের সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে সমর্থিত হলেও তাঁর নির্বাচন কিঞ্চিৎ বিস্ময়েরই সৃষ্টি করেছে। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা এবং নেহেরুতনয়ী শ্রীমতী ইন্দিরা যিনি সম্প্রতি তথ্যমন্ত্রীর পদে বৃত্ত হয়েছেন—এঁদের বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যাপার সংক্রান্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে তুলনায় স্বল্পখ্যাত সর্দার স্বরণ সিং-এর নির্বাচন অবশ্যই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু অপ্রত্যাশিত তাবেই, ইসলামাবাদ হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমহম্মদ করিম চাগলা ইসলাম-রাষ্ট্র পাকিস্তানের কাছে অবাস্তব; কারণ তিনি কাশ্মীর সংক্রান্ত অনমনীয় মনোভাবের অধিকারী।

আর শ্রীমতী গান্ধী এই পদের জন্য অনেকের সমর্থন লাভে ধন্য হলেও তাঁর সমালোচকের সংখ্যা ততোধিক। সমালোচনার বিষয় : ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর ও ষিটখিটে মেজাজ এবং রাজনৈতিক বিচারে তাঁর বাম-বৈষ্ণব দৃষ্টিভঙ্গী।

অপর পক্ষে সর্দার স্বরণ সিং-এর শত্রু অথবা সমালোচকের সংখ্যা নগণ্য। আইনের ডিগ্রীধারী শ্রীসিং নেহেরু-কেবিনেট-এ দীর্ঘ বারো বছরেরও বেশী কাজ করেছেন এবং এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে কর্মক্ষেত্রে তিনি কোনোদিন স্বৈর্য হারান নি কিংবা ধৈর্যচ্যুত হন নি। কংঘী (চিরুণী), কড়া (লোহার বাল), কুপাণ, কেশ এবং কচ্ছু (আঙুরওয়ালা জাতীয় পরিধেয়) সম্বলিত হলেও শিখ সর্দার স্বরণ সিং-এর ধর্মীয় মতবাদ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও উদার।

শ্রীসিং হস্তোত্তম চমকপ্রদ জৌনুব অথবা আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী নন; কিন্তু অস্তিত্বলাভে তিনি ধন্য। জাপান, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং রেড চায়নায় তিনি ভারতীয় দলের নেতৃত্ব নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। এমন কি পাকিস্তানও শ্রীসিং-এর আপোষধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থনই করে। নির্দিষ্টায় ধরে নিতে পারা যায় যে, শ্রীসিং-এর ফরেন পলিসিতে মধ্যপথপ্রায়ী প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে। যে দৃষ্টিভঙ্গীকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের চিরন্তন নিরপেক্ষ-নীতি অহুস্ত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান আদান-প্রদানের বন্ধন দৃঢ়তরই হবে। সৈনিকোচিত আহুগতাই শ্রীসিং-এর চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ বলে বিবেচিত। অর্থাৎ শ্রীসিং কোনো পৃথক অথবা স্বাধীন ব্যক্তিত্ব নয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসিং প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীরই মুখপাত্র।

স্বর্গত নেহেরু একদা শ্রীসিং সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'Singh is a very modest, a very clear-headed and a very hard working colleague'. অর্থাৎ শ্রীসিং অত্যন্ত বিনয়নম্র, অত্যন্ত স্বচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমী সহকর্মী।

একাল বৎসরান্তে

মহর্ষি প্রেমানন্দ

[সিদ্ধ যোগাচার্য্য মহর্ষি প্রেমানন্দজী একটি বিশিষ্ট যোগধারার প্রবর্তক—গীতাভারতী মিশনের প্রতিষ্ঠাতৃ গুরু। একাল বৎসর বয়স্ক্রম পূর্তিতে তিনি স্বীয় জীবনের ভাবগম্ভীর যে কাব্যরূপ দিয়াছেন তাহাই এখানে প্রকাশিত হইল। তাঁর স্বল্প জীবনামৃত্তির গভীরতা ও তার স্মরণসম্পন্ন অল্প কাব্যরূপ কবিতাটিতে সুপরিষ্কৃত। প্রঃ সঃ]

কত হর্ষ বিবাদে বলাকা পাখায়
ক্লান্তিকর বস্তুর দিন কেটে যাব
মান লগ্ন উত্তরিয়া উন্নত অধীর—
আজি গুরু একান্তর অর্ধ শতাব্দীর।

কালের কুটিল পথে তিতীষ পথিক
অতী-প্লুত অভিযাত্রা, জীমূত তুফিক
সৌভাগ্যের অপেক্ষায় প্রাণরসধারা
নিঃশেষে হথেছে ক্ষয় করে সর্বহারার।

শ্রান্তিহরা বিশ্রান্তির পরশন মাগি'
অতপ্লিত নিশিদিন রহিয়াছি জাগি,
বক্ষের আড়ালে ছিল লক্ষ আশা যত
কালের সংঘাতে সবি' হ'য়ে মূর্ছাহত।

আধারের ছায়াঘেরা শুক কালজলে
নিশ্চলিম নিশীথের নিরুদ্ধ অঞ্চলে
পঙ্কজ কোরক যথা বিকাশ আশায়
কাঁপে ধীরে ভ্রমরের আসন্ন স্পৃহায় ;

বর্ষার বাতায় ক্লাস্ত ছিন্ন মেঘ পথে
উছসি' উঠেছে আলো ক্ষণিকের রণে,
জীবনের পাদপীঠে প্রাণের কমল—
অনির্বাণ দীপালোকে হ্রস্ব উজল।

কত আশা নিরাশায় এ বীণার তার
রাগিণী সংলাপে ছিঁড়ে গেছে বাব বার
ব্যথিত হষেছে গতি কালের উপলে
নেমেছে গোধূলি ছায়া উদয় অচলে।

কতবার গাহিয়াছি উষার বন্দনা—
কতবার ধুঁজিয়াছি আলোর অঙ্কনা,
জীবনের থলুচরে প্রদোষ বেলায়
শাস্ত সমাহিত প্রাণে শুক মহিমায়।

কখনো ভরেছে পাত্র সোনালী রেণুতে,
শুনেছি বিজয়ী সুর বেতস বেণুতে ;
আবার ঘিরেছে পথ নিরুদ্ধ আধার
জীবনের পূর্ণ পাত্র করিতে উজাড়।

জীবনের বিসারণে কত শ্রোতধারা
জাগিয়া দুর্দাম বেগে হয়ে পথহারার
অর্ধ শতাব্দীর মাটি করেছে সুষম
মরুমুখী কুহুমের উদ্যানের সম।

পুনঃ পথ চলিয়াছি নিঃস্বতায় দহি
বিদগ্ধ পরাগদল ভাঙ্গা বৃকে বহি
অজ্ঞানার পরশনে গভীর উল্লাস
পেয়েছে অলক্ষ্য হাত নিষত আশাস।

বিশ্বাঘের তরীখানি বিসারিত গানে
ধরেছিল পাড়ি তার দিগন্তের পানে,
অস্তুর-দেবতা মোরে অনন্ত ভাষায়
কহিয়াছে কত কথা নিত্য নিরালাষ।

কান পেতে শুনিয়াছি সে আশার বাণী
বেদনার বিনিময়ে লইয়াছি মানি।
হাসির আড়ালে ঢাকি ক্ষোভ ক্ষিপ্র মনে
নির্ভয়ে চলেছি পথ কাল উত্তরণে।

মানি নাই পরাজয় ললাট লিখন
সংগ্রামী সৈনিক বেশে করেছি গমন
অদেখা আখরে লিখি কত রক্ত লেখা
ছিন্ন শিরস্ত্রাণ শিরে চলিয়াছি একা।

প্রদীপ্ত অস্তুর ছিল, সত্যছিল সাধী
সেই দীপ্তিস্পর্শে করি শঙ্কাহীন রাতি
সম্মিত গৌরবে মোর জীবনের রথ
চলিয়াছে নিরস্তুর তেদি' মরুপথ।

আমারে ঘিরিয়া যা'রা তা'দের বেদীতে
সুখের দীপালী কভু পারিনি জ্বালিতে।
মোর মর্ম দাবদাহে হষেছে লাক্ষিত
সেই শাস্ত শিবজনে করেছি বক্ষিত।

ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের তপ্ত আঁখিজল
করেছে উন্মনা মোরে, করেছে চঞ্চল,
দেখাতে পারিনি পথ ভোগ-বাসনার
অচঞ্চল আলোকের প্রদীপ শিখায়।

একান্ত স্বপ্নন যাবা ছিল স্নেহময়
অনামীয় রূপে নিত্য দিল পরিচয়।
কঠোর সংঘাতে ত্যজি' বাহা হেথা প্রিয়—
বরিয়াছি বৈরাগীর ছিন্ন উত্তরীয়।

আসক্তি বন্ধনহীন মোর অভিযান
প্রজ্ঞার আলোক লভি' হয়েছে মহান—
ঐহিক দুঃখের মাঝে শাস্ত তুখের
অলেছে বস্তুকাখানি বিশীর্ণ প্রাণের।

মধুগর্ভ কমলের গোপন গহ্বরে
চন্দ্রমা দেখাল পথ অসুপ্ত ভ্রমরে
স্ব-সম্বিত জ্ঞানাল যে আস্বারে অক্ষয়-
অস্বিতায় বিশ্বাস্তার দিল পরিচয়।

সেই মধুভাণ্ড হ'তে মাধ্বী বিতরিতে
আহ্বান করেছে আমি অধ্যাত্ম-তৃষিতে।
বিভেদের বিভ্রান্তিরে করে দিতে দূর—
বিশ্ব মাছুষের প্রাণে তুলি মৈত্রী হুর।

সোহিনীর সেই হুরে ব্যথারে ভুলেছি
কালের কুলিশ বক্ষে ভ্রুকুটি হেনেছি।
প্ৰীতির পসরা লয়ে প্রতি ঘারে ঘারে
অমৃতের আমন্ত্রণে ডেকেছি সবাবে।

অস্তরের আনন্দের সে উর্মিধারায়
জীবন শ্রোতের গতি মালিন্য হারায়
অলকায় উপেক্ষিতা বেদন মর্ত্যের
যক্ষ যাগে প্রতীক্ষায় শুভ মুহূর্তের।

তুহিন গহবতলে শিব সাধনার—
হল কি সার্থক আজি বিরহী উমার ?
বশিষ্ঠের মধুমান শাস্ত তপস্তায়—
মর্যদাহী বিশ্বাসিত্য সরমে লুকায়।

অরুণের আসো লাগি নিশার কাদন
হারায় নীলিমা বুকে, না মানে বাঁধন,
পূরব দিগন্তে জানি শুকতারাখানি
বাহিত কালের পথে লইবে কি টানি ?

সমর্পণ

আচার্য্য শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা সকলেই শিবস্বন্দরের কোলের শিশু এবং তাঁর খেলার পুতুল। আমরা শিশুর মতই কত কল্পনা জল্পনা করি, কত আশা আকাঙ্ক্ষা করি। আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'লে অভিমানে স্ফীত হই, বাসনা পূর্ণ না হলেও, অভিমানে আঘাত লাগলে বেদনায় অস্থির হই ও কাঁদি। শিবস্বন্দর তাঁর খেলালমত আমাদের নিয়ে বিচিত্র খেলা খেলে চলেছেন, কখনো হাসাচ্ছেন, কখনো কাঁদাচ্ছেন, কখনো বাসনা পূরণ করছেন, কখনো সব আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দিচ্ছেন, কখনো অভিমানকে স্ফীত ক'রে তুলছেন, কখনো আঘাত দিয়ে সব অভিমান ভেঙ্গে ছুরমার করে দিচ্ছেন। তাঁর সব খেলাতেই আনন্দ। যারা ভক্তি-বিশ্বাসের চক্ষুস্পন্দ করেছেন তারা তাঁর সব খেলার মধ্যেই মঙ্গল ও সৌন্দর্য্য দর্শন করে। তারা তাঁর দিকে চেয়ে বাসনাপূর্তিতেও যেমন মঙ্গল ও সৌন্দর্য্য দেখে, বাসনার ব্যর্থতাতেও তেমনি মঙ্গল ও সৌন্দর্য্য দেখে, তারা হেসেও যেমন আনন্দ পায়, কেঁদেও তেমনি আনন্দ পায়। তারা জানে যে, আমরা শিবস্বন্দরের

রাজত্ব বাস করি, তিনি আমাদের জন্ত যখন যে বিধান করেন, তাই শিব, তাই স্বন্দর, তাই মধুর, তাঁর সব বিধানের মধ্যেই তিনি আমাদের পরম কল্যাণ ও আনন্দের পথে নিয়ে চলেছেন। আমাদের নিয়ে তাঁর খেলা যখন সাদৃশ্য হবে, তখন তিনি আমাদের সর্বপ্রকার ব্যক্তিত্বের অভিমান, বর্ত্ত্বত্বের অভিমান, ভোক্ত্বত্বের অভিমান, জ্ঞানাত্মিকতা, ভক্ত্যত্মিকতা এমন কি সাধন ভজনের অভিমান নিঃশেষ করে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মসংকট করে নেবেন, আপনার অমৃতময়, আনন্দময়, কল্যাণময় স্বরূপে বিলীন করে নেবেন। এই বিশ্বাস নিয়ে, এই পরম আশা নিয়ে তাঁর প্রেম ও করুণার উপর একান্ত নির্ভরশীলতা নিয়ে তাঁর এই খেলার সংসারে জীবনপথে এগিয়ে চলতে হবে। সারা জীবন দিয়ে শিবস্বন্দরের জয়গান করতে হবে।*

* জৈনিক ভক্তকে লিখিত পত্রাংগ। শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারীজী, দোমস্তে প্রাপ্ত।

ভারত রাষ্ট্রের গতিপ্রকৃতি

শ্রীতারাকিশোর বর্দন

চীনের সঙ্গে ভারতের একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের অবতারণা হয়েছে। ভারতপ্রেমিকদের প্রধান কর্তব্য এখন কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে সমাজদেহে আদর্শের মোহে যে সব বিভ্রান্তির আবর্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে, দেশসেবকদের কর্তব্য এখন এসব সরকারী কর্তৃপক্ষের ও জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। রাজনীতিতে যাহাকে ইমার্জেন্সি বা সঙ্কট বলে তাহা স্বল্পকাল স্থায়ী। কিন্তু চীন-ভারত সমর দীর্ঘস্থায়ী এ ধারণা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলালজীও প্রকাশ করে গেছেন। এ বিষয়ে জনসাধারণও একমত। ইমার্জেন্সির অজুহাতে যদি আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধিত না হয়ে সমাজদেহে বিস্তারিত থাকে তবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ আমাদের পক্ষে অন্ততই হবে।

এখন শিল্পক্ষেত্রে সরকারী মালিকানা ও বেসরকারী মালিকনার কথা ধরা যাক। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিচার করে দেখতে হবে, কোন্ প্রণালী কম খরচে উৎকৃষ্টতর মাল বৈশী পরিমাণে তৈরী হ'তে পারে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত অমুরাগ-বিরাগের প্রশ্ন নাই, রাজনীতির হৈ-হল্লোড়ের এবং আইডিয়োলজির তর্কবিতর্কেরও প্রয়োজন নাই। কেবল প্রয়োজন আছে হিসাব-রক্ষা ব্যবস্থার (Accountancy)। সরকারী মালিকানা ও বেসরকারী মালিকানার ক্ষেত্রে যে পক্ষ দেশবাসীকে উন্নততর আর্থিক স্বচ্ছন্দের মধ্যে রাখতে পারবে তারই জয় হবে। যে কোন দেশে ও কালে যতক্ষণ একদল সততাপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং সুদক্ষ রাজকর্মচারীর অভাব না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারী মালিকানার ক্ষেত্র সীমায়িত করতে হবে। অল্পাধিক অনর্থ ঘটবে, দেশ দুর্নীতিতে ও চোরা কারবারে-অতিষ্ঠ হবে। এদেশের তো সেই অবস্থা এসে গিয়েছে। গবর্ণমেন্ট বসছেন—তাঁদের পরিচালিত কারবারে অনেক লাভ হচ্ছে; কিন্তু লাভের টাকাটা কোথায় যাচ্ছে—তার হদিশ তাঁরা এখনও পাচ্ছেন না! মাঝে মাঝে অডিটার জেনারেলের হিসাব সম্বন্ধে মতামত দেখে জনসাধারণের মনে সন্দেহের ভাব এসে গিয়েছে, রাজকর্মচারীগণের সততা ও দক্ষতার অভাবেই দুর্নীতির প্রসার হচ্ছে। অদক্ষ, উদারনীতিক গণতন্ত্রের মধ্যেই দুর্নীতি পরিপুষ্ট

হয়, তারপর সরকারী মালিকানার ক্ষেত্রে উহা ফলে-পুষ্পে অশোভিত হয়ে মন্ত্রীপর্যায়েও প্রভাব বিস্তার করে। তার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি বিভিন্ন মূর্তিতে দেখা দেয়। এই পরিবেশে দেশপ্রেম ক্ষীয়মান হয় এবং কমিউনিজ্‌মের বীজাণু দ্রুতগতিতে বংশবিস্তার করে। এই দুর্নীতি কিতাবে অল্পবিধ মূর্তি গ্রহণ করে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করছি। সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা উহার অল্পবিধ রূপ।

কলিকাতা হ'তে রেল-দপ্তরের আপিস বা দামোদর-ভেলী কর্পোরেশনের আপিস অল্প প্রদেশে সরিয়ে নিতে হ'বে। তাতে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অপচয় হবে অথবা হবেনা, সে প্রশ্ন বিচার্য্য হল না। কারণ গণতান্ত্রিক ভোটের জোরে (brute majority) সেই প্রস্তাব গৃহীত হবে। আসাম হতে উদ্বাস্তুসহ সমস্ত বাঙ্গালীকে উচ্ছেদ করতে হবে—তাতে ভারতের ক্ষয়ক্ষতি যাহা হয় হউক, তা ভাবতে হবে না। এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যে যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সি, আই, ডি, বিভাগ পূর্বে তার কোনও খবরই রাখলো না। ঘটনাগুলি ঘটে যাবার পর দেখা গেল প্রায় একলক্ষ লোক গৃহত্যাগ করতে বাধ্য ও দশমহত্ম গৃহ ত্যাগীভূত। শত শত কুলনারী ধর্ষিতা এবং লক্ষ লক্ষ টাকার ভারতীয় সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। এত বড় একটা ঘটনার মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা তদন্ত কমিটি গঠনের ব্যবস্থা হতে পারল না। কেন্দ্রীয় সরকার এই আসামী নৃশংসতার যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, বঙ্গবাসীগণ তাঁদের স্মৃতি-চেতনা থেকে এই মর্মান্তিক চিত্র মুছে ফেলতে পারবে না।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনামূলে যখনই একটি বিশালায়তন শিল্পক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন হয় তখনই দেখা যায় যে কোন্ প্রদেশে ঐ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে অর্থনীতির যৌক্তিকতা ভারতের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা না করে প্রাদেশিক রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ কোন্ প্রদেশের উপর করুণা বর্ষণ করলে কংগ্রেসের দলের হাতে ভারতের শাসন-কর্তৃত্ব বজায় থাকে সেটাই হচ্ছে আসল কথা। তাতে ভারতের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব তুলিয়ে যাক।

কংগ্রেস দলের হাতে দেশের স্বার্থের চাইতে এখন পাটির স্বার্থ বড় হয়েছে। তৈলশোধনাগার গোঁহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে। ভাগ্যিস চীনা সামরিক বাহিনী ১৯৬২ সালে নেফাতে ওয়ালাং পর্যন্ত এসে ফিরে গিয়েছিল। নইলে গোঁহাটি তৈল শোধনাগারটির কি অবস্থা হতো? তা ছাড়া এখন তো পাক-চীন মিতালীর ফলে গোঁহাটির ঐ কেন্দ্রটির বিপদ আরও বেড়ে গিয়েছে। একথা বলা যায়, সর্ব রকম যুক্তিতে ঐ শোধনাগারটি কলিকাতার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমগ্র ভারতের স্বার্থের অমূলক হত। তা সত্ত্বেও আসামের এবং বিহারের কংগ্রেস দলের মন রক্ষার জন্য ঐ কারখানাকে বিধিত করে এক ভাগ গোঁহাটিতে ও অল্প ভাগ বারৌণীতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, এসব ব্যাপারও দুর্নীতি-পর্যায়ভুক্ত হওয়া উচিত।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যখনই ভারত অল্প রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও বিষয়ের দরকষাকষি করছে তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভারত। আবার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে দর কষাকষির ব্যাপারে যখনই কেন্দ্রীয় সরকার হাত দিয়েছেন সেখানেই দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতুল মনোভাবের পরিচয় বাঙ্গালী স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হ'তেই পাচ্ছে, ইহা দিনের মতই স্পষ্ট।

পূর্ব পাকিস্তানের গত জাহ্নুয়ারী মাসের ঘটনাবলী এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতা, আমসেদপুর ও রাউরকিলায় যা কিছু ঘটেছে তাতে বাঙ্গালী জনসাধারণ একদিকে শোকময় অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবহার যা বিধান সভার আলোচনা পরিষূত হয়েছে তাতে বাঙ্গালী ক্রুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ক্রোধের যথেষ্ট কারণ থাকলেও সরকারের বিপক্ষে কোনও প্রকার আন্দোলন করে নাই। বাঙ্গালীর স্বদেশাভিমানের ইহা পরিচয়। পিণ্ডি-পিণ্ডি পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বিপদের সত্তাবনা বিগ্ৰহমান। এর প্রতীকার নিশ্চয়ই বাঙ্গালীকেই করতে হবে। কিন্তু এজন্য স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন আছে।

পাকিস্তানের উদ্ভূত কটাহ থেকে বাস্তহারার দল এসে জলন্ত চুল্লীর ভেতর পড়ে যাচ্ছে। শরণার্থীগণকে আশ্রয় দেবার দাবি পুনর্কাসন দপ্তরের। যে ব্যাপারে স্বয়ংস্বতার প্রয়োজন সেখানে লালফিতার প্রাহুর্ভাব। যে অভাবটা গান্ধীযুগের কংগ্রেসকর্মীগণ মিটাতে পারত, সে সদিচ্ছা ও ত্যাগ বরণের মনোভাব এখনকার কংগ্রেসকর্মীগণের নাই। পশ্চিম জার্মানীতে শরণার্থী-সমগ্রা বাংলাদেশের চাইতে বেশী বই কম নয়। কিন্তু সেখানকার কর্তৃপক্ষ এই স্বয়ংস্বতার ক্ষোভেই সে দেশের সমগ্রা মিটিয়েছেন? কংগ্রেস কমিটি যদি গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে হাত দিত তা হলে বিরোধী দলগুলির হস্তার্পণে ব্যাপারটা এত তালগোল পাকিয়ে যেত না। কিন্তু সে যুগের কংগ্রেস মরে গেছে। এখনকার কংগ্রেস তো লাইসেন্স পারমিট এবং সরকারী মালিকানার কারখানাসমূহের চাকুরী বর্ডন এবং কন্ট্রাক্টারী দিবার লোভ দেখাইয়া ভেদে সংগ্রহের একটা যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস কমিটি এখন সরকারের একটা হাঁ-হুজুরে পরিণত হয়েছে। কাজেই সরকারী মহলে কথা উঠেছে যে, “আমরা বাস্তহারাদের অমূল্য করে আশ্রয় দিচ্ছি।” শ্রীমতী জাহ্নুলাল নন্দ এবং শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন একদা তা লোকসভায় বলেছেন। যে জিনিষটা কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে তাকে অমূল্য করে নিয়ে আসা হয়েছে। কেন, বাস্তহারাগণ কি ভারত ছাড়া অন্য কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করে এতদিন পরিবর্তিত হয়েছিল? তাদেরকে বিদেশের ভাবেদারীতে ফেলে দিল কারা? সে সময়ে তাদের কি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল?

বর্তমানে বাঙ্গালী জনসাধারণের মন নিরাশায় ভেঙ্গে পড়েছে। একটা কিছু করা উচিত এ ভাবন সবারই। কিন্তু কি করা যেতে পারে সে বিষয়ে বাঙ্গালীর মতিস্থির নাই।

গান্ধীযুগে কংগ্রেসের যে আদর্শ ছিল তা' থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত আজকের কংগ্রেস। এখন উপায় কি? আজকের ইহাই বড় প্রশ্ন। কংগ্রেসের ভিতরে অথবা বাহির হতে এ প্রশ্নের সমাধান হবে তাও চিন্তনীয়।

আলোচনা

স্কুল ফাইন্সাল

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

কাগজে খবর দেখলাম এবারকার স্কুল ফাইন্সাল পরীক্ষায় ফেল করেছে শতকরা প্রায় ৭৫ জন পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা দিয়েছিল রেগুলার ছাত্র ৪৪,০৭৫ জন, প্রাইভেট ছাত্র ৮০,২৫২, মোট সংখ্যা ১২৪৩০৮ জন। এদের মধ্যে ফেলের সংখ্যা নব্বই হাজারের চেয়েও বেশী। যদি ধরে নিই এরা সকলেই আবার আসছে বছর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করবে, তা হলে নব্বই হাজার জীবনের এক বছরের অগ্রগতি নষ্ট হলো, ব্যাপারটা নেহাৎ উপেক্ষণীয় নয়। তবে এই ধরনের ব্যাপার বছরের পর বছর ঘটে যাচ্ছে বলে আমরা এটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তার উপর এটা বেদান্তের দেশ—এখানে সবই মায়া, আর নয়তো পূর্ব-জন্মের কর্মফল ও অদৃষ্ট।

কর্মফল কথাটা খুবই সত্য। স্বাধীনতা লাভের আগে বিদেশীর কর্মের ফলটা আমাদের ভুগতে হতো, কিন্তু স্বাধীন হবার পরে আমাদের কর্ম করার যে অধিকার এসেছে, তার ফলটাই আমরা ভোগ করছি। তবে সেটা গত জন্মের নশ, সেটা এই জন্মের এবং প্রত্যক্ষ।

ইংরেজরা এদেশে একটা শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, সে ব্যবস্থায় ক্রটি ছিল, স্বাধীন হবার পর দেশের প্রয়োজনে যেগুলি সংশোধন, পরিবর্তন ও উন্নতি বিধান করার কথা, সেই দিকে স্তম্ভ ব্যবস্থা করার জন্ত মধ্যশিক্ষা পর্যন্ত করা হয় বলেই আমার ধারণা। পর্যন্ত পাঠ্যসূচীর নানা অদল-বদল করেছেন, কিন্তু শিক্ষাদানের ব্যবস্থার উন্নতি করতে পেরেছেন কিনা তা-ই জিজ্ঞাস্য।

বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুদ্ধিজীবী, দারিদ্র্য যতই হোক পিতামাতা সর্বস্ব পণ করে ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখান। এই শ্রেণীর ধারণা—স্কুল ফাইন্সাল পাশ না করলে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা হলো না। এই-জন্তই বোধ হয় আগের যুগে এই পরীক্ষাটিকে ‘প্রবেশিকা’ পরীক্ষা বলতো। স্কুলের দশটি শ্রেণী পার হয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েদের তিন-চতুর্থাংশ যদি অকৃতকার্য হয়, তা হলে সমাজজীবনের দিক থেকে যে ক্ষতি হয় তা উপেক্ষা

করলে জাতির সর্বনাশ। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ আজ সেই সর্বনাশের সম্মুখীন হয়েছে।

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়—আজকাল ছেলে-মেয়েরা পড়ান্ত না করে না। এই না-পড়ার দুটো দিক আছে—পড়া ও পড়ানো। প্রথমে পড়ার কথাই ধরা যাক। একজন স্কুল ফাইন্সাল পরীক্ষার্থীর বয়স পনেরো-ষোলো বছর। তাকে পড়তে হয় মাতৃভাষা ছাড়াও আরো দুটি ভাষা, ইংরেজী ও সংস্কৃত। মোটামুটিভাবে তাকে কত পৃষ্ঠা পড়তে হয়, তারই একটা আনুমানিক হিসাব প্রথমে ধরলে অর্থোক্তিক হবে না।

ইংরাজী গদ্য ও পদ্য : ১০০ পৃষ্ঠা ; ঐ অর্থ পুস্তক : প্রায় ৬০০ ; ঐ গ্রামার : ৫০০ ; ট্রান্স্লেসন : ৫০০ ; বাংলা গদ্য ও পদ্য : ১৫০ ; ঐ অর্থ পুস্তক : ৫০০ ; ঐ সহপাঠ্য : ১০০ ; ঐ ব্যাকরণ : ৩০০ ; সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য : ৩০ ; ঐ অর্থপুস্তক : ৫০০ ; ঐ ব্যাকরণ : ৩০০ ; ইতিহাস : ৪০০ ; শাসনতন্ত্র : ১০০ ; ভূগোল : ২০০ ; পাটিগণিত : ৪০০ ; বীজগণিত : ৪০০ ; জ্যামিতি : ৩৫০ ; মোট—৫৪৩০ পৃষ্ঠা।

এ ছাড়া পরীক্ষার আগে প্রত্যেকটি পরীক্ষার্থীকে একখানি টেস্ট পেপারের অন্ততঃ ৩০০।৪০০ পৃষ্ঠা ভাল-ভাবে প্রশ্নোত্তর তৈরী করতে হয়।

এই প্রস্তুতি ছ’ বছরের। ছ’ বছরে দিনের হিসাব ৭৩০ দিন, পাঠ্য বইয়ের মোটামুটি পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৬০০০। ফাইন্সাল খেলা, লীগ ও শীল্ড, হকি-ফুটবল-ক্রিকেট, স্পোর্টস্ এবং সার্বজনীন সোরগোল বাদ দিয়ে ৭৩০ দিনের মধ্যে যদি ৬০০ দিনও পড়ার জন্ত রাখা হয়, তা হলে একটি ছেলেকে গড়ে প্রতিদিন ১০ পৃষ্ঠা করে ছ’ বছর পড়তে হবে, কিন্তু কোন সাধারণ ছেলেমেয়ের পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়, তার কারণ সময়ের অভাব ও শক্তির অভাব। দিনে দশটা থেকে চারটে অবধি স্কুল, তারপর খানিক খেলাধুলা বাদ দিয়ে ছাত্রছাত্রীর নিঃস্বপ্ন পড়ার সময় থাকে তিন ঘণ্টা ও রাত্রে তিন ঘণ্টা, সকালে তিন

ঘণ্টার মধ্যে আবার সরকারী ছুঁধের জন্ত প্রতিদিন আশ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হবে, তা ছাড়া বাজারে হয়তো মাছের লাইন এবং সপ্তাহে একদিন রেশনের দোকানে লাইন দিতে হয়। (অভিভাবক হয়তো তখন কোন কাজে হু' পয়সা আয়ের সন্ধানে বেরোন)। এর উপর নিজের অথবা বাড়ীতে কারও অসুখ হলে সারা সকালটাই ডাক্তারখানায় কাটাতে হয়। ছাত্রজীবনে সময়ের অপচয়ের এই দিকটা জাতীয় শিক্ষাবিদদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

এরপর শক্তির অভাবের কথা। উঠতি বয়সে দেহকে শক্তির জোগান দেবে খাদ্য। আজকের বাঙালী ছেলে পুষ্টিকর খাদ্য কতটা পায়? তেল, ঘি, মাখন যে খাঁটি হয় স্বাধীন বাংলায় নতেরো বছরে তার কোন প্রমাণ বর্তমান আছে কি? তা ছাড়া ডিম ও মাংস হুমুঁচ্য, মাছ জুলত। পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিদ্রা বলেন যে, কোন মানুষের মস্তিষ্ক তার দেহের তুলনায় দুই শতাংশ মাত্র, কিন্তু দেহকে সক্ষম রাখার জন্ত যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি মস্তিষ্ক তার তুড়ি শতাংশ গ্রহণ করে। এবং এই ত্রৈণকে সক্ষম ও সমর্থ রাখতে হলে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন আছে। আজকের বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য কতটুকু পায়? ছাত্রছাত্রীর মেধা এজন্ত দুর্বল হয়, অল্প পড়াশুনা করেই যদি ক্লাস্ত হয়, সেজন্ত দায়ী কি তারা? না, যে রাজ্যে শুধুই ডেজাল বিক্রী হয় সেই রাজ্যের শাসনপদ্ধতি?

এবার পড়ানোর কথা। প্রথমেই কথা উঠবে অল্প বিষয় ভালোভাবে শেখানো ভাল, না বেশী বিষয় গোঁজামিল দিয়ে শেখানো ভাল? প্রশ্নজত: বলতে পারি, ইতিহাসখানি স্কুল ফাইন্সালে পড়ানো হয়, সেখানি ভালোভাবে পড়লে বোধহয় বি-এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া যায়। স্কুল ফাইন্সালের পাঠ্যপুস্তক এতো বিস্তার কেন? পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পিরিয়ডে চল্লিশজন ছাত্রছাত্রীকে একজন শিক্ষক কি শেখাতে পারেন? ব্যক্তিগত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব কি? অনেক প্রাইভেট স্কুলে একজন শিক্ষক চলে গেলে নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। এই সময় সেই

বিষয়ে পড়ানোর কোন ব্যবস্থা থাকে না। উপরন্তু প্রাইভেট স্কুলে একটা কারচুপি অনেক ক্ষেত্রেই শোনা যায়, শিক্ষকেরা যে বেতন পাচ্ছি বলে সই করেন তার চেয়ে অনেক কম বেতন হাতে পান, সেটা সেক্রেটারীর পকেটে যায়। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকার স্তায়নিষ্ঠভাবে কাজ করার ইচ্ছা থাকে না, অল্পসংস্থানের জন্ত তাঁকে সকাল-সন্ধ্যা টিউশনি করতে হয়, তার ক্লাস্টি জমে দিগ্রহরে। এর প্রতিকার কি? সরকারী বিদ্যালয়ের কথা ভিন্ন, কিন্তু সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কয়টি? বিদ্যালয়-পরিদর্শক আছেন, কিন্তু এক একটি স্কুলে তাঁরা বছরে কদিন যেতে পারেন? এর উপর যেসব ক্ষেত্রে মর্নিং স্কুলের ব্যবস্থা, সেখানে তো সময়ের ফাঁকিই সবার আগে উদ্বেগযোগ্য।

সবার শেষে পরীক্ষার কথাটাও ভাবতে হবে। অঙ্ক-শাস্ত্রে নম্বর দেবার মাপকাঠি আছে, কিন্তু সাহিত্যে নম্বর দেবার মাপকাঠি কি? সাহিত্যে যে লেখাটা রামবাবুর কাছে ১০ নম্বর পেলো, শ্রামবাবুর কাছে তা-ই হয়তো পেল ৫ নম্বর। সব খাতা কিছু একজনের হাতে পড়ছে না, যে একই মান থেকে বিচার হবে। কিন্তু এই বিচারের উপরেই হাজার হাজার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তার উপর প্রশ্ন: আরেকটা মনোভাব দেখা যাচ্ছে যে, পরীক্ষার্থীদের নাজেহাল করার জন্ত পরীক্ষক হয়তো এমন প্রশ্ন করছেন যা অতি দীর্ঘ অথবা অতি দুর্লভ। এবং পরীক্ষার্থীরা সেজন্ত যদি কোন গোল বাধায় তাই পরীক্ষা হলের বাইরে পুলিশ বসিয়ে রাখতে হয়। এতে কি পরীক্ষার মর্যাদা বাড়ে? ছোটরা সামান্য সহানুভূতি পেলেই খুসি হয়, সেখানে নিষ্করণ শৃঙ্খলাবোধ কি মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে সমর্থনীয়?

অভিভাবকেরা সবই জানেন ও বোঝেন। এ বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য আছে—গণতন্ত্রে এই কথাই বলে। কিন্তু গণতন্ত্রের উপরে একটা বস্তু আছে, তা অল্পবস্তু। আমাদের জীবিকার মান বাড়তে গিয়ে এই অল্পবস্ত্রের মূল্যমান যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, তাতে অল্প আয়ের পিতামাতা হু' পয়সা আয়ের চেটা ছাড়া সারাদিন আর কিছুতেই মাথা ঘামাতে পারছেন না। এর ফলে ঋণা নানা



আজিকার অসহনীয় দুর্গতি ও পরিত্রাণের উপায় :

বর্তমান ভারতের বিশেষভাবে বাঙালীর বৈষয়িক দুর্গতি ও নৈতিক অধোগতির ফিরিঙ্গি দিবা লাভ নাই। ইহা সর্বজনবিদিত এবং অধিকাংশ ভুক্তভোগী এই দুরবস্থার নিরূপায় নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ, পীড়িত ও মুমূর্ষু। এই জীবন-মরণ সঙ্কটের সমাধানের জুঁই চিন্তা ও তার পথ নির্দেশের প্রয়োজন আছে। অবশ্য এত বড় মনীষার দেশে আজকের সঙ্কট-ত্রাণের উপায় যে জানা নাই এমনও নহে। অভাব পরিত্রাতার অর্থাৎ নির্দলীয় সত্য ও ত্রায়নিষ্ঠ বলিষ্ঠ নেতৃত্বের। একটা জঘন্য বৈশ্ববৃত্তিমূলক মনোভাব, নির্লব্ধ ঘৃণ্য অর্থগৃহুতা এমন ব্যাপক আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করিয়াছে যে সামগ্রিক দেশ-চিন্তে বিবেক বস্ত্র মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। যেখানেও বা বিবেক-বোধের এক-আধটু অঙ্কুর অন্মান আছে তাহাও অবস্থার চাপে পড়িয়া পাপড়ি মেলিবার আশুকুল্য পাইতেছে না। বর্তমানে জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি ইহাই— এই ব্যাপক দুর্ঘটতি।

সাম্প্রতিক কালে আমরা একজন মাহুষের এই অসহ

অব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা নিরঙ্কুশ হয়েছেন। বিপন্ন অভিভাবক অনেক ক্ষেত্রেই শেষের দিকে বাধ্য হন গৃহ-শিক্ষক রাখতে। গৃহশিক্ষকরা আজকাল ঘণ্টা ধরে পড়ান, শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে শিক্ষাদানের ব্যবসা করাটাই তাঁদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এজন্য বর্তমান অন্ন-বস্ত্র গৃহের অত্যধিক ব্যয়বৃদ্ধি একটা বড় কারণ।

এদিকে সব ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার খরচও বেড়েছে। স্কুলের বেতন বেড়েছে, তার সঙ্গে প্রাইভেট স্কুলের ক্ষেত্রে যোগ হয়েছে—পুওর ফাণ্ড, বিল্ডিং ফাণ্ড ইত্যাদি। পাঠ্য পুস্তকের দাম বেড়েছে, খাতা পেন্সিলের দামও বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন সুরাহা হয়নি (১)। স্বাধীনতার সত্তেরো বছরে আমরা যেখানে এসে পৌঁছলাম, তাতে আমাদের ছাত্রসমাজের একটা

দুরবস্থার প্রতিকারার্থে শুধু কুখিষা দাঁড়াইতে নয়, সক্রিয় হইতে দেখিয়া অঙ্ককারের মধ্যে একটুখানি আলো পাইয়াছি। ইনি হইতেছেন অশীতিপর বুদ্ধ, নীরব কর্মী, অনন্ত গান্ধীনীষ্ট ত্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। বর্তমান সমস্তার মূলীভূত কারণের গোড়া ধরিয়া তিনি টান দিয়াছেন। সরকারী বা বে-সরকারী পুরস্কারের লোভ-মোহ ষাঁর আছে তিনি অবশ্য ইহা করিতে পারিবেন না—জানিয়া-শুনিয়াও ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ করিবেন। এবস্থি লোভী হীন-আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তিই আজকের এই দুর্দশার পরাকাষ্ঠা আনিয়াছে। নানাবিধ সমস্তার সমাধান, দুর্নীতি দূরীকরণ, উদ্বাস্ত পুনর্বাসন প্রভৃতির পরিকল্পনা ত্রীদাশগুপ্ত দিয়াছেন। ইহা সরকারের মনঃপুত হইবার নহে এবং হয়ও নাই, পরন্তু অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সংবাদপত্রে ইহা বহুল প্রচারিত না হওয়ায়, পরিকল্পনার উপযুক্ততাও দেশবাসী বিচার করার অবসর পায় নাই। স্বাধীনতা সংগ্রাম-যুগে যে ত্যাগ-তপস্কারও মনোভাব লইয়া সংবাদপত্র পরিচালিত হইত তাহার অভাব বর্তমানে ঘটিয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত। স্বাধীনতা-উত্তর লুণ্ঠের রাজ্যে ইহা বজায় রাখা খুব কঠিন নিশ্চয়ই। গণজাগরণ ও জনমত সংগঠনের এই প্রচার-যন্ত্রগুলি যদি আর একবার ধনিক-বণিক আর সরকারী প্রসাদের মোহমুক্ত হইয়া জাতীয় কল্যাণের নিরপেক্ষ

বৃহৎ অংশের জীবনের বিরাট অপচয় ঘটবে বলে কি মনে হয় না? এই অঙ্ককারে আলো দেখাতে পারেন এমন একজন শিক্ষাবিদ আজ বাঙালীর মধ্যে নেই কি? আজকের দিনে আমাদের আরেকজন আন্তোষ মুখোপাধ্যায় প্রয়োজন (২)।

(১) অভিভাবকের ধরনের কথা ছাড়াও সরকারী ব্যয়ের কথাটাও মনে রাখতে হবে। কুস ফাইন্ডাল পরীক্ষা অবধি এক একটি ছাত্রপিছু সরকারের খরচ হয় ১৮০ টাকা। এর তিন চতুর্থাংশ যদি অপচয় হয় সে কি জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি প্রতিশ্রুতি বহন করে?

(২) সমাজ-বিজ্ঞানের এই কথাটি স্মরণীয়—“If a part of society is neglected, if a part of society is left uncared for, if a part of society is allowed to rot, the filth accumulated will one day engulf the welkin of our society and the whole social structure will collapse in near future.”

পথটির নির্দেশ দিবার তপস্যা বরণ করিয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে বছরখানেকের মধ্যেই দেশ পরিচ্ছন্ন কলঙ্মুক্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু পারম্পরিক নির্ভর-শীলতার পাপচক্র এমনি অক্টোপাশের মত কঠিন জালে জড়াইয়াছে যে, জ্ঞানপাপী সাজা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ধনিকত্বে এমনি মাথাভারী অবস্থা-ব্যবস্থা যে, যাহারই বিরোধিতা করা আবার বিবেকের বিরুদ্ধে তাহাকেই বহন করা। জীবনের মূল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, এই বিবেক-দৈত্যই আজিকার দিনের বড় অভিশাপ।

●

শ্রীদাশগুপ্ত নিরাশ হন নাই, হইবার মত ধাতুতে তিনি গড়াও নহেন। সেবা ও তপস্যাই যার জীবনব্রত তিনি প্রতিকূলতার পরাধুখ হইবার নহেন। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে পুস্তিকাদির মাধ্যমে তিনি তাঁর মত ও পথের প্রচার করিতেছেন। তাঁর স্বকীয় উদ্বাস্ত-পুনর্কাসন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ‘উদ্বাস্ত সেবা ট্রাস্ট’ গঠন করিয়াছেন। উদ্বাস্ত সেবা ও পুনর্কাসনের ইহাই সর্বপ্রথম সক্রিয় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। ইহার জন্ত কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে বলিয়া তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন। এবং এই টাকার জন্ত তিনি দেশ-বাসীর নিকট আবেদনও করিয়াছেন।

শ্রীদাশগুপ্তের যে উদ্বাস্ত পুনর্কাসনের পরিকল্পনা তার লক্ষ্যণীয় সিদ্ধান্ত এই যে, সরকারী উদ্বাস্ত পুনর্কাসন হিসাবে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে শ্রীদাশগুপ্তের মতে তার এক-চতুর্থাংশ ব্যয়ে বাঙালী উদ্বাস্তর বাংলায়ই পুনর্কাসন করা সম্ভবপর। শ্রীদাশগুপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইয়াছেন : “সংবাদপত্রে বিবৃত হইয়াছে যে, উড়িষ্যা সরকার বাংলার ২০,০০০ উদ্বাস্ত পরিবার বসাইতে ৩৪ কোটি টাকা চাহিয়াছেন এবং উহা মঞ্জুর হইয়াছে। ঐ টাকার এক-চতুর্থাংশে বাংলাতেই বাঙালীকে পুনর্কাসিত করা যায়। প্রাথমিক প্রবাসকালীন ব্যয় বাদে। সেতো দুই ক্ষেত্রেই আছে।”

বাংলায় বাঙালীর পুনর্কাসন সম্বন্ধে সরকারী মহলের কথা এই যে, বাংলায় আর এক বিন্দু স্থান নাই, ‘saturation point’-এ পৌঁছিয়াছে। পক্ষান্তরে

শ্রীদাশগুপ্ত হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহা ঠিক নহে, বাংলায় এখনও পুনর্কাসনের যথেষ্ট অবকাশ আছে। শ্রীদাশগুপ্তেরই হিসাব : “সুন্দরবনে যে জমি ডাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে বসত করান যায় তাহার পরিমাণ আনুমানিক এক চাপে ৪০,০০০ একর ধরিলে, এই প্রকার দুইটি চাপেই ৮০,০০০ একর নতুন জমি বাহির হয়। পরিবার প্রতি ৩ একর বা ৯ বিঘা জমি দিলে ২৫০০০ পরিবার ৫৭০০০ একরে বসত করান যায়। ২৫০০০ পরিবারে ৪ জন প্রতি পরিবারে ধরিলে এক লক্ষ লোক বসত করান যায়। ইহাই কৃষির জমির হিসাব। গ্রাম্যশিল্প দ্বারা বসত করাইলে দেড় বিঘা বা অর্ধ একর বা কৃষির এক ষষ্ঠ জমিতে এক পরিবার বসিতে পারে। আরও এক লক্ষ লোক গ্রাম্যশিল্প দ্বারা বসাইতে আবার আরও ১৩০০০ একর লাগিতে পারে। দুই লক্ষ লোকের জন্ত দরকার তো তবে ৮৮,০০০ একর। এত সংখ্যক একরই সুন্দরবন হইতে পাইতে হইবে এমন কথা নয়। জিলায় জিলায় বহু অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে—গঙ্গার চরে...নদীযায়...২৪ পরগণা বসিরহাট অঞ্চলে তেমনি অনেক জমি পড়িয়া আছে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূমে প্রাপ্তব্য জমির বিবরণ আসিতেছে।”

শ্রীদাশগুপ্ত শুধু জমির হিসাবই দেখান নাই, কৃষি ও গ্রাম্যশিল্প দ্বারা পুনর্কাসনের বিস্তারিত হিসাবও তাঁর উদ্বাস্ত পুনর্কাসন পরিকল্পনায় দিয়াছেন—যাহা সরকারী বে-সরকারী উভয় মহলেরই বিবেচনাযোগ্য।

①

বর্তমানের দুর্নীতি ও দুর্গতি হইতে মুক্তির মোক্ষম রাজপথটির প্রতিও শ্রীদাশগুপ্ত নির্ভীকভাবে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছেন। তাঁর স্পষ্ট অভিমত এই যে, কংগ্রেস ও কংগ্রেসী শাসন ভ্রষ্টাচারী হওয়ার ফলেই আজকের এই অসহনীয় দুর্গতির অশুপ্রবেশ ঘটয়াছে। তাঁরই সিদ্ধান্ত : “কংগ্রেসী ভ্রষ্টাচারের মুক্তির প্রধান পথ ইলেকশনে অর্থ ব্যয়ের জন্ত ধনপতির দ্বারস্থ না হওয়া।” কথাটা অজানা কারও নয়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার বীর্য আর নৈতিক বল আজকের অনেকেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। একদিকে অমুগ্রহ-উচ্ছিষ্টভোজীর প্রাবল্য, অঙ্গদিকে

বিরামহীন জীবন-সংগ্রামে শ্রাস্ত-ক্লান্ত মধ্যবিত্ত সমাজের অবসন্নতা ও অবলুপ্তি। গান্ধীবাদী সতীশচন্দ্রের এই দুর্বলতা নাই এবং নাই বলিয়াই তিনি লিখিতে পারিয়াছেন “জহরলালজী গান্ধীজীর অনতিশ্রুত পথেই চলিয়াছেন।” শ্রীদাশগুপ্ত পণ্ডিতজীর পরলোকগমনের অব্যবহিত পূর্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন : “গান্ধীজীর মৃত্যুর ১৭ বৎসরকাল পরে শ্রীপ্রকাশ তাঁর বয়স্ক ও চীফ জহরলালজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি কি প্রকারের ভারতবর্ষ রাখিয়া যাইতেছ ? ভারতবর্ষের দরিদ্রের জীবনের স্তরে স্তরে কংগ্রেসের ভ্রষ্টাচারের পীড়া বর্তমান। জহরলালজী ইহার উত্তর দিয়া যাইবার সময় পান নাই। আজ শোকমগ্ন ভারতে ঐ শ্রীপ্রকাশের প্রশ্নই ধ্বনিত হইতেছে—এ কেমন ভারতবর্ষ রাখিয়া গেলে ?”

খাটি জহর-চরিত্রের কোন্ হিঙ্গুপথে ভ্রষ্টাচারের শনি প্রবেশ করিল তারও একটা সুন্দর সংক্ষিপ্ত চিত্র শ্রীদাশগুপ্ত নিরলঙ্কার টেলিগ্রাফিক ভাবায় দিয়াছেন : “তিনি (জহরলাল) অসহিষ্ণু ছিলেন।...দেশ ভাগ না করিলে স্বাধীনতা আসিবে না। তবে হউক দেশ ভাগ। এখন সম্পদশালী হওয়া চাই। মূলধন নাই। নাই তো কি হইল ? ধনী দেশ হইতে ধার করা। ধার করা হইল এবং মহাজন দেশ দ্বারা শিল্পায়ণ অবশ্যই প্রভাবিত হইতে লাগিল। বৈদেশিক প্রভাব বিস্তার লাভ করিল। জহরলালজীর একনায়কত্ব চাই। নহিলে কাজ ইঙ্গিত পথে চলে না। একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ডেমো-ক্রেসীর আসল দ্রব্য অন্তর্হিত হইল। ভারতকে অগ্রসর হওয়ার জন্ত প্লানিং চাই। পাঁচ পাঁচ সালের প্লান—প্রথম পাঁচ, দ্বিতীয় পাঁচ, তৃতীয় পাঁচ—এইরূপ পাঁচটা পাঁচশালা প্লান ঠিক হইল। কিন্তু শাসনদণ্ড এক পার্টির হাতে না থাকিলে ঐ প্লান অহুযায়ী চলার দায়িত্ব ঠিক থাকে না। অতএব কংগ্রেসকে রাজপাটে থাকিতেই হইবে। সেজন্ত ভোটের জোর চাই। টাকা দিয়া ভোট কেনা যায়। লও টাকা, লও ক্রোড়পতি ব্যবসাদারদের নিকট হইতে টাকা। লও—কোটি কোটি টাকা লইয়া ইলেকশন চালাও। এইতে ভ্রষ্টাচারের সর্বনাশী কপাট খুলিয়া গেল। ভ্রষ্টাচারের স্রোত দেশের উপর দিয়া বহিল।”

মুদ্রাস্ফীতি ঘটিল, সমস্ত পাপ একসঙ্গে ঘিরিয়া ধরিল। হুর্নীতি, দুর্গতি, দুর্ভোগ গড়াইতে গড়াইতে এমন গড়ানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, কোন অঘটন ঘটন না ঘটিলে আর উজান বাওয়ার কোন আশা ভরসা মিলিতেছে না। শ্রীদাশগুপ্ত এদিকেও আলোকপাত করিয়াছেন। দলাস্তর তিনি চাহেন নাই। চাহিয়াছেন বর্তমান কংগ্রেস দলেরই শোধন। কংগ্রেস তন্ত্রের শুদ্ধির ইঙ্গিতও তিনি দিয়াছেন : “কংগ্রেস ধন লোভে নিজেকে ডুবিয়াছে, দেশ ডুবায়াছে। কংগ্রেসকে রিক্ত হইতে হইবে। কংগ্রেস হইতে চাহিবে না—তখন কংগ্রেসকে বাধ্য করিয়া রিক্ত করিতে হইবে। কংগ্রেস কমিটির পাপ দ্বারা অক্ষিত ও সঞ্চিত অর্থ বাহির করিয়া দিতে হইবে। সাক্ষাৎভাবে উহা সরকারী ধনকোষ তুলত করিয়া দিতে হইবে। তারপর রিক্ত নিঃস্ব কংগ্রেস মেম্বারশিপ্ টাঁদা দ্বারা নিজ কোষ পূরণ করিবে। আঙ্গিকার মত কৌশলে পার্টি শক্তি বাড়াইবার মত অসমুপায়ে বাহিয়া বাহিয়া কংগ্রেস মেম্বর বরা চলিবে না।...ঐ অর্থ ব্যবহার করিয়া কংগ্রেসী পরিচালনা কার্য ও ইলেকশনাদি অমুষ্ঠিত হইবে। পদাধিকারের জন্ত কোনও মনোনীত ব্যক্তি নিজ প্রশংসা বা দাবী প্রচার করিতে পারিবেন না। কংগ্রেস পার্টি থাকিবে না। দল বা পার্টি ভাগ থাকিলেও কংগ্রেস অফিসের উপর সমানাধিকার সকলের থাকিবে। সকল মতের সমাবেশ দ্বারাই গবর্ণমেন্ট গঠিত হইবে। পার্টি গবর্ণমেন্ট থাকিবে না। কোয়ালিশন দ্বারা মন্ত্রীবর্গ নিয়োজিত হইবে এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তই একমাত্র সিদ্ধান্ত হইবে। কাজ তাহাতে ধীরে হইবে কিন্তু অপকার্য আর ভ্রষ্টাচার বন্ধ হইবে।”



শ্রীদাশগুপ্তের ‘সর্বসম্মত সিদ্ধান্তই একমাত্র সিদ্ধান্ত’ নির্দেশটি লক্ষ্যণীয়। প্রবর্তক সজ্ঞ-প্রতিষ্ঠাতা সজ্ঞগুরু শ্রীমতিলাল সজ্ঞ-তন্ত্রে অমুরূপ নীতিরই প্রবর্তন বহু পূর্বে করিয়া গিয়াছেন। সজ্ঞের সাধ্য প্রেমৈক্য। প্রেমৈক্যের সাধনা ও সিদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ এই মতৈক্য। এই সীমিত-চক্রের সিদ্ধিকে সজ্ঞগুরু ব্যাপক জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত করিতে চাতিয়াছিলেন।

অন্তরায় ব্যক্তি অহং ও ব্যক্তিগত আসক্তি। অহং ও আসক্তির রূপান্তর আসে উৎসর্গে—সত্যের শরণাগতিতে। সৎ ও সত্য, স্নমহান আদর্শের আনুগত্য ছাড়া অষ্টাচার শীলসম্মত সদাচারে পরিণতি লাভ করিতে পারে না। গোড়ার কথাটি হইতেছে ব্যক্তি, সমষ্টি ও জাতীয় জীবনের মূল্য ও প্রয়োজন বোধ। প্রয়োজনটি যদি একান্ত বস্তুগত হয় তাহা হইলে কাম-কাঙ্ক্ষার মোহমুক্তি সম্ভবপর নহে। উত্তেজনা, খেয়োখেয়ি, চোরাকারবার, দুর্নীতি সে-ক্ষেত্রে অনিবার্য। ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতি তাই কর্ণের কলাকাজ্ঞা বর্জন করিয়া পশুর বিষদাঁতটি উপড়াইয়া ফেলিয়াছে। রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, অর্থের যে মূল্যমান ভারতবর্ষ নিরূপণ করিয়াছে তাহাতে রাষ্ট্র প্রভৃতি পশুধর্মের উপরে সেই মহৎ লক্ষ্যের উপায়স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। আজকের কংগ্রেস আদর্শের যে ইতিহাস ও ঐতিহ্য তাহাতে ইহাকে খানিকটা সংযত ও শুদ্ধ করা চলিতে পারে মাত্র। কিন্তু আমরা যে দিব্যজীবন ও ভগবত জ্ঞাতির কথা বলিতেছি যাহাই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের শিশন ও আত্মাভিব্যক্তির লক্ষ্য সেই শুদ্ধ সিদ্ধ জ্ঞাতির মাধ্যম আজকের কংগ্রেস নহে। কেন নহে তাহা নয়। দিল্লীতে অস্থিষ্ঠ নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস

কমিটির সাম্প্রতিক অধিবেশনের একটি বক্তব্য হইতেই অহুমান করা যায়। পরলোকগত নেতা নেহেরুজীর উদ্দেশ্যে রচিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত শোকপ্রস্তাবে বলা হইয়াছে “After Mahatmajee passed away Jawarharlaljee has been the Indian Congress and indeed India.” প্রস্তাবে পণ্ডিতজী প্রবর্তিত মত-পথ নির্বচনাতে অহুসরিত হইবে বলিষাও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। নেহেরুজীই ভারতবর্ষ, এ কথা খাটি ভারতাস্থা স্বীকার করিবে না। নেহেরুজীর রাষ্ট্রীয় আদর্শ, জীবনের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী অনাবিল ভারতীয় জীবনধারার অহুকুল যে নহে, ইহা অনিশ্চিত। বৌদ্ধ নীতি ও আদর্শ প্রভাবিত গান্ধী-নেহেরু, বিশেষভাবে মার্কসীয় বস্তুনিষ্ঠ সমাজবাদ-বিভোর পণ্ডিতজী কখনই ভারতীয় মনন-দর্শনের শেষ কথা নহে। ইহা ভারতীয় আত্মাভিব্যক্তির একটি চলতি পর্যায় বলা চলে। ভারত আত্মস্থ হইবে ভারত-আত্মার প্রতীক শ্রীকৃষ্ণ-প্রবক্তিত যোগভূমিতে পুনরাবর্তন করিয়া। আসন্ন ঐ আগামী দিনের আভাস, আমরা শ্রীদাশগুপ্তের জ্ঞানে-অজ্ঞানে কথিত বক্তব্যের মধ্যে পাইয়া আশাবিহিত হইয়াছি। সেইদিন শুধু ভারতই নহে, সমগ্র বিশ্ববাসী অষ্টাচারের আবর্জিত হইতে মুক্তির আলো ও পথ পাইবে।



উৎসব অনুষ্ঠানে—
হৃদয়ব সান্বেদন
অপ্রাধিকার্য্য

৮৬, আম্বাহাষ্ট্রী টি কলি: ২ ফোন-৩৫-১৩৮৩	৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২ ফোন-৩৪-২৫৩৩
--	---

শ্রীমদ্রাহাপ্রভু বলেছেন—

“এই তো কহিলুঁ ভক্তির দিগ্‌দরশন
ইহার স্বরূপ মনে করহ ভাবন।”

আত্মদান করুন

মহাপ্রভুর মতাম্বায়ী গীতার

ভক্তি ব্যাখ্যা

ভক্তিতারতী শ্রীবঙ্কিম সেনের

গীতা-মাধুরী—১২.০০ ও

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষেপে—৩.০০

প্রকাশক : শ্রীরাইমোহন আচার্য্য

৭ ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা—৩

সাধারিক

সার্থক অভিযান :

মার্কিন ও রুশ উভয় দেশের চাঁদের সন্ধানী অভিযান বিখে কোতুল সৃষ্টি করিবারে। সম্প্রতি মার্কিন মহাশেষ ট.সে এমন এক সন্ধানী অভিযান প্রেরণ করিয়াছেন, বাহার ভিত্তিতে সম্ভবতঃ ১৯৭০ সালের মধ্যেই মার্কিন মহাকাশচারীরা এই উপগ্রহে পাড়ি দিবেন আশা করা যায়। গত ২৮শে জুলাই, মঙ্গলবার, সকালে ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি হইতে যুগ্মীয় পাঁচ হাজার মাইল বেগে রেঞ্জার-৭ চাঁদের দিকে ধাবিত হয়। রেঞ্জার-৭ যখন চাঁদ হইতে মাত্র ১৩০০ মাইল দূরে তখন প্রথম ক্যাসেরাটি চিত্র গ্রহণ আরম্ভ করে। এক মিনিটে পরে পৃথিবীর ধারক টেলনটি ছবির বেতার সঙ্কেত লাভ করে। কিছুক্ষণ পরে ছয়টি ক্যাসেরা হইতেই ছবির সঙ্কেত আসিতে থাকে। রেঞ্জারের চত্রে অবতরণের সময় পৃথিবী ২৮৬,৬৬৬ মাইল দূরে ছিল। রেঞ্জার-৭-এর মরণবার্ণিশের ঠিক ১৩ মিনিট ৪০ সেকেন্ড আগে, চাঁদ যখন ১১২০ মাইল দূরে পরলা ক্যাসেরা হইতেই উপগ্রহের বামদিকের ১৮০,০০০ বর্গমাইল এলাকার ছবি লওয়া হয়। রেঞ্জারের ছয়টি টেলিভিশন ক্যাসেরা চাঁদের অক্ষাত ভূ-খণ্ডের ৪০-বানি ছবি তুলিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছে। রেঞ্জার-৭ বিষুবরেখার ঠিক নীচে মেঘ-সমুদ্র ভেদ করিয়া চাঁদের বামদিকের আলোকিত অঞ্চলে মরণ-বার্ণিশ দিয়াছে। ক্যাসিকোপারিয়ার জেট প্রোপালসন ল্যাবরেটরি রেঞ্জারের জনক। রেঞ্জার-৭ যে-সব ঐতিহাসিক ছবি পাঠাইয়াছে, তাহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় চত্রে অবতরণ করা মানুষের গকে পূব কটন হইবে না।

শ্রীশ্রীমীরাবাইর আবির্ভাবোৎসব :

কালী নিবাসী মীরাবাই গ্রন্থ প্রণেতা পরম ভাগবত শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে অষ্টাঙ্ক বৎসরের ভ্রাম্য এ বৎসরও ৮ই হইতে ১০ই আগষ্ট তিনদিন ব্যাপী মীরাবাই আবির্ভাবোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-পূজা, ভোগারতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, নাম-কীর্তন ও মীরা-ভজন প্রভৃতি

উৎসবের আঙ্গিক হিসাবে সনিষ্ঠায় প্রতিপালিত হয়। ৯ই আগষ্ট অপরাহ্নে সোনারপুরা কোচবিহার কালীবাড়ীতে পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীগঙ্গা দেবী পুরাণসংখ্যাবেনোত্তীর্ণার সভানেত্রীত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে বিভিন্ন দিক হইতে মীরার দিব্যজীবন ও ধর্শন আলোচিত হয়। এই আলোচনার কালীধামের বহু জ্ঞানী, দৃষ্টি ও মনীষী ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেন।

বৈদিক কৃষ্টি ও শ্রীরামমোহন নাথ :

কলির বোল কলা পূর্ণ হইলে কালচক্র আবার ঘুরিবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী শাস্ত্রে বরা আছে। এই চাকা ঘুরিবার লক্ষণ যেন দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির, বিশেষ বৈদিক কৃষ্টির, স্মারক ও অভ্যুত্থান লক্ষ্যে পড়িতেছে। অবশ্যক পাবলিশার্স হইতে প্রকাশিত রূপণ্ডিত রামমোহন নাথ তত্ত্বজ্ঞানের 'মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা' বইখানি নানা দিক দিয়া মৌলিকত্ব দাবী করিতে পারে। বাংলা বই, কিন্তু বাঙালীর কাছে বইখানি সমাদৃত হয় নাই। লণ্ডনে বা অষ্ট্রােল দেশে বরং বিছু বিক্রী হইয়াছে। ইন্দো-মৌলিক কলিযুগের পণ্ডিতদের দৃষ্টি বইখানির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। রুশীর অধ্যাপক যুরি নোরোজভ উজ্জ্বলিত প্রাণসা করিয়াছেন এবং গ্রন্থকারকে একজন অস্তিত্ব গবেষক হিসাবে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। আমেরিকার প্রাচীন মায়ালিগির পাঠোদ্ধার সম্পর্কিত শ্রীনোরোজভের সাম্প্রতিক বিরাট প্রত্নতাত্ত্বিক ও তিনি শ্রীনাথকে উপহার পাঠাইয়াছেন। রাজস্থানের গভর্ণর ডঃ সম্পূর্ণানন্দ সম্প্রতি বৈদিক কৃষ্টির অবনতির কারণ ও উত্থানের উপায় সম্পর্কে দ্বিতীয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'Organiser' পত্রিকার ধারাবাহিক তিনটি প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধের তথ্য ও মতামতের আলোচনা-মূলক রামমোহনবাবুর দুইটি প্রবন্ধও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক বৈদ্যব্যাপ্যপূর্ণ শ্রীনাথের এই প্রবন্ধ সারা ভারতে সংস্কৃতি-কোতুলীর ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাতে বৈদিক কৃষ্টির বেশ একটা জাগরণ লক্ষ্যে পড়ে। রামমোহনবাবু শিলং-এ থাকেন। এই শিলং-এ শ্রীমৎ অনির্বাণজীও থাকেন। শ্রীঅনির্বাণজীর বৈদিক কৃষ্টির গবেষণা সুবিধিত এবং বহুল প্রাণসিত। সম্প্রতি রূপণ্ডিত শ্রীরামমোহন নাথকে কামরূপ সংস্কৃত সজ্জাবনী স্তম্ভার ৫১তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন করিয়া তাঁর এই গবেষণামূলক সাধনাকে যে শোভা সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক ; সম্পূর্ণাঙ্গ ; নির্ভরযোগ্য

বুক বাইণ্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাধাই কাজ সজ্জার ও জ্বলতে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫৬ নং সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-২

ডি.রতন ঞ্জ কোং

ফটোডুপ্লিকেশন

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: ৩৪-৩৭১১

বাঙালী মহিলা শ্রীমতী পারুল চক্রবর্তীর কৃতিত্ব :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের সহকারী লেবার কমিশনার শ্রীমতী পারুল চক্রবর্তী শ্রম-শিক্ষা-মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণামূলক মৌলিক রচনার ক্ষুদ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি.ফিল' উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। গবেষণার বিষয় ছিল "কর্তৃপক্ষ ও কেরানীবৃন্দের স্বার্থ, মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব"। শ্রীমতী চক্রবর্তী ইতিপূর্বে জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা এবং গুয়াশিটনে কোডারেল লেবার বিভাগে শিক্ষালভ করেন।

কবি মিনতি নাথ :

গত ১৭ই আগস্ট মহাযোগি অরুণান হাউসে ডঃ কালিদাস নাগের পৌরোহিত্যে কবি মিনতি নাথের ত্রয়োবিংশতিতম জন্মদিবস পালিত হয়। ডঃ নাথ তাঁর সভাপতির ভাষণে গ্রিকই বলিয়াছেন, শুধু কবিতার নয়, গানে, গল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে, রামা, সেলাইয়ের মিনতির প্রতিভা ছিল অসাধারণ। বিকশিত হইবার মুখেই অকালে মিনতির ফুটনোমুখ জীবন খরিয়া পড়ে। কিন্তু তার মধুর ব্যবহার ধীরে ধীরে তার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাঁদেরই আপন করিয়া লইয়াছে। মিনতির জন্মদিন উপলক্ষে মাননীয় স্ত্রী হুমায়ুন কবীর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শুভেচ্ছা বাঞ্ছা প্রেরণ করেন। সভায়ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে মিনতি নাথের হস্তশিল্প, বই ও রচনার এক প্রদর্শনীও হয়।

কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য :

গত ১৮ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় বেলঘরিয়ায় রাগচক্র মিউজিক কলেজ ভবনে সাহিত্যিক শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিকের পৌরোহিত্যে পরলোকগত কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের এক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। দৈনিক স্তোত্র-পাঠ করেন পণ্ডিত নরেন্দ্রমোহন বোদান্তাশ্রী। তৎপরে ভক্তিমূলক সঙ্গীত করেন শ্রীমহাবিৎ সাহা এবং কবির প্রতিকৃতিতে রাম্য অর্পণ করেন কুমারী শিখা দে। কবি নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী অপূর্বকৃষ্ণের

জীবনদর্শন আলোচনা করেন। সাধককবি শ্রীপারুলাল মাইতি উদাত্ত কণ্ঠে কাব্যছন্দে স্রষ্টা জ্ঞানান এবং কবি-শিল্পী শরদ্বিন্দুনারায়ণ ঘোষ "অপূর্বকৃষ্ণ তিরোধান"ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অপূর্বকৃষ্ণের কাব্যগ্রন্থে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন কবি ও সমালোচক শ্রীপূর্ণেন্দ্র-এস।ধ ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে কীর্তন ও ভজন সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমুক্তা মৌরী মুখোপাধ্যায়, কুমারী শিখা দে ও শ্রীগণেশ দাস প্রভৃতি। সভাপতি এক মনোজ্ঞ ভাষণে কবির বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভার একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। সভান্তে রাগচক্র মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষ সঙ্গীতপ্রভাকর শ্রীমুখ্য চাকলাদার সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ডানকুনিতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব :

গত ১০ই মে, শনিবার ডানকুনি রামকৃষ্ণ স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনার রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে সাহিত্যিক শ্রীনগেন দত্ত এবং শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। সভায় বিশ্বকবি জীবনের বহু দিক লইয়া আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী চিত্রর চট্টোপাধ্যায়, শিবানী মুখোপাধ্যায়, অশোককান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচু দত্ত প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পীরা।

নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় :

বর্গত শ্রীনেহেরু স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত দিল্লীতে শ্রীনেহেরু নামে দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। এক হাজার একর পরিমিত জমিতে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করিবে। দিল্লীর উপকণ্ঠে রামকৃষ্ণপুরমের নিকট সুনিরকা গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল, আলোয়ান ও হোসিয়ারী পোষাক বিক্রোতা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা। ফোন : ৩৫-২৩০৩

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্ম

রামকানাই মেডিক্যাল স্টোশ

১২৮/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

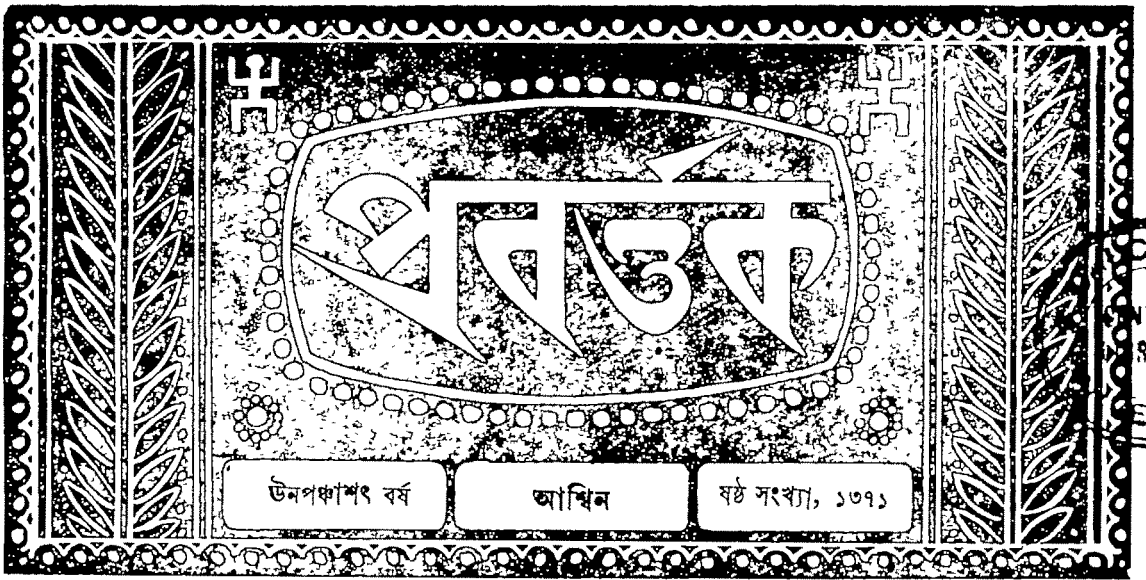
সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাক্‌স্টোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীমদিত্যরাম দাস কর্তৃক মুদ্রিত।



বিভাঃ সমস্তান্তবদেবি ভেদাঃ
দ্বিগ্নাঃ সমস্তা সকলা জগৎসু ।
দ্বৈকয়া পূৰ্বিতমস্বয়েতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যাপরা পবোক্তিঃ ।



মহাপূজার বোধন

বন্দিতাজি, যুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনী ।

রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি ॥

কোটি কণ্ঠে এই প্রার্থনার ধ্বনি আজ কেন ভারতের আকাশ বাতাস আর মুখরিত করে না ? কণ্ঠ কেন স্তব্ধ, চক্ষু কেন দীপ্তিহীন, বক্ষে ধমনীর আঘাত কেন নিষ্পন্দ ? চাহিবার স্পর্ধা কে তোমাদের চূর্ণ করিয়া দিল, কে তোমাদের স্বর্ণকাস্তি ধূলিমলিন করিল, জয়ের ধ্বজা কেন তোমাদের মাটির বুকে খসিয়া পড়িল রে ! যশোমলিন বন্দীজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণাভার বুকে বহিয়া ঘন ঘন মরণশ্বাস, বেদনার শিহরণে কণ্টকিত কলেবর, রোমকূপে রক্তবিন্দুর ধারা—আত্মহারা জাতি । পূজার মণ্ডপে মঙ্গল ঘট স্থাপন করিয়া আজ আর কণ্ঠে প্রার্থনা জাগে না—দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরম সুখম্ । রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥

গর্ব যে জীবনের বীৰ্য্য, অহঙ্কার যে মেরুদণ্ড, আজ আমাদের স্বাস্থ্য নাই, সৌভাগ্য নাই, রূপ নাই, যশঃ নাই, আছে শুধু গর্বহীন নিকৰ্ণীয়া জীবনের দায় । সিংহগ্রীব বীরেন্দ্রকেশরী মাতৃব্রতী বঙ্গবাসী ! অহঙ্কার উদ্ধুদ্ধ করিয়া একবার নিজ নিজ অন্তরের মণিকোঠায় সম্পর্শ কর—পীতাম্বরং কণকভূষণমাল্যশোভাম্ দেবীং ভজামি ধৃতমুদগর বৈরিজিহ্বাম্ ॥ আর উচ্চ কণ্ঠে উন্নত বক্ষ প্রসারিত করিয়া চিৎকার করিয়া বল—অহং রুদ্রেভিবিস্তুভিশ্চরাম্যহম্ আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ । আমি অমর শক্রহস্তা—আমি তৃপ্তা, আমি রাষ্ট্রী—আমি শ্রেষ্ঠা ।

এই পূজার মন্ত্র ভারতের জীবনযন্ত্রে যে নিত্য ধ্বনি তুলিত, এই শক্তি-ঋকের বঙ্ধারে যে ভারতের আকাশ বাতাস নিত্য মুখরিত হইত, এই জীবন-বেদের উদগান যে ভারতের ঋষির কণ্ঠে প্রতি প্রহরে প্রহরে মুচ্ছনা তুলিত—ভারতের বীণা আজ কেন মুচ্ছিত, কেন তার ছিন্ন তার, কেন সে অনাদৃত, কেন উপেক্ষায় ধূলি-ধূসরিত ? ওগো ভারতের বাণীমুক্তি, ওগো ব্রহ্মগায়ত্রী, অগ্নিমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী ! উঠ, জাগো,—আজ পূজার বোধন দিনে অন্তরে অন্তরে তোমার প্রতিষ্ঠা চাই । তাই আজ যুক্তকরে তোমায় নমস্কার করি—নমো দেবো মহাদেবৈ শিবায়ৈ সত্যং নমঃ । নমঃ প্রাকৃতে ভজায়ৈ নিয়তা প্রণতাস্মতাম্ ॥ (সঙ্কলিত) সত্যগুরু শ্রীমতিলাল

মহর্ষি প্রেমানন্দ

সাধনক্রমে ধূলোচেন বধের পর উপরে উঠতে উঠতে একটা প্রবল আধ্যাত্মিক তীব্রতা দেখা দেয় সাধকে। মহাশক্তিকে স্বেচ্ছাশ্রুগ করবার জন্য হয়ে উঠে রোষান্বিত। যৌগৈশ্বর্যাদিকে নিয়ে আত্ম (ব্যক্তিবোধের) প্রকাশের নিমিত্ত জাগে তাবাবেগ। দেখা দেয় অধ্যাত্ম-প্রচেষ্টায় তীক্ষ্ণতা। স্বেচ্ছাচারের সকল প্রতিরোধী শক্তিকে ছেদন করে এগিয়ে যেতে চায় সাধক। এই রোষ এবং প্রতিরোধে শক্তির ছেদন প্রচেষ্টাই চণ্ড আর মুণ্ড। (চন্ড—রোষ করা থেকেই চণ্ড এবং মূন্ড—ছেদন করা থেকে মুণ্ড)। যে মহাশক্তির দোলনে সৃষ্টি প্রসূত ও বিধৃত তাকে স্বেচ্ছাশ্রুগ করবার প্রবৃত্তিতে প্রকৃতি বিকৃত হয়ে উঠে। প্রকৃতি অশ্রুগ হয়েই সাধনা। সেখানেই আত্মসমর্পণ। এর ব্যতিক্রম হলেই আস্তর কলন-শক্তি জেগে উঠে স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিস্পর্কী শক্তিরূপে। ইনিই চণ্ড-মুণ্ড সংহারিণী চামুণ্ডা।

পূর্বেই মধু, কৈটভ এবং মহাশ্বরষাদির সংহারের ফলে নাদাশ্রয়ে সাধক উর্দ্ধগ হবার যে সন্ধান পায় তাতে এই ক্রীণ স্বেচ্ছাচারিতা তাকে আর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অহং ও ভ্রম সেখানে কিরিয়ে নিতে পারে না। কল্যাণময়ী আস্তর কলনশক্তি, যা ছিল জৈবী বিলাসে আচ্ছন্ন, আত্মিক মহাশক্তিকে স্বেচ্ছাশ্রুগ করবার প্রবৃত্তির বিফলতা সাধকের জীবনে নিয়ে আসে মহা কল্যাণ। উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধতর লোকে নিয়ে যায় তাকে।

চণ্ড-মুণ্ড বধকালীন অধ্যাত্ম-সংগ্রামের তীব্রতার মাঝেই সাধক অমুভূতি পায় “প্রহ্লাদ জ্যোতিঃ” মধ্যস্থ নিত্য ঘূর্ণায়মান “প্রাণচক্র” বা “ব্রহ্মচক্র”। “প্রাণচক্র” বা “ব্রহ্মচক্রের” অমুভূতিতেই সাধকের জ্ঞান আনে—“ও জ্যোতির্হি ব্রহ্মঃ, জ্যোতির্হি প্রাণঃ (এবং) প্রাণোহি বিশ্বঃ”। ব্যক্ত বিশ্ব যে পরমের “তেজ অংশসমুত” গীতার এই মহান বাণীর তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সাধকের অন্তর্দৃষ্টিতে। যার বিষয়ে বিজ্ঞান বলেছে—বিশ্ব বলতে যা’ সকলই শক্তির প্রকাশ (matter is

not matter but energy)। মনীষী আইনষ্টাইনের সেই কথা— $E=MC^2$ ।

এই অবস্থার অর্থাৎ প্রাণচক্রের বর্ণনা দিতে যেয়েই শ্রীশ্রীচণ্ডী চণ্ডমুণ্ড বধে বলেছেন—

“তানিচক্রানেকানি বিশমানানি তদ্বুধম্।

বভূর্ধ্বধার্কবিধানি সুবহনি ঘনোদরম্॥” (১৮)

প্রাণচক্রের অমুভূতিতেই হয় মুণ্ডবধ। মুণ্ড বধান্তরে সাধক পায় ব্যোম সন্ধান। যা’র সঙ্ক্ষে উপনিষদ বলেছেন—“সর্বং ঐশ্বর্যসম্পন্নং শিবং আকাশং”। যাকে আশ্রয় করে চলে নিয়ত মহাকালীর কলনধারা। হয় সৃষ্টির প্রসারণ। চণ্ডমুণ্ড বধে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবী কালী ‘হং’কার শব্দ উচ্চারণ করে, মহা অসি উস্তোলন ক’রে চণ্ডাশ্বরের অতিমুখে ধাবমানা হলেন এবং তার কেশাকর্ষণ করে সেই অসিতে শিরচ্ছেদ করলেন। এই স্তরে এলে সাধকের দেহস্থ চিৎশক্তি (phosphorescent energy) ক্রমে কেল্লীভূত হতে থাকে ব্রহ্মরঞ্জে। পরে সেই পথে উৎপক্ষিপ্ত হ’য়ে যোগাযোগ নেয় মহা ব্যোমের সাথে। তাইত শ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত হয়েছে কেশাকর্ষণ করে অসিতে শিরচ্ছেদ করলেন। (“কে”—(মস্তকে)-শয়ন করা অর্থে “কেশ”, “অস্”—(ক্ষেপণ করা) অর্থে “অসি”।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। পঞ্চ ভূতের মাঝে নিহিত আছে পাঁচটি ধ্বনি—লং, বং, রং, যং, হং। “হং” হল ব্যোমবীজ। ব্যোমামুভূতি যখন সাধকে জাগ্রত হয়ে উঠে তখনই বধ হয় চণ্ড। সাধকের জীবনে ক্রমে নেমে আসতে থাকে এক প্রশান্তির ধারা।

চণ্ডমুণ্ড বধের অব্যবহিত পূর্বে সাধকের জীবনে থাকে রুদ্রত্বের প্রকাশ। অমুভূতির জগতে অনভ্যন্ত জীবনের সর্বক্ষণ তেজোময় লোকে প্রতিষ্ঠা নিবার ফলে এবং শক্তিকে স্বেচ্ছাশ্রুগ করবার প্রবল তাবাবেগ হতেই জন্ম নেয় এই রুদ্রত্ব। এটিই অধ্যাত্ম সাধনার মহলোক। মহঃ অর্থে তেজ।



শ্রীদুর্গা প্রশস্তিঃ

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

নৈকল্যেহপি যতো বিচিত্রকলনং যৈকাপি সৰ্বা সনাং
সৰ্বেষাং জননী তথাপি সকলং বজ্রং প্রবিষ্টং জগৎ ।
যস্যশ্চৈককটাক্ষপাত উদয়ো বিশ্বস্য চাশ্রো লয়ঃ
স। কুৰ্য্যাং সহিতা বিভূতিনিচয়ৈষু কুতশ্চেষ্টিতম্ ॥ ১

জীবে সা সুরদানবদ্বয়কৃতং হৃদং দধানা স্বয়ং
ভ্রাস্ত্র্যা তং কুপণং স্বকৰ্মজফলং ভুঞ্জনমেবাবশম্ ।
শ্রীলা-স্বন্দগণেশসিংহসকলা দুর্গা স্বশস্ত্রেবৃত্তা
তৰ্ভুং দুর্গতিহারিণী প্রভবতি শ্রদ্ধার্ত-কণ্ঠাহবয়ম্ ॥ ২

নিষ্কলা পরমতত্ত্ব তুমি,
তোমা হ'তে বিশ্বে কত বিচিত্র কলনী !
তুমি একতত্ত্ব একেশ্বরী,
তবু সৰ্বা সনাতনী, সকলি আপনি !
সৰ্বের জননী তুমি মাগো,
তবুও সৰ্বেরে কর তব বজ্রে, নিক্ষেপণ !
তোমার একটি কটাক্ষপাতে
বিশ্বের উদয়, অস্তে তার নিরঞ্জন !
তবু রণে দৈত্য সংহারিতে,
এত শত্রুবিভূতির কেন বল আরোজন !

প্রসবিয়া জীবে তুমি মাগো,
তাতে সুরাসুর হৃদ করেছ বিধান ।
ভ্রান্তিরূপে ভুলাইয়া তারে,
অবশের মতো, নিজ কৰ্মফল, করাও ভোজন !
সুরাসুর হৃদে যুধ্যমান
তারে, কত জয়পরাজয়ে কর নিপাতন !
দেবভাবে তারে উজ্জীবনে,
লক্ষী সরস্বতী স্বন্দ-মুগেন্দ্র-বিনায়ক,
কর কত দিব্যবীৰ্য্য বিভূতি প্রকটন !
আর, নিজে দশপ্রহরণ ধরি,
যেবা আৰ্ত্তকণ্ঠে 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে ডাকে,
দুর্গতিনাশিনী তুমি, তারে সদ্য কর জ্ঞান !

[শ্রীলা=শ্রী+ইলা=লক্ষী সরস্বতী । আশ্রয়ং=দুর্গেতি নাম ।]

নব বোধন

অমিয়া সেন

মাথার উপরে সূর্য-তারকা-খচিত চন্দ্রাতপ। পায়ের নীচে ফেনোর্মি মুখরিত সমুদ্রের উল্লাস কলরোল। আদিগন্ত মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে রচিত হলো মায়ের পূজা বেদী। বনচারী রাজপুত্র নীলোৎপলের অর্ঘ্য হাতে উচ্চারণ করলেন মহাশক্তির বন্দনা-মন্ত্র। মুখময়ী প্রতিমা চিন্ময়ী হল। বালুকাস্তীর্ণ সমুদ্র তট আলোয় আলোময় হয়ে গেল মায়ের দিব্য বিভাগ্ন। মর্ত্যমানবের যত অকল্যাণ, পরাতব আর অহংকার তমিশ্রা দূর করে দিতে ছুঁলোকবাসিনী নেমে এলেন মর্ত্যের মাটিতে।

বিশ্বজগৎ সেদিন বুঝি আনন্দে বিশ্বয়ে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিল সেই অপূর্ণ আবির্ভাবের দিকে।

ভারতের তপোবনে ঋষি বান্দীকি বীণা বাজিয়ে তাঁর যে মহাকাব্য গান করে গেছেন, অকাল বোধন তারি একটি মুর্ছনা মাত্র। বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর বিচিত্র দেশ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সেই গানের তালে মিলে মিশে এক হয়ে গেল। অযোধ্যার রাজপুত্র আর রাজবধূ অমর হয়ে রইলেন মহাভারতের অন্তরে।

সমুদ্রের বেলাভূমি উজ্জ্বল করে মা একা দাঁড়িয়ে রইলেন কতকাল। রামসীতাকে সবাই ভেকে নিষে গেল, কিন্তু বিদ্যা, বিভূতি, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বীর্ঘ্য ও বিক্রম-ভূষণা মাকে আত্মান করে নেবার ক্ষমতা ত কই কেউ এলো না। মায়ের সেই অভিমান-স্তব্ধ মুখের দিকে চেয়ে ছলে উঠলো ক্ষুদ্র সমুদ্র হৃদয়। বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে গেল রাম-পদ-লাঞ্ছিত পুণ্য সেতু।

গাঙ্গেয়ী বাংলার ঘরে ঘরে কন্ঠা বিরহাতুরা মায়ের বুকে এসে ঘা দিল সেই গুরু গুরু আত্মান...শিউলী তলার ঝরা ফুলে, চারণ-কবির গানের সুরে, আকাশের খণ্ড মেঘে ভর দিয়ে কোন্ অদূর থেকে যেন তেঁসে এলো বরণ করো—বরণ করো ধনি।

নদীমেখলা শ্রামলা বাংলা অমনি আনন্দে তার হৃদয় আসন বিছিয়ে দিল মায়ের পা ছুঁখানি রাখার জন্য। বরণভালা হাতে বধূরা আবাহন জনালো উলু উলু উলু—

আসমুদ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করে অনেক দূর দূর

পথ পার হয়ে মা এলেন অবশেষে আমাদেরই মাটির ঘরে—তাঁর আপন ঘরে। এলেন কন্তারূপে, এলেন শক্তিরূপে, এলেন মুক্তিদাত্রীরূপে। বাঙালী সঙ্গীমের মধ্যে অসীম আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হলো। তার জয়রথ ছুটলো মরুভূমির ধূসর শূন্যতা পার হয়ে ছল্লজ্য গিরি-কন্দর অতিক্রম করে।

সেদিনের অবশেষ আজ আর কোথাও নেই। রাজ-রাজেশ্বরী জগজ্জননীর আশীর্বাদ-ধন্য বাংলা আজ খণ্ডহীন দেহে সকল জনের দ্বারায় করুণার ভিধারী।

তবু মা আসেন আমাদেরই স্বপ্নায়োজনের অর্ঘ্য নিতে—আমরা যে জ্ঞাত-ভিধিরী নই সে কথা মনে করিয়ে দিতে। আমরা সেই বরাভয়দায়িনী মহাশক্তির সম্ভান, এই উত্তরাধিকারই ত আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

এই সম্পদের কিরণধারায় আবাহন করে আজ দূর হয়ে যাক চিন্তের সব দীনতার গ্লানি। হৃদয় প্রসারিত হোক দূর বিস্তার নীলিমার মত। শীর্ষ মুঠিতে শানিত হয়ে উঠুক সঙ্কল্পের রূপাণ। আমরা শক্তিদর হবো। ফিরিয়ে আনবো হারানো দিনের হৃত গৌরব। পৃথিবীর মানচিত্রে আবার স্টুটে উঠবো উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মত।

পল্লী-বাংলার স্বপ্নায়তন পূজা-মণ্ডপের প্রাচীর ভেঙ্গে গেছে। ভেঙ্গে গেছে দেশ-কালের সঙ্কীর্ণ বন্ধন। বিশ্বময়ী মা হাত ধরে আমাদের নিয়ে এসেছেন সুরথের শাস্ত তপোবনে নয়, ঝঞ্ঝাট জীবনসমুদ্রের তপ্ত বালুকাবেলায়।

ভালই হয়েছে। আত্মবিশ্বস্তির বন্ধীক স্তূপ থেকে আমাদের পুনর্জন্ম।

বাঙালীর জাতীয় উৎসব দেশে দেশে পরিণত হয়েছে মহাজাতির উৎসবে। মন্দির ছয়ার খুলে গেছে দরিদ্র অচ্ছুৎ অস্বস্ত—সকলের জন্য। বোধনের বাঁশীতে বাজছে মহামিলনের সুর।

বেদনার নীল পদ্মে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে এসো, বাঙালী আজ আমরা প্রার্থনা করি—মা আমাদের জীবন থেকে মহাজীবনে উত্তীর্ণ কর।

বৈজ্ঞানিকের ঈশ্বরাবিষ্কার

যোগাচার্য্য শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দোপাধ্যায়

একজন বিশ্ববিখ্যাত আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিককে তাঁর এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন,—‘মহাশয়, আপনি ত সারাজীবন অক্লান্ত তপস্বী করে প্রকৃতিরাজ্যের বহুবিধ সূক্ষ্ম রহস্য-উদ্ঘাটন করেছেন এবং আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে মানবসমাজের সুখসুবিধার জন্য নানা-প্রকার উপকরণও সৃজন করেছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার নিজের বিচারে আপনার শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার কি?’ বৈজ্ঞানিক প্রথম একটু হেসে এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দিলেন—‘God (ঈশ্বর)’। বন্ধু এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে বিস্মিত হয়ে ইহার একটু বিশদ ব্যাখ্যা চাইলেন। প্রবীণ বৈজ্ঞানিক সংক্ষেপে তাঁর ঈশ্বরাবিষ্কারের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তার সারমর্ম আমাদের ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করি।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রথম থেকেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহের বাস্তব সত্তা মেনে নিয়ে তত্ত্বাসূক্ষ্মান শুরু করে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষই আমাদের বিজ্ঞানের তিস্তি। নিরীক্ষণ বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ যুক্তি বিচার ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে আমাদের তত্ত্বাসূক্ষ্মান যত অগ্রসর হয়, ততই এই ইন্দ্রিয়গোচর জগতেই চিন্তচমৎকারী নূতন নূতন রহস্য উদ্ঘাটিত হয় এবং তা আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও আমরা প্রয়োগ করিতে সামর্থ্য অর্জন করি। এই সব রহস্যের ইয়ত্তা নাই। যতই আবিষ্কারের পর আবিষ্কার হইতে থাকে, এই জগৎ যে কত রহস্যময় তা ততই আমরা উপলব্ধি করতে থাকি। আমাদের বিজ্ঞানের যত প্রসার হয়, আমাদের জ্ঞানের দারিদ্র্য সঙ্ঘে আমরা ততই সম্মান হ’তে থাকি। আমরা বুঝতে থাকি

জ্ঞাতব্যের তুলনায় আমাদের জ্ঞাত কত সামান্য।

আমাদের বিজ্ঞান যখন ইন্দ্রিয়গোচর অসংখ্য স্থূল পদার্থের রহস্য ভেদ করে সারা বাস্তব জগতের উপাদান-রূপে কয়েকটি মাত্র মৌলিক বস্তু (elements) আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়, এবং তাহাদের সংযোগ বিযোগে সারা বিশ্ব রচিত বলে সিদ্ধান্ত করল, আবার প্রত্যেকটি মৌলিক বস্তুর সূক্ষ্মতম পরমাণুস্বরূপ নিরূপণ করে তাদের সংযোগ

বিরোগের কতকগুলি নিয়মপ্রণালীও নির্ধারণ করল, তখন বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আমাদের নিবিড় পরিচয় হ’ল বলে বৈজ্ঞানিকদের যে অতিমান হয়েছিল, তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে সব জড়পরমাণু অবিভাজ্য অপরিণামী নিত্যসত্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তারাও বিভাজ্য পরিণামী ও অনিত্য বলে প্রতিপন্ন হ’ল, তাদেরও গঠন ও প্রকৃতির মধ্যে কত অটিলতা ও রহস্যময়তা আবিষ্কৃত হল। প্রত্যেকটি পরমাণু কতকগুলি শক্তির অদ্ভুত সমাবেশ বলে প্রমাণিত হল। সেই সব শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশলও মানুষের কতকটা করায়ত্ত হল; সেই সব শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যে কি প্রচণ্ড ক্রিয়াসামর্থ্য লাভ করে, তারও পরিচয় পাওয়া গেল। জড়ের ধারণাই বদলে গেল। প্রত্যেকটি জড় পরমাণু শক্তিময়, শক্তিই জড়ের উপাদান, আধুনিক বিজ্ঞান ইহা প্রতিপাদন করেছে। দেখা যাচ্ছে যে, শক্তি জড়ের ধর্ম নয়। জড় বস্তুর ঘাত প্রতিঘাতেই যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা নয়; বা জড় বলে প্রতীয়মান হয়, তা শক্তিরই অবস্থা বিশেষ, পরিণাম বিশেষ, সমন্বয় বিশেষ।

বহুবিধ বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সূক্ষ্ম গণিত ও সূক্ষ্ম বিচারের সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞান নিঃসন্দেহেই প্রতিপাদন করেছে যে, বিশ্বজগতের সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত শক্তিরই বিচিত্র খেলা চলছে। সূক্ষ্ম-দৃশ্য সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রেও যেমন, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রেও তেমনি, গতিশীল ও ক্রিয়াশীল পদার্থগুলির মধ্যেও যেমন, আপাততঃ স্থিতিশীল ও নিষ্ক্রিয় পদার্থগুলির মধ্যেও তেমনি; বহির্জগতেও যেমন অন্তর্জগতেও তেমনি, সর্বত্র সর্বদা শক্তিরই বিচিত্র পরিণাম, বিচিত্র অভিব্যক্তি, বিচিত্র রূপান্তর গ্রহণ। শক্তি ছাড়া কোন বস্তুর কোন যথার্থ পরিচয় আমরা পাই না। সূতরাং বস্তুর শক্তি এ কথা বলা নিরর্থক। ক্রিয়ার মধ্যে যেমন শক্তির পরিচয় বস্তুর মধ্যেও তেমনি শক্তিরই পরিচয়। প্রত্যেকটি বস্তু একটি শক্তিকেন্দ্র ছাড়া বা শক্তির সমন্বিত অবস্থাবিশেষ ছাড়া কিছুই নয়।

শক্তিকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া

দেখে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করি, যথা—বিদ্যাশক্তি, আলোকশক্তি, উদ্ভাপশক্তি, চুষকশক্তি, রাসায়নিক-শক্তি, পারমাণবিকশক্তি ইত্যাদি। তদতিরিক্ত জীবজগতে আমরা প্রাণশক্তির বিচিত্র খেলা দেখি। মনোরাজ্যে মনঃশক্তির বিচিত্র বিলাস দেখি, বুদ্ধিরাজ্যে বুদ্ধিশক্তির বিচিত্র পরিচয় পাই। এই সব শক্তি যে শুধু পরস্পরের সহিত বিচিত্র সম্বন্ধে মিলিত হয় ও সংঘর্ষ করে, সহযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া করে, তাই নয়, এক শক্তি অল্প শক্তিরূপে পরিণত হয়, রূপান্তরিত হয়ে প্রকৃতিরাজ্যে এক শক্তির অল্প শক্তিতে পরিণতি সর্বদাই চলেছে। আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক শক্তিকে অল্প শক্তিতে রূপান্তরিত করে থাকি। স্তত্রাং বিভিন্ন জাতীয় ক্রিয়ার অভিব্যক্তির মধ্যে শক্তি বহুবিধ বলে প্রতীয়মান হলেও, সর্বশক্তিই যে মূলতঃ এক, এতে কি সন্দেহ করা চলে; একই মূল শক্তি বিচিত্র ক্রিয়ার ভিতরে বিচিত্র আকার ও উপাধি গ্রহণ করে, বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে, ইহাই কি প্রতিপন্ন হচ্ছে না?

প্রকৃতিরাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে শক্তির যে সব বিচিত্র পরিণাম, বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিচিত্র রূপ-রূপান্তর গ্রহণ, বিচিত্র গতিবিধি ও কার্যোৎপাদন আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, তার মধ্যে প্রায়শঃ আমরা নিয়ম শৃঙ্খলার পরিচয় পাই, সব ক্ষেত্রেই শক্তির যেন সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ আছে। বিজ্ঞান এরূপ অনেক নিয়ম আবিষ্কার করেছে ও করছে। এগুলিকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলি এবং প্রায়শঃ অখণ্ডনীয় বলে গণ্য করি। কিন্তু সূক্ষ্মতর অন্বেষণে দেখতে পাই যে, সব ক্ষেত্রেই যে শক্তি এই সব নিয়মের বন্ধন মেনে চলে, তা নয়। আমাদের আবিষ্কৃত নিয়ম শৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করেও শক্তি অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়া করে এবং আপনার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয়। শক্তিকে আমরা সর্বতোভাবে নিয়মাবলী করিতে পারি না। শক্তির কার্য দেখেই আগরা নিয়ম আবিষ্কার করি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করেও শক্তি কার্য্য করে। শক্তির ক্রিয়ার মধ্যে স্থূল জগতে আমরা এক জাতীয় নিয়ম দেখি, সূক্ষ্ম জগতে অল্প প্রকার। জড়জগতে এক প্রকার, জীবজগতে

কখন কখন তার বিপরীত। স্তত্রাং শক্তি যে শুধু নিজের সত্তায় সত্তাবতী, তা নয়; কার্য্য জগতে আপনাকে বিচিত্রভাবে অভিব্যক্ত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যও আছে, এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হয়ে পড়ে।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যে এত বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রকারের শক্তি-পরিণাম দেখি, এত অভিনব সৃষ্টি ও আকর্ষক ধ্বংস দেখি, এত নিয়মের ঐশ্বর্য ও তার সাপেক্ষে এত নিয়মের ব্যভিচার দেখি, এর মধ্যেও আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এ কথা অস্বীকার করতে পারে না যে, দেশে-কালে অপরিচ্ছিন্ন, অসংখ্য সৌরমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল বিশিষ্ট, অশেষ জটিলতা সমাকীর্ণ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ একটা রহস্যময় ঐক্যস্থলে গ্রথিত। এর একটা আভ্যন্তরীণ যোগ-স্থল আছে, এর সর্বাবয়বে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। একটা প্রাণশক্তি যেন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে বিধৃত করে রয়েছে। এটা যেন কারো একটা বিরীতি দেহ; এ কথাটা শুধু পরিকল্পনা মনে হয় না।

এই বিরীতি বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ আমাদের পৃথিবী। এই পৃথিবীর ক্রমবিকাশের ইতিহাসও সাক্ষ্য দিতেছে যে, কি আকর্ষকভাবে সূর্য্যের একটা টুকরা খসে এসে একটা নির্দিষ্ট কক্ষে সূর্য্যকেই প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করল। কি অদ্ভুতভাবে একটা প্রচণ্ড তাপবিশিষ্ট অগ্নিগোলকের অবস্থা থেকে শক্তি পরিণামের ভিতর দিয়ে সূর্য্যের এই টুকরাটি আকাশে বাতাসে জলে স্থলে পর্কতে অরণ্যে অগ্নি-বিদ্যুতাদিতে বিভক্ত হয়ে এ সকলের স্তম্ভের সমাবেশে কালক্রমে জীব-বসতির যোগ্যতা লাভ করল। কি রহস্যময় প্রণালীতে এই জড়পিণ্ডের মধ্যে প্রাণের অভ্যুদয় হল, প্রাণের মধ্যে আবার মনের বিকাশ হল, মনের মধ্যে বুদ্ধির উদয় হল এবং ক্রমে এই পৃথিবী মনুষ্য সভ্যতার লীলাভূমি হল। এই বিবর্তনের মধ্যে কতবার কত প্রকার ভাঙা-গড়া হয়েছে, কত সৃষ্টিপ্রলয় ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এ সবই তো শক্তিরই খেলা। প্রাণ-মন-বুদ্ধি সবই তো এক শক্তিরই বিচিত্র রূপ। সূর্য্যও শক্তিময়, নক্ষত্রাদিও শক্তিময়, পৃথিবীও শক্তিময়ী। কত সৃষ্টি ও ধ্বংসের সমাবেশে কি অদ্ভুত সংগঠন!

বিজ্ঞান আমাদের সামনে যেসব তথ্য উপস্থিত করেছে, তা থেকে আমরা অক্লেশে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অশেষ বৈচিত্র্যসমাকুল ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হলেও এবং এর প্রত্যেক বিভাগে সর্বদা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের তাণ্ডবলীলা চললেও, এর সমস্ত অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের মধ্যে একটা একত্ব আছে, একটা যোগযুক্ত সংঘবদ্ধ তাব আছে, স্মরণ্য নিশ্চয়ই এর একটা প্রাণকেন্দ্র আছে। সেই প্রাণকেন্দ্র অবশ্যই অনন্ত শক্তির আধার, স্ব-সত্তায় সত্তাবান্, স্বয়ং প্রকাশ, স্বয়ংক্রিয় ও স্বতন্ত্র। সেই প্রাণকেন্দ্র থেকেই চিরকাল অসংখ্য প্রকার শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে, অসংখ্য প্রকার রূপ-রূপান্তরের সৃষ্টি হচ্ছে, সেই প্রাণকেন্দ্রেই স্বীয় অসীম শক্তিতে বিশ্বের সকল অংশকে, সকল অদ্বৈতত্বকে বিধৃত করে সংঘবদ্ধ করে যোগযুক্ত করে ধরে রেখেছে, সেই প্রাণকেন্দ্রেই বিশ্বের সকল ব্যাষ্টি ও সমষ্টি সত্তার অক্ষুরস্ত উৎস, আশ্রয় ও নিয়ামক। শুধু বহির্বিষয় নয়,

আমাদের ইচ্ছিয় প্রাণ মন বুদ্ধিও এই বিশ্বপ্রপঞ্চেরই অন্তর্গত এবং সেই একই মহান্ শক্তিকেন্দ্র হইতেই অস্তিত্ব ও তদ্বারাই বিধৃত ও নিয়ন্ত্রিত। এই শক্তিময় বিশ্বের সকল শক্তির মূলীভূত ও আশ্রয়স্বরূপ এই মহা-শক্তিকে আমরা জড় বলিতে পারি না, কারণ তিনি স্বরাই স্বয়ম্ স্বপ্রকাশ স্বয়ংক্রিয়। ইহাই তো চৈতন্তের লক্ষণ। এই মহাশক্তির বিচিত্র আত্মপ্রকাশকে আমরা তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলে অভিহিত করতে পারি। স্মরণ্য সর্বকারণকারণ পরম সত্তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে চৈতন্তময়ী ও ইচ্ছাময়ী মহাশক্তি বলে স্বীকার করতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তাঁকে স্বেচ্ছাময় অনন্তমান চেতন পুরুষ বলতেও আপত্তি নাই। তাঁকেই তো ধর্ম্মাচার্য্যগণ পরমেশ্বর বলে বর্ণনা করেন ও উপাসনা করেন। ঈশ্বর ও ঐশীশক্তির মধ্যে তো কোন ভেদ কল্পনা ঠিক নয়। (ডঃ মহানাম ব্রহ্মচারীজী প্রণীত চণ্ডী-চিন্তা গ্রন্থের ভূমিকা হইতে)।

মায়ের লীলা

শ্রীমুখীর গুণ

মা কা'রে কী ভাবে কবে
কেমন রাখে মা-ই জানে;
লীলাময়ী মা যে আমার,
লীলাতে তা'র কাছে টানে।

মহাশ্মশান স্রজন করে,
স্মৃতিকাগার গড়ে আবার;
ধ্বংস-স্রজন-পালন মায়ের,
কে বলে গো বই পাবে তা'র!

অপার মহামায়ার বশে
এ ব্রহ্মাণ্ড-সংসারে দে
মাটির ঘরে মাটির পুতুল
নাচায় কেবল নানান্ বশে।

ঘরকরনার স্বাদ যে তা'দের
লয় সোহাগে আড়াল থেকে;
নানান্ নামে জানান্ দিয়ে
কী স্থখ যে পায় খেলনা দেখে।

সূর্য্য-তারার দীপ জেলে দেয়,
অন্ত যে নেই সরঞ্জামের;
মায়ের অতুল স্নেহের গুতুল
তল কি পাবে মা'র সোহাগের।

মায়ের নিহের আকার-বিকার
ইচ্ছাময়ী ভাঙে গড়ে;
পাগলী মা মোর মহামায়ার
লীলাখেলা-ই কেবল করে।

কত ভাবে গড়লো আমায়,
কত সোহাগ দিলো ঢালি';
স্নেহের লীলায় নাচায় বুকে
করলী মা শিশি-ভালী।

জেনেছি তা'র স্বরূপ এবার
ধরেছি যে জাপটে তা'রে;
মায়ের রূপায় মাকে পেলাম,
কোল থেকে আর নামবে না।

শুচি সমাজ

শ্রীকুম্ভদরঞ্জন মল্লিক

সদাচার-পুত আগে গড়া চাই আজ,
সংযত, শুচি, সূক্ষ্মর যে সমাজ ।
দূচতা এবং কঠোরতা চাই তাতে,
কীর্ণ নাহি হয়, হীনতার আওতাতে ।
থাকিবে না সেথা শিথিলতার যে লেশ ।
শালীনতা-হীন বাক, ব্যবহার, বেশ ।
সূক্ষ্ম শুদ্ধ পবিত্র তার নীতি
সবল-সুস্থ-সৌজ্ঞেয়র রীতি ।
দুর্বলতার সেথা নাহি আশ্রয়,
প্রেলোভন যেন বহুদূরে সরে রয়,
কঠিন কঠোর সংযম, সঙ্কম—
গড়ে তোলে যেন সংসার আশ্রম ।
সতর্কতা যে রহিবে অনিদ্র—
অগ্নিগর্ভ ব্রহ্ম-দারিদ্র্য ।
দুর্গের চেয়ে নিরাপত্তায় ঘেরা
রহিবে গণ্ডী মুক্তকেশীর বেড়া ।
সেখায় পুণ্য হোমকুণ্ডের শিক্ষা—
সরাইয়া দিবে বিদ্ব ও বিতীষিকা ।
দর্শ-প্রহরণ-বারিণীর বাসভূমি
ভক্তি এবং সঙ্কমে দেখ তুমি ।
কীচকের দল সদা সতর্ক রও
ভীম জাগিতেছে, নও নিরাপদ নও ।
সাবিজী আর সত্যবানের দেশ,
জাগেন সব্যসাচী সহ হৃষিকেশ ।
দুষ্টের নাশ, সাধুর পরিজ্ঞান—
করিতে এখানে আসেন যে ভগবান ।
দুষ্কৃতিদের বিনাশীর রাজ্য,
দুঃখতিদের ঝাটতি যে ত্যাগ্য ।
জেনো পুণ্ডরীকাক্ষের এই পুণী—
শুচিতায় এর কোথাও মেলে না জুরি ।
স্রষ্টি স্থিতি ধর্মের এ ক্ষেত্র
সকল ভীর্ণ হস্তে এ পবিত্র ।

স্বর্গ ও মর্ত্য

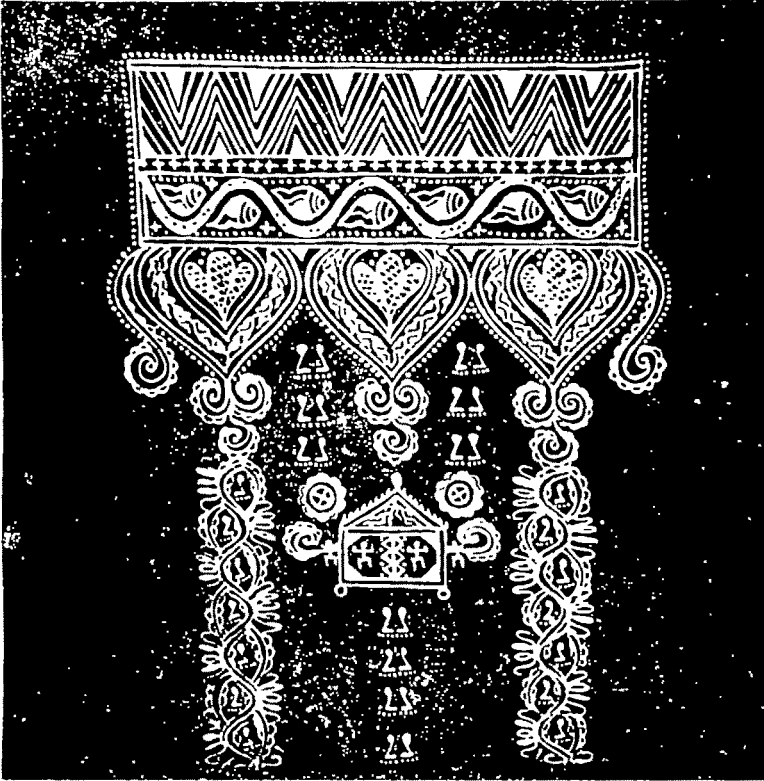
শ্রীকালিদাস রায়

অনেকখানিই ছ্যালোক পেয়েছি ভুলোক ভূমে,
ঢাকা পড়ে গেছে মাঝে মাঝে তাহা যজ্ঞধূমে ।
সম্ভাপহারী শিশু-সন্তান-মহোৎসবে,
'সন্তানকের' সন্তান মোর মিলেছে ভবে ।
মন্দির মোর ঘেরি 'মন্দার' ছড়ায় বিভা,
প্রিয় পরিজন-'নন্দনবনে' রয়েছি কিবা ।
সাধুর সংঘে 'দেবেরি' সঙ্গ মিলেছে বেশ ।
ধরার শোভাই করেছে আমার 'নির্নিমেষ' ।
'মন্দাকিনী'র পাবণতা ছেরি সতীর চোখে,
করেছ 'অজর' চিরমধুমাংস মানসলোকে ।
জ্ঞান বিজ্ঞানই হেথায় 'কল্পপাদপ'-ময় ।
সারা ত্রিভুবন ঘুরি কল্পনা-'বিমান' ময় ।
বাকী যা ত্রিদিবে আছে তার লাভে নাইক লোভ,
না পেয়ে দুঃখ নাই এককণা—বিন্দু ক্ষোভ ।
স্বর্গে যা নাই তাও মিলিয়াছে । মায়ের স্নেহ
পেয়েছি হেথায় অবাধ অপাধ অপরিমেয় ।
তুনেছি, স্বর্গে বেদনা নাহিক একটি কণা,
বেদনা বিহনে জননীরো নেই সম্ভাবনা ।
হেথা বৎসলা ধরণী শ্রামলা বক্ষ চিরি',
অন্ন বিলাসে রেখেছে বাঁচায়ে আঁচলে ঘিরি' ।
দেশমাতা হেথা সহি কত ব্যথা, শুষ্ক তুঘি'
আদরে পুষিয়া, আশিসে ভূষিয়া রেখেছে খুশী ।
প্রকৃতি হেথায় ভরি' ফুলে ছয় ঋতুর ডলা,
কণ্টক-ব্যথা সহিয়া কঠে পরায় মালা ।
হেথা গিরিনদী সহি কঙ্কর-উপল-পীড়া
আমারি জীবন জুড়াতে সন্তত স্নিগ্ধনীরো ।
গগন-জননী বজ্রে ধমনী-গ্রস্থি ছিঁড়ে,
'অবিরল হেথা মাতৃ-মমতা বরিষে শিরে ।
মাতৃ-মহিম-মস্তিভা হেথা সরস্বতী,
জ্ঞান জীবনের পথে দিয়াছেন উর্দ্ধগতি ।
স্বর্গেরে মম মর্ত্যজননী গিধাহে জিতে,
নেই কোন' ক্ষোভ স্বর্গের লোভ নেই এ চিতে
পুণ্যের ক্ষয়ে স্বর্গ হারাল নহয় জানি,
মৃত্যুরে মোর পুণ্যের শেষ বলিয়া যানি ।

আল্পনা শিল্প

শ্রীমতী প্রতিভাবালা বর্দন

[বঙ্গীয় প্রবন্ধ লেখিকা শ্রীমতী প্রতিভাবালা বর্দন বহুল প্রশংসিত 'আল্পনা' গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে বাংলাদেশে সুপরিচিত। গ্রন্থখানি শ্রীমতী বর্দনের আল্পনা শিল্পেব নৈপুণ্য-পারদর্শিতার চমৎকারিষের সাক্ষ্য বহন করে। প্রচ্ছদপটে ও প্রবন্ধে প্রকাশিত আল্পনাগুলি লেখিকার স্বরচিত এবং তাঁরই সৌন্দর্যে শ্রীমতী। আল্পনাগুলির বিশিষ্ট রীতি লক্ষ্যণীয়। লেখিকা প্রবর্তক সঙ্ঘের সহযোগী সভ্যা এবং সঙ্ঘগুরু দীক্ষিতা সন্তান]



অঙ্কুরের টানে টানে, পিটুলির রেখায় রেখায় রূপ পায় মঙ্গল কলসী, চরণ পদ্ম, শতদল পদ্ম, ত্রিপদ্ম, অষ্ট কলসী, শ্বেতপদ্ম ইত্যাদির আল্পনা। প্রত্যেকটি আল্পনা অর্থপূর্ণ। পবিত্র পরিবেশে মেয়েদের শিল্পী-মনের সৃষ্ট আল্পনগুলো খুবই মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় দেয় বাংলার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা। এই লোক-কলার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, আছে সাংস্কৃতিক মূল্য। দুঃখের বিষয় বর্তমান সভ্যতার যুগে আল্পনা-শিল্প ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শুধু

আল্পনা বাঙালীর সংস্কৃতি ও মননশীলতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। বংশপরম্পরায় চলে আসছে এই শিল্পের প্রচলন। নানা ব্রত-পার্বণের ও মেয়েদের সংসারধর্মের অঙ্গ—কুমারী ব্রত, মথবা ব্রত বা এমোতি ব্রত, মাঘ-মণ্ডলের ব্রত, লক্ষ্মী ব্রত ইত্যাদি। বাংলা দেশে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকম আল্পনা দিতে দেখা যায় একই রকম রকম ব্রতে। তবে মোটামুটি আঙ্গিকের মিল থাকে। ব্রতগুলিতে মেয়েদের আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা ও শিল্পীমনের অভিব্যক্তির বিকাশ পায়, রূপ পায় আল্পনার মধ্যে—খুবই সস্তা বা সহজলভ্য উপকরণের মাধ্যমে। পিটুলি, ধড়ি গোলা ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক বিশেষ অঙ্গুষ্ঠানে কখনও কখনও আল্পনা চোখে পড়ে। পদ্মাগ্রামেও আগের মত করে ঘরে আল্পনার প্রচলন নেই। গরীব ও নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা এই লোক-কলা শিল্পকে এখনও আঁকড়ে ধরে আছে। অর্থনৈতিক চাপে রোজগারের আশায় পাড়ারগায়ের গৃহস্থরা শহরের কোলে ছুটে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জন দিয়ে আসছে লোক-কলার ঐতিহ্যকে।

শহরের অঙ্গ বায়গায়, ভাড়াটে বাড়ীতে বা ফ্ল্যাটে ব্রত করা ও আল্পনা দেওয়ার কথা আজকাল অনেকেই ভাবতে পারে না। কিন্তু ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও চেষ্টা থাকলে সংক্ষিপ্তভাবে সাধ্যানুযায়ী করা চলে। তাই

মাঝে মাঝে পূর্ববঙ্গ হতে আগত পরিবারে আল্পনার চিহ্ন বিশেষ বিশেষ পুঞ্জ বা ব্রতের সময় দেখা যায়। অবশ্যই মাঘমণ্ডলের ব্রত পালনের সময় কোলকাতার পুতুরঘাট হাতের কাছে পাওয়া অচিন্ত্যনীয়। চৌবাচ্চার জলে 'সাঁঝের পিদিম' ভাসানো চলে না। বাড়ির শানবাঁধানো উঠানে পুণ্যপুতুর কাটতে গেলে বাড়ীওয়ালার হাদ্যমা আছে। অত শত অসুবিধা

সঙ্গেও কখনও কখনও মধ্য-বিস্ত গৃহস্থের ঘরের দোরে আল্পন দেওয়ার রীতি আছে। দর্শন মাজই মনটা আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। মনে পড়ে ফেলে - আসা বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা। কিন্তু শিল্পটা কে বাচিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে। শাস্তি নিকেতন, কলাভবনে মৃতপ্রায় শিল্পকে বাচিয়ে রাখার, নতুন রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু সেই প্রযত্নের আশাহীন রূপ ফল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কাগজে বইয়ের মলাটে কদাচিৎ নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় আল্পনার। আরও ব্যাপক-ভাবে ইহার প্রচার বাঞ্ছনীয়। মেঝে, পিড়ি বা মাটির দেয়ালে আল্পনা দেওয়া চলে।

আল্পনা-শিল্প বাংলার অতি প্রাচীন লোক-কলা। এই শিল্প আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। মা, দিদিমা ও ঠাকুরমাদের কাছ থেকে মেয়েরা আল্পনা দেওয়া শেখে। পৃথিবীতে যত প্রকার কলাবিভাগ আছে তার মধ্যে আল্পনা অঙ্কন শিক্ষাপদ্ধতি খুবই সহজ এবং সাধারণ। উপকরণও সহজলভ্য। আল্পনা শিক্ষার জন্য কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষাবিদগণ থাকতে হয়

না। মজুরী বা মাইনে দিতে হয় না। উপকরণের জন্মে বিরাট ফর্দ তৈরী করে সাহায্যের জন্মে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ধর্ণা দিতে হয় না। ঘরে বসে মা-দিদিমার কাছ থেকে বা বিশেষজ্ঞদের পুস্তিকার মাধ্যমে এই শিল্প সহজেই আয়ত্ত করা যায়। তুলির বদলে দক্ষিণ হস্তের দু'টি অঙ্গুলিই যথেষ্ট। অবশ্য আজকাল কেউ কেউ তুলির ব্যবহারও করে থাকেন।



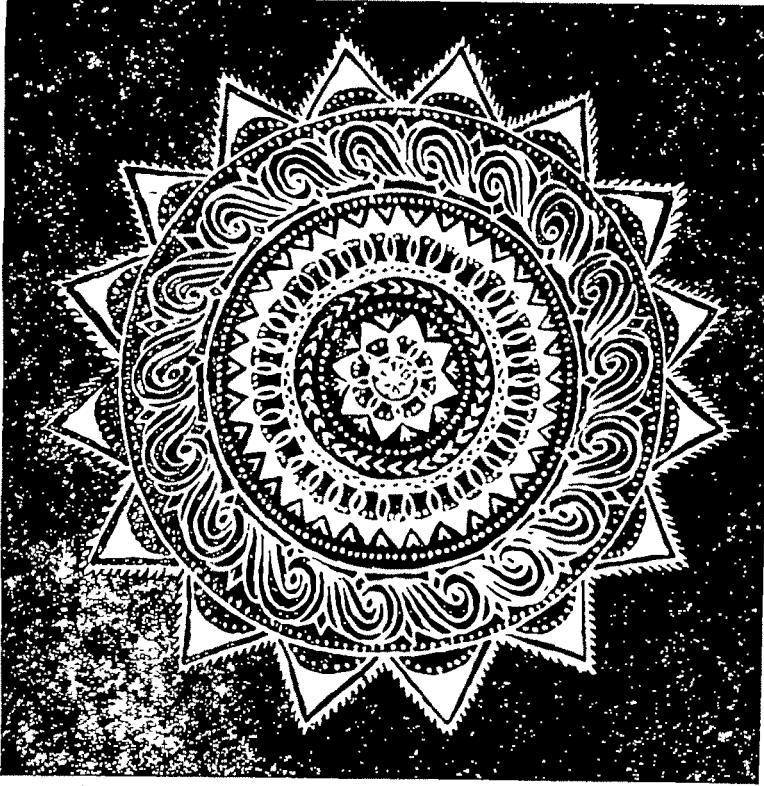
আল্পনার প্রণালী অতি সহজ। বৃত্তাকারে আল্পনা দেওয়ার রীতি আছে। বৃত্ত বিন্দু থেকে উদ্ভূত। কেন্দ্রবিন্দু থেকে অঙ্কন শুরু হয়। বৃত্তকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথম অংশের পর দ্বিতীয় অংশে নানারকমের সূক্ষ্ম লতা ঝাঁকা হয়। দ্বিতীয় অংশের শেষ বেষ্টনী রেখার উপর থেকে পদ্মের পাপড়ি বা কলসী কাটা হয়। বৃত্তাকারে আল্পনার এটি তৃতীয় অংশ।

এক টুকরো নেকড়া পিটুলির জলে তিজিয়ে নিতে

হয়। চার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও দু' তিন ইঞ্চি চওড়া হলেই চলে। নেতা বুলিয়ে ঘর মোছার মতো ভেজা নেকরাটুকু মেঝেতে ঘষে রেখা টানা হয়। হাতের তেলের আলগোছে ধরে রাখা হয়। ভেজা আঙুলের দাগ দিয়ে

পিটুলির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে লাগের বিভিন্ন শেড্ বা রকমারী রঙ করা চলে। বাটা হলুদ মিশিয়ে হলুদ রঙ করা যায়। প্রদীপের ভূষা থেকে কালো এবং গেরুয়ামাটি থেকে গেরুয়া রঙ তৈরী করা যায়।

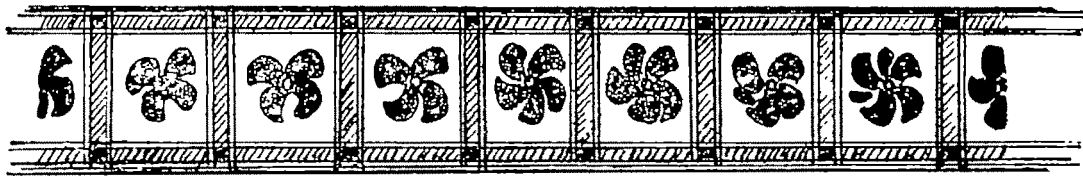
সাধারণতঃ আল্পনার জন্তে ব্যবহবে সাদাটাই উপযোগী।



আল্পনা - শিল্প মেয়েদের নিজস্ব শিল্প। অবশ্য পুরুষ শিল্পীরাও এতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। আশার কথা, ইদানীংকালে এই মৃত প্রায় শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার কিছু প্রচেষ্টা হচ্ছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামসেবিকা ও মুখ্য সেবিকারা শিক্ষা-শিবিরে আল্পনা আঁকা শেখা বার প্রচেষ্টা করছেন। এই শিল্পকে ডোমেস্টিক সায়েন্সের অন্তর্ভুক্ত করলে ভাল হয়। চিত্রবিজ্ঞা, আল্পনা শিক্ষা প্রভৃতি মাধ্যমের স্বচিকে মার্জিত ও দৃষ্টিভঙ্গীকে জন্মদায় করে তোলে। শিল্পবোধ মেয়েদের জীবনে একটা মস্ত

মেঝেতে বা দেয়ালে আল্পনা আঁকা হয়। এত সহজ সম্পদ। ছবি আঁকা পদ্ধতি বা উপকরণ অত্ কোন শিল্পে নাই।

সব মেয়েদের সহজে আসে না। কিন্তু আল্পনা আঁকা কয়েকটা প্যারের। কাজেই আল্পনা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা সার্থক হওয়া সম্ভবপর। এবং এই বিষয়টিকে বাংলা দেশের স্কুলে বিশেষ মেয়েদের স্কুলে অবশ্য শিক্ষণীয় বলে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়।*



* এই প্রবন্ধে প্রকাশিত আল্পনা তিনখানির পরিচয় বর্ণনায় “গৃহঘরে শব্দ ও খাতপূর্ণ মঙ্গল কলসী”, “বীনপদ্ম” ও “বেতপদ্ম”। “প্রীপদ্ম” আল্পনার নমুনা প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত।

সুনীতি সুরুচি সংবাদ

শ্রীজ্যোতির্শ্রী দেবী

১

স্থান ফ্রলোক। প্রাসাদের ছাতের উপর সুনীতি আর সুরুচি দাঁড়িয়ে অনন্ত আকাশ, জ্যোতির্শ্রয় ব্রহ্মাণ্ড, নক্ষত্র-তারাময় দিব্যালোক সকল দর্শন করছিলেন।

সহসা সুনীতি বললেন, 'দেখতো সুরুচি এটেই কি জম্বুদ্বীপ? কখনো মিট মিট করছে কখনো জল জল করছে?'

পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছিল। বহুদূরবর্তী, চেনা কঠিন।

সুরুচি খগীষ 'বাইনোকুলার' অর্থাৎ দিব্য দৃষ্টিকে অঙ্গুসরণ করলেন। তারপর দেখতে পেয়ে বললেন, 'ঐতো পৃথিবী আর ঐ যে আমাদের জম্বুদ্বীপ। অনেক বদলেছে। তবু চেনা যাচ্ছে।'

এবারে সুনীতিও দিব্যচক্ষুকে আহ্বান করে সমাগরা অরণ্যকুণ্ডলী হিমবানশীর্ষ জম্বুদ্বীপকে দেখতে লাগলেন।

তারপর সহসা বললেন, 'দেখ ভগিনী, আমার একবার পৃথিবীতে গমন করবার বাসনা হচ্ছে।' যখন এখানে আসি তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা বলেছিলেন, 'মাতঃ তোমরা তো অনন্তকাল ফ্রলোকেই বাস করবে। এর তো ক্ষয় নেই। গতি নেই। চিরস্থির লোক। চির ফ্রলোক। তবে কলিযুগে একবার জম্বুদ্বীপ দেখবার তোমার বাসনা হবে। তখন তার নাম হবে ভারতবর্ষ।...সে ভারত অনেক উত্থান পতনের পর আবার অভ্যুদয়ের চেষ্টা করবে। তখন একবার পুরাতন স্মৃৎস্বপ্নের লীলাভূমি পুরানো মর্ত্যলোকে যেতে চাও তো যেয়ো।' তা সে কথা শুনে তখন হেসেছিলাম। মর্ত্যজীবনের স্মৃৎস্বপ্নের কথা তো ভুলিনি। ফ্রলোকের শাস্তি ছেড়ে আর কি মর্ত্য দর্শনের ইচ্ছা হবে। আজ কিন্তু সহসা মনে হচ্ছে একবার মর্ত্যভূমি দর্শন করে আসি। সেই জ্ঞান, তপস্যা, দানযজ্ঞায় আবালা স্পর্ধা, নীচতা ক্ষুদ্রতাময়, ঘেঘ-কলহ, কুটিলতাময় সেই পৃথিবী মানবভূমি মর্ত্যভূমি দর্শন করে আসি। কি বল? চল না ভূমিও? তা হলে চল মহারাজার অঙ্গুমতি যাক্সা করি। যদি সম্মত হ'ন।'

স্বর্গে তো ঘেঘ-হিংসা নেই কাজেই সপত্নীযুগলের মতামতে কোনো অমিল নেই।

সুরুচি বললেন, 'তা মন্দ বলনি। একঘেষে স্বর্গসুখ তো যুগযুগান্তর ধরে সেই সত্যযুগ থেকে ভোগ করছি। চল রাজা যদি সম্মত হন তো যাব ছ'জনে।'

রাজা উত্তানপাদ তখন ফ্রব আর উত্তমের সঙ্গে ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা ও অধ্যয়ন করছিলেন। সহসা শাস্ত্রালোচনাগারে পত্নীদ্বয়কে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে-জিজ্ঞাসুভাবে চাইলেন।

তারা কিছু প্রকাশ করলেন না। বসে পাঠ শ্রবণ করতে লাগলেন।

স্বর্গে কাজ নেই। কোনো কিছুর আয়োজন নেই। কোনো সঞ্চল করলেই সিদ্ধি তখনি। ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই। সে কি ব্যাপার মর্ত্যমাছুষ আমরা বুঝি না। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ 'স্বর্গ হইতে বিদায়' লিখেও আমাদের স্বর্গসুখ কি তা বুঝিয়ে দিতে পারেন নি। স্বর্গে দেশ কাল পাত্রই বা কি ভাবের তাও জানেন না কেউ। কাজেই সুনীতি সুরুচির সঙ্গে আমরাও রাজার ভাগবৎ পাঠ শেষ হবার জন্ত অপেক্ষা করি।

২

অনন্তর সন্ধ্যা হয় দেখে ফ্রব মানস সরোবর তীরে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সন্ধ্যা-বন্দনাদি জন্ত গমন করলেন। উত্তম অন্ত্র গেলেন।

এবারে পত্নীযুগল পতির নিকট নিজেদের মনের বাসনা নিবেদন করলেন।

রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। 'মর্ত্য? মর্ত্য যাবার আকাঙ্ক্ষা কেন দেবীগণ তোমাদের?'

তারপর চিন্তিতভাবে বললেন; 'এ সময়ে মর্ত্যের অবস্থা বড়ই জটিল ও কুটিল। ফ্রব রাজ মানস সরোবর তীরে সন্ধ্যাহ্রিকের জন্ত যায়। নারদ বলছিলেন যে, মানস সরোবর তো আর ভারতের অধিকারে নেই, চৈনিক দস্যুরা নিয়ে নিয়েছে। হিমবান পর্বতও আয়ত্ত করে নেবার চেষ্টায় আছে। মানসতীর্ষ গেছে, হিমবান পর্বত গেলে নরনারায়ণ তীর্ষ ও বদরীধামও ভারতের রক্ষা করা

কঠিন হয়ে উঠতে পারে। চতুর্দিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের আয়োজন। কি ব্যাপার সেটা জানিনে। এদিকে বিদেশী বিজ্ঞানীদের অভিযান চললোক অবধি পৌঁছেচে। চললোক যায় যায়। চললোক গেলে পিতৃগণের পর-
লোকের আবাস তপোভূমি সব যাবে। এমনিতেই তাঁরা 'নিরালঙ্ঘ্য' বায়ুভূতো অবস্থায়—কোথায় তাঁরা যাবেন তাও বোঝা যাচ্ছে না। ফ্রবলোকও হয়ত বিপন্ন হবে। এ সময়ে তোমাদের মর্ত্যে যাওয়া ঠিক হবে কি? আমি তো ফ্রব উদ্ভবের জন্মই চিন্তায় থাকি মর্ত্যবাসীদের এই সব অন্ধকার অভিযানের সংবাদে। হে দেবীগণ, আমাদের এই প্রস্তাবে আমি বিশেষ সম্মতি দিতে পারছি না।'

সুনীতি ধীর শাস্ত মাহুষ। নীরবে রইলেন।

স্মৃতি চিরকালের পতিপ্রিয়া রমণী। তিনি হেসে বললেন, 'মহারাজ! মর্ত্যভূমিতে আমাদের আর কি বিপদ হতে পারে। আর যদি কোনো কিছু হয় তো আমরা তো দৈবশক্তিতে 'বামচারী' হতে পারি, তৎক্ষণাৎ ফ্রবলোকে ফিরে আসব। আপনি চিন্তিত হবেন না। নবীন ভারত কিতাবে নিজেকে সংগঠিত করছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সমন্বয় করছে একবার পর্যবেক্ষণ করে আসি। আমাদের পুরাতন জম্বুদ্বীপের সেই সত্যযুগের সুখ শান্তি ঐশ্বর্য আর এই কলিযুগে আছে কিনা তাও দেখবার ঔৎসুক্য রয়েছে।'

এড়াতে না পেরে—চিরপ্রিয়া পত্নীকে রাজা দ্বিধা হেসে বললেন, 'আচ্ছা তাই হোক। কিন্তু একাকিনী তো স্ত্রী-জাতির যাওয়া সম্ভব নয়। দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করি। তিনি এখনো সর্বত্র পর্যটন করে থাকেন। সর্বগামী তাঁর সঙ্গে হলে তোমাদের মর্ত্যলোক দর্শন সম্পূর্ণ হবে। তিনি অন্তরীক্ষচারীও বটে। তেমন কোনো বিপদ হলে তোমাদের কিরিয়ে আনতে পারবেন।'

দেবর্ষি তো স্মরণমাত্র মনোরথে ফ্রবলোকে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে সুনীতি, স্মৃতি নিজেদের রুচিমত প্রসাধন বেশভূষা করে প্রস্তুত হলেন।

৩

আকাশে সোনার আলো। ভারত আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। চারদিকে সমারোহ উৎসব লেগেই

আছে। কোথাও সভা, কোথাও শোভাযাত্রা, কোথাও কবি মনীষী জয়ন্তী (জম্মদিন স্মরণোৎসব যা সেকালে রাণীরা দেখেন নি) কোথাও কোনো অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন, কোথাও কোনো বিশাল নদীর বাঁধ উদ্বোধন। আর দলে দলে পরিপুষ্ট বপু স্থলকায় রাজকর্মচারীগণ সংসদ সদস্যগণ বিমানে মোটরে আরোহণ করে সেই সব স্থানে যাতায়াত করছেন। এবং অর্দ্ধাশনে শীর্ণকায় জীর্ণ-বাস ক্ষুধিত জনতার দল পথপার্শ্ব থেকে হস্তমুখে তাঁদের জয়ধ্বনি জানাচ্ছে।

সুনীতি স্মৃতি রাজকর্মচারীদের ঐশ্বর্য ও সম্মান দেখে ভারী খুসী। কিন্তু সুনীতি যেন বুকু জ্বলন্ত জনতাদের দেখে একটু বিমনা। যেন দুইয়ে মিলছে না।

স্মৃতি বললেন, 'চলুন দেবর্ষি, শীঘ্রই ফিরব তো। আগে হস্তিনাপুরই দর্শন করে নেওয়া বাক। যদি চৈনিক শত্রু আক্রমণ করে তা হলে এই দেখেই ফিরে যাব। রাজার আদেশ।

অহো কি হস্তিনাপুর! স্বর্গবাসিনীরা মুগ্ধনেত্র চারদিকে দেখেন।

যুধিষ্ঠিরের বিশ্বকর্মা গঠিত ইন্দ্রপ্রস্থকেও হার মানিয়েছে যেন। রাষ্ট্রপতি ভবন, মন্ত্রীভবন, অট্টালিকা প্রাদাদ উদ্যানময়ী অপূর্ব নগরী। অধিবাসীদের বিলাস ঐশ্বর্যের যেন সীমা নাই। মোগল বাদশারাও বুঝি এ বিলাস-ব্যসনের কাছে পরাজয় মানতেন।

যেন সেকালের কামধেনু স্মৃতি নন্দিনী তাঁদের হকুমের অপেক্ষায় সর্বত্র হাজির আছেন। উচ্চপদস্থগণ নীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেই সব ভবনে বসে বসেই অন্তরীক্ষ গণে দেশবিদেশের নৃত্যগীত শ্রবণ দর্শন করছেন।

নানাবেশিনী নারীরা মদালস গমনে নয় কিপ্রচরণে যাতায়াত করছেন। কোথাও কলহাস্তে শুধুনে আলাপ আলোচনা করছেন স্বর্গাসনে বসে।

স্মৃতি বললেন, 'আর্য্যে, দেখ দেখ পৃথিবীর কি উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রভাবে এঁরা সব সুখই সকলে পাচ্ছেন। আমাদের সে সময়ের জম্বুদ্বীপে মূনি ঋষি তপস্বীরা তপস্তাবলে এবং কামচারী দৈত্য অসুররা এই সুখ আহরণ করে নিতে পারতেন। আহা! পৃথিবীর অধিবাসীরা আজ কি সুখী।'

দেবর্ষি নারদ ঈষৎ হেসে বললেন, ‘আমুন মাতৃগণ, একবার লালকিল্লা আর পুরাতন ‘দেহলী’ দর্শন করুন। হস্তিনীপুর পৃথ্বীরাজ যুগের, দাসরাজ যুগের, খিলজী রাজ্যকালের মোগল বাদশাদের নানা কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তিময়, ধ্বংসস্তুপময় নগরীর অশ্রু সর্বাঙ্গিক ও দর্শন করুন। লোকে বলে এখানে পরে পরে সাতটি দিল্লীর সপ্ত ধ্বংস-স্তূপ আছে। অবার কেউ কেউ বলেন শতের চেয়ে বেশী আছে। তাই সম্ভব। কেননা চন্দ্রবংশ স্বর্ষ্যবংশের পর আরো কত রাজা সম্রাটের অভ্যুত্থান হয়েছিল, সম্রাট আশোকের আগেও কত রাজা ছিলেন...। ঐ দেখুন (‘রিজের’ ধার দেখিয়ে) এই বোধহয় সেই দুর্ভিক্ষ খাদ্য-বনের অবশিষ্ট অংশ। যার কিছু অর্জুন বাকি রেখে দিয়েছিলেন। দহন করেন নি।’

তারা মনোরমেই এক নিমেষে পুরনো দিল্লীতে এসে পড়লেন। লালকিল্লা, সেসিমগড়, কাশ্মীরি গেট মোগল ইতিহাসের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জায়গাগুলি—জুমা মসজিদ, চাঁদনী চক, হুদমিয়া বাগ, রোশনারা বাগ সব দেখতে লাগলেন।

কিন্তু তার দিকে দিকে যেমন নোংরা পল্লী আর দারিদ্র্যক্লিষ্ট অপরিচ্ছন্ন অধিবাসীবৃন্দেরও দেখতে পেলেন। দেখে ক্রবলোকবাসিনীরা একটু বিমনা হলেন আবার।

সুনীতি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তপোধন, এই নগরীর এ প্রান্ত এমন নোংরা কেন?’

দেবর্ষি বললেন, ‘রাজ্যসরকার দিল্লী নগরীকে দু’ভাগে খণ্ডিত করেছেন। একটিতে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ, অমাত্যগণ, বৈদেশিক অতিথিদের দূতগণের বাস ও আবাসভূমি রচিত হয়েছে। তারা এরকম অপরিচ্ছন্নতা সহ করতে অসম্মত নন।’

‘খারি বাউড়ি’র বাজার ও পল্লী এসে পড়ল। সুরুচি নাকে রুমাল দিলেন—‘দেবর্ষি, এ কোথায় আনলেন, ভীষণ দুর্গন্ধ।’

দেবর্ষি বললেন, ‘এ জায়গাটার নাম ‘খাড়ি বাউড়ী’। অর্থাৎ লোনা জলাভূমি। কোনো সময়ে জল ছিল। এখনো বর্ষার জলে ঠে ঠে করে। এখানকার অধিবাসীরা

দিল্লীর অতি পুরাতন দরিদ্র অধিবাসী। আর ঐ দেখুন উপরের বারান্দায় এই মর্ত্যলোকের অপ্সরাদের দেখুন।’

সুনীতি সুরুচি উপরে চাইলেন। কয়েকটি নারী পরিস্কার বেশভূষা করে ছোট ছোট খাটিয়ায় বসে-আলবোলায় তান্ত্রকূট সেবন করছে।

দেবর্ষি বললেন, ‘চলুন মাতৃগণ, আপনাদের কুতব-মিনার দেখিয়ে, গান্ধীজীর বাল্মিকী আশ্রম হরিজন কলোনী দেখিয়ে পার্লামেন্টে লোকসভায় নিয়ে যাব।’

সুনীতি বললেন, ‘কে এখানে হরিভক্ত আছেন, হরিজনাবাসে?’

দেবর্ষি হাসলেন। বললেন, ‘হরিভক্ত নয় কেউ।

তার। নগর পরিস্কারক পরিচারক জনসমূহ।’

‘এই কুতব মিনার দেখুন।’

সুরুচি বললেন ‘এটি কে নির্মাণ করেছিল?’

নারদ বললেন, ‘কিষ্কিন্দী বলে এটা মহারাজা পৃথ্বীরাজের জী সংযুক্তা এর উপর থেকে যমুনা দর্শন করার জন্ত নির্মাণ করিয়েছিলেন। তারপর কুতবউদ্দীন বাদশা এর পাথরের উপর কোরাণের ‘বয়েং’ লিখে নিজের নামে কুতব মিনার নামে প্রচার করেন। তাই এখনো এর গায়ে কোরাণের বাণীর পাশে পাশে পদ্ম এবং ঘটা চিহ্ন দেখা যায়। ঐ দেখুন সামনে ‘আশোক স্তম্ভ’।

‘সুন্দর মূখের সর্বত্র জয়’ বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি।

দুটি অনন্তমোহনা রূপবতী নারী নিয়ে দেবর্ষি যেন বিনা আয়ামেই লোকসভায় দর্শকের আসন সংগ্রহ করে নিলেন।

একটি গৈরিকবাস স্তম্ভ শ্রদ্ধা বৃদ্ধের সঙ্গে আশ্চর্য সুন্দরী দুটি নারী তাদের বেশবাস ঠিক আধুনিক ভারতীয় নয়। রূপ ও প্রসাধনও বিচিত্র। দর্শকদের দৃষ্টিতে যেন কোন্ বিলুপ্ত যুগের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল।

মাথার কবরী, গলার হার, কেশের কঙ্কন কুণ্ডল মেখলা কুম্ভচন্দনে চিত্রিত বাহুরতল সূক্ষ্ম উপানয়নোত্তীর্ণ চরণ-কমল কোন্ দেশের এ সম্ভ্রম; সকলের মনে প্রশ্ন জাগে।

কিন্তু লোকসভায় তো কত দর্শক কত দেশের লোকই আসেন। সভা অচিরাত্তর্ক বিতর্ক প্রশ্নোত্তরের জগতে উপনীত হতে সেইদিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল।

সুনীতি স্থির। সুরুচির কোঁতুকের আর প্রশ্নের সীমা নেই। বিজ্ঞাতীয় ভাষায় আলোচনা—দেবর্ষি নারদ প্রয়োজনমত বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

দেবলোকে স্বর্গে তো কোনো কিছু নিয়ে তর্ক আলোচনার প্রয়োজন হয় না। একমাত্র যখন সুরাসুর দ্বন্দ্ব হয় তখনই তাঁদের আলোচনা সভা বসে।

মর্ত্যে যত সমস্তা, তত সমাধানের চেষ্টা, তত নিষ্ফল বাণী ও বিতর্ক।

সহসা সুরুচি ক্ষিপ্তাঙ্গা করলেন নারদকে ‘দেবর্ষি, এই প্রশ্নোত্তরে আমাদেরও প্রশ্ন করার বিধান আছে নাকি?’

দেবর্ষি হেসে বললেন, ‘না, এর সদস্ত না হলে কারুর সে অধিকার হয় না। আমরা তো দর্শক মাত্র।’

সুরুচি বললেন, ‘আমার কিন্তু একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হচ্ছে।’

নারদ বিস্মিত। ‘কি প্রশ্ন? মর্ত্যভূমিতে একালে এ যুগে দেবীর কি প্রশ্ন থাকতে পারে?’

সকৌতুকে সুরুচি বললেন, ‘মর্ত্যের লোকসভায় সুনীতি শ্রেষ্ঠ অথবা সুরুচির আসন শ্রেষ্ঠ এই আমার প্রশ্ন।’

নারদের বিস্ময়ে একটু হেসে বললেন ‘না না, আমাদের কথা নয় নীতি আর কচির কথা।’

তবু দেবর্ষি আশ্চর্য্যই হলেন।

ভাবলেন প্রশ্নের তাৎপর্য্যই বা কি আর প্রয়োজনই বা কি। একি তবে সেই সুনীতি ও সুরুচির দ্বন্দ্ব? শ্রেষ্ঠতার দ্বন্দ্ব।

অহো মর্ত্যভূমির কি মহিমা। মর্ত্যে পদার্পণ করেই সুরুচির হৃদয়ে এই মর্ত্যভাব উদয় হ’ল।

সরলা সুনীতি সপত্নীর এই আকস্মিক প্রশ্নে কিছু বিচলিত হলেন।

অবশ্য কিছু ভাবলেন না বিশেষ করে।

কিন্তু সুরুচির যেন কোঁতুকের সীমা নেই।

দেবর্ষি যেভাবেই হোক প্রশ্ন উত্থাপনের ব্যবস্থা করলেন মন্ত্রীসভার সদস্যদের ধরে।

মাসে একটা করে প্রেস, সভা কনফারেন্স বসে, তাতে প্রশ্ন করা হবে।

প্রেস সভায় দর্শকের আসন সংগ্রহ করে দেবর্ষি

রাণীদের নিয়ে বসলেন। সংস্কৃতি মন্ত্রী, দুর্নীতি দমন মন্ত্রী, ছোট বড় মেজাজ সব অনেক মন্ত্রী জড় হবেন।

প্রধান মন্ত্রীও রইলেন।

দেশের কল্যাণের জ্ঞাত কি বড়? কোন্ আদর্শ বড়? সুনীতি অথবা সুরুচি। কারুর সঙ্গে কারুর মত আর মেলে না। কেউ বললেন, ‘কল্যাণ অবশ্য সুনীতির আদর্শেই হয়।’

প্রধান একজন বললেন, ‘কিন্তু শুধু কল্যাণই বড় কথা নয়—রুচিময় সুরুচিময় জীবনযাত্রা না হলে আমরা দেশ বিদেশের কাছে মুখ দেখাব কি করে?’

অপরিস্রব গ্রাম্য অর্ধনগবেশ জীবনধারাকে পরিবর্তন করতে গেলে সমাজে রুচিবোধ জাগানো দরকার।

একটু থেমে—‘হ্যাঁ, সুনীতি খুবই বড় বিষয়, আদর্শও বড়।—কিন্তু আমি মনে করি রুচিবোধেরও আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে এ যুগের সভ্যজগতে।’

প্রশ্ন। ‘কিন্তু নীতিবোধ তো অন্তরের ধর্ম, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা। বিশেষ সুরুচিসম্মত ভাবে থাকতে হলে তো প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুনীতি পালনে সে প্রয়োজন থাকে না। নীতিবোধ ধর্মময় এক লক্ষ্য। রুচির নিয়তই পরিবর্তন ঘটে।’

সভা উষ্ণ উগ্র হয়ে উঠল তর্ক বিতর্কে।

প্রধানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ‘আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রীর মত হচ্ছে।’—‘হ্যাঁ, সুনীতি থাকুক। কিন্তু সুরুচি বাইরের কিছু বিষয়জগতের জ্ঞাত আমাদের সুরুচিরই বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের সভ্যসভায় সৌষ্ঠবময় রুচিময় না হলে চলবে না।’ শেষ অবধি স্পষ্ট হ’ল না সুনীতি শ্রেষ্ঠ না সুরুচি বড়।

সভা ভাঙল।

সুরুচি কোঁতুকে উচ্ছল। সুরুচি কি তাহলে এবারেও রাণী সুরুচিরই হল সভ্যযুগের মত?

সহসা দেবর্ষি দেখলেন সুনীতি তো পাশে নেই।

সুনীতি অন্তর্হিত হয়ে গেছেন। কোথায় গেলেন?

দেবর্ষি মর্ত্যভূমিতে তাঁকে আর পেলেন না।

সভ্যযুগের মত এ যুগেও তবে কি দ্রবলোকেই তাঁর স্থান?

সেইখানেই ফিরে গেলেন।

স্মরণে

নরেন্দ্র দেব

তোমাতে চাহিয়াছিলাম বাঁধিয়া রাখিতে এ বাহ বন্ধনে, আলিত অঞ্চলা :
তুমি যে পারো না কভু অচলা থাকিতে, আনন্দ নন্দনে, হে চির-চঞ্চলা !
এ কথা জানিত মন, তবু যেন ভুলে, চেয়েছি বাঁধিতে—অছেদ্র শৃংখলে,
ভাবি নাই কোনোদিন জীবনের কূলে হবে গো কাঁদিতে তপ্ত অশ্রুজলে !
তুমি চলে যাবে এতো ভুলেও স্বপনে পারিনি আনিতে ? ছিল যে ধারণা,—
ভালবাসিয়াছি যারে কভু তার মনে বেদনা হানিতে তুমি তো পার না !
সেদিন বুঝিনি আমি তুমি এসেছিলে ক্ষণিকের লাগি, লীলাভরে কত ।
অমুরাগে কিছুদিন স্থপ্তি শুধু দিলে হৃদিপথে জাগি প্রেমদীর মতো ।
যাত্রী মোরা যুগে যুগে জীবনের পথে, জানি না কোথায় স্কুরাবে এ গতি ;
কতকাল ক্লান্তপদে চলি ধরেছিলাম পাণি, ওগো আশ্রয়তি !
সেদিন চলার পথে শ্রান্তিটুকু মম করেছিলে দূর বহু যত্নে সেবি,
বলেছিলে কাশে কাশে ‘প্রিয়’ ‘প্রিয়তম’ শ্রীকণ্ঠে, মধুর কেরো তুমি দেবি ?
তোমাতে পাইয়া আমি ভেবেছিলাম মনে পেয়েছি এবার সাধনার ধন,
জন্মে জন্মে যারে খুঁজে ফিরেছি ভুবনে, মিলেছে তাহারে, সার্থক জীবন !
তোমাবে রাখিব ধরে, সাধ ছিল চিতে বাঁধি বাহুতোরে চির-অমুরাগে,
সেদিন কি জন্মিতাম পারে না রাখিতে কেহ কারে ধরে’ নিবিড় সোহাগে ।
তুমি চলে গেছ’ আজ না-বলিয়া কিছু, চাহি যে ফিরাতে, জীবনে আবার,
জানি আমি, বুধা এই ছোটো তব পিছু দিবসে ও রাতে, নহে তা পাবার !
তবু যে মানে না মন, অমুগন তাই বোনে স্বপ্ন-জাল নিতি নব নব,
জীবনে পাথের মোর কিছু আর নাই, যাপিতেছি কাল পথ চেয়ে তব !
এতোদিনে বুঝিয়াছি তুমি শুধু এসে করে গেছো দান জগতে যা শেষ,
অভাগার অন্ধকার অন্তর-প্রদেশে অমৃত সন্ধান মিলেছে যা প্রেম ।
জ্বলে গেছ’ স্নিগ্ধ-শিখা যে ভালবাসার প্রবতারা প্রায়, চিরস্থির জানি,
পূর্ণ করি প্রয়োজন তোমার আসার চলে গেছো হায়, হে মোর কল্যাণি !

বৃত্তপথ

ভবঘুরে

জীবনের কী যে মানে—সত্যকথা ভুলে গেছি তাও
গোলকের শেষ খুঁজে পাইনি কোথাও ;
কথায় কান্যে শুধু বিশ্লেষণ বেড়েছে অনেক
বর্ষাষ-প্রাবনে কত উদাস শতাব্দীর ভেক ।
হায় রে জীবন হায় !
পান পাত্রে মদিরার আশ্বাদ কোথায় ?

অনেক কয়েছি কথা : প্রেম-প্ৰীতি বহু উপদেশ,
অনেক কাহিনী রচি : মধুময় অনেক নিমেঘ,
জীবনের সত্য বিন্দু খুঁজি তাতে জহরীর মত
উলঙ্গ সত্যের ঘিরে যে-জীবন রয়েছে সংহত
হায় রে জীবন হায় !
স্থির পথিকে তুমি কেবল ছুটিয়ে চল নিপুণ মায়ায় ।

জীবনের কী যে মানে—স্থির সত্যের পাইনি সন্ধান ।

যেহেতু, আমরা ছুটে চলেছি সমান

সত্যের উত্তরীয় খসাবই ব’লে ।

বৃত্ত-পথে পদযাত্রা : সবেগে—সকলে ।

সুরবালার পুনর্বিবাহ

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১

কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ীর একটি বেনের ছেলে
সুরেশ তাহার জাতব্যাবস্যা ফেলে,
বিমাতার ঘোর অভ্যাচারে দারুণ অতিমানে
নেত্রকোণার শ্রামগঞ্জের জংশন ইষ্টিশানে,
পানিপাঁড়ের চাকরি নিল এসে।

বৌকে এনে শেষে

মিলে মিশে সেই পাড়ার্পায় আনন্দেতে থাকে।
গাইতে পারে এসব স্নেহে স্তনে,

মিষ্টিগলার গুণে

বাউল-গানের সব আসরে সবাই তাকে ডাকে।
এমনিভাবে বেশ কিছুকাল কাটলো সুখে তার ;
ইঠাৎ একদিন রাত্রে অস্বকার
গান শুনে সে পল্লীপথে একা
আগার সময় চালতে-গাছের ত্বতের পেলো দেখা !
পথের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে ছড়িয়ে ছুটি হাত
চায় সুরেশের করতে মুণ্ডপাত !
ভয় পেয়ে সে অল্পপথে এসে নিজের ঘরে
পরের দিনই মরলো ভীষণ জ্বরে !

২

তব্বী রূপবতীর রূপ হলো তাহার কাল।

ভাঙলো রে কপাল !

সুন্দরী ওই সুরবালার দুঃস্থ দাদা তাকে
গভীর দুখে তাহার কাছে গৌরীপুরে রাখে।
ওই বেচারার উপার্জনটা বড়ই বেশী কম !
তাইতো তাহার ঘটলো শেষে একটা মতিভ্রম,—
চাইলো দিতে জলাঞ্জলি বোনটার সম্বন্ধ !
রমেশচন্দ্র দাস মহাশয় এসব গুপ্ত কথা
করতে আমার কর্ণগোচর করেন নি অন্তথা।
ডাকিয়ে আনি ওইদিনই ওই রাতে ;
সুরবালার দাদা এলো সুরবালার সাথে।
জিজ্ঞাসিছ—“তোমার কি এই দাদা ?
ওরে হারামজাদা !
বোনটাকে চাস ডুবিয়ে দিতে, লক্ষ্মীছাড়া গাধা !”

৩

লজ্জানত মুখের পানে চেয়ে কিছুক্ষণ
ব্যথায় কাতর হলো আমার মন,
অশ্রু এলো চোখে,
আমীহারা এই তরুণীর উষ্মলিত শোকে।

শুধাই তাকে—“বল দেখি মা, আবার বিয়ে হবে,
তোমার কি তা ত অমত আছে, থাকবি তুই গৌরবে !
লজ্জা কি মা, আমি যে তোমার ছেলে !”
মত দিল সে বামদিকে শির হেলে,
কইলো আমার—“ধর্মপথে থাকতে আমি চাই !
বাবা, আমার আর তো কেহ নাই !”

৪

ছ-এক দিনের মধ্যে আমি পাত্র করি ঠিক,
বহাল আমার থাকলো সকল দিক।
শ্রীধরগী দত্ত নামে বাজারের এক যুবক,
তাহার সাথে বিয়ে দিতেই হলো প্রস্তাবক।
বাপ-মা তাহার কেউ বেঁচে আর নাই,
বুঝিয়ে বলায় সম্মতি তার পাই,
বিবাহের দিন শীঘ্র করি স্থির ;
এ সব শুনে' ঘোর জননীর চক্ষে বহে নীর।

৫

ভেরো-শত-চুম্বালিশের ছয়ই ফাজ্জল প্রাতে
ঠিক করেছি শুক্রবারের আজকে সন্ধ্যারাত্রে,
সুরবালার বিবাহটা দেবো নির্বিবাদে,
কেউ যেন না বিবাহে বাদ সাধে।
কাসির সাথে চুলী এলো ঢোল লয়ে তার কাঁধে,
সবকে বসায় তারিণী রায় তাহার আঙিনায়।
মমমনসিংহের পুত্র পাঠায়
প্রিয় বন্ধু অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ;
ঢোল কাসির ঘোর শব্দে হোলো মুখের গৌরীপুর।
ধর্মপিতা হয়ে সেদিন কল্যাণ সম্মুখানে
কী আনন্দ পেয়েছিলাম, জাগছে আজো প্রাণে।

৬

এই বিবাহের পরে আরো ষোলো বছর সুখে
কর্মভূমে কাটিয়ে এলাম আনন্দ-উৎসুকে
দেশে এলাম সুরবালার সুন্দর দুই ছেলে,
মায়ের সাথে আসতো খেলা ফেলে,
চেয়ে থাকতো আমার মুখের পানে !
তারা আমার মনকে আজও টানে !
আমার সুরোর লজ্জানত আঁখি
কৃতজ্ঞতায় সত্যি যেন করছে ডাকাডাকি !
না জানি হয়, কোথায় তারা, কোথায় আছি আমি !
জানে অন্তর্যামী !

৩

স্বাস্থ্য-কথা

ডাঃ শ্রীনলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত এম. ডি.

চতুর্দিকে স্বাস্থ্যসভা প্রভৃতি হইতেছে। ইহা খুব ভাল; আমাদের স্বাস্থ্যের যেমন দুর্দশা তাহাতে জাতীয় স্বাস্থ্য ভয়ের কারণ নির্দেশ সত্ত্বর প্রয়োজন; কিন্তু কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া কেহ কেহ আম্র দেশের লোককে দেশের চিরপ্রচলিত নিয়মাবলীর নিন্দা করিয়া থাকেন। স্বাস্থ্য-সভা সমিতিতে এই কথাও বলা হইয়া থাকে যে, আমরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিত্যন্ত অজ্ঞ, আমাদের ধর্ম, কর্ম, আচার অনুষ্ঠান সবই স্বাস্থ্য-বিধি বিগর্হিত—ইহাই আমাদের বর্তমান দুর্দশার কারণ। এ কথা কিন্তু আদৌ সত্য নহে, বরং চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এদেশে একজন নিরক্ষর চাষীর জীবন যেক্রপ নিয়ম ব্যবস্থায় পরিচালিত তাহা Europeএ চিকিৎসক বা বিজ্ঞানবিদেরও নাই। মাসিক অতি অল্প আয়ে ৪৫ জনের সংসার ভরণপোষণ করিতে হইলে ওদেশের অনেকের এতদিন চিহ্নও থাকিত না। বিলাতের এক বিখ্যাত ব্যক্তি কয়েক বৎসর আগ্রার নিকট এক গ্রামে বাস করিয়া তাহার অভিজ্ঞতার ফল এক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন এদেশে ব্রাহ্মণেরা ‘আচার’ বলিয়া যে নিয়ম ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহা সর্বপ্রকারে এত দারিদ্র্য দুঃখের মধ্যেও এ জাতিটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মনে করুন রঞ্জন করিবার পূর্বে স্নান করা শৌচবস্ত্র পরা এখানে নিয়ম। ইংরাজী আদব কায়দার নিয়ম ধোপদোরস্ত কাপড় পরা। পাচক মহাশয়ের

শরীরে বে নানারকম জীবাণু থাকিতে পারে তাহার কোন প্রতিকার হইল না—কাজেই আমাদের প্রচলিত প্রথাই যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ কি? আহারের পূর্বে হাত ধোওয়া, আহারের পর হাত ধোওয়া, মল মূত্র ত্যাগ করিয়া জলশৌচ করা, বাহির হইতে আসিয়া কাপড় বদলি করা, এই প্রথাগুলি যে কত সুন্দর, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সকল রীতি জগতে কোথাও নাই। অথচ এ দেশে ঐগুলি আবহমানকাল প্রচলিত কর্মের অঙ্গ। “League of Nations-এর এক Committeeর কয়েকজন Denmark-এর member এদেশে পল্লীগ্রাম দেখিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—বাসন মাজা ও ঘর পরিষ্কার করা এ দেশে যেমন দেখিলাম, এমন কোথাও নাই। দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

তাই বলি আমাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান নাই ও এই জন্ম কষ্ট পাই বলিয়া যাহারা অভিযোগ করে, তাহারা নিত্যন্ত ধূষা ধরিয়া কথা বলে—এই রকম ধূষাতে অনেক কথাই চলে যাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বলা হইয়া থাকে যে, বিজ্ঞানের দৌলতে আজ পাশ্চাত্য জগৎ এত স্বাস্থ্যবান। যে কোন Bacilli বাহির হওয়ার পূর্বে বায়ু, পিত্ত, কফ-এর বিকৃতি লইয়া ভারতীয় চিকিৎসা ছিল। Bacilli-এর খবর পাওয়া গিয়াছে মাত্র ১৮৮৫ অব্দ-এর পর। সুতরাং পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যজ্ঞানের সহিত ভারতীয় স্বাস্থ্য জ্ঞানের উৎকর্ষের সম্পর্ক নাই।

(আয়ুর্বিজ্ঞান, বৈশাখ ’৭১)



অপরূপ রূপকুণ্ড

শ্রীমুণীল চৌধুরী

[বক্ষ্যমান ভ্রমণকাহিনীর লেখক শ্রীমুণীল চৌধুরী অসম সাহসী স্বাস্থ্যবান যুগপুরুষ। বিনয়নম্র ও মিষ্ট-ভাবী। সাহিত্যিক হিসাবেও 'শ্রীচৌধুরীর' খ্যাতি আছে। গল্পলেখক হিসাবে প্রবর্তক পাঠক-পাঠিকার নিকট তিনি সুপরিচিত। এই বছরেরই বিগত মে মাসে দুর্গম রূপকুণ্ডে দুঃসাহসিক অভিযানের বিজয়গৌরব অর্জন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই অভিযানের বৈশিষ্ট্য ছিল একটা অজ্ঞাত নূতন পথের আবিষ্কার। কলিকাতা অভিযাত্রী সম্বন্ধে হৃদয়জন সভ্য এই অভিযানে যোগদান করেন এবং নেতৃত্ব করেন শ্রীমুণীল চৌধুরী। এই প্রবন্ধটি লিখিয়া দিবার পরই শ্রীচৌধুরী আর একটা হিমালয়ের দুর্গম অভিযানে রওনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁর নিরাপদ যাত্রা এবং সফল প্রত্যাগমনের প্রার্থনা করি। —প্রঃ সঃ]



হোমকুণ্ডের সম্মুখে স্থাপিত শিবির ও অভিযাত্রীগণ

রহস্যাবৃত রূপকুণ্ড!

গাড়োয়াল হিমালয়ের নির্জন চিরতুষারাবৃত আঠারো হাজার ফুট উচ্চে এক অ্যান্ড্রিথিওটর—নাম তার রূপকুণ্ড। চনোনিয়া কোট পর্বতমালার তীরে এর এক অপূর্ব অবস্থান—ডিম্বাকৃতি। এই রূপকুণ্ডের তীরে অজস্র পাথরের নীচে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর নাম-গোত্রহীন মানুষের শত শত বিকৃত-অবিকৃত মৃতদেহ পড়ে আছে। বিশ্বের বিজ্ঞানীরা উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন সেই জনপ্রাণীহীন নিম্নরু তুষারাবৃত কুণ্ডের দিকে। কারা ঐ মানুষ? কি তাদের জাত, কিবা পরিচয়? ওরা ভারতীয় না তিব্বতীয়? ধর্মভীরু তীর্থযাত্রী না মদমত্ত সৈন্যদল?

—অনেক, অনেক প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর নেই কোন।

বৈজ্ঞানিকদের উত্তরগুলোও যেন হিমালয়ের মত মৌন!

পাহাড়ের আকর্ষণ বহুদিনের। হিমালয়ের অনেক তীর্থ, অনেক নাম-না-জানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি। রূপকুণ্ডের আকর্ষণও তাই সহজাত। ও পথে একা যাওয়া যায় না। বিপদ তো পথের সাথী। সমস্তা অর্থ। তাই দলগঠন করতে হয়েছে। এ যাত্রা তীর্থযাত্রা নয়—অভিযান। পথ নেই, মাথা পোঁজার জায়গা নেই। জনহীন প্রান্তর—তুষারে কাটাতে হবে দিনের পর দিন। অনেক দিনের আকাংক্ষা রূপকুণ্ড দেখব। এবারের অভিযান সেই আকাংক্ষারই ফলশ্রুতি।

বিগত ১৪ ই মে ১৯৬৭ কলিকাতা অভিযাত্রী সংঘের ছয়জন সভ্য যাত্রা করল রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ডের পথে। দল পরিচালনার দায়িত্ব আগার ওপর। হাওড়া ষ্টেশনে বহু শুভামুখ্যায়ীর শুভেচ্ছা নিয়ে যাত্রা করলাম দুর্গম পথের উদ্দেশ্যে।

দু'দিন ট্রেন আর দু'দিন বাস যাত্রা করে আমরা গোয়ালদাম পৌঁছলাম। গোয়ালদামের দশ মাইল আগে বিখ্যাত গরুড় চটি। গরুড়গঙ্গার তীরে ঐতিহাসিক গরুড় সন্থ। দশম শতাব্দীতে এখানে হরপার্বতীর মন্দিরমালা তৈরী হয়, যা আজো বর্তমান। আর আছে বিখ্যাত বৈষ্ণনাথ মন্দির। গোমতী নদীর কাকচক্ষু নীল শ্রোতোধারা বৈষ্ণনাথ মন্দির ঘিরে বয়ে চলেছে।

গোয়ালদাম পৌঁছাই বিকালে। আকাশ কালো মেঘের আস্তরে ঢাকা। বৃষ্টি পড়ছে। বাস স্ট্যান্ডের উপর ফরেষ্ট রেট হাউস। বাংলার অবস্থান চমৎকার। চারিদিকে পাইন বীথি আর বাহারী ফুলের কেয়ারী করা বাগান। দূরে হিমালয়ের বিখ্যাত ক'টি শৃঙ্গ। ত্রিশূল, নন্দ্যমুষ্টি, নন্দাদেবী আর নন্দাকোট পর্বতমালা ঘিরে রেখেছে দিগন্ত।

ভোরের পাখী ডাকছে। রাতের যবনিকা উঠে গেছে দিনের আবির্ভাবে। ঘুম ভেঙ্গেছে হিমালয়ের— ঘুম ভেঙ্গেছে অভিযাত্রীদের। আজ হবে পদযাত্রার উদ্বোধন।—যাত্রা শুরু হবে নাম-না-জানা পথের উদ্দেশ্যে।

দেবল গোয়ালদাম থেকে মাইল ছয়েক পথ। অক্ষরস্তু উৎরাই নেমে গেছে পিণ্ডার উপত্যকায়। পিণ্ডারী গঙ্গার কোলে উৎরাই শেষ হয়ে নদীর অপর পারে সামান্য চড়াঘের পর দেবল গ্রাম। পাইন-টীর আর ভূর্জ গাছের ছায়ায় ছায়ায় পথ। পথে নন্দাকেশ্বরী গ্রাম পড়ে। ধাপ কাটা পাহাড়ে চাষাবাস করছে মেহনতী পাহাড়ী মানুষ।

বেলা বারোটা নাগাদ আমরা দেবলে পৌঁছলাম। দেবল গাড়োয়ালের এক বিখ্যাত সন্ন্যাস-তীর্থ। পিণ্ডারী হিমবাহ থেকে পিণ্ডার গঙ্গা আর কৈলুনিয়ায়ক পর্বত থেকে কোয়েল গঙ্গা। এই দুই নদী মিলিত হয়েছে দেবলে। তাই দেবল সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য হরিদ্বার এবং

প্রয়াগ সন্ন্যাস থেকে কম নয়। চারিদিকের গগনচুম্বী পর্বতমালা বেষ্টিত দেবলের বুক চিরে বহে চলেছে দুটি নদী। এর শাস্ত্রী মুগ্ধ করে মানুষকে, আকর্ষণ করে তপস্বীকে। তাই বৃষ্টি দেবলের পাহাড়ে-গুহায় প্রয়াগের তীরে তীরে ধ্যানমগ্ন সাধু-সন্তের দর্শন মেলে অহঃরহ। দেবল তাই দেবালয়।

দেবল থেকে বাগরীগড় আট মাইল পথ। সন্ধ্যার আগে ওখানে পৌঁছতে হবে। পথ সরল। তবে ঘন বনভূমির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আজ রাতের বিশ্রাম ওখানে।

সামনে উত্তর চড়াই। দু'বছর আগে দেখা অমরনাথের পথের পিস্ত চড়াইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। খাড়া চড়াই। এটির নান লোহাজং পাস। উচ্চতা প্রায় দশ হাজার ফুট। এক মাইলে দু'হাজার ফুট চড়াই। মাঝে মান্দোলী গ্রাম। বাগরীগড় থেকে স্বর্ষোদয়ের আগে বেরিয়েছি। চড়াই ভাঙ্গছি। বেলা প্রায় ন'টায় লোহাজং পাশে পৌঁছলাম। এখানে লোহাজং দানবের সঙ্গে দেবী দশপ্রহরিশীর হয়েছিল যুদ্ধ। লোহাজং প্রাণ হারিয়েছিলেন এখানে। ওপরে দেবীর মন্দির আছে। পথিকদের জন্য একটি চায়ের দোকান আছে ওপরে।

লোহাজং থেকে ওয়ানগ্রাম প্রায় মাইল দশেক পথ। খানিকটা উৎরাই প্লেসে প্রায় সমতল। এ অঞ্চলের শেষ গ্রাম ওয়ান। ওয়ান থেকেই রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ডের পথে সত্যাকার অভিযান শুরু হবে। ওয়ান গ্রামে পৌঁছলাম প্রায় বেলা তিনটে নাগাদ।

আবহাওয়া দারুণ খারাপ। গতকাল বৃষ্টি নেমেছে আজও চলছে। কোথা থেকে মেঘ আসছে অহঃরহ— বিরামহীন। সামনেই লালসিংড়া পাহাড় (১২,০০০ ফুট) তার সুন্দর শ্রামলিমা হারিয়ে ফেলেছে। আজ সে তুষারচ্ছাদিত। অভিযাত্রীরা চিন্তিত। এ রকম আকাশের অবস্থা থাকলে অভিযান পেছিয়ে যাবে। দেবী করার অর্থ ঘরে ফিরে যাওয়া। এখানে বসে পয়সা নষ্ট করলে চলবে না। অথচ উপায় নেই। বৃষ্টি হলেই রূপকুণ্ডের পথ তুষারে ঢেকে যাবে। তখন ও পথে চলা

হুঃসাধ্য। বিশেষ করে আলানীর অভাবে মারা পড়তে হবে পথে।

আজ বিশেষ মে। রাত্রে ওয়াল ল্যাম্পের আলোর মিটিং বসেছে। বয়োভ্রষ্ট হিসেবে জ্যোতি পাল আজ সভাপতি। হুমু সিং গাইড হিসেবে উপস্থিত। এ ছাড়া আমরা পাঁচজন—সমর বন্দ্যোপাধ্যায় দলের ম্যানেজার, বৈষ্ণনাথ রক্ষিত, সুভাষ রায়, অসীম সান্ডাল ও আমি। আলোচনা ও ম্যাপ দেখে অবশেষে ঠিক হল আগামী কাল আমরা হোমকুণ্ড হয়ে রূপকুণ্ডের পথে যাত্রা করব। যদিও এ পথ আমাদের জানা নেই। অরণ্যভীত কালে কেউ ওপথে যায় নি। কিন্তু আমাদের যেতে হবে। রূপকুণ্ড হোমকুণ্ড দেখতে হলে এই নোতুন পথের হদিশ বার করতেই হবে। না হলে কেবল রূপকুণ্ড দেখেই ফিরতে হবে।

রাতটা কাটল জেগে। হুঁতাবনায় ঘুম এল না। সকালের আকাশ আরো খারাপ। তবু কুলির দল এসে গেল। মালপত্র বেঁধে-ছেঁদে বেলা আটটা নাগাদ যাত্রা হল শুরু। প্রচণ্ড বৃষ্টি মাধ্যম করে পথে বেরতে হল।

ওয়াল গ্রাম থেকে কোকিনা বাল গিরিবন্দ্য মাইল আড়াই পথ চড়াই। এখান থেকে দু'টি পথ—একটি রামনগর হয়ে তপোবন—যোশীমঠ এবং অপরটি গভীর অরণ্যপথে তাতাড়া গ্রামের দিকে। অরণ্যপথে আমরা চললাম। একটানা হাজারখানেক ফুট উৎরাই নেমে রূপগঙ্গা। অপর পারে তাতাড়া গ্রাম। এটাই শেষ জনপদ। তাতাড়ার-আধ মাইল ওপরে প্রায় সাড়ে ন'হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত চণ্ড। চণ্ড উপত্যকায় যাত্রা-পথের প্রথম তাঁবু পড়ল।

পরদিন ভোরে চণ্ড থেকে তাঁবু গুটিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সামনে গভীর অরণ্য। এই অরণ্যপথে নন্দাঘুটি পর্বতশিখর লক্ষ্য করে আমাদের এগুতে হবে। নন্দাঘুটির পাদদেশে হোমকুণ্ড গলি, সামনেই হোমকুণ্ড।

পাড়োয়াল হিমালয়ের ঘন অরণ্যানী। পাইন, চীল ও ভূর্জপত্রের আকাশ ছোঁয়া গাছের ছায়ায় পথ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সম্ভরণে এগুতে হচ্ছে। কাঁটাগাছ

ও পাহাড়ী সরু বাঁশের জংগলে চলতে চলতে কাঁটার ঘায়ে সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত। রক্ত ঝরছে। খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই। চণ্ড থেকে সেই কোন সকালে বেরিয়েছি, পথ খুঁজছি তো খুঁজছিই। কিন্তু এতটুকু আশার আলো দেখছি না। মনে সকলের সন্দেহ—অরণ্যের এই নাগপাশ থেকে মুক্তি কি কোনদিন সম্ভব? আমাদের দলের কুলি রতন সিং এসেছিল এ পথে গত সাত-আট বছর পূর্বে। তিনজন আমেরিকান এই গহন অরণ্যে পথ খুঁজে



রূপকুণ্ডের দুর্গম সড়ক পথ

হোমকুণ্ড গলি পৌছতে চেয়েছিল। কিন্তু পথেই তাদের দু'জন মৃত্যুর অমোঘ দণ্ড নিয়েছে। রতন সিং আর অপর একজন সাহেব কোনমতে পৈতৃক প্রাণটুকু নিষে ঘরে ফিরেছিল।

একটা রাত এই গহন অরণ্যে কাটিয়ে পরদিন ভোরে সন্ধান মিলল পথের। আনন্দে উন্মাদ অভিযাত্রীরা ছুটে চলেছে সামনের সবুজ সমতল লাটবুড়ী উপত্যকার দিকে। অরণ্যের বন্ধনমুক্তি ঘটেছে। আশার নতুন স্বর্ষ উঠেছে আকাশে। নতুন পথের হয়েছে সন্ধান। আগামী দিনের মাহুষ আসবে আমাদের এক নবাবিহ্বত পথে। দেখবে হোমকুণ্ড—দেখবে ত্রিশূলী তীর্থ।

২৪ মে বিকেল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত চনোনিয়া ঘাট এ তাঁবু পাতা হষেছে। পেছনে চনোনিয়া কোট পর্বত হমড়ি খেয়ে পড়েছে। অদূরে দেখা যাচ্ছে হোমকুণ্ড। সামনে দিগ্নে শ্রোতোধ্বনী নন্দাকিনী নদী নৃত্যরতা।

গত রাত কেটেছে জামুনডালীর তুষার ক্ষেত্রে। আজ সকালে জামুনডালী থেকে বেরিয়েছিলাম। ছ'মাইল পথ চনোনিয়া ঘাট। এই পথটুকু কেবল হিমবাহ আর মোরেনে ভর্তি। সৰু গিরিশিরা—চার হাত পায়ে উঠতে হয়েছে। ডানে-বায়ে সামান্য অসতর্ক হলেই হাজার হাজার ফুট নিচে পড়তে হবে আছড়ে। শেষে খরশ্রোতা নন্দাকিনী পার হতে হয়েছে হাতে প্রাণ নিয়ে।

আমাদের তাঁবু থেকে হোমকুণ্ড মাত্র এক কার্লং দূরে। তাঁবুতে বসে দেখা যাচ্ছে নন্দাদেবীর হোমধম্ম হোমকুণ্ড। অনেক কাহিনী এই কুণ্ডটিকে নিয়ে ভড়িয়ে আছে। নন্দাদেবী কৈলাসপতি স্বামী মহেশকে তুষ্ট করার জন্য এই কুণ্ডে হোম করেছিলেন। আজো ওখানে হোমায়ির শিখা বৃষ্টি দিয়ে নেত্রান হয়। এ দেশের লোক বলে, হোমকুণ্ডে হোম করলেই মহেশ বৃষ্টি দেন। হবে হয়তো।

২৫শে মের একটি ঝরঝরে আলোঝলমল সকাল। পোর্টারের দল তাঁবু তুলে মালপত্র গোছগাছ করে নিষেছে। সকাল সকাল খিঁচুড়ী বানিয়ে খেয়ে নিয়েছে সবাই। আজ সারাদিন হাঁটতে হবে। অতিক্রম করতে হবে বিরাট হিমবাহ। রূপকুণ্ড দেখে যতটা সম্ভব নিচে নেমে যেতে হবে। তাই যাত্রা শুরু হল ভোরে।

খনিকটা পথ অতিক্রম করে পৌঁছলাম নন্দাদেবীর হোমধম্ম হোমকুণ্ডে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪,০০০ ফুট উচ্চে এর অবস্থান। নন্দাশ্রুটি আর ত্রিশূলের সংযোগস্থলে হোমকুণ্ড গলি। তারই নিচে হোমকুণ্ড। হোমকুণ্ডের দক্ষিণ পাশে শিলসমুদ্র হিমবাহ। শিলসমুদ্র আর হোমকুণ্ড গলির তুষারগলা জলে উৎসারিত হয়েছে নন্দাকিনী নদী। নন্দাকিনী বড়ীনাগায়ণের পথে নন্দ-প্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে মিলেছে। হোমকুণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রায় তিনশ' ফুট, প্রস্থ নেই। শিল সমুদ্র হিমবাহ এর

একটা পাড় গ্রাস করেছে। সেজন্ত হোমকুণ্ড আর জল ধারণ করতে পারে না। কুণ্ডের পাশে একটি বড় পাথর, নাম তার ছায়াচোরী। নন্দাদেবী এখানে বিশ্রাম করেছিলেন। এই পাথরটিই গাড়োয়াল-কুমায়ূনের মাহুষের পরম ও চরম তীর্থ—ত্রিশূল। ভাদ্র মাসের নন্দাষ্টমী তিথিতে যাত্রীর দল আসে, পূজা করে বড়ী নন্দকাত উৎসবে। যদিও এখানে মাহুষ সামান্যই পৌঁচেছে রূপ-কুণ্ডের পথে। জিউনরাগলির বিভীষিকা অতিক্রম করা হঃসাহ্য প্রায়।

হোমকুণ্ড থেকে এক সংকীর্ণ গিরিশিরা ইঠে গিয়ে ওপরের হিমবাহে মিশেছে। পথটা চার হাত পায়ে অতিক্রম করতে হলো। আমাদের নেই পাহাড়ে চড়ার সাজ সরঞ্জাম—কিন্তু নেশা আছে। আর সেই নেশার কোঁকেই বুকি অতিক্রম করলাম এই দারুণ দুর্গম পথ। গিরিশিরা যেখানে শেষ হয়েছে সেটি একটি চমৎকার ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড, নাম তার ধী-অপন। এখান থেকে পথ উঠে গেছে আকাশে। বহুদূরে দেখা যায় জিউনরাগলি কল। সারা পথ তুষারে আবৃত। পথটি চননিয়া কোট আর ত্রিশূল পর্বতের মধ্যবর্তী হিমবাহের ওপর দিয়ে। ধাপে ধাপে এই পথ চোদ্দ হাজার ফুট থেকে আঠারো হাজার তিনশ ফুটে উঠে শেষ হয়েছে জিউনরাগলিতে। ওর নিচেই রহস্যময় রূপকুণ্ড।

আমরা ছুটি দলে ভাগ হয়ে চলছি। দলে প্রথম গাইড হকুম সিং, সমর রতন সিং ও বাগদোয়ার সিং এবং আমি। শেষ দলে জ্যোতি পাল, অসীম সান্মাল, স্বভাব রায় ও বৈদ্যনাথ রক্ষিত এবং পোর্টারের দল।

নরম তুষারের পথ, হাঁটু অন্ধি ডুবে যাচ্ছে। পথ বলতে পাহাড়ে বরফে কোন পায়ে হাঁটা তৈরী পথ থাকে না। এ পথে কবে কোন মাহুষ চলেছে? যেখান দিয়ে হাঁটছি সেটাই পথ—তাই আমাদের যাত্রাপথকে পথ বলছি। মাথার ওপর প্রখর স্বর্যতাপ। শাদা বরফে আলোকছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। হাই অল্টিটিউত চশমা থাকা সত্ত্বেও চোখ জ্বালা করছে।

আজ কেন যেন বায়ে বায়ে মনে পড়ছে সেইসব

হতভাগ্য তীর্থযাত্রীদের কথা যারা রূপকুণ্ডের তুষারের নিচে ঘুমিয়ে আছে। ওরা ওদের নাম গোত্রও তুষারে কবর দিয়েছে। গাড়োয়ালের মানুষ বিশ্বাস করে ওরা চতুর্দশ শতকের কনৌজ রাজ যশোদয়ালের রাজকীয় তীর্থযাত্রী। গাড়োয়ালের মানুষ ঐ হতভাগ্য মানুষগুলোকে লোকসংগীতের মধ্যে মূর্ত করে রেখেছে।

চতুর্দশ শতকের কোন এক শ্রাবণী নন্দাষ্টমী তিথিতে বড়ী নন্দাজাত উৎসবে যোগ দিয়েছিল কনৌজের রাজা যশোদয়াল। সভাসদ পাত্রমিত্র আর প্রিয়তমা রাণী বনভ্রমকে নিয়ে রাজা ত্রিশূলী তীর্থপথে বেরিয়েছিলেন। বৈদীর্ঘ্য কুণ্ড হয়ে রূপকুণ্ড। ওখান থেকে জিউনরাগলি অতিক্রম করে হোমকুণ্ড। রাজা যশোদয়াল রূপকুণ্ডের মাত্র মাইলখানেক আগে হনিয়াথরে রাণী বনভ্রম প্রসববেদনা অস্থতব করলেন। জনহীন তুষার প্রান্তরে দিলেন এক সম্ভানের জন্ম। নন্দা ভগবতী হলেন কুন্ডা। দেবভূমি কলুষিত করার অপরাধে নামালেন ঝড় ঝঞ্ঝা আর তুষারপাত। ক্রান্ত ঘুমন্ত তীর্থযাত্রীরা বাঁচার পথ পেল না। মৃত্যুর শীতল ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় সমাহিত হল তারা। পরিচয়ের সব চিহ্নই গোপন হয়ে গেল রূপকুণ্ডের তুষার বক্ষে।

চমকে উঠলাম বিকট এক গর্জনে। কোথায় এর উৎস? যেন হাজার কামান গর্জন করে উঠেছে এক সঙ্গে। হকুম সিং চিৎকার করে বলে অ্যাভালাস। ত্রিশূলের তৃতীয় শৃঙ্গ থেকে নেমে আসছে এক তুষার স্তূপ। আকাশ জোড়া তার বিস্তার। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছি। তুষারস্তূপ ভেঙ্গে কোটি কোটি কণা তুষারে আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেললো। ঘন কুয়াসার আবরণে মুহূর্তে ছেয়ে গেল আকাশ। অন্ধ আমরা। পথ ভুল করলাম।

অ্যাভালাস থেকে রক্ষা পেলাম, কিন্তু তুষারপাত

থেকে বাঁচার পথ? মাথা পোঁজার একটিও স্থান নেই। আকাশ ঘন কালো। দশ হাত দূরের কাউকেই দেখা যায় না। পেছনের দল কোথায় জানি না। নিচেরাও যে কোথায় চলেছি তাও জানা নেই। এমন সময় উঠলো দমকা হাওয়া। স্বপ্ন তুষারকণাগুলো উড়ছে। হকুম তাকালো আমার মুখে। ওর মুখে হুসিয়ার কালো ছায়া। জিউনরাগলীর নিশানা একখণ্ড কালো পাথর দেখা যাচ্ছে না। কোথায় চলেছি? তুষার ঝঞ্ঝা এসেছে। কি করব কি হবে ভাবার অবসর নেই। রূপকুণ্ড আমাদের পৌঁছেতেই হবে। তুষারকণা নাকে মুখে ঢুকে দম বন্ধ করে দিচ্ছে। তবু চলছি। চলছি— চলতে হবে বলেই।

রতন সিংয়ের চীৎকারে খেয়াল হল জিউনরাগলির কাছাকাছি এসে গেছি। ওপরদিকে তাকালাম—মাত্র তিনশ' ফুট বাকী। এ পথটুকু অতিক্রম করতে পারলেই এত পরিশ্রমের পুরস্কার রূপকুণ্ড দর্শন। পা চলছে না। তুষার ছাতি কাটছে। জল নেই, তুষার ঝঞ্ঝা। গলা চিরে রক্ত বরছে তবু এগুচ্ছি।

চড়াই শেষ হল। জিউনরাগলি—১৮৩০০ ফুট উচ্চে এক কালো পাথরের গামে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। নিচে দেখলাম রূপকুণ্ড। মাত্র তিনশ' ফুট নীচে রহস্যাবৃত রূপকুণ্ড। যেখানে নামগোত্রহীন মানুষের অজস্র মৃতদেহ আগামী দিনের মানুষের দিকে তাকিয়ে আছে।

বরফের খেতচাদরে মোড়া রূপকুণ্ড অপরাধ। হোক সে রহস্যাবৃত তবু রূপকুণ্ড তো! এত রহস্যের মধ্যেও ওর নিজস্ব এক অপরাধ রূপ আছে যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, যে রূপ মানুষকে যুগায়ুগান্ত ধরে আকর্ষণ করে। মানুষ মৃত্যু তুচ্ছ করে ছুটে আসে ওর তীরে। রহস্যাবৃত রূপকুণ্ড তাই অপরাধ।





শিল্পীঘন

—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ লোকে ধীর—

(পূর্বাভূত : ভাদ্র, ১৩৭১ সংখ্যার পর)

পরদিন পূর্বাঙ্কেই যুবরাজ হর্ষবর্ধন যুদ্ধযাত্রা করলেন। নদীর পরপার থেকে যে যুদ্ধযাত্রা দেবকুমার প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই শোভাযাত্রা এবার দেখতে হলো সামান্যসামান্য। তবে এবার হাতীর সে সমরোহ নেই। শুধু একটি সুসজ্জিত হাতীর পিঠে চড়ে যুবরাজ হর্ষবর্ধন ছ'জন দেহরক্ষী ও শঙ্কর ভৈরব সবার আগে রওনা হয়ে গেলেন। পিছনে ঘোড়সওয়ার ও তীরন্দাজের দল। ঘোড়সওয়ার প্রত্যেকেই বর্মাবৃত—মাথায় শিরদ্বাপ। বুক, পিঠ ও বাহতে পিতলের অঙ্গজাণ। অস্ত্রসজ্জা অস্ত্র, হাতে বজ্রম, কোমরে তলোয়ার, আর কাঁধে ঢাল। তার পিছনে তীরন্দাজ পদাতিক দল, বর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। দীর্ঘ চৌকোণা এক একটি ঢাল কাঁধে, হাতে দীর্ঘ ধনু, আর কোমরে তুণ, আঁট-সাঁট খুসর রঙের ধুতি ও পিরাণ পরণে। সঙ্গে একদল ভৈরীবাদক ছাড়া দামামা বা অস্ত্র কোন রণবাচ্চের ব্যবস্থা নেই। রাজ্যবর্ধনের তুলনায় এই যোদ্ধাদল অনেক সংক্ষেপ, এক প্রহরের মধ্যেই তারা নগর ছাড়িয়ে গেল।

এক বিশাল বাহিনীর যুদ্ধযাত্রার ক'দিন পবেই আবার এই বাহিনীর যুদ্ধে যাওয়া দেখে সকলেই একটা বিপর্যয়ের শঙ্কা করলো। নগরে একটা থমথমে ভাব দেখা দিল। রাজপথে ও বিপণিগুলিতে পথচারী ও ক্রেতার সংখ্যাও আজ যেন অনেক কম বলে মনে হলো।

ভৈরবের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার ভয় আর নেই। দেবকুমার গদাভীরে বসে ইতিকর্তব্য চিন্তা করলো, কিন্তু কোন কিছু স্থির করতে পারলো না। ঝিন্মনকে নিষে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করবে, না মূর্তি খোদাই করে ভৈরবের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? দ্বিধা-ভিন্ন চিন্তে গঙ্গার গতিশীল স্রোতের পানে তাকিয়ে সে বসে রইল সন্ধ্যা অবধি।

পরদিন সকালে আনন্দ বললো—বাইজী আপনার কাছ থেকে খবর চেয়েছেন।

—বাইজী?—দেবকুমার অবাক হলো।

—হ্যাঁ, ঝিন্মন বাই। কাল রাত্রে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে আপনি অর্থসংগ্রহ করতে পেরেছেন কি না। নাহলে আজ কঙ্কণ বেচে অর্থ সংগ্রহ করবেন। শিবরাত্রির আর দেরী নেই। আগে থেকে প্রস্তুত হওয়াই ভালো।

—কঙ্কণ বেচবো কিনা এখনও কিছু স্থির করিনি।

—কেন, অস্ত্র টাকা পাবার আশা আছে?

—না, কোথাও কোন আশা নেই। তবে ভৈরব একটা কাজের কথা বলে গেছেন সেইটার কথাই ভাবছি।

—সে বাজ কি এই নগরে থেকেই করতে হবে?

—হ্যাঁ, দুর্গমন্দিরে প্রস্তরমূর্তি খোদাই করার কাজ।

—তাহলে তো আপনার যাওয়া এক প্রকার অনিশ্চিত।

—এখনও মনস্থির করিনি।

—কিন্তু আমার তো মনে হয় আপনি একপ্রকার মনস্থির করেই কেলেছেন। আপনি ভাস্কর, রাজমন্দিরের শিল্পকর্মের তার আপনি পেয়েছেন, এ সুযোগ ত্যাগ করা আপনার পক্ষে মোটেই সহজ নয়। শিল্পীর কাছে শিল্প-কর্মই বড়। কবি শিল্পী গায়ক যতজন আমি দেখেছি, সবাই নিজের সৃষ্টিতেই বিত্তোর হয়ে থাকেন। আর কোন-কিছুই তাঁদের চিন্তে স্থান পায় না। আপনিও তো

সেই দলেরই লোক। যাক, বাইজীকে আমি সেই কথাই বলবো। আশা ছিল যে কিছু বখশিস মিলবে, তা আর অদৃষ্টে নেই।

—যদি মন্দিরের কাজ করি, তাহলে শঙ্কর ভৈরব ফিরে এলে, আমি তোমার জন্ত একটা ভাল বখশিসের ব্যবস্থা করবো।

—সে অনেক দূরের কথা। লড়াইয়ের কলাকল কি হবে, কোথাকার মানুষ কোথার যাবে, কিছুই কিছু ঠিক নেই। আমার অদৃষ্টই এমনি—অভাগা যেদিকে চায় সাগরও শুকায়ে যায়। আপনি আর কি করবেন বলুন। সবই পূর্বজন্মের কর্মফল।

অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় আনন্দ যে খুশি হতে পারেনি, কিছুটা বিকল্প হয়ে উঠেছে তার মুখের পানে তাকিয়েই দেবকুমার তা বুঝতে পারতো। বললো— আমি আজ বিকালেই অতিথিশালায় চলে যাবো। ভৈরব সেই ব্যবস্থাই করে গেছেন।

আনন্দ সংক্ষেপে বললো—ওখান থেকে মন্দিরের কাজের সুবিধা হবে।

আনন্দ বিনামূল্যে দেবকুমারকে আর স্থান দিতে রাজী নয়।

দেবকুমার যাজ্ঞানিবাসে চলে এলো। হুর্গের প্রাকার সংলগ্ন বিশাল রাজকীয় অতিথিশালা। সারি সারি খিলান করা ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের ঘর। একক, দুজন ও বহুজন যাজ্ঞীর জন্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। কোন ঘরেই দরজা নেই। এখানে, চুরি হয় না। রাজকীয় অতিথিশালায় চুরি করার হুঃসাহস-কারো নেই। তাছাড়া যারা এখানে আসে, তারা তীর্থকামী ধর্মপ্রাণ মানুষ, পার্থিব লোভের চেয়ে পুণ্যের কামনাই তাদের মন ভরে আছে। অন্তের দ্রব্যে তাদের জ্রম্পা নেই। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সর্বভ্যাগী আদর্শ তখন উত্তরা-পথের এই অঞ্চলের মানুষের মন একেবারে বদলে দিয়েছে। কোন অপকর্ম করে জন্মজন্মান্তর ঘরে সেই কর্মফলের চক্রে আবর্তিত হতে আর কারও মন চায়

না। ইন্দ্রিয়-সংযম ও চিন্তাচঞ্চল্য রোধের অভ্যাস তখন ভারতীয় মনে সহজাত গুণ হয়ে বিকাশলাভ করেছে।

দেবকুমার একখানি ছোট একক ঘরে স্থান পেল, কিন্তু সেখানে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো, সেখানে কোন স্বস্তি নেই। অবিরাম মানুষ চলেছে ঘরের সামনে দিয়ে। তাদের কথার টুকরো এসে কানে বাজছে। এতো মানুষের চোখের সামনে কোন মতে নিজেকে একা বলে ভাবতে পারে না, এই ধরনে থাকতে দেবকুমার অভ্যস্ত নয়। সে চলে যায় মন্দিরে।

প্রাঙ্গণে পাথরের তালগুলো যেখানে আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে কিছুক্ষণ তারপর সবচেয়ে ছোট চাইটা কোন মতে এক পাশে সরিয়ে আনে। এই প্রস্তর-পিণ্ডটিকে কেটে মূর্তি বানাতে হবে। নটরাজ মূর্তি। আর পাঁচজন শিল্পী যা করে গেছেন, সেও আরেকটি তা-ই করবে। দীর্ঘকালের পরিশ্রম শুধু অসুকরণেই ব্যয় হবে, স্বকীয়তার কোন প্রকাশ থাকবে না। এই দেবমূর্তি করতে হলে সে তো নিজ গৃহে বসেই তো করতে পারতো, এতো দূরে প্রবাসে থাকার প্রয়োজন তো ছিল না। চিত্তের একাগ্রতা, সাধনা, মোক্ষ—এসব খুব বড় কথা। কিন্তু মন যা চায় না তা করতে গেলে একাগ্রতা থাকবে কোথেকে?

আনমনা হয়ে সে গদাভীরে এসে বসলো। কাজ যদি নাই করতে চায় তো এখানে তার থাকা কেন? দেখে শেখার মত কোন শিল্পকর্ম তা এখানে নেই। এখান থেকে তার চলে যাওয়াই ভাল। তাহলে বিন্দনকে সঙ্গে নিলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু বিন্দনকে নিয়ে তো দেশে ফেরা যাবে না। সেখানে নিরাল্লা আছে। তবে কি সে পথে পথে ঘুরবে? এ জিজ্ঞাসার সমাধান হয় না। মন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গদার হাওয়ায় সে উকতা কমে না। তবে গদার স্নিগ্ধ সমীরণে একটা মাতৃহৃৎ স্নেহ-স্পর্শ আছে, যা ভাল লাগে। একটি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দেবকুমার বসে থাকে। বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

পর পর কয়েকটা ঘিন অস্থিরতার মধ্যে দিয়েই কাটলো। পাথর কাটিতে বসে হৃদয় কাজ করতে পারে

না। নগরে কাকণ বেচতে গিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। রথ, ঘোড়সওয়ার আর পথচারীদের চাল-চলন ও দোকানের জৌলুষ দেখতে দেখতে দিন কেটে যায়। সন্ধ্যার পর আলোর সারি নগরের শোভা যেন বাড়িয়ে দেয়। সব চেয়ে জমে ওঠে গঙ্গার তীর ধরে যে পথটি বরাবর পূর্বমুখী হয়ে গেছে, সেইটি। পথের একপাশে ছোট ছোট মঞ্চ বেঁধে ফুলওয়ালীরা বসেছে। আরেক দিকে প্রাচীর ঘেরা বাগানওয়ালী ছোট ছোট বাড়ী। এটি নাগরিকদের পল্লী। প্রতিষ্ঠানের বহু নামকরা নটী এই পল্লীতে থাকেন। রাজপার্বদ ও সভাসদের প্রায় সকলকেই দেখা যায় সন্ধ্যার পর এই পথে। অনেকে বলেন এখানে কোন কোন নাগরিকার গৃহে রাজ্যের অনেক দুক্লহ সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়, ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ণয়ের আলোচনাও হয়। অজ্ঞাত স্থানের মত এখানেও রাজ্যের প্রধানদের উপর নাগরিকদের প্রভাব খুব বেশী। কোন কোন নাগরিকার প্রতিপত্তি এতই বেশী যে, তিনি বিক্রম হলে, রাজ্যের যে কোম লোক—বর্ত্ত প্রধানই হোক না কেন, সব সম্মান হারিয়ে সাধারণের পর্যায়ে নেমে আসবেন। দীর্ঘকাল ধরে এই অঞ্চলে তাই একটা কথার প্রচলন আছে—রাজ্য চালায় নাগরিক। রাজা মন্ত্রী কা করেরা।

সন্ধ্যার পদস্থ রাজকর্মচারী ও বহু গণ্যমান্ত নাগরিকদের এই পথ দিয়ে চলাফেরা করতে দেখা যায়। তবে এ পথে রথে বা ঘোড়ার পিঠে কেউ আসে না, পদ-ব্রজেই যায়। কুড়িবাইশ বছরের ধনীপুত্র থেকে ষাট বছরের প্রবীণকেও নজরে পড়ে। সমগ্র প্রাগ নগরীর মধ্যে গঙ্গাতীরের এই পথটিই সবচেয়ে শোভন। গঙ্গার বাতাসে সামনের উত্তানভবনগুলি থেকে ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসে। প্রতিটি পথচারী সুবেশী। গঙ্গাবক্ষে সারি সারি দীপালোকিত নৌকার শোভা। কোন কোন গৃহ থেকে সন্ধ্যার পর থেকেই সঙ্গীতের সুরলহরী ওঠে। চিত্তকে প্রফুল্ল রাখার জন্য অনেক নাগরিক এই পথে শুধু সাক্ষ্য-ভ্রমণ করতে আসে। সন্ধ্যার পর এই পথে ঘুরতে দেবকুমারেরও ভাল লাগে। কোন দুঃখের স্পর্শ বুঝি এই পথ অবধি এসে পৌঁছায় না।

সন্ধ্যার পর এই আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশ তার ভালো লাগে। পথের মাঝে মাঝে গঙ্গাতীরে বড় বড় বট-অশথের গাছ, নীচে বেদী বাঁধানো। কোন কোন পথিক সেই বেদীর উপর বসে মৈশ সমীরণে অবকাশ বিনোদন করে। পথের শেষপ্রান্ত অবধি গিয়ে দেবকুমারও এক বেদীতে বসে থাকে রাত এক প্রহর অবধি। প্রহর শেষে দুর্গে তুর্ধ-ধ্বনি হয়, তখন দেবকুমার কিরে আসে অতিথিশালায়।

শিবরাত্রি এসে পড়লো। দুর্গমধ্যে শিবপূজার সমারোহ দেখা দিল। গঙ্গাতীরে দুর্গ-প্রাকার বরাবর মেলা বসলো—সারি সারি অস্থায়ী আটচালা বেঁধে বহুবিধ পণ্যদ্রব্যের বিপণি দেখা দিল। তারই সঙ্গে বসলো ঘোড়দোড় ও নাগরদোলার সমারোহ। দুর্গের সামনের মাঠে হাতীর খেলা, ঘোড়ার খেলা, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতির আয়োজনও হয়। তবে এবার মহারাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর কারণে ও যুবরাজ হু'জন যুদ্ধযাত্রা করায় রাজ-আদেশে এই সব অহুষ্ঠান স্থগিত আছে। তাতে আনন্দের উপকরণ কিছুটা কমেছে সত্যি, কিন্তু মেলার জৌলুষ হাস পাযনি।

তিনদিন এই মেলা থাকে। এই তিনদিন যাত্রী-নিবাসে তিলধারণের স্থান থাকে না। বহুদূর থেকে কতজন আসে, কত রকমের মানুষ দেখা যায়। দেবকুমার গঙ্গাতীরে এসে বসে থাকে। বিচিত্র মানুষের বহরকমের ব্যস্ততাচঞ্চল জীবনের কর্মধারা দেখতে থাকে।

আজ শিবপূজার উদ্বোধন করবেন মহারাজ স্বয়ং। কিন্তু রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন রাজধানীতে না থাকায় কনিষ্ঠ রাজকুমার মাধবগুপ্ত আজ সবার আগে শিবের মাথায় জল দেবেন। অর্ঘ্যদানের পরে দুর্গ থেকে শোভাযাত্রা করে রাজকুমার বেরলেন। প্রথমে কয়েকজন অধারোহী রক্ষী, তারপর রাজহস্তীর পিঠে মাধবগুপ্ত ও মহামন্ত্রক ভাণ্ডী, তারপর কয়েকখানি শিবিকায় অস্ত্র-পুরচারিণী মহিলারা। তাদের পিছনে স্তবর্ণ কলস মাথায় নিয়ে পরিচারিকা দল, তারপর পদব্রজে কয়েকজন পার্শদ, শেষে মুক্ত রূপাণ হস্তে একদল পদাতিক দেহরক্ষী। সবার পিছনে ভেরীবাদক, ঢাকী ও শিঙা-বাজিয়ে।

সঙ্গমের সামনে ঘাটের একপাশে ইতিপূর্বেই তীর থেকে জল অবধি দাল সাঁলু দিয়ে পর্দা আড়াল করে রাখা

হবেছিল। জলেরও অনেকখানি পর্দা দিয়ে ঘেরা। মাধবগুপ্ত সেই পর্দার মুখে হাতী থেকে নামলেন, পুরনারীরাও শিবিকা থেকে নামলো। সবাই সেই লাল সালুর আড়ালে চলে গেলেন, কলসী মাধব পুরনারীরা তাঁদের অহুসরণ করলেন। বাইরে রইল পার্শ্বদরা, ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক সাত্তরীরা। বাদকেরা নেচে নেচে বিভিন্ন সুরে বাজনা বাজাতে লাগলো।

রাজকীয় স্নান। বেশ কিছুক্ষণ পরে মাধবগুপ্ত ও রাজাস্তঃপুরচারিণীরা পর্দার বাইরে আত্মপ্রকাশ করলেন। এবার মাধবগুপ্তের সে রাজবেশ নেই, পরণে পট্টবস্ত্র, কাঁধের উপর একখানি উত্তরীয়, পদ পাছকাবিহীন। ভাতীরও সেই বেশ। ছ'জনে নগ্নপদে অগ্রসর হলেন দুর্গমন্দিরের দিকে। পিছনে পট্টবস্ত্রপরিহিতা পুরনারীরা তাঁদের অহুসরণ করলেন। সঙ্গে চললো পূর্ণকৃষ্ণ নিয়ে পরিচারিকার দল। পার্শ্ব ও বাদকেরা নীরবে চললো পিছনে। ধীরপদে সকলে মন্দির তোরণ অতিক্রম করে তিতরে প্রবেশ করতেই, বাদকেরা আবার বাজনা শুরু করলো। রাজপরিবারের লোকজন ছাড়া সকলেই বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। বাজনা বাজতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে পূজা শেষে মাধবগুপ্ত মন্দির থেকে বেরলেন, আবার হাতীতে উঠলেন। মেয়েরা শিবিকায় উঠলো, পূর্বের মত শোভাযাত্রা করে সকলে দুর্গে ফিরে গেল।

পূজার্থীরা এতক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করছিল, এবার তারা মন্দির ঘারে ভীড় করলো।

সারাটা দিন ভীড় দেখেই কাটলো। মাহুষের ভীড় দেবকুমার কোনদিন পছন্দ করে না। কিন্তু এতো মাহুষের ভীড় সে জীবনে দেখেনি। যোগিনী ঘাটে দেয়ালীর মেলা বসে প্রতি বছর। কালীপূজায় অনেক ধুমধাম হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের এই শিবরাত্রির মেলার তুলনায় তা কিছুই নয়। কত বিভিন্ন জাতির মাহুষ, কত রকমারি পরিচ্ছদ। সবচেয়ে বেশী রঙের বাহার খেলছে মেয়েদের ষাগড়া আর ওড়নায়। আবার বিদ্যাচলের ওদিক থেকে পাহাড়ীরা এসেছে, ঘাদের গায়ে একটা

জামাও নেই। সবচেয়ে ভালো লাগে রাজপুরুষদের জমকালো সাজগোজ, মাধব পাগড়ির চূড়াটা ময়ূরের পেখমের মত উচু হয়ে থাকে প্রায় হাতখানেক। সব রকমের মাহুষের এই পাশাপাশি ধৈর্যধৈসি দেবকুমারের দেখতে ভাল লাগে। যত বেলা পড়তে থাকে ততই ভীড় যেন বাড়তে থাকে। এখানকার একটা বিশেষত্ব দেবকুমারের নজরে পড়ে, যোগিনীঘাটের মত এই মেলার মধ্যে হাতী ঘোড়া এক্কা, দোক্কা (ছ'ঘোড়ার গাড়ী)-র ঘোরাফেরা নেই। ক'বছর আগে একটা হাতী ক্ষেপে গিয়ে কয়েকজনকে জখম করেছিল, সেই থেকে মহারাজ প্রভাকরবর্ধন মেলাক্ষেত্রে গাড়ী-ঘোড়ার প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। এখন সবাই নিঃশব্দ মনে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়।

সন্ধ্যা থেকে ভীড় আরো বাড়়ে, চার প্রহরের চার বার শিবপূজার ব্যাপার তো আছেই, তার উপর আছে দুর্গমধ্যে নাট্যাভিনয়। দুর্গমধ্যে প্রাদর্শে মঞ্চ বৈধে তিন-দিন নাটক অভিনয় হবে। তবু শ্রমী সেই নাটকের পরিচালনা করবেন। নাট্যশাস্ত্রে ভবু শর্মার সমকক্ষ খ্যাতি উত্তরাপথে আর কারো নেই। তিনি এক উপযুক্ত শিল্পীও নাকি তৈরী করেছেন বাণভট্ট নামে। এবার কান্তকূজের নগরপ্রী রাজনর্ডকী চারুশিতা নাটকে অভিনয় করবেন। রুচিসম্পন্ন নাগরিকেরা এই অভিনয় দেখার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। সন্ধ্যার পর থেকে সকলেই তাই দুর্গদুখী, পূর্বাঙ্কে একটু ভালো আসন সংগ্রহ করার আগ্রহ সকলেরই।

আজ ঝিন্মনের সঙ্গে দেবকুমারের দেখা হবার কথা। কিন্তু কখন ও কোথায়? আনন্দ নিশ্চয় ঝিন্মনকে জানিয়েছে যে, দেবকুমার যাত্রী-বাসে আছে। ঝিন্মন এলে সেখানেই আসবে। দেবকুমার তাই কোথাও যেতে পারে না। যাত্রীবাসের সামনে গদ্যাতীয়ে সে বসে থাকে। যাত্রীবাসের কটকের দিকে লক্ষ্য রাখে।

আজকের রাত্রে গলাতীর আর অক্ষকার হয় না। অসংখ্য বিপণির আলো গঙ্গার নীরে বহুদূর অবধি আজ আলোকিত করেছে। সে আলোর উজ্জ্বলতার প্রসার বেশী নয়, তবু মাহুষের চলাফেরা ঠিক নজরে আসে।

বঙ্গে দুর্গোৎসবের ইতিকথা

ডাঃ তারাশ্রম সরকার

বঙ্গদেশে সুপ্রাচীন কাল হইতে দুর্গাপূজা অতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই মহাপূজার আত্মবদিক উৎসবদিগের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ধার্মিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাস অন্তর্নিহিত আছে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পূজিত পূজার ইতিহাসের মূল উপাদান আর্ড রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য রচিত “দুর্গোৎসব পদ্ধতি” ও অমৃত কতিপয় প্রামাণ্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে যে সকল গ্রন্থাগারে দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে তন্মধ্যে রঘুনন্দনের ‘মঠাদি প্রতিষ্ঠা তত্ত্ব’, কৃষ্ণানন্দের ‘বৈদিক সর্কস্ব’, বিষ্ণুদেবের ‘বৈদিকার্ণব’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থের রচনাকাল ৮০০ খৃষ্টাব্দে বলিয়া পণ্ডিতদের অনেকেই অনুমান করেন। ভৎকালে “হরশীর্ষ পঞ্চরাত্র” নামক প্রামাণিক গ্রন্থে যে চত্বিকার মূর্তির বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সেই বর্ণনার সহিত বর্তমানে বঙ্গদেশে দুর্গার যে ধ্যান প্রচলিত তাহার সর্বাংশে মিল আছে।

বহু বৎসর পূর্বে জিপুরা জেলার সদর মহকুমায় হরিপুর নামক স্থানে একটি পুষ্করিণী সংস্কারকালে দশভুজা কাত্যায়ণীর শিলাময়ী প্রতিম—নিখুঁত অবস্থায় আবিষ্কার হইয়াছে। দশভুজার শিলামূর্তি অতি বিরল : আর কোথাও দেখা যায় না। ইহাতে মনে হয়, বহুকাল পূর্বেই বঙ্গদেশে দশভুজা শিলা পূজিত হইয়াছিল। ইহা

ব্যতীত অনেক ধাতুমূর্তিও নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অনেকেই অনুমান করেন সোমনাথের মন্দির ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবার পর ভারতের নানাস্থানে মন্দির ও দেবতার প্রতিষ্ঠার রীতি ব্যাপকভাবে কমিয়া যায়। সেই সময় হইতে বঙ্গদেশে শক্তিতন্ত্রসম্মত যুম্ময়ী মূর্তির আবাহন ও বিসর্জন করিয়া পূজা প্রবর্তিত হয়। শূলপাণি কৃত “দুর্গোৎসব বিবেক” সর্কাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র ও প্রকরণ দৃষ্ট হয়।

শূলপাণি ১৪০৫ হইতে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। শূলপাণি কৃত “দুর্গোৎসব প্রয়োগ বিবেকহুসঙ্গমঃ” নামক গ্রন্থখানির বর্তমানে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থখানিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রের উল্লেখ ছিল।

দেবল অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংহিতাকার। তাঁহার কালোপযোগী ব্যবহার নূতনত্ব অনেক স্থলেই লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গদেশে নব্য স্মৃতির আদি নিবন্ধকার শূলপাণির গ্রন্থ হইতে বহু প্রমাণ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তথ্যচ দেবল :

চরলগ্নে চরাংশে চ দেব্যা নিয়ত মানসঃ।

প্রতি সপ্তংসরং কুর্য্যাৎ স্থাপনঞ্চ বিসর্জনম্ ॥

জিকিন একজন সুপ্রাচীন গোড়ীয় স্মৃতি-নিবন্ধকার।

সন্ধ্যার খানিক পরেই একদল শৈব সন্ন্যাসী এলা দল বেঁধে। গঙ্গাস্নান করে ‘হর হর মহাদেও’ বলে তারা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলো। মন্দির-তোরণের নহবৎ-খানায় ঢাক ঢোল মানাই বেজে উঠলো। পূজা শুরু হলো। এই পূজার সমারোহ এখন চলবে সারা রাত, শিবরাত্রির পূজা সারা রাত জেগে চার প্রহরের পূজা।

দেবমন্দিরের দিকেই যখন সকলের মন পড়ে আছে, তখন অলক্ষিতে একখানি দ্রুতগামী নৌকা এসে ভিড়লো দুর্গ-তোরণের সামনে। নৌকারোহী এক সৈনিক

ঘাটে নেমে ব্যস্তভাবে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করলেন। কনৌজের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি সংবাদ নিয়ে আসছেন।

দু-দণ্ড পরেই দুর্গ থেকে ভেরী নিনাদ হলো। তোরণ শীর্ষ থেকে ঘোষক ঘোষণা করলো—রাজকুমার মহামায়া মাধবগুপ্ত বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সেই কারণে দুর্গ-প্রাঙ্গণে আজকের নাট্যাভিনয় বন্ধ রইল।

দেখা গেল দর্শনাত্মিলাবী নাগরিকেরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসছে।

(ক্রমশঃ)

ভবদেব ভট্ট তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে জিকিনের বচনসমূহ শ্রদ্ধার সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্মরণ্য জিকিনের আবির্ভাবকাল ১০৫০ খৃষ্টাব্দর কিছু পূর্বে এ অসুখান ঠিকই বলা যায়। সেই সময় “শত্রুঘ্নজ্ঞা রোপণ” সাধারণিক অসুখান সম্পাদনের ২৫ দিন পর দুর্গা সপ্তমীর কাল নিরূপিত হইয়াছিল।

শারদীয়া পূজামূলকম জিকিনে উল্লিখিত আছে :
শত্রুঘ্নজ্ঞাং পথযুতে দশাহে মূলক্ষযুক্তাসিত সপ্তমীয়া।
আরভ্য তস্তাঃ দশমীঞ্চ যাবৎ প্রপূজায়েৎ পর্যন্ত

রাজা পুত্রীম্।

স্নান, পূজা, বলি, হোম ইত্যাদি তান্ত্রিক অসুখান। প্রতিষ্ঠিত শিলা বা গাতু মূর্তিতেই এ সব আঙ্গিকের অসুখান সম্ভবপর। কিন্তু যুগ্মমী মূর্তিতে স্নানবিধির সার্থকতা নাই।

“চতুর্কর্মযমী স্নানপূজাবলিদান হোমরূপা”—শূলপাণি।

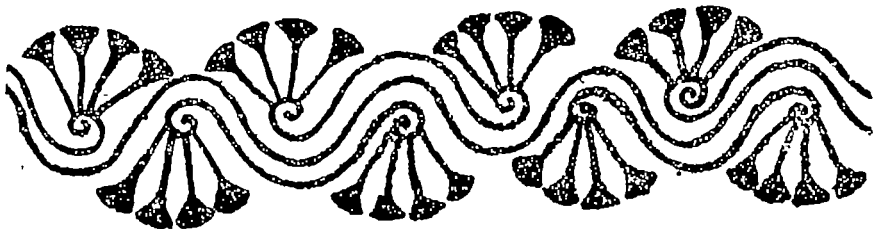
বাস্তবিক দুর্গোৎসবের স্বাভাবিক সার্বজনীন স্বরূপ প্রায় কেহই লক্ষ্য করেন না। এই পূজার সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বহু প্রাচীন। বর্তমানে সার্বজনীন পূজা বলিয়া যে দস্ত তাহা বস্তুতঃ সাম্প্রতিক বা আধুনিক নহে।

পূর্বেও দুর্গোৎসবের বিভিন্ন অসুখানে সমাজের যাবতীয় লোকের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। বাস্তবিক ঘরে ঘরে বিভিন্ন পদ্ধতি অসুখারে পূজা অসুখিত হইত। কোন পূজার সঙ্গে কোন পূজার মিল ছিল না। প্রত্যেক পদ্ধতিই কোন না কোন প্রাচীন সম্প্রদায়ের নামে প্রচলিত। যথা দেবীপুরাণোক্ত, বৃহদ্রিকেশ্বর পুরাণোক্ত, মৎস্য পুরাণোক্ত, কালিকা পুরাণোক্ত, দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী সন্মত, বেণীমাধব সন্মত ইত্যাদি। শূলপাণির সময়ে দেবীপুরাণ ও বৃহদ্রিকেশ্বর পুরাণোক্ত, পূজা প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক পণ্ডিতপ্রধান

গ্রামে এবং প্রত্যেক বংশের নানা স্থানে নানাক্রমে পরিবর্তিত হইয়া পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে পূজার প্রচলন ছিল। এখনও গ্রামাঞ্চলের অনেক স্থলে হস্তলিখিত পুঁথির পদ্ধতি অসুখারে পূজা হইয়া থাকে।

বর্তমানে বঙ্গদেশে বিশেষভাবে কলিকাতায় যে সকল পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে তাহার প্রায় অধিকাংশই একই ছাঁচে ঢালা। ইহা বিশেষ কোন ঐতিহ্যবাহী নহে। ইহাতে যুগযুগান্তরব্যাপী সকল রকম পার্থক্য নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া সার্বজনীনতা সম্পাদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপকরণ বিলুপ্ত করবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশে দশভূজার পূজাই অতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু দশভূজা হইতে অষ্টাদশভূজা পর্যন্ত প্রতিমাও নির্মিত এবং পূজিত হইত। তাহার পূজা পদ্ধতি অধুনা লুপ্ত।

বঙ্গদেশে এই মহাপূজার একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এই পূজা-পদ্ধতিতে যদিও স্মার্ত রঘুনন্দনের মত-পথ বিশেষভাবে অসুখ্যত, তথাপি কিন্তু রঘুনন্দনের সম-সাময়িক কালে এই পূজা তখনকার মোঘল-পাঠান সংঘর্ষের অরাজকতার মধ্যে তেমন ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই অথবা তেমন আড়ম্বরের সঙ্গে এই মহাপূজা অসুখিত হইতে পারে নাই। কলির বর্ণনা প্রসঙ্গে রঘুনন্দন তাঁর গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট আভাস দিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কালে বঙ্গদেশে শাস্তি ফিরিয়া আসিলে রাজা কংসনারায়ণ এই মহাপূজা সাড়ম্বরে অসুখান করেন। রাজা কংসনারায়ণ এই পূজা উপলক্ষে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করেন যাহা সম্রাট আকবরেরও সমপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে আজকের যে ব্যাপক সার্বজনীন উৎসবের ধুমধাম ও বৈশিষ্ট্য ইহা সাম্প্রতিক কালের।



‘সংস্কৃতা সংস্কৃতা’

সুদর্শন চক্রবর্তী

মহিষাসুর বধের পর দেবতাদের পূজায় সঙ্কট হয়ে দেবী যখন বর দিতে চাইলেন, তখন দেবগণ প্রার্থনা করলেন, হে জগদম্বা, যখনই তোমার স্মরণ করব, তখনই তুমি আবির্ভূত হ’য়ে স্বর্গ ও মর্ত্যবাসী আমাদের সকলের সঙ্কট মোচন করিয়ো—

“সংস্কৃতা সংস্কৃতা স্বং নো হিং সেথাঃ পরমা পদঃ।”

দেবীও কথা দিলেন—‘তথৈতি’—তাই হ’ক। শারদীয়া দেবীপক্ষ তাই স্মরণেরই পরম ক্ষণ।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে আজ আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি বল ও পুরুষকার যেন নস্তাং হ’তে চলেছে। হুংখ, তন্ন, নৈরাশ্র, সংশয় ও চঞ্চলতা সব রকম অক্ষমতার অঙ্ককারকে ঘনীভূত ক’রে যা কিছু উদ্যম, সংকল্প ও লক্ষ্য, সমস্ত শুভ কামনাকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। ত্যাগের আদর্শ, মুনি-ঋষি প্রভৃতির প্রদর্শিত পথ হারানোর ফলে ভারতীয় নিজস্ব কৃষ্টি, সম্যকতা ও সংস্কৃতি ভুলে গণজীবন আজ একেবারে বিপন্ন হয়ে পড়েছে; বিশেষ ক’রে দেশ-মাতৃকার সীমান্তে আজ হানাদারের পৈশাচিক লোলুপ দৃষ্টি আর স্বদেশের অভ্যন্তরে মুনাফা শিকারীর শয়তানী বীভৎসতা। এইতো দেবী আবাহনের চরম মুহূর্ত্তে, আলস্য ও সাময়িক ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বুদ্ধি ও কর্মশক্তিকে স্ফূর্ত্ত ক’রে তোলার পরম ক্ষণ।

অহরের আত্মসত্ত্বিতায় বিজ্ঞানবলে পার্থিব সম্পদে যতই আমরা ইচ্ছিয় সেবার দাসত্বে ডুবছি, দীনতা ও অসহায়তা বেড়ে গিয়ে ততই লক্ষ্য থেকে দূরে চলে যাচ্ছি।

আগলে চৈতন্তশক্তির অবহেলাই এই নৌজামিলের অবশুজ্ঞাবী পরিণতি। ত্যাগী মাদুঘের নেতৃত্ব ও চরিত্র-বল এতকাল ভারতবর্ষকে তার বিপর্যয় থেকে রক্ষা ক’রে এসেছে। তাইত আমাদের সর্বস্বক্ষেত্রের ভিখারী! দেশের আজ সর্বহারার যারা, যারা বঞ্চিত তারাই তো যথার্থ নারায়ণ। তাদের ত্যাগেই ভারতের শ্রীবৃদ্ধি। এই নরনারায়ণদের সেবার কথাই মহাপুরুষগণ ব’লে গেছেন। এই সর্বহারাদের উৎপাদিত বস্তু যারা শোষণ করে ভোগ করে তাঁরা সত্যিই ঘৃণার পাত্র। আজকে এই মহামানবদের ত্যাগ ও মহৎ আদর্শকে স্বীয় জীবনে অস্মরণ ক’রেই মাতৃভূমির সেবা করতে হবে, নাস্ত পছা।

এইভাবে উদ্বুদ্ধ হ’য়ে সমবেত চেষ্টায় অগ্রসর হ’লে পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যে আমাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে। সর্কাগ্রে প্রস্তুতি প্রয়োজন—যথাযথভাবে সর্কাস্ত্রকরণে মাতৃ-আহ্বান। কারণ এই মা হলেন সর্বস্বরূপা ও সর্বশক্তিসমম্বিতা। সকলের একজ্ঞীকরণেই মায়ের যথার্থ পূজা। প্রথমেই সর্বসিদ্ধির জন্তে মিলন, ঐক্য, গণ বা সংঘদেবতা গণেশের পূজা, অর্থাৎ দেশের, দেশের সর্বশক্তির ও সর্বসিদ্ধির মূল যে জনসাধারণ, তারই পূজা। সঙ্গে সমাজ ও শৃঙ্খলারক্ষী কার্তিকেয়, আর আছে দুই মেয়ে, জ্ঞানের দেবতা সরস্বতী আর ধন ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মী। সমস্ত দেব-গণের শক্তিসমন্বয়ে সমষ্টি শক্তিরূপিনী মা দুর্গা তাই হিংসা দমনে সিংহবাহিনী, সর্কায়ুধধারিণী, দুর্গতিনাশিনী অশুর বধে সংগ্রামোন্মত্তা। দশ দিক দেবীর দশ হাত। হিংসা ও পাপের মূর্ত্তি অশুর। এই দেবীর আবাস হচ্ছে বিব্রতরু বা সাধকের বেরদণ্ড মধ্যস্থিত স্রুম্মা। তারই নীচে অনন্ত শক্তিময়ী মা স্রুম্মা—একান্ত ধ্যানেই যার উদ্বোধন।

বিজ্ঞানের সেরা আবিষ্কার যে ইলেক্ট্রন, তা কেউ কখনও চোখে দেখেনি, দেখা যায়ও না। এই চৈতন্ত-ময়ী মাতৃশক্তিও তেমনি অলক্ষ্য হয়েও অতি বাস্তব। মোটের উপর বিশ্বাস বিশ্বাসই—অজ্ঞতা অজ্ঞতা কিছু নেই। আগলে চিন্তাই আমাদের সব কিছুর প্রসবিনী, একান্ত বিশ্বাস আর সম্পূর্ণ নির্ভরতা নিয়ে যে প্রার্থনায় অশুষ্ক পাখী আকাশে ওড়ে, স্রোপোকা হয় প্রজাপতি।

তাই পরিণেবে বলি, আলো, মাইক আর সাক্ষানো ছড়কে না যেতে আসুন আমরা মনপ্রাণ এক ক’রে সাগরে ও সমুদ্রের সঙ্গে প্রার্থনা করি—“দেবী প্রসাদ”—প্রসাদ হও, অর্ধ, অনাচার, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ থেকে আমাদের উদ্ধার কর—

“বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলং শ্রিয়ম্।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিঘো অহি।”

দেবী, চারিদিকে তোমার কল্যাণের আলোয় শান্তি ও সমৃদ্ধিতে গণজীবনের সমস্ত অন্তঃ অন্তঃকার বিনাশ করে পূর্ণ ও জয়যুক্ত কর। শু শান্তি।

প্রবন্ধক

ভারপ্রণব ব্রহ্মচারী

বেনারস ক্যান্টনমেন্ট।

ট্রেন থেকে নামল বিবেকরঞ্জন। স্ত্রী স্মিতাকৈঃ হাত ধরে নামাল। স্মিতার মুখে-চোখে বিরক্তি-ঘৃণা ফুটে উঠেছে। বিবেকরঞ্জনের মূৰ্খতা অসহায়-বিপদগ্রস্তের ছাপ।

স্টেশনের চত্বরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ভোলা পাণ্ডা। তিন পুরুষের যজ্ঞমানকে দেখেই এক গাল তেসে, কাছে এসে দাঁড়াল। মুখের হাসি শুকিয়ে গেল নিমেষে বাবুজীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

কি সমাচার বাবুজী? গাড়ীতে বোরাণীর আপনার কুহু তকলিফ-টকলিফ—

সর্বস্ব গেছে ভোলা! সর্বস্ব—প্রাণটুকু রেখে ছেড়ে দিয়েছে কেবল ডাকাতরা। কি ভাগ্যি তোমার ভৌজীর বাল। হু'টোয় লক্ষ্য পড়েনি—তাই সতীলক্ষ্মীর এরোতীর চিহ্নটাও বজায় রয়ে গেছে! কাদো-কাদো গলার স্বর বিবেকরঞ্জনের।

বিশ্ময়বিমূঢ় ভোলা পাণ্ডা। বাবুজী নতুন বিয়ে করে আসছেন বেড়াতে—তাকে পেয়ে শূন্যে প্রাসাদ গড়েছে। মেয়ের বিয়ের অঙ্কহাত দেখিয়ে কিছু লামলাম আদায় করবে ভেবেছিল, সে আদায়ে বাদ সাধল শিবশঙ্কু! যাক, এই বিপদেও যদি বাবুজীকে যত্নসেবা করতে পারা যায়—পরে এর পুরস্কার পাবে নিশ্চয়। বাবুজী ধনী লোক।

কুহু ভাবনা নেহী বাবুজী। হম যবতক জিন্দা আছি, আপনার অসুবিধা হোনে দেংগে নহী।

বিস্ময় মুখে হাসির চমক খেল গেল বিবেকরঞ্জনের। স্মিতার মুখ রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। স্তম্ভর মুখ শ্রীহীন একেবারে। একটা উদ্বাস্ত ক্রোধের ফৌসফৌসানি আশুন হ'য়ে ঠিকুরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অতি কষ্টে দমন করতে চেষ্টা করছে সে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্বাক মুখে স্বামীর অসুখামিনী হল স্মিতা।

পাণ্ডা-বিবেকরঞ্জন-স্মিতা টাঙায় চড়ে বাড়ীতে এলো। ভোলা পাণ্ডার বাড়ী।

ধারকর্জ ক'রে বাবুজীকে সম্ভট করবার জন্তে আপ্রাণ

চেষ্টা চলল ভোলা পাণ্ডার। এক পা হাঁটতে পারেন না বাবুজী। বাবুজীর পায়ের তলা নাকি তুলোর মতো নরম! গংগা স্নানে যাবেন—পাঁচ মিনিটের পথ—টাঙা চাই। সারাদিনই টাঙায় চেপে চেপে সারনাথ-হুর্গা-বাড়ী-মুনিভার্গিটি দেখে, নতুন বোকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন বাবুজী আর তাড়া গুণবে ভোলা পাণ্ডা! পাণ্ডাগিন্নী গালাগালি দেয় ভোলাকে—কি হচ্ছে এসব?—মেয়ের হাতের রূপোর বাল ছোটোও গেল! এবার বাড়ী বাঁধা রেখে টাকা নাও। তারপর বাবুজীর সেবা করে, মেয়ে-বোয়ের হাত ধরে দোরে দোরে ভিখ মেণ্ডো!

ভোলাও মনে মনে তাবে। জর তো কিছু অন্ডায় বাত বলছেন না। বাবুজী তো রোজই বলছেন, বাড়ী থেকে হু'এক দিনের ভেতর টাকা এসে পৌঁছেছে। চিঠি লেখা হয়ে গেছে। হু'একদিন ক'রে ক'রে মাসাবধি হতে চলল। টাকার পাতা নেই! এমন রাহগ্রস্ত বছর চলছে তার—যেটা ভালো ভাবছে, সেটারই উন্টো ফল ফলছে।

বাবুজীকে তাড়াবার জন্তে মতলব খুঁজতে লাগল ভোলা পাণ্ডা। রাবড়ি মিষ্টির দোকানে, বেনারসী কাপড়ের দোকানে গিয়ে হাজির হ'ল। বাবুজীর জামিন থাকতে সে নারাজ। দোকানিরা তাগাদা দিক। বাবু বোরাণীকে রেখে, কলকাতা থেকে টাকা এনে, পাওনা-গড়া চুকিয়ে দিয়ে যাক সবার।

সকলের তাগাদায় উত্থাপ্ত হয়ে উঠল বিবেকরঞ্জন। স্মিতাকে নিয়ে চুপি চুপি সরে পড়বার মতলব করল। মনের গোপন সিদ্ধান্ত স্ত্রীকে স্তনাল। স্ত্রী বিস্মিত শুদ্ধ। কিছুক্ষণ। পা থেকে মাথা অবধি উষ্ণ রক্তশ্রোত বয়ে গেল স্মিতার। মনে হল, ক্রমে অসহনীয় পরিস্থিতিতে টেনে আনছে তাকে মাহুঘটা। স্পর্ধার সীমায় উঠে পড়েছে। তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আরো খেলতে চাইছে। আর একটুও দেবী না করে এই মুহূর্তেই একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলা উচিত। কেলংকারী ছড়াবে। ছড়াক। কিন্তু এতোদিন বিবেকরঞ্জনের সমস্ত কিছু অন্ডায় মুখ বুজে সস্থ করার

কলঙতো তাকে পেতেই হবে। লোক ভেবে নেবে সেও দোষী। বাবার নাম ডুববে!

নিঃশব্দে সংযত করলে শ্রিতা। মৌন মুখে বিবেক-রঞ্জনর সামনে থেকে উঠে গেল।

শরীর অস্থস্থের ভান করে বিকেলের দিকে আর স্বামীর সংগে বেড়াতে বেরল না।

স্তম্বে স্তম্বে মন্থন করছে শ্রিতা। কলকাতা থেকে কাশী আসার এক একটি ঘটনা।

শ্রিতা। তোমার গায়ের গমনাগমনো খুলে রেখে দিয়ে যাও। রাস্তায় চুরি যেতে পারে।

খুলে দিবেছে সমস্ত শ্রিতা। সরল বিশ্বাসে দিবেছে। একটুও মনের কোণে সন্দেহের ছায়াপাত করেনি। বাবাকে মানী জ্ঞানী লোকেরা বুদ্ধিমান ব'লে সম্মান করে, পরামর্শ নেয় তাঁর কাছে। তিনি বলেছেন, অনেক যাচাই-বাছাই করে এই রত্নটি পেয়েছি—একেবারে ঝাঁটি। নামেও বিবেক—কাজেও।

সোনার ব্যাংগেল ছ'টোও খুলে দিতে বললে বিবেক-রঞ্জন। এই পাথর বসানো বালা ছ'টো পর। ভ্রমকালো দেখাবে। মানাবে ভালো। তোমার জন্মে অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়ে আনিয়েছিলুম। যা' সোনা নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সব, সোনার নামগন্ধ কাছে না রাখাই ভালো বিদেশে বিতুলে।

ব্যাংগেলও খুলে দিলে স্বামীর কথায় শ্রিতা।

ভুল ভাঙল তার কাশী স্টেশনে। সেখান থেকেই বিবেকরঞ্জনর মধ্যে অভিনয় সুরু হ'ল। সর্বস্ব চুরি গেছে। সর্বহারার মতো কাঁদুনি গাইতে লাগল যাত্রীদের কাছে। ঘুমের ঘোরে ব্যাগসমেত গমনা টাকাকড়ি—সব!

ক্যাণ্টনমেন্টে নেমে আবার অন্য অভিনয়।... প্রাণটুকু রেখে... স্বগতোক্তি করলে শ্রিতা—জোচ্চোর। বাবার অতিবুদ্ধির নাকে দড়ি হয়েছে। তার গমনা নিয়ে, বিক্রিপাটা ক'রে বেড়াতে বেরনো হ'য়েছে বাবুর—নবাবি দেখাবার জন্মে। এখানে এসেও সবার কাছে ধারদেনা করে বেড়াচ্ছে। হিঃ! হিঃ! ঝাঁটি ভেবে মেকির হাতে জঁপে দিলে বাবা তাকে!

পাণ্ডাগিন্নীর কাছে গিয়ে হাতের পাথর বসানো বালা ছ'টো দিয়ে বললে শ্রিতা, জমা রইল। পাণ্ডাগিন্নীর চে'খেমুখে খুশীর আমেজ ছেয়ে গেল।—জডোয়ার বালা বহত টাকার জেবর।

বেড়িয়ে এসে জীর হাত খালি দেখে স্তম্ভিত বিবেক-রঞ্জন। জিহ্বাসু দৃষ্টির উত্তর দিলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে শ্রিতা।—পাণ্ডার বোকে দিয়েছি। এ জোচ্চুরি বরদাত্ত করা অসম্ভব আমার পক্ষে।

বিবেকরঞ্জনর মুখখানা ক্যাকাশে হ'য়ে গেল। খানিক পরে অস্থনঘের স্বরে বললে, উঠে পড়। টিকেট কেটে এনেছি।

যাবো না!

ওরা যদি বুঝতে পারে ও ছ'টো গিন্টি করা খুটো পাথরের—

বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে শ্রিতা। তার মাথায় বাজ পড়ল। মানসম্মত বাঁচাবার জন্মে উঠে পড়ল।

...কলকাতায় ফিরে এসেছে বিবেকরঞ্জন। ফিরে এসেছে শ্রিতা। শ্রিতা পৌঁ ধরেছে এফুনি বাপের বাড়ী চলে যাবে। এরকম স্বামীর সংগে বসবাস করাও অস্বাভাবিক। হেসেছে জীর কথা শুনে বিবেকরঞ্জন। ছ' হাত ধরে, পাণ্ডাগিন্নীকে দিয়ে দেওয়া বালা ছ'টো বার করে পরিষে দিয়েছে। শ্রিতাকে হতবাক ক'রে দিয়ে হাসতে হাসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

শ্রিতা পাথরমুত্তির মতো বসে আছে চুপচাপ।

হাসতে হাসতে আবার ঘরে ঢুকল বিবেকরঞ্জন একটি হুটকেস হাতে করে। রাখলে হুটকেস শ্রিতার সামনে। খুললে। খুলে রাখা সমস্ত গমনা এক একখানি করে পরিষে দিলে সর্বাংগে।

শ্রিতা কাঁদছে। হাপাস নয়নে কাঁদছে।

সামান্য দিচ্ছে বিবেকরঞ্জন—রগড় করা স্বভাব আমাদের বংশের। তোমায় নিয়ে একটু রগড় করেছি কেবল। জোচ্চোর নই আমি। ধার-দেনা সব চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। তুমি যা বলেছো—তার জন্মে মনে কিছু করিনি। এই রকমই সং জী চেয়েছিলুম আমি।

কান্নার বেগ আরো প্রবল হ'য়ে উঠতে লাগল শ্রিতার।—ধারণা কতো ভুল তার। কি মহৎ-সৎ-ক্ষমাশীল মানুষ বিবেকরঞ্জন! এর সংগলাভেও পুণ্য।

বাংলার বিগত মনীষী স্মরণে

মনোজ দাস

আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে নেতৃত্বহীন বাঙ্গলা অসংখ্য সমস্তার সম্মুখীন। বাঙ্গলায় এমন নেতৃত্বের অভাব কোনদিন হয় নি। বিশেষ করে এই বাঙ্গলা দেশেই বিগত শতকে অসংখ্য মনীষীর অভ্যুদয় ঘটেছিল। পৃথিবীর কোন দেশেই একই সময়ে এত সংখ্যক মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে এমন নজীর মিলে না! কি ধর্ম, কি রাজনীতি, কি দর্শন, কি সাহিত্য সর্ব ক্ষেত্রেই বাংলায় মনীষিগণ তাঁদের অদ্বিত্য প্রতিভার স্বাক্ষর

বিশ্বের বিস্তার হয়ে আছে। এই মনীষীদের দৌলতেই বাঙ্গলা সারা বিশ্বে গণ্যমান্য হয়েছিল এবং বিশ্ব সাহিত্যে বাঙ্গলাভাষা সপ্তম স্থান পেতে পেরেছে। বস্তুতঃ ইহাদের জীবনের আলোয় আমাদের বর্তমান সঙ্কট-ত্রাণের সত্যিকার পথও নিহিত আছে।

প্রথমেই মনে পড়ে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—যিনি বাঙ্গলার এক নগণ্য পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেও, এবং উচ্চশিক্ষাবিহীন হয়েও, স্বীয় মহিমায় চির-



শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ

রেখে গিয়েছেন। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে যারা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের কর্মকাল বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই বিগত শতাব্দীকে যদি বাঙ্গলার স্বর্ণযুগ বলা যায়, তবে বর্তমান শতকের প্রথম ভাগকে তার অস্তভূক্ত করা চলে।

অষ্টাদশ শতকের কয়েকজনকে ছেড়ে দিলে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের ইতিহাসই হল বাঙ্গলার ইতিহাস। তাঁদের ঘিরেই ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল যা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সারা ভারতেরই ইতিহাস।

বাঙ্গলার উর্বরতা শুধু শস্যশ্যামল প্রান্তরে নয়—প্রতিভা ও স্বপ্নের ক্ষেত্রেও তার অনতিক্রান্ত উৎকর্ষতা



আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

পূজ্য হয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর চরম কীর্তি বহন করেছেন তাঁরই যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে। বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীকে এক নতুন ধর্ম, নতুন আলোর সন্ধান দিলেন। ধর্ম বে আলাদা কিছু নয়—কর্মেরই অঙ্গস্বরূপ তিনি তা দেখিয়ে দিলেন। তাঁর অপূর্ব বাণীতায় বিস্মিত হল সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ! তা ছাড়া সমসাময়িক কালের ব্রাহ্মদমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গলাকে অগ্রবহ করে নিয়ে চলার পথে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের দান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ-সময়কার আচার্য বিজয়রূপ গোস্বামীর বিচিত্র সাধনা ও সিদ্ধি বিশেষভাবে স্মরণীয়। আগাগোড়া বিদ্রোহী ছিলেন গোসাইজী। জীবনারম্ভে সে-সময়কার পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্রোতে গা-ভাসাইলেও, আত্মস্থ ভারতের প্রথম দিগদর্শন তাঁর জীবনসিদ্ধির শেষ পর্যায়ের আমরা পাই—যার ভবিষ্য সস্তাবনায় কথা শ্রীঅরবিন্দ পরে উল্লেখ করেন।



স্বামী বিবেকানন্দ

বাঙ্গালীর সাধনা অত্যন্ত ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকেনি। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙ্গলার আসন পৃথিবীর বেদীতে স্থাপন করে গেলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রেরিত হয়ে পরবর্তীকালে স্তার পি. সি. রায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, জে. সি. ঘোষ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের মান উচ্চতর করে গেছেন।

দর্শনক্ষেত্রে আচার্য ত্রেজেন্দ্রনাথ শীল ও মহেন্দ্রনাথ সরকারের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আচার্য শীলের প্রতিভা সারা জগতে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

• শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গলার বাঘ

স্তার আন্ততঃ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের তুলনা হয় না। শিক্ষা ও চরিত্রগঠন ক্ষেত্রে অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রমুখের নামও স্মরণীয়। জনসেবায় রাণী রাসমণি ছিলেন নারী-শিরোমণি। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও স্যার ইউ. এন. ব্রহ্মচারী ও বিধানচন্দ্র রায়ের অবদান স্মরণীয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎস ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা। মোগল সম্রাটগণ কোনদনি পুরো-



বিষকবি রবীন্দ্রনাথ

পুরি বশে আনতে পারেননি বাঙ্গলাকে—ব্রিটিশ প্রভুরা শত প্রলোভনেও ভুলিয়ে রাখতে পারেন নি বাঙ্গলাকে। স্বাধীনতা-যুদ্ধে প্রথম ব্যাঘ্র গর্জনে বেরিয়ে এলেন স্নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি। বিপ্লবযুগের তিস্তি স্থাপন করলেন পি. সি. মিত্র ও ঋষি অরবিন্দ তাঁরই অনুজ বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতিদের নিয়ে। বৃটিশের ফাঁসি-মঞ্চে প্রথম প্রাণ আহুতি দিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীজাত বীর ক্ষুদিরাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণযুগ জন্ম দিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি

(বাঘা বতীন), মতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, অখিনী দত্ত, বীরেন শাসমল, পুলিন দাস, সতীন সেন প্রভৃতি। এই সব মনীষীদের চেষ্টাতেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তৈরী হয়েছিল বহু আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক, নৈতিক বলে বলীয়ান কর্মী। আরও গড়ে উঠেছিল বহু ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠান। বাংলার বিপ্লব-উত্তর যুগের ইহা এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রাক্তন বিপ্লবীরাই ছিলেন প্রায় প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠাতা। এঁদের

ক্রমধারার একটা পরিণত রূপ দেখি শ্রীমতিলালে— বিবেকানন্দের স্বপ্নের রূপায়ণ।

সাহিত্য ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, অক্ষয়কুমার সরকার, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, অতুলপ্রসাদ, অরেশ সমাজপতি প্রভৃতি অগণিত দিকপালের আবির্ভাব



ইবরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর

মধ্যে প্রবর্তক-সম্ম-প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা সম্মুখক শ্রীমতিলাল ছিলেন বিশিষ্টতম ধার সম্বন্ধে মনীষী অতুল গুপ্ত মস্তব্য করেছিলেন, ‘অসামান্যদের মধ্যেও অসামান্য’। শ্রীগুপ্তের ভাষায় “যে পূর্ণ জীবন, ব্যক্তি ও সমাজের, সে-যুগে বাংলা দেশ কল্পনা করেছিল, মতিলালের জীবন তার আদর্শ।” বর্তমান শতকের প্রথম দুই দশকে বাঙ্গলায় যে জীবনের জোয়ার নামে তা একদিকে ভেঙ্গেছে, অপর দিক গড়েছে। নির্মাণের ক্ষেত্রে বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, অরবিন্দ, রবীন্দ্র প্রমুখের



হুয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দৃষ্ট হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে তাঁরা যেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিবিধান করে গিয়েছেন।

আজ অবাক হবে ভাবছি তাঁদের আদর্শ বাঙ্গলা এতো সহজে ভুলে গেল কি করে! জগতের সবচেয়ে বড় আশ্চর্য এটা নয় কি? এত জন-নেতা, এত মন-নেতা, এত অসাধারণ অধ্যাত্ম পুরুষপ্রবরের অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল যে বাঙ্গলা সেই বাঙ্গলা আজ একেবারেই নেভুত্বহীন।

আজ জীর্ণ, শীর্ণ, জীবনযুদ্ধে পরাজিত বাঙ্গালীদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। তারা যাতে আবার মেরুদণ্ড



যথার্থ শক্তিপূজা ও সজ্ঞগুরু শ্রীমতিলাল :

আজ বাঙালী জাতির সমষ্টি-জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে দুর্গাপূজা সে সম্পর্কে সম্পাদকীয় লিখিতে গিয়া কেন যেন উচ্ছ্বসিত হইতে পারিতেছি না। দ্বিখণ্ডিত বঙ্গভূমি গ্রাম্যে পরিণত। শাসনের চিতাশয্যায় শায়িত বাঙালীর নাস্তিভাষ উঠিয়াছে। নিজ বাসভূমে বাঙালী পরবাসী। অথচ শক্তিপীঠ বাংলা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাঙালী জাতিটাই সবচেয়ে শক্তিহীন, সবচেয়ে নিরুপায়—ধ্বংসোন্মুখ। কেন এমনটি হইল? কেন এমন সাড়ম্বর শক্তিপূজা নিফল হয়? হয় আমরা যেসব শক্তি-প্রতীকের পূজা করি তাহা অসার অচেতন, নবতো বাঙালী শক্তিপূজার নির্গুচ মর্ম্মরহস্য ভুলিয়াছে অথবা শক্তির সাধনে পালনে পরাঙ্মুখ কিম্বা উদাসীন হইয়াছে। তাই নীতিহীন, শক্তিহীন, উশ্জ্বল অধঃপতিতের পূজার বন্ডাধর প্রেতের নৃত্য-উল্লাসে পর্য্যবসিত।

মাতৃস্বরূপ সম্বন্ধে আমরা উচ্ছ্বাস সহকারে বলিয়া থাকি ‘বাহতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।’ ইদানীং-কালে শক্তি-ভক্তি দুইটিই খোয়াইয়া আমরা মাকেও হারাইয়াছি। ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য’—বস্তুতঃ বল-হীনের আশ্রয়স্থানও হয় না। আশ্রয়স্থান না হইলে একটা জাতি বলহীনও হয় না। আজকের বাঙালী আশ্রয়বিম্বৃত। আপনার সাধনা, ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার সে ভুলিয়াছে। স্তবরাং আমরা মরিয়াছি শক্তিপূজা করিয়া নয়, যথার্থভাবে শক্তিপূজা না করিয়া। পূজাব ভড়ং দেখাইয়াছি, কিন্তু সত্যকার পূজা করি নাই। উপরিচর উত্তেজনা ও আমোদ প্রমোদের নেশায় মশ্গল হইয়া আমরা নৈতিক-শারীরিক বল-বীৰ্য্য উভয়ই হারাইয়াছি। দৈহিক বল সম্বন্ধে

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা: “বাহবল ইহজগতের উচ্চ আদালত—সকল আপীলের উপর আপীল এইখানে। ইহার উপর আর আপীল নাই। বাহবল পশুর বল; কিন্তু মহুগ্য অত্যাপি কিয়দংশ পশু, এ জন্ত বাহবল মহুগ্যের প্রধান অবলম্বন। বাহবলে কখনও কোন সমাজে ইষ্টসাধন হয় না, এমত নহে। আশ্রয়বন্ধার জন্ত বাহবলই শ্রেষ্ঠ।”

বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিবেশে ‘কিয়দংশ মহুগ্য পশু’ বলিয়া বাহবলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, আজকের পরিবর্তিত পরিবেশে অধিকাংশ মানুষই পশুধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় সত্যের আশ্রয়বন্ধার জন্ত শক্তিসাধনার অধিকতর প্রয়োজন হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্তমানেই কেবল নহে, সর্বকালেই শক্তিসাধনার প্রয়োজন ছিল এবং আছে। কেন ধর্ম্ম-জীবন সাধনায়ও বলবীৰ্য্যের প্রয়োজন সে সম্পর্কে সজ্ঞ-গুরু শ্রীমতিলাল চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন: “হাজার হাজার বামুন চক্ষু বুঁজে বসেছিল সোমনাথের মন্দিরে। ধর্ম্মের উপর ছিল তাদের প্রচুর প্রত্যয়। মামুদ গজ্জনী এসে বুঝিয়ে দিয়ে গেল তাদের বিশ্বাসের ফাঁকি। সোমনাথ রক্ষা হল না। কাশীর বিশ্বনাথ মুসলমান বাদ-শাহের ভয়ে জ্ঞানকুপে ডুব পাড়লেন। মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ উঠলো। চক্ষের সম্মুখে এ দৃশ্য এখনও বর্তমান। কোথাও বিষ্ণুমন্দিরের লৌহ কপাট ঠাকুরের মহিমায় এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেল যে, স্নেহদল সেখান থেকে বিমুখ হলে ফিরে গেল—এই উডোকথার দেববিগ্রহেব উপর প্রত্যেয় রাখা হয়”—আমরা এমনি বীৰ্য্যহীন হইয়াছি। সজ্ঞগুরু ধর্ম্ম-পূজার এই ফাঁকি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছিলেন: “মানুষ চায় না তার ঠাকুরকে জাগতে, সে বুঝে না তার বাহ দুটো চোখ বুজে বসলে জোর পায় না, জঠর জ্বালাও তাতে নির্দোষিত হয় না। এই প্রত্যক্ষ সত্যটা অস্বীকার করে যে ধর্ম্ম তাহা নিছক পাগলামী।”

শক্তি-পূজার নামে এই পাগলামীই আমরা করিতেছি। নচেৎ এমন সাড়ম্বর পূজার ফলশ্রুতি এত দৈন্ত, এত

সোজা করে দাঁড়াতে পারে সেই ভরসা দেবারও কেউ নেই। কি জানি কি আছে নিয়তির বিধানে হতভাগ্য বাঙ্গালীদের ভাগ্যে! মাতৃভূমি দ্বিখণ্ডীকরণ স্বীকার করে নেবার এই যেন চরম শাস্তি বাঙ্গালীদের শিরে

নেমে এসেছে। মাতৃক্ষতের এই আঘাত মুছে ফেলতে হলে বাঙ্গালীকে আবার স্মরণ করতে হবে বাঙ্গলার বিগত এই আলোকদিশারীদের। এ ছাড়া আপনাতে আপনার ফিরে আসার বাঙ্গলার আর দ্বিতীয় পথ নেই।



সত্ত্বগুরু শ্রীমতিলাল

হীসমন্ততা কেন? “দুর্গোৎসব ও যথার্থ দুর্গাপূজা” পুস্তিকায গ্রন্থকার কবিভূষণ কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বর্তমানের বাঙালীর পূজা সম্পর্কে ঠিকই মন্তব্য করিয়াছেন: “পূর্ব-বঙ্গের পূজামণ্ডপ সকল আজ ভগ্ন শূন্য হৃদয়ে হাহাকার করিতেছে। সেখানে অসহায় সর্বস্বান্ত বাঙালী কোথাও ভগ্ন প্রতিমার চরণতলে, অন্তরের আলাময় মরুভূমে মায়ের উদ্দেশ্যে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। পশ্চিম বঙ্গে যা দেখা যায় সেও পরাস্ত বিকৃত রাজসের তাণ্ডব। সে শুধু সর্বস্বহারার বক্ষবিদারী বিকট ব্যঙ্গচিত্র! সেখানে এখন মা নাই, থাকিতে পারে না।” সে-দিনের কথা শক্তির বরপুত্র বিবেকানন্দ। সেই বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী লইয়া সারা বৎসর আমরা হৈ-চৈ, করিলাম, কিন্তু ব্রতের শুভ সমাপ্তির মধ্য দিয়া ব্রত উদ্‌যাপন পূর্ণ কবার বীৰ্য্য বীর-পুজারী বাঙালী দেখাইতে পারিল না। মোক্ষমুক্তির কথা দূরে থাকুক, সামান্য মনুষ্যত্ব হইতেও আমরা বিচ্যূন হইয়া পড়িয়াছি! বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সেই সাক্ষ্যই রাখিয়া গেল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাষায় “অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি তাহা নিবারণ করার চেষ্টা করে না, সে নিজের মনুষ্যত্ব অপমান করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির মনুষ্যত্বকেও অপমান করে। যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপন্ন হয়। কারারুদ্ধ হয়, অথবা লাঞ্চিত হয় সে সেই ত্যাগ ও সাধনার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসন প্রাপ্ত হয়, কতখানি মৃত, কতটা হতচেতন ও স্বার্থান্ধ আজকের বাঙালী জাতিটা হইয়াছে যে, নিত্য দিনের জীবনধর্মী সহস্র অন্তায়ের বিরুদ্ধে কি ব্যক্তি কি সমষ্টি ঝুঁকিয়া দাঁড়াইবার এতটুকু বীৰ্য্য-বিক্রম দেখাইতে পারিতেছে না। কেন? এই কারণটাই আজকের শক্তিপুজার শুভক্ষেণে বাঙালীর অহুসন্ধানযোগ্য।

॥ সজ্জগুরু ও শক্তিপূজা ॥

বিগত শতকে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, “বাহুবলে না হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙালী অচিরে পৃথিবী মণ্ডলে যশস্বী হইবে, তাহার সম্বন্ধ আসিতেছে।” ঋণিবাক্য সত্য হইয়াছে। জীবন

বিকাশের বিচিত্র ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতিভা বিশ্বের বিশ্বয় অঙ্কন করিয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর বাঙালী বিপুল জ্ঞান ও অনাবিল প্রেমের সিদ্ধির উত্তরাধিকার দাবী করিতে পারে। সজ্জগুরুর কথায়: “ভারতের প্রতিভাময় ঈশ্বর জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে, ভারতের হৃদয়ে হইয়াছে ভাগবত প্রেমের বিকাশ, কিন্তু দিব্য প্রাণ ভারতের এখনও জাগে নাই।” এ কথা বিনা বিভর্কে বলা চলে যে, বাংলা ভিন্ন নিখিল ভারতের সাধনেতিহাসে আর কোথাও জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি অর্থাৎ মস্তিষ্ক, হৃদয় ও প্রাণের সমন্বয় সাধনার ঐতিহ্য দৃষ্ট হয় না। বাংলায় এই ত্রি-ধারার সাধনা ও সিদ্ধির একটা সুস্পষ্ট রূপ আমরা দেখিতে পাই। এখনও তেমন স্পষ্ট না হইয়া উঠিলেও, দেহ শুদ্ধি ও সিদ্ধির একটা সাধন-বিজ্ঞান বাঙালী-মানসে সূনিশ্চিত ও সক্রিয় ঠাঁই করিয়া লইয়াছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিপ্রেক্ষিতে ও যে অর্থে ‘বাহু বলের’ কথা বলিয়া-ছিলেন তাহা বঙ্কিম-উত্তর কালে আরও ব্যাপকতর ও নিগূঢ় তাৎপর্যগর্ভ হইয়া বাঙালীর সাধনায় ধরা পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে এই শুদ্ধ প্রাণের জাগরণ-প্রতীক ছিলেন বিবেকানন্দ। বাংলায় বর্তমান শতকের প্রথম দুই দশকের যে অগ্নি-বিপ্লব ইহা তাহারই ফলশ্রুতি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বিপ্লব-উত্তর কালে প্রাণ-শুদ্ধির পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস-বিজ্ঞান মিলে শ্রীঅরবিন্দ-সাধনায়, আর সিদ্ধ প্রাণ-প্রয়োগের পরীক্ষা-নীরিক্ষা দেখি সজ্জগুরু শ্রীমতিলালের জীবনে। বাংলার অন্তর্গুঢ় সাধনার নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হইলে এই ইঙ্গিত যে সত্য বহন করে তাহা নিশ্চিত প্রকটিত হইবে।

বিশ্বপ্রাণের উদ্বোধনই দশদিকব্যাপী দশহস্তসমন্বিতা দশপ্রহরণধারিণী শক্তি-প্রতীক দুর্গাপূজার মর্ম্মকথা। যশোবীৰ্য্য ঐশ্বর্য্যদায়িনী দুর্গাদেবীর পূজা বাঙালী নানা-ভাবে ও বিচিত্র প্রকরণে করিয়া থাকে। শাস্ত্রমর্ম্মকে যুগ-প্রয়োজনসম্মত করিয়া সজ্জগুরু তাঁরই সৃষ্ট প্রবর্তক সজ্জগুরু এই পূজার বিশিষ্ট ধরণ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রচলিত পূজাবিশিষ্ট মর্ম্মধাবাতিকে

অক্ষর রাখিয়া তার পরিপূর্ণতর অভিব্যক্তি সজ্জগুরু-প্রবর্তিত পূজার মর্ম ও কর্মপদ্ধতিতে মিলে কিনা তাহা জ্ঞাতির কল্যাণকামীদের বিচার করিয়া দেখিতে বলিব।

প্রবর্তক সজ্জের এই মহাপূজা-আঙ্গিকের সবখানি উদ্ধার করার অবসর বক্ষ্যমান সম্পাদকীয়ের স্বল্প পরিসরে নাই। এই প্রাণ-পূজায় বাঙালীজাতির শুদ্ধ প্রাণ জাগরণের ক্ষুদ্র সজ্জগুরুর প্রয়োগপদ্ধতির নমুনা হিসাবে এখানে পূজা-আঙ্গিকের অংশবিশেষমাত্র দেওয়া হইল। সংস্কৃতের ইহা বাংলা অনুবাদ। এই পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণ কর্ম সমবেতভাবে সাধ্য।

আসন শুদ্ধি: হে পৃথিবী, যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার বুক মুর্ত্ত ভগবানের চরণচিহ্নে লাক্ষিত। পুণ্যময়ী! তোমার অপরিমিত পবিত্রতা আমার পরিপূর্ণ কর। ধর্মক্ষেত্র তোমার পুণ্যপীঠে আমার আসন স্থিরপ্রতিষ্ঠ কর। হে বরিত্রী, দেবী ভারতীর মূর্ত্তিতে তুমি লীলায়িত—বার বার তোমায় প্রণাম করি।

ভূতশুদ্ধি: “দেবী ভগবতী, ভগবানের অপরূপ বিশনে চতুর্কিংশতি তত্ত্বে আমার মূর্ত্তি দিয়াছ। আমার পদাস্ত্র হইতে কেশাশ্র পর্ষাস্ত্র আজ নিঃস্বার্থ, নিফলুষ, ভগবন্ময় হউক। আমার প্রাণে, পুণ্য গঙ্গে স্বাস-প্রস্বাস গৃহীত হউক। আমার শ্রুতিতে ভগবানের পাঞ্চজন্মধ্বনিত হউক। আমার দৃষ্টিতে ব্রহ্মের জ্যোতির্ময় রূপ প্রকাশিত হউক। আমার স্পর্শে আনন্দময় ভগবানের অমৃতরাশি উৎপলিয়া উঠুক। আমার রমনায় ভগবানের কীর্ত্তন জয়ধ্বনি করুক। আমার করপল্লব ভগবানের চরণে অর্ঘ্য দানে উদ্যত হউক। আমার চরণ দৃঢ় সঙ্কল্পে ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনে অচল প্রতিষ্ঠ হউক। আমার বাক পবিত্র ধর্ম ও মন্ত্রময় হউক। আমি আজ সর্বতোভাবে সর্বাঙ্গ ভাগবত প্রেমে অবগাহিত করিয়া শক্তি পূজার ষষ্ঠাধিকারী হইতে চাহি।”

ধ্যান: “হে দেবী, আজ আমাদের হৃদয় মন্দিরে জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তিতে আবিভূতা হও, ত্রিশূলাঘাতে পাণাসুর বিনাশ করিবা আমাদের অমৃতময় জীবন দাও। আমি তোমার সন্তান, অমৃতের পুত্র, নিষ্পাপ নিষন্দ্ব চক্ষে দেবতার সৃষ্টি রচনার যোগ্য হই। * + আমি

জগদ্ধাত্রী বীরমাতার জগজ্জয়ী বীর পুত্র। ভগবানের পাঞ্চজন্ম ধর্মমন্ত্র আমার জীবন দিয়া সিদ্ধ হউক। হে দেবী, অনন্ত সন্তানব্রত সিদ্ধ করার শক্তি দাও, বর দাও। তোমারই রূপের আলোতে আমি দ্রবীভূত হইয়া থাকি।”

সজ্জগুরু-প্রবর্তিত মহাপূজার প্রতিটি আঙ্গিকই ব্যাটি ও সমষ্টির ভাগবত-জীবন উজ্জীবনের এমনই ইঙ্গিতগর্ত। সার্বজনীন পূজামণ্ডপে এই পদ্ধতি সনিষ্ঠায় অমুষ্ঠিত হইলে জাতীয় জীবনকে লক্ষ্যান্তিমুখী করার নিশ্চয়ই আহুকূল্য ধরিবে। আজকের লক্ষ-লক্ষ লক্ষ্যহীন পূজা ও পুষ্পাঞ্জলী নিঃসার শূন্যগর্ভ হৈ-চৈ-এ পর্যাবসিত হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ সত্য। আমরা বাঙালীর সম্ভাব্য দিব্য জীবন-সাধনার বিশিষ্ট মিশন সম্বন্ধে ষাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের এ-দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি

সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল ছিলেন জীবনের পূজারী। এ জীবন বলিতে কি বুঝায় তাহা যাহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছেন তাহারা তাঁহার সত্য উত্তম, অফুরন্ত ভুবড়ির মত দিব্য চेतনার ফুল-ঝুরি-কাটা জীবন দৃষ্টান্তে খানিকটা আন্দাজ পাইয়াছেন। এ ছিল এমন অসাধারণ মহাজীবন যে সে সর্বহারার জীবনের কোন আসক্তি ছিল না, ছিল না কোন প্রবৃত্তি, অথচ ছিল নিবিড় সংসার-মমতা, ছিল ব্যথিতের জন্ত আর্জনাৎ, আর ধরণীর ধুলির জন্ত আত্মার ক্রন্দন। ইহা সত্যই অভিনব অনির্কচনীয়। সজ্জগুরু তাঁর নিজের জীবনের মিশনের কথা নিজেই বলিয়াছেন : “যুগে যুগে অনেক মহাপুরুষ কেঁদে গেছেন ‘হা হরি’, ‘হা জগন্নাথ’ বলে, কেহ ‘জয় রাধে’ ‘শ্রীরাধে’ বলে চক্কের জলে ধরা অতিবিক্ত করেছেন। তাঁদের আত্মাই কেঁদেছে। তাই সে বিলাপ বেদ হয়ে আছে পৃথিবীর বুকে। আমার সেই আত্মাই কাঁদছে ভগবানের জন্ত নয়, মুক্তি-মোক্ষের জন্ত নয়—কাঁদছে আমার এই মুর্ত্ত সুষ্টাম ধরণীর জন্ত। আমার অশ্রু সরিৎ সাগর হয়ে যায় এই বিশ্বকে ঘিরে—এত অশ্রু, এত বর্ষণ!” তিনি আরও বলিয়াছেন : “পৃথিবী আমার

আবির্ভাবে মনে করুক সে নিরাপদ, আর অসহায় নয়। আমার জীবন দান তাকে অলঙ্কৃত করে তুলুক। ধর্মের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হোক, স্বপ্ননের রাগিণী উঠুক বিধে। আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নাই। তাই বিশ্বের পুষ্টি দিতে আমার এত উল্লাস। সন্ন্যাসের অমর বীৰ্য্য যদি জীবনেই না প্রকাশ হল, তবে অতীতের মত ইহাও যে ব্যর্থ হয়।”

জীবনের জয়গান করিয়া সজ্জগৎ এ জাতির প্রাণ জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রাণ দানই তিনি দাবী করিয়াছিলেন এবং নিজের প্রাণও নিঃশেষে উজ্জ্বল করিয়া উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন জগদ্ধিতায়। এই প্রাণময় জীবনের সংজ্ঞা সজ্জগৎর কথাই বলি : “ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থাকে, বেদ থাকে, কে তা মুছে দেবে—থাকুক। আজ ও সব আমার দেবার বস্তু নয়। আজ আমি নিছক দেখছি জীবন। কাম্য জীবন নয়—দিব্য জীবন। জীবন বলতে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ার জীবন, পৃথিবী আকর্ষণ করে’ ধন সঞ্চয় করে যে জীবন—পৃথিবী মুখরিত করে কঠোর বজ্রগর্জনে, আর যে জীবনের দাপটে বিশ্ব বিস্ফারিত নয়ন মেলে তাকায়—সেই জীবন। শূগল কুকুরের মত বেঁচে থাকার জীবন বলছি না। বাড়ীর মেনুকু কুকুরটাও বেঁচে আছে জীবন নিয়ে।”

প্রাণপূজারী সজ্জগৎ ছিলেন যুগমানব। যুগের প্রয়োজনের কথাই তিনি বলিয়াছেন : “প্রাণের অর্ঘ্য প্রকাশ কর কর্মে। প্রাণময় বজ্রক্ষেত্র ঐশ্বর্য্য ও গর্বে পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করুক। পণ্য পৃথিবী ছেয়ে দাও। বহুধরার বুক চিরে শস্য উৎপাদন কর, মেদিনীর গর্ভ থেকে তুলে আন মণি-মাণিক্য, বলভদ্রের মত হলানুধ যন্ত্রে ভূমি কর্ষণ করে সৃষ্টিকে অতিনব মূর্ত্তি দাও। রেখে যাও জগতের বৃকে জীবনের পতাকা স্ফুট ভিত্তির উপর।”

এ কার কণ্ঠ? চিরন্তন ভারতের চিরকালের বিবেকানন্দের নয় কি? ইহা কি বর্তমান শতকের যুগ-মানবের কণ্ঠে বিগত শতকের বিবেকানন্দের আরও জোরালো কণ্ঠধ্বনি নহে?

শুদ্ধ প্রাণের জাগরণে যেখানে না হয় সে পূজা ব্যর্থ, নিষ্ফল। কেবল ‘দুর্গা দুর্গতি নাশ কর’ বলিয়া নাকি কান্নাই হয় সার। পূজাবিলাসীর শূন্যগর্ভ ইহা হৈ-চৈ মাত্র। পূজার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সজ্জগৎর ইঙ্গিত : “ইহা ক্লান্তি দূর করার অবকাশ নয়, জীবনের মহাপর্ব্ব, মহাবজ্র। ‘জয় মা জননী জগদ্ধাত্রী’ বলিয়া হে ভারতের নারী পুরুষ, সকল অন্তর-কালিমা মুছিয়া নূতন উত্তম কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। এ ভারত দেবভূমি, ধর্ম-ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র। পূজা-তীর্থ সেই অমৃতভূতির সিদ্ধক্ষেত্র। পূজা-প্রাণে জীবনের জয়গানে আকাশ মুখরিত কর।”

সজ্জগৎ শ্রীমতিলাল বাঙালীর সমষ্টিগত পূর্ণ জীবন-গঠনের স্বপ্ন-সিদ্ধির জন্ত জাতির ব্যাপক ক্ষেত্রে বিচরণ কবেন নাই। দিব্য জাতীয়তার অভ্যুদয়কল্পে তিনি শত শুদ্ধ প্রাণের সিদ্ধ চক্র নির্মাণেই উন্মাদ তপস্বী জীবনভোর করিয়া গিয়াছেন। তাঁর এই মহাপ্রাণ-পূজা রূপাষণের আধারপট হিসাবে প্রবর্তক-সজ্জ-সংগঠনে তৃতী হইয়াছিলেন এবং বড় আশা করিয়াছিলেন যে, “আমার স্বপ্ন ব্যর্থ হইবে না। প্রবর্তক সজ্জ বহু যুগ পরে আবার বাসবের হাথ, সুরধের তায়, রামচন্দ্রের তায় মহাপূজার অমুষ্ঠান করিবে।” তিনি সজ্জকে অস্তর দিয়াছিলেন : “দেবীর বরাভয় স্বচক্ষে সন্দর্শন করি। নিঃসংশয় হও। দিব্যরাজ্য সংগঠনের আমার এই মহামন্ত্র অমোঘ।”

কিন্তু আজিকাব পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, সজ্জগৎ ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা ঋষি। দূর অনাগত কালের স্বপ্ন—বাঙালী যা হইবে বা হইবার জন্ত বিধিনির্দিষ্ট তারই সম্ভাব্য চিত্র তাঁর শুদ্ধচিন্তে প্রতিকলিত হইয়াছিল। মহাকাল এই সিদ্ধ স্বপ্নের রূপ নিশ্চয়ই ফুটাইয়া ফলাইয়া তুলিবে। কিন্তু সমসাময়িক কাল সজ্জগৎকে ঠিক ঠিক ধরিতে বুঝিতে পারে নাই, ইহা অনিশ্চিত। এমন কি তাঁরই হাতেগড়া প্রবর্তক সজ্জও কালের গতানুগতিক ও অতীতের সংস্কার-মোহ কাটাইয়া সজ্জগৎর স্বপ্নকে সমষ্টি জীবনে রূপায়ণ করার জন্ত আজও সংগ্রামরত আজও তপস্বীরত। মানুষের মূর্ছিত চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া তাঁর স্বপ্নের অতিনব প্রাণ-সাধনার আহুকূল্যে

মোড় পরিবর্তনের দুরূহতা তিনি নিজেই অমৃতব করিয়া গিয়াছেন। তাইতো প্রবর্তক সজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়া সজ্ঞগুরু আক্ষেপ করিয়াছিলেন: “হয়তো এ জন্মে তোমরা আমার কথা বুঝিবে না। হয়তো এখনও তোমাদের চিত্ত পুর্বোক্ত বেদ-পুরাণের আবর্তে অভিভূত, হয়তো এখনও লোকপ্রসিদ্ধ মত ও মানুষের প্রভাবে তোমরা বিভ্রান্ত। কিন্তু আমার বাণী রইলো পৃথিবীর বুকে। এমন দিন আসছে যারা দীর্ঘদিন সর্বভ্যাগী মোক্ষপথের পথিক ছিল তারা আমার এই নূতন জীবন-চিহ্নিত প্রাণপতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা করবে। আমি থাকবো তাদেরই প্রতীক্ষায়, আমার আশা-প্রদীপ তাই নিভবে না।”

সমসাময়িক কালের অজ্ঞতা অক্ষমতা যুগে যুগে এমনি কাঁদিয়াই মহাপুরুষেরা এ কঠিন কৃত্ত্ব কামপঙ্কিল পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছেন। সজ্ঞগুরুও তার ব্যতিক্রম নহেন। যুগে যুগে পৃথিবীর মানুষ অহঙ্কারের বোঝা বহিয়া এই মহা মানবদেরই মন্দির আর পূজাঘরের মধ্যে আত্মকাম চরিতার্থ করিতেছে। আপনার প্রকৃতি-প্রবৃত্তির রূপান্তর সে চাহে না। চাহে না সে মরণ—অহঙ্কারের মরণ। কিন্তু শব না হইলে গ্রামার নাচনে

এই ধরিজীও সুন্দর হইয়া উঠিবে না। স্বপ্নদ্রষ্টার সত্যের পরিপূর্ণ আনুগত্যে এ মর্ত্যের মানুষ চলিতে পারে নাই বলিয়াই পৃথিবীর প্রেয়ঃ সাধন হইলেও আত্ম পর্য্যন্ত প্রেয়ঃ সাধন হয় নাই। মানুষ ও মহামানুষের স্বপ্ন-লব্ধের মধ্যে যে মহাপ্রলয় তাহাতেই ভূমা ও ভূমির সমন্বয়, তাহাতেই এ মরণশীল মর্ত্যের অমরত্ব, সত্যকার শ্রী, ঐশ্বর্য্য, বীর্ঘ্য, মাধুর্য্য। বাঙালী জাতীয়তার সাধ্য ইহাই। ইহাই ছিল এ যুগের শিবময় সজ্ঞগুরু যুগদাবী।

তবুও আমরা নিরাশ নহি। আমরা প্রত্যয় করি, বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য, তার সাধনা ও সংস্কৃতির অস্থিমজ্জাগত মর্ম্মলোকের নিগূঢ়সঞ্চারী মানবাত্মার পূর্ণ অভিব্যক্তির জীবনশক্তি লুপ্ত হয় নাই, হইবাব নহে, হওয়াটা তার ভাগ্য-বিধাতার অভিপ্রেত নহে। জাতির এই জীবনীশক্তিই যুগ-প্রবেশে সজ্ঞগুরু আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। আমরা প্রত্যয় করি, তাঁর অভিসন্ধিত জাতীয়তাব নববিগ্রহ রচনার নিমিত্ত ও উপাদানও সৃষ্ট হইয়া আছে। আজিকার জাতী প্রতীক দেবী দুর্গা-পুজার সন্ধিক্ষণে এই কল্প সত্যটি স্মরণ রাখিলে ইহা স্বাভাবিক হইবে। আমরা অনন্ত সন্তানব্রতী বাঙালীর দৃষ্টি এ-দিকে আকর্ষণ করি।

আনাড়ী যোদ্ধা

শ্রীসুধমা মৈত্র

আনাড়ী যোদ্ধা :

জীবনযুদ্ধে হায়েছি সেনাপতি

নিয়ম শৃঙ্খলার ধারি না ধার।

কাউকে বা দরাজ মনে দিষেছি মুক্তি

শত অপরাধে অপরাধী ছেনেও।

মানি না কোন কঠোর কঠিন বিধান।

হৃদয়বেগের হুকুম তামিল করি।

কেন যে হৃদয় সংগ্রামে লিপ্ত হইবেও

ধরে না অসীম আশের খড়্গ অসি।

এই অ্যাটোমিক, হাইড্রোজেন যুগের মানুষও

কি নিজেকে ভেবেছে দুর্বল, ভীতু ? তাই সে

ধারে না কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার ধার ?

ভাবাবেগের ফাহুস উড়িয়ে উড়িয়ে চলে।

ভাবাবেগে কতদিন চলে ?

বুদ্ধির যোগসাজস না ঘটলে ?

বুদ্ধিহীন ভাবেব ফাহুস উড়িয়ে উড়িয়ে

পতঙ্গই কেবল আঙুনে পুড়ে মরে।

বুদ্ধিজীবী, নব-সেনাপতির সাজে না সে নিবুদ্ধিতা

নষ সে সেনাপতি কখনো। আঙুনে পুড়ে মরতে

জন্মেছে ধরায় সে নররূপী কীট যেন।

আমি তো চাই না সে সেনাপতি হতে।

মানুষ আমি মনুষ্যত্বের অয়গানে ভরে তুলতে

চেষ্টেছি পৃথিবী। তবু আমি না কেমনে আমার

এ কী হলো ? ভাগ্যের পায়ে দুর্বলচিত্তে

সঁপেছি হৃদয় মম। অদৃশ্য শক্তির ফাঁদ

পাতা ভুবনে আমি জড়িয়ে পড়েছি আঠেপুঠে।

সে কাঁদ ছিঁড়ে বের হতে গিয়ে

আমি পড়েছি গোলক ধাঁধায়।

পথ না দেখি। তাই সেজেছি

অক্ষম হৃদয়বেগে চালিত সেনাপতি। তবুও কেন

যে মন চায় সে সে গোলকধাঁধা থেকে বের হয়ে চলি আমি

সোজাপথে। জীবন যেখানে সহজ সরল যবে।

ফরাসী

চন্দননগরের কামান

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



বিগত ১৮ই এপ্রিল তারিখে চন্দননগরের কুটির-ঘাটের নিকটে সেচ বিভাগের শ্রমিকরা বাঁধ নির্মাণের জন্য গঙ্গাবক্ষে খননকার্যে রত থাকাকালীন একটি মাঝারি ধরনের কামান পাওয়া যায়। বাংলা দেশের এমন শহরেই এ ধরনের কামান ইতস্ততঃ ছড়ান থাকে এবং সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে এর ভিতর যে কোনও ঐতিহাসিক স্ত্রু লুকিয়ে থাকতে পারে, এরকম ধারণা কখনও আসে না। কিন্তু ইতিহাসের তথ্য-সম্মানে রত থাকলে অনেক সাধারণ জিনিষের মধ্যেও কিছু ঐতিহাসিক তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়।

চন্দননগরের ফরাসী শাসনের নিদর্শন বলতে কিছু ইতিহাসের পাতায় লেখা তথ্য ছাড়া এক রকম কিছুই সম্ভব পাওয়া যায় না। মাত্র ৪৫টি ২০০ বছরের পুরাতন গীর্জা, মন্দির বা অপরাপর গৃহ ছাড়া বর্তমানে যা দেখতে পাই, সে সবই অনেক পরবর্তীকালের। তাই এখানকার গঙ্গাভীরবর্তী ঝাঁপ, বর্তমান অবস্থার শাসকের বাড়ীটিই ডুল্লের বাসস্থান, এখানকার গড় একইভাবে ২০০ বৎসর রয়েছে ইত্যাদি ভ্রান্তিজনক অথচ জনপ্রিয় তথ্য ইতিহাসে স্থান পাওয়ার অবস্থায় এসে গেছে। এমনকি এই ধরনের জনশ্রুতিই আজ চন্দন কাঠের জন্ম-স্থান বলে এক ভ্রান্তিজনক তথ্য ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। তাই সাধারণ লোকের কাছে একটি মাঝারি ধরনের কামান কি ঐতিহাসিক স্ত্রু বহন করে সেটা ব্যাখ্যা করা খুব সহজ কাজ নয়, তবুও যতটা সম্ভব

সংক্ষেপে কামানের বিবরণ ও ফরাসী আমলের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে পাঠকমহলে এই কামানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে জানান হবে।

কামানটি যেখানে পাওয়া যায় সেই জায়গাটি কুটির-ঘাটের মাত্র কয়েক গজ উত্তরে এবং এখনও বৎসরের সমস্ত ঋতুতেই সেখানে জোয়ারের জল আসে। নিকট-বর্তী পুরাতন ফরাসীদের ওরলিবাঁ দুর্গের বর্তমানে কোনও চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে দুর্গের উত্তর দিকের বেশ প্রশস্ত পরিখা ও পশ্চিমের কোম্পানীর দীঘি বা লাল দীঘির সঙ্গে ১৭৪২, ১৭৬২, ১৭৭৮ ও ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের নক্সা মিলিয়ে দুর্গের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মুশে (Mouchet) অঙ্কিত ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের নক্সা ছাড়া বাকী কোনটিতেই মাপ বা স্কেলের (Scale) কোনও ভিত্তি নেই এবং শুধু এই কারণেই শতাব্দিক ফরাসী ইতিহাস পুস্তকের মূল্য খুবই কম। এরপর আবার আছে ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে এই সব পুস্তকের অবহেলা। তাই—ফরাসী উপনিবেশ বিষয়ে গবেষণা খুবই কষ্টসাধ্য।

ইংরাজ ঐতিহাসিকব্র মি: ব্রুম (Broome) ও মি: বিভারিজ (Beveridge)-এর মতে গঙ্গা থেকে মাত্র ৩০ গজ দূরে দুর্গ অবস্থিত ছিল। কিন্তু মুশের অঙ্কিত নক্সা থেকে জানা যায় যে, দুর্গের পূর্বদিকের প্রাচীর-সংলগ্ন একটি বড় ও উঁচু ধরনের বাঁধ ছিল শুধু দুর্গ রক্ষার উদ্দেশ্যে—এ থেকেই অনুমান করা যায় যে,

উক্ত ইংরাজ ঐতিহাসিকদ্বয় বহির্ভাগে অবস্থিত বাঁধটিও দুর্গের অংশ হিসাবে ধরিয়াই তাঁহার বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। কুটিরঘাট ও নিকটবর্তী গঙ্গাতীরবর্তী ভূভাগ লক্ষ্য করলে বেশ অনুমান করা যায় যে, গঙ্গা অনেকখানি পশ্চিমে সরে গিয়ে নূতন ভূভাগ সৃষ্টি করেছে যা প্রায়ে ১০০ গজের কম নয়।

বিভিন্ন মানচিত্র লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় যে, দুর্গের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের গম্বুজ (Bastion) যাহা বর্তমান উদ্ভিজ্জার রাস্তার ৩০ থেকে ৫০ গজ পশ্চিমে ছিল বলে অনুমান করা যায় ঠিক সেই জায়গা থেকে ১৫০ থেকে ২০০ গজের মধ্যে এই কামানটি পাওয়া গেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই কামান ফরাসী দুর্গ বা তাহার সংলগ্ন পরিধার কামান ছাড়া! অপর কোনও জাতির ব্যবহৃত কামান হতে পারে না।

এ ছাড়া কামানটির এমন কয়েকটি লক্ষণীয় চিহ্ন আছে যাতে ফরাসীদের কামান বলে আরও দৃঢ় ধারণা আসে। কামানটির গায়ে চুণ, সুরকি ও ইটের খোয়া এখনও লেগে আছে যা থেকে বোঝা যায় যে, এটি কোনও জায়গায় স্থায়ীভাবে রাখা ছিল। কাজেই এ ধরনের কোনও কামান যে অপর কোনও জাতি তাদের উপনিবেশ থেকে তুলে এনে ঠিক ফরাসীদের দুর্গের পাশে গদাবক্ষে নিষ্কেপ করবে এটা কোনও স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে না। কামানটি বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, এর ওজন অনুমান ১০ মণ, দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি যদিও মুখের দিকে ভগ্ন হওয়ায় দৈর্ঘ্য ও ওজন উভয়ই কমে গিয়েছে এবং বাহিরের দিকের অনেকখানি মর্চে ধরা অবস্থায় খসে গিয়েছে। নূতন বা ব্যবহারের উপযোগী সময়ে এর দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ছিল এবং ওজনও ১৫ মণের কম ছিল না। মুখের দিকে গোলা নির্গমন পথের মাপ সাড়ে চার ইঞ্চি। এ থেকে বোঝা যায় যে, কামানটি মাঝারি ধরনের অর্থাৎ ৯ থেকে ১০ পাউণ্ড ওজনের গোলা ব্যবহারের উপযোগী হিসাবে নির্মিত হয়েছিল। কামানটি প্রাচীন কালের বারুদগাদা পদ্ধতিতে নির্মিত যাকে গাদা কামান বলে অর্থাৎ (Muzzle load) সেই ধরনের কামান।

ফরাসী চন্দননগরের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, দুর্গের বরাহে স্থায়ী কামানগুলি খুবই বড় আকারের অর্থাৎ ২৪ থেকে ৩২ পাউণ্ড গোলা নিষ্কেপের উপযোগী ছিল। এ ছাড়া ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে মসিয়ে' রেনো (Renault) কয়েকটি ৮।১০ পাউণ্ড গোলা নিষ্কেপকারী কামান দুর্গের পূর্বদিকের প্রাচীর, ভিতরের গির্জার উপর ও বাহিরের বাঁধের উপর স্থাপনা করেন। স্বাভাবিক কারণেই এ কামান উক্ত শ্রেণীর কোনও একটি হওয়া সম্ভব। এবং দুর্গ ধ্বংস করার সময়ে কোনও উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়াতে এর অগ্রভাগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

ওরলিয়ঁ দুর্গ বারবার ধ্বংস করা হয়েছে এবং শেষের দিকে একে ধ্বংস করার চেষ্টাকে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়ার মতই বৃষ্টিশ্রুতির একটা উদ্ভ্রান্ততার প্রমাণ দেয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ দুর্গ দখল করার পর প্রথম একদফা ধ্বংস করা হয়। এরপর উপনিবেশ ফরাসীদের ফিরিয়ে দেওয়ার সময়ে ইংরাজেরা আর একবার ধ্বংস করেন ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। মসিয়ে' শিভালিসের (Chevelicer) আমলে আর একবার দখল হয় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এবং পরবর্তীকালে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আবার দুর্গ খানিকটা ধ্বংস করে তবে ফরাসীদের উপনিবেশ ফেরৎ দেওয়া হয়। পর পর তিনবার যে ধ্বংস করা হয় তা সত্ত্বেও যে দুর্গ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় জেফ্রাইট পাত্রী তিফেনথলার (Father Tiffenthaler)-এর আঁকা মানচিত্র যাহা ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরের গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলের বিবরণ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র। এই নক্সায় দুর্গকে Castelum Destructum অর্থাৎ ক্ষুদ্র ধ্বংস-প্রাপ্ত দুর্গ এইভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে।

দুর্গ এতবার করে ধ্বংস হওয়ার পর যে দুর্গ বলতে কিছু ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফরাসী সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত পুস্তকে। মসিয়ে' বোজাদার (J. Boxadar) লিখিত—“Fraise' Theorique et Pratique” ইত্যাদি শীর্ষক রাজস্ব বিষয়ে নির্দেশনামার পৃথকে দেওয়া আছে যে, ৮১ আর (bre) পরিমিত ভূমির উপর অবস্থিত দুর্গটি ১৮১৪-ও ১৮১৫

মাতা ধরিত্রীর ক্রন্দন

কুমারী রেণুকণা ঘোষ (প্রবর্তক সজ্জকন্যা)

মা ও মাটি এক এবং অভিন্ন। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন—ধরিত্রী সন্তানকে বক্ষে ধারণ করেন—স্থ + ধারণে=তাই মা ধরণী ; ধরিত্রী পিতা যখন পত্নীর গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন পত্নী হয় জাম্বা, তেমনি মাতা ধরিত্রীও একসময় পুত্রীরূপে পরিণতা হয়েছিলেন সূর্য্যবংশীয় রাজা বেনের পুত্র পৃথুর কাছে। মাতা ধরিত্রী সেই অবধি পৃথিবী নামে পরিচিতা হয়ে আসছেন। তখন ছিল ত্রেতাযুগ। তার পূর্বে কৃতযুগে ঋষিবৃন্দ ধরিত্রীমাতার মাতৃদ্বন্দ্ব অঙ্গভাবে রক্ষা করে গেছেন। তাঁদের জীবন ছিল যজ্ঞকেন্দ্রিক ; নিত্য নিয়মিতভাবে তাঁরা যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল আকাশের জলধারাকে স্থনিযন্ত্রিত করা। এ ছাড়া আরও অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্ত যজ্ঞ সম্পাদিত হত। সে সব যজ্ঞের নাম ছিল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ, পুত্রোষ্টি যজ্ঞ, দ্রব্য তপঃ যোগ, জ্ঞান আরও কত। এ সব যজ্ঞের কথা সর্ব্বজনবিদিত। আবার ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এসবও আছে। যজ্ঞে দেবতারা অধিষ্ঠিত থাকেন। সর্ব্বলোক যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞের দ্বারাই ধরিত্রী শাস্ত্রশালিনী হন—প্রজাসকল যজ্ঞ দ্বারাই পুষ্টি ও তৃষ্টি-

লাভ করে। যজ্ঞ তাই ঋষিজীবনের দৈনন্দিন কর্ম্ম। ঋষিরা ছিলেন ধরিত্রী-মায়ের হৃদয়সন্তান—তাঁরা নিয়মিত যজ্ঞ, কৃষি এবং গোপালন দ্বারা মাতা বহুমতীকে বীৰ্য্য-শালিনী করে রাখতেন ধরিত্রীমায়ের বীৰ্য্যবস্তা দুটি বিষয় দিয়ে। এক জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি, দুই—সন্তানের বল, বীৰ্য্য, সাহস, সততা, ধর্ম্মপরাধগতা প্রভৃতি। ঋষিদের দৃষ্টি এই দুটি বিষয়েই সদাঙ্গাগ্রত ছিল। যজ্ঞকে অনির্বাণ করে রাখার জন্ত গোপালন তাদের প্রধান ধর্ম্ম ছিল, কারণ গব্যযুত যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ। তাছাড়া মাতৃদুগ্ধর জ্বায় গোদুগ্ধই মানবশিশুর একমাত্র পেষবস্তু। উহাই শরীরের বলবীৰ্য্য প্রদানকারী। তাই গো-ও মাতৃদুগ্ধরূপ। গোমাতা নিজ দুগ্ধ দ্বারা শুধুই মানবশিশুকে পুষ্টিদান করে না, গোমূত্র ও গোময় দ্বারা ধরিত্রীমাতারও উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। কৃতযুগে তাই স্নেহশীল। কল্যাণময়ী ধরণীর অজস্র আশীর্বাদ ঋষিরা লাভ করেছিলেন।

তারপর এল ত্রেতাযুগ—সে আরও উৎকৃষ্ট। তাকে বলা যায় সুবর্ণযুগ। সেই যুগেরই সূর্য্যবংশীয় রাজচক্রবর্তী নরপতি পৃথু, যিনি জ্ঞানে, গুণে, বলবীৰ্য্যে অতুলনীয়, তিনিই প্রথম ধরিত্রীকে দোহন করেন। দুহু ভাবে

খুঁটাধ্বের চুক্তি অনুযায়ী আবার ধ্বংস করা হয়। এ সম্বন্ধেও কিন্তু ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় তাঁহার ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ভ্রমণ-বিবরণীতে কেবল দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া উল্লেখ করেন। অবশ্য গঙ্গাপথে দূর থেকে কোনও বাঁধ বা সুউচ্চ গুদাম বাড়ীকে তিনি দুর্গের স্থানে দেখেছিলেন কিনা তাহা এখন অস্মান করা খুবই কঠিন। কারণ দুর্গ তখন একেবারে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং বোম্বাদারের বিবরণীতে জমিগুলিও ঠিকাপাট্টা পদ্ধতিতে বিলি করা হয়েছিল ১৮২৫ সালের মধ্যে।

দুর্গ ধ্বংসের ইতিহাস থেকে এটাই খুব স্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় যে, এই দুর্গের ধ্বংসের যে কোনও সময়ে একটি উঁচু জায়গায় গাঁধা কামানকে অনেক নীচুতে ফেলে দেওয়া হল এবং এইভাবে একটা ভাঙ্গা কামানকে

অপ্রয়োজনীয় জিনিষ হিসেবে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হয়। তবে এ সম্বন্ধে গবেষণার মাল-মশলা যা কিছু ভারতের মধ্যে পণ্ডিচেরীতে আছে। এ কামান সংগ্রহের খবর অবশ্য ভারতীয় দৈনিক কাগজ ছাড়া ফরাসীদের দেশের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানও গ্রহণ করে বিতরণ করেছে। কিন্তু কোনও পক্ষেরই কিছুমাত্র আগ্রহ যে এই সহর বিষয়ে আছে বলে মনে হয় না। তাই ফরাসীদের পূর্ব্বতন এই ক্ষুদ্র উপনিবেশের অনেক তথ্যই রহস্যাবৃত থাকবে এবং যত রকমের জনপ্রিয় ইতিকথা ইতিহাসের স্থান নিয়ে পাঠক মহলকে বিভ্রান্ত করবে বলেই মনে হয়। পাঠকসমাজ এই সহরের তথ্য সন্ধানে আগ্রহ প্রকাশ করলে ইতিকথাকে পৃথক করা সম্ভব হবে।

অলু—দোহন—মানে তৃপ্তি। রাজা পৃথু মাতাকে ভূক্তি দান করেন। কেমন করে? মা চান মায়ের বৃকে যে শস্ত উৎপন্ন হবে সন্তানরা তারই সার অংশগ্রহণ করে নিকট অংশটুকু আবার তাঁকেই ফিরিয়ে দেবে। তাই নিয়ে মা আবার উৎকৃষ্ট অন্ন সন্তানকে দান করবেন। মহারাজ পৃথু মায়ের এই চাওয়া পূরণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম মাটির বৃকে হলচালনা করে শস্য বপন করেন। তারপর সেই উৎপন্ন শস্যের সারাংশ প্রজাসাধারণের মধ্যে বিলি করতেন আর নিকট অংশ পুনঃ শোধনের জন্য আবার মাটির বৃকেই প্রত্যর্পণ করতেন। এইভাবে জমির উর্বর-শক্তি বৃদ্ধি করেন। পরম পরিতৃপ্তা মা। সন্তানকে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করেন। মায়ের আশীর্বাদে পৃথুরাজা নারায়ণের অবতাররূপে পুজিত হন। পরিতৃপ্তা মাতা নিজের তাঁর পুত্রীক স্বীকার করে পৃথিবী নামে পরিচিতা হন। যাজ্ঞিক ঋষিবৃন্দ “পৃথিবী” এই নামটিকে স্থায়ী করার জন্য শাস্ত্র পুরাণ প্রভৃতি রচনা করেন। যুক্তিবাদীর দল যুক্তি দিয়ে তাহা স্বীকারও করে নেন। তাঁরা পৃথিবীর গুণাগুণ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ শুরু করেন। বিচারে তাঁরা দেখান, “পৃথিবী গন্ধের সমবায়িকারণ মাত্র। পৃথিবীতে নানাবিধ রূপ, ছয় প্রকার রস ও দ্বিবিধ গন্ধ আছে। পৃথিবীর স্পর্শ উষ্ণও নহে, শীতলও নহে, পরন্তু পাকজ। আবার নিত্য ও অনিত্যভেদে পৃথিবী দ্বিবিধ; পরমাণু স্বরূপে পৃথিবী নিত্য; তত্ত্বিয় সমস্তই অনিত্য। অনিত্য পৃথিবীমাত্রেরই অবয়ব আছে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে এই অনিত্য পৃথিবী আবার ত্রিবিধ। দেহ—যোনিজ ও অযোনিজ, ইন্দ্রিয়—জ্ঞান, বিষয়—দ্যগুণ হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত।” এইভাবে যুক্তিনিষ্ঠ হয়ে শাস্ত্রাদিতে পৃথিবীর নামের সঙ্গে রাজচক্রবর্তী মহারাজ পৃথু অমর হয়ে রইলেন।

এর পর থেকেই বহু নরপতি স্বয়ং হলচালনা করে যশস্বী হয়েছেন। রাজর্ষি জনক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই স্বর্ণ ত্রেতাযুগেই সূর্য্যবংশের ধারা ধরে অবতীর্ণ হন স্বয়ং রঘুপতি রামচন্দ্র। যাঁর রাজত্বকাল আজও মাহুকের কল্পনায় অগ্নরাজ্য হয়েই রইল।

কালে এই স্বর্ণ ত্রেতাযুগেরও অবসান হল। এল

দ্বাপর যুগ। ক্রমশঃ নরপতিবৃন্দের মধ্যে দেখা দিল মদ, মাংসর্ষ্য। রত্নগর্ভা ধরণীর অজস্র দানে রাজারা স্ফীত হয়ে উঠলেন। ধর্মবুদ্ধি লোপ পেল। দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার মাথা তুলে দাঁড়াল। অধ্যাত্মিক নরপতিবৃন্দের পদভারে ধরিত্রী মাতা কম্পিতা হলেন।

ত্রেতাযুগে ধর্মপরায়ণ রাজন্যবৃন্দের সেবা পেয়ে মায়ের যে হৃষ্টপুষ্টি কলেবর ছিল দ্বাপরের আরম্ভ থেকে ধর্মবুদ্ধি হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতা ধরিত্রীও ক্ষীণ হতে লাগলেন। “গোভৃদ্ধাশ্রমুখী খিলা”... (ভাগবত)। অবশেষে একদিন ধরণীর ক্রন্দনে পিতামহ বিচলিত হলেন। তিনি মাতা ধরিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেবগণের নিকট উপস্থিত হলেন। কিন্তু দেবতারাও মায়ের দুঃখ দূরীকরণে অসমর্থ দেখে পিতামহ সকলকে নিয়ে নারায়ণের স্তব করতে লাগলেন। স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ অবতীর্ণও হলেন। বলদৃষ্ট অশুরদের নিহতও করলেন, ধর্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার অমোঘ বাণীমন্ত্রও রেখে গেলেন গীতায়। কিন্তু মাতার দুঃখ দূর হল না। বরং অধিকতরভাবে মা আবার পীড়িতাই হতে লাগলেন। তার প্রধানতম কারণ যুগপরিবর্তন। কালচক্রের আবর্তে দ্বাপর যুগেরও অবসান হল। এল কলিযুগ—অবিদ্যাপ্রধান শূদ্রযুগ। এ যুগে মর্ত্যের মাহুঘ দেবতাদের প্রসন্ন করতে “পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ” কৌশল জানেন না। বিদ্যার প্রকাশপণ এ যুগে রুদ্ধ। অবিদ্যার প্রভাবে তাঁরা হতে চান দেবতাদের সমপর্যায়-ভুক্ত। আকাশের বৃক চিরে গ্রহচক্রের পশ্চাদ্ভাবন করে তাঁরা অবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন সত্য—কিন্তু তার ফলে দেবতা হচ্ছেন কুপিত। বায়ুমণ্ডল হয়ে উঠেছে বিষাক্ত। সেখানে হোমাগ্নির পূতবায়ুর সন্ধান আর পাওয়া যাবে না। নিশ্বাসে আর পবিত্র ও সুরভিত হবির্গন্ধ মিলবে না। বিষবাপ্তে অন্তরীক্ষলোক আপূরিত। তারই প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে মাটির বৃকে। মাতা ধরিত্রীর অসহায় সন্তানসন্ততি আজ আকর্ষ বিষপানে জর্জরিত। ব্যাকুলা বিহ্বলা মাতা আজ দিশাহারা হয়ে পড়ছেন কি দিয়ে তিনি আজ সন্তানকে রক্ষা করবেন? তাঁর বশত্বও যে আজ বিষ মিশ্রিত—বিজ্ঞানের সম্মোহনে। ভূ-বায়ু হতে অন্তরীক্ষ-বায়ু পর্যন্ত সবই আগবিক বোমার ক্ষুরে

পাত্র-পাত্রী

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এনা, হেনা, চেনা—তিনজনেই রূপসী। তিনজনেই যুবতী।

প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করে যুবক।...

এনা আর অশবে, হেনা আর বিকাশ, চেনা আর অরুণ।

তিন জোড়া যুবক-যুবতী কিন্তু একসঙ্গে বসে নি। এক-এক জোড়া এক-এক জায়গায় বসেছে।

প্রেক্ষাগৃহের আলো বুঝি এবার নিববে। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে সেগুলি।

অশেষ এবার কানের কাছে মুখ আনল এগিয়ে। তার স্বর বিরক্তিপূর্ণ : নাঃ, এ ভাবে আর চলে না! কতদিন নজরবন্দী হয়ে থাকা যায বলো দেখি ?

নজরবন্দী হয়ে যদি থাকতে চাও, আমি কী করতে পারি ? তুমিই তো ব্যবস্থা করার মালিক।

বিকাশ বলে হেনাকে : তোমাকে আমার চাই-ই। আর পারছি না...

কী পারছ না ?—হেনার সর্কোতুক উক্তি।

খুকী নাকি ? বয়স হল কত ?

উনিশ—হেনা হাসে : চলবে না ?

এদিকে অরুণ অমনয় করে চেনাকে : একবার পিছন ফিরে চাও লক্ষ্মীটি।

ওরে বাবা! আমি পারব না! চেনার স্বর ত্রস্ত।—মামা দেখছেন, এই তো ?

মামা দূর থেকে দেখছিলেন কিনা বোঝা গেল না। অরুণ ঘাড়টা ফেরাতে গিয়েই নিরস্ত হল। চেনার কোলে একটা চাপড় মেরে হেসে উঠল। তারপর

বিশদূষিত। এই বিষকে শ্বাসে শ্বাসে আকর্ষণ পান করে প্রাণবায়ুও আজ মুমূর্ষু—যত্নার কালো ছায়া আজ আপাদ-মস্তক আবৃত করে দিয়েছে। এই বিষকে গরাসে গরাসে পান করে কণ্ঠে ধারণ করার জন্ত কোথায আজ সেই

নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, যাই বলো, তোমার মামাটি কিন্তু একখানি চাঁজ! উনি কী ভাবেন বলো দেখি আমাদের সম্বন্ধে ?

আসলে যা তোমরা—তাই ভাবেন।

আসলে আমরা কি ?

প্রেক্ষাগৃহ ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সরকারী তথ্য-চিত্র দেখানো শুরু হয়েছে।

চেনা অরুণের গালে একটা টোকা মেরে বললে, ঞ্চাকা যেন! আসলে তোমরা কি—জানো না? কচি ধোকা! মামা সঙ্গে না এলে রেহাই দিতে ?

রেহাই দিছুম না তো, কী করছুম ?

কী করতে তুমিই জানো !

তোমার শ্রীমুখ থেকেই শুনি না !

হয়তো তুমি এ সিনেমাতে আসতেই না। অল্প কোথাও আমাকে নিয়ে যেতে। পরে রাস্তিরে ফিরে গিয়ে মামাকে বলতে—সিনেমা দেখে এলুম।

সাবাস! কী যেন ভাবল অরুণ। তারপর বললে, আসলে মামাই তো পাড়তে পারেন কথটা। অত ষড়-যন্ত্রের কী দরকার ?

তোমরাও তো তেমন সোদের-বোধের নও! তাই এই ষড়যন্ত্র! নইলে তোমাদের পক্ষ থেকে হলেই বা দোষ কি? তোমরা চাও—লুকিয়ে-লুকিয়ে প্রেম করবে, আর বিয়ে করতে বললেই হটে যাবে! মামা এসব কিছু বোঝেন না, না? কাঁচা ছেলে তিনি? তোমরা যাও ডালে-ডালে, মামা যান পাতায়-পাতায়, বুঝেছ? মামা যা-তা ছেলে নন!

সে তো দেখতেই পাচ্ছি!

আর-একবার সম্মুখে পিছন ফিরে চাইবার চেষ্টা করল

নীলকণ্ঠ। ক্রন্দনরতা মাতা বহুমতী ব্যাকুল কণ্ঠে তাই সেই নীলকণ্ঠের কাছেই মর্শ্বব্যথা নিবেদন করে বলছেন—

আগ হে পিনাকপাণি নীলকণ্ঠ জাগ গঙ্গাধর।

ধরার সজ্ঞাপ হর রক্ষা কর সন্তান শব্দর ॥

অরুণ। কিন্তু দেখবার তেমন সুবিধা হল না। মামা না দেখলেও আশ-পাশের দর্শকবৃন্দই এখন মামার জ্বলাভিষিক্ত। তাঁরা দেখছেন যুগলটিকে। আর বেশি বাড়াবাড়ি ঘটলে তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাত আশ্চর্যের নয়।

জন-গণ-মন অধিনায়ক গান শেষ হবার পরই দোতলার ব্যালকনি থেকে মামা নেমে এলেন। যেন ড্রিল-মাষ্টার...সরু লম্বা চেহারা। সকলকে একত্র করে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরবেন...

মামা এতক্ষণ রাস টেনে বসেছিলেন। উপর থেকে সব লক্ষ্য করেছেন। লক্ষ্য করবার জুই এসেছিলেন। এ একটা তাঁর অদ্বুত আনন্দ। টোপ বেলে রেখে বসে থাকা! মনোভাবটা এই: দেখা যাক না, কী হয়! পিছনে তো আমি আছিই।

প্রথম জীবনে দুটি মেয়ের লাশ-ঘরে যাওয়ার কারণ নাকি এই মামাই হয়েছিলেন। মধ্যজীবনটা অবশু তাঁর নিকটক হয়েছিল—চিকিৎসাবিহনে স্ত্রী মারা যাবার পর। স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে চাননি শ্যালকের উপর রাগ করে। শ্যালক নাকি এঁকে পাস্তা দিতেন না! বড় ফিল্ম-ডিরেক্টর বলে তাঁর অহঙ্কার ছিল।

সিনেমার টিকিট অবশু মামাই লোক দিয়ে কাটিয়ে এনেছিলেন। আর এমন হিসেব করে কাটিয়েছিলেন, যাতে জোড়ায়-জোড়ায় আলাদা বসতে পারে। এনা-হেনা-চেনা—এই তিনটিই তাঁর সব। তাঁর ভাগনীরদ্ব। তাঁর হাতের পাশা। এদের নিয়েই সংসার। সবাই এরা আজ বিবাহযোগ্য। মামা জীবনে অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছেন। অনেক রকমের ব্যবসা করে হাত পাکیয়েছেন। পয়সাও করেছেন প্রচুর। আর সে-পয়সা তাঁর কেঁপে উঠেছে দেশ আধীন হওয়ার পর। বর্তমানে তামাকের ব্যবসাটি তাঁর একচেটে। ভিতর ভিতর আরো কত কি ব্যবসার টাকা লগ্নী করেছেন, সে খবর আমাদের অজ্ঞাত। মামার নাম অবন্তীকুমার নন্দী। কিন্তু সই করেন অবন্তী নন্দী বলে। তাতে অনেক সময় সুবিধা হয় কাজের। অনেকের বিভ্রান্তিও তাঁর মনে জটিল হাশ্বোদ্ভেক করে। দুটি মাত্র তাঁর মুদ্রা-দোষ

আছে। সময়-সময় হ্রেষাধ্বনিবৎ একটা আওয়াজ বার করা গলা থেকে। আর বাঁ-চোখের পাতা নাচানো। এমন অবলীলাক্রমে বাঁ-চোখের পাতা কেউ নাচাতে পারে, মামাকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন!

এ ক্ষেত্রেও মামা হ্রেষাধ্বনি করলেন। বাঁ-চোখের পাতাটিকে অস্থির করে তুললেন।

দিন কতক আগে পর্যন্ত মামা জানতেন না, অশেষ বিকাশ আর অরুণের মতো ছেলের পদম্পর্শ ঘটবে তাঁর বাড়িতে। কিন্তু এই যে ঘটছে, এর জন্ম তিনি যতখানি না সম্বোধ, তার বেশি মতর্ক। সাংসারিক অভিজ্ঞতা তাঁকে এ-জ্ঞানটুকু দিয়েছে—বর্তমান ছেলেদের মতি-গতি কী। অবশু এদের আহ্বান করতে হয়েছিল তাঁকে একদিন মনোজ রায় মারফৎ। মনোজ রায় একজন তরুণ ব্যারিষ্টার। তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। অবন্তী যখন বিস্মিত হয়ে শুনলেন, মনোজ রায় বিলেত থেকেই বিবাহকর্মটি সুসম্পন্ন করে এসেছেন, তখন তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তিনটি বাছা বাছা সুবিবাহিত স্মার্ট যুবকের সম্মান দিতে। যারা দরকার পড়লে কোচ করতে পারবে তাঁর তিনটি ভাগনীকে।

মনোজ রায়ই এনে ঢেলে দিয়েছিলেন এই তিনটিকে: অশেষ, বিকাশ আর অরুণকে। অশেষ ইঞ্জিনিয়ার, বিকাশ অধ্যাপক, অরুণ ডাক্তার।

বয়সের অসুপাতে ভাগনীরাও যে যার নিজের নিজের বন্ধু টিক করে নিবেছিল। কিন্তু ভাগনীদের উপর মামার আদেশ ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত এরা না সম্মত হয় বিবাহে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যেন না শৈথিল্য প্রকাশ করে। এ জগৎ বড় খারাপ জায়গা।...

মামার গুণমুখী ভাগনীরাও তাতে সম্মতি দিয়েছিল। মামা নিজেই তাই খবরদারি করতে ছুটতে পিকনিকে, সিনেমা-থিয়েটারে, গানের জলসায়, নিউ এম্পায়ারের 'শ্রামা' নৃত্যনাট্যে।

আজো ছুটে ছিলেন.....

পরেও হয়তো ছুটতেন। কিন্তু দেখলেন একদিন,

পাত্রদের অভিসন্ধি বিশেষ সুবিধার নয়। সকলেই চায় একটু স্বাধীন স্বাবলম্বীভাবে বেড়াতে—তার ভাগনীদের নিয়ে। কেউ যেতে চায় গ্র্যাণ্ডে, কেউ নৌকাভ্রমণে, কেউ শালারজং মিউজিয়াম, হায়দারাবাদে। এ প্রস্তাবে আমার কোনো মমত্ব নেই। তিনি রাজী হবেন কেমন করে? বার কয়েক হেঁচাধ্বনি করলেন।

ভাগনীদের এক এক করে ডেকে বললেন, জিগ্যেস করুন অমুককে সরাসরি—বিয়ে করবে কি-না। যদি বলে হ্যাঁ, কাগজে লিখিয়ে নিবি। আমি চাই বিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে ওসব শর্ত-ফর্তের ধার ধারি না।

বাঁ-চোখের পাতাটিকে মামা স্থির করে তুললেন।...

ভাগনীবী সকলেই স্বাস্থ্যবতী। মাসের মধ্যে ছুবার তাদের বডিস বদলাতে হয়। মনোমতো পাত্র পেলে কে না চাষ বিয়ে করতে? কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যেও কারো পক্ষ থেকে যখন লিখিত সম্মতি এল না, মামাও চললেন মাস তিনেকের মতো কলকাতার বাইরে। সঙ্গে নিয়ে ভাগনীদের।

ইতিমধ্যে অশেষ বিকাশ অরুণ—নিজদের মধ্যে একটা মিটিং ডাকল। তারা প্রস্তাব করল, ওই তিনটিকে কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না। অতএব গণতান্ত্রিক ভাবে তারা মার্চ করতে করতে সোজা মামার কাছেই যাবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

গেলও একদিন। কিন্তু একি কথা শুনি আজ...

মামা তখন কোথা? তিনি তো বাড়িতে দারোয়ান বসিয়ে চলে গেছেন বিদেশে। কোথায় গেছেন—খোলাখুলি কাউকে বলে যাননি। এমন কি, একটা ভাগনীকেও রেখে যান নি যে, অশেষ বিকাশ অরুণ এলে এক কাপ চা করে দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করবে।

অনেক পীড়াপীড়ির পর দারোয়ানের পক্ষ থেকে জবাব এল: তিন মাস পরে আপনারা আসবেন বাবুরা সব।

অশেষ বিকাশ অরুণ—পরস্পর মুখ চাওয়া চাষি করতে লাগল। বলে কি ব্যাটা? আমাদের প্রেক্ষিজ যে টিলে করে ছেড়ে দিল! ইতিমধ্যে আমরা বিয়ে করতে পারি না? আমরা বিকলাঙ্গ?

অরুণ বললে, বিকলাঙ্গ তো বটেই! নইলে প্রমাণ দেখাও। বিয়ে করো অন্ত্র।

বিকাশ বললে, আরে কোর্টশিপ করতেই তো তিন মাস লেগে যাবে! বিয়ে করো অন্যত্র—বললেই কি করা যায়? একটা ফিল্ড যখন জিয়েট করেছি, মামা ব্যাটা বানচাল করে দিল। নাঃ, আর এখানে নয়।

অপর দুজনও সমস্বরে প্রতিজ্ঞা করল, নাঃ, আর এখানে নয়। এই নাকে খং, কানে খং... ..

কিন্তু খং দিলে কি হবে, আবার মিটিং বসল অশেষ বিকাশ আর অরুণের মধ্যে। তিন মাস পরেই।

অশেষ নাকি তর্কে তর্কে ছিল। দারোয়ানকে মোটা বকশিশ কবুল করার ফলে খবরটা সে পেয়ে গিয়েছিল যথাসময়ে। অনুচা অবস্থায় তিন বোন ফিরেছে।

তিন পাত্র আজো অবিবাহিত। বাধা পেয়ে আরো তারা অধৈর্য, ব্যস্ত, মার্চ করার ব্যাপারে উৎসাহী।

মার্চ করতে করতেই তারা মামার কাছে এসে অবতীর্ণ হল।

মামা তখন দরজা আগলেই, বসেছিলেন। পাক্স ব্যবসায়ী হওয়ার ফলে যুবক তথা মহুগুচরিত্র তাঁর নখদর্পণে। ইতিমধ্যে বাজার দরেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

মামা হেঁচাধ্বনি করলেন। বাঁ-চোখের পাতা নাচালেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, কী চাও?

আমরা কথা দিতে এলুম—বিয়ে করব। তিনজনেই সমস্বরে বললে।

মামা আবার হেঁচাধ্বনি করলেন। বাঁ-চোখের পাতা নাচালেন...

অশেষ বিকাশ অরুণ ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল। মামা বাধা দিয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

একটু দেখা করব।

না। মামার বাঁ-চোখের পাতা নাচতে শুরু করল। আবার তিনি হেঁচাধ্বনি করলেন। করার পর একখানি করে নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করলেন তিনজনের হাতে।

নিমন্ত্রণ-পত্রের সারমর্ম: একই দিন তিন ভাগনীর বিয়ে—অমুক অমুক পাত্রের সঙ্গে। অশেষ, বিকাশ,

যখন বহিবেনা ভাগীরথী

শ্রীজলধর বিশ্বাস

যখন বহিবে না ভাগীরথী
প্রতি ধরে তীব্র ধ্বনিবে অনল ; দাবানলে
তস্মীভূত হবে হিমালয় ; প্রলয় ঘটাবে অগ্নি
বিস্ফোচল জুড়ে ; জলে পুড়ে হারথার হইবে
জগৎ ; পাহাড় পর্বত যত এটনায় হবে পরিণত ।
অবিরত উদগারিবে উদগ্র অজস্র আভাম্বী
জলন্ত অঙ্গার দুর্গিবার ফুজিয়ামা । গতভ্রাস
নিদ্রাতঙ্গ ক্রোধে প্রতিরোধ অবহেলা করি
ধরি রণ-চণ্ডিকার বেশ মুক্তকেশ হইবে ধাবিত
উরালের দিকে । চতুর্দিকে বিস্তার করিয়া

প্রবল প্রকোপ

যুরোপ করিবে সে গ্রাস । দেবতা-নিবাস আলসের
অন্তমিত গৌরব কাহিনী জানি মুষ্টিমেয় ভস্ম রেখাকারে
হবে পরিণত । অসংযত আরবের মরুরাশি হাসি হাসি
হবে অগ্রসর ভূমধ্য সাগর-জলে মিটাইবে জ্বালা ।
গোবি করিবেক গ্রাস প্রাতরাশ সম সমগ্র উদগ্র চীন ।
দীন আফ্রিকার হবে দুর্গতি ; দুর্গতি সাহারা কারামুক্ত
হৃদয় উল্লাসে উর্ধ্বশ্বাসে যাবে সাগরিকা কূলে ।

তন্নী আমেরিকা

এটমাগ্নি লয়ে আপনার চিতাশয্যা করিবে রচনা
স্বলোচনা । প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হতে কোনমতে
ঝাঁচাইতে দগ্ধ দেহখানা আনমনা উর্ধ্বলোকে
উদ্ভ্রাস্তের মত অব্যাহত থাকিবে ছুটিতে । তবে ভবে
রশ-বেহঁস বিহ্বলগতি বিদ্যুৎ লুটিকে । ফিকে হয়ে

যাবে অনন্ত আকাশ : প্রকাশ হবে না রবি

প্রধূসিত ধূমে ।

মরুভূমে হবে পরিণত নর্মদা কাবেরী কৃষ্ণা তৃষ্ণাক্রিষ্ট তীর্থঙ্কর
কঙ্কর পাইবে শুধু গোদাবরী ঘাটে । ঘর্মান্ত ললাটে
ফোরাতে তীরে, পড়িতে নমাজ হজ-প্রার্থী
পাবেনাক' জল অবিচল নিষ্ঠাপহ করিবারে উজ্জ্ব ;
ধ্বজ দীর্ঘ-ধ্বজ-বিশ্রেণী দেবেনাক' ছায়া । ক্ষীণকাষা
জর্ডানের জল হবে না বাহিত আর ক্যান্টারবারি
চার্চে সূচচিত ভূঙ্গারে তরিয়া । আনত করিয়া বিশপ
ঢালিবে না স্রবিসল-ধারা আশ্রহারী উৎসবমুখর

অভিষেককালে দীপ্তভালে দিবে টিপ রাজরাণী শিরে ।
শাস্তিনীরে করিবে না স্নান । ওবি ইনিসি লেনা কেণাময
কণি তুলে উদগারিবে বিষ অহর্নিশ । বিধবংসী ইয়াংসি
দংশিবে আপনজনে প্রাণপণে হোয়াংহোকে করি সঙ্গে ।
ফেনিল উৎসঙ্গে আমাজান মিসিসিপি হবে উলঙ্গিনী

বিবশা রঙ্গিনী ।

বাডব অনলে হবে প্রজ্জ্বলিত সমস্ত সাগর । বালুচর কিছু
পড়িয়াছে ভাগীরথী মুখে অতিদুঃখে বাঁধ কারাক্ষার
অপেক্ষা করিয়া সরিয়া পড়েছে তীব্র অজস্র ধারায় হায় !
ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের প্রকোপে । তোপের সমুখে
বুল-ডোজারের শেষ আক্রমণ খনন করিয়া পথ করিতে
বিস্তার ব্যর্থতার হবে নিদর্শন । দেশব্যাপী বন্যার প্রবাহ
মাতৃস্নেহ অপবিত্র করি ফিরিবে না আর
হৃদয়-গঙ্গার হিমবিধু মুক্তা ধবল-তরঙ্গে ।

অরণ এরা কেউ নয় ! এরা বরবাদ । ইঞ্জিনিয়র,
অধ্যাপক, ডাক্তার—কেউই যোগ্য পাত্র নয় । এদের
সব ছারিছুরি ব্যর্থ হয়ে গেছে বর্তমান সমাজব্যবস্থার
কঠিন জীবন-সংগ্রামের কোটিপাথরে ।

তাহলে যোগ্য কে ?...

অশেষ বিকাশ অরণকে পরে স্বীকার করতে
হয়েছিল আমার দূরদর্শিতা ।...

বাজারের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে ।...

কে যোগ্য—বিষের দিনই মামা প্রমাণ করলেন ।
পরিচয় দিলেন পাত্রদের । বডটি চাউল-আড়তদার, মেজটি
(সরিষার) তেলকল মালিক, মেজটি মৎস্য ব্যাপারী...।

সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার ফলে জনগণমন-অধিনায়ক
সরকার এদের প্রতি প্রসন্ন । এদের বনিয়াদ যে পাকা—
সেটা আজ কারো অবিদিত নয় ।



তিরিশে ভাদ্র

শ্রীউমাপদ নাথ

পূর্ণ জ্যোতির্ময় ! তুমি এলে এই পুণ্য পূর্ণমাসে,
তোমার আলোক-লোকে উদ্ভাসিত এ-ত্রিলোক তামে
আপ্তির আনন্দরসে। জীর্ণকঙ্ক-গায়ের বৃদ্ধা এই
পৃথিবী কেঁপেছে শীতে, রক্ত অস্থি শুক বায়ুতেই
হয়েছে নীরস শিন্ন : সাহারা-প্রকৃতি-লীন মনে
সেই যুত্মমুখী দিনে অমৃতের প্রাবলী সিকনে

তুমি এলে মর্ত্য-পরে। জীবন-নায়করাজ ! তব
প্রযুক্তি-মূহুর্তে আজ গর্বতরে মোরা নত হব।

লোকবর্ষে সাত্তান্তরে তোমার এ পুণ্য পদপাত
গণি মোরা, বর্ষান্তর হে প্রথম সৃষ্টির প্রভাত !
বিরিট অজ্ঞেয় হতে কৃপা করে জ্ঞেয় হয়ে আস,
যাচিয়া কাঙাল সেজে মাহুঘেরে আগে ভালবাস ;
লোকবর্ষে পেয়ে লোকে তুচ্ছ করে তোমার সে দান—
অহংকারে ফিরে দেয় মৃতপ্রায় তার কাম্য প্রাণ।
তথাপি তোমার মূল্য ধরা পড়ে—কাছে আসে যারা
তোমার কণিকা পেয়ে ভ'রে উঠে : গান গায় তারা।

তোমার যে কত আছে—তুমি জ্ঞান, যা দিয়েছ তা-ই
অঞ্জলি উপচে পড়ে—আর নেব, তার ঠাই নাই।
জগতের স্রষ্টি-স্বধা, সকলের তরে মহাপ্রাণ
তোমার যজ্ঞের হবি। এ বিশ্বের তুমি মূর্ত জ্ঞান
অমুকুলচন্দ্র তুমি, সর্বপ্রাণ-অমুকুল বিহু,
অনন্ত বছর ধরে অস্থ দেহে থাকো তুমি প্রভু !
এ তিরিশে ভাদ্র থাক অনন্ত জ্যোতির মতো হ'য়ে
চিরস্থির দিনরূপে : ধরা ধস্ত হোক পদ ব'য়ে।*

* সংসদেব অধিবেশন। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অমুকুলচন্দ্রের
জন্মতিথি তালনবমী—তারিখ-৩০-এ, ভাদ্র। এ বৎসর তারিখ ও তিথির
সংশ্লেন পরম তাৎপর্যপূর্ণ। কবিতাটি এই উপলক্ষ্যে লিখিত।

প্রতিমা

শ্রীবংশী মণ্ডল

তোমার সৌন্দর্য্য দ্ব্যতি যুগান্তের-ভীরে
আকিয়ারে প্রাণপুষ্পে মূর্তি অযমার
রচিয়া গানের ব্যাধা শত অক্ষনীয়ে
একটি সুরের ছন্দে গাহে বার বার।

প্রেমের করুণ গন্ধে দিনের ধরণী
চলমান পথে পথে ফুটাল কুহুম
রয়েছ কোথায় প্রিয় আলোক বরণী
আজি কি প্রভাতী সুরে ভাদ্রে নাই ঘুম ?

হেথায় পেতেছি আমি পুতুলের খেলা
আবার গড়েছি প্রিয় পাষণ প্রতিমা
আশার ছলনে তবু কেটে যায় বেলা
খুঁজিয়া পাইনি আজো অসীমের সীমা।
একবিন্দু গন্ধে তাই একের অঞ্চলে
দিও গো সেধায় ঠেলে আমি যাই চলে।

আগমনী

গান

মাগো তুমি এসো আমার
শিউলি-ঝরা দিনে,
আগমনীর গান বেজেছে
আমার মনোবীণে ।
শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসে
অরুণ আলোর বিম্বু হাসে,
বুক পেতে সে নেবে তোমার
চরণ ছুটি চিনে ।
কমল বনে সুপ্ত কলি
অলির পরশ পেয়ে
নীল সরসীর বুকে ফোটে
তোমারি পথ চেয়ে ।
ঐ যে শাদা মেঘের মেলা
আলোর সাথে করে খেলা,
এমন ক্ষণে রাখবে কি মা
তোমার আশীষ বিনে !

স্বরলিপি

কথা—ত্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—ত্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

II পা পা -া | মা -পা | জ্ঞা -মা I পা না -র্সা | ধনা -র্সনা | ধা -পা I
মা গো ০ তু ০ মি ০ এ সো ০ আ ০০ মা রু

না -র্সা র্সা | র্সা -া | রা -র্সনা I না -র্সা -া | -না -ধা | -পা -া I
শি উ লি ঝ ০ রা ০০ দি নে ০ ০ ০ ০ ০

না না -র্সা | র্সা -া | র্সা -া I না -র্সা না | দা -দা | পা -া I
আ গ ০ ম ০ নী রু গা নু বে জে ০ হে ০

পা পা -পা | ধা -া | পা -ধপা I মা গা -া | -া -া | -া -া II
আ মা রু ম ০ নো ০০ বী গে ০ ০ ০ ০ ০

II পা পা -ণা | মা -পা | জ্ঞা -মা I পা না -সী | সনা -ধনা | সী -ণা I
শি শি র্ তে ০ জা ০ স বু জ্ ঘা ০ ০০ সে ০

সী -সী -জ্ঞা | রা -রা | -সী -ণা I সী -রা সী | সনা -ধনা | সী -ণা I
অ র্ গ্ আ ০ লো র্ বি ন্ ছ হা ০ ০০ সে ০

পা -গা গা | গা -ধা | গা -ণা I সী গসী -গা | ধা -ণা | পা -ণা I
বু ক পে তে ০ সে ০ মে বে ০ ০ তো ০ মা র্

পা পা -গা | ধা -পা | মা -গা I মা পা -ণা | -ণা -ণা | -ণা -ণা II
চ র্ গ্ হ ০ টি ০ চি নে ০ ০ ০ ০ ০

II সা -সা -মা | মা -ণা | মা -ণা I মা -পা পা | মধা -পমা | জ্ঞা -ণা I
ক ম ল্ ব ০ নে ০ স প্ ত ০ ক ০ ০০ লি ০

জ্ঞমা জ্ঞা -মা | রা -সা | সা -গা I সা -রা -ণা | -ণা -ণা | -ণা -ণা I
অ ০ লি র্ প ০ র্ শ্ পে রে ০ ০ ০ ০ ০

রা -মা মা | মা -ণা | মা -ণা I মা মা -পা | পা -ণা | পা -ণা I
নী ল্ স র ০ গী র্ বু কে ০ ফো ০ টে ০

পা পা -গা | ধা -পা | পা -ধা I জ্ঞা পা -ণা | -ণা -ণা | -ণা -ণা I
তো মা ০ রি ০ প থ্ চে য়ে ০ ০ ০ ০ ০

পা -ণা পা | মা -পা | জ্ঞা -মা I পা না -সী | সনা -ধনা | সী -ণা I
ঐ ০ যে শা ০ দা ০ মে যে র্ মে ০ ০০ জা ০

সী সী -জ্ঞা | রা -ণা | সী -ণা I সী -রা -সী | সনা -ধনা | সী -ণা I
আ লো র্ সা ০ থে ০ ক রে ০ থে ০ ০০ লা ০

পা -গা -ণা | গা -ধা | গা -ণা I গা -সী গা | ধা -ধা | পা -ণা I
এ ম ন্ ক ০ পে ০ রা থ্ বে কি ০ মা ০

পা পা -গা | ধা -পা | মা -গা I মা পা -ণা | -ণা -ণা | -ণা -ণা IIII
তো মা র্ আ ০ গী ব্ বি নে ০ ০. ০ ০ ০

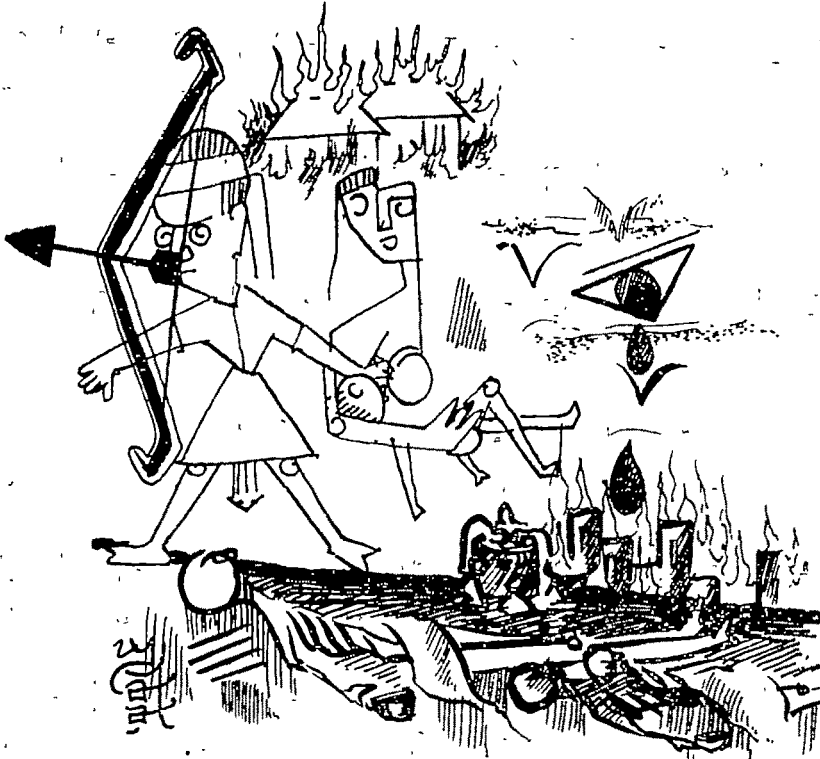
অমর বাঙলা

প্রবীর বিশ্বাস

আমারে দেখাও তম ?
জানো না আমার পাঁজরে পাঁজরে
বজ্র তৈরী হয় ।
শঙ্কর মোর শিয়র প্রহরী
ঘটায় মহা প্রলয় ।
শাক্ত আমরা রক্ত পুঞ্জায়
আমার ধোয়াই পা,—
বুড়ো শিব মা'র পাবের তলায়
দেখনি তুমি কি তা ?
শোন নি কবির কথা,
বাংলার শিশু “ব্যাত্রে-বৃষভে
ঘটাবে সমন্বয় ।”
আমার মৃত্যুভয় ?
বাংলার ছেলে আমি
বার বার আমি উঠেছি জাগিয়া

জন্মভূমিরে নমি' ।
আমার চেতনা ঝড়
তেঙেছে কারার লোহ-প্রাচীর
অত্যাচারীর গড় ।
আমারই পুণ্য প্রেমে
পতিতপাবন নরনারায়ণ
ধূলায় এসেছে নেমে ।
আমার কি আছে কন্ম ?
মৃত্যুর মাঝে আমি অমৃত
উদ্ধিত বরাভয় !
আমার মৃত্যুভয় ? !
শোননি কাহিনী মোর :
রোগ-শোক-জরা গৃহিণী সাজিয়া
হেঁসেলে রয়েছে বসি' ।
মহামারী মোর প্রথম প্রশয়ী

হু' চোখে মরণ হাসি ।
দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল সঙ
চৈতি গাঞ্জে নাচে,
জীবন ঢাকে মরণ বাজনা
হাড়ের কাঠিতে বাজে ।
ঘৃণিপাকের ঘুবন্ চরুকা
যৌবনে পরিচয় ।
আমার মৃত্যুভয় ?
গ্রীষ্ম আমার ভরা ফসলের
ঝলসে দিয়েছে মাঠ ;
ঋশানে-কবরে আমরা হাজারে
বসিয়েছি নয়্যা হাট ।
কত কত ভাই দিয়েছে রক্ত
কত বোন দিল মান,
কত বধু দিল শাখা ও সিঁদুর,—



“মরণ ধনুকে দুখের ছিলায় জীবনের তীর ছোঁড়ে” ।

কত মা'র চোখে বান।
কত কত ঝড় কত না ঝঞ্ঝা
হুখোগ হুবার
মারি ও মড়ক-মধুস্বরে
এনেছে যে হাহাকার।
অমর বাংলা তবু আছে বেঁচে
অক্ষ-অব্যয়।
আমার মৃত্যু ভয়?
বাংলার ছেলে ওরে—
মরণ ধনকে হুখের ছিলাম
জীবনের ভীর ছোঁড়ে।
পিশাচের অট্টাল
হা-হা ক'রে যদি কাঁপায় বাতাস

হবে না সর্বনাশ!
বাংলার ঘরে ঘরে
বীর বিপ্লবী মহাসেনাদল
ছোট ছোট ঘাঁটি গড়ে।
মহা ভাঙনের যুগে
লাখ লাখ মুখ মুখে
শোননি কি তুমি
জন্মভূমির মন্ত্র উচ্চারণ?
দেখনি মোদের পদতরে কাঁপে
পিরি-নদী-উপবন।
জন্মে আমরা জীবন যুদ্ধে
মৃত্যুর মুখোমুখি

সদিন হাতে দৈনিক হ'য়ে
বার বার আসি কুখি'।
মৃত্যুকে দিই পিছনে হটিয়ে
চালিয়ে রক্ত রথ,
ভেঙেচুরে চলি বাধা-বন্ধক
কণ্টক প্রাণ পথ।
সুখ-দুঃখের অতীত আমরা
সর্বহারার দল
অঙ্গে মেখেছি ধুলার বিভূতি
তিনয়ন উজ্জল!
আমারে দেখাও ভয়?
আনো না আমার পাঁজরে পাঁজরে
বজ্র তৈরী হয়!!

পূর্ণ হোক এই নিবেদন

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

উৎসব প্রাদর্শের পতঙ্গের প্রাণ বিসর্জন,
দিনের অনেক আগে যেমন পৃথিবী পর্যটন
শেষ করে চুপিসারে সেবে নেয় আত্মসমর্পণ।

লখিম্বর মরে গেলে বেহলা যেমন গাঙ্গুড়ের
জলে কলার ভেলায় বসে ব্যাধা-ভরা ছদয়ের
অরে কাতর — মিনতি করে মৃত-পতি জীবনের।

তেমন মঙ্গলকাব্যে সাম্প্রতিক কবিদের মন
ঈশ্বরের কণালাভে পূর্ণ হোক এই নিবেদন।

ভারতের মর্মমাঝে উচ্ছিষ্টের স্বাধীন দানব
রামলীলা রাজত্বের ধ্বজাতলে যোলটা বছর
আশা করে বসে আছে—হাই চাপা আগুনের আচে
ভাঙা কুলোর বাতাস। বাঙালীর ছেলেমেয়ে সব
ক্রীতদাস হবে আর কত কাল অপর নির্ভর
হাতে খুদী হয়ে বসে রবে “সব পেয়েছির ঘাঁচে!”

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক ; সম্পূর্ণ ; নির্ভরযোগ্য
বুক বাইণ্ডিং কারখানা।
পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয়
বাধাই কাজ সম্বন্ধে ও অলভে সম্পন্ন হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
১৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২

ডি.রতন ঙ্গ কোং

ফটোগ্রাফার্স



২২১, কণওয়ালিস ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪ - ৩৭১১

সাহিত্যিক

পনেরই আগষ্ট :

পনেরই আগষ্ট জাতির জীবনে নানা দিক দিয়া তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবর্তক সজ্জ জীবনের বিচিত্র পার্শ্বপেয় মধ্যে উৎসবময় এই দিনটি বিশিষ্ট স্থানাদিকার করিয়া আছে। বিগত ১৫ই আগষ্ট সজ্জ তার অনিষ্ট প্রতিহু-সম্মত এই দিনটি প্রতিপালন করে। প্রাতে আশ্রম প্রাঙ্গণে চন্দনগরের মহকুমাপালক শ্রীনারায়ণ সেন শুভ শঙ্খধ্বনি ও 'বন্দেমাতরম্' গীতমুখর পরিবেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং শহীদ বেদী-মূলে মালার্পণ করেন। সজ্জ-সহসভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ভারতের শুদ্ধ-সিদ্ধ অর্থ জাতীয়তাব পরিপোষক সজ্জকল্পিত সজ্জ বাণী পাঠ করেন এবং উপস্থিত সবাই তিনবার ইহার অনুবৃত্তি করেন। অতঃপর চন্দন-নগরের পুরপালক শ্রীঅনিলকুমার ঘোষের পৌরোহিত্যে বৃক্ষ রোপণ উৎসব শিল্পসম্মতিব সহিত স্তম্ভপন্ন হয়। ইহার পর সজ্জাচার্য পণ্ডিত সূর্য-নারায়ণ তর্কতীর্থের ঋত্বিক্তে সাবহৃত দীক্ষাযজ্ঞের মাধ্যমে প্রবর্তক চতুষ্পাতিব নব বর্ধারস্ত-অমুষ্ঠান হয়। এই দিন অপরাহ্নে সজ্জমন্দিবে শ্রীঅবিন্দ-জন্মোৎসব নিবিড় নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। অধ্যক্ষ শ্রীঅমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই উপলক্ষে অমুষ্ঠিত সভায় পৌরোহিত্য করেন। সভাপতি শ্রীমুখোপাধ্যায় এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে জড় বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস ধারণার বিশদ বিশ্লেষণ করেন। সম্মত, আবৃত্তি, প্রবক্তা পাঠেব মধ্য দিয়া যুগধি শ্রীঅরবিন্দের জীবন বাণী স্মরণ-অমুষ্ঠান করা হয়। পূর্ণ প্রশস্তি মস্ত্রে এই পূণ্য দিনের অসমাপ্তি হয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রশান্ত মহাসাগর পারাপার :

ওয়াশিংটনের স্মিথসোশ্পিশন ইনস্টিটিউশন সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহাদের হাতে এমন সব মূল্যবান প্রমাণ আছে যাতে অনুমান করা যায়, 'খৃষ্ট জন্মের তিন হাজার বৎসর আগের মানুষ এশিয়া হইতে আমেরিকায় যাতায়াত করিত এবং তাদের সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করিত। আমেরিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের অপেক্ষা এশিয়ার

সংস্কৃতি অনেক উন্নততর ছিল। একদা এই ভারতবর্ষ বিশ্বকে আলো দেখাইয়াছিল এ সাক্ষ্য ভারতের পুরাণাদি শাস্ত্রে এখনও বিদ্যমান।

পরলোকে ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত :

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও আইনবিশারদ ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গত ১৯-এ সেপ্টেম্বর পরিণত ৮৩ বৎসব বয়সে তাঁহার কলিকাতায় বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আইন বিশেষজ্ঞ হিসাবে নরেশচন্দ্র শুধু ভারতই নয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। বহুবার তিনি বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইন অধ্যাপকও ছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রাচীন ভারতীয় আচার ও সমাজনীতি বিষয়ে গবেষণা করিয়া তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। সাহিত্যিক হিসাবে ডাঃ সেনগুপ্তের নাম বাঙালী মাঝেরই নিবট হুবিমিত। গল্প-উপন্যাস মিলাইয়া আর ৬০খানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকখানি বইয়ের চিত্রকণ বিশেষ সমাদর পাইয়াছে। প্রবর্তক সজ্জের তিনি বরাবরই স্নেহ ও শুভামুখ্যাবী ছিলেন। প্রবর্তক জুট মিলসেব আরম্ভ হইতে ডাঃ সেনগুপ্ত শুধু ডিরেক্টরই ছিলেন না, নানাভাবে সাহায্যও করিয়াছেন। ডাঃ সেনগুপ্তের প্রথম যুগের উপন্যাসের মধ্যে 'পরিণাম'-এর প্রকাশক ছিল প্রবর্তক পাবলিশার্স। এই সজ্জমিত্রের বিগত আত্মাব উর্দ্ধগতি কামনা করি।

বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা চলে না :

১৭ই সেপ্টেম্বর আংকারার আনাতোলিয়ান নিউজ এজেন্সির এক সংবাদে প্রকাশ, ক্রীমতী ফতেমা দুইটি বসন্ত সন্তানের জন্ম দিয়াছেন, ক্রীমতীর বয়স্ক্রম ৯৫ বৎসর ও তাহাব পতির বয়স ১২৭ বৎসর। ক্রীমতীর নাতি, নাতনী ও তন্ত নাতি-নাতনীর সংখ্যাও প্রচুর।

প্রবর্তক ফার্মিশাসে' বিশ্বকর্মা পূজা :

বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে গত ৩০-এ তারি অপরাহ্নে প্রবর্তক ফার্মিশাসে'র ট্যাংরা রে'ড'ই কারখানায় ফার্মিশাসে'র হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে কক্ষিগণেব এক মনোজ্ঞ ক্রীতি-অমুষ্ঠান হয়। প্রবর্তক ফার্মিশাসে'র প্রতিষ্ঠাতা সজ্জক শ্রীমতিলালের পুষ্পমালা বিশোভিত পটচিত্রের সম্মুখে বস্মিবৃন্দ সমবেত হন। সচন্দন ধূপ-গন্ধ-দ্রব্ধিত আবহাওয়া নিষ্ঠা ও অস্বস্তিকতার প্রদম্মী ধরিয়া সবাই চিত্ত স্পর্শ

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্বাবধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সস্তার

সন্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্মল : পিরামিড : অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

রানমলক্ষ্মী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

প্রখ্যাত ক্রোডাবিদ ও সাহিত্যিক

শ্রীমুশীলপ্রসাদ সর্কাদিকারী প্রণীত

স্মৃতি-আলেখ্য

স্মৃহুৎ গ্রন্থ। বহুল চিত্র সম্বলিত বাংলার অর্ধ শতাব্দীর অস্তরঙ্গ আলেখ্য। দাম্পত্য জীবনের উন্নত উজ্জল রসের অল্পম আবেদন। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

করে। অমুঠানে পোরোহিত্য করেন আনন্দবাহার পত্রিকার প্রত্নাগারিক হুপতিত শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত। সভায় শ্রীতি সম্ভাষণ জানান শ্রীতারাক্ষর বন্যোপাধ্যায়, কবি বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়ক ও প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী। সভাপতি এক সংক্ষিপ্ত স্বরসংগ্রাহী ভাষণ দেন। উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত করেন শ্রীমতী আরাবনা গুপ্ত। পরিশেষে সবাইকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীশ্রীদেবীমাতা ও শ্রীশ্রীশক্তিমাতা :

গত ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মাতৃকাস্তম-প্রণব সঙ্ঘ (১৫ বি, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬) সর্বজন প্রত্নেয়া মাতাজীময়ের জন্মতিথি প্রতিপালিত হয়। মাতাজীদের প্রধান অমুগামী আশ্রম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা যোগিস্রেষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। নেপাল-ভিত্তিক ইত্যাদি দেশবিদেশ ভ্রমণ কালে ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের জন্তে লুপ্ত-ভুপ্ত মনস্তাত্ত্বিক, যৌগিক ও সূর্য রশ্মি বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াগুলির পুনরুদ্ধার ও জনকল্যাণে প্রচার-প্রয়োগ মাতাজীময়ের স্রবণীয় অবদান। পর দিন বহু শুভ সনাক্ষে নিবিড় নিষ্ঠার সঙ্গে পিতাজী মহারাজের ৮৯ তম জন্মতিথি পালিত হয়।

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি :

প্রতি বৎসর পৃথিবীতে লোক বাড়িতেছে হয় কোটি পাঁচ লক্ষ। রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক এন. ডাভলেষ্টান জিওগ্রাফিকাল কংগ্রেসের বিশেষতম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অসম্ভবস্বরূপ ভূ-বস্তুতে বৎসরে দুই-শতাংশ করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সংবাদটি আনন্দের নয়—আতঙ্কের।

পরলোকে নীতিশচন্দ্র লাহিড়ী :

গুরুত্বপূর্ণ নীতিশচন্দ্র লাহিড়ী গত ২১শে জুলাই ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীলাহিড়ী ছিলেন আন্তর্জাতিক রোটারী

আন্দোলনের অঙ্গতম পুরোধা। ১৯৪৪-৪৫ সালে তিনি কলিকাতার রোটারী ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯১২-৬৩ সালে আন্তর্জাতিক রোটারী ক্লাবের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মানে বিভূষিত হন। বেদান্ত ও উপনিষদ সম্পর্কে তাঁহার পাণ্ডিত্য আমেরিকায় প্রচুর আলোড়ন জাগাইয়াছিল। বাংলার এই কৃতী পুরুষকে আমরা সজ্ঞায় স্মরণ করিতেছি।

দেশসেবক অম্বদা প্রসাদ চৌধুরী :

বিশিষ্ট খাদি সংগঠক কর্মী এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রথম অর্থমন্ত্রী শ্রীঅম্বদা প্রসাদ চৌধুরী গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁহার লোয়ার মাতৃলার রোডে নিজ বাড়িতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

শ্রীঅম্বদা প্রসাদের মৃত্যুতে বাংলাদেশে মহাস্বাক্ষরী অমুগামী খাদি আন্দোলনের স্মৃতিবাহী মুষ্টিমেয়ের অঙ্গতম একজনের অভাব হইল।

মনোরঞ্জন গুপ্ত :

গত ৮ই সেপ্টেম্বর প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও দেশসেবক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রিন্স অব ওয়েলস হাসপাতালে ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ১৯০২ সনে মংমনসি হু হেলার মুন্সিবাড়ী-কেন্দ্রারপূরে মনোরঞ্জনর জন্ম। ইবি বিখ্যাত ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র। টাটর তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ। ১৯২৪ সন হতে বেঙ্গল কমিক্যালের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাগায়নিক ছিলেন শ্রীগুপ্ত। ১৯২৯ হতে তিন চার বৎসর সঙ্গীতনীর সহকারী সম্পাদকতা করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। ইংরাজী বাংলা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ইতিহাস ও নৃত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান, দেশ ও জাতীয় জাগরণ এবং সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ তাঁর হৃদয় দৃষ্টি ও চিন্তার পরিচয় দেয়। তাঁর 'Two New

উৎসব অনুষ্ঠানে -
ইদ্র'ব সন্দেশ
অপরিহার্য!

৮৬, আমহার্ট স্ট্রীট কলি: ১ ৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২
 ফোন - ৩৫-১৩৮৩ ফোন - ৩৪-২৫৩৩

শ্রীমহাপ্রভু বলেছেন—

“এই তো কহিলু ভক্তির দিগ্‌দর্শন
 ইহার স্বরূপ মনে করহ ভাবন।”

আত্মদান করুন

মহাপ্রভুর মতাম্বাধী গীতার
 ভক্তি ব্যাখ্যা

ভক্তিতারতী শ্রীবঙ্কিম সেনের

গীতা-মাধুরী—১২'০০ ও

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে—৩'০০

প্রকাশক : শ্রীরাইমোহন আচার্য

৭ ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা—৩

Pala Records' ভারত, ইং ও জাপানের মনীষীদের প্রণীত অর্জন করিয়াছে। তাঁর রচিত 'আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়', 'আচার্য অগ্নিশীল বহু' 'ভাষ্কার মহেন্দ্রলাল সরকার', 'আচার্য প্রমথ নাথ বহু' এবং 'আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বহু'র জীবনী বিশেষ সমাদৃত। শ্রীঃপু পত্রীর বহু জনহিতকর এবং সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তি ছিলেন। মনোরঞ্জন গুপ্তের মৃত্যুতে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশী একজন কৃতি পুরুষ হারাইল।

পরলোকে প্রাক্তন বিপ্লবী লোকনাথ বল :

বিপ্লব ৩৭ সেপ্টেম্বর ৭৭ বৎসর বয়সে প্রাক্তন বিপ্লবী লোকনাথ বল জন্মরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলায় লুণ্ঠনের জন্য মাদারীয়া দাখীনা সেনের নেতৃত্বে যে অভিযান চলে, শ্রীলোকনাথ জেনাবেলের কাজ করেন। জালালাবাদ পাহাড়ের পুলিশের সহিত প্রচণ্ড সংঘর্ষে তাহার আপন ভাই হবি বল (টোপবা) ও খুন্সাতা ভাই প্রভাস বল শহীদ হন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা বার্থ হইলে পর শ্রীলোকনাথ মদলবলে আত্মসমর্পণ করেন। কিছুকাল পরে চন্দ্রনগরে তাঁহাকে প্রেষণার কাজ হয়। প্রেষণার কালে পুলিশের সহিত সংঘর্ষে জীবন বোঝালে মৃত্যু হয়। পরবর্তী কালে দীর্ঘ কারাবাস ঘাপন করেন। মুক্তি লাভের পর রেডিকেল ডিমোক্রটিক পার্টি এবং পরে কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেন। শেষকালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের চ্যুরম্যান গ্রহণ করেন। প্রবর্তক সম্বন্ধে প্রতি শ্রীলোকনাথ বিশেষ প্রসঙ্গীল ছিলেন।

শ্রী শ্রীবিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব :

শ্রী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন সাংঘম উত্তাপে সংঘ ভবন ৬০নং সিমলা স্ট্রিটে বিপ্লব ৭ই ভাদ্র, রবিবার পূর্ণা কুলন পূর্ণিমা ব্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোঁষাখী প্রভুর আবির্ভাব তিথি উদ্‌ঘোষিত হয়। সংঘের শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ মহা-রাজের তত্ত্বাবধানে মদল-ভারতী, উবা কীর্তন, হোম, পূজা, পাঠ, ভজন ও ভোগরাস ইত্যাদি অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ৯টার নাম কীর্তন করেন কীর্তনোয়া শ্রীহাজীরালাল অধিকারী। অপরায় ৬ টার বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে প্রভুগদ প্রাণকিশোর গোঁষাখী পৌরোহিত্যে এক মনোজ্ঞ ধর্ম সভার আবিবেশন হয়। বিভিন্ন বক্তা পৌসাইজীর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ জীবনের উপর আলোকপাত করেন। প্রধান অতিথি অধ্যাপক ত্রিপুরাধিকার সেনশাস্ত্রী ঐতিহাসিক-পটভূমিতে শ্রী শ্রীবিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব-তাৎপর্য সম্বন্ধে এক চিত্তগ্রস্ত ভাষণ দেন। সভাপতি মহোদয় পৌসাইজীর জীলা-মাংস খার অপূর্বতার রসাবাদন করান উপস্থিত বসিক ভক্তসমুদায়কে। হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মিঃ ডেভিড মিলার সভাপতি উপস্থিত হইতে না পারিয়া একখানি তথ্যপূর্ণ পত্র দেন। পত্রখানি সভায় পঠিত হয়। ব্রহ্মকর্তা শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য প্রমুখ করেকজন বিশিষ্ট গীতশিল্পী সর্বজন উপভোগ্য ভজন গানে অংশ গ্রহণ করেন।

হেমনাথ সান্ত্বালের শৌচনীয় মৃত্যু :

প্রকাশ গত ৮ই সেপ্টেম্বর মধ্য রাত্রে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ভারতের মলিমিটার জেনারেল শ্রীহেমনাথ সান্ত্বালের নগ্না দ্বিজীহ ঘাসভবনে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ঘাস রোধ করিয়া হত্যা করে। রাজধানীর নাকের ডগায় প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের সন্নিবটে এমন অসংযত স্থানে এইরূপ হত্যাকাণ্ড অকল্পনীয় ছিল। সমগ্র ভারত এই রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত বিম্মিত। ইদানীংকালে শ্রীসান্ত্বালের এই শৌচনীয় মৃত্যু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। শ্রীসান্ত্বালের মৃত্যুতে দেশ নিখিল ভারতীয় খ্যাতি-সম্পন্ন একজন আইনজ্ঞ হারাইল আর বাংলাদেশী দুর্ভাগ্য ও দুঃখ এই যে, বাংলার নিঃশেষিত শ্রম কৃতি সম্মানবোধের মধ্যে শ্রীসান্ত্বালের জায়গা প্রতিস্থাপন পুরুষকে এমন বেঘোরে বিরোপাত্তক অবস্থায় প্রাণ বিসর্জন দিতে হইল।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্ম

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

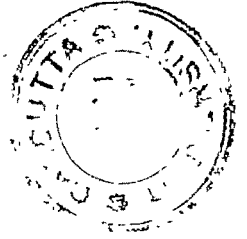
সকল রকম বেনারসী সাজী, শাল, আলোয়ান ও হোসিয়ারী গোষাক বিক্রেতা

রামকানাই ষামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা। ফোন : ৩৫-২৩০৩

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারাম চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারাম চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাক্সটোন লিমিটেড, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৯ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

প্রবন্ধ

কার্তিক, ১৩৭১

মা আসিবাছিলেন—চলিবা গিয়াছেন। মায়ের আগমনে যে আনন্দের হাট বসিয়াছিল, মায়ের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সে আনন্দ আর নাই। পৃথিবী যেমন আগে ছিল, তেমনই রহিয়াছে; কিন্তু অন্তরের উল্লাস কে যেন কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। কেন এমন হয়? মায়ের আগমনের তালে তালে হৃদয় যেন ঢুলিয়া ঢুলিয়া উঠে—মায়ের প্রস্থানে নিরানন্দে হৃদয় আঁধার হয়। এ যে কি রহস্য, বুঝা যায় না। মায়ের ইচ্ছা চিরদিনই অন্তরে জাগিয়া আছে। তবুও মহালয়ার পরদিন হইতে নবমীর নিশাকাল পর্যন্ত প্রতি ধমনীতে যে দ্বন্দ্বুতি ধ্বনিত হয়, দশমীর প্রভাতে সে ধ্বনি স্তব্ধ হয় কেন তাহা আমরা বুঝাইয়া দিবে কে? মাতৃপন্দের প্রতিপদ হইতে যে আনন্দের কলরব নবমীর নিশাকাল পর্যন্ত স্তনিলাম, হৃদয় উদ্ভুদ্ধ হইল, দশমীর প্রভাতে তাহা শেষ হয়। কেন কেহ বলিয়া দিতে পার কি? ধারণার কি মোহিনী শক্তি! মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কি উৎসুকতা, বিজ্ঞা দশমীর প্রভাতে সব যেন সুরাইয়া যায়। সত্যই কি তিনি চলিয়া যান স্বধামে? তবে এই জীবন ভার কে বহন করে? ভাগবত-শক্তির আগমন ও প্রস্থান যদি সত্য হয়, মহাদেবীর প্রস্থানের পর আমরা প্রাণহীন হইয়া পড়ি না কেন? লোকে বলিবে—এই কয়দিন তিনি বিশেষভাবে অন্তর প্রদেশ আলোকিত করিয়া থাকেন। তাই আমাদের হৃদয় আঁখিনীরে ভাসিয়া যায়। মায়ের আগমনে আনন্দ—বিসর্জনে নিরানন্দ—সুখ-দুঃখের তরঙ্গে আমরা এমনই উঠা-নামা করিয়া থাকি। সুখের সময় অজ্ঞ—দুঃখ সংবৎসরকাল স্থায়ী। এই এক বৎসরের মধ্যে হৃদয়কে আমরা আরও অধিক প্রস্তুত করিয়া রাখার স্বযোগ পাইব। আমাদের দেহ-প্রাণ-মন উৎসর্গের আগুনে দগ্ধ করিয়া বৎসরান্তে আবার মায়ের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা থাকিব। মা! তুমি যে মধুকৈটভকে দমন করিলে, সে আমাদের দেহের অহংকার। তুমি যে মহিষকে উন্মূলিত করিলে, সে আমাদের প্রাণের ঘৃতিহীন অবস্থা। তাহা হইতে মুক্তি দিয়া, ধূম্রাক, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজকে বিনাশ করিয়া শুভ নিশ্চল দৈত্যদলনীকূপে আমাদের মনকে তুমিই সিদ্ধি দান কর। হে বিধেধরি! তোমাকে আমরা কোটা কোটিবার নমস্কার করি। যেন আমরা স্বরূপের মত মন লইয়া স্বরূপ হইতে পারি; সমাধি বৈশ্বের মত প্রাণ লইয়া তোমার কন্ঠে উদ্ভুদ্ধ থাকিতে পারি এবং দেহরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া মেঘসের মত জ্ঞান-বুদ্ধি লাভে দক্ষ হইতে পারি। আমাদের শরীর, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধিকে নিষ্কলুষ কর মা! আমরা শরীর দিয়া শূদ্র, প্রাণ দিয়া বৈশ্য, মন দিয়া ক্ষত্রিয় এবং বুদ্ধি দিয়া ব্রাহ্মণরূপে এই ধরিত্রীর বুকে চতুর্গুণে বিভূষিত হইয়া যেন নব জন্ম লইতে পারি, ইহাই বাঙালীর বিজ্ঞার প্রার্থনা হউক।

(পুরাতন “নবসম্ভব” হইতে)।

সঙ্কল্পকর শ্রীমতিলাল.

শ্রীদুর্গাবিভূতিঃ

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

যা শ্রীসৌষ্ঠবমণ্ডিতা চ সুষমা বিধে মধুচ্ছন্দসা
সা লক্ষ্মীঃ শিবসুন্দরায় বিরজা বুদ্ধিশ্চ বাগীশ্বরী ।
সিদ্ধৈক্য মূষিকশাসনোহস্বররণে দাক্ষ্যায় সেনাপতিঃ
শূলং সস্বমুদগ্রমার্জ্জবমহিঃ সিংহোহজিবু রাতং সহঃ ॥

বিশ্বের অঙ্গনে, অন্তরে বাহিরে,
শ্রীসৌষ্ঠবমণ্ডিত আলপনা,
আঁকিবে বলিয়া

তুমি লক্ষ্মী, মধুচ্ছন্দা সজীব সুষমা ;
শ্রীহীনে আনিবে শ্রী, যাহা ছন্দছাড়া দেবে ছন্দ,
তব এই প্রসাদ মহিমা ॥

যেটি সত্য, শিব ও সুন্দর,
বিভ্রমকুহকহীন দৃষ্টিদানে,
তারে দেখাইবে,
তুমি বাগীশ্বরী, বিরজা শুভ্রোচ্ছল বুদ্ধিরূপা ;
মোহাঞ্জে জ্ঞানাজন, অস্বন্দরে সুন্দর রূপায়ণ,
দিতে এই তোমার প্রেরণা ॥

আয়ু আর সাধনের মূল,
কাটে যে মূষিক তমরজরূপে,
তোমার শাসনে,
বিঘ্নবিনাশন ! সে মূষিকে করিলে স্ববশ,
মুটে দিলে কর্মদীক্ষা, কর্ণে শিখাইলে ধ্যান,
তাই সিদ্ধিপ্রদা তব ওঁকার প্রতিমা ॥
সুরাসুর, শুভাশুভ রণে,
তুমি কার্তিকের দেবসেনাপতি ;
তোমার বাহন শিখী,
নিপুণ স্তম্ভাম নটনের রূপ, সুভদ্র সুন্দর ;
অসমঞ্জসে সমঞ্জস, অদক্ষের দক্ষদীক্ষা—
তাই তব মন্ত্রণা-যোজনা ॥

রজস্বল হয়ে নোয়াইয়া,
স্বপ্নের উদগ্ধ রূপটি ত্রিশূল ;
কুটিল যে কাল অহি,
সেও বার হাতে আর্জব-অমোঘ সন্ধান,
অসুরের বুকে ;
আত্মা বলহীনের অলভ্য, তাই সর্বকৈব্যাল দিলে
শৌর্য দীক্ষা,
সিংহ পদাশ্রিত মা'র বীৰ্য্য পরিসীমা ॥

বিজয়া

মহর্ষি প্রেমানন্দ

মহাকাল-মহাঙ্গনে মহাশক্তি তোমার খেলায় ।
দানব দশনপ্রষ্ট প্রাণোচ্ছল আলোর বেলায় ॥
সাধাশ্রয়া, সর্বরূপা, সনাতনী তুমি একেশ্বরী ।
জীবনের অন্তরালে অগতেরে রাখিয়াছ ধরি ॥

ত্রিলোকের তত্ত্বরূপে সত্ত্বারে আবরি' অমুক্ত ।
বহুত্বের মাঝে তুমি একত্বের জ্ঞানোপ্পন্দন ॥
অমৃত্যুর অক্ষরে স্খারূপী সে চেতনার ধারা—
প্রান্তির বালুকান্তরে নিঃশেষিয়া আজি পথহারা ॥

সকল বিভ্রান্তি নাশি, আমিত্বের দিয়া বিসর্জন ।

বিজয়ার বিশিষ্ট জীবনে প্রজ্ঞা করিও অর্জন ॥

ভারত-বন্দনা !*

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচতুর্ধীণঃ

যত্রৈবাস্তি হিমালয়ো গিরিবরঃ শুভ্রৈস্তবাবারুতৈঃ
শৈলাসহযাহেল্লবিদ্যামলয়শ্রীনীলগোবর্ধনাঃ ।
নানাদৃশমনোহরং তরুসত্যান্তৈশ্চ যন্মণ্ডিতম্
বন্দে ভারতবর্ষমীশ-করণা-পীযুষ-বর্ষাপ্নুতম্ ॥১॥

গঙ্গাশোণশতজ্জস্ফুযমুনাগোদাবরীনন্দদা
কাবেরীতপতী তথা চ বিদিতা কৃষ্ণা কুশীগণ্ডকী ।
যস্মিন্ সন্তি সরস্বতী চ সরযুলোহিতাপদ্মাদয়ো
বন্দে ভারতবর্ষমীশ-করণা-পীযুষ-বর্ষাপ্নুতম্ ॥২॥

যস্মিন্ নৈমিষচক্ষুশেধরগম্যাবনন্দহারকাঃ
কাশীপুত্রসেতুবন্ধমথুবাঃ পুণ্যোচ্ছল ভূময়ঃ ।
নানাস্থ শ্রুশোভিতং চিরহরিৎ বৃক্ষৈশ্চ যৎ শ্রামলং
বন্দে ভারতবর্ষমীশ-করণা-পীযুষ-বর্ষাপ্নুতম্ ॥৩॥

শান্তিল্যাসিতযাজ্ঞবল্ক্যলিখিতাবাণ্ডাজিরোনারদাঃ
বিখ্যামিত্রযুক্তশৌতিশনকাঃ প্রাপ্তবর্ষভূবর্ষধাঃ ।
যত্র ব্যাসবশিষ্ঠগর্গকপিলি মাঙ্কাতৃকাত্যায়নৌ
বন্দে ভারতবর্ষমীশ-করণা-পীযুষ-বর্ষাপ্নুতম্ ॥৪॥

কৃষ্ণা যত্র যুধিষ্ঠিরো রঘুবরশ্চৈতন্তবুদ্ধাদয়ো
ভীষ্মদ্রোণকপাঞ্জুনাঃ সম ভবন্ ভীমোহভিমহ্যন্তথা ।
যস্মিন্ কর্ণজয়প্রধাদনলাঃ স্ত্রীবনীলাদয়ো
বন্দে ভারতবর্ষমীশ-করণা-পীযুষ-বর্ষাপ্নুতম্ ॥৫॥

সাবিত্রী পরমা পবিত্রচরিতা সীতা তথাকুরুতী
মৈত্রেয়ী বিদুষী তথৈব হি শ্বনাগার্গা চ লীলাবতী ।
শর্মিষ্ঠা কমলা তথা স-বহলা দুর্গাবতী বেহলা
বন্দে ভারতবর্ষমীশ-করণা-পীযুষ-বর্ষাপ্নুতম্ ॥৬॥

বাল্মীকিরপি ভারবেশ্চিরমহো যৎ কালিদাসস্ত চ
পদ্মানীব সদা চিত্তানি কবিভিঃ চত্যানি পত্যানি চ ।
স্বর্গেভ্যো যদতীব স্তন্দরতমং সর্বজু লীলাময়ং
বন্দে ভারতবর্ষমীশ-করণা-পীযুষ-বর্ষাপ্নুতম্ ॥৭॥

যস্মিঞ্জকরনানকপ্রভৃতয়ো রামাহুজঃ কেশবঃ
মাধ্বাচার্যকবীরবজ্রভমহাবীরাদয়ঃ সাধবঃ ।
ধর্ম্মাচারযুতস্ত যত্র রমতে লোকশ্চ শান্তিপ্ৰিয়ঃ
বন্দে ভারতবর্ষমীশ-করণা-পীযুষ-বর্ষাপ্নুতম্ ॥৮॥

* ছন্দঃ—উনবিংশতাক্ষরা বৃত্তিঃ । ষাটশে উনবিংশে চ যতিঃ । অত্র মদঙ্গসতগণানন্তস্য একমক্ষরং গুরু ভাবঃ । তদঙ্গকং যথা ছন্দোমতপ্রাণা

বিতীয়ঃ স্তবকঃ—সুধা বৈদ্যসমুদ্রতঃ সগরবঃ শাবুলবিক্রীড়িতম্ ।

“ভারতজননী” (“প্রবর্তক”, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮, পৃঃ ১০৫) কবিতায়াঃ সংস্কৃতানুবাদঃ পঠিতব্যঃ ।

দ্রুতচার্যবৃহস্পতি-প্রভৃতঃ ক্ষেমেজ্ঞকামানকৌ
চাণক্যাদয এব নীতিকুশলা যত্রৈব সঘুদ্ধয়ঃ।
তচ্চার্যপ্রতিভং সমগ্র-বসুধা-চূড়ামণিং ভাস্বরং
বন্দে ভারতবর্ষমীশ-করণা-পীযুষ-বর্ষাপ্লুতম্ ॥৯॥
দণ্ডাচার্যবরঃ সদর্শচতুরঃ সংকাব্যরত্নাকরো
ভাষাতত্ত্ব বিলাসরসিকঃ সং পণ্ডিতঃ পাণিনিঃ।
যত্রৈবাবিল-শব্দশাস্ত্রনিপুণা শ্রীবোপদেবাদযো
বন্দে ভারতবর্ষমীশ-করণা-পীযুষ-বর্ষাপ্লুতম্ ॥১০॥

বেদাদর্শনকাব্যতত্ত্বগণিতজ্যোতিঃ-কথাসংহিতাঃ
আয়ুর্বেদরসায়নোপনিষদো বার্তাপুরাণাদয়ঃ।
বিশ্বে শিল্পকলাস্তথা স কলা বিদ্বন্তিরত্যাধাতাঃ
বন্দে ভারতবর্ষমীশ-করণা-পীযুষ-বর্ষাপ্লুতম্ ॥১১॥
ভূমির্ষত্র সমুর্জরা সুরভিতো বায়ুর্জলং নির্মলং
চন্দ্রার্কবতিশুশ্রোভো জ্বলিমলং যস্মিন্ নতোমণ্ডলং।
নানাপুষ্পবনাদিতং মুখরিতং যৎ কুজিতৈঃ পক্ষিণাম্
বন্দে ভারতবর্ষমীশ-করণা-পীযুষ-বর্ষাপ্লুতম্ ॥১২॥

মন্তব্যঃ ভা (প্রভা) দীপ্তিমং তর্গঃ (“জ্যোতিষাং
জ্যোতিঃ—গীতা, ১৩।১৭) অথ-বা ভারবদ্যাক। ভা
(দীপ্তিঃ) রতম্ (বৃত্তম্)। দীপ্তিমং মহাবিশুবরেখায়াঃ
সম্মিহিতং প্রদেশং ভারতম্। কিংবা জ্ঞানদীপ্তম্।

“অগ্নিদেবো দ্বিজাতীনাং” ইতি ঋতৈর্বাচ্যং তৎ
দীপ্তম্। যস্মিন্ দেশে ধর্ম্যঃ আচারপ্রভবঃ ভক্ত্যা জ্ঞানেন
চ জগৎ বিভর্তি পোষয়তি চ তচ্চি ভারতবর্ষম্। তত্র পুনঃ
প্রধানং ভারতবর্ষং তথা চ বিষ্ণুপুরাণে ২।৩।১—

“উত্তরং যৎ সমুদ্রস্ত হিমাদ্রেষ্ঠৈব দক্ষিণম্।

বর্ষং তস্তারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥”

ইতঃ স্বর্গশ্চ যোক্ষশ্চ মধ্যক্ষান্তশ্চ গম্যতে। ন খলুভ্রাত
মর্ত্যানাং কর্ম ভূমৌ বিধীয়তে। অত্র জন্মসহস্রাণাং
সহস্রৈরপি সন্তম্। কদাচিৎপ্রভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসংক্রমং।
তথাহি—“গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধম্মাস্ত তে

ভারতভূমিভাগে।

স্বর্গাপবর্গাম্পদমার্গভূতে ভবন্তি ভূয়ঃ

পুরুষাঃ সুরত্বাং ॥”

—বিষ্ণুপুরাণে ২।৩

মহাভারতাদাবপোষ্যম্।

ভারতবর্ষ—ভরত রাজপুত্র + অ (ফ) —দানার্থে।

ভরতকে দান করা হয় বলিয়া ‘ভারত’ নামে খ্যাত :

“হিমাক্ষং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় দদৌ পিতা।

তস্মাচ্চ ভারতং বর্ষং তস্মা নান্না মহাস্থনঃ ॥”

জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভরত রাজার অধিকৃত অংশ—
‘ভারত’। জম্বু, প্রক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও

শালমলী—এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপের
অন্তঃপাতী অংশবিশেষ ‘ভারত’ :

“সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।

তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্মের প্রদীপ ॥”

—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, “অম্লদামঙ্গল”।
ভারত (নামক) বর্ষ (বিভাগ)। জম্বুদ্বীপের নব-
বর্ষান্তর্গত বর্ষবিশেষ। হিমালয়ের দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর
দেশ। আরব, পারস্য, তুরস্ক ও মধ্য আসিয়ার বহুদূর
পর্যন্ত ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

‘ভারত-বন্দনা’—‘ভারত-গাথা’র নামান্তর।

বন্দনা—বন্দ + অন (ভাববাচ্যে) + আ (জ্ঞী)।
স্তব।

“জয় গোপবল্লভ তরুসম্ব দেব দুর্জিত বন্দন।”

—অম্লদামঙ্গল।

গাঁথা—সংস্কৃত—গাথা (গৈ-কর্মবাচ্যে—ধনু, আপ),
সঙ্গীত, গান, শ্লোক।

“অমিয় অধিক গাঁথা”—বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস (পদ-
কর্তা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা)।

ঋগ্বেদে ‘গাথা’ শব্দের অর্থে সাধারণতঃ কেবল
বুঝায়—সঙ্গীত, কবিতা, ছন্দোবদ্ধ রচনা—ঋগ্বেদ ৮।৩২।১ ; ১
৭১, ১৪ ; ২৮, ২ ; ২।২২।৪ ; গাথা—১।১৬।৭৬ ; ২।১১।৪ ;
গাতৃ—১।১৫।১২ ; ২।২০।৫ ; ৩।৪।৪ ; ৪।৪।৬ ; ৫।৮।৭।৮ ;
১০।২০।৪ ; ১২২, ২ (Macdonell & Keith's Vedic
Index of Names and Subjects, Vol. I, London, 1912, p. 224)।

প্রাচীন তামিল সাহিত্যে সমাজ-শাসনের আদর্শ

শ্রীনিমাইচরণ বসু, এম. কন্., এ. সি. এ.

রাজ্যপরিচালননীতির, সমাজশাসন নীতির আদর্শ
কল্প হওয়া উচিত—এ বিষয়ে বর্তমান ভারতবর্ষে
আলোচনা বাদাঙ্কবাদের অন্তর্ভুক্ত নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষেও
যে এই বিষয় লইয়া তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মাথা
ঘামাইতেন, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। মহাত্মারতে
রাজ্যশাসন নীতি সম্পর্কে সুন্দর ও সুনির্দিষ্ট উপদেশ
আছে। মহাসংহিতায়, চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে এ বিষয়ে
যে নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহা মুসলমান অধীনে
আসার পূর্বে অবধি ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্যগণ কর্তৃক নিষ্ঠার
সহিত প্রতিপালিত হইত।

দাক্ষিণাত্যেও প্রাচীন যুগ হইতে সুদক্ষতার সহিত
রাজ্যশাসন করা হইত। ইহার প্রধান কারণ চেয়া-চোল-
পাণ্ড্য-পল্লববংশীয় রাজবৃন্দের রাজসভায় রাজাকে রাজ্য-
শাসন বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ দানের জন্য একদল অভিজ্ঞ
চিন্তাশীল পরামর্শদাতা থাকিতেন। তদুপরি ‘দক্ষিণ
ভারতের অর্থশাস্ত্র’ ‘তিরুক্কুরল’ গ্রন্থের বিচক্ষণ সুযুক্তিপূর্ণ
রাজনীতিবিষয়ক নির্দেশাবলী রাজত্বমণ্ডলী রাজ্যশাসন-
নীতির আদর্শ হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে অরণ্য করিতেন।

‘তিরুক্কুরল’ এক অপূর্ব স্মৃতিস্মরণ গ্রন্থ। খ্রীষ্টীয় প্রথম
হইতে তৃতীয় শতকের কোন এক সময়ে তিরুবল্লুর কর্তৃক
এই গ্রন্থ রচিত হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব-
জাতির উদ্দেশ্যে রচিত এই গ্রন্থের ১৩০০টি সুন্দর ও সংহত
শ্লোকরাজির মধ্যে মানবসমাজের সর্বস্তরের সর্বকালীন
এবং সর্ব অবস্থার শাস্ত্র অতীন্দ্রা ও নৈতিক উন্নয়নের বাণী
নিহিত রহিয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশেই তাই কুরলের
সমাদর হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রের ধর্ম, অর্থ ও কাম এই
ত্রিবিধের আলোচনায় কুরল তিনটি পর্বে বিভক্ত—
(১) সদাচার (অরম্), (২) সম্পদ (পোরন্), ও
(৩) প্রেম (ইন্বাম্)। দ্বিতীয় পর্বে ৭০টি অধ্যায়ে
৩৯-১৮০) ৭০০ সংহত শ্লোকে রাজ্যশাসন ও সমাজ-
শাসনের নৈতিক ভিত্তি বিবৃত করা হইয়াছে। সমাজের
ব্যক্তি-চরিত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজশাসন ব্যবস্থাও যে
উন্নত আদর্শস্থানীয় হওয়া প্রয়োজন—এ কথা তিরুবল্লুর

উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই সমাজশাসন ব্যবস্থার
সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি অঙ্গ—যথা, রাজা, অমাত্যবৃন্দ,
প্রজাবর্গের ছায়নিষ্ঠ ও সুকৃতিসম্বৃত ইতিকর্তব্য সম্পর্কে
বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দিয়াছেন। এই পূর্ক পাঠ
করিতে করিতে আশ্চর্য্য হইতে হয় এই ভাবিয়া যে,
প্রায় ১৮শত বৎসর পূর্বে এই ভারতের এক মহান কবি
সমাজশাসন ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত না হইয়াও এমন
এক উন্নত আদর্শ শাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিয়া
গিয়াছেন যাহা আজিকার কালেও সমভাবে প্রযোজ্য ও
চিন্তনীয়। চাণক্যের নীতিশাস্ত্রে ও মহাসংহিতায় বর্ণিত
রাজ্যশাসন সম্পর্কিত অনুশাসনগুলি আমরা অনেকেই
জানি। কিন্তু কুরলের এমন ছন্দোবদ্ধ সহজ সুবিস্তৃত
রাজনীতির আদর্শধারার পরিচয় উত্তর ভারতে আমরা
কল্পজন খোঁজ রাখি।

এই গ্রন্থের স্বল্প-পরিসরে কুরলে বর্ণিত সমাজ-
শাসননীতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা সম্ভবপর হইবে
না। ইহার মর্ম্মকথা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে।
সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত আছে
সাতটি বিষয়—রাজা, অমাত্য, ভূখণ্ড, ভূগ, অর্থভাণ্ডার,
সৈন্যবাহিনী ও মিত্রবর্গ। রাজ্যশাসনের প্রত্যেকটি অঙ্গকেই
তিরুবল্লুর ছায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, কঠোর পরিশ্রমী ও
সহনয় হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই সাতটি অংশের
প্রত্যেকটি সম্পর্ক বিস্তৃতভাবে কুরলে নির্দেশ করা আছে।

সমৃদ্ধিকামী রাজার পক্ষে অন্তরঙ্গ শক্তি হিসাবে স্বীয়
চরিত্রমাধুর্য্য ও বহিরঙ্গ শক্তি হিসাবে বহু সৈন্য, পরিশ্রমী
প্রজাবর্গ, পর্যাপ্ত ধান্যসম্পদ, অভিজ্ঞ সদাসতর্ক অমাত্যবৃন্দ,
বৈদেশিক শক্তির সহিত মিত্রতা ও সুদৃঢ় রক্ষণ ভূগ একান্ত
আবশ্যক। সাহস, উদারতা, কর্ম্মক্ষমতা প্রাজ্ঞতা—এই
চতুর্বিধ গুণাবলীতে রাজাস্বত্বকরণ ভূষিত হওয়া উচিত।
রাজার কর্তব্য বৈদেশিক আক্রমণ, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা
হইতে দেশকে মুক্ত রাখা, দেশের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা ও
শান্তি বজায় রাখা এবং জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা।
রাজ্যে প্রচলিত আইনের উর্দ্ধে রাজার স্থান নহে, তিনি

নিরপেক্ষ ও ভ্রাম্যশীল হইবেন। জনগণের বাক্যধীনতা, মন্ত্রিগণের রাজকার্য্য সমালোচনা করার স্বাধীনতা দান করাও রাজকর্তব্য। অসংযম ও বিলাসকলার মধ্যে নিমগ্ন না থাকিয়া রাজা শাসন সংক্রান্ত প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখিবেন, প্রজাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ মেলামেশা করিবেন। প্রজাসাধারণের অভিপ্রায় অনুযায়ী রাজ্যপালন ব্যবস্থা রাজার অনুমোদন করা উচিত। ন্যায়বিচার যেন কখনো পদদলিত না হয় এবং এই ন্যায়বিচারের মর্যাদা রক্ষা করা রাজার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। তিনি সং ও মহম্মদীয় ব্যক্তিদের মধ্য হইতে তাঁহার বন্ধুবর্গ বাছিয়া লইবেন, অত্যন্ত সতর্কতার সহিত রাজ্যের পদস্থ কর্মচারীদের নির্বাচন করিবেন। স্বয়ং এবং গুপ্তচর মারফৎ রাজ্যের সমস্ত বিষয়ের খবরাখবর লইবেন। রাজ্যের মধ্যে সর্বশক্তি বাহাতে অসংযত উদ্বৃত্ত হইয়া যথেষ্টাচার করিতে না পারে, সেইজন্য check valve-এর মত অমাত্যদের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা বিধেয়। কোন কিছু করিবার পূর্বে রাজা বহু চিন্তা করিবেন। কিন্তু কোন কার্য্য হইতে তিনি কখনই পিছাইয়া পড়িবেন না। দৃঢ়চিত্ততা, দৃঢ়সংকল্পতা ও দ্রুত-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা উত্তম রাজার পক্ষে অন্যতম প্রধান গুণ। গভীর জলে কুমীর যে কোন শক্তির সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে, কিন্তু ডাক্তার উপর উঠিলে অন্যান্য জন্তুরা তাহাকে বধ করে। সেইরূপ কার্য্য সিদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত সময়, সুযোগ ও উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করার উপযোগী জ্ঞান রাজার থাকা আবশ্যিক। যখন হুঃখ কষ্ট আসে তখন রাজা সে সব হাসিমুখে ধীর স্থির ভাবে সহ্য করেন। ইহা ছাড়া এসব জয় করার আর কোন ভাল উপায় নাই।

রাজ-অমাত্যবর্গ অভিজ্ঞ চতুর বুদ্ধিমান ও নিষ্কলুষ হইবেন। কোণায় কখনও কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত—এ বিষয়ে তাঁহার বিচক্ষণ হইবেন। রাজা কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে এবং মন্ত্রিবর্গের হিত উপদেশ না শ্রবণ করিলেও মন্ত্রিবর্গের পক্ষে রাজাকে শ্রেয়ঃ মন্ত্রণা দেওয়াই কর্তব্য। মনে প্রাণে সং ও সরল হওয়া কাম্য, কেননা ধূর্ততার দ্বারা অর্থ ও নিরাপত্তা

লাভ করিলে তাহা আশুনে না পোড়ানো যুৎপাত্রে জল ঢালার মত ক্ষণস্থায়ী হয়।

জাতির প্রকৃত সুখ তখনই আসে, যখন সেখানে সমৃদ্ধিশালী কৃষকমণ্ডলী, ধর্ম্মানুরাগী জনসাধারণ, উন্নতিশীল ধনিক সম্প্রদায় থাকে, যখন দেশে দুর্ভিক্ষ, মড়ক বা ধ্বংসকারী শত্রু থাকে না। দেশের প্রকৃত শান্তি আসে পাঁচটি বিষয়ে—(১) ব্যাধিমুক্তি, (২) অর্থসম্পদ, (৩) পর্য্যাপ্ত শস্ত্রোৎপাদন, (৪) সুবসমৃদ্ধি ও (৫) দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়। এগুলি শান্তির কারণ হইবে না যদি শাসক ও প্রজাবৃন্দের মধ্যে মনোমালিন্য থাকে।

সংস্কৃত হিন্দুশাস্ত্রে বাণিজ্যকেই সমৃদ্ধির জন্ত প্রধান স্থান দেওয়া হয়—‘বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ষণি’। তামিল নীতিশাস্ত্রে কিন্তু কৃষিকার্য্যকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। সমাজের ধারক হিসাবে সর্বপ্রধান মর্যাদাদান হিসাবে কৃষককেই তিরুবল্লুর স্থান দিয়াছেন। ব্যবসায়ী, যাজক ও সৈন্যদেরও কৃষকগণের উপরই নির্ভর করিতে হয়, সেইজন্ত সর্বপ্রকার পরিশ্রম ও বৃত্তির মধ্যে কৃষিকার্য্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশীল বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। পর্য্যাপ্ত খাদ্যসম্পদ হইলে দেশের সমৃদ্ধি অবশ্যস্বাভাবী।

উত্তম গ্রন্থ যত পাঠ করা হয় ততই ইহার রসমাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায়, তদ্রূপ উপযুক্ত পাত্রে বন্ধুত্বের যত আদান প্রদান করা হইবে, ততই ইহা গাঢ় হইতে থাকে। প্রকৃত বন্ধুত্ব শুধু হাসিমুখ দেখানো নয়, অন্তরের অন্তঃস্থলে বন্ধুদের জন্ত যে ভালবাসা, আনন্দ—তাহাই প্রকৃত বন্ধুত্ব। বৈদেশিক শক্তির সহিত মৈত্রীবন্ধনের সার্থকতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—পতনশীল পোষাককে ধরিবার জন্ত হস্ত যেক্রপ দ্রুতগতিতে কার্য্য করে, বন্ধুর হুঃখকষ্টে প্রকৃত বন্ধুও তদ্রূপ দ্রুত অগ্রসর হইয়া থাকে। শত্রুও এইরূপ মহৎপ্রাণ ব্যক্তির সৌখ্য কামনা করিয়া থাকে যিনি বন্ধুর দ্রুত সখেও তাহার সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলেন।

ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রদূতের গুণাবলী ও কর্তব্য, প্রজাবৃন্দের অধিকার ও কর্তব্য, সৈন্যবর্গের বিশ্বস্ততা ও সাহসিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে নির্দেশ দান করা হইয়াছে

এই পর্বে। ভদ্রব্যক্তির স্বরূপ সম্পর্কে তিরুবল্লুর বলিয়াছেন—সদাপ্রসন্ন মুখমণ্ডল, উদার মনোভাব, মিষ্টবাক্য ও সকলের সহিত সৌম্য ব্যবহার—ইহাই তদ্রজনকে চিহ্নিত করে। আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা, মহত্ব, চরিত্রমাদুর্য্য, সৌন্দর্য্যবোধ, লজ্জাশীলতা, পারিবারিক দায়িত্বজ্ঞান—এইগুলি সংপ্রজ্ঞার নিকট আশা করা যায়।

সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত অর্ধশাস্ত্র ও মন্ত্রসংহিতায় বর্ণিত অমুশাসনের সহিত কোন কোন স্থলে কুরলের অমুশাসনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বৈসাদৃশ্যও কম নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত সংস্কৃত অমুশাসনে প্রয়োজন হইলে ছলচাতুরীর আশ্রয় লইবার জন্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কুরল গ্রন্থে কিন্তু সকল ব্যাপারেই অসং উপায় ছলচাতুরীকে পরিহার করিয়া চলিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। রাজনীতির নোংরামিকে তিরুবল্লুর অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ রাজাকে প্রভূত ক্ষমতাসালী রূপে চিহ্নিত করিলেও তিরুবল্লুর তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। রাজা দেশের জনগণের প্রতিভূ, ধর্ম্মপথে ন্যায়সঙ্গতভাবে তিনি রাজ্যের সকলের স্বার্থরক্ষা কল্যাণসাধন করিয়া চলিবেন—ইহাই তাঁহার বক্তব্য। আঠারশত বৎসর পূর্বে হৃদ

রাজতন্ত্রের আওতার মধ্যে বাস করিয়াও তিরুবল্লুর যথেষ্ট প্রগতিশীল ও স্বাধীনচেতা ছিলেন—ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হয়।

তিরুকুরল গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কর্ম্মধারার নৈতিক ভিত্তি বিবৃত করা হইয়াছে। ইহা হইতে রাজপুরুষ জানিয়াছে আদর্শভাবে রাজ্য পালনের দ্বারা, প্রজারা জানিয়াছে রাষ্ট্রিক জীবনে ন্যায়সঙ্গত ভাবে স্বীয় অধিকার সংরক্ষণ ও কর্তব্যপালন, গৃহী জানিয়াছে কেমন করিয়া আদর্শ গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতে হয়। এমনভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সমাজের সকল স্তরের অধিবাসীকে আদর্শ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হইবার প্রেরণা দিয়া কুরল তামিল জনগণের মনে এমন এক চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে, যাহা হইতে সহজে বিচ্যুত হইবার নহে। কালের পরিক্রমায় দেশের শাসন ব্যবস্থার স্বরূপের পরিবর্তন আসিয়াছে। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র আজ দেশ শাসন করিতেছে। তিরুকুরলের অমুশাসনের কোন কোন অংশ আজিকার পরিবর্তিত অবস্থার সহিত তাই খাপ খায় না। কিন্তু তবু ইহার আবেদন অনস্বীকার্য্য। তিরুকুরলের আদর্শ আজও তামিলভাষী জনগণের অন্তরের মণিকোঠায় দেদীপ্যমান আলোকবর্ত্তিকা স্বরূপ যাহা চিরকাল তাহাদের সমাজ শাসন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবে।



পাগলিনী শ্যামা

ঠাকুর শ্রীধনঞ্জয় চক্রবর্তী

ঘরে আছে পাগলিনী মেয়ে।
নাম তার 'শবাসনা'—থাকে সদা বিবসনা
শ্রমশানে মশানে যায় বেয়ে।
শব-করে লাজ ঢাকে, বিকট হাসিতে ঢাকে,
নর-শির-মালা দোলে গলে।
নাহি নিদ আধিপাতে ঘোরা অমানিশা রাতে
ডাকিনী-যোগিনী সঙ্গে ফিরে।
প্রেতিনী, পিশাচী সঙ্গে করে নৃত্য নানা রঙ্গে,
শিবাকুল থাকে সদা বিরে ॥
ঘৃণা, ভয়, নাহি মান, শাসনে না দেয় কাণ,
সমাজ বাঁধন নাহি মানে!

নারী হবে অসি ধরে নাচে শব-শিবোপরে
কি মহিমা কেহ নাহি জানে।
মহাকালী করালিনী—মেয়ে মোর 'নিস্তারিণী'।
ত্রিভুবনে একি কথা বলে?
কালীরূপে মহামায়া—ঘরে মোর পদছায়া,
তবে কিগো দিলা মেয়ে ছলে?
আমি অন্ধ—অভাজন, সন্দ দ্বিধায়ুত মন,
কি বুঝিব জগন্মাতা লীলা?
লীলাময়ী লীলাভরে—সৃষ্টিস্থিতি লয় করে,
মাতা, কন্যা, শক্তিরূপা "নীলা"।





শিল্পীঘন

— শ্রী বীজেন্দ্র মোহন ঘোষ —

(পূর্বস্মৃতি : আশ্বিন, ১৩৭১ সংখ্যার পর)

নাট্যাভিনয়ের ভিড়টা ভেঙে পড়লো মেলায়।

সম্ভ্রান্ত নাগরিক ঝাড়া এসেছিলেন নগরস্ত্রী চারুশ্রিতার অভিনয় দেখতে তাঁরা গৃহে ফিরে গেলেন, কিন্তু সাধারণ নগরবাসী ও দূরাগত গ্রামবাসীরা আনন্দ-অহুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হয়ে মেলায় ঘুরতে লাগলো। মেলার ক্ষেত্র জনবহুল হয়ে উঠলো।

দেবকুমার গঙ্গার ঘাটের এক সিঁড়ির উপর বসেছিল, কোন এক সময় কয়েকজন তরুণ সেখানে এসে বসলো। তাদের অনর্গল কথায় দেবকুমার যে শাস্তিটুকু এতক্ষণ উপভোগ করছিল তা বিস্মিত হলো। সে এতো কাছাকাছি এত কর্তব্যের সহিতে পারলো না, উঠে পড়লো। কিন্তু যায় কোথায়? যাত্রীনিবাসে আজ সারারাত তো এই অবস্থা। দেহে ক্লান্তি না থাকলেও দেবকুমার মানসিক ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়লো। যাই হোক, নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে বলে সে উঠে পড়লো।

যাত্রী-নিবাসে প্রবেশ করতে যাবে, এমন সময় ভীড়ের মধ্যে কে যেন তার হাত ধরলো। দেবকুমার মুখ

কেরালো, পাশে আনন্দ। আনন্দ হেসে বললো—
আনন্দ।

দেবকুমারকে আনন্দ নিয়ে গেল। বরাবর মেলার ক্ষেত্র পার হয়ে গঙ্গার তটরেখা খানিকটা বেঁকে গিয়ে পুষ্পবীথির সঙ্গে মিশেছে। সেখানে এক গাছতলায় বাধানো বেদীর উপর বিন্দন বসেছিল, আনন্দ বললো—
এই নিন্, পৌছে দিয়ে গেলাম, আমার কাজ শেষ।

বিন্দন মাথাটা একটু ছলিয়ে শাস্তকণ্ঠে বললো—
হ্যা, তুমি এখন যেতে পার।

আনন্দ চলে গেল।

বিন্দন এবার দেবকুমারকে বললো—কাঁকন-বিক্রী
করেছ?

—না। চেষ্টা করিনি। এই নাও।

কোমরে জড়ানো কাপড়ের বন্ধনীর মধ্যে থেকে দেবকুমার কাঁকনটি বের করে বিন্দনের হাতে দিল। বিন্দন বিনা বাক্যব্যয়ে হাতে পরে নিল। তারপর বললো,
—তুমি কিছু করতে পারবে না, তা আমি আন্দাজ করে-
ছিলাম। যাক, এখন যাবার জন্য তৈরী হয়ে বেরিয়েছ
তো, না এইখানেই বসে বসে মন্দিরের পাথর কাটবে?

—সে সংবাদ তুমি জানো?

—খবর জানতে হয় না, আমার কাছে এসে
পৌছায়।

—দেবমূর্তি খোদাই করার মধ্যে আমি কোন উৎসাহ
পাই না।

—তবে চল।

বেদীর পাশ থেকে একটা ছোট কাপড়ের পুঁটলি
তুলে নিয়ে বিন্দন দেবকুমারের হাত ধরলো।

দেবকুমার বললো—কোথায় যাবো?

—যেদিকে ছুঁচোখ যায়, এ নগরে আমি আর একদণ্ড
থাকবো না।

ছুঁজনে পুষ্পবীথির পথ ধরলো। রাত দ্বিতীয় প্রহর
শেষ হবার আগেই পুষ্পবীথির পথ শেষ করে তারা মাঠে
নামলো। বিন্দন বললো—নাট্যাভিনয় থাকলে বেক্রমে
রাত তিনপ্রহর হয়ে যেতো, ভগবান সুবিধা করে
দিয়েছেন।

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করলো—অভিনয় বন্ধ হলো কেন?

—নতুন রাজার বিপদ ঘটেছে। মালবের রাজার সঙ্গে নতুন রাজার লড়াই হয়েছিল। সে যুদ্ধে নতুন রাজা জেতেন। কিন্তু তারপর গোঁড়ের রাজা শশাঙ্ক নতুন রাজাকে নিজের শিবিরে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান, সেখানে নাকি নতুন রাজা খুন হয়েছেন।

—গোঁড়ের রাজা শশাঙ্ক নতুন রাজার ভাই তো।

—মামাতো পিসতুতো ভাই, কিন্তু রাজা হিসাবে জ্ঞাতিশক্র। রাজ্যের ব্যাপারে ওসব ভাই-টাই বলে কিছু নেই। খুঁড়তুতো-জ্ঞাঠতুতো ভাইয়ের লড়াই নিয়ে তো অতবড় মহাতারত লেখা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান তিনিও সে যুদ্ধে বঞ্চে পারেন নি। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও লড়াই জেতার জ্ঞাত মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

—রাজারা বহু পাপ করে।

—একজন মানুষ যখন দশজন মানুষের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে চায়, তখন মিথ্যে কথা, ছল-চাতুরি, খুন-জখম—এ সবের তো দরকার হবেই। মানুষ ভয় না পেলে হকুম মানবে কেন? সঙ্কল্প কখনও রাজা হতে চায় না, সে সর্লভ্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যাবে।

—নতুন রাজা যদি খুন হয়ে থাকেন, তাহলে শশাঙ্কই তো এখন এখানকার রাজা হয়ে বসবে।

—না, এখনই রাজা হতে পারবে না। রাজার ভাই মৈত্র নিয়ে গেছে, আরেকটা লড়াই হবে। তাতে যে জিতবে সেই হবে এখানকার রাজা।

—রাজার ভাই ওই সুবরাজ হর্ষবর্দ্ধন তো?

—হ্যাঁ।

—ওঁর বয়স তো খুব অল্প, ও কি গোঁড়ের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে পারবে?

—ও কি আর নিজের বুদ্ধিতে লড়াই করবে? ওর সঙ্গী আছে ভাণ্ডী, সে লোকটি নাকি খুব বুদ্ধিমান, তাছাড়া শঙ্কর ভৈরবও সঙ্গে আছেন, তিনি থাকতে সুবরাজের কোন বিপদ ঘটবে না।

—যদি কোন বিপদ ঘটে তা হলে তো অরাজক অবস্থা।

—সে তো বটেই। এই খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই পারিষদ মহলে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেই চাকল্যের মধ্যে আমি কঙ্কুর দৃষ্টিতে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। মানুষটি সব সময় আমাকে চোখে চোখে রেখেছিল। স্নান করতে যাবার সময়েও সঙ্গে পরিচারিকা পাঠাতো। নতুন রাজার বিপদের খবর পেয়ে সবাই যখন অস্তমনস্থ হয়ে পড়েছে, সেই অবসরে আজ সবাইকার চোখকে ফাঁকি দিয়েছি।

—আজ রাতে পালিয়ে আসবে বলে তুমি তো আগে থেকেই কন্দী করে আমায় জানিয়েছিলে।

—তবেছিলাম যেভাবেই হোক শেষ রাতে বেরিয়ে পড়বো, কিন্তু তার আগেই স্বেচছগ পেয়ে গেলাম।

কথায় কথায় ধানক্ষেত পার হয়ে তারা এক গ্রামে এসে পড়লো। অতো রাত্রেও গ্রামে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। গ্রামের বাড়ীগুলির পিছনে আলোর আভাষ দেখা গেল। একটা মন্দিরের ছায়া মাথা তুলেছে আকাশে। শিবচতুর্দশীর রাতে ধর্মপ্রাণ গ্রামবাসীরা ঘুমায়নি, রাত জেগে দেবতার অর্চনা করছে। বিন্দন ও দেবকুমার মন্দিরের দিকে গেল না। সোজা পথ ধরে গ্রাম পার হয়ে গেল। এবার সামনে পড়লো বনভূমি, চতুর্দশীর ঘন অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে। দেবকুমার বললো—এ পথে এই রাতে পথ হারিয়ে যাবে।

বিন্দন বললো—এ পথ আমার চেনা। একটু গিয়েই এক সঙ্করাম আছে। মহারাজ অশোকের তৈরী সঙ্করাম। এখন আর সেখানে কেউ থাকে না, সেইখানেই আজ রাজিবাস করবো। এই পথে আমি ক'বার যাওয়া-আসা করেছি।

বিন্দনের কথাই সত্য। সেই বনমধ্যে কয়েক রশি এগিয়ে যেতেই পথের পাশে হুমুড়ি-খেয়ে-পড়া এক দৈত্যের মত একখানি বাড়ী চোখে পড়লো। বিন্দন বললো—এই তো, পৌছে গেছি।

রোয়াকের উপর মাথার পুঁটলিটা নামিয়ে, তার ভিতর থেকে সে কিছু শুকনো খড় আর চক্মকি বের করলো। বললো—আগে আসুন জালি, অন্ধকার ঘরে ঢোকা ঠিক হবে না, সাপ ব্যাঙ কি আছে কে জানে।

খড়গলো পাকিয়ে লম্বা করে নিয়ে, চক্ষু মকি ঠুকে তাতে আশ্রয় জেলে, বিন্দন সেই জলন্ত খড় হাতে নিয়ে সামনের ঘবখানির মধ্যে ঢুকলো। ঢুকেই সে খুশী হলো, ঘরের একপাশে একটা ধুনী রয়েছে। আধপোড়া অনেক কাঠ-কুটো পড়ে আছে, দু'একদিন আগে কেউ এখানে রাজিবাস করে গেছে। সেই ধুনীতেই বিন্দন নতুন করে আশ্রয় দিল। বললো—যাক, আশ্রয়ের মত নিশ্চিন্ত হলো।

অনেক পথ হাঁটা হয়েছিল, এবার দু'জনে আশ্রয়ের পাশে বসে পড়লো।

অচেনা পরিবেশে অরক্ষিত অবস্থায় শুয়ে পড়ার সাহস হলো না। দু'জনে বসে বসে গল্প শ্রবণ করলো। বিন্দন বলতে থাকে নিজের কথা, দেবকুমার চুপ করে শোনে। আশ্রয়ের আশ্রয় বিন্দনের তপ্তকাণ্ডের মত মুখ রক্তভ হবে জল জল করতে থাকে, কথায় কথায় চোখের কোলে কাজলের রেখা যেন নেচে ওঠে, শাদা ছুধের মত দাঁতগুলি লুকোচুরি খেলতে থাকে লাল ঠোঁটের পাশে পাশে। ওর কথা যত না শোনে তার চেয়ে ঢের বেশী ভাল লাগে ওর মুখের পানে তাকিয়ে থাকতে। দেবকুমার যত দেখে তত মনে হয় নিরাশার চেয়ে বিন্দনের জৌলুষ অনেক বেশী। নিরাশার রূপ ছিল, কিন্তু সে রূপে এমন ঐচ্ছল্য ছিল না। বিন্দনকে নিয়ে সংসার সাজালে নেহাৎ খারাপ হয় না। দেবকুমারের মন টলতে থাকে।

বিন্দন বলতে থাকে তার জীবনের কথা। প্রতিষ্ঠানের নগরশ্রীর খ্যাতি ছিল তার মায়ের। কয়েক বছর তার মায়ের মত নর্তকী ও গায়িকা প্রতিষ্ঠানের জনপদে দ্বিতীয় ছিল না। সম্রাট প্রভাকরবর্দ্ধন এজন্ত তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। পুষ্পবীথির এক উত্তানভবনে তিনি থাকতেন। কিন্তু বিলাস ও বৈভব এবং রাজপুরুষদের চিত্তবিনোদন তাঁর কাছে খুব প্রীতিপদ ছিল না। কত রত্নাবলীকে তিনি এই পরিবেশ থেকে তক্তাতে রাখতে চেয়েছিলেন। সম্রাটের অনুরোধে নগরশ্রীর সূদর্শনা কতাকে সঙ্গীত-চর্চা করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু মা চেয়েছিলেন এই বহু-পুরুষ-

সঙ্গ-বিনোদিত জীবন থেকে মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে পুরোপুরি গার্হস্থ্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। সেজন্ত গোপনে তিনি উপযুক্ত শ্রেষ্ঠপুত্রের সন্ধান করছিলেন। কিন্তু সেদিকের সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে উঠলো সম্রাট-তনয় মাধবগুপ্ত। কুক্ষণে মাধবগুপ্তের নজরে পড়ে গেল রত্নাবলী। পুষ্পবীথিতে মাধবগুপ্তের গতিবিধি বৃদ্ধি পেল। নগরশ্রী তা প্রতিরোধ করতে পারলেন না। নগর ত্যাগের সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। ইতিমধ্যে মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে রাজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহের কথা উঠলো। কনৌজের গ্রহবর্ষাও ছিলেন রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী। সম্রাট কার হাতে কন্যা সম্প্রদান করবেন সেই সম্পর্কে বিধায় পড়লেন। রাজা দু'জনের মধ্যে কে শেষে সেই সম্পর্কে দেখে শুনে আসার জন্ত নগরশ্রীকে নিযুক্ত করলেন। নগরশ্রী এই ধরনের সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে উজ্জয়িনীর মহাকাল দর্শনে বেরিয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য রইল মালবের দেবগুপ্ত সম্পর্কে সকল তথ্য সংগ্রহ করে আনা, এবং পথে যোগ্য পাত্র মিললে রত্নাবলীকে সম্প্রদান করা।

উজ্জয়িনীতে মাসাধিক কাল অবস্থান করে নগরশ্রী ফিবলেন। ফেরার পথে মণ্ডলেশ্বরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গ্রীষ্মকালে মালবের উষর প্রান্তরের আবহাওয়া নগরশ্রীর সহ্য হয়নি। সিদ্ধিনাথের কাছে সূচিকিৎসার সম্ভাবনা আছে জানিয়ে কঙ্কী তাকে এক গৃহে নিয়ে যায়। সেখানে সিদ্ধিনাথের গুরীশুটি খেয়ে রোগ উপশম না হয়ে রোগ বৃদ্ধি পেল। কয়েকদিনের মধ্যে নগরশ্রীর মৃত্যু ঘটলো। রত্নাবলী চোখে অন্ধকার দেখলো। তার সেই অসহায় অবস্থায় শ্রেষ্ঠপুত্র কল্যাণকুমার জানালো যে, সে রত্নাবলীকে বিবাহ করবে। রত্নাবলী অকুলে কুল পেল, কল্যাণকুমারের গৃহে গিয়ে উঠলো। মায়ের কাছে গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-সাম্রাজ্যের অনেক কথা সে শুনেছিল, এই জীবনকে গ্রহণ করার জন্ত সে মনে মনে তৈরী হয়েছিল। কল্যাণকুমারকেই সে সানন্দে পতিত্ব বরণ করে নিল।

কিন্তু যে সুখের স্বপ্ন সে দেখেছিল তা কয়েকদিনের

মধ্যেই ভেঙে গেল। সে জানতে পারলো সিদ্ধিনাথ রত্নাবলীকে সংগ্রহ করে দেবার জন্ত কল্যাণকুমারের কাছ থেকে অর্থ পেয়েছে। ধনীপুত্রদের মনোমত নারী সংগ্রহ করে দেওয়াই সিদ্ধিনাথের পেশা। তাছাড়া ধনীপুত্রদের সিদ্ধি পান করিয়েও সিদ্ধিনাথ অর্থ উপার্জন করে। কল্যাণকুমারও সেই সিদ্ধিসেবীদের একজন।

যত দিন যায় কল্যাণকুমারের উপর রত্নাবলীর বিতৃষ্ণা ততই বাড়তে থাকে। কল্যাণকুমারকে ছেড়ে চলে যাবার জন্ত সে উৎসুক হয়ে ওঠে। একবার সে ঘর ছেড়ে পালিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু কল্যাণকুমার তার পিছনে ধাওয়া কবে তাকে ধরে আনে এবং বেজাঘাতে তাকে সজ্জরিত করে তোলে। কিছুদিন বাড়ী থেকে পথে বেরবার সুযোগ অবধি সে পারনি। কল্যাণকুমার কঙ্কালীকে নিযুক্ত করে তাকে পাহারা দেবার জন্ত। অনেক দিন পরে এবার রত্নাবলী সুযোগ পেয়েছিল। পালিয়ে এসেছিল দেবকুমারের সঙ্গে। এই পলায়ন তার সার্থক হয়েছে। কিন্তু বিপদ সে একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

নগরশ্রী ফিরছে এ সংবাদ রাজকুমার মাধবগুপ্ত জানতেন, পথে তিনি গুপ্তচর রেখেছিলেন। সেদিন রাজ্যে এক গুপ্তচর মুক্ত কপাণ হস্তে মৃত্যুভয় দেখিয়ে মন্দিরের অতিথিশালা থেকে রত্নাবলীকে নিয়ে আসে প্রতিষ্ঠানে। সম্রাটনন্দন মাধবগুপ্তের প্রমোদভবনে তাকে পৌঁছে দেয়। কিন্তু এই জীবন থেকে সে পরিত্রাণ চায়, তাই সে আবার পালিয়েছে। এবার সে মনস্থির করেছে—হয় মুক্তি নয় মৃত্যু। যদি রাজপুরুষদের হাতে ধরা পড়ে সে আবার দুর্গমধ্যে নীত হয়, তাহলে সে গঙ্গায় ডুবে মরবে।

দেবকুমার এতক্ষণ চূপ করে শুনছিল, বললো—তোমার নাম রত্নাবলী, তাহলে তোমাকে বিন্দন বলে কেন?

—ওটা আমার ডাক-নাম। শৈশবে আমি নুপুরের নিকণ বড় ভালবাসতাম, সেই নুপুরকে বলতাম ঝন্ ঝন্, তাই থেকেই কেমন করে যেন আমার ডাক-নাম হয়ে গেল বিন্দন।

—রত্নাবলী নামটাই তো ভালো। বিন্দন নামটা কেমন যেন জংলী বলে মনে হয়।

—নাম কিছু নয়, মাহুষ নিয়ে কথা। কল্যাণকুমার নাম কত ভালো, কিন্তু মাহুষটি কি?

—দেবকুমার কিন্তু নাম ও মাহুষ দুই-ই ভালো, বল? বিন্দন খিল খিল করে হেসে উঠলো, তারপর হাসি ধামিয়ে বললো—তুমি আমার মনের মাহুষ। প্রথম থেকে কেন জানি না তোমাকে আমার ভালো লেগেছে।

একটা উত্তর শোনার জন্ত বিন্দন দেবকুমারের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু দেবকুমার কোন জবাব দিলে না।

বিন্দন কিছুক্ষণ শুন্ম হয়ে বসে রইল। দেবকুমারের দিক থেকে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে রইল ধূনীর প্রচ্ছলিত কাঁঠগুলির পানে। থমথমে আবহাওয়া ক্রমে অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। কোন একসময় দেবকুমার বললো—কি হলো, কথা কও না যে?

—ভাবছি—বিন্দন সংক্ষেপে জবাব দিল।

—কি ভাবছ?

—ভাবছি আমার অদৃষ্টের কথা। জীবনে আমি শাস্তি চেয়েছিলাম, ছোট একটা সংসারে শাস্তিতে জীবন কাটাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার এমনই অদৃষ্ট যে, বাইশ বছর বয়সের মধ্যে সৈ শাস্তি পেলাম না। আমার বয়সী কত মেয়ে ছেলেপুলের মা হয়ে দিবি সংসারের গিন্নী হয়ে বসেছে, স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু পূর্বজন্মে আমি এমনই কিছু পাপ করেছিলাম যার জন্ত এ জন্মে আমি জুখী হতে পারলাম না।

আঙনের আভাস বিন্দনের চোখ দুটি চিক্ চিক্ করে উঠলো। বড় বড় ছ' কৌটা জল দেখা দিল গালের উপর। দেবকুমার একটু অবাক হলো, তারপর বললো—তুমি কাদছ?

বিন্দন সম্মল ছুটি চোখ দেবকুমারের মুখের উপর তুলে ধরলো।

দেবকুমারের কি যেন মনে হলো, ধীরে ধীরে বিন্দনের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিল।

ঝিন্দন ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। তারপর সহসা দেবকুমারকে হু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার বুকের মধ্যে মুখ রেখে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো—তুমি আমাকে নিরাশ করো না, তুমিই আমার সব। তোমাকে নিয়ে আমি ঘর বাঁধতে চাই। আমি ছেলে চাই, যে তোমার চেয়ে ভালো ভাস্কর হবে, আমার চেয়ে ভালো গাইবে হবে।

দেবকুমার একটু খতিয়ে যায, তারপর হেসে উঠে, হু'হাত দিয়ে ঝিন্দনের মুখখানি তুলে ধরে বললো—তুমি একটা বদ্ধ পাগল, এর জন্ত এতো কাঁদবার কি আছে? চুপ কর!

তারপর ঝিন্দনের অশ্রুসিক্ত অধরের সঙ্গে নিজের অধর মিলিয়ে দেয়। চোখের জলের একটা লবণাক্ত স্বাদ লাগে মুখে।

রুদ্ধ আবেগে ঝিন্দনের শরীর কাঁপতে থাকে। ধীরে ধীরে সে এলিয়ে পড়ে দেবকুমারের বুকের উপর। দেবকুমার তার মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলাতে থাকে।

ঠিক সেই সময় মুক্ত গৃহদ্বারে একটি মাছ এসে দাঁড়ালো। অন্ধকারে তাকে স্পষ্ট চেনা যায় না। কিন্তু সেদিকে তখন কারও নজর ছিল না, ঝিন্দন ও দেবকুমার তখন পরস্পরের অহুভূতির মধ্যে তন্ময় হয়ে ছিল।

মাহুঘটি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপরই লাফিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। ঝিন্দন ও দেবকুমার চমকে উঠলো।—কে? কে?

—আমি কল্যাণকুমার।

—তুমি?

—হ্যাঁ, আমি?

কল্যাণের হাতে একখানি ধারালো ছুরিকা আগুনের আভাষ চক্ চক্ করে উঠলো, পরক্ষণেই ঝিন্দন আর্জনাৎ করে উঠলো। দেবকুমার তাড়াতাড়ি কল্যাণকে বাধা দিতে গেল, কিন্তু তার আগেই কল্যাণ ঝিন্দনকে আঘাত করলো। তারপর সেই ছুরিকা আবার তুললো দেবকুমারের উপর, বললো—ওর সঙ্গে তুইও মর?

দেবকুমার বাধা দিতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই বাম বাহতে সে আঘাত পেল। দেবকুমার কয়েক পা পিছিয়ে গেল। কল্যাণ ছুরিকা হাতে লাফিয়ে পড়লো দেবকুমারের উপর। দেবকুমার ধূনীর আগুনের উপর গিয়ে পড়লো। জলন্ত অগ্নির স্পর্শে চকিতে সে একখানি জলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে কল্যাণকে আঘাত করলো। কল্যাণ সেই আঘাতে ঘুরে পড়ে গেল আর উঠলো না। কিন্তু ইতিমধ্যে দেবকুমারকে যে আঘাত সে করতে চেয়েছিল সে— আঘাত সে করেছে, দেবকুমারের কাঁধে কল্যাণের হাতের ছুরিকা তখন বসে গেছে। বেদনার একটা বিহ্বল-স্পর্শে দেবকুমারের বুকের মাঝে টনটন করে উঠলো। কেমন যেন মাথাটা টলে গেল, একটা কালো কুয়াশা নেমে এলো চোখের সামনে। একটা কঠিন অন্ধকারের ভার কে যেন চাপিয়ে দিল মাথার উপর। দেবকুমার বসে পড়লো সেইখানেই।

(ক্রমশঃ)

জহর-জ্যোতি

শ্রীমুখীর গুপ্ত

এখন সে ইতিহাস। মহাকাল-মন্দির-চত্বরে
ডয়ক-ভিত্তিমে বাজে ক্ষুদ্র-কুল তা'রও জয়গান।
ধীরে ধীরে তীর্থ-তীরে নিন্দা-স্তুতি হবে বেপমান ;—
স্বনি—প্রতিস্বনি তা'রও কাল হ'তে যাবে কালান্তরে
তুরন্ত তরঙ্গ-ভরে। ধূস্র-নীল উদ্ভূত অঘরে
চলন্ত বাজন্ত মেঘে মহামন্ত্রে স্বনিবে সে তান।
এখন সে ইতিহাস। অধা-শান্ত সে হৃদান্ত প্রাণ।
ইতিহাস হ'লে আর জীবন তো কিছুতে না মরে।

নানী মূর্তি গড়ে তা'র যুগ-শ্রোতে জন-শ্রুতি যত
প্রধাবন্ত-জীবনের নিরন্তর-উত্থান-পতনে।
নিত্য-পরিবর্তমান মহাকাল-নির্দ্ধারিত ব্রত
সঙ্কিত সে-ইতিহাস উদ্দীপিত করে উদ্দ্বাপনে।
এখন সে ইতিহাস ;—কালোত্তীর্ণ দেবতার মত।
ঐতিহাসী অমরতা মর-লোকে লভে কয়জনে! *

* লোকান্তরপ্রাপ্ত শ্রীমহরলালের ৭৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে রচিত।

সুন্দরের আবির্ভাব

অধ্যক্ষ শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু, এম. এ.

জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে।

কৃষ্ণ আবির্ভাব কৈল গুণরাজ তণে।

(শ্রীকৃষ্ণবিজয়)

কংসের কারাগারে জন্ম হোল বাসুদেবের, স্থান হোল
নন্দালয়ে। বৃন্দাবনে আনন্দের রোল উঠিলো। নন্দপুর
চন্দ্রালোকে তমসা অপহৃত হোল। ব্রজবাসীনের আনন্দ
আর বাধা গানে না। নন্দনন্দনের মুখচন্দ্রদর্শনে ব্রজবধূদের
নয়নচকোর লুকু হ'য়ে উঠিলো।

গোপের রমণী যত চৌদিগে শত শত

মুখ হেরি লহ লহ বোলে।

মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হলহলি

আরতি করয়ে কুতূহলে ॥

জালিয়া রতন বাতি করে সবে আরতি

হরষিত যশোমতী মাই।

কহে বলরাম দাসে আনন্দ সাগরে ভাসে

দৌহ রূপের বলিহারি মাই ॥

ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'লেন। পাপ-তাপ-পীড়িত,
ক্লান্ত পৃথিবীতে দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশের, সাধুদের
পরিজ্ঞান ও ধর্মসংস্থাপনের জন্ত তাঁর আবির্ভাব ঘটিলো।
এ আবির্ভাব যুগে যুগে ঘটেছে—শ্রীভগবান বার বার
মাটির পৃথিবীতে দেখা দিচ্ছেন। এই তো সেদিনও
পৃথিবীর কলুব কালিমা মুছে দিতে প্রাণের ঠাকুর
শ্রীগোবিন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল। এ লীলার শেষ নেই—
মানস-বৃন্দাবনে নিত্য লীলা চলেছে—‘কোন কোন
তাগ্যবান দেখিবারে পায়’।

সকলের সে ভাগ্য হয় না—সে সাধনা নেই। এ যে

সব দেওবার সাধনা—আপনাকে নিঃশেষ করে। এ
সাধনার স্তর ভেদ আলাদা। এ জানার কথা নয়—জ্ঞানে
কিছু হয় না। লীলার আশ্বাদন কর্মফলে কুলায় না।
এর ভিন্ন বৃত্তি—মার্গও ভিন্ন। গীতায় ভগবান বললেন,—

“ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈ ন দানৈ

ন চ ক্রিয়ান্তি ন তপোভিরূপৈঃ।

বেদপাঠ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান-ক্রিয়ামুষ্ঠান বা উগ্র তপশ্চাষ

আমাকে পাওয়া যায় না। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যও সেই কথা
বলেন,—

“কিস্তো মস্তে কিস্তো তস্তে কিস্তোরে ঝাণ বখানে।”

মস্তে তস্তে এবং ধ্যানে কিছুই হয় না। তবে হয় কিসে?
কিরূপে সেই আনন্দস্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়?
ভগবান বললেন,—

মৎকর্ম্যকৃৎ মৎ পরমো মদুত্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাওব ॥

(গীতা ১১।৫৫)

অর্থাৎ যিনি আমার জন্তই কাজ করেন, আমার ভক্ত
কামনারহিত ও সর্বপ্রাণীতে প্রীতিযুক্ত তিনিই আমাকে
পান।

প্রহ্লাদ এ কথা বুঝেছিলেন—তাঁর অন্তরে কৃষ্ণনাম
জাঁকা হ'য়ে গিয়েছিল। তাঁর শয়নে, অপনে, জাগরণে
সর্বত্র সবসময়ে অধরে কৃষ্ণনাম। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু
প্রহ্লাদের শিক্ষক বণ্ড আর অমর্ককে আদেশ দিলেন—
কৃষ্ণমুখি প্রহ্লাদকে সম্পদমুখি করতে। কৃষ্ণনাম যে
তিনি সহ করতে পারেন না। শিক্ষকবধ প্রাণপণ করলেন
প্রভুবাক্যরক্ষায়। কিছুদিন পরে হিরণ্যকশিপু পুত্রকে
ডেকে তার পাঠের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। প্রহ্লাদ
বললেন,—

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দান্তং সখ্যামান্ননিবেদনম্ ॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণো ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।

ক্রিয়েত ভগবত্যাক্ষা তদ্ব্যক্তেঽধীত মৃতমম ॥

—শ্রীমদ্ভাগত

অর্থাৎ বিষ্ণুর নাম-গুণ-লীলা শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, বিষ্ণুর
পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দান্ত, সখ্য এবং বিষ্ণুকে
আশ্বনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি তাঁকে সাক্ষাৎভাবে
অর্পণ করাই আমি উত্তম অধ্যয়ন বলে মনে করি।

চাই আত্মসমর্পণ। সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে এই
বিচরণ। কথায় বলে ‘মান লঙ্ঘা ভয় তিন থাকতে নয়।
আপনা ভুলে, জগৎ ভুলে, পারিপার্শ্বিককে ভুলে বৃন্দাবন-

চক্ষের পায়ে আঙ্গনিবেদন করতে হবে। আর্তি থাকা চাই
নিবেদনের মধ্যেই তো জোর। নরোত্তম ঠাকুর বললেন,—

“হরি হরি হেন দশা হইবে আমার।

তুই মুখ নিরখিব তুই অঙ্গ পরশিব

সেবন করিব দৌহাকার ॥

ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে

মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।

কনক সম্পূট করি কর্পূর তাহুল ভরি

যোগাইব অধর যুগলে ॥

রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবন, সেই মোর প্রাণধন

সেই মোর জীবন উপায়।

জয় পতিতপাবন দেহ মোরে এই ধন,

তোমা বিহু অত নাহি ভায় ॥

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু

লোকনাথ লোকের জীবন।

হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া

নরোত্তম লইল শরণ ॥

সমস্ত জীবকুল নিরন্তর সাধনা করে চলেছে। এ সাধনা
সুন্দরের—পরম সুন্দরের সান্নিধ্যলাভের সাধনা। এই
জগৎ সুন্দর, মানুষ সুন্দর, সৃষ্টি সুন্দর,—সুন্দর সৃষ্টির
কারণ যিনি, তিনি না জানি কেমন সুন্দর। এই সৌন্দর্য-
ভূমিই তো চরম ভূমি, সৌন্দর্য-দর্শনই স্বরূপ দর্শন, আর
সৌন্দর্য্যভাবই পরম প্রাপ্তি। কবি জ্ঞানদাস বললেন,—

“রূপ লাগি আঁখি বুঝে গুণে মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥”

তখন সাধকের চোখে সব কিছু সুন্দর হয়ে ফুটে উঠলো।

মাটি সুন্দর, ফুল সুন্দর, সূর্যকিরণ সুন্দর, ফুল্লজ্যোৎস্না
সুন্দর, কৃষ্ণ-অঙ্ককার সুন্দর,—সব সুন্দর। কিন্তু এতে কি
মন ভরে? এহো বাহু—আগে কহ আর। এই সুন্দরের
বৃত্তিই তো সাধনা। ক্রমে চিত্ত রূপের রসের দিক থেকে
যায পরম সুন্দরের দিকে—রসামৃত সিঞ্চুর দিকে। যে
একবার এই রসের স্বাদ পেয়েছে—সে কি ঠিক থাকতে
পারে! অখণ্ড সৌন্দর্য্যভিমুখে শুরু হয়েছে তার
অবিরাম অভিসার যাত্রা। বাউল বললেন,—

“তুমি যে সুরের আঙ্গুন লাগিবে দিলে মোর প্রাণে।

এ আঙ্গুন ছড়িয়ে গেল সবখানে ॥”—(রবীন্দ্রনাথ)

এই সুন্দরের বৃত্তে ষাঁদের পদচারণা তাঁরা কি অসুন্দরকে
দেখতে পারেন? তাঁদের চোখে সব সুন্দর। সুন্দর বলে
সুন্দর নয়—পরম সুন্দরের আলোয় তাঁদের দৃষ্টিই সুন্দর।

আমি যাকে সুন্দর বলেছি উপনিষদ তাকে বলেছেন
আনন্দ। “আনন্দাত্মো যঃ সঞ্জিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যতি সং-
বিশন্তি ॥” আনন্দ থেকেই ভূতসকল জন্ম গ্রহণ করেছে;

আনন্দই বেঁচে থাকে—শেষে আনন্দই লয় পায়।

আনন্দই অমৃত—নিরানন্দই মৃত্যু। আনন্দিতির মৃত্যু

নাই। আনন্দই সত্যবস্তু, আনন্দকে জ্ঞান, আনন্দের

আত্মদান কর—‘রসো হ্রেস্বায়ং লঙ্কানন্দী ভবতি’।

‘আপনি আত্মদান করে সেই আনন্দ আপনকে দান

করো’। আনন্দকে জানতে হলে জগৎকে ভালবাসতে

হয়। জগৎকে ভালবাসলে জগদীয়কে ভালবাসা যায়।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাহুয় আনন্দ নেই—কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-

বাহুয় আনন্দের প্রকৃত স্বরূপ।



উত্তর

ইন্দু গুপ্ত

জন্মের আগে এবং জন্মের পবে

একটা কিছু আছে;

কিন্তু সেটা কি?

—এ প্রশ্নের উত্তর য়েলে নি’।

দীপ শিখাটা জ্বলছে...

চিরকাল স্থিতিবিড় জ্বলছে।

এই দীপ শিখাটা একদিন নিভবে।

তখন হয়ত মানুষের

এই প্রশ্নের উত্তর দেবে সে,

নিরন্তর উত্তরে।

মহাপ্রয়াণে
সঙ্ঘ-সভাপতি
শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত



প্রবর্তক সঙ্ঘের অধ্যক্ষ অগ্রজ ও দ্বিতীয় সভাপতি পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত গত ২৪-এ আশ্বিন (ইং ১১।১০।৬৪) রবিবার বেলা ১০টা ২৫ মিঃ-এ মর্ত্য দেহ সংবরণ করিয়া ইষ্ট পদে লীন হইয়াছেন। প্রয়াণ কালে তাঁর পার্শ্বিণী আশু হইয়াছিল প্রায় ৭১ বৎসর। কিছুকাল যাবত তিনি নানারূপ শারীরিক অসুস্থতায় ভুগিতেছিলেন। সম্প্রতি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেও, তিনি যথাকর্তব্যের নির্দেশ দিতে কখনও বিরত হন নাই। একটি মুহূর্তের ক্ষণও তাঁর সেই প্রশন্ন বদন, সুমিষ্ট ভাষণ, কারুণ্যভরা আঁখি ও ওষ্ঠপুটে হাসির অভাব দেখা যায় নাই। সমর্পিত চিন্তা ও আত্মনিবেদনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিল শ্রীদত্তের অসাধারণ জীবন। অসহ রোগযন্ত্রণাকেও হাসি মুখে মায়ের দান বলিয়া তিনি গ্রহণ করিতেন। বলিতেন, “এ জীবন লইয়া মায়ের অপূর্ণ লীলাখেলা চলিয়াছে। মা-ই এ দেহটাকে ভালিয়াচুরিয়া তাঁর কাজের উপযোগী করিয়া লইতেছেন।” রোগে তিনি কখনও কাতর হন নাই। ভোগও তাই তাঁর কাছে, ছিল সম্ভোগ্য। জীবনের শেষ সাপ্তাহিক প্রান্তে তাঁর প্রশান্ত চেতনায় আলোড়ন দেখা যায়। দুই বাহু বাড়াইয়া তিনি শ্রীশঙ্কর-শ্রীমাকে সন্মোদন করিতেন। বুঝিবা তাঁর সর্বোৎসর্গীকৃত মগ্ন চেতনায় ইষ্টের উপস্থিতি ঘনায়মান হইয়া উঠিতেছিল। মৃত্যুর ঠিক চার দিন পূর্বে রোগজীর্ণ শরীর ত্যাগের সুস্পষ্ট ইচ্ছার অভিব্যক্তি দিলেন। তারপর ক্রমশঃই আত্মসমাহিত হইয়া পড়িলেন। ২৪-এ আশ্বিন মহাষষ্ঠীর পূর্বাহ্ণে। শান্ত সমাহিত চেতনায় ইষ্ট-অরণবিভোর সঙ্ঘ-সভাপতি শঙ্কাকুল সঙ্ঘ-সভ্য-সভ্যা পরিবৃত হইয়া গীতা পাঠ ও ব্রহ্ম নাম শুনিতে-শুনিতে মহাসমাধিতে মর্ত্য অর্জিত্ব বিলীন করিলেন।—প্রঃ সঃ।

আত্মকথা

শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত

[শ্রীশ্রীগঙ্গাধরজীর পরবর্তী প্রবর্তক-সম্ম-সভাপতি শ্রীনলিনচন্দ্র দত্তের অ-সাধারণ উৎসর্গীকৃত জীবনের অতলস্পর্শী মহিমা লেখনীমুখে ব্যক্ত হইবার নয়। তিনি এত নিরতিমান, নিরহঙ্কার, বিনয়-নম্র ও নিজেই সম্বন্ধে নীরব ছিলেন যে, তাঁর জীবনের বিশ্লেষণ-খতিয়ান করা অতি ঘনিষ্ঠের পক্ষেও দুঃসাধ্য। তাঁর স্ব-ভাবে সৌরভে আমোদিত ছিল পরিবেশ, কিন্তু জীবনকোরকটি ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে সংগোপিত। পাণ্ডিত্য নয়, তর্কবিতর্ক নয়, তত্ত্ব-দর্শনের বিচার নয়, তাঁর স্বিষ্ট মধুর হাসি, তাঁর অনাবিল প্রেমস্পর্শ মানুষকে কাছে টানিত, আপন করিষা লইত। শ্রীদত্তের অন্তরঙ্গ জীবনের একটুখানি আভাস মিলিবে তাঁরই আত্মকথায় যাহাই সম্বন্ধে স্মৃতি সংখ্যা প্রবর্তক (আবান, ১৩৬৬) হইতে এখানে উদ্ধৃত হইল। —প্রঃ সঃ]

আজ এই জীবনের সায়াহ্নে এসে পুরানো দিনের কথা ভাবি আর হাসি—আর করতালি দিয়ে বলে উঠি—‘জন্ম গুরু শ্রীভগবান।’ আভিজাত্য নিয়ে জন্ম, সংসারের সকলেই জ্ঞানী, গুণী, সম্মানী—কৈশোর থেকেই আমারও তাই ছিল কত রঙীন স্বপ্ন—বিদ্যার, গৌরবের, ঐশ্বর্যের ও প্রতিপত্তির। আড়াই বছরেই পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় বাড়ীর সকলেরই আদরের বিশেষ বিগত সম্মান দিদিমা দাদা মহাশয়ের অন্ধের নড়ী। বেশ সোহাগে আরামে আদরে আর উদীসীনতায় দিনগুলি কাটছিলো—একটা জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবার রুদ্ধ করে কে? কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল সবই, সেদিন থেকে আজ বিনি সজ্জের প্রাণ-স্বরূপ শ্রীগুরু তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলাম। তখন ছিলেন তিনি বেশ সহজ মানুষটি, সৌম্য, সুদর্শন মুক্তি, স্ত্রীমাম চোহারা, তপ্ত কাঞ্চনের মত গায়ের রং। কপালে রক্ত চন্দনের কোঁটা, মাথায় কুঞ্চিত কাল চুলগুলি কানের ছ’পাশ দিয়ে বয়ে ঝুলে পড়েছে কণ্ঠ পর্য্যন্ত—দেখলেই তাল না বেসে থাকা যায় না। সহজ মানুষের মতই আমাদের সঙ্গে খেলতেন। গান গাইতেন, স্তন্যতাম; খিয়েটার করতেন, দেখতাম—কখন দাদার ব্যবসা নিয়ে ছুতারদের সঙ্গে বকাবেকি করছেন, সংসারের সামান্য ক্রটি নিয়ে অগ্নিশর্মা হয়েছেন আবার প্রয়োজন হলে গরীবের মরা ফেলাতে, প্লেগের, বসন্তের সময় প্রাণ দিয়ে সেবা করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। নিভৃতে নিত্য নিয়মিত তপঃ, আধ্যায়, দৈন্যপ্রাণধানও বাদ যেত না। অদ্ভুত বলে মনে হতো—অবাক হয়ে দেখতাম। বড়

সাধ তাঁর কাছে সব সময়েই থাকতে কিন্তু আভিজাত্যের বেড়া অতিক্রম ক’রে তাঁর সঙ্গে মেশাও দায—নিজেকে বাঁচিয়েই চলতাম।

কিন্তু কি আকর্ষণ তাঁর। প্রেমাত্মক বিগলিত অথচ প্রদীপ্ত ভাস্করের মত উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে তাকালে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। কি যেন খুঁজছেন তিনি—কি চান তিনি? দেখতাম আমাদের পেলে তাঁর চোখ দুটি যেন আনন্দে ভরে উঠতো—আমরা আশ্বহারা হয়ে পড়তাম। প্রতি রবিবারে আমাদের নিয়ে তাঁর আরম্ভ হলো ভোরে শিবপূজা, তারপর দুঃস্থের সহায়ের অস্ত্র থলি কাঁধে ভিক্ষা সংগ্রহ, ফিরে এলে দল বেঁধে স্নানের পালা। অতঃপর যে যার বাড়ী গিয়ে পুনরায় ২টা থেকে আরম্ভ হতো রবিবাসরীয় ক্লাস, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি অবিরল বকে চলেছেন,—রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, আবার ফাঁকে ফাঁকে নিজেই ঘণ্টা বাজাচ্ছেন ক্লাস পরিবর্তনের। সূর্য্যদেব গড়িয়ে পড়তো পশ্চিমে, তবুও তাঁর বলা আর শেষ হয় না—অস্থির হয়ে উঠলেও উঠতে পারতাম না। আবার সন্ধ্যার পর কোনওদিন শাস্ত্রাদি পাঠ, কোনওদিন বা নৌকা বেড়ান অথবা গঙ্গার ধারে বা বাড়ীতে এলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রাণ মাতান গান ও সমস্তের মন্তোচ্চারণ “ও নমো ভগবতে বাহুদেবায় নমঃ, ‘ও কালী’ ইত্যাদি। সারা রবিবারটা একটা না একটা নেশার মধ্যে যেন কেটে যেতো। তাবতাম কি অসীম প্রাণশক্তি এই মানুষটির। সক্রিয় তিনি, তাই অপূর্ব বীর্য ও উৎসাহ যেমন ছিল, আবার তেমনই বাঙালীর

যেথা ও প্রেমিক হৃদয় একাধারে তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে। তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণী একবার আরম্ভ হলে আর থামতো না, বুঝি আর না বুঝি, অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে এক অপূর্ণ শিহরণ তুলতো—আর মনে হতো, এষে আমারই অন্তরের কথা তাঁর মুখ দিয়ে শুনিছি, তিনি কি তার অন্তর্যামী, কিন্তু এই সব আকর্ষণের মধ্যে তবুও চেষ্টা করতাম নিজেকে আগলে রাখতে। বাড়ীর কড়া শাসন তো ছিলই। তাঁরা বললেন—এই রকম ধর্ম কর্ম করে পথে পথে হাতাত্তের মত ঘুরে বেড়ালে জীবনের ভবিষ্যৎ কি? আমারও মনে প্রতিধ্বনি উঠতো—সত্যই তো—করছি কি? অথচ তাঁকে কিছুতেই এড়াতে পারতাম না। ফাঁক পেলেই ছুটে যেতাম তাঁর কাছে—তিনি গাইছেন ছেলেদের নিয়ে—“ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ, গোবিন্দ আমার প্রাণ রে, এই হরি নাম যে করে সেই আমার প্রাণ রে।” সেই প্রাণমাতান গানে আর তাঁর পরিবেশে সব ভুলে যেতাম, বাড়ীর শাসন, উপদেশ, দিদিমার করুণ আকৃতি। এমনই উঠা-নামার দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটছিলো দিন, এমন সময় বিধাতা দিলেন হৃদ্যাগের মধ্যে এক স্রবোগ। আমার অস্থূল হল সাংঘাতিক। ৭৮ মাস একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে উঠলাম। ডাক্তার বদ্যি কিছুই বাকী রইল না। সবাই একে একে বিদায় নিলেন—কথা কইবার শক্তি নাই। অবশ্য অঙ্গ, অবশেষে একদিন এল যেদিন মৃত্যুর তুষার স্পর্শ যেন অহুভূত হল। অর্দ্ধ-অবলুপ্ত চেতনার মধ্যে বুঝলাম, আমার ঘব থেকে আঙিনে বের করা হয়েছে, শুনিছি দিদিমার মর্ন্তভেদী ক্রন্দন এবং বন্ধুরা আমার ঘিবে উচ্চস্বরে বলছে—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ—আর তিনি আমার বৃকের উপর মুখ রেখে চীৎকার করে বলছেন—“নলিন, তোমায় বাঁচতে হবে, আমার যে অনেক কাজ তোমার করতে হবে।” একি কথা, এতো শুধু কথার কথা নয়, এ তাঁর আদেশ, এ যে তাঁর অমোঘ সঙ্কেত। চেয়ে দেখলাম—এষে জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত মুখ, চক্ষে আমার জল ঝরে পড়লো—অস্তুর দিয়ে নিলাম তাঁকে বরণ করে—দীক্ষা আমার হল নব জীবনের।

মরা আর হল না—বঁচে উঠলাম, সকলে আশ্চর্য্য হলেন। মুক্তিও নিলাম বাইরের দিক থেকে, দিদিমার সবেধন নীলমণি ছিলাম, তিনি বললেন—মতি, আজ হতে এ ছেলেকে তোমার হাতেই সমর্পণ করলাম। ধীরে ধীরে স্থস্থ হয়ে অতঃপর অবাধ মেলামেশার স্রবোগ পেলাম। অম্মর থেকে কেনই যে অঙ্গনে বেরিয়েছিলাম, বাহ্যতঃ তার আর প্রতিরোধ করার কেউ রইলেন না। কিন্তু আপন মনের চিন্তের চোর-কুঠুরীতে যে অম্মর নিজের মধ্যে এতদিন গড়ে তুলেছি, সেখান থেকে মুক্তি পেয়েছি কি তখনও? না জীবনের সঞ্চিত পুঞ্জীভূত সংস্কার সেখানে বাসা বেঁধে তখনও বেশ রয়েছে। তা থেকে মুক্তির উপায় কি? দ্বন্দ্ব স্রুজ হল ভিতরে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে ছুটে যাই তাপদঙ্ক চিন্তে তাঁর কাছে। তিনি আদরে মাথা কোলে কেলে নিয়ে বলেন, ভয় কি? সব ঠিক হয়ে যাবে; ভগবানের মানুষ তুমি, তিনি তোমায় মুক্তি দেবেন। এই কি তবে সেই প্রাপ্তি-বোধের সাধন। ভগবান বুঝি না তখন, তবে তাঁরই যে চিহ্নিত মানুষ আমি—তিনি সব করাবেন। তাঁর চোখ কি তবে আপনজনের সন্ধানই দীপ্ত হয়ে থাকে? তবে আর ভয় কি? লুটিয়ে পড়লাম তাঁর পায়—বৃকে ধরে আদর করে বললেন—বিশ্বাস কর, তুমি আমার মানুষ, এই আপন জনকেই ধুঁজছি—চাই একশত জন। তাদের নিয়েই হবে নূতন সজ্জ রচনা। নূতন জাতির জন্মমুষ্টি। এ যুগের এই যে খেলা!

সকল দিক কাঁকা হয়ে গেল। ছিলাম অম্মরে কুপ-মণ্ডুক হয়ে, আনলেন অঙ্গনে; মুক্ত আকাশতলে, বিশ্বকর্নার বিরাট স্রষ্টি দেখিয়ে অস্তুর তরিয়ে দিলেন নবস্রষ্টির দ্যোতনায়। ছিলাম সংসারে আচ্ছন্ন হয়ে, নিয়ে এলেন ক্রমে ক্রমে সংসৃতির পথে, ভারতের অনাদি কালের অভয়বাণীর অহুসরণে ও প্রবাহের মধ্যে—শৃঙ্খল বিশ্বে অমৃতস্ত পুত্রাঃ। জীবন-রথের চাকা ঘুরে গেল—গতির পরিবর্তন হল। তাঁর ও মায়ে র করুণা মাথা স্নেহসিক্ত অঞ্চলে চির আশ্রয় পেল আমার এই নূতন জীবন। দিনের পর দিন যায়—ঘটনার পর ঘটনা, সবই চলেছে, কিন্তু সে এক অতিনব অহুভূতির মধ্য দিয়ে

প্রবর্তক সঙ্ঘ-সভাপতি—নলিনচন্দ্র

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

দেশের ডাকে, যুগের ডাকে যারা সাড়া দেন, তাঁরা নমস্। যারা সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া সে প্রেরণার সাধনে আত্মনিবেদন করেন, তাঁরাই চিহ্নিত মানুষ।

এমনই একজন চিহ্নিত মানুষ ছিলেন—শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত। আমার শিক্ষাজীবনের সহপাঠী। আমার সঙ্ঘ-জীবনের গুরুভ্রাতা, সঙ্ঘযোগী, অন্তরঙ্গ সহতীর্থী। আমার আরও একজন সঙ্ঘাগ্রজ স্বামী চিদানন্দজীর পর, আবার এই অগ্রজ সহতীর্থকে হারাইয়া, সঙ্ঘের ঐতিহ্য-রক্ষায় আজ বড় একা, নিঃসহায়, মর্ষ্যহারা বোধ করিতেছি।

সঙ্ঘগুরু ও সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি—শ্রীশ্রীমতিলাল রায় মহোদয় ১০ই এপ্রিল ১৯৫৯ সালে মহাসমাধি গ্রহণ করিলে, সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন নলিনদা—তাঁর ধীর, শাস্ত, সৌম্য, চির হাসিমাখা ভাবমূর্ত্তি লইবা আমাদের আশ্রমতীর্থে শান্তি ও প্রেরণার উৎস হইয়া এতদিন বিরাজমান ছিলেন। অসুস্থ, রোগজীর্ণ দেহেও সেই প্রশান্ত প্রেম ও সঙ্ঘনিষ্ঠার প্রতিচ্ছবি যেন সঙ্ঘের প্রতীকরূপেই

আমাদের সকলের প্রত্যক্ষীভূত ছিল। আজ সহসা সঙ্ঘের নবতর অভিযানের মুখে তাঁর অন্তর্দ্বান যে শূন্যতার স্রষ্টা করিল, তাহা কেমন করিয়া পূর্ণ হইবে, তাহা যেন ভাবিয়া পাইতেছি না। বিদেহলোকে শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরু ও সঙ্ঘমাতৃকা তাঁহাদের আদরের সন্তানকে কোলে টানিয়া লইয়া যে মর্ষ-বেদনায় অভিভূত করিলেন, সে বিষাদযোগ আজ সঙ্ঘের সকলকেই অর্গোণে আকুল করিয়া তোলে।

নলিনচন্দ্রের পৈতৃক বাস—বর্দ্ধমান, মেড়াল গ্রামে। পিতা অধোরচন্দ্র দত্ত তথাকার প্রসিদ্ধ কায়স্থ পরিবারের সন্তান। পিতৃব্য—কালিদাস দত্ত কুচবিহার রাজ-ষ্টেটের দেওয়ান—ইহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস মহারাষ্ট্রে সেশান জজ থাকা-কালে জাতীয়তার ঋণি শ্রীঅরবিন্দের গুপ্ত বিপ্লব-সঙ্ঘের একজন অন্তরঙ্গ সহায়ক ও পরিশেষে তাঁর অধ্যাত্মশিষ্যও হইয়াছিলেন। ভ্রাতা নলিনচন্দ্রও ভিন্ন পথে একই বিপ্লবতন্ত্রের পথিক ও যোগজীবনের সাধক হইয়া জাতীয় আগরণের ইতিহাসে অরণীয় হইয়া রহিলেন।

জীবন-তরীর হাল ধরেছেন তিনি আর শক্তি যোগাচ্ছেন “না”। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। ‘এতদিন নিজেদের করতে সম্মান দান’ যা করেছি আর কেবল অপমানই কুড়িয়েছি। আজ তাঁর তৃপ্তির গুস্ত সব কাজ করতে অন্তর হতে এক অপার্থিব শক্তি আমায় উদ্বুদ্ধ করে, আনন্দে ডরে উঠে প্রাণ মন। তিনি গাইতেন, “জীবনতরী উজ্জান চলে পালে হাওয়া লেগেছে, কারু কথা আর কি শুনি প্রাণের ঠাকুর জেগেছে। হোক না বাধা আকাশ জোড়া, প্রাণ যে নেচে চলেছে।” তিনি পথ দেখিয়ে দিলেন, বললেন—‘চল, চল, চল, চট্টবেত্তি’। জীবনের উপর দিয়ে কত ঘটনার স্রোত বয়ে গেল, এল স্বদেশী যুগ, বিপ্লব যুগ, তন্ত্র ও বেদের নির্দেশ, তারপর এল গঠনপ্রেরণা—সবই পথের অন্তর্গত। বললেন, মনে রেখো এরা সব কেউ

লক্ষ্য নয়, পথের Mile stone—এগিয়ে চল কোথায় এ পথের শেষ? কোথা হতেই বা পেলাম এই দুস্তর পথ অতিক্রম করার দুর্জয় শক্তি? সবই যে তাঁর ও মাথের মহিমা। আজ তিনি স্বরীরে নাই, মাও নাই। কিন্তু সভ্যই কি নেই? আজ আরো যে স্পষ্ট ও জাগ্রত হষে উঠেছেন তাঁরা আমাদের কাছে। এ অবস্থিতির একটুও ছেদ নেই, বিরতি নেই, নিত্য স্বরূপে তিনি আমাদের এই সঙ্ঘের মধ্যে বর্দ্ধমান রয়েছেন—স্বৈর্ঘ্যমিলাজতে—অন্তরে ও বাহিরেও। তাই আপাততঃ প্রতীয়মান এই বিরহের দিনেও বুকভরা আনন্দে বলি—মাঠে, ‘যো অসাবসো পুরুষঃ সোহমসি’ তুমিই পর্যায়ক্রমে আচার্য্য, নেতা, গুরু, ইষ্ট, ভগবান হয়ে ধরা দিলে, আবার তুমিই জ্ঞানালে তুমিই আমি—অপূর্ব তোমার মহিমা।

নলিনচন্দ্র শৈশবেই পিতৃমাতৃহারা হইয়া চন্দননগর বোড়াইচণ্ডীতলারই অধিবাসী; তাই অতি বাল্যকাল হইতেই নলিনচন্দ্র তাঁর 'মতিদা'র ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। এই পারিবারিক পরিচয়ই যথাকালে সাংস্কৃতিক ও অধ্যাপনপরিচয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।

ছাত্রজীবন হইতেই আমাদের আরও কয়েক জনের ছায় নলিনচন্দ্র শ্রীমতিলাল রায়েরই নেতৃত্বে তাঁর বৈপ্লবিক কর্মে ও পরে তাঁর সংগঠনযজ্ঞে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করেন। ইহারাই প্রবর্তক সঙ্ঘের ভিত্তি।

বিপ্লবের সাধনায়, শ্রীরায়ের অদ্ব্যতম অন্তরঙ্গরূপে নলিনচন্দ্রকে বহু গুরুতর গুচ দাযিত্ব গ্রহণ করিতে হয়। বিপ্লবী নায়ক শ্রীশ্রীশচন্দ্র ও শ্রীরাসবিহারী বসু যখন ১৯১২ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর নয়াদিল্লীতে বোমানিক্ষেপের পরিকল্পনা করেন, তখন শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়কের হাতে নির্মিত—রাউলাট রিপোর্টের ভাষায়—অতি ভয়ঙ্কর ধরনের বোমা (bomb of a most dangerous type) কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দেন সঙ্ঘগুরু নির্দেশে এই তরুণ নলিনচন্দ্রই। এই ব্যাপারেই পাঞ্জাব হইতে রাসবিহারী বসু কর্তৃক প্রেরিত আউথ-বিহারী ও আমীরচাঁদ প্রমুখ কয়েক জন বিপ্লবী বীর চন্দননগরে আসিলে, তাঁহাদের দেখাশোনার ভার ছিল নলিনচন্দ্রের উপর।

উত্তরপাড়ার ভগ্নমন্দিরের সমুখস্থ ঘাটে, এক মহানিশায যে গুরুত্বপূর্ণ গোপন বৈঠক রাসবিহারী, বাঘা যতীন, যাহ্নগোপাল, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য (পরে মানবেন্দ্র রায়), শ্রীশ ঘোষ, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবী মহানায়কগণ ২১শে ফেব্রুয়ারী দেশবাসী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সম্মিলিত হন তখন সেই বৈঠকের মহাচার্য্য-রূপে পুঞ্জনীয় সঙ্ঘ-গুরুকে নোকাপথে তথায় সংগোপনে পৌঁছাইবার দায়িত্ব লইয়াছিলেন শ্রীমণীন্দ্রনাথের সঙ্গে আবার এই নলিনচন্দ্রই।

শ্রীঅরবিন্দের অহুপ্রেরণায়, সঙ্ঘের ইংরাজী মুখপত্র "Standard bearer" যখন বাহির হয়, তখন গতগমেট সকাশে ১০০০ টাকা সিকিউরিটি স্বরূপ আমানত জমা

দিবার প্রয়োজন হইলে, নলিনচন্দ্রই তাঁর গ্রাম্যসম্পত্তির সদ্যোবিক্রয়লব্ধ টাকা ভাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ সেই ১০০০ টাকা প্রদান করেন ও "Standard bearer" পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তখন শ্রীরামপুর কলেজ হইতে সদ্য বি. এ. পাস করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়িতে আসিয়াছিলেন ও তাঁর মাসিমার বাটীতেই বাস করেন। এই বাটীতেই উক্ত পত্রিকার কার্যালয় ও নলিনচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে আমাদের নূতন সংহতির জন্ত কল্পী-তরুণ-সংগ্রহের আড্ডা-কেন্দ্রে পরিণত হয়।

শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে যখন সঙ্ঘগুরু সজ্জাভিত্তিতে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সংগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তখন রাজশক্তির প্রবল সংশয় ও বিরুদ্ধতা বিদীর্ণ করিয়াই প্রবর্তক বিদ্যার্থিভবনকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। এই বিদ্যার্থিভবন ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব লইতে হয় নলিনচন্দ্রকেই। তাঁর গুণমুগ্ধ শিক্ষকগণ ও অগণিত ছাত্রকুল আজও তাহাদের চিরপ্রিয় 'নলিনদা'র নামে শ্রদ্ধাপ্লুত-হৃদয়ে আনতশির ও তাঁর উন্নত চরিত্র এবং জাতীয়তামূলক আদর্শের স্মরণে অহুপ্রাণিত হইয়া থাকেন।

সঙ্ঘের গঠনযুগে সঙ্ঘগুরুর সঙ্কল্পিত অর্থ-সংগ্রহে, অমরেন্দ্র-প্রমুখ রাজবন্দী বা গোপনচারী বিপ্লবিগণের মুক্তিকল্পে রাজশক্তির সহিত সংযোগসাধনে ও সর্ববিধ প্রয়োজনীয় কর্মে নলিনচন্দ্রই সঙ্ঘগুরুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ কার্য্য করিতেন।

এক কঠিন রোগে বাল্যকালেই নলিনচন্দ্র মরণাপন্ন হইলে, তাঁর চির শ্রদ্ধাভাজন 'মতিদা'র বিশেষ আশ্বাসে ও নির্দেশে তিনি রোগমুক্ত হন। দীর্ঘযুগ পরে অনেকগুলি কঠিন ব্যাধি পুনরায় তাঁহাকে আক্রমণ করে ও পরিশেষে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলে। কিন্তু কোনদিনই সঙ্ঘ ও জাতির চিন্তায় তিনি বিরত হন নাই, সঙ্ঘগুরুর আদর্শ সিদ্ধ করিতে তিনি আজীবন উদ্বুদ্ধ, অক্লান্ত হৃদয়ে সঙ্ঘ-সেবারত, রোগজীর্ণ দেহ লইয়াই সঙ্ঘগুরুর মহাসমাধির পর গুরু-পূর্ণিমার সভায় তিনি

প্রথম স্পর্শ

শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত

জীবনের আদর্শবাদী আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া যখন আসামের শেষ প্রান্ত হইতে ঘুরিতে-ঘুরিতে কার্তিক বস্তুর লেনে স্বীয় অগ্রজের বাসায় আসিয়া দাবী সহ প্রত্যাখ্যাত হইলাম, অভিমানে অন্তর তুলিয়া উঠিল। সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া অনাহারে বাহির হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ মনে পড়িল—এই গলিতেই প্রবর্তক দলের এক বাসা আছে। খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে উপস্থিত হইলাম—নলিনদারই সম্মুখে। প্রণাম করিলাম। স্নেহভরা অন্তরের পরশে ও আশ্বাসে বুক তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। ঐ ক্ষপুরে এক সঙ্গে ধুলো-চিংড়ির ঝোলের সহিত প্রচুর পরিমাণে অন্ন গ্রহণ করিয়া উদর পূর্ণ করিলাম। পরের দিনই দেশে ফিরিলাম, কিন্তু নিজ বাটীতে আর গেলাম না। সরাসরি চট্টল, শাকপুরার প্রবর্তক আশ্রমে হাজির হইলাম।

১৯১৯ সালের শেষ ভাগে, সঙ্ঘগুরু চূষকাকর্ষণে সঙ্ঘজীবনে দীক্ষা পাইলাম। আমার সঙ্ঘপ্রবেশের প্রথম স্মৃতিই নলিনদার সঙ্গে দেখা—তঁার আশ্বাসবাণী।

আজীবন শিক্ষাব্রতী আদর্শ আচার্য্যরূপেই তাঁকে জীবনপাত করিতে দেখিলাম।

সঙ্ঘগুরু মহাসমাধির পর সঙ্ঘের সামগ্রিক গুরুভার

পড়িল তাঁহারই উপরে। নিরীচনসভায় অভিব্যক্তিপ্রসঙ্গে আমি তাঁকে শ্রীগুরুর প্রতিনিধিরূপে সম্ভাষণ করা মাত্র তিনি উত্তরে বলিলেন, “ভাই নির্মল, সঙ্ঘের কেহই আমরা একক গুরুর প্রতিনিধি নহি, তিনি যে রেখে গেছেন তাঁরি কাষবৃহৎ!”

কি নিরহঙ্কৃত অপার্থিব ধারণা—সঙ্ঘের সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ কি নিখুঁত সূক্ষ্ম সূচ বর্ণনা! আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম, ভাবিলাম—এমন অনহং সঙ্ঘ-ভাবনার নিকষিত ভাবমূর্ত্তি বলিয়াই তো সঙ্ঘগুরুর স্বপ্ন সুসিদ্ধ করার যোগ্য আধার-রূপে আজ আমরা তাঁহাকে পাইলাম।

পূজনীয় নলিনদা আজ তাঁর নিজ দেহে সঙ্ঘের সকল বিদ্যবিপত্তি টানিয়া লইয়াই বৃষ্টি মরমেহের অবসান করিলেন—নিত্য আনন্দলোক হইতে তাঁহার হান্তময় মাধুর্য্যে সকলকে আনন্দ দান করিতে।

এই দিব্য আধারকে আজ সশ্রদ্ধায় প্রণাম জানাই। নিবেদন করি—শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরু ও সঙ্ঘমাতার সঙ্গে তাঁহাদেরই নিত্য পার্শ্বদরূপে আমাদের সঙ্ঘজীবনে প্রেম ও ঐক্যের মহাশক্তি সঞ্চার কর—আমাদিগকে নবজাতি-গঠনের সিদ্ধ প্রেরণা দাও।



গুরুমন্দির নির্মাণের সঙ্কল্পব্রত গ্রহণে পৌরোহিত্য করেন।

সঙ্ঘশক্তির উপর তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতারও তুলনা মিলে না।

এই অসাধারণচরিত্র সঙ্ঘসাধক, প্রেম ও ঐক্যের

একনিষ্ঠ পূজারী, চিরকুমার মহাযোগী—আজ উর্দ্ধলোক হইতে তাঁর অগ্নান কল্যাণ দৃষ্টি ও অমোঘ প্রেরণা দিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখুন—তাঁর অসমাপ্ত সঙ্ঘ-সাধন ও নবজাতির সংগঠন ব্রতে অখিল সঙ্ঘমণ্ডলীকে জয়যুক্ত করুন। ওঁ শান্তি: শান্তি: শান্তি: হরি: ওঁ।

আমাদের নলিনদা

কুমারী মমতা দাস (সঙ্কলন)

১৩৬৫ সালের ৪ঠা মাঘ। বিকেল ৪।০টা নাগাদ—

উত্তর বঙ্গের রায়গঞ্জ থেকে প্রবর্তক সজ্জ এসে পৌঁছেছি। ভগবানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে নারী-মন্দিরে এলাম। সে রাত্রি কোন রকমে কাটল। আমি বাড়ী থেকে জোর করে এসেছি বলে মনটা বেশ চঞ্চল ছিল। ভোরের উপাসনার পর অন্নপূর্ণামন্দিরের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলাম, নীচে চেয়ে দেখি—লাঠি হাতে, নিটোল স্বাস্থ্য, লম্বা-চওড়া চেহারা একজন পুরুষ অন্নপূর্ণামন্দিরে ঢুকছেন। এমন সময়ে একটা ছোট মেয়ে ছুটে এসে সেই মানুষটিকে জড়িয়ে ধরল, তিনিও মেয়েটিকে ধরে উচ্চঃস্বরে হেসে উঠলেন। ভাবলুম—হয়ত মেয়েটিরই উনি বড়দাদা। আমি নীচে নেমে আসছি, এমন সময়ে ছোট মেয়েটি বলে উঠল—“দাদামনি, মমতা-দি কাল এসেছে।”

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন “কে? তোমাদের বোর্ডিং এর মেয়ে?”

মেয়েটি বলল, “জানি না।”

এমন সময়ে স্বর্ণদি বললেন, “না, মেয়েটি সজ্জই থাকবে।”

তিনি আমার দিকে একটু তাকালেন—কি বললেন জানি না, শুধু বললেন “বেশ, বেশ, আমাদের মেয়ে তুমি।”

সেই কথাটা আজও আমার কাণে বাজে। সেই স্নেহমাখা চোখ, হাসি-হাসি মুখ—মৃত্যুর দু’দিন আগেও যেন একই রকম দেখেছি।

সেদিন জেনে নিয়েছি—ইনিই আমাদের নলিনদা।

তার পরে আশ্বে-আশ্বে কি ভাবে যে তাঁকে এত আপন করে পেলাম, তা’ আজ ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারব না। যখনই দেখা হ’ত নলিনদার সঙ্গে, তখনই তাঁর কথা—“ভাল আছ? ভগবানের মাহুস হও।”

আশ্বে-আশ্বে উপরে অন্নপরিবেশনের ভার আমার উপর এসে পড়ল। ভাল করে গুছিয়ে, বুঝে-সুঝে দিতে আমি শিখি নি। একদিন কয়েকটা কাঁচাকলার টুকরা

আমি পাতে দিয়েই বলে ফেলেছি “কাঁচ-কলাগুলো অখাদ্য!”

তিনি তখন বললেন, “মমতা, কিছুই অখাদ্য নয়, যদি ভগবানের প্রসাদ বলে আমরা গ্রহণ করি। আমি ১৬ বৎসর পর্যন্ত পেটের রোগে ভুগেছি। কাঁচকলার প্রতি ঘৃণা ধরেছে। একদিন ভগবানের সঙ্গে খেতে বসেছি। আমার পাতে এক টুকরা কাঁচাকলা পড়তেই তা’ আমি ফেলে দি। ভগবান তা’ দেখলেন—বললেন—‘নলিন, যে খাওয়াই সমুখে আসুক, প্রসাদ বলে গ্রহণ করবে—দেখবে তা সুস্বাদুই হবে। সেই দিন থেকে আমি কাঁচা কলাও তাঁর প্রসাদ বলেই খাই আর ভালই লাগে।”

যা’ দেই না কেন, আর যে ভাবেই দেই না কেন, নলিনদা তা’ আনন্দসহকারেই খেতেন। নলিনদাকে খাওয়াতে যে তৃপ্তি পেয়েছি, এমন তৃপ্তি আর কোথাও পেয়েছি মনে হয় না।

আশ্বে-আশ্বে কি করে’ যে নলিনদা আমার অন্তরে এতখানি শ্রদ্ধার আসন কেড়ে নিয়েছিলেন, বুঝতে পারিনি। ভগবানের দেহত্যাগের পর আমার বড়ই দুঃখ হল। একদিন নলিনদার কাছে কেঁদে ফেলেছিলাম—বলেছিলাম, “নলিনদা, ভগবান আমায় আশ্রয় দিলেন, কিন্তু কিছু তো দিয়ে গেলেন না! তিনি দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তা’ও হ’ল না।”

নলিনদা বললেন : “মমতা, আমরাও সে রকম দীক্ষা নেই নি—শুধু তাঁকে ভালবেসেই রয়েছি। মা যাকে কোল দেন, আশ্রয় দেন, তার আবার দুঃখ কি।”

পরে দেখা হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করতেন—“মমতা, ভাল আছ ত? মনে আনন্দ পাচ্ছ ত?”

আমি ঘাড় নেড়ে সাহা দিতাম। কোন দিন যদি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম, তা’ হলে তিনি বুঝে নিতেন—আমার মনে কিছু সমস্যা আছে। তখন তাঁর কাছে টেনে’ নিয়ে, মাথায় হাত বুলাতে-বুলাতে বলতেন, “মমতা, মনের ওঠা-নামা আছে। সব চলে দাও মা ও ভগবানের কাছে। দেখবে—শান্তি পাবে।”

সারল্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

২৩শে শ্রাবণ রবিবার, ১৩৬১।

বেলা আড়াইটে। তিন বন্ধু মিলে ঢুকে পড়লাম প্রবর্তক মন্দির এলাকায়। কলকাতা থেকে সোজা গেছি প্রবর্তক সঙ্ঘ দেখবার জন্য। আর বলা বাহুল্য, এই আমাদের প্রথম আগমন, প্রথম প্রচেষ্টা ঐ সঙ্ঘ দেখবার।

বাইরে থেকে অনেক কিছু শুনেছিলুম। তাতে লাত ছিল না। সামনে গিয়ে না দেখলে আনন্দ কৈ? আগুনের কাছে না গেলে উত্তাপ কোথা?

নিশ্চয় ছুপুর। কারো সাড়াশব্দ ছিল না। একবার পূর্বের বাগানটার ঘুরে এলাম। কেউ বললে না, ওখানে যেয়ো না। কেউ বললে না, এখানে দাঁড়াও।

কিন্তু শুধু মন্দির দেখলেই তো হবে না। মন্দিরের সেই অধিবাসীটিকেও তো দেখা দরকার! মন উদ্ভাস্ত

আমি তা' পারিনি। যত হুঃখ হোক, মনে-মনে নলিনদার কাছেই টেলে' দিতাম—আমার মনে এই বিশ্বাস যে, মা ও ভগবান ঈশ্বরের ভালবাসেন আর ঈশ্বর মা ও ভগবান ছাড়া কাকেও জানেন না, তাঁরা তাঁদের থেকে, পৃথক নন; তা' না হলে, এত বড় সঙ্ঘের ভার কেমন করে' তাঁরা হাসিমুখে বহন করে চলেছেন! ভগবানের অভাব আমি বুঝি নি, নলিনদার মধ্যে ভগবানের স্পর্শ পেতাম। সেখানে ছিল না দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, লজ্জা-ভয়। নলিনদা ছিলেন যেন আমার বড়দাদা। তাই ছিল না সঙ্কোচ। অন্ত দাদামণিদের কাছে যেতে হলে, তাঁদের সাথে কথা কইতে হলে বুঝে-সুঝে যেতে, কথা কইতে হত—কিন্তু নলিনদার কাছে যেতে, কথা বলতে কিছুই দরকার হত না। যে অবস্থায় তিনি থাকুন না কেন, আমার মনের ভূমি ঠিক দিতেন। নলিনদা আমাকে যে ভাবে আপন করে' নিয়েছিলেন, মনে হয় আর কেহই আমায় সেভাবে স্থান দেয় নি। হয়ত বা আমিই তাদের নিতে পারিনি।

আশ্রমে পড়তে গেলে তিনি তাকিয়ে দেখতেন, খোঁজ নিতেন—কেমন পড়া করছি। আশ্রমে গেলেই আমার

হয়ে উঠলো। এখানে কোথায় কি আছে—আমরা কিছুই জানতাম না। সঙ্গী একজন কাকে যেন খবর দিলেন একটি লোকের সাহায্যে। আর যিনি এসে দেখা দিলেন তাঁকে দেখে নিঃসম্মেহে একজন সজ্জন, সরল, ভক্তিমান পুরুষ বলে মন স্বীকার করে নিল। কোন দ্বিধা নয়—দ্বন্দ্ব নয়, শুধু অনাবিল একটি ভক্তিশ্রোতে মন আপ্লুত হয়ে উঠলো তাঁর সঙ্গ পেয়ে। ভদ্রলোকের গায়ে জামা ছিল না। একখানা উত্তরী। পরিধানে সামান্য একটা খদ্দেরের ধুতি আর পায়ে চপ্পল। কিন্তু সেই বেশেই তাঁকে ভারতবর্ষের একটি মহান পুরুষের প্রতীক বলে মনে হল। আর সবচেয়ে স্নেহ লাগলো তাঁর চোখের চাহনি। কি কোমল, কি ক্ষমাশীল সেই চোখ!

কিন্তু যে কথা বলছিলাম। ভদ্রলোক আমাদের

একটা কাজ ছিল—নলিনদার কাছে যাওয়া। তাঁকে একটু না দেখে' এলে যেন মনে শাস্তি হ'ত না। দূর হতে বসেই তিনি আমাদের দেখতেন—হাসতেন—সে হাসি এখনও আমার চোখে উজ্জ্বল হয়ে' রয়েছে। পড়া পারছি না বললে, তিনি উৎসাহ দিতেন—বলতেন—“ঠিক পারবে। একবারে না পার, ছ'বারে হবে—ভয় কি, পরীক্ষা দাও।” নলিনদার সব কথা'র মধ্যেই ছিল—“মা যা' করবেন, তাই হবে—ভাবনা কি!”

মায়ের উপর এত বিশ্বাস—এত ভুগেও কোন দিন তাঁকে বলতে শুনি-নি, মা, আমায় কি করলে! সব কষ্ট যেন মাকে দিবেই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আজ নলিনদা ফুলদেহে নেই—আমার যেন কেউই নেই আমার ব'লে টেনে নিতে—আমার অন্তরটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে' গেছে—সব যেন বিশ্বাদ লাগছে। নলিনদা নিশ্চয়ই ভগবানের সাথে মিশে গেছেন—তবে তিনি যেখানেই থাকুন, আশীর্বাদ করুন—আমি যেন শাস্তি পাই—যেন তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে পারি—দূর থেকেই প্রণাম জানাই—জানি না সেখানে তাঁর চরণে তা' পৌঁছাবে কি না।

প্রবর্তক বিদ্যার্থী ভবনের একটি ঘরে এসে আদর করে বসালেন। সেদিন রবিবার। কাজেই সমস্ত বিভাগ বন্ধ। পরিচয় জানতে পারলাম তিনিই নলিনচন্দ্র দত্ত। বিদ্যার্থী ভবনের অভিভাবক। সজ্জগুরুর ডান হাত। স্বর্গীয় চারুচন্দ্র দত্ত, আই. সি. এস. মহাশয়ের ভ্রাতা। আজীবন অকৃতদার এবং একজন উচ্চ শিক্ষিত।

আকাংখা জানালাম, সজ্জগুরু শ্রীমতিলালের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তার আগে অল্প কি দেখবার জিনিস আছে যদি দয়া করে দেখার ব্যবস্থা করে দেন খুশী হই।

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই দেব। সজ্জগুরুর সঙ্গে দেখা চারটের আগে হবে না। তাঁর শরীরও বর্তমানে ভালো নেই।...ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন।

কিছু শুধু বসে তো বিশ্রাম হয় না। হয়তো ঘুমুতে হয়, নয় ঝগড়া করতে হয়। বাঙালী হিসেবে যদি এইটুকু না করতে পারলাম তবে আর বিশ্রাম কি?

তাই ঝগড়ার প্রথম অবস্থায় উপনীত হবার জন্ত তর্কযুদ্ধে মেতে উঠলাম। প্রথমেই তাঁকে আক্রমণ করলাম—প্রবর্তক আশ্রমে থাকার জন্ত আপনার মনে কোন বিক্ষোভ নেই? ধর্মের নামে ত্যাগ স্বীকারের আদম্বর, এই অবদমন—এও কি দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হবার নামাস্তর নয়? আমি প্রবর্তকের জন্ত কাজ করবো অথচ মাইনে নেব না, আমার সংসারকে বঞ্চিত করবো, গড়ে উঠবে ব্যাঙ্ক, জুট মিল, অথচ আমি সন্ন্যাসী—এটা কি রকম ব্যাপার বোঝা মুশ্কিল। আধ্যাত্মিক জগৎ আর সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদ—দুটোর জন্ত কেমন করে সামঞ্জস্য আনা যায়, বুঝতে পারি না...।

কিন্তু আগে যা বুঝতে পারিনি—সেদিন যেন ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন নলিনবাবু তাঁর অদ্ভুত বিচারশক্তি আর জীবনের স্পর্শ দিয়ে। কোথাও তাঁকে বিচলিত হতে দেখলাম না! বরং স্থিতহাস্তে মুখখানি তাঁর অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

যা বলেছিলেন, ঠিক মনে নেই। শুধিছে বলবার ক্ষমতা বা তেমন পাণ্ডিত্যও আমার নেই। তবুও এইটুকু মনে আছে, তিনি বলেছিলেন, আপনার যা প্রশ্ন তা

আজকের দিনের অনেকেরই প্রশ্ন। তবে নিজের কথা বলতে গেলে—বলতে পারি, আমি অত্যন্ত সুখী। হয়তো অল্প কাজে যেতে পারলে অনেক বড়লোক হতাম, অনেক প্রতিষ্ঠা বাড়তো কিন্তু সুখ পেতাম না। আমি মনে করি যে সৃষ্টিধর্মী প্রেরণা নিয়ে আমি প্রবর্তকে আসতে পেরেছি সেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার...ক্ষমতার যথেষ্ট পরিপূরক। প্রবর্তক ধ্বংস চায় না—চায় সৃষ্টি। আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়েই সে সৃষ্টি করেছে। সে সৃষ্টি করবে। তারপর যখন কাজ বিরাট হবে, বিপুল হবে তখন আর সে তাকে চানবে না। তাকে দান করবে, দীক্ষা দেবে দেশের কল্যাণে, জাতিরই নুর্তি নেবে। প্রবর্তক জোর করে কাউকে টানেনি। কাউকে ধরে রাখেনি। যার মধ্যে সেই জাগরণ এসেছে, সেই এসেছে প্রবর্তক সজ্জে। সেই টিকে আছে, টেনে আছে প্রবর্তককে। প্রবর্তকের জন্ত কোন প্রচার কার্য চালাতে হয় নি।...

তারপর গীতার থেকে ব্যাখ্যা, ছাত্রদের অধ্যাপনা, চরিত্রগঠন প্রভৃতি বিষয়ে এমন সব সূষ্ঠু আলোকসম্পাত করলেন যে, যেন এক মুহুর্তে হুজিৎ বহরের জীবনের অনেক অন্ধকার দূর হয়ে গেল।

যা ছিল সজ্জের সম্বন্ধে অজ্ঞতা, অন্ধকারের মরুপ্রান্তর তাই যেন জ্ঞানের প্রভাত রশ্মিতে শশ্যামলা ধরিত্রীর মতো সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠলো।

মাথা নত করলাম নলিনবাবুর কাছে। আর সংগ্রাম নয়—এবার সন্ধি। সত্যের সঙ্গে, সরলতার সঙ্গে।

সেই সহজ বিশ্বাস আর অনায়াস সরলতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবির পায়ে মাথা আপনিই নত হয়ে এল।

* * *

চলে আসার কালে মনে হল যেন একজন অত্যন্ত প্রিয়জনের সঙ্গবিচ্যুত হয়ে ফিরে যাচ্ছি। ফিরে যাচ্ছি সেই জটিল কুটিল সংসারে—যেখানে স্নেহ নেই, মায়া নেই, এমন কি জীবনের মেরুদণ্ড পর্যন্ত ভগ্ন, বিপর্যস্ত।

তবুও ফিরে যেতেই হল।*

* প্রবর্তক পৌষ, ১৩৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘চন্দ্রনগর মহাতীর্থে’ শীর্ষক প্রবন্ধের নলিনচন্দ্র সম্পর্কিত অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল।—প্রঃ দঃ

পুণ্যস্মৃতি

শ্রীবৈষ্ণব বিশ্বাস

নলিনদার কথা মনে হতেই মনে পড়ে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী ব্যক্তিত্বপূর্ণ দেহ আর তার সাথে অপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে মিলিয়ে থাকা তাঁর একান্ত নিরতিমান স্বভাব, যার তুলনা কোথাও পাইনি। ছ’মিনিট আলাপেই তাঁর এই আত্মভোলা স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেত। এটা যেন ছিল তাঁর সহজাত সিদ্ধ সম্পদ—মানুষকে আপন করবার বিধিভিত্তিক সহজ অধিকার। এই স্বভাব বলে অনায়াসে অতি অল্প সময়ে প্রতিপক্ষের মন জয় কবে নিতে তাঁকে অনেকবারই দেখেছি। শিশুর সারল্য, ঋষির প্রজ্ঞা আর আপনহারা আত্মসমর্পণ এই তিনের সমাহার ছিলেন তিনি। মুখে মুখে হাসি, চোখে স্নিগ্ধ প্রশান্তি, সান্নিধ্যে আলাপে বুকভরা, প্রাণ জুড়ানো এই ছিলেন আমাদের নলিনদা তাঁর সহজ কথ কথাই না মনে পড়ে।

দীক্ষার পরে একদিন একান্তে তাঁর সাথে দেখা করলাম। প্রণাম করে বললাম “যে দীক্ষা পেলাম তার সহজ কিছু উপদেশ দিন।” বলেন “আত্মসমর্পণ যোগে দীক্ষা পেয়েছ—সাধন করে চলে।” প্রশ্ন করলাম “সাধন কেমন করে কোরব? আর তাতে এগুচ্ছি কিনা তাই বা কি করে বুঝবো?” উত্তরে বলেন—“গুরু হাতে নিজেকে কতখানি তুলে দিতে পেরেছ এবং গুরু তাঁর মধ্যে তোমাকে কতখানি পাচ্ছেন এই হবে তোমার সাধনার অগ্রগতির নিরিখ। গুরুর সাথে পূর্ণ identity-ইত এই সাধনার লক্ষ্য।” নির্ভীক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সত্যে অসম্ভব করলাম তাঁর ধারা ও ধারণা।

আর একদিনের কথা। শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যার কি এক অশ্রুতান। আধ ঘণ্টার বেশী সময় আছে দেখে জ্বলের ছেলেরা ফুটবল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। ইচ্ছা যতটুকু পারে খেলে নেবে। অরুণদা মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছেলের খেলতে নিষেধ করলেন। ছেলেরা বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দূরে নলিনদাকে আসতে দেখে তারা আবার উৎসাহী হয়ে উঠল। তাদের কথাবার্তা শোনা গেল “নলিনদাই ত জ্বলের সর্কেসর্কা।

তিনি যদি বলেন ত আমরা খেলব।” কথজনে তাঁকে ধিরে ধরল। বলল “নলিনদা! এখনও আধঘণ্টার বেশী সময় আছে। আমরা একটু খেলব।” নলিনদা বলেন, “তা খেল। কিন্তু ১০ মিনিট থাকতেই খেলা বন্ধ করবে। কোন অসুবিধা যেন না হয় খেলায় রেখো।” “ঠিক আছে।” বলেই কথজনে ছেলে ‘বল’-এ সট্ট করে মাঠে নেমে গেল। কিন্তু আরও কথজনে কিছু ইতস্ততঃ করে বলল, “নলিনদা! অরুণদা কিন্তু খেলতে নিষেধ করে গেছেন।” শুনে তিনি মহাব্যস্ত হয়ে বলেন “অরুণ নিষেধ করেছে। কই একথা তা তোমরা আগে বলনি। তা’হলে খেলবে না। নিশ্চয়ই খেলবে না।” তাঁর সেই ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখে ছেলেরা অবাক হয়ে গেল এবং বল তুলে নিয়ে সরে পড়ল।

আর একটি ঘটনা। বর্ধমান প্রবর্তক রক্ত-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সভা। সভাপতি বর্ধমানের মহারাজা বিজয়-চাঁদ মহাতাব। সভা লোকে লোকারণ্য। এরই মধ্যে একদল লোক তাদের জমিদার ছোটবাবুকে দেখার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের ছোটবাবু চন্দননগরে তাঁর দাদামহাশয় ও দিদিমার কাছে মাফুষ। তার পরে প্রবর্তক সন্ধ্যা আছেন। দেশে কখনও যান নি। তারা তাঁর বর্ধমানের জমিদারীর প্রজ্ঞা। তিনি এখানে এসেছেন শুনে তাঁকে একবার দেখতে চায়। বোঝা গেল, এই ছোটবাবুটি নলিনদা ছাড়া আর কেউ নন। নলিনদাও ঘটনাচক্রে সেই সময় সেখানে এসে পড়ায়, তাঁকে জানান হল যে, তাঁর প্রজ্ঞারা এসেছে বর্ধমানের গ্রাম থেকে। তারা তাদের ছোটবাবুকে একবার দেখতে চায়। শুনে তিনি চকিত হয়ে উঠলেন এবং মুহূর্তমধ্যে সে স্থান থেকে অন্তর্হিত হলেন। প্রজ্ঞারা সংবাদ শুনে তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজলো। আমরাও তাদের সঙ্গে খুঁজলাম। কিন্তু নিকটে বা দূরে কোথায়ও তাঁকে আর দেখা গেল না। তাঁর সেই ভ্রম চকিত পলায়ন আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে। ভাবি, এমন আত্মবিলোপ কি সাধনায় সম্ভব, না ইহা—সহজাত সিদ্ধি—ভগবানের নিজ হস্তের দান?

সবারই নলিনদা

শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়

(সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক)

নলিনদা—নলিনচন্দ্র দত্ত—প্রবর্তক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি গত ১১ই অক্টোবর বেলা ১০-২৫ মিনিটের সময় ৭১ বছর বয়সে আমার চোখের সামনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে দেহান্তর লাভ করলেন। দেহটিও ভস্মীভূত হল চোখের সামনে কিন্তু অন্তরখানি নিয়ে যেতে পারলেন না। চোখের সামনে এও দেখলাম যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরখানি আমাদের অন্তরের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। তাঁকে এক দণ্ডও মনে না রাখার উপায় রাখলেন না। সরল হৃদয়, মানবদরদী, সঙ্ঘের সাধ্য প্রেম ও ঐক্যের অনাবিল অকপট উৎসর্গীকৃত মুক্তিখানি সব সময় চোখের সামনে ভাসছে। নলিনদা নানা রোগে কয়েক বৎসর ভুগছিলেন। আমিও এক বৎসরকাল অসুস্থ—হৃৎপ্লবের আশ্রমে বাস—এ-ঘর ও-ঘর—একেবারে সামনাসামনি—তাই এক রকম হৃৎপ্লবনেই অসুস্থতাবশতঃ নিত্যসঙ্গী ছিলাম। আজ আমার ঘরে আমি একলা—তাঁর দেহের সান্নিধ্য পাবার উপায় নেই। কেবল মনে পড়ছে—কত কথাই মনে পড়ছে। লেখবার শক্তি নেই, ভাষা নেই। দেহধারী মানুষ সেই দিক থেকে বড় একলা মনে হয়।

সঙ্ঘগুরুর বিপ্লব কর্মের নীরব সহায়ক—সহকর্মীদের মধ্যে কেউবা অন্তরীন, কেউবা জেলে আটক হন। কেউবা আন্দামানে কারাবাস করেন, কিন্তু নলিনদা এমনভাবে বাইরে উদাসীন ও ভিতরে বুদ্ধিমান অস্তুর্দৃষ্টিসম্পন্ন মিষ্টভাবী, সদা প্রফুল্লমুখ ছিলেন যে, তাঁকে কোনক্রমেই পুলিশ কিছু কিছু সন্দেহ করলেও আটক করতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ১৯১৮ সালে কলিকাতায় তাঁর মাসিমার (যিনি পরে সঙ্ঘের মাসিমা হয়ে সঙ্ঘকর্মেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন) বাসায় থাকতেন আর উৎসাহী দেশের প্রতি কিছু অস্বস্তিক্ত তরুণ দেখলেই মিষ্ট কথা দিয়ে বশ করতেন ও ধীরে ধীরে সঙ্ঘগুরুর সান্নিধ্যে আসার পথ করে দিতেন। আমিও এইরূপেই তাঁর সঙ্গে প্রথম

আলাপের পর সঙ্ঘগুরুর সান্নিধ্যে এসে পড়ি সেই ১৯১৮ সালেই। তখন সচ্য হয়নি, সঙ্ঘগুরুও হন নি। তিনি ছিলেন কারো মামাবাবু, কারো কাকাবাবু, কেউবা মতিবাবু বলেই আমরা ডাকতুম। ১৯১৮ সাল থেকেই বাড়ী পালিয়ে তাঁর কাছে আসতুম—সহায়ক নলিনদা। সঙ্ঘগুরুর কত তত্ত্ব, অসুগত বিপ্লব কর্মের সহায়ক, অন্তরঙ্গ শিষ্য দেখলুম। নলিনদার মত এমন অন্ধ ভক্ত কাউকেই আজ পর্যন্ত দেখিনি। অন্ধ ভক্ত বলছি তার মানে মামাবাবু বা শেষে সঙ্ঘগুরু যা বলবেন তা নিয়ে বিচার বিবেচনা, তর্কবিতর্ক অনেককেই করতে দেখলুম, কিন্তু নলিনদাকে কোন দিন তর্ক করতে দেখি নি। মামাবাবু বা সঙ্ঘগুরু যা বলবেন তা তাঁর কাছে বেদবাক্য ছিল। সম্ভ্রান্ত প্রেমিক বুদ্ধিমান আর এমন অকপট ভক্ত একজনকেও আমার জীবনে দেখি নি। আমরা সঙ্ঘের কথা নিয়ে কত আলোচনা, সমালোচনাই না তাঁর সামনে করতুম তিনি মুখটি বুজে সব শুনতেন। মনে হোত যেন তিনিও সায় দিচ্ছেন, কিন্তু কার্যকালে দেখা যেত অন্তরঙ্গ। যেমন ধরু দেহটি ছিল, প্রফুল্লবদন রসে ভরা, আর্য্যোনাসিকায়ুক্ত মুখখানি ছিল তেমনি সরল হৃদয় সহজ সাদাসিধে মানুষটি ছিলেন। কোন কাজেই মাতব্বর বা মোড়লের মত এগিয়ে আসতেন না—পাশ কাটিয়ে চলতেন অথচ সব কাজে নীরব সক্রিয় সহায়ক ছিলেন। সভাপতির নেতৃত্ব শক্তির পরিচয় কখনও দেন নি—যেন সকলেরই সেবক তিনি। তাই তাঁকে ভালবাসত না এমন কাহাকেও দেখিনি কি সঙ্ঘ, কি বাইরে। প্রবর্তক বিজ্ঞার্থী ভবন আজ যা বহুমুখী সর্বার্থসাধক শিক্ষানিকেতনরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে—গোড়া থেকেই তার ডিরেক্টর হিসাবে তিনি যুক্ত ছিলেন। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘগুরুর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তাঁর স্মদক্ষ পরিচালনায় ছাত্রগত প্রাণ, শিক্ষকদের প্রিয় ও আদর্শ হিসাবে পরিচিতি সর্বজনবিদিত। ছাত্রদের প্রতি কখনও কখনও রুঢ় ভাষা তাঁকে প্রয়োগ করতে হয়েছে, কিন্তু প্রেমের

অভাব কোনদিন হয় নি বলে তারা তাঁর ভৎসনা শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখতো। শিক্ষকরা তো নলিনদার শুধু অহুগতই ছিলেন না, ছিলেন ভক্ত ও অমুরাগী। তাঁদের কাজের উপর নলিনদা যেমন কোনও কর্তৃত্বের অহংকার রাখতেন না, তাঁদেরও নলিনদার পরিচালনা বা পরামর্শ কখনও কখনও মনোমত না হলেও তাঁর সিদ্ধান্তই মেনে চলার ব্যতিক্রম হোত না। বহুসংখ্যক ছাত্র নলিনদা অস্ত্র প্রাণ ছিল। অস্ত্রা তো নয় শিক্ষক হিসাবে এত ভালবাসতে ছাত্রদের এ যুগে দেখা যায় না। প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন বড় ছোট কাউকেই দেখি নি যে নলিন বা নলিনদার কাছ থেকে কোনদিন অশ্রিয় ভাষা শুনেছে বা তাদের প্রয়োজনে নলিনদা মানবোচিত স্বহৃদের মত সাড়া দিতে অগ্রসর হন নি। নানা রোগে তিনি ভুগেছেন কিন্তু কি অসহ্য সহনশক্তি ছিল তা বারা না দেখেছে তাদের তা বিশ্বাস করা শক্ত। যোগীর মত আত্মস্থ হয়ে থাকতেন। দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি হেসে ছেলেমেয়ে ও পাড়া-প্রতিবেশীর খবর নিতেন। তাই তাঁর প্রেম-মাখানো মুখখানি কেউ ভুলত না। কাছে এলেই যেন আপনার করে নেবার অসামান্য সৌজন্য ও শক্তি ছিল। সঙ্ঘের সাধকদের কোন ক্রটি দেখলে তিনি কৈদে ফেলতেন এমনই ছিল তাঁর নরম স্বভাব। বিনয়ী, উদার-হৃদয় জনপ্রিয় মানুষটি যেন বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি ছিলেন। সব কাজেই নলিনদা আমাদের এগিয়ে দিতেন আর পিছন থেকে কল্যাণ দৃষ্টি ও শুভেচ্ছা দিয়ে সাহায্য করতেন। তাই ছাড়া তাঁর সম্বোধন ছিল না।

সঙ্ঘের প্রথম সংগঠন যুগে নলিনদা ছিলেন প্রচারক। কলিকাতার লক্ষপ্রতিষ্ঠ দানশীল লোকের ঘারে ঘারে তিনি ঘুরতেন। সঙ্ঘ তখন খুবই নগণ্য এক প্রতিষ্ঠান, তবুও তার ভাবাবেগের দ্বারা সঙ্ঘের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে এত স্বেচ্ছা করে ধরার স্বপ্ন আঁকতেন যে, কেউ সাহায্য করতে না পারলেও, সঙ্ঘগুরুকে দেখতে আসার আকাঙ্ক্ষা দমন করতে পারতেন না। দান সংগ্রহে নলিনদা ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। তাঁর প্রচারের গুণের সহিত অমায়িকতা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা লোকদের মুগ্ধ করত। শুধু বাঙালী নয় অবাঙালীর কাছেও তাঁর যাতায়াত

সহজ ও স্নগম ছিল। তাঁর সাহচর্য্যে এসে সঙ্ঘের দুঃখের দিনে কত লোক যে সঙ্ঘের আপনার হয়েছিল ও আত্ম পর্য্যন্ত আছে তার সংখ্যা নেই। প্রথম যুগে সঙ্ঘ বিপ্লব প্রতিষ্ঠানরূপে পুলিশের কুজনের ছিল—যেখানে যেখানে নলিনদা ঘোরাঘুরি করতেন তারা কোথাও কোথাও ধাওয়া করে সঙ্ঘকে সাহায্য করলে তদানীন্তন সরকারের কুনজরে পড়তে হবে বলে ভয় দেখাত, কিন্তু নলিনদা এখন কোঁশলে তাঁদের দান সংগ্রহ করতেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আনন্দময় পুরুষ, প্রেমিক প্রচারক—লোকে পুলিশের ভয় ভুলে তাঁকে সাহায্য করতে বাধ্য হোত। পরে নলিনদা বিদ্যার্থী ভবনের কাছে সর্বদা ব্যস্ত থাকায় কলিকাতায় বা বাইরে ঘুরতে পারতেন কম, কিন্তু আমরা যেখানে গেছি প্রথমেই নলিনদার নামটি তাঁরা করে খবর নিতেন।

১৯২০ সালে ‘Standard Bearer’ সঙ্ঘের ইংরাজী মাসিক বাহির হয়। উপরের মলাটে লেখা থাকতো ‘Under the inspiration of Sri Aurobindo’ কলিকাতা থেকে প্রকাশ করার দায় দায়িত্ব সব নলিনদার ঘাড়ে সঙ্ঘগুরু (যদিও তখন এ নাম হয় নি) দিলেন। না আছে অর্থ, না আছে কোন সম্বল। কিন্তু যেহেতু সঙ্ঘগুরু দায়িত্ব দিচ্ছেন, নলিনদার সে যে কী অসীম দরদ দিয়ে কার্য্যভার গ্রহণ করার ইচ্ছা ও উদ্যম তা ভোলার নয়। আমরা তখন নলিনদার কলিকাতার বাসায় সন্ধ্যার পর আড়া জমাতুম—সকলেই ছিলাম নবাগত। টাকা নেই—তু’ তিনখানা কাগজ বাহির হয়ে গেছে—Metcalf Press-এর তাগিদ—নলিনদার হাসিমুখে এক কথা—আচ্ছা এ সংখ্যাটা বাব করে দিন না—টাকা দিচ্ছি—Press-এর স্বত্বাধিকারী সয়কারী কর্মচারী ছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় গড়গড়া নিয়ে Press এ এসে বসতেন। এদিকে Standard Bearer কম্পোজ হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে স্বত্বাধিকারী টাকার কথা তুলছেন আর নিঃসম্বল নলিনদা তাঁকে দেশের, সঙ্ঘের নানা কথার অবতারণা করে ভোলাচ্ছেন। কোন কোন দিন রাজি ১০টা-১১টা হোয়ে যেত। Press-এ বসে বসেই নলিনদা আসর জমাতেন।

খাওয়া ঘুম ভুলে যেতেন। আমাদের কয়েকজনকে গ্রাহকদের ঠিকানা লিখে দিতে বলতেন—সন্ধ্যায় এলে—তাও যেন কত কুণ্ডার সঙ্গে। তাঁর কাছে যারা আসতো এত ভালবেসে কাজ করত যেন নলিনদার কাজ তাঁদেরই কাজ। Standard Bearer বন্ধ হয়ে যায়—Press-এর অনেক টাকা বাকী পড়ে। স্বত্বাধিকারী নলিনদার এমন প্রেমে পড়লেন যে, টাকার তাগিদ দিতে যেন অতি কুণ্ডা করতেন। টাকা দেওয়া হয় নি—নলিনদা কখনও দেব না বলতেন না—এমনি তাঁর অন্তরে বিশ্বাস ছিল।

কত মনে পড়ে যাচ্ছে—রোজ সন্ধ্যায় আমরা অন্ততঃ ১৩/১৪ জন ভ্রমণ কলিকাতার তখনকার হেডুয়ার ঘাসের উপর বসে রাত্রি ৯/১০টা পর্যন্ত আড্ডা জমাতুম। নলিনদা একমুখে বলে যেতেন—কেবল আশ্বতোলা ভাবের মানুষ আর মধ্যে মধ্যে চন্দননগরের ও সন্ধ্যাকর কণা পাড়তেন। আমাদের মনকে প্রস্তুত করতেন। নলিনদার মাসিমার বাড়ী যেদিন সন্ধ্যায় আমরা জমায়েত হতুম—সে ছিল এক ফ্যাসাদ—নলিনদার মেসো ছিলেন পাঁড় মাতাল। সন্ধ্যায় বাড়ী এসে প্রথমে জলে যেতেন আমাদের দেখে। কতদিন তাড়া করতেন—নলিনদা সামলে দিতেন। মেসোমশায় নলু বলতে যেন অন্তরান—বলতেন নলুব কাছে এরা এসেছে—আচ্ছা সব বস—বলে রাত্রে বাজার থেকে চৌকি চৌকি খাবার এনে নলিনদার হাতে দিয়ে বলতেন—নলু তোমার ছেলের খাইয়ে দাও—আমি বকেছি বলে কিছু মনে কর না। নলিনদা যেন জাহ্নু জানতেন। কত হাসি ঠাট্টা, গল্প-গুজব হোত, নলিনদা সব শুনতেন, হাসিতে গাল ভরে যেত কিন্তু উদ্দেশ্য ভুলতেন না অর্থাৎ আমাদের সন্ধ্যাকর খণ্ডের এনে দেওয়া। এমন কত পুরানো দিনের কথা স্মৃতিতে ভীড় করে আসছে। কিন্তু থাক...

*

নলিনদার মৃত্যু হোল কিন্তু সহসা। শেষাশেষি কয়েক মাস নলিনদার সেবার জন্ত অর্থাৎ তাঁর কাছে হাজিরা দেবার জন্ত সর্ব সময় সেবক দরকার হোত।

প্রধান সেবক ছিল আমাদের সুধাংশু—কি অকৃত্রিম সেবা একজন মানুষের জন্ত একজন দিতে পারে—একান্ত সুহৃদ, সখা, বশংবদ পুত্রের চেয়েও বেশী। নলিনদাও সুধাংশু ছাড়া হোতে চাইতেন না। সুধাংশু বাইরে গেলে নলিনদার কষ্ট না হয় সব ব্যবস্থা করে যেত। ১১ই অক্টোবর ছিল রবিবার—বৃহস্পতিবার নলিনদা পায়খানায় যেতে গিয়ে কেমন যেন হয়ে যান। সুধাংশুর খবর পেয়ে আমরা ছুটে আসি। তখন দেখি নলিনদা একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। আমাদের দেখে বললেন—পায়খানায় যাব। আমরা যেতে দেব না, তিনিও যাবেনই। শেষ পর্যন্ত ধরে ধরে গেলেন। প্রতিদিন ভোর ৪ টায় বিছানা ছেড়ে ইঞ্জি চেয়াবে এসে শুতেন। সারাদিন ঐ ইঞ্জি চেয়ারখানিতে বসে থাকতেন হু' পা উঁচু করে। বিছানায় দিনের বেলা শুতে পারতেন না। সন্ধ্যায় বাইরে এসে বসতেন। শুক্রবার থেকেই একরূপ বেশীক্ষণ শুয়ে থাকতে হয়। শেষ পর্যন্ত বলতে গেলে জ্ঞান ছিল। শনিবার আমার Trust-এর General meeting-এর জন্ত কলিকাতায় যাবার কথা ছিল। খোঁজ নিলেন—আমি ঠিক যাচ্ছি কিনা। এরই মধ্যে শুক্র কি শনিবার সকালে দেখি সামনে হাত বাড়াচ্ছেন, যেন কাকে ধরতে যাচ্ছেন। সুধাংশু কেবল ডেকে ডেকে তাঁর চৈতন্ত রাখার চেষ্টা করত। হাত বাড়াচ্ছেন কেন—জিজ্ঞাসা করতে বললেন—বিরক্ত কর না, ভগবান যে দাঁড়িয়ে আছেন—তাকে দেখছি। প্রায় এই কথাই বোধ হয় শেষ কথা তবে আমার মনে আছে শনিবার কেবল খোঁজ নিচ্ছিলেন কটা বেজেছে। আমি বললুম—কটা বাজা তোমার দরকার? কিছু বললেন না। একদিন মাত্র বিছানায় শুয়ে তাঁকে পায়খানা করাতে হয়েছে শুক্রবার বৈকালে। কাউকে না ভুগিয়ে তিনি সহসা রবিবার সকালে চলে গেলেন।

*

আমার কেবল মনে হচ্ছে আশ্রমে কার সঙ্গে হৃদয় বিনিময় করব।

সাধক নলিনচন্দ্র

শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক

সাধক নলিনচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে প্রবর্তক সম্বন্ধে অল্প মর্মান্বহত, শুধু প্রবর্তক সম্বন্ধে নয়, চন্দ্রনগর আর একজন নিষ্ঠাবান, প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও শিক্ষাব্রতী সাধককে হারাইয়া অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করিতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার অস্বদ্বাদে প্রবর্তক সম্বন্ধে যে ক্ষতি হইল তাহা প্রকৃতই অপূরণীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৮৯০ খৃঃ জাহ্নসারী মাসে নলিনচন্দ্র ২৯ পরগণা জেলার নৈহাটীর সরকার বাড়ীতে (দিদিমার পিতালয়ে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক বাসভবন ছিল বর্ধমান জেলার মেডাল গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় অবোরচন্দ্র দত্ত, তাঁহার পিতৃব্য ৮কালিকাদাস দত্ত; তিনি কুচবিহার রাজ্য ষ্টেটের দেওয়ান এবং প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নলিনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দত্ত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা ৮বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্য করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পুত্র ৮চারুচন্দ্র দত্ত, আই. সি. এস. বোম্বাই-এর ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেশনস্ জজ ছিলেন। এই চারুবাবু শ্রীঅরবিন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সাধনায় এবং দেশসেবায় ও বিপ্লব কার্য্যে সম্পর্কিত ছিলেন। শেষ জীবনেও তিনি শ্রীঅরবিন্দের সাধনাতেই সজীব মগ্ন থাকিয়া উভয়েই পণ্ডীচরীতে দেহত্যাগ করেন।

নলিনচন্দ্র অতি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া তাঁহার মাতামহ চন্দ্রনগর বোডাইচণ্ডীতলা নিবাসী ৮উমেশচন্দ্র ঘোষের ও তাঁহার দিদিমার যত্নে তাঁহাদেরই বাড়ীতে অতি বাল্যকাল হইতে লালিতপালিত হন। এই বাড়ীটিও পরে সম্ভব উৎসর্গীকৃত হয় এবং সেখানেই দিদিমাকে “মাতৃ” সম্বোধনে, তাঁহারই বাটীতে প্রৌঢ় বয়স অবধি বাস করেন।

সম্ভব মতিলালের এবং নলিনচন্দ্রের মাতামহের বাড়ী কাছাকাছি, তাই নলিনচন্দ্র তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যুর পরই চন্দ্রনগরে তাঁহার মাতামহের বাড়ীতে থাকিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তখন

হইতেই তিনি মতিমামার সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁহারই সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া, স্বদেশী ব্রতের দীক্ষা লাভ করেন এবং সকল সময়েই তাঁহার মতিমামার সহিত নিগূঢ় পরিচয়ের ফলে দেশসেবার জন্ত তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং তিনি সর্বতোভাবে মাতৃসাধনায় মগ্ন হন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড কর্জন কর্তৃক বাংলা বিভাগের ফলে যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং তাহারই অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে বাংলার তথা সমগ্র ভারতের মধ্যে যে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তাহারই ফলস্বরূপ চন্দ্রনগরে মাতৃসাধক কানাইলাল দত্ত সরিষাপাড়ায় তাঁহার মাতুল ৮নন্দকুমার দত্তের গৃহে বাসকালে, তথায় যে লাঠি ও ছোরা খেলা, বস্ত্রিং, কুস্তি এবং অন্যান্য শরীর চর্চার যে আশা গড়িয়া তুলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশাসুরাগের তিস্তিস্বরূপ যে পাঠ-চক্র প্রতিষ্ঠা করেন, নলিনচন্দ্র অতি বাল্যকালেই তাহাতে যোগ দেন এবং কানাইলাল আলিপুর বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হইবার পর, সম্ভব মতিলাল যখন এই পাঠ-চক্র তাঁহার বাড়ীতে স্থানান্তরিত করেন, নলিনচন্দ্র এবং অরুণচন্দ্র দত্ত তাহার একনিষ্ঠ ছাত্ররূপে এই পাঠচক্রকে বলিষ্ঠ হইবার পথে সহায়ক হন। আমিও তখন কানাইলাল দত্তের বাড়ীর সকল খেলাধুলায় ও পাঠচক্রে এবং পরে মতিদাদার সকল বিষয়েই অমুরাগী হই। ইহার পূর্বেও মতিদাদার সহিত অতি বাল্যকাল হইতে আমার পারিবারিক জীবনে পরিচিত ছিলাম।

নলিনচন্দ্রের ছাত্রজীবনের শিক্ষাও চন্দ্রনগরের তদানীন্তন ডুপ্পে কলেজেই হয়। সেই সময় তিনি চারুচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে আসিয়া শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। তথা হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান হইতে আই. এ. এবং বি. এ. পাশ করেন। পরে কলিকাতায় থাকিয়া এম. এ. পড়েন কিন্তু পরীক্ষার পূর্বেই তাঁহাকে

কলেজ ছাড়িতে হয় এবং তাঁহার আর এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া হয় না।

১৯০৮ খৃঃ বাংলায় বিপ্লব আন্দোলন আরম্ভের অব্যবহিত পরেই মানিকতলার বোমার মামলায় যখন বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীগণ গ্রেপ্তার হন, তখন কলিকাতার বিপ্লবকেন্দ্রের অনেক কর্মতার চন্দননগরে আসিয়া পড়ে। শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির সঙ্গে চন্দননগরের উপেন্দ্রনাথ ও কানাইলালও গ্রেপ্তার হন। এই অবস্থায় সজ্জগুরু মতিলাল বিপ্লবের অন্ততম কর্ণধার-রূপে চন্দননগরেই ইহার কেন্দ্র স্থাপনা করেন। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এবং পরে রাসবিহারী বসু তাঁহার প্রধান সহায় হন। অন্তপক্ষে চন্দননগরের দক্ষিণে চন্দ্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্বোধনে আর একটি বিপ্লবকেন্দ্র গড়িয়া উঠে।

এই সময় ছাত্রজীবনেই নলিনচন্দ্র তাঁহার মতিমামার নিকট হইতে বিপ্লবের দীক্ষা লাভ করিয়া সকল কর্মে তাঁহার সহায়ক হন। আমি এবং শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত এই সময়ে চন্দননগরের বিপ্লবকার্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করি এবং নলিনচন্দ্রের সহিত সকল বৈপ্লবিক কার্যেই সংশ্লিষ্ট থাকি। চন্দননগর যখন বোমা তৈয়ারীর প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায়, নলিনচন্দ্র ইহার মালমশলা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে, বিশেষ করিয়া বোমা তৈয়ারীতেই নানাভাবে সাহায্য করিতেন। চন্দননগরের যে বিভিন্ন স্থানে বোমা তৈয়ারীর সহায়ক-কেন্দ্র ছিল, তাহার সংযোগ রক্ষা করিতেন এবং পরিদর্শনেও ত্রুটি থাকিতেন। ইহার পূর্বে যখন বিপ্লববিহারী গাজুলী এবং অমৃত্যুর উদ্যোগে রডা কোম্পানীর মজার পিস্তল ও কার্তুজ লুটের পর ইহার এক প্রধান অংশ শ্রীসত্যচরণ কর্মকারের সহায়তায় চন্দননগরে আনীত হয়, নলিনচন্দ্র এই সব অস্ত্রাদি সংরক্ষণ ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। দিল্লীর চাঁদনীচকে ১৯১২ খৃঃ ২৩-এ ডিসেম্বর দিল্লী দরবারের শোভাযাত্রা কালে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর ইঙ্গিতে বসন্তকুমার বিশ্বাস যে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা চন্দননগরেই

আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল। সেখান হইতে নলিনচন্দ্র উহা কলিকাতায় লইয়া যান এবং তথা যাইতে বোমাটা দিল্লীতে পাঠান হয়।

১৯১৪ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট, শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় ‘আর্য্য’ পত্রিকা প্রকাশ করেন, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পূর্বে ৫ই আগষ্ট, ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার ফলে, ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত আর্য্য পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। ইংরাজী ভাষায় আর্য্য যথারীতি বাহির হইতে থাকে। এই সময়ে সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল রায় শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং তাঁহারই নির্দেশে চন্দননগর হইতে পাক্ষিক প্রবর্তক পত্রিকা বাহির করেন। আমিই ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলাম। ৮রামেশ্বর দে ইহার প্রকাশক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত ছিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে, যখন শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লব কার্যে “Halt, Moti” বলিয়া নির্দেশ দেন এবং সংগঠন কার্যে তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করেন, তখন নলিনচন্দ্র কলিকাতায় কার্তিক বসুর গলিতে তাঁহার মাসিমাতার বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করেন এবং শ্রীমতিলাল রায়ের কথামুযায়ী সংগঠনকার্যে ত্রুটি হন এবং তাঁহারই নির্দেশে যখন মতি মামার কার্যে সহায়তা করিবার জন্ত লোকসংগ্রহে লিপ্ত থাকেন, সেই সময় সজ্জগুরুর অন্তরে আর একটি প্রেরণা জাগিয়া উঠে। তিনি শ্রীঅরবিন্দের অনুমতি লইয়া “The Standard Bearer” নামে এক সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ করিলে, নলিনচন্দ্র এই কার্যের সমগ্র গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইহার জন্ত যে অর্থাদি প্রয়োজন হয়, তাহাও তিনি নিজেই সংগ্রহ করিতেন। এইভাবে কয়েক বৎসর The Standard Bearer পত্রিকা চলিবার পর, উহা বন্ধ হইয়া যায়। তখন নলিনচন্দ্র প্রবর্তকেরই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া, সজ্জগুরু যেমন ভাবে তাঁকে নিয়োগ করিতেন, তিনি সেইভাবেই সম্বন্ধ প্রচার কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

এই সময় ১৯২১ খৃঃ সরস্বতী পুজার দিন, চন্দননগরে যেখানে বর্তমান প্রবর্তক আশ্রম রহিয়াছে, সেখানেই

তিনি জাতীয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রবর্তক বিভাগীঠের প্রতিষ্ঠা করেন। বাহারা সেই সময়ে সর্বস্বত্যাগী হইয়া প্রবর্তকের শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তক বিভাগীঠে যোগদান করেন তাঁহাদেরই মধ্যে অধিকাংশই আজ প্রবর্তক সঙ্ঘের মেরুদণ্ড হইয়া সঙ্ঘগুরুর সকল কার্যে সহায়তা করিতেছেন। এইভাবে নলিনচন্দ্র প্রবর্তকের শিক্ষা এবং আদর্শ প্রচারের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া কার্যে অগ্রসর হন। ইহার ফলে সঙ্ঘের নাম চারিদিকে ব্যপ্ত হইয়া পড়ে। বাহিরে নলিনচন্দ্র সঙ্ঘের প্রচার এবং গঠনমূলক কার্যে যে ভাবে আত্মদান করেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরের সাধনা আরও গভীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে উচ্চতর আদর্শে উন্নীত করে।

চন্দননগরের যে বাড়ীতে নলিনচন্দ্র তাঁহার মাতামহ এবং মাতামহীর সহিত বাস করিতেন, তাহা তাঁহার নলিনচন্দ্রকেই সম্পূর্ণ দিয়া যান, নলিনচন্দ্র পরে তাহা তাঁহার আত্মদানেরই সাক্ষ্যস্বরূপ সঙ্ঘে উৎসর্গ করেন। তাঁহার নিজস্ব বলিতে তিনি আর কিছুই রাখেন নাই।

সঙ্ঘগুরু ১৯২১ খৃঃ প্রবর্তক আশ্রমে ছাত্রজীবনের মধ্য দিয়া মাহুষ গড়ার জন্য যে বিভাগীঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাকেই পরবর্তী যুগে বৃহত্তর রূপ দিবার উদ্দেশ্যে, শিক্ষার বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা করিতে

থাকেন। চন্দননগরে ফরাসী শাসনের একটি নিয়ম ছিল যে, গভর্নমেন্ট ভিন্ন আর কাহারও বে-সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে পারিবেন না। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সে নিয়ম যে চলিতে পারে না এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বে অনেক অসুবিধাও আছে তাহা প্রদর্শন করিয়া সঙ্ঘগুরু তদানীন্তন ফরাসী কর্তৃপক্ষের নিকট একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পশ্চিচারীতে আবেদন করেন। অনেক অসুস্থস্থানের পর ফরাসী কর্তৃপক্ষ সে আবেদন মঞ্জুর করিয়া প্রবর্তক সঙ্ঘকে চন্দননগরে বে-সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অমুমতি দেন। ইহার ফলে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গোস্বামী ঘাট শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে প্রবর্তক বিভাগীভবন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নলিনচন্দ্র দত্ত ইহার ভারপ্রাপ্ত হন। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি নিরলস শ্রম ও সেবায় এই বিদ্যালয়ের লালন পালন ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। ১৯৪৯ খৃঃ সঙ্ঘগুরুজী বিদেহী হইবার পর, নলিনচন্দ্র সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। বিরামহীন সেবার মধ্য দিয়া সঙ্ঘের সকল গুরু দায়িত্ব বহন করিয়া তিনি যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গেলেন তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মৃত্যু তোমা করে নাই ম্লান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

প্রবর্তক প্রাণলোকে তুমি এক প্রস্ফুট নলিন
অর্গের স্বপ্নমা ভরা প্রজ্ঞাদীপ্ত চির অমলিন।
সত্যের আহব-মন্ত্রে আত্মদান করিয়া স্বীকার
দুর্জয় বাসনা বন্ধে ছিল তব নিত্য অভিসার।
দীক্ষা নিয়া অগ্নিমন্ত্রে বিদুরিতে মানিভার যত
ত্যাগবীৰ্য্যে নিষেছিলে হে ঐশ্বিক স্বাধীনতা-ব্রত।

মৃত্যুরে করিয়া তুচ্ছ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিতে
তোমার নিঃশঙ্ক বাণী শুনায়েছে প্রাণ উৎসারিতে।
সঙ্ঘের সাধনতীর্থে শিক্ষাব্রত করিয়াছে দান
মুমুকু জ্ঞাতির তাহা করিয়াছে বিরাট কল্যাণ;
যেই শিক্ষা অসত্যেরে অহুক্ষণ ম্লান করি দিয়া
সত্যের আলোক স্পর্শে অমরত্ব নিয়াছে অর্জিয়া।

জ্ঞাতির প্রণম্য তুমি, কীর্তি তব রাখি অনির্কাণ

চিরঞ্জীব বীর তুমি,—মৃত্যু তোমা করে নাই ম্লান।

শেষ শয়ান পার্শ্ব

কুমারী রেণুকণা ঘোষ (সজ্জকর্তা)

নলিনদা, ও নলিনদা! নলিনদা! কি হয়েছে? ক্লান্ত-কাতর চোখ দুটি মেলে কেউ আর বলবে না—“কি যেন হয়ে গেল।” পার্শ্ব গিথে দাঁড়ান মাত্র কেউ আর শাস্ত সংযত কণ্ঠে জানাবে না—“বড় কষ্ট! অব্যক্ত যন্ত্রণা।” সব শেষ! ধ্বনির প্রতিধ্বনিটিও মিলিয়ে গেল। মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

আড়াই ঘণ্টা আগেও যে মানুষটি স্ব-মহিমায় সুসজ্জিত বেশে আশ্রম-অঙ্গনে শায়িত ছিলেন—যে মানুষটির পুণ্য তত্ত্বাবধান ঘিরে সম্ব-ভাইবোনদের সাথে তাঁর চির প্রিয় শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সেই সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত আশ্রমপ্রাঙ্গণে আসীন ছিলেন—যাঁর মরদেহখানি শেষবারের মত বহন করার জন্ত সকলেই ব্যগ্র ব্যাকুল—আড়াই ঘণ্টা পরে সেই সবার প্রিয় প্রজ্ঞাতাজন, চিরহাস্যময় অমায়িক মানুষটির মরদেহের আর কোন চিহ্ন এই মর্ত্যধূলির পুরে রইল না। সহস্র নবন মেলে অহুসন্ধান করলেও আর তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এমনই হয়। বিশ্ববিধাতার এমনই নিষম-নীতি। সৃষ্টির ইহাই অকাট্য বিধান। “জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে।” কিন্তু তাই কি? অমর ব্যক্তিও কি নাই? আছে বৈকি। দেহের লয় হলেই যে মানুষের মৃত্যু হবে, এমন কোন কথা নেই। বিদেহী হয়েছে মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে। যে গুণ ও কর্মের দ্বারা মানুষ অমর হয়, সেই গুণ ও কর্ম আমাদের নলিনদারও যে ছিল। নারাণদা সত্যই বলেছেন—“আমাদের সকলেরই মৃত্যু হবে, কিন্তু নলিনের মৃত্যু নেই; সে চির অমর হয়েই থাকবে।” মননশীল নারাণদার উক্তি চেতনা সজাগ হয়। সত্যই তো আমাদের নলিনদার মরণ নাই, মৃত্যু তাঁকে কবলিত করতে পারে না। হিসাবের ভুল আমাদের হয় নি, মনকে চোখ ফাঁকি দেয় নি। ষোল আনা মন দিয়ে ছ’ চোখে অনিমেঘ মেলে ধরে যা দেখেছি, তা’ ঠিকই। নলিনদা আশ্বে আশ্বে ডুবে যাচ্ছেন, কোন গভীরে, অতলে যেন তলিয়ে যাচ্ছেন, নিমজ্জমান অবস্থাতেও বার বার সন্ধানী দৃষ্টি মেলে শ্রীশ্রীগুরুদেবের

অশরীরী অবস্থিতি লক্ষ্য করছেন—শিখিল হাতখানি বাড়িয়ে যেন তাঁর হাতে হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন—তাঁকে জাগিয়ে রাখার শত প্রয়াসও যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত তখনও মনের মন যিনি, তিনি বলছেন, নলিনদাকে এখনও বেঁচে থাকতেই হবে; শ্রীগুরুমন্দির সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নলিনদা যেতে পারেন না। শ্রীগুরুমন্দির সমাপ্ত হওয়া মানেই শ্রীগুরুর ভাব ও আদর্শের সম্যক রূপায়ণ। এই রূপরেখা সম্পূর্ণরূপে স্রুতিপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নলিনদা কি করে যেতে পারেন? চক্ষু-মন বাহ্য সত্য দর্শন করলেও মনসঃ মনের দৃষ্টি কিন্তু অন্তঃস্বত্বপথ-যাত্রীকে মরণের অভিসারে ধেয়ে যেতে দেবেও সে যেন তা স্বীকার করতে রাজী নয়। সতর্ক বাণী কানে আসে—না, হিসাবের ভুল হয় নি। নলিনদাকে কালান্তকাল অবধি বেঁচে থাকতেই হবে। মন ও অতি মনের দোটানায় পড়ে কেমন যেন বিভ্রান্তি এসে গেল। তাই যে মুহূর্তে নলিনদার শেষ নিঃশ্বাসটি শেষ হয়ে থেমে গেল, সেই মুহূর্তে একটা অব্যক্ত বেদনায়, একটা তীব্র অনুশোচনায় মর্ষ যেন পুড়ে গেল—তবে কি হিসাবের ভুল হল? কি এক গভীর শূন্যতায় অন্তর বাহির তরে গেল। অহুভব করলাম—পাঁচ বৎসর পূর্বে পুণ্ড্রপাদ সজ্জগুরুদেবের শয্যা-পার্শ্বেও এমনই ভাবে বসেছিলাম, সেদিন তো কৈ এমন শূন্যতাবোধ জাগেনি। সেদিনের সে ব্যথা যেন পূরণের জুরেই বেজে উঠেছিল। কিন্তু আজ! আজ কেন এমন হয়? যেন মনে হয় নলিনদার সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগেরও বুঝিবা অঙ্কপাত হয়। একি শূন্যতা বোধ! নিজের কাছে নিজের অস্তিত্বকে সজাগ রাখার জন্ত উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মনাম জপ করতে করতে যেন সন্ধি ফিরে আসে। বোধি-সম্ভ্রাম কে যেন আঘাত দিয়ে জানায়—একি মৃত্যু? না মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যোগী শিষ্যের যোগীগুরুর সহিত মিলিত হওয়ার উদগ্র আকুলতা। তা না হলে এত জ্ঞান, এত চেতনা নিয়ে কি কেউ কখন মরতে পারে? এই না এক মিনিট পূর্বে গীতাপাঠ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নলিনদা উৎকর্ষ হয়ে তা’ শুনতে লাগলেন। তাঁর স্মৃতিত অধর একবার কেঁপে উঠল সমবেত সম্বতাইদের কণ্ঠস্বরে

কণ্ঠ মেলাতে! চোখে দেখেও এমন ভাস্কি! মরণের বিভীষিকা দর্শন! মৃত্যুর পর সব শেষ হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক! ব্রহ্মনাম জপ করার সঙ্গে সঙ্গে মনঃমনের অভাস্ত দর্শনকে গাঢ় ভাবে উপলব্ধি করার জন্ত চক্ষু মুদে নলিনদার শয্যা পাশে ঘন হয়ে বসলাম।

কে আমাদের এই নলিনদা? বীর বিয়োগে এত ব্যথা, বেদনার আঘাত; উষ্মলিত অশ্রু বারণ মানে না। কোন রক্তের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে আমাদের আছে কি? না তো! তবে এত আপনার হতেও আপন জন হলেন কেমন করে? এটাই অসুধাবনীয়। সজ্ব-পরিবারের সজ্বজননী ও সজ্বগুরুদেবকে কেন্দ্র কবে যে মধুচক্র গড়ে উঠেছে সেই মধুচক্রের মধ্যমণি আমাদের এই নলিনদা। দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল এক সঙ্গে অবস্থান করেও নলিনদার পিতৃপরিচয়, বংশাবলী আজও সম্যক আমাদের জানা নেই—জানার প্রয়োজন বোধও কোনদিন হয় নি। কুল-গোত্র ছাড়া একদল মানুষ যে নবরসে নব ভাবে সঞ্জীবিত হয়ে দানা বেঁধে উঠেছে, সেই রসে রসান্নিত হবেই জীবনতরা ভেসে চলেছে—আত্মীয় গোষ্ঠীর পরিচয়স্পৃহা তাই জাগে নি কোনদিন। সজ্ব-তার্থে অতিথি হয়ে যেদিন আই. সি. এস. ত্রিচারচন্দ্র দত্ত এলেন—নলিনদার দাদা বলেই সজ্বগুরুদেবের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছি আমরাও। অত্ৰ কোন পদগৌরবের স্থান সেখানে ছিল না। এমনই ধারা আত্মীয় স্বজন যে যখন এসেছেন অন্তরের সঙ্গেই বরণ করে নিয়েছেন নলিনদা—কিন্তু বংশমর্যাদায় কোনওদিন স্ফীত হয় নি, কুলগৌরবেও কোনদিন গৌরবান্বিত হতে দেখি নি।

এমনই নিরহঙ্কার ও নিরভিমানিষ ছিল নলিনদার সহজাত গুণ। ভালবাসা দিয়ে সকলকে আপন করে নেওয়ার জন্মগত অধিকার নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। সজ্বগুরুদেবের প্রেম ও ঐক্যমন্ত্রের মূর্ত সাধক ছিলেন তিনি। সজ্বতীর্থ রচনায় নলিনদার অবদান যে কত—তাঁরা দিয়ে তা' খাটো করব না। তাঁর সর্বশেষ দান শ্রীমান সুধাংশু। শিক্ষিত ভদ্রবংশের সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান সুধাংশু। শিক্ষকতা করার জন্ত নলিনদার কাছে আসে। এসে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ল কেমন করে? এত প্রেম, এত ভালবাসা, এত ভক্তি, এত শ্রদ্ধা এর যে তুলনা মেলে না। এ কোন সঘন্থের টানে এমন হয়? পিতা নয়, পুত্র নয়, সখা নয়, সুহৃৎ নয়, গুরু নয়, শিষ্য নয়, প্রভু নয়, ভৃত্য নয়, এখানে দেনাপাওনার কোন কথা নেই—দানপ্রতিদানের কোন হিসাব নেই; প্রাকৃত সঘন্থের লেশ নাই নেই—এ সত্যই অপ্রাকৃত সঘন্থ—এ শ্রদ্ধা-প্ৰীতি-ভালবাসা অনির্কচনীয়। “সুধাংশু! সুধাংশু!” নলিনদার ক্ষীণ কণ্ঠ ক্ষীণতর হয়। “সুধাংশু, কোথায় তুমি?” সুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে সুধাংশু সাড়া দেয়: “নলিনদা! এই যে আমি।” “আমার কাছে থেকো, কোথাও যেন যেও না।” কাছেই সে ছিল। তারই দিকে মুখ করে তারই কোলে হাত ঝুঁকানি রেখে নলিনদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সুধাংশুর বক্ষভেদী আর্দ্রনাদে নলিনদার মুক্ত আত্মাও বুঝি বিচলিত হয়: বাহুগুণ্ড গুমরিয়া উঠে—বাতাসে প্রতিধ্বনি ফুকারিয়া বলে, “আমি আছি সুধাংশু—চিরদিন থাকব—আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যেও না।”

মৃত্যু-দীপন

কনকপ্রভা দাশগুপ্তা

সুস্মিত তব সৌম্য আনন
মুদিত নলিন কলিকা সম,
মৃত্যু নীরব প্রলেপ পরশে
ঘনাইয়া দিল আঁধার তম।

সে আঁধার শুধু কণিক কুয়াসা,—
প্রাণ-বহির উজল তেজে
এ মরলোকের মর্ম্ম-দীপনে
সূর্য্য সমান ভাতিবে সে যে।

শূন্য ঘর

কুমারী আরতি দত্ত

অধর চরকার সূতা কাটা শিখতে আসা—কাজের
ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। একদিন আশ্রমে গেছি মাসিমার
সঙ্গে অরুণদাদামণির নির্দেশে। মাতৃমন্দিরে মাঘের
অপূর্ণ মূর্তি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। প্রণাম করলুম।
ছবিভরা আর একটি ঘর—মাসিমা বললেন, ভগবান
সম্বন্ধে এখানেই থাকতেন। প্রণাম করে নেমে এলুম
এবার যেখানে—মাসিমা জানালেন—এটি নলিনদাদামণির
ঘর—এখন সম্ব-সতাপতি ইনিই। প্রণাম করতে, আমিও
তাকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার পরিচয় নিয়ে
মাথায় হাত দিয়ে বললেন—“জয় গুরু, জয় গুরু।
তোমার আশা-কামনা ভগবান নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন।”

বাড়ীর সম্পর্কে মনটা বেশ খারাপ ছিল—তিনি
কেমন করে’ কি বুঝলেন জানি-না—মাথার হাত নামিয়ে
পিঠে হাত বুলাতে-বুলাতে বললেন—“ভয় কি, মন
খারাপ ক’র না। মনটা ঠিক করে’ এক লক্ষ্যে এগিয়ে
চল—যা আসবে হাসিমুখে মেনে নেবে—দুঃখ বলে মনে
কিছু রাখবে না। মা-ই সব ঠিক করে’ দেবেন।”

আমি ততক্ষণ একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে’
বসেছিলুম—তাঁরই পায়ের কাছে। কিছু বলতে পারলুম
না—হ’চোখ ভরে’ গেল জলে। মনে-মনে ভাবলুম—
এখানেই আমার সব আছে। উঠে’ এলুম—ভাবতে
ভাবতে। নলিনদার কথাগুলোই কাণে বাজতে লাগল।

আর একদিন নলিনদা এসেছেন সম্ব-মন্দিরের
বৈঠকখানায়। আমি ঢুকে প্রণাম করতেই তিনি জিজ্ঞাসা
করলেন—“মহিলাসদনে থাক ? তোমার নাম কি ?”
ভাবলাম বোধ হয় ভুলে’ গেছেন। নাম বলতেই তিনি
বললেন, “ও, কেমন আছ ? কাজ শিখছ ? সূতো
করেছ কি ?”

বললুম—“হ্যাঁ, কিছুটা করেছি।”

খুশী হয়ে তিনি বললেন : “হ্যাঁ, চরকা-তাঁত
আমাদেরই আবলধনের আদর্শ। মন দিয়ে শিক্ষা কর।
মা তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন।”

দু’বছর পরে আমি সম্বই চলে এলাম—স্বচ্ছায়।
না, এখানকার আকর্ষণই আমায় টেনে আনল।

এবার দেখা হওয়ার কিছু বেশী সুযোগ হ’ল—
নলিন-দাদামণির সঙ্গে। অগ্রহায়ণ মাসে সম্বজননীর
উৎসব। উৎসবের এক সন্ধ্যায় আশ্রমে গিয়েছি। মনে
সেদিন কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব—নলিনদার ঘরে
গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি আগের মতই “জয় গুরু”
তিনবার বলে’ আমার মাথায় হাত দিলেন ও বললেন :
“মনটা খুব স্থির করে’ চল—সবই মায়ের ইচ্ছা। ভগবান
কখন কাকে কি দেন বলা যায় না।”

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে কিছু
লোক ঘরে ঢুকতেই তিনি থেমে’ গেলেন।

আমার সারা শরীর কাঁপছিল। মুখে কিছুই বলতে
পারলাম না—চোখের জলে দৃষ্টিটা যেন ঝাপসা হয়ে
এসেছিল।

মায়ের উৎসব যতদিন ছিল, প্রত্যেক দিনই কীর্তন
শুনে ফেরার সময়ে মাকে প্রণাম করে’ বলতুম—“মা,
আমার আশা তুমি পূর্ণ কর।”

পূর্ণিমা-সম্মেলন সে-বার আশ্রমেই হল। সম্মেলনের
পরে নলিনদার ঘরে গেছি প্রণাম করতে, দেখি
অরুণদাদামণিও সেখানে এসেছেন—তিনি সামনের
চেয়ারে। অরুণদা আমায় বললেন “বস, কিছু কথা
আছে।” তিনি একটা চিঠি পড়ে’ শোনালেন—কোনো
যেয়ে চিঠি লিখেছেন দীক্ষার প্রার্থনা জানিয়ে।

নলিনদাই জিজ্ঞাসা করলেন—“তোমার কি দীক্ষা
নেওয়ার ইচ্ছা আছে ? তা’ হলে বল।”

তা’ হলে মা আমার মনের প্রার্থনা শুনেছেন। অস্থিরে
তখন কি যে হচ্ছিল বলে’ বুঝান যাবে না—আমি যেন
কোন ইন্দ্রপুরীতে তখন গিয়ে পড়েছি—আমি যেন আর
আমার মধ্যে নেই। মুখে শুধু বললুম—“আপনারা
যা বলবেন, তাই হবে। আর কিছু বলতে পারব না।”

নলিনদা এবার বললেন—“গুরুমন্ত্র যেই দিক, দীক্ষা
ভগবানেরই দেওয়া—আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।”

আরও কত কথা—সব মনে নেই। মন যেন তার
চাওয়ার শেষে এসে গেছে, আর কিছু বলা-কওয়ার নেই।

এল ২২শে পৌষ—আশাতীতভাবে আমার স্বপ্ন

অবিস্মরণীয়

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

এই বিশ্বসংসারে এক একজন মানুষ জন্মায় স্বভাব ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যে যারা অসাধারণ, সকলের থেকে আলাদা। এঁদের তুলনায় অস্বাভাবিক চরিত্রকে ছোটবড় মনে হয়। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নলিনদা ছিলেন এমনি এক মহৎ মাটির মানুষ। যারাই তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে গেছেন তাঁরই লাভবান হয়েছেন।

অগ্নিযুগে তরুণ নলিনচন্দ্র প্রখ্যাত দস্ত বংশের সকল আভিজাত্য ও সকল উচ্চ সম্ভাবনা তুচ্ছ করে স্বদেশ সাধনায় নিজেকে নিষোগ করেন। এই সময়েই পুজুদায়ী সঙ্ঘগুরুজীর পুণ্যস্পর্শে আসেন এবং তাঁর জীবনের মহনীয় দিকটি খুলে যায়। চন্দননগরের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে প্রবর্তক সঙ্ঘের অতিনব জাতি-সংগঠন যজ্ঞে হবিষরূপে নিজেকে আহুতি দেন।

নলিনদার মত হৃদয়বান উদার মহৎ মানুষ অতি বিরল। দীর্ঘকাল তিনি সঙ্ঘের শিক্ষায়তন পরিচালনা করেছেন। তাঁর অগণিত ছাত্রের মধ্যে এমন একজনও পাওয়া যাবে না যে, নলিনদার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত, বিমুগ্ধ, বিগলিত চিন্তা নহে। তাঁর স্নেহময় ক্ষমাশীল হৃদয় দিয়ে ছাত্রদের অনায়াসে জয় করতেন। তাঁর স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের পরিধি ছিল হিমালয়ের মত পরিবাপ্ত ও প্রশান্ত, জীবনে তিনি কাজের উপর কখন বিরক্ত হতেন না, এবং বিশ্রামও জানতেন না।

সকল কাজেই উৎসাহী হওয়া এবং সকলকে বিশেষ

করে ছাত্রদের উৎসাহী করা, এই ছিল তাঁর স্বভাব। তিনি প্রবর্তক বিদ্যাধিভবনের ডিরেক্টর ছিলেন। পরে এত বড় প্রতিষ্ঠান প্রবর্তক সঙ্ঘের সভাপতি হইলেও আমাদের কাছে সব সময়েই নলিনদাই ছিলেন। পদমর্যাদা তাঁর সহজ স্বভাবকে কৃত্রিম করতে পারে নি।

স্বখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে নলিনদা ছিলেন আমাদের অতল প্রহরী। তাঁকে আমরা সকল অবস্থায় সবকিছু বলতে পেয়েছি। অচ্যায় করেছি, ভৎসনা করেছেন তিনি। আবার কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন।... সেই নলিনদা আজ আর নাই।

যে মহৎ হৃদয় দিয়েছে মরণজয়ী সাহস, দিয়েছে গঠনপ্রেরণা, দিয়েছে আত্মোৎসর্গের শক্তি, যে হৃদয়ে ছিল দেশপ্রেমের অশাস্ত প্রাবন, ছিল বজ্রবাৎসল্যের প্রস্রবণ, সেই হৃদয় চিরদিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করলো।

এই অমূল্য হৃদয়ের মূল্য আমরা দিতে পারি নি। জীবনে চিনতে পারিনি, মরণের কালো যবনিকার মধ্য দিয়ে আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

শ্রীশ্রী শব-সংস্কারের ধোঁয়াতে যেন সন্নিবিষ্ট হয়ে এল। হৃদয়-কন্দরে ধ্বনিত হতে লাগলো নলিনদা নেই, নেই, নেই...। সবই বুঝতে পাবছি কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। যিনি আমাদের হৃদয়-রাজ্যে প্রেমের আসনে অধিষ্ঠিত, তুচ্ছ মৃত্যু তার বিচ্ছেদ আনতে পারবে না। নলিনদা অবিস্মরণীয়।

সফল হল। দীক্ষা দিলেন—অরুণদাদামণি নলিনদাদামণিরই নির্দেশে। দীক্ষান্তে যখন নলিনদাদাকে গিয়ে প্রণাম করলুম—তিনি বললেন, “ধুশী হয়েছ। নিয়মিত পালন করবে। খাও-গে কিছু।”

মনে যেন আর কোনও অত্যাচার নেই। আমার সব এখানেই পেয়েছি। আমার মনের কথা একটু শুনে’ তিনিও মহাধুশী হয়ে’ বললেন, “হ্যাঁ, এই বোধটাই ত চাই। আনন্দে থাক।”

এলা বৈশাখের দিনে সকলকে টিপ পরাচ্ছিলেন তিনি—আমি প্রণাম করতেই তিনি বললেন, “তোমার লাল চন্দনের টিপ পরাব।” বলে তিনি তাই দিলেন।

কেন জানি-না মুখটা বোধ হয় কিছু গম্ভীর ছিল। তিনি হেসে’ বললেন—“আজকের দিনে তোমার হাসিমুখটা একটু দেখব।” - বলে চিবুকটা ধরে’ তিনি মুখ তুলে’ ধরেছেন। আমি তখন আর না হেসে থাকতে পারলুম না। সেখানে অনেক লোক ছিল—আমার

একটু লজ্জাও করতে লাগল। “কাজে আরও উন্নতি কর” বলে’ তিনি সেদিন আশীর্বাদ করলেন।

এবার মহালয়াব দিনেও তাঁর ঐ একই রকম কথা—“কখনও মন খারাপ করবে না, সব সময়ে হাসিমুখে থাকবে। তারপরই তিনি শুয়ে পড়লেন তাঁর বিছানায়—বললেন, “জ্বর হচ্ছে—বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি।”

আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না।

রোজ দেখতে যেতুম আর মনে-মনে মা-ভগবানকে প্রার্থনা জানাতুম—“আমাদের কাছে আরও কিছুদিন থাকতে দাও—নলিনদাকে একটু সুস্থ করে দাও।” কেউ তো তা শুনলেন না—তাঁদের ছেলেকে তাঁরা তাঁদের কাছেই টেনে নিলেন।

শুষ্ক ঘরে গেলে এখনও তাঁর এই কথাগুলিই শুনতে পাই—“জ্বর গুরু, মুখটা শুকনো কেন—কখনও মন খারাপ করবে না।” শূণ্য ঘর কিন্তু হিয়া আমার পূর্ণ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সজ্জ-সভাপতির প্রয়াণ-সংবাদে চট্টল প্রবর্তক আশ্রম
হইতে সজ্জ-সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রলাল চৌধুরী লিখিয়াছেন :

“আজ তোরে পূজামন্দিরে সমবেত উপাসনাস্থে
গীতাপাঠকালে দুঃসংবাদবাহী তারবার্তা পেলাম। সমগ্র
আশ্রমে একটা গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
পূজামন্দিরে শিশুদের কলকাকলিও শুক্ন হইবে।
শ্রদ্ধাম্পদ নলিনদার শরীর দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ যাচ্ছিল
—কিন্তু তাঁকে এত শীঘ্র হারাণ, ইহা কল্পনাও আসে-
নি। পূজার সব বহিরঙ্গমস্থান বন্ধ করে’ দেওয়া হল।
ভগবানের নিকট তাঁর অমর আত্মার উদ্ধৃগতি প্রার্থনা
করি। তাঁর আত্মার উদ্দেশে সমবেত প্রার্থনার আয়োজন
চন্দননগরে যেমন, তেমনি এখানেও ঠিক একই সময়ে সে
ব্যবস্থা করতে চাই।”

জলপাইগুড়ি হইতে শ্রীবীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর পত্র :

“Statesman কাগজে নলিনদার মৃত্যুসংবাদ পেলাম।
দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তিনি বিদেহ হয়েছেন, তাঁর
আত্মা পরমাত্মায় লীন হোক—এই প্রার্থনাই করি।...
এমন একটা সরলপ্রাণ, মিষ্টস্বভাব ও উৎসর্গীকৃত জীবনের
শুভস্থান পূর্ণ হওয়া শক্ত, যাহুবা চিন্তায় এ-কথাই মনে
হয়। সজ্জ-ভাই-বোনদের সমবেদনা জানাচ্ছি।”

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযানেশ-
নারায়ণ চক্রবর্তী এম-এ, সাহিত্যশাস্ত্রীর পত্র :

“দেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতানয়নে,
অধ্যাপনসাধনার নব প্রতিষ্ঠায় প্রবর্তক সজ্জ দীর্ঘকাল যে
দিব্যকর্মযজ্ঞ করে’ চলেছে, তারই অন্ততম ঋত্বিক ছিলেন
মনীষী নলিনদা—তাঁর ত্যাগপুত, কর্মদীপ্ত জীবনের
অগ্নান মহিমা আমাদের জাতীয় জীবনে বহুদিন ধরে’
ভাস্বর হয়ে’ পাকবে। যখনই প্রবর্তকের পুণ্যছায়ায়
গিয়েছি, তাঁর শিশুজলভ সারল্য এবং ঋণিশূলভ অধ্যাপন-
দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়েছি। সজ্জের সকলকে সমবেদনা ও
সহানুভূতি জানাচ্ছি।”

শুক্রাচী বন্ধু গৌতম ধর্মপালের প্রার্থনা :

“Shree Nalinda's saintly life & loving
nature will be warmly remembered by all
those who came in his touch—it will surely
lead his soul to eternal peace.”

দীক্ষিত গুরুভাতা শ্রীজগৎসিং লোরা জিয়াগঞ্জ;
মুর্শিদাবাদ হইতে লিখিতেছেন :

“এই কৃতী জীবনের অবসানে আমাদের সজ্জের,
সমগ্র দেশের এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল। এ শোক
আমার, তাঁর গুণমুগ্ধ সকলের এবং দেশের। তাঁর অমর
আত্মা শান্তিরাজ্যে বিরাজ করুন।”

সজ্জ-সভাপতির মহাপ্রয়াণ-সংবাদে সাংবাদিক
বন্ধুর শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের সংক্ষিপ্ত রবীন্দ্রোদ্ধৃতি :

“বল শান্তি, বল শান্তি দেহ সাধে সব ক্লান্তি
হয়ে থাক ছাই।”

পুরী-প্রবাসী শ্রীঅনিলকুমার মুখার্জীর পত্র :

“I still remember the affectionate smile
with which he (Samgha-president)
greeted me every time. I met him at
Chandernagore. May his soul rest in
peace.”

চুঁচুড়াবাসী সহপাঠী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীর পত্র :

“১৯১৩-১৪ সালে হুগলী কলেজে I. A. ক্লাসে
তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহাকে যতদিন
দেখিয়াছি, কাহারও সহিত বিশেষ কথাবার্তা কহিতে
দেখি নাই। তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই আধ্যাত্মিক-
ভাবাপন্ন ছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে প্রবর্তক সজ্জ যখন
দেখা হইত, তখন একটু মুগ্ধ হাসি তিন তিন বিশেষ
কোন কথাবার্তা কহিতেন না। তিনি পৃথিবীতে
 থাকিয়াও সকল সময়ে অপার্থিব চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন।

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—তঁাহার আত্মা যেন অক্ষয় স্বর্গলাভ করেন এবং প্রবর্তক সজ্জ, তঁাহার আদর্শে একতার সহিত কর্তব্যপথে অগ্রসর হয়।”

সম্ভ্রম চিরজুহু কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থের সহায়ভূতিপত্র :

“মহাষষ্ঠীর দিন নলিনবাবু আমাদের ছাডিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁর অভাব দেশবাসী শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। যাইতে সকলকেই হইবে একদিন ঠিকই, কিন্তু আদর্শের অভাব, দৃঢ় চরিত্র পরিচালক মানুষের অভাব অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হইতেছে।”

বিধান পরিষদের সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্তের পত্র :
“প্রবর্তক সম্ভ্রম একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা। শ্রীদত্ত ছিলেন পরম অমায়িক, নিরহঙ্কার, আদর্শচরিত্র ধার্মিক পুরুষ। শিক্ষক হিসাবে তাঁর সম্ভ্রম বহুত্ব আমি সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। তিনি নিশ্চয়ই শাস্তিলোকে গিয়াছেন। তাঁর আত্মা চির শাস্তি উপভোগ করুন।”

মেদিনীপুর তমলুক হইতে গুরুভ্রাতা শ্রীঅমরেন্দ্র জ্ঞানার আকৃতিপূর্ণ পত্রমর্ম :

“পরম শ্রদ্ধাষ্পদ, আমাদের পরম আত্মীয় নলিনদার পরলোক গমনের বার্তা পাঠে যারপরনাই ব্যথিত হইলাম। অত্যন্ত হতভাগ্য আমি—ভগবান্ সজ্জগুরু মহারাত্তের তিরোধান-সময়েও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হয় নাই। তাঁহারই নিকট প্রত্যাহ চারিবার উপাসনা ও ধ্যানের সময়ে নলিনদার আত্মার উর্দ্ধগতির জন্ত প্রার্থনা জানাইব। এই উপলক্ষে সজ্জসন্তানের অমৃত যাহা কর্তব্য জানাইবেন।

চন্দননগরগৌরব শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয়ের সাক্ষাৎ :
“সজ্জ-সভাপতি শ্রদ্ধাভাজন নলিনচন্দ্র দত্তের পরলোক প্রাপ্তিতে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। বিধির বিধান

মানিয়া লওয়া ভিন্ন আমাদের আর উপায় কি আছে ? মৃত মহাত্মার আত্মার সপত্তি কামনা করি।”

চন্দননগরের ভূতপূর্ব এডমিনিষ্ট্রেটর শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়ের পত্র :

“শ্রদ্ধেয় নলিনবাবুর মৃত্যু সংবাদ কাগজে পড়িয়া মর্মান্বিত হইলাম। তাঁর শ্রামনিষ্ঠা, সকলের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ভগবান তঁাহার আত্মার কল্যাণ করুন, এই প্রার্থনা করি।”

অগ্নিযুগের সহতীর্থ, চিরবন্ধু শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :

“নলিনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। অনেক কালের কর্মী—নিষ্ঠা ও সাহসের তুলনা নাই।”

অখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমহাশয় সর্বাধিকারীর পত্র :

“যুগান্তর পত্রিকায় সজ্জ-সভাপতি কর্তব্যবীর নলিনচন্দ্র দত্তের দেহত্যাগের সংবাদ পেলাম। তাঁর মৃত্যু হল—তিনি চির শাস্তি লাভ করুন।”

চির শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু শ্রীভুবনমোহন দাস লিখিয়াছেন :

“আমাদের নলিনদা দেহরক্ষা করিয়া গুরুধামেই পৌঁছিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আপনারা আমার শ্রদ্ধা ও সহায়ভূতি গ্রহণ করুন।”

বেতালবনের সজ্জসভ্য শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্তের পত্র :

“বড় কর্মী, ত্যাগী ও মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন নলিনদা—তাঁর মৃত্যুতে সজ্জ ও দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাঁর শ্রাদ্ধকার্যে যাইতে পারিলাম না বলিয়া আমি দুঃখিত।”

কুমারপুর হইতে শ্রীবন্ধিম ব্রহ্মচারী জানাইয়াছেন :

“নলিনদার মৃত্যুসংবাদে অন্তরে একটা ব্যথার মোচড় অনুভব করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে বিশ বছর আগেকার তাঁর সম্বন্ধ স্পর্শ, সম্বাদভূতি ও দিব্যমুষ্টি আমার মনোলোকে সব ভেসে’ উঠল। সম্বন্ধটির অত্যন্তম স্তম্ভ তিনি—তাঁর অমর আত্মার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।”

বারাণসী মীরাবাণী প্রচার সমিতির অধ্যক্ষ শ্রীব্যোম-কেশ ভট্টাচার্য্যের শ্রদ্ধানিবেদন :

“১৯৬১ সালে নলিনবাবুর সহিত আলাপ-অলোচনার অভিজ্ঞত হইয়াছিল। তিনি সম্বন্ধরূপ যথার্থ উত্তরাধিকারী ও যোগীপুরুষ, তাঁর বিদেহ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।”

উত্তরপ্রদেশ প্রবাসী শ্রীজীবনকৃষ্ণ বাগচীর পত্রমর্ম্ম :

“বিশ্বাস করিতে পারছি না আশ্রমে গিয়া আর তাঁকে দেখিতে পাইব না। তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণমহিমা অতুলনীয়। তাঁর মহান আদর্শাহুসরণে আমি কৃতসঙ্কল্প হইলাম। মহান নলিনদা ও মহান প্রবর্তক সম্ব চিরজীবী হউন।”

দিনাজপুর হইতে প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনিলকুমার রায় হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন :

“আমার শিক্ষাগুরু নলিনদার বহু অতীত স্মৃতি আজ চোখে ভাসিতেছে। ত্যাগ ও আত্মসমর্পণের তিনি ছিলেন অলস প্রদীপ। মহান পুরুষ, মহান শিক্ষাগুরু পাইয়া আমার জীবন ধন হইয়াছে। দেশাহুসরণের বীজ তিনিই ছাত্র-জীবনে আমাদের মধ্যে বপন করিয়াছেন। তাঁর পরলোক-গমনে আমরা সপরিবারে পরমাত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।”

কবি-বন্ধু শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন :

“নলিনবাবুর মৃত্যুসংবাদে মর্মান্বিত হয়েছি। ত্যাগমস্ত্র দীক্ষিত বীরা দেশ ও দেশের চক্ষে এতদিন আদর্শের আকাশ-প্রদীপ হয়ে দীপ্যমান ছিলেন, আজ তাঁদের

অনেককেই হারাতে হচ্ছে। প্রার্থনা—শোক ভগবান্ সান্ত্বনা দিন।”

চির-সম্বন্ধরূপ বর্ষায়ান্ শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী শ্রদ্ধা প্রেরণ করিয়াছেন :

“নলিনচন্দ্র দত্তের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন কায়মনোবাক্যে করিতেছি। অল্পহতানিবন্ধন অয়ং যাইতে পারিলাম না। ইষ্টপদে তাঁহার আত্মার শান্তিলাভ হউক, হে ভগবান্!”

পঞ্জীকৃত শ্রীসিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র :

“সম্বন্ধরূপ পরলোকগমনে নলিনবাবু গুরুদায়িত্ব লইয়া সম্বের গঠনকার্য্য চালাইয়া আসিতেছিলেন—তাঁহার অবর্ত্তমানে বাংলা একজন নিষ্ঠাবান্ গঠনকার্মী হারাইল, সম্বের অপূরণীয় ক্ষতি ও আমার মত অনেকেরই পুরাতন বন্ধুবিয়োগ হইল।

নবদ্বীপের শিক্ষক-বন্ধু শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত লিখিয়াছেন :

“পূজনীয় নলিনদার মৃত্যুতে শুধু প্রবর্তক সম্ব নয়, বাঙালীজাতি একটি মহৎ প্রাণ আদর্শ পুরুষকে হারাইল। বিদেহী অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করি।”

অধ্যাপক বন্ধু শ্রীঅমিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র :

“সাদু আত্মার মৃত্যু নেই। তিনি সম্বের কর্ম্মে, ব্রতে, ভাবাদর্শে ও আদর্শ প্রচারে আপনাদের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন বলে আমি জানি। শিবলোকপ্রাপ্ত হন তিনি, এই প্রার্থনা।”

স্বইল্যাণ্ড হইতে সম্বাহুসরণী শ্রীএলিক ম্যাকনিজ (২৭-১০-৬৪) জানাইয়াছেন :

“I am very sorry to learn about the passing of Nalin Chandra Dutt. This is a big loss to Prabartak as a whole but you will have memories of his wonderful contribution to encourage you as you continue along the road.”

Sd. Alick McInnes



আদর্শের আকাশ প্রদীপ :

একটি উৎসর্গের ঘূত-প্রদীপ নিভিল। ইয়া, ঘূত-প্রদীপের আলোর মতই স্নিগ্ধ মধুর ছিল সেই জীবনের মাধুর্য্য-মহিমা। আত্মিকার সমস্ত আড়ম্বর-উদ্বেজনার বাহিরে, দূর গগনে, আদর্শের আকাশ প্রদীপ ছিল শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত—প্রবর্তক সঙ্ঘ সভাপতি। বাঙালীর ভাব্য-ভাবনা, তার ঐতিহ্যের অন্তর্গত অভিসন্ধি যে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবন-গঠন তার একটা সিদ্ধ দীপ্শর্শন মিলে শ্রীনলিনচন্দ্রের জীবন-সাধনায়। পদ-চিহ্নহীন চলার পথে শ্রীনলিনচন্দ্রের জীবন যে রূপরেখা রাখিয়া গেল তাহা বর্তমানে সম্ভাবনারূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও, অনতিদূর আগামীকালে অনিশ্চিত সুপরিষ্কট হইয়া নব জাতীয়তার দিশারী হইবে।

॥ সঙ্ঘ-সভাপতির তিরোধান ॥

গত ২৪-এ আশ্বিন (১১।১০।৬৪) ১৩৭১, রবিবার বেলা ১০-২৫ মিনিটে প্রবর্তক সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত সঙ্ঘ-সভ্য-সভ্য, বহু অমুরাগী ভক্ত পরিবৃত হইয়া মর্ত্য দেহ সম্বরণ করিয়া ইষ্টধাম প্রাপ্ত হন। অপরাহ্ন প্রায় তিন ঘটিকায় মালা ও চন্দন চর্চিত শব ও পুষ্প সম্বিজিত শবাধার সঙ্ঘবাসী নরনারী, ছাত্র ও শিক্ষক এবং অমুরাগী পল্লীবাসী ভরুণদল শোভাযাত্রা সহকারে সঙ্ঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্র এবং চন্দননগর সহরের গোত্রামী-ঘাট, কুণ্ডুঘাট, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার, ময়দা-পট হইয়া বোড়াইচতীতলা রাস্তা ধরিয়া বোড়াইচতী-তলার শ্মশানে প্রত্যগমন করিলে পর যথাবিহিত পূর্ণাঙ্গ অমুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পরম শ্রদ্ধায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী কর্তৃক “অগ্নিমীলে পুরোহিতং” মন্তোচ্চারণের সঙ্গে চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হয়। সঙ্ঘের অগ্রজ ও সহ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সঙ্ঘ-প্রতিভূ হিসাবে যথারীতি মুখাঙ্গি করেন।

তারপর, নিত্যবোধে বিশ্বাসী সঙ্ঘে অশৌচ লোকাচার না থাকায় বিগত-আত্মার নির্মল, সর্বোৎসর্গময় জীবনের মহিমা স্মরণ-মনন ও অমুখ্যানের মধ্য

দ্বিয়া সঙ্ঘে সমষ্টিগতভাবে দশাহ-স্মরণাচার সনিষ্ঠায় প্রতিপালিত হয়। সঙ্ঘ বিধানে বিদেহীর রানুভূত-নিরাশ্রয় স্বপ্ন-ভাবদেহের ভাবনার উদ্ঘাপন হয় ঠাণ্ডা কার্তিক ১৩৭১, ইং (২৬।১০।৬৪) বুধবার বেলা সাড়ে দশটায়। এই উপলক্ষে মাতৃতীর্থ আশ্রমের মাতৃ-মন্দিরে সঙ্ঘ-সভ্য-সভ্য, অমুরাগী ভক্ত সম্মিলিত হন। সঙ্ঘকল্যাণ কর্তৃক সময়োচিত সজ্জিতের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী গীতা ও কঠোপনিষৎ পাঠ করেন। সঙ্ঘের পক্ষে বিগত আত্মার জীবন ও সাধনার তাৎপর্য ও বিভিন্ন দিক স্মরণ করাইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সঙ্ঘের সহ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়। অতঃপর সমবেত সবাই মাতৃবেদী পীঠে বিগতাত্মার তৃপ্তার্থে তিলোদকাজ্জলি তর্পণ করেন। এই দিন সন্ধ্যায় শ্মশানবন্ধু ভোজন পর্বও যথারীতি সনিষ্ঠায় সম্পন্ন হয়। ইহা উল্লেখ্য যে, সঙ্ঘ ব্রহ্মগোত্রান্তরিত হইলেও, প্রচলিত বর্ণাশ্রমী সনাতন শাস্ত্র মন্ত্রে ও স্মৃতি-শাসন স্বীকৃতিতে সঙ্ঘের প্রতিভূ হিসাবে সহ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত অধ্যাত্ম গুরুভ্রাতৃ সঙ্ঘে ত্রৈরাজিক শোকাচারান্তে সঙ্ঘাচার্য্য শ্রীস্বর্নানারায়ণ তর্কতীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে যথারীতি আহুষ্ঠানিক পিণ্ডোৎসর্গ শ্রাদ্ধও করেন।

॥ শেষকৃত্য ও স্মরণাচার ॥

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতির তিরোত্তাবের পর সঙ্ঘজীবনে “শেষ কৃত্য ও স্মৃতিবিধি” লইয়া প্রচুর আলোচনা-আলোচনা হয়। বৃহত্তর সমাজ ও জাতীয় জীবন এবং সর্বোৎসর্গকৃত গোত্রান্তরিত সঙ্ঘজীবনের মধ্যে সঙ্গতি রাখাই এই সব আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল। কুলধর্ম, কুলচার, কুলগুরু, লোকাচার সব পরিত্যাগ করিয়া সঙ্ঘধর্ম গ্রহণ, সদৃশ আশ্রয় লাভের মধ্যে নব জন্ম সংঘটিত হইবে, ইহাই সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ দীক্ষা ও ধর্মাস্তরের নিগূঢ় তাৎপর্য। প্রচলিত বর্ণধর্ম-বিধানসম্মত অশৌচ গ্রহণ ও প্রেত শ্রাদ্ধাদি ব্রহ্ম-গোত্রান্তরিত সঙ্ঘধর্মবিরোধী নিশ্চয়ই। অভিমানে রূপান্তরই দীক্ষার ধর্ম। সত্যকার দীক্ষা জড় বস্তু, সমাজ-ধর্ম, বর্ণধর্মের অভিমান হইতে দীক্ষিতকে চিরন্তন ও ইষ্ট-সম্বন্ধ-চেতনায় সমুদ্রত উজ্জীবিত করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এই ইষ্ট-চেতনাবিশিষ্টতার মধ্যেই সাধকের দ্বিতীয় জন্ম ঘটে, দ্বিজ্ঞান লাভ হয়। শাস্ত্রেরই কথা : “দীক্ষা-

বিধানেন বিজয়ং জায়তে নৃনাম্।” শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে
কবিরাজ গোস্বামীর ইঙ্গিত :

দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।

সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

সুতরাং ‘সজ্জ-অস্তিমান’ ও ‘অধ্যাত্ম সজ্জসম্বন্ধ জ্ঞানে’
যে নব-জন্ম, যে দ্বিতীয় জন্ম বা বিজয় লাভ ঘটে তাহাতে
ব্রহ্মসম্বন্ধী অন্তরঙ্গ সজ্জ দীক্ষিত মাত্রকেই নিশ্চয়ই
ব্রাহ্মণ বলা চলে। পাপ-পুণ্যভোগী, ফলাকাজ্জী আর
স্বর্গকামীর প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডীয় স্মার্ত স্মৃতির পরিধির
বাহিরে এই অপ্রাকৃত সজ্জসম্বন্ধী। সুনিশ্চিত খাঁটি সজ্জসম্বন্ধী
ব্রহ্মসম্বন্ধস্থিত ব্রাহ্মণ। এই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ ও
ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের আচার-আচরণ ও সংস্কার যে এক
হইবে না, ইহাই পরম সিদ্ধান্ত। বিশেষ নির্বিধিমূলক
আত্মসমর্পণ যোগীর পক্ষে ইহা প্রযুক্ত।

সজ্জ-সভাপতির তিরোধানের পর তাঁর ‘শেষকৃত্য ও
স্মৃতিবিধি’ লইয়া যে ব্যাপক আলোচনা হয় তাহাতে
সজ্জের বর্তমান সভাপতি শ্রীস্বরূপচন্দ্র দত্ত সজ্জাস্থার এই
পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্বের কথাই নানাভাবে ব্যক্ত করেন।
সজ্জের মুখপত্র নবসজ্জও (ইং ২।১১।৬৪) তিনি মন্তব্য
করিয়াছেন : “দীক্ষার ব্রহ্মবৈর্য্যেই ব্রহ্মগোত্র সজ্জাস্থার।
সজ্জাস্থার সে ব্রহ্মবর্ণ আজও ব্যক্ত শাস্ত্রপৃষ্ঠায় সহজ স্মার্ত
স্বীকৃতি পায় নাই—নবতর সুরমান স্রুতি-স্মৃতি-প্রকাশ-
প্রতীক্ষায়” অপেক্ষমান।

প্রবর্তক সজ্জ প্রচলিত সনাতন শাস্ত্রাচার ও সংস্কার
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে চাহে
নাই বলিয়াই শাস্ত্রসম্মত ক্রমবিকাশমান যুগসঙ্গতি
দিবারই ইহা শুভ প্রচেষ্টা। প্রবর্তক সজ্জের সর্বোৎসর্গ-
কৃত অন্তরঙ্গ সভ্য-সভ্যার ক্ষেত্রে—‘শেষকৃত্য ও স্মৃতি-
বিধি’ সম্পর্কিত যে বিধি-বিধান আলোচনাক্রমে
আপাততঃ অস্বাধীভাবে স্থিরীকৃত হয় তাহা এই :

কোন অন্তরঙ্গ সভ্য বা সভ্যা দেহত্যাগ করিলে,
চন্দনচর্চিত ও পুষ্পসজ্জিত করিয়া এবং সম্ভবপক্ষে
আলোক-চিহ্ন তুলিয়া সজ্জপীঠায় প্রদক্ষিণাস্থে এবং
প্রয়োজন বোধে নগর-পরিক্রমা করিয়া শ্মশানক্ষেত্রে দাহ
করা হইবে। মুখাঙ্গি করিবেন সজ্জ সভাপতি বা তদনুপ-

স্থিতিতে সহ-সভাপতি বা তাঁহাদের নির্দিষ্ট কোন সভ্য
বা সভ্যা অথবা সজ্জসভায় অনুমোদনপ্রাপ্ত স্বেচ্ছা-
প্রণোদিত কোন সভ্য।

দাহাস্থে চিতাভস্ম সংগ্রহ ও গন্ধায় অগ্নি বিসর্জন-
পূর্বক স্নান সমাপন করিয়া দেহত্যাগ ক্ষেত্রে প্রত্যাগত
হইয়া অগ্নি স্পর্শন, তিষ্ঠান্বাদন এবং কিঞ্চিৎ মিষ্ট দ্রব্য
ও পানীয় গ্রহণ বিধেয়।

অন্তরঙ্গ সজ্জ সভ্য-সভ্যার চিতাভস্ম রক্ষা করিতে
হইবে।

প্রবর্তক সজ্জের প্রত্যেক অন্তরঙ্গ সভ্যসভ্যা নিজেকে
সদা-স্মৃতি মনে করেন। ব্রহ্মমতের সাধকের অন্তর্চিহ্ন
নাই। তাই সজ্জ লোকাচার বিহিত অশৌচ পালনের
বিধি নাই। সজ্জের বিদেহী আত্মাকে সজ্জ-সভ্যসভ্যাগণ
সদা স্মরণে রাখিবেন—অন্ততঃ দশ দিন। এই দশ দিন
স্মরণাচার কাল বলিয়া অভিহিত হইবে। এইকালে
নিম্নলিখিত স্মৃতিবিধি অবশ্য পালনীয় :

- প্রয়াগ দিবসে দাহকার্য্য সমাপনের পর লঘু
আহার্য্য গ্রহণ।
- দ্বিতীয় দিবসে হবিষ্যাহ গ্রহণ।
- তৃতীয় দিবস হইতে দশম দিবস পর্য্যন্ত নিরামিষ
আহার।
- ত্রিরাত্রির পর চতুর্থ দিনে মুখাঙ্গি প্রদানকারী
কর্তৃক পিণ্ডদান।
- একাদশ দিবসে প্রাতে মাতৃতীর্থে সজ্জবিধি
অনুযায়ী শ্রদ্ধাহুষ্ঠান সভ্য, তিল-তর্পণ।
- প্রতিদিন উপাসনার পর দশ মিনিটকাল
বিগতাস্থার ধ্যান।
- এই দশদিন যথাসম্ভব যৌনগ্রহণ।
- স্মরণাচার কালে দেবকার্য্যে বা শুভাহুষ্ঠানে
যোগদানে বাধা নাই।

॥ প্রবর্তক সজ্জের নবনির্বাচিত সভাপতি ॥

প্রবর্তক সজ্জের প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি পূজনীয় সজ্জগুরু
শ্রীমতিলালজী ২০ই এপ্রিল ১৯৫৯ সালে মহাসমাধি
গ্রহণ করিলে, সজ্জের দ্বিতীয় সভাপতির গুরু দাম্বিষপূর্ণ

পদে নির্বাচিত হন সজ্জেরই সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক অগ্রজ ও সজ্জগুরুজীর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত। গত ২৪-এ আশ্বিন (ইং ১১।১০।৬৪) সজ্জের দ্বিতীয় সভাপতি মর্ত্যদেহ সংবরণ করিবার পর—২৫-এ অক্টোবর ১৯৬৪ সজ্জের গভর্নিং বডির যে অধিবেশন হয় তাহাতে বর্তমান সহ-সভাপতি সর্বসম্মতিক্রমে সজ্জের তৃতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। এই অধিবেশনে শ্রীমতী নির্মলা দেবী ব্যতীত অন্যান্য সকল সভ্যই উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে সমবেত সকল সভ্য পাঁচ মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া বিগত সভাপতির বিদেহী আত্মার উদ্দেশে মৌন প্রজ্ঞা

নিবেদন করেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় বিগত সভাপতির শূভ পদে সজ্জের অগ্রজ ও সহ সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের নাম প্রস্তাব করেন। শ্রীরাধারমণ চৌধুরী সম্বোধিত এক সংক্ষিপ্ত সশ্রদ্ধ ও স্নেহগর্ভ ভাষণে

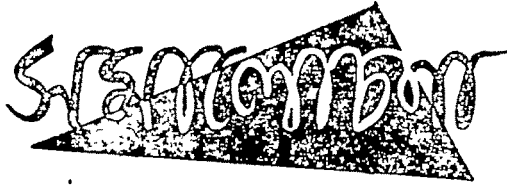


শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে সানন্দে গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে ইহাও স্থির হয় যে, শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক এবং স্বামী বোধানন্দজী ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী সম্পাদক হিসাবে বহাল থাকিবেন এবং আপাততঃ প্রয়োজনমত সাধারণ সম্পাদক অস্থায়ীভাবে সহ-সভাপতির কর্তব্য নিষ্পন্ন করিবেন। শেষে নব-নির্বাচিত সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে সবারই শুভেচ্ছা, সাহচর্য ও সহযোগিতা কামনা করিয়া সজ্জের ভবিষ্য প্রেমিক্যমূলক কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। অতঃপর এক সপ্তাহ পরে ৩রা নভেম্বর সজ্জের সকল অন্তরঙ্গ সভ্য-সভ্যাদের এক প্রাতঃ-সম্মেলনে সভাপতি শ্রীদত্ত এক

দীর্ঘ ভাষণে সজ্জের 'মিশন', তার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন এবং সজ্জের গুরুমুখী গতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া ভবিষ্য কর্মপন্থার দিগদর্শন দেন। সজ্জ-প্রগতির তিনটি স্তরের কথা তিনি উল্লেখ করেন : (১) সজ্জের প্রবীণতম অগ্রজ স্বামী চিদানন্দজীর গুরু-প্রতিষ্ঠা। গুরুর অকুণ্ঠ আহুগত্যে তাঁর শুদ্ধ অর্থনীতিক-সাধনার অ-পূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন। (২) দ্বিতীয় সভাপতি শ্রীনলিনচন্দ্র দত্তের নির্বচনার সমর্পণ সিদ্ধির উপর প্রেমিক্যের প্রতিষ্ঠা। (৩) সজ্জের জাতি হিসাবে অভিব্যক্তি যাহাই সজ্জজীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাধ্য।

প্রবর্তক সজ্জের বর্তমান সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের বয়স বর্তমানে ৬৮ বৎসর। তিনি ফরাসী চন্দ্রনগরের বিপ্লব যুগের ঐতিহ্যবাহী সুবিদিত দত্ত পরিবারের সুসন্তান ও বিপ্লবীবীর কানাইলাল দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র। অগ্নিযুগের আবহাওয়ার মধ্যে শ্রীঅরুণচন্দ্র লালিত-পালিত-বদ্বিত হওয়ায় বাল্যকাল হইতেই তিনি সেই সময়কার বিপ্লবী-নায়েকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন। শ্রীঅরবিন্দের তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কিছুকাল বাস করেন। তাঁর বহু প্রশংসিত শ্রীঅরবিন্দ-মন্দিরে পুস্তকখানি শ্রীদত্তের শ্রীঅরবিন্দ-সঙ্গেরই ফলশ্রুতি। চন্দ্রনগরের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'সন্তান সজ্জের' তিনি প্রতিষ্ঠাতা। বাল্যকাল হইতেই শ্রীদত্তের জীবন গঠিত ও নিষ্পন্ন হয় তদানীন্তন বিপ্লবী নায়েক এবং পরবর্তী কালের সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের আহুগত্যে। সজ্জগুরুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপে কিশোর বয়স হইতেই শ্রীদত্ত সজ্জগুরুর সৃষ্ট প্রবর্তক সজ্জ আশ্রোৎসর্গ কবেন এবং সজ্জের ভাবাদর্শের ধারক ও বাহকদের অগ্রগণ্য হিসাবে সজ্জের সর্বজন-শ্রদ্ধার ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শ্রীদত্ত চিন্তাশীল লেখক ও হুবহু। সুঠাম জ্ঞানদর্শন। পৌরুষ-ব্যঞ্জক নাতিদীর্ঘ অবয়ব। উজ্জল গৌরবর্ণ। প্রতিভাদীপ্ত আনন। একাধারে যোগী, ভাবুক, দার্শনিক ও নিরলস কর্মী। প্রবর্তক সজ্জ মিশনকে অগ্রবহ করিয়া স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠা দিবার শ্রীগুরুর বরপ্রাপ্ত যোগ্য পাত্র বর্তমান সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত।



বিবেকানন্দ যুগ : লেখক ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি., বি. এস., আয়ুর্বেদাচার্য। সাধনা প্রকাশনী, ৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, কলিকাতা-৪৮ হইতে শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ডাঃ ঘোষ হুবহি আয়ুর্বেদ-প্রতিষ্ঠান সাধনা ঔষধালয়ের প্রাণপুরুষ। ডাঃ ঘোষের বহু বাস্তব কর্মময় জীবনেও যে তিনি স্বাদেশিকতাব্য প্রীতিস্থ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং অর্থ-কারিতার মধ্যে নিজে হারাইয়া ফেলেন নাই, তাহা তাঁহার জাতীয়তা ও সাহিত্যমূলক রচনা, পুস্তক-পুস্তিকা হইতেই বুঝা যায়। স্বামীজীর সম্পর্কে ইতিপূর্বে তিনি 'বাঙালী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ' পুস্তিকা লিখিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের স্বামীজীর উপর বিভিন্ন সময়ে লিখিত ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বোলাট প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইলেও, সামগ্রিকভাবে গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য 'যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ' ও তাঁর ভাবময় স্বরূপটি প্রাণ অঙ্গুরভাবেই হৃদয়স্পর্শ হইয়াছে বলা চলে। গ্রন্থকারের ভারতীয় চিন্তার স্বচ্ছতা ও বস্তুব্য বলার সাধনীলতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থকারেরই কথা—“স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান-ধারণা ভারতের জাতীয় জীবনকে কি ভাবে উদ্দীপ্ত করেছে—এ দৃষ্টিকোণ থেকেই 'বিবেকানন্দ যুগ'-এর প্রবন্ধসমূহ লেখা” এবং এ লেখা সার্থক হইয়াছে নিঃসন্দেহে বলা চলে। বর্তমানের দিশাহারা জাতীয় আদর্শ-সঙ্কটে এ ধরনের পুস্তকের ব্যাপক প্রচার অসীকার্য।

ত্রিনিষার্কসম্প্রদায়ের আচার্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী : ১ম খণ্ড—২-৫০, ২য় খণ্ড—৩-০০। ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিষাবাবা, তর্কব্যাকরণ-তীর্থ প্রণীত। কাঠিষাবাবার আশ্রম, পোঃ স্মৃচর, ২৪ পরগণা হইতে শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বস্ব সংরক্ষিত।

ত্রিনিষার্কসম্প্রদায় চারিটি প্রধান এবং মূল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্ততম এবং প্রাচীনতার দিক দিয়াও উল্লেখযোগ্য। এই সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক শ্রীশ্রীহংস ভগবান হইতে বর্তমান মহন্তের পূর্ববর্তী মহন্ত ব্রজ-বিদেহী শ্রীমৎ সন্তদাস মহারাজজী পর্যন্ত ৫৫ জন গুরুপরম্পরা আচার্যের নামের তালিকা প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী ত্রিনিষার্ক সম্প্রদায়ের আচার্যগণের সিদ্ধান্তের যে সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইয়াছে তাহা যেমনি জ্ঞানগর্ভ তেমনি মূল্যবান।

প্রথম খণ্ডে আদি সম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীহংস ভগবান ও দ্বিতীয়

খণ্ডে চতুঃসনের (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার) ইতিবৃত্ত ও উপদেশাবলী বিবৃত হইয়াছে। এইখানে নিষার্ক সম্প্রদায়ের অর্ধ শতাব্দিক পূর্বাচার্যগণের জীবনী ও তাঁহাদের উপদেশাবলী গ্রন্থরূপ করার মহৎ সঙ্কল্প লইয়া প্রস্তাবিত গ্রন্থ-বচনা শুরু হইয়াছে। কাজটি সুকঠিন এবং অত্যন্ত শ্রমসাধ্য সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজেই গ্রন্থ-লুপ্তিকায় বলিয়াছেন : “আমার শরীর একে বৃদ্ধ, তরুণি প্রায়ই অগ্রস্থ থাকে। এমনভাবেই আমাব দ্বারা এই শ্রমসাধ্য কার্য সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। * * কার্যতঃ দেখিতেছি, এই গ্রন্থ বচনাকে উপলক্ষ্য করিয়া পূর্বাচার্যগণ ও শ্রীশ্রীহংসদেব অশেষ কৃপা করিতেছেন।” গ্রন্থকার শ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী শুধু পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ নহেন, একজন ব্রহ্মদর্শী সিদ্ধাচার্যও বটে। আমাদের বিখ্যাত গুরুপরম্পরার কৃপা প্রেরণাবশেই তিনি এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁর শুদ্ধ সিদ্ধ আধার্যশ্রেণে তাঁরাই এই কার্য সুসম্পন্ন করাইয়া লইবেন। এই সবুহ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে, শুধু বাংলার তাত্ত্বিক ও দার্শনিক সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য সংযোজনই হইবে না, সম্প্রদায় নির্বিশেষে অধ্যাত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মাত্রেবই আত্মজিজ্ঞাসাব পক্ষে আলোকবর্তিকাস্বরূপ হইবে—যেহেতু গ্রন্থখানি সম্প্রদায় বিশেষকে উদ্দেশ্য করিয়া লিপিবদ্ধ হইলেও, বস্তুতঃ ইহার বস্তুব্য বিষয়টি সার্বজনীন, ইহার আকর-উৎস একই সনাতন শাস্ত্র এবং ইহার প্রেরণাব মূল একই অভিন্ন অখণ্ড গুরু, ভগবান ও ভগবৎ শক্তি।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

শুক্লশ্রীলা : শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা। প্রকাশক আর্ট ইউনিয়ন, ৮০।১৫, গ্রে শ্রীট কলিকাতা-৬। মূল্য ছয় টাকা।

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা প্রধানতঃ শিল্পী। কিন্তু সাহিত্যিক সতীন্দ্রনাথের রসোক্তাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব বেশী নয়। আমরা তাঁকে শিশু সাহিত্যিক হিসাবে খানিকটা চিহ্নিত করে বেখেছি মাত্র। এমন সময় হঠাৎই বলতে পারি শুক্লশ্রীলা পড়বার সুযোগ এলো। তাঁর সৌন্দর্য-বোধের এক নূতন দিগন্ত ধরা পড়েছে সাহিত্যের ভূপৃষ্ঠে। একাধারে কবি, শিল্পী এবং সাহিত্য-সত্তার আবিষ্কারে যুগপৎ বিস্মিত হলাম।

মহাকবি কালিদাস শুক্লশ্রীলা মহাকাব্য লিখে রেখে গেছেন। তাঁর অমর লেখনীর রসাবাদ সকলের অঙ্গ নয়। কেননা তাঁর ভাষা ছিল সংস্কৃত। অধুনা অনেকেই সংস্কৃত চর্চা করেন না এবং সেই অজুই তাঁদের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে অনেকেই ঐ মহাগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন। কিন্তু তৎসঙ্গেও শ্রীসতীন্দ্রনাথের এই শুক্লশ্রীলা অভিনব। কেননা এ শুধু অনুবাদই নয়, মহাকবির অমর কাব্যের নব রূপ। জীবন্ত এবং সাবলীল। অসংখ্য চিত্র শোভিত চিরদিনের রস ও আনন্দের বস্ত শুক্লশ্রীলাব এই নব পবিত্রেশন এক কথাই সার্থক। শিল্পী সতীন্দ্রনাথের রূপসজ্জাতে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে তা সাহিত্যরসিক মাত্রেবই অনুধাবনযোগ্য। উপহারেরও যোগ্য গ্রন্থ। বইখানার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীহিন্দু গুপ্ত

সাহিত্যিক

উপাসনা গৃহের উদ্বোধন :

গত ১৯-এ অক্টোবর সোমবার কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে বরাহনগর-সিঁথি এলাকায় ১৮ রামলাল আগরওরলা লেনে প্রবর্তক ট্রাষ্টের অন্তরঙ্গ সেবকবৃন্দের আবাস কেন্দ্রে নব নিৰ্মিত উপাসনা মন্দিরের উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর পৌরোহিত্যে সারাদিন ব্যাপী সমবেত উপাসনা, যজ্ঞ, গীতা-উপনিষদ পাঠ, গুরুপূজা ও ভোগ এবং অপরাহ্নে ভক্ত-সম্মেলন হয়। মনোহর কাকশিল্পশোভিত ও পুষ্পমালা সজ্জিত সিংহাসনে সজ্জবগ্নজী ও সজ্জবগ্ননীর চিত্রপট স্থাপিত হয়। সম্মেলনে সজ্জবর সাধাষণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অভ্যাগতদের সবাইকে স্বাগত জানান। যোগীবর স্বামী শিবানন্দ মহারাজ সমাজ জীবনে উপাসনার প্রয়োজন সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এক ভাষণ দেন। আনন্দবাজার পত্রিকার বৃত্ত সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ পন্নীতে প্রবর্তক সজ্জবর উপাসনা-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা প্রতিবাসীদের পক্ষে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। উপদ্বহারে সজ্জব-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সজ্জবর আদর্শ, লক্ষ্য ও মিশন সম্বন্ধে প্রেরণাদীপ্ত বক্তৃতা দেন। সভার প্রারম্ভে সদ্য পরলোকগত প্রবর্তক সজ্জব-সভাপতি শ্রীনলিনচন্দ্র দত্তের বিদেহী আত্মার

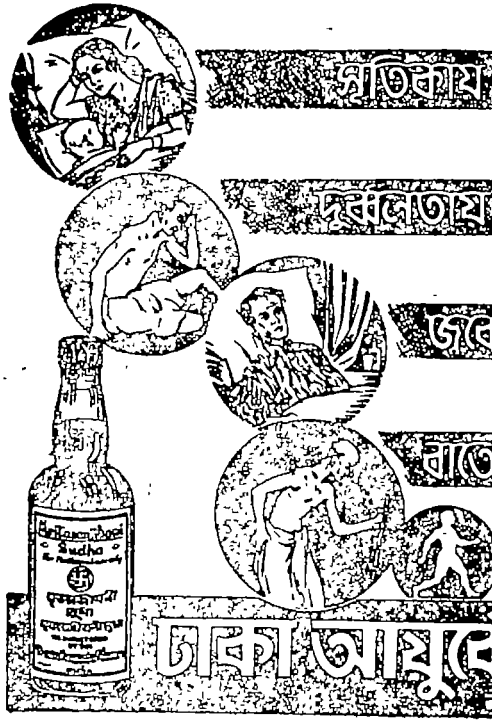
উদ্দেশ্যে মৌন নীরব শ্রদ্ধা তর্পণ করা হয়। উপস্থিত প্রায় তিনশত অমুরাগী ভক্ত ও উপস্থিত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

প্রবর্তক সূহৃদ শ্রীমুখীলপ্রসাদ :

বিগত আধিনে বনামধ্য ক্রীড়াবিদ ও সাহিত্যিক শ্রীমুখীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী ৮৮ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। প্রবর্তক সজ্জব ও প্রবর্তক পত্রিকার সহিত তিনি স্বদীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট। ঐকান্তিক নিকাম নিষ্ঠাব সঙ্গে শ্রীসর্বাধিকারী প্রবর্তকের সেবা করিয়া আসিবাছেন। সজ্জবর প্রস্তাবিত শ্রীকৃষ্ণমন্দির নির্মাণকার্যে এই পরিণত বয়সেও প্রজ্জ্বল শ্রীসর্বাধিকারী যে সাহচর্যের দায়িত্ব বেচ্ছাষ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সজ্জবর সহিত তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও সন্তোষবাই প্রমাণ করে। এই বয়সেও তাঁর স্মৃতি ও লেখনীশক্তি আশ্চর্য্যরকম সজ্জীব। সতীরাণী গ্রন্থের পর তাঁর প্রকাশমান বিরাট গ্রন্থ “স্মৃতি আলোধ্য” ইহার সাক্ষ্য বহন করে। আমরা এই সজ্জব-সূহৃদদের নিরাময় শতায়ু কামনা করি।

পর্বত আরোহণে বাজাজী মহিয়ার কৃতিত্ব :

কলিকাতার হিমালয়ান আ্যোসিয়েশান কর্তৃক আয়োজিত ১৭ হাজার ৭ শত ফুট উচ্চ টেল গিবিবর্ডে আরোহণকালে গত ২রা অক্টোবর তুষার স্তূপের নীচে গড়িয়া শ্রীমতী অনিমা সেনগুপ্তা শৌচনীর মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ১৬ হাজার ৩ শত ফুট পর্যন্ত পর্বত আরোহণ করিবাছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড ধ্বস নামার কালে লিখামে এই শৌচনীর ছবচনা ঘটে। ১৯৫২ সালে কৈলাস ও মানস সন্মোহনে, ১৯৬০ সালে অমরনাথ, ১৯৫৫, ৫৬ ও ৫৭ সালে গোমুখী, মন্জোত্রী ও ঘমুনোত্রী এবং



স্বাস্থ্য
দুর্ভোগ
জ্বর
বাত

মৃত সঞ্জীবনী সুধা

মস্তক ন্যায় কার্য করে

প্রতিষেধক প্রদান প্রস্তুতকারক

ডাক্তার আয়ুর্বেদীয় ফার্মাসী লিঃ

কলিকাতা

১৯৫৪ সালে কেদারবতীর সকল অভিযানে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তিনিই বোধহয় একমাত্র মহিলা যিনি রূপকুণ্ডে পৌঁছিতে সমর্থ হন। মৃত্যু বরণ করিয়াও শ্রীমতী সেনগুপ্তা যে দুঃসাহসিক দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন তাহা মহিলা জগতের সামনে চিরদিন আকাশ-প্রদীপের মত প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে। শ্রীমতী অনিমা সেনগুপ্তা এম. এ., কলিকাতা শিশুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

কবিরাজ ইন্সভুষণ সেন :

বহুখ্যাত ও জনপ্রিয় কবিবাজ শ্রী ইন্সভুষণ সেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রী গত ৫ই অক্টোবর তাঁহার কলিকাতা বাসভবনে অবস্রাৎ পরলোকগমন করেন। তাঁর পিতা সত্যচরণ সেন কলিকাতার খ্যাতিমান চিকিৎসক ছিলেন। শ্রীসেন দীর্ঘকাল বৈজ্ঞানিকপন্থীর সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে নানানভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁর রচিত 'বাঙালীর ঋতু' ও 'বাংলাদেশের গাছপালা (৩ খণ্ড)' পুস্তকগুলি বিশেষ সমাদৃত এবং তাঁর গবেষক মানসের পরিচায়ক। আয়ুর্বেদের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে অগণিত গ্রন্থ তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্র-

পত্রিকায প্রকাশ করিয়াছেন। আয়ুর্বেদ বিষয়ক কয়েকখানি মাসিক পত্রিকাও বিভিন্ন সময়ে তিনি সম্পাদনা কবিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে মূহূর্ত্ত পর্যন্তও তিনি আয়ুর্বিজ্ঞান পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদনা ও পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীসেনের মত এমন অমারিক, সামাজিক, বহুবংশল, মজলিসি ও অজ্ঞাতশক্তি মানুষ এ যুগে বিরল। প্রবর্তক সচিবরও শ্রীসেন একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহায় ছিলেন। আমরা তাঁর পরলোকগমনে আত্মীয় বিরোগ ব্যথা অনুভব করিতেছি।

সতীরাগীর ৭৫তম জন্মোৎসব :

প্রবর্তক সজ্জ-সুহৃদ পুণ্যলোক শ্রী হুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারীর রত্নগর্ভা সহধর্মিণী সতীরাগীর ৭৫তম জন্মতিথি গত ১২-এ ভাদ্র তাঁর বালিগঞ্জ সানি পার্কস্থ ভবনে অনাড়ম্বর মৌন স্মরণ-মননের মধ্য দিয়া পারিবারিক ভাবে প্রতিপালিত হয়। এই তিথি পালনের অমুকরমীর দৃষ্টান্ত হইতেছে অপ্রাকৃত অনাবিল গভ্বানিষ্ঠা। এ যুগে উন্নত উজ্জল দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ এই সর্বাধিকারী দাম্পত্য। বিগত বর্ষে প্রকাশিত পত্রির



**POLYTHENE
PIPES**

- Light Flexible
- Non-Corrosive
- Acid Proof

P.V.C. PIPES.



**SANKHA
COMBS**

- Durable
- Comfortable
- Economic

Purnima TOOTH BRUSH

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

ESTD. 1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO. 10813

॥ শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ.

পি. আর. এস. ॥

শকার্ণ তত্ত্ব ৫-০০ শব্দ তত্ত্ব ১৫-০০

জাতিভেদ ১ বেদ ও

কোরাণের সাদৃশ্য ১

॥ পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ॥

শ্রী শ্রী নামাঙ্কিত ২-২৫

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০

॥ কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥

পরার্থকথা ২-২৫

প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

শ্রীমন্তপ্রভু বলেছেন—

“এই তো কহিলুঁ তজ্জির দিগ্‌দ্রশন
ইহার স্বরূপ মনে করহ ভাবন।”

আত্মদান করুন

মহাপ্রভুর মতামুযায়ী গীতার
ভক্তি ব্যাখ্যা

ভক্তিতারতী শ্রী বঙ্কিম সেনের

গীতা-মাধুরী—১২.০০ ও

জীবন-মৃত্যুর সঙ্কিশ্লে—১.০০

প্রকাশক : শ্রীরাইমোহন আচার্য্য

৭ ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা—৩

উৎসব অনুষ্ঠানে—

হৃদয় সন্দেশ

অপ্রবাহ্য

৮৬, আমহার্ট ষ্ট্রীট কলি: ৯

ফোন-৩৫-১৩৮৩

৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২

ফোন-৩৪-২৫৩৩

পত্রীর প্রতি ক্ষমদার্য্যধরূপ ‘সত্যবাণী’ গ্রন্থবানি আবিলতামুক্ত প্রেম-সাহিত্যে ‘সরসী’ হইয়া থাকিবে।

পরলোকে বাংলা সাহিত্যের “মহাশবির” :

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বাংলা সাহিত্যের ‘মহাশবির’ সনমামিত সাহিত্যিক প্রেমাক্ষর আতর্ষী ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সাহিত্য সৃষ্টি, পত্রিকা-সম্পাদনা, সাংবাদিকতা সর্বত্রই প্রেমাক্ষর আতর্ষী দক্ষ মূল্যবান সাহিত্য রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি “জাহ্নবী”, “বৈকালী”, “সফা”, “বিন্দুস্থানের” সম্পাদক মণ্ডলীতে যুক্ত ছিলেন। আকাশবাণী বেতার সংগঠন পত্রিকার শেষ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। কিশোর-সাহিত্যেও প্রেমাক্ষর আতর্ষী সরসী হইয়া অধিকার করিয়া থাকিবেন। তাঁহার গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি মধ্যে ‘চাষার সেবে’, ‘হুই রাত্রি’, ‘বড়ের পাখি’, ‘নিশির ডাক’, ‘অর্ণের চাষি’, ‘তথুত ডাউন’, ‘শিউলি’, ‘বিচিত্র লেখা’, ‘অচল পথের যাত্রী’ এবং ‘মহাশবির জাতক’ উল্লেখযোগ্য। শেখোক্ত উপন্যাসগুলির এখনও অর্থ খণ্ড ছাপা হয় নাই। এই গ্রন্থই বাংলা সাহিত্যে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সরসীর অবদান।

কুইকেটা বিবেকানন্দ আশ্রম :

মহাত্মা গান্ধীর শুভ জন্মদিনে, মেদিনীপুর শহরের অন্যতম অনুন্নত পত্রীর উন্নয়নত্রী কুইকেটা-বিবেকানন্দ আশ্রমের প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২রা অক্টোবর সকালে প্রার্থনা, বাণী-চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন, সূত্রযজ্ঞ, গান্ধীকথা ও সাফাইয়ের মাধ্যমে গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল পাঁচটায়, বালোয়াদী ও পাঠশালায় ছাত্রছাত্রীদের প্রার্থনা, ব্রতচর্চা, সংগীত, ছড়া গান ও আবৃত্তিব দ্বারা এক বিচিত্র মুহূর্তের ব্যবস্থা করা হয়। পৌরোহিত্য করেন বি. ডি. ও. শ্রীমন্ত ননীগোপাল সেনগুপ্ত। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন—শিশু ব্রিনারদী শিক্ষণ

মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীবক্ষিম পাল। স্থানীয় বহু বিদ্বান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই অমুহূর্তে যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভাবিনোদ তাঁর সহধর্ম্মিণী কণা দেবী ভারতীর সাহচর্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার অনেকগুলি মৃত গ্লান মুক পবিবাবের সেবা করিয়া চলিয়াছেন বালোয়াদী, আশ্রম-পাঠশালা (ব্রিনারদী নীতিসম্মত সংশোধনী প্রাথমিক শিক্ষালয়), সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র, পরিবারের পরিকল্পনা, কেশ ও হোমিও-চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে। এই আন্তরিকতা সম্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠানটি সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার যোগ্য প্রতিষ্ঠান বলিয়া আমরা মনে করি।

শরৎ স্মৃতিভবন :

সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, শরৎ স্মৃতিভবন নির্মাণের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার চার লক্ষ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আরও দুই লক্ষ টাকা তুলিবার জন্ত শিল্পী-সংস্থা ইতিমধ্যে তাহাদের কাজ শুরু করিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন এই কার্যে শরৎ স্মৃতি কমিটিকে ছয় কাঠা জমি দান করিয়াছেন। হুসংবার নিশ্চয়ই।

একসঙ্গে পাঁচ সন্তান প্রসব :

গত ১লা সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ, মূর্শিদাবাদ জেলার খুলিয়ান হইতে জনৈক গর্ভবতী মহিলাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। উক্ত মহিলা একসঙ্গে পাঁচটা সন্তান প্রসব করেন। সন্তানগুলি প্রসবের এক ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। প্রসূতিকে মাত্র ৬ মাস গর্ভ ধারণের পর অস্ত্রোপচার দ্বারা প্রসব করান হয়। নবজাত শিশু কয়টার ওজন মোট ১১ পাউণ্ড। জন্ম নিয়ন্ত্রণের দিনে এই ঘটনা সত্যই বিস্ময়কর।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল, আলোচন ও হোসিয়ারী পোষাক বিক্রেতা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা। ফোন : ৩৩-২৩০৩

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধের জন্ম

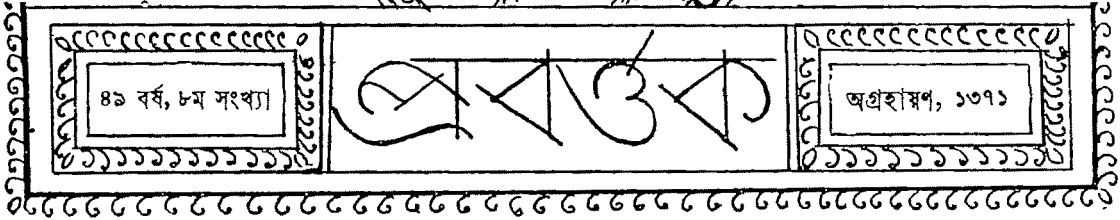
রামকানাই মেডিক্যাল স্টোয়ার

১২৮/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকনিষ্বরণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৯ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

প্রবন্ধ

অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

জীবনের আলো

ধর্ম জ্ঞান নয়, কর্ম নয়, অহুষ্ঠান নয়, ধর্ম জীবন। সমস্তখানি জীবন যদি ধর্মের না হয়, ধর্মের যে কি অমৃতময় আশ্বাদ তা কোনদিন উপলব্ধি হবে না। ধর্মই নিয়ম, সংযম, ব্রহ্মচর্য। যারা দশ বৎসর বয়সে নিরবচ্ছিন্ন ধর্মজীবন যাপন করে, তারা শতায়ুঃ হবেই। অর্ধ শতাব্দী পরমাযুর মানুষও যদি ধর্ম-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে সে নিরাময় দেহ নিয়ে অন্ততঃ সত্তর বৎসর জীবিত থাকবে। কিন্তু ধর্মজীবন চাই, নিরবচ্ছিন্ন ধর্মজীবন। ধর্মজীবনের জন্ম অবশ্য পালনীয়—নিয়ম, সংযম, সদাচার। জাগ্রত সচেতনায় চাই আত্মবিচার। আর মনে রাখিতে হইবে যে,

১ ঈশ্বরের জন্ম যে সঞ্চয়-প্রবৃত্তি তাহা প্রেম।

- আত্মভোগের জন্ম নারী ও অর্থের প্রতি যে লালসা তাহা কাম।
- নিজের প্রতি অহোর মুখে অপ্রিয় কথা শুনিয়া হৃদয় তপ্ত হওয়া ক্রোধ।
- অহোর সুখ-সম্পত্তি দর্শনে হৃদয়ে প্রাপ্তির লালসা লোভ।
- আমার আমার বলিয়া বিষয়ের প্রতি মমতা মোহ।
- আমি মহাত্মা, আমি ধনবান, আমি বিদ্বান, ইহার নাম মদ।
- লোকে আমায় ভাল বলে না, জীবনে ধিক—ইহাই মাৎসর্য।
- সর্বজনহিতকর বাক্যই সত্য বাক্য।
- অহোর সুখ সম্পত্তি নষ্ট হউক এইরূপ চিন্তাই হিংসা।
- অহোর ক্রেশ নিবারণ করার প্রবৃত্তিই দয়া।
- যাহা পাও তাহাতেই সুখ ও আনন্দ জন্মিলে শাস্তি।
- শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে ঈর্ষা বা মমতা না থাকাই সমদৃষ্টি।

সত্যেন্দ্র শ্রীমতিলাল

(৮১ মে, ১৯৩৪-এর দিনলিপি হইতে সংকলিত)

আবেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । সপ্তত্রিংশৎ সূক্তং ।) ১৩-১৫ অঙ্ক

(সম্ভবতঃ শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

যক্ যাস্তি মরুতঃ সং হ ক্রবতেহধ্বমা

শৃণোতি কশ্চিদেয়াং ॥ ৩১ ॥

অর্থ—“যং হ” (যখন) “মরুতঃ” (মরুদেবগণ) “যাস্তি” (গমন করেন) [তখন] “অধ্বন্” (মার্গে) “আ” (সর্বতোভাবে) “সংক্রবতে হ” (মিলিত ধ্বনি অবশুই করিষা থাকে) “এয়াং” (এই মরুদেবগণের) [মিলিত শব্দ] “কশ্চিৎ” (যে কেহ) “শৃণোতি” (শুনিতে পায়) ॥ ৩১ ॥

সরলার্থ—আকাশপথে বাতাস যখন প্রবাহিত হয় তখন যে শব্দ উথিত হয়, তাহা যে কেহই শুনিতে পায় ॥ ৩১ ॥

প্রযাত শীভমাশুভিঃ সস্তি কথেষু বোহুবঃ ।

তত্রো যু-মাদয়াধৈ ॥ ১৪ ॥

অর্থ—“হে মরুতঃ” (হে মরুদেবগণ, আপনারা) “আশুভিঃ” (বেগবান স্বকীয় বাহনের দ্বারা) “শীভং” (শীঘ্র) “প্রযাত” (প্রকটরূপে আগমন করুন) “বো” (আপনাদের) “হুবঃ” (পরিচর্যাভার) “কথেষু” (মেধাবী অনুষ্ঠাতৃগণের উপর জন্ত আছে) “তত্রোযু” (সেই মেধাবী অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতি) “মাদয়াধৈ” (তৃপ্ত হউন) ॥ ১৪ ॥

সরলার্থ—হে মরুদেবগণ! আপনারা বেগবান স্বকীয় বাহনের দ্বারা শীঘ্র আগমন করুন। মেধাবী অনুষ্ঠাতৃগণ আপনাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের সেবা লইয়া আপনারা তৃপ্ত হউন ॥ ১৪ ॥

অস্তি হি আ মদায় বঃ অসি আ বয়মেয়াং ।

বিশ্বং চিদায়ুর্জীবসে ॥ ১৫ ॥

অর্থ—“হে মরুতঃ” (হে মরুদেবগণ) “বঃ” (আপনাদের) “মদায়” (তৃপ্তির জন্ত) “অস্তি হি আ” (আমাদের হবনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত রহিয়াছে) “এয়াং” (আপনাদের ভৃত্যস্বরূপ) “বয়ং” (আমরা, প্রার্থনাকারিরা) “অসি আ” (বিদ্যমান রহিয়াছি) “জীবসে” (জীবনের জন্ত) “চিং” (চিংস্বরূপ) “বিশ্বং” (বিশ্বব্যাপী) “আয়ুঃ” (আয়ু, জীবন) [প্রার্থনা করিতেছি] ॥ ১৫ ॥

সরলার্থ—হে মরুদেবগণ! আপনারা তৃপ্তির জন্ত আমাদের দ্রব্যসকল প্রস্তুত রহিয়াছে এবং আমরাও আপনারা ভৃত্যস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছি। জীবনের জন্ত চিংস্বরূপ বিশ্বব্যাপী আয়ুঃ প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৫ ॥

সরলার্থ—তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তত্রিংশৎ সূক্তের সমাপ্তি ঋক তিনটি। তিনটি ঋকই প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা দান প্রতিদানের। দান সমগ্র—অংশত নহে। ঋষি বলিতেছেন—হে মরুদেবগণ! আপনারা তৃপ্তির জন্ত “অস্তি হি আ”—শুধু হবনীয় দ্রব্যসামগ্রীই যে প্রস্তুত, তাহাই নহে—“বয়ং অসি আ”—আমরাও বিদ্যমান

শুরু যজুর্বেদের আদিকথা

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম্. এ. পি. আর. এস্.

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন—বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোন সাধারণ মানুষ বেদ রচনা করেন নাই। জ্ঞানাত্মক বেদ অনাদি, অনন্ত; কারণ জ্ঞানের রচনা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নহে। শব্দাত্মক বেদও অনেকের মতে অপৌরুষেয়। বস্তুতঃ তপঃসিদ্ধ ঋষিদের অন্তরে যে জ্ঞানাত্মক বেদের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহারা নিজ নিজ ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই ভাষাত্মক বা শব্দাত্মক বেদ পূর্বে ছিল না; স্ততরাং ঋষিরা তাহাকে রচনা করিয়াছেন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সিদ্ধ ঋষিরা জ্ঞানাত্মক বেদের বিভিন্ন অংশ অল্পে অল্পে উপলব্ধি করতঃ ধীরে ধীরে তাহাদিগকে শব্দাকারে প্রণয়ন করিয়া যে বিরাট বেদগ্রন্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, পরবর্তী কালে তাহাকে অথর্ব, ঋক্, সাম ও যজুঃ নামে চারিটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। অথর্ববেদের নাম প্রথমে উল্লেখ করিতেছি এই কারণে যে, আমার মতে অথর্ব বেদের মন্ত্রগুলিই প্রাচীনতম (মন্ত্রপ্রণীত ‘শব্দ তত্ত্ব’* প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। যজুর্বেদ শুরু ও কৃষ্ণ ভেদে ২ খণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে শুরুযজুর্বেদের আবির্ভাব বা উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান আছে। বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত উপাখ্যানটিরই আলোচনা করিব।

* অবর্তক পাবলিশার্স: ৩১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৫।

মহর্ষি ব্যাস বেদ-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রচারের সুবিধার জন্তই সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বেদের চারিটি বিভিন্ন ভাগের প্রচারের ভার তিনি চারিজন অসাধারণ প্রতিভাশালী শিষ্যের উপর অর্পণ করেন। তন্মধ্যে যজুর্বেদ প্রচারের ভার পড়ে প্রবীন ঋষি বৈশম্পায়নের উপর। মহর্ষি বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শিষ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পরম যত্নে সমগ্র যজুর্বেদ যাজ্ঞবল্ক্যকে শিক্ষা দিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি—যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী। প্রতিভাব ধর্মই এই যে, সে নিত্য নূতন সৃষ্টি করিয়া চলে (প্রজ্ঞাঃ নবনবোন্মেষশালিনীঃ প্রতিভাঃ বিদুঃ)। সমগ্র যজুর্বেদ অধ্যয়নের পর যুবক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মনে কোন কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইল এবং তিনি আচার্য্যকে এই বিষয়ে স্মৃষ্ণ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

বৈশম্পায়ন ছিলেন অত্যন্ত গুরুতর। শুরু ব্যাসের নিকট হইতে তিনি যে গ্রন্থখানা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাহার কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্যও নিজের সংশয় দূর না হইলে কোন গ্রন্থ প্রচার করিতে নারাজ। যাজ্ঞবল্ক্যের এই জ্বিদ দেখিয়া শুরু বৈশম্পায়নের ক্রোধ জ্বলিল। তিনি বলিলেন—“তুমি আমার নিকট হইতে যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছ, সব উদ্গীরণ কর।” শুরুর আদেশে যাজ্ঞবল্ক্য অধিগত সমগ্র যজুর্বেদ উদ্গীরণ করিয়া দিলেন। তখন

রহিয়াছি। আমাদের দেহ-মন-প্রাণ সব কিছু আপনাদের জন্তই উৎসর্গীকৃত। “দেবায় জন্মানে” সিদ্ধ করার জন্ত আমরা আমাদের সব কিছু প্রস্তুত রাখিয়াছি—আমাদের উৎসর্গের অবদান লইয়া আপনারা তৃপ্ত হউন এবং বিনিময়ে আমাদের সেই আয়ুঃ দান ককন, যাহা চিৎস্বরূপ, যাহা বিশ্বব্যাপী। আমি ক্ষুদ্র নহি, তুচ্ছ নহি—আমি শুধু আমার জন্তই নহি, আমিও ঈশ্বরেরই প্রতিভূ। লোহখণ্ড যেমন অগ্নি স্পর্শে অগ্নিময় দেহ ধারণ করে তদ্রূপ দেবতার আয়ুঃ লইয়া আমিও দেবস্বরূপ। অল্পে আমার তৃপ্তি নাই—“ভূমৈব সুখং, নাজ্জৈব সুখমস্তি।”

বেদ যৌকধর্মী নহে, জীবনধর্মী। বেদের ঋষি জীবনবাদী—তাই জীবনেরই জয় গান উঠিয়াছে বেদের মন্ত্র-রক্ষার। সে মন্ত্র শোনার কান থাকে চাই, সাধনা থাকে চাই, তপস্তা থাকে চাই। বেদবাণী হৃদয়দম করার জন্ত ত্যাগ-তপস্তা আমাদের মধ্যে মূর্ত হউক—বেদ-ভগবানের নিকট আমাদেরও ইহাই প্রার্থনা।

বৈশম্পায়ন অস্ত্রাঙ্গ শিষ্যদিগকে বলিলেন—“তোমরা ইহা ভক্ষণ কর।” শিষ্যেরা বমি ভক্ষণ করিতে স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক। তাঁহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওযি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমস্তা বুঝিয়া গুরু পুনরায় আদেশ করিলেন—“তোমরা তিস্তিরি পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া উহা ভক্ষণ কর।” শিষ্যেরা তাহাই করিলেন। এই বমি-করা বেদ সেইদিন হইতে ‘কৃষ্ণযজুর্বেদ’ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

বৈশম্পায়নের গুরু মহর্ষি ব্যাসের আসল নাম ছিল ‘কৃষ্ণ’। সম্ভবতঃ তাঁহার নামানুসারেই (তিনিই ইহার প্রথম প্রচারক বলিয়া) প্রাচীন যজুর্বেদের এই নাম হইয়াছে। কেহ কেহ আবার অস্ত্র রকমও মনে করেন। ইহাদের মতও আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—(১) ‘কৃষ্ণ’ শব্দের অর্থ ‘কাল’। তিস্তিরি পক্ষীর রং কাল বলিয়া তাহাদের দ্বারা ভক্ষিত বেদ ‘কৃষ্ণ’ বিশেষণে বিশেষিত হয়; (২) কৃষ্ণ শব্দটি নিন্দিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ কাল রঙ অনেকেই পছন্দ করেন না। বমি-করা বেদ নিন্দাতাজন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই ইহার এই নাম।

বেদে বহু কথাই রূপকের আকারে লিপিবদ্ধ আছে। অতএব, উল্লিখিত উপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে হইলে রূপক বিশ্লেষণ করা আবশ্যিক। উল্লিখিত উপাখ্যানটি যে একটা রূপক, ইহা বলাই বাহুল্য। বেদ বা অদ্বীত বিষয় বমি করা এবং শিষ্যগণ কর্তৃক তিস্তিরি পক্ষীর রূপ ধারণ পূর্বক উহার ভক্ষণ—রূপক ভিন্ন আর কি হইতে পারে? উল্লিখিত রূপকের অর্থ আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

প্রাচীনকালে মুদ্রাষন্ত্রের প্রচলন ছিল না। ছাত্রেরা গুরুর নিকট হইতে যাহা শিখিতেন, তাহা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইতেন। পরে নিজের লিখিত এই গ্রন্থ অবলম্বনেই আবার অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হইতেন। যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর নিকট হইতে সমুদয় প্রাচীন যজুর্বেদ অধ্যয়ন করতঃ লিখিয়া লইয়াছিলেন। পরে তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, এই যজুর্বেদ দ্বারা তাঁহার জ্ঞানপিপাসা

নিবৃত্ত হইতেছে না।* নিজের সংশয় অপনোদনের নিমিত্ত তিনি গুরুর কাছে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতে থাকিলেন, গুরু অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন—“বাপু হে, আমার প্রদত্ত বিদ্যা যখন তোমার মনঃপূত হইতেছে না, তখন যাহা লিখিয়া লইয়াছ, তাহা ফিরাইয়া দিয়া তুমি অস্ত্র গুরুর কাছে চলিয়া যাও।” যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর নির্দেশমত স্বহস্তলিখিত যজুর্বেদখানা ফিরাইয়া দেন। তখন গুরু অস্ত্রাঙ্গ শিষ্যদিগকে ঐ গ্রন্থ দেখিয়াই পড়াইতে আরম্ভ করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের পর প্রথম যে শিষ্য এই পুরাতন যজুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল ‘তিস্তিরি’। এই নামে আবার একজাতীয় পক্ষীকেও বুঝায়। রূপক ছাড়া কবিতার সময় এই দ্ব্যর্থক তিস্তিরি শব্দটি তাই পক্ষী অর্থেই চলিয়া গিয়াছে। তিস্তিরি যে এক শিষ্যের নাম ছিল, ভাষ্যকার ভট্টভাস্কর তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন; তবে তাঁহার মতে—যাজ্ঞবল্ক্য নিজেই তিস্তিরিকে উচ্চ বেদ পাঠ করাইয়াছিলেন।

বেদ বা অদ্বীত জ্ঞান সাধারণ খাদ্যের মত নহে যে উহা বমি কবিতা কেলা যাইবে, অথবা ঐরূপ বমি ভক্ষণ করিয়া অস্ত্রেরাও বিনা পরিশ্রমেই উল্লিখিত জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিবে। স্মরণে উল্লিখিত রূপকের যে বিশ্লেষণ আমরা উপরে প্রদান করিলাম, তাহাই আমাদের বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত।

উল্লিখিত প্রকারে গুরুর নিকট হইতে অধিগত প্রাচীন যজুর্বেদ প্রত্যর্পণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য আর কোন নূতন আচার্য্যের নিকট যান নাই। তিনি নূতন জ্ঞান আহরণের জন্য সূর্য্যের উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দীর্ঘকাল সাধনার পর সূর্য্যদেব বাজী রূপে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং সূর্য্যের কৃপায় যাজ্ঞবল্ক্য নূতন একখানা যজুর্বেদ প্রণয়ন করেন। গুরুবর্ণ সূর্য্যের কৃপায় ইহা আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য স্বপ্রণীত নূতন বেদগ্রন্থখানাকে গুরুযজুর্বেদ নামে অভিহিত করিলেন।

* কৃষ্ণযজুর্বেদে কেবল বিভিন্ন যজ্ঞের এবং শ্রাদ্ধাদির বিধানই আছে। দার্শনিক তত্ত্ব বিশেষ কিছুই নাই। সম্ভবতঃ এই কারণেই যাজ্ঞবল্ক্য ইহা দ্বারা সমস্ত লাভ করিতে পারেন নাই।



শিল্পীঘন

—শ্রী বীরেন্দ্র লোহে ধীর—

(পূর্বাহ্নবৃত্তি : কার্তিক, ১৩৭১ সংখ্যার পর)

দিনের আলো ও রাত্রের অন্ধকার পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হতে থাকে। এই অনিবার্য আবর্তনে সবকিছু অবহেলিত, কঠিন বর্তমান বিস্মৃত অতীতে অবলুপ্তি পায়। কি হলো, কি রইল আর কি গেল দিন রাত্রির গতিবেগে তার কোথাও কোন বিশেষত্ব নেই। সবই নির্বিশেষ, বিলীয়মান, প্রয়োজনহীন। শুধু গতি। প্রবাহমান কালশ্রোত আর অপস্রয়মান ঘটনা।

এই অনিবার্য গতির মধ্যে কয়েকটা দিন-রাত কেটে গেল। তারপর দেবকুমার একদিন ফিরে এলো চৈতন্য-

এই শেষোক্ত উপাখ্যানটিও একটি রূপক। ইহা হইতে আমরা বুঝিতেছি যে, গুরুত্ব নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য সাধনা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন; কিন্তু খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে কিছুদিন তিনি সাধনা বা গবেষণায় মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে অন্ন ও আশ্রয় দান করিয়া একজন ধনী লোক তাঁহার অভিপ্রেত সাধনে সাহায্য করেন। ‘বাজ’ শব্দের অর্থ অন্ন। যিনি অন্ন দান করেন

জগতে। চোখ মেলে চারিপাশে তাকিয়ে সে বিস্মিত হলো। ঘর, দার, খাটিয়া, সূর্যের আলো—এ সে কোথায় এসে পড়েছে?

কয়েক মিনিট স্থিরভাবে বিচার করতে চেষ্টা করতেই মনে পড়লো—কল্যাণকুমার, বিন্দন, তীক্ষ্ণধার ছুরিকার বলমলানি। শয্যা থেকে মাথা তুলতে গিয়ে দেখলো সর্বাঙ্গ-বেদনায় কেঁপে উঠছে। আঘাতের দুর্বলতা সারা দেহ আড়ষ্ট করে রেখেছে, অক্ষম করে ফেলেছে। শুধু চূপ করে পড়ে থাকার ছাড়া পথ নেই।

কোন এক সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন এক ভিক্ষু। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বেশ। দ্বিজ্ঞাসা করলেন—ভদ্র, কেমন আছেন, কোন কষ্ট আছে?

দেবকুমার উত্তর দিল—না। আপনি কে?

—আমি ভিক্ষু।

—এ আমি কোথায় আছি?

—প্রতিষ্ঠানের সজ্জারামে।

—ওরা কোথায়?

—কারা?

—বিন্দন?

—আপনার সহধর্মিনীর কথা বলছেন? তিনি জীবিত নেই।

—বিন্দন বেঁচে নেই!

—আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হয়েছেন।

—আততায়ী? ই্যা ই্যা, কল্যাণকুমার...

—সেও প্রাপত্যাগ করেছে।

—সেও বেঁচে নেই!

—অগ্নিতে তার মুখ দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দগ্ধকৃত বিষাক্ত হয়ে সে মারা গেছে।

অথবা বাঁহার প্রভূত অন্ন আছে তাঁহাকে বলা যায় ‘বাজী’। যাজ্ঞবল্ক্য এই আশ্রয়দাতা ধনী বাজীটিকে সূর্য্যের রূপায়ই লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিতেন। দীর্ঘকাল সাধনা ও গবেষণার পর যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যে জ্ঞান আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাকেই তিনি ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গুরুযজুর্বেদ নামক নূতন গ্রন্থখানা প্রকাশ করেন। ইহাই গুরু যজুর্বেদ রচনার আদিকথা।

বিন্দন নেই, কল্যাণ নেই, সে একা মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছে। দেবকুমার কয়েক মুহূর্ত ভিক্ষুর মুখের পানে নীরবে তাকিয়ে থেকে ঘটনাটা ভালো করে বুঝে নিতে চায়। শাস্ত ভিক্ষুর মুখে স্নিগ্ধ সহানুভূতির ছায়া। দেবকুমার সহসা উপলব্ধি করে, সে বড় একা, শূন্যতার গুরুভার ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে চেপে বসছে যেন। স্বর্ধকিরণের এই ঔষ্মল্যের চেয়ে অন্ধকারই বোধ হয় ভালো। দেবকুমার চোখ বুঁজলো।

—কোন কষ্ট হচ্ছে ভদ্র?—ভিক্ষু প্রশ্ন করলেন।

—না।

ভিক্ষু এগিয়ে এসে দেবকুমারের কপালে হাত রাখলেন। দেহের তাপ পরীক্ষা করলেন বোধ হয়। তারপর শাস্ত কণ্ঠে বললেন—অকারণে চিত্ত অশাস্ত করবেন না ভদ্র। পূর্বজন্মের প্রারব্ধ কর্মের অনিবার্য ফল এ জন্মে সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে। জীবনের কর্মফলকে এড়িয়ে যাবার শক্তি কোনও জাতকের নেই, তাকে স্বীকার না করলেও তা ঘটবে। সম্যক কর্ম ও সম্যক চিন্তা দিয়ে চিন্তকে স্থির রাখতে হবে। অশাস্ত চিন্তা চকল করবে। নতুন হৃৎকের হেতু হবে। চিত্ত শাস্ত করুন। হৃৎখই জীবনের অহুগামী। এই হৃৎকে জয় করাই মনুষ্যত্ব।

ভিক্ষুর শাস্ত কণ্ঠের উপদেশ, দেবকুমার কিছু শোনে কিছু শোনে না। সেই মৃদু কণ্ঠ ধুম-পাড়ানি গানের মত কানে বাজতে থাকে। সে চোখ বুঁজে পড়ে থাকে। চোখের উপর ভাসতে থাকে একখানি বকুবকে ছুরিকা ও বিন্দনের মুখ।

অনেকক্ষণ পরে দেবকুমার যখন চোখ মেলে ভিক্ষু তখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

মুক্ত দ্বারপথে টুকরো আকাশ। সেই আকাশের পানে তাকিয়ে দেবকুমার কত কি ভাবছিল। একবার পাশ ফিরতে গিয়ে সর্বাঙ্গের যাতনায় নিজের অভ্যন্তরে সে আতর্জনাদ করে উঠলো। সেই আতর্জনাদ শুনে ঘরে এসে ঢুকলো এক ভিক্ষুণী। বললো—কোন কষ্ট হচ্ছে?

—একটু নড়াচড়া করলেই সর্বাঙ্গে যাতনা হচ্ছে।

—ও বেদনা নিরাময় হতে দীর্ঘ সময় লাগবে। আপনি নড়াচড়ার চেষ্টা করবেন না।

ভিক্ষুণীর কণ্ঠ অতি-পরিচিত। দেবকুমার ভাল করে ভিক্ষুণীর মুখের পানে তাকালো, তারপর ধীরে ধীরে বলে উঠলো—নিরালো!

ভিক্ষুণী কোন কথা বললো না।

—তুমি কি নিরালো?

—আমি ভিক্ষুণী উত্তমা।

—ভিক্ষুণী উত্তমা।

দেবকুমার ভিক্ষুণীর মুখের পানে আরো ভালো করে তাকালো। দুটি মাহুষকে কি একই রকম দেখতে হয়? উত্তমা যে নিরালারই যমজ। সেই মুখ, সেই চোখ, শুধু মুখে কচ্ছ সাধনার একটা শুষ্ক মলিনভাব, চোখের কোলে মান ক্লান্তির রেখা। আর রঙীন ঘাগড়ার বদলে গৈরিক বেশবাস। তবে নিরালার চোখে যে আবেশের আবেশ ছিল, এর চোখে সে আবেশের বিন্দুমাত্র আভাষ নেই। এ সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

সারাদিনে উত্তমা কয়েকবার ঘরে থাকে, ঔষধ নিয়ে আসে, দুধ নিয়ে আসে। রোগীর পরিচর্যা করতে আসে। দেবকুমার যতবার তাকে দেখে ততবারই তার মনে হয়, এ যেন নিরালো ছাড়া আর কেউ নয়।

দেবকুমার দেখে আর ভাবে। এমন সাদৃশ্য কি সত্যি হয়?

ক'দিন পরে এক সম্ভাষ দেবকুমার নিজেকে আর সংযত রাখতে পারে না। সহসা ভিক্ষুণীর একখানি হাত চেপে ধরলো, বললো—তুমিই নিরালো।

ভিক্ষুণী ধীরে ধীরে হাতখানি ছাড়িয়ে নিল, শাস্ত কণ্ঠে বললো—আমি ভিক্ষুণী উত্তমা।

—তুমি কি সত্যি নিরালো নও?—হতাশভাবে দেবকুমার বলে উঠলো—কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখছি তুমিই সেই নিরালো।

—আমি ভিক্ষুণী!—শাস্ত কণ্ঠে উত্তর হলো।

—তাতো দেখছি। কিন্তু তুমি ভিক্ষুণী কেন?

—জীবনের হৃৎখতোগ থেকে পরিজ্ঞান পাবার জন্ম ভগবান তথাগতের শরণ নিয়েছি।

—তোমার পূর্বনাম কি? তুমি কোথাকার মাহুষ?

—অগ্রয়োজন বোধে সে অতীতকে মুছে দিয়েছি।

—তবু আমার বল তোমার পিতৃদত্ত নাম কি ?
কোথায় তোমার জন্মস্থান ?

—অতীতকে আমি ভুলে যেতে চাই।

—তুমি বল, আমি জানতে চাই।

—আমার জন্মস্থান যোগিনীঘাট।

—পিতৃদত্ত নাম ?

—নিরাল।

দেবকুমারের ঔৎসুক্য শাস্ত হলো। স্থির দৃষ্টিতে সে চেষ্টে রইল নিরালার মুখের পানে। নিরালার মুখে কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য চোখে পড়লো না।

কতক মুহূর্ত পরে দেবকুমার প্রশ্ন করলো—আমায় চিনতে পারছ না ?

—চিনেছি বলেই তোমার সেবার ভার আমি স্বহস্তে নিয়েছি।

—পরিচয় দিলে না কেন ?

—এখনকার পরিচয় তো বলেছি।

—তা তুমি ভিক্ষুণী হলে কেন ?

ভিক্ষুণী সে কথার কোন জবাব দিল না, মস্তুর পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তরুণীর উচ্ছল যৌবনের স্বপ্ন আভাবটুকুও নেই, সংযমের কাঠিন্দ সে চাঞ্চল্যকে মাটিচাপা দিয়েছে। দেবকুমারের বিদায় লগ্নের নিরাল। এ নয়।

প্রহরখানেক কাটিয়ে ভিক্ষুণী একবাটি দুধ নিয়ে এলো।

দেবকুমারের পাশে বসে বললো,—দুধ এনেছি খাও।

ঝিনুকে করে দেবকুমারকে দুধটুকু সে খাইয়ে দিল। মাথা তুলে দুধ খাবার মত দেহ তখন দেবকুমারের নয়।

বাটিটা একপাশে সরিয়ে রেখে নিরাল। দেবকুমারের মাথায় হাত বুলাতে শুরু করলো, বললো—বল, এবার তোমার কথা শুনি।

দেবকুমার পূর্ণ দৃষ্টিতে নিরালার পানে তাকায়। আশৈশবের একান্ত পরিচিন্তা এই মেবেটির চেনা মুখ চেনা দেহটির চারিপাশ ঘিরে এই গৈরিকের বন্ধন বড় কটু লাগে। ধীরে ধীরে বললো,—তোমার এই গেকরায় বসন বড় চোখে লাগে, তোমার পানে আর চাওয়া যায় না।

মান হেসে নিরাল। উত্তর দিল—কিন্তু ভিক্ষুণীর তো এ ছাড়া অন্য বসন নেই।

—ও বসন তুমি ত্যাগ কর নিরাল।, তুমি আমার সঙ্গে ফিরে চল।

—সে আর হয় না শিল্পী, আমি এখন ভিক্ষুণী, সেবাই এখন আমার ধর্ম।

—কেন হয় না ? সংসারে থেকেও কি মানুষের সেবা করা যায় না ?

—হয়তো বা, কিন্তু এখন আব তা সম্ভব নয়, এখন আমি একান্ত ভাবেই তথাগতের সেবিকা। সংসারে আমার আর কোন আকর্ষণ নেই।

দেবকুমার নিরালার একখানি হাত চেপে ধরলো, বললো—আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো নিরাল।

নিরাল। হাত ছাড়িয়ে নেবার কোন চেষ্টা করলো না। শাস্তকণ্ঠে বললো—যে গৃহ, যে সমাজ, যে দেশ ছেড়ে চলে এসেছি, সেখানে আর ফিরে যাব না। অতীতকে আমি মুছে দিয়েছি জীবন থেকে, এখন আমি একেবারে নতুন মানুষ—নতুন পথের আমি যাত্রী। আমি এখন শুধু সেবিকা মাত্র।

—সেবিকা ! শুধু সেবা দিয়েই কি জীবন চলেবে ? জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা কিছু নেই ?

—না। সব কামনা-বাসনাকে জয় করে মানুষকে নিষ্কাম হতে হবে। ভগবান তথাগত বুদ্ধ বলেছেন—কামনা থেকেই দুঃখ, বাসনাই দুঃখের কারণ। দুঃখ থেকে জ্ঞান পেতে হলে কামনা-বাসনাকে জয় করে নিতে হবে। নিষ্কাম চিন্তে আত্মোন্নতি করতে হবে নির্বাণ লাভের জন্য, তবেই সংসারের শোক দুঃখ জরা মৃত্যু থেকে মুক্তি মিলবে, আসবে পরমা শান্তি।

একান্ত অসহায়ের মত হতাশার স্বরে দেবকুমার বললো—আমি তাহলে কি করবো ?

অচঞ্চল স্বরে নিরাল। বললো—তুমি ভাস্কর। তুমি মূর্তি গড়বে। তুমি শিল্পী। পাথরকে তুমি প্রাণ দেবে। শিল্পকর্মই তোমার কাছে বড়। জগতের কোন কিছুই তোমার কাছে শিল্পের চেয়ে তো বড় নয়। সব বন্ধনকে সরিয়ে দিয়ে তোমাকে এগিয়ে চলতে হবে। যখনই তুমি বন্ধনে বাঁধা পড়বে তখনই তোমার শিল্পহৃদয় ব্যাহত হবে। পিছন পানে তাকানো তোমার ধর্ম নয় শিল্পী।

দেবকুমার কিছুক্ষণ শুক হয়ে থাকে। এতো যোগিনী-ঘাটের নিরালা নয়। এ যেন কোন স্ববিরের ধর্ম-উপদেশ। এই ক'দিনে নিরালার মনের এতো পরিণতি হলো কি করে!

ধীরে ধীরে দেবকুমার বললো—আমি ভুল বুঝেছিলাম নিরালা, সেই ভুল এখন শুধরে নিতে চাই।

—তুমি কিছু ভুল করনি, শিল্পীর সম্যক চিন্তা তোমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। চিন্তের সেই দৃঢ়তা তুমি এখন হারিয়ে ফেলেছ, আহত দুর্বল দেহ তোমার মনকে দুর্বল করেছে। নিঃশব্দে অসহায় ভেবে তুমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছ। এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। মোহকে প্রাধান্য দিলে সাধনার উৎসাহ নষ্ট হবে। মোহযুক্ত একাগ্রতাই তোমার পথের সাথী।

—তুমি পাশে থাকলে হয়তো আমার কর্ম আরো সহজ হতো নিরালা।

—ওই চিন্তাই ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হও। মনে রেখো তুমি শিল্পী, তোমার কর্ম একক সাধনা, তোমার সৃষ্টি একার সৃষ্টি, তোমার সাথী কেউ নেই, শিল্পী সব সময়েই এক।

—বুঝেছি, আমি একবার যে ভুল করেছি সেই ভুলেব জের টেনে চলতে হবে সারা জীবন।

—ভুল কেউ করে না, প্রারম্ভ কর্ম জাতকের জীবনের পথ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে রাখে। তোমার পথ তাই আমার পথ থেকে ভিন্ন। তুমি শিল্পী, আমি ভিক্ষুণী।

কয়েক মুহূর্ত কেউ আর কোন কথা বলে না।

কোন এক সময় নিরালা প্রথম কথা বললো—তুমি আর আমাকে নিরালা বলে ডেকো না। আমি এখন ভিক্ষুণী উত্তমা।

দেবকুমার কোন জবাব দিল না।

ইতিমধ্যে এক প্রবীণা ভিক্ষুণী এসে ঢুকলো ঘরে। বললো—উত্তমা, রোগী এখন কেমন আছে?

—অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

—উত্তম। এ বেলার ঔষধে মধু ও দুর্বার রস অল্পপান দেবে। পাশের ঘরে রোগী বড় চঞ্চল হয়ে

পড়েছে, তার ঠাণ্ডা জলে মাথাটা ধুইয়ে দাও গে। আমি ঔষধ প্রস্তুত করে নিয়ে যাচ্ছি।

নিরালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রবীণা ভিক্ষুণী এবার দেবকুমারকে বললেন—শুভ্র, তুমি এখন আরোগ্যের পথে চলেছ, এখন অতিরিক্ত বাক্যলাপ করে শরীরকে অবসন্ন করা যুক্তিযুক্ত নয়। মৌনতা দৈহিক শক্তির সাম্য রক্ষা করে। সামর্থ্য সঞ্চয়ের জন্য তোমার পক্ষে দীর্ঘ নিদ্রাই এখন প্রশস্ত।

অগ্রগম্য দৃষ্টিতে দেবকুমারের মুখের পানে একবার তাকিয়ে প্রবীণা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেবকুমার বুঝলো নিরালার সঙ্গে তার কথাবার্তার কিছুটা হয়তো ভিক্ষুণী শুনেছেন, বিরক্ত হয়েছেন, তাই পরোক্ষে তৎসনা করে গেলেন।

প্রবীণা ভিক্ষুণী নিরালাকে কিছু হয়তো বলেছিলেন, নিরালার আদা যাওয়া খুব সংক্ষেপ হয়ে গেল। ঔষধ ও পথ্য নিয়ে আসে, বলে—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

—এতো তাড়া কিসের? তুমি একটু বসো না।

—না, অনেকগুলি রোগীর দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে, বসার অবকাশ নেই।

—এতো রোগী এলো কোথা থেকে?

—এমন জনবহুল নগরে কিছু অসুস্থ মানুষ তো থাকবেই।

—তাদের সবাইকে দেখার দায়িত্ব কি তোমার একার?

—আমরা সেবাত্রতী, এ তো আমাদেরই কাজ।

—আমিও তো সুস্থ নই।

—আর কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

—সুস্থ হলেই তো এখান থেকে চলে যেতে হবে।

—সে তো হবেই।

—কোথায় যাবো?

—তুমি শিল্পী, তোমার থাকার ভাবনা কি? নাও, খেয়ে নাও, আমাকে ছেড়ে দাও।

নিরালা তাকে এড়িয়ে চলতে চায় সেটুকু বুঝতে দেবকুমারের কষ্ট হয় না। সে আর কথা না বাড়িয়ে নীরবে ঔষধ ও পথ্য সেবন করে। (ক্রমশঃ)

মনীষি-মন্দিরে

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শীল কলিকাতায় আসিয়াছেন। কথাটা শুনিয়াই বহুদিনের অন্তরের সাধ জাগিয়া উঠিল—ভারতবরেণ্য এই মনীষিসম্রাটের চরণে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিব। দুই-তিনজন সহতীর্থ মিলিয়া অপরাহ্নে যাত্রা করিলাম।

আচার্য্য শীল তো আমাদের চিনেন না। তাই পরিচয়েব তার দিখাইলাম—আমাদের শ্রদ্ধাতাজন ও কল্যাণকামী অধ্যাপক শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদারের উপর।

তিনি সানন্দে সে ভার-বহনে সম্মত হন। উদার-হৃদয় স্নেহশীল অধ্যাপক মহাশয় কতখানি অস্থিরের আকুলতা লইয়া আমাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা বলিবার স্থান এ নহে। তাঁহার নিকট আমরা যে উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়া থাকি, তাহা চিরদিন স্মরণ থাকিবে। বাইরের দৃষ্টিহার্য্য হইয়াও, তাঁর অন্তরের আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টি অনেক প্রকারেই পথের সঙ্কেত দেয়—তাঁর আশীর্ব্বত্তি স্বচ্ছ নিষ্করধারার হ্রায় সকল কুণ্ঠা ও গ্লানিমুক্ত করিয়া জীবনকে শান্ত, স্নিগ্ধ, সমুজ্জ্বল করিয়া

তুলে। এই জ্ঞান-গভীর প্রবীণ মনীষিপুরুষকে দেখিলে মনে পড়ে সেই বাঙ্গালী মরমী কথা—

‘আমার বাহির ছুয়ারে কপাট পড়েছে,

তিতর ছুয়ার খোলা’—

সত্যই নিত্য-সুন্দরের তীর্থযাত্রী—কি নিবিড় মধুময় আত্মীয়তার স্পর্শে আমাদের কাছে টানিয়া লইয়াছেন।

উজ্জল, গরিমময় অপরাহ্ন। অধ্যাপক মজুমদার নিজের মোটরে আমাদের কাছে তুলিয়া লইয়া আচার্য্য শীলের বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য অসুস্থ। ভৃত্য খবর দিল—তিনি উপর-তলাতেই আছেন।

অধ্যাপক মজুমদার তাঁর আগমন-সংবাদ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে, ডাক্তার শীল বিজয়-বাবুকে উপরেই যাইবার জন্য অহুরোধ জানাইলেন—শরীর খারাপ বলিয়া নীচে আসিয়া কথাবার্তা কওয়া কষ্টকর হইবে। বিজয়বাবু অগ্রেই গেলেন। ইহার কয়েক মিনিট পরেই আমরা আহত হইলাম। দীর্ঘদেহ, প্রশান্ত-নয়ন, সৌম্য-দর্শন, মহিমাব্যঞ্জক ঋষিমূর্ত্তি। ব্রহ্মণ্য-গর্বে ললাট সমুজ্জ্বল—দেখিলে ভ্রান্তি দূর হয়, শূদ্রদেহে



আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

ব্রহ্মণ্যশক্তি, ব্রহ্মণ্যপ্রতিভা এ যুগেও অপ্রকট নহে—চাতুর্কর্ণ্যের নূতন সংস্থানের কথাই মনে জাঁকিয়া বসে! শরীর ঈষৎ শীর্ণ, মুখপ্রভা রোগ-গ্লান। ব্যক্তিত্বের পিছনে একটা বিরীচ মানসিক সত্তা যেন দিগন্ত ছাইয়া বিপুল বনস্পতির স্তায় চিন্তা-রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন—কিন্তু আত্মসমাহিত, প্রশান্ত, অগাধ জলধির স্তায় গান্তীর্থ্যপূর্ণ। হাসিটি স্নিগ্ধ, করুণাপ্লুত ও মমতাময়। ইহার সবখানিই বিরীচ, গভীর, অশৈ—যেন কুলকিনারা পাওয়া যায় না—

অথচ একেবারেই বাহ্য প্রকাশ ও

আড়ম্বর নাই—অপার জ্ঞানগরিমার সঙ্গেই ভূগাদপি স্থনীচ বিনয়েব অপূর্ক সংমিশ্রণ! তাঁর প্রতি বাক্যে, প্রত্যেক আচরণে! এ মাহুষের মধ্যে কোনও ক্ষুদ্রত্বের বীজ আছে বলিয়া স্বপ্নেও ভ্রম হয় না।

বিনয় ও অমায়িকতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রের গুণ—উহাতে লেশমাত্র কৃত্রিমতা ও অভিনয়ের স্পর্শ অসম্ভবে পাওয়া গেল না।

ডাঃ শীল বিজয়বাবুকে স্বয়ং মমতাস্তরে হস্তে ধরিয়া ধীরে-ধীরে একখানি আরাম-কেদারায় বসাইয়া দিলেন—আমাদিগকেও আসন দেখাইয়া বসিতে বলিলেন। আমরা তাঁহাকে মাঝখানে রাখিয়া সারি-

সারি পাতা চেয়ারগুলির এক-একখানিতে স্থান গ্রহণ করিলাম।

ঔৎসুক্য ও আগ্রহে পূর্ণ মুখের ভাবধানি লইয়া, তিনি নিজেই আমাদের পানে চাহিয়া কথা শুরু করিলেন।

তিনি বলিলেন—“তোমাদের কাজের কি ধারা, তা’ ঠিক জানি না। তোমাদের সম্বন্ধে শুনলেও, ভাল করে’ জানা-শুনার সুযোগ পাইনি।”

আমরা গোড়াতেই আমাদের শিক্ষা-সাধনার কথা তুলিলাম—“খাকে ঘিরে আমরা কয়েকটি মাহুষ শিশুকাল থেকে গড়ে’ উঠেছি, তাঁর কাছে পেয়েছি আমরা একটি বস্তু, একটি ভাব—শিখেছি একটি মন্ত্র। সে মন্ত্র—আত্ম-সমর্পণ। সেই মন্ত্রে জীবন ঢেলেই জীবনের রস, সৃষ্টির আনন্দ খুঁজে’ পেয়েছি।”

এই Creative culture-কেজ্জ কবে’ই আমাদের সকল কাজ-কর্ম, আশ্রম-প্রতিষ্ঠান। এগুলি উৎসর্গেরই বহিঃ-প্রকাশ। আমরা শতাধিক মাহুষ এই উৎসর্গ-যজ্ঞে সম্পূর্ণরূপে আত্মাহুতি দিয়ে সজ্জ-জীবন গ্রহণ করেছি। সজ্জের নর-নারী সকলেই গোত্রান্তরিত। আমরা সকল কাম-বাসনা বর্জন করে’ এই একটা মিশনকে জীবন দিয়ে সিক্ত করতে প্রস্তুত হয়েছি। আমাদের কারও স্বতন্ত্র ভাব, স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নাই—এমন কি স্বতন্ত্র অর্থকোষ পর্যন্ত উৎসর্গ করে’ আমরা অখণ্ড ঐক্যত্বকে বাস্তব জীবনে মূর্ত করে’ ধরতে পেরেছি। এই একই ভাব-প্রণোদিত হয়ে’ আমরা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, সব কিছুই জাতি-গঠনের অঙ্গ-রূপে বরণ করে’ চলেছি। ভারতে একটা নূতন দিব্য জাতি-গঠন করে’ তোলাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।”

তিনি মন দিয়া কথাগুলি শুনতেছিলেন। মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাইলেন—আমরা শিক্ষার কি-কি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছি, আমাদের কৃষিক্ষেত্রটা কোথায় ইত্যাদি। উত্তরে আমরা যথাযথ-ভাবে সকল খবরই তাঁহাকে সংক্ষেপে জানাইলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—“বা, বেশ কাজ হচ্ছে ত! তবে কাজ ছাড়া একটা কথা তোমাদের বলি—তোমরা যে আত্মনিবেদনের

‘ভাব নিয়ে’ চলেছ, এ ভাব খুব স্বন্দর বটে, কিন্তু শুধু emotional ভাবকে আশ্রয় করে’ চললে, সাম্প্রদায়িকতার গুণী এসে পড়তে পারে। সেটা না হয়, সেদিকে প্রথমে দৃষ্টি রাখতে হবে। সেজন্য চাই একটা strong critical faculty নিয়ে সকল বিষয়ে searching enquiry—যুগের ভাব, জগতের সত্য, নিজের ও পরের সকল সমস্যার উপর এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির তীব্র আলো ফেলে’ সমস্যার সমাধান করতে হবে। তবেই তোমরা যুগের সঙ্গে তাল রেখে’ ঠিক এগিয়ে যেতে পারবে। এ দিক দিয়ে কি ব্যবস্থা তোমরা করছ ওখানে?”

আমরা বলিলাম—“উৎসর্গে হৃদয়ের লয়, কিন্তু তাই বলে’, এটা শুধুই emotional নয়। জীবনে বিদ্যুৎদ্বীপ্য (dynamic energy) ফুটে’ ওঠে উৎসর্গেই। ষোল আনা উৎসর্গ না করলে কখনও কিছু গড়ে’ উঠতে পারে না। এই দিক দিয়ে আমরা আত্মসমর্পণযোগের অমুঠানে ভারতের ইষ্টবস্তুর সন্ধান পেয়েছি। ইহারই উপর দাঁড়িয়ে আমরা জাতি গড়ার সকল উপকরণ আহরণ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ—ইহারা আমাদের উৎসর্গ-তীর্থে একে-একে ভারতের গুরু-শক্তিরই অস্তরের আশীর্বাদ ও বিচিত্র অবদান বিভিন্ন মূর্তিতে ঢেলে’ দিয়েছেন—আমরা সকল দানই যুগ-দেবতার মূর্ত আশিসরূপে মাথা পেতে বরণ করে’ নিয়েছি—এতে সজ্জ প্রযুক্তই হয়েছে, নিজের তত্ত্ববস্তুকে আরও পূর্ণরূপে, খাঁটিভাবে আঁকড়ে’ ধরতে শিখেছি। আমাদের জীবন-দেবতা এই ইন্দ্রিত দিয়েই দিকে-দিকে বেরিয়ে’ যেতে বলেছেন—‘চারিদিক হতে অমর জীবন, বিন্দু-বিন্দু করি’ আহরণ’, আপনার মাঝে পরিপূর্ণ অমৃতের আশ্বাদে—সৃষ্টির, ভোগের অখণ্ড সামর্থ্য লাভে তিনি আমাদের অধিকারী করে’ই তুলতে চান। জ্ঞানের অতল জলধিরূপে আপনি যে বিরাট তত্ত্ব বুকে নিয়ে বসে’ আছেন, তার সামান্য পরিচয়ই আপনার হৃৎ-একটা লেখার ভিতর দিয়ে’ পেয়েছি—Dr. Roy’s Hindu Chemistry-র ভূমিকাঙ্কে ভারতের যে আশ্চর্য্য প্রতিভা-মূর্তির আভাস আপনি দিয়েছেন, সে সত্যই একটা নূতন ক্ষণে আমাদের চোখের সম্মুখে খুলে’

দিয়েছে—তাই জাতির গুরুবিগ্রহ-রূপী আপনার চরণে সজ্জ্বর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতেই আজ এসেছি। সত্য, মহান, দিব্য ভারতকেই চিন্তে চেয়েছি—এখানে আপনার আন্তরিক আশীর্বাদ ও জীবনের অবদান সত্য-সত্যই আমাদের তপস্বীকে সমৃদ্ধ করে' তুলবে—এ-বিশ্বাস আমাদের আছে।”

দেখিলাম—একটা কি জানাইবার ব্যাকুলতা তাঁর ভিতর থেকে ঠেলা দিয়া উঠিতেছে—বিরাট্ ভারতের যে কল্প-মূর্ত্তি তাঁর প্রতিভালোকে স্পষ্ট কুটিরায় রহিয়াছে, তাহা যেন বাহিরে ফোটার আশ্রয় কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই বলিয়াই তার সস্তার সাগরে শুধু উচ্ছ্বসিত ভরঙ্গের তুফান তুলিয়াই প্রকাশের ব্যাকুলতায় আছাড়-কাছাড় করিতেছে—কিন্তু সে প্রকাশ ব্যষ্টিভেব নয়, সমষ্টিভেব, জাতিভেব বলিয়াই উপযুক্ত সমষ্টি-দেহের, জাতি-রূপের অভাবে আপনার মধ্যে শুধু গুমরিয়াই মরিতেছে—
ডাঃ ব্রজেননাথকে সেই মুহূর্ত্তে দেখিয়া স্পষ্টতঃ মনে হইল—a personality too deep and vast for individualistic self-expression—যেটুকু ব্যক্তি বাহিরে, সেটা শুধু ছল (excuse) বা প্রতীক (symbol) যাত্র। ব্যক্তি-বিগ্রহে তাঁহার বার্থ আত্মপ্রকাশ নাই, তাঁর ভিতর একটা বিরাট্ সমষ্টি-প্রতিভাই মুক বেদনায় national self-expression-এর জন্ত আপনার সবখানি সংযত (suppress) করিয়া রহিয়াছে। কথার সুযোগ লইয়া, সেই অন্তর্গুঢ় সস্তার সহিত commune করিতেই অন্তরখানিতে শ্রদ্ধার আগুন পাতিয়া দিলাম। ভারতের যে ব্রহ্মণ্যবীর্ষ্য তলহীন আত্মলয়ের পথ ধরিয়া সমষ্টির জীবনে আপনাকে অলক্ষ্যে, নীরবে বিলাইয়া দিয়া, শুধু দেওয়ারই সস্তাষ নিমগ্ন হইয়া যায়, হইয়া যায় দেওয়ারই স্বরূপ, ব্রাহ্মণ্যভেব সেই সনাতন স্বভাব ও স্বরূপের পরিচয় ইহারই মধ্যে খুঁজিয়া পাইলাম। ব্রাহ্মণ আপনার জ্ঞান, সিদ্ধি, সাফল্যের পুরস্কার যাচে না, ব্রাহ্মণের জীবন ও পরমাণুঃ নিঃশেষে জগদ্ধিতায় সমষ্টির জন্ত, জাতির জন্ত—ইহা তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম—এমন সস্তা, এমন জীবনের স্তারতেই সম্ভব, তাই ব্রহ্মণ্যগুণই অপৌরুষেয় প্রভাবে ভারতের সমাজ-

বিকাশে সত্যই চির পুঙ্খ ও শীর্ষস্থানীয়। যাক্, তাঁহার সহিত আলোচিত কথাগুলি বলি।

আমাদের কথায় ডাঃ শীল বলিলেন—“দেখ, ভারতের যে একটা কিছু দেওয়ার জিনিষ আছে, এটাই আমি জানাতে চাই—সে জিনিষ তার খাঁটি নিজস্ব—ইউরোপের প্রতিধ্বনি নয়।”

আমরা—“রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র এই দেওয়ার বাণীই বাইরে দিয়ে' এসেছেন”—আমাদের কথা শেষ হইল না, তিনি খুব একটা গভীর বেদনার সুরেই বলিলেন—“ইউরোপ ইহাদের বাণী শুনে' প্রথমে চমকে' উঠলেও, তারপর ধীরে-ধীরে বুকে' নিচ্ছে—এও তাদেরই কাছ থেকে পাওয়া জিনিষেরই প্রতিধ্বনি, ভারতের খাঁটি মৌলিক প্রতিভার দান নয়। Slave-mentality আমাদের শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, cultural slavery ওতঃপ্রোতভাবে ভারতের সকল প্রতিভাকেই গ্রাস করে' বসেছে—তাই ভারত নিজের দান নিয়ে' জগতের বুকে ঝাঁপিয়ে' পড়তে পারছে না।”

এইখানে আমাদের উপলব্ধি তাঁর জাতি-দর্শনের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া গেল। বলিয়া উঠিলাম—“ভিতরটা পরাধীন না হলে, একটা জাতি বাইরে পরাধীন হয় না। প্রাচ্যের, এশিয়ার সব জাতিই একে-একে ইউরোপের এই সর্বগ্রাসী সভ্যতার শ্রোতে ভেসে' যেতে বসেছে—জাপান, চীন, আফগানিস্তান, তুর্ক—ধর্ম্মে-কর্ম্মে, ভাবে-ভাষায়, অশনে-বসনে পর্য্যন্ত আত্মবৈশিষ্ট্য হারিয়ে' পাশ্চাত্যের অহুকরণে ব্যস্ত, ভারতও কি সেইভাবে আত্মবৈশিষ্ট্য হারিয়ে' আপনাকে বিক্রয় করবে? আমরা এই কারণেই অন্তঃস্ববী হয়ে' সর্বপ্রথমে ভারতের cultural awakening চাই। এই ভারতীয় তত্ত্বকে ইষ্ট-বস্তু করে' আমরা সর্বস্ব চলে' এই culture-এর প্রতিষ্ঠার জন্তই জীবন উৎসর্গ করেছি।”

আমাদের কথার মধ্যে উৎসর্গের সুরটা এইবার নিবিড়ভাবেই যেন তাঁর অন্তর স্পর্শ করিল। তিনি খুব সংক্ষেপেই তাঁর মনের ভাব জানালেন—“হাঁ, এই রকম সবখানি দিয়ে না লাগলে সৃষ্টি হয় না।” জাপানের কথায় তিনি একটু প্রতিবাদ করিলেন—জাপান যে

একেবারে আত্মবৈশিষ্ট্য হারাইবার পথেই চলিয়াছে, তাহা তাঁহার মতে ঠিক নহে। সহসা তার মুখে-চোখে একটা স্বদূরগামিনী দৃষ্টির আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ যেন নথ্য-দর্পণে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি কহিলেন—“যুগের ভাব, যুগের দান ছাড়লে চলবে না। রাজা রামমোহন বর্তমান যুগশক্তিকে উপেক্ষা করেননি। তিনি বুঝেছিলেন—‘দ্বার রুদ্ধ করে’ দুনিয়ার আলো-বাতাস থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে’ আমরা বাঁচব না। তাই তিনি নির্ভয়ে যুগোচিত ভাব ও ভাবার আবাহন করেছিলেন—কিছুমাত্র দ্বিধা-সন্দেহ করেননি। জগতের জীবনে ‘কাঁপিয়ে’ পড়ে’, নিজ প্রতিভার ছাপ দিতে ভারত কোন দিন কুষ্ঠা বোধ করেনি। ভারতের প্রতিভা অমর বস্তু—ভারতের মরণের ভয় নেই!” শেষ কথা কয়টা এমন অদম্য তেজঃ, অপরিমেয় বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি বলিলেন যে, তার প্রত্যেকটি বর্ণ বিদ্যুৎশক্তিপূর্ণ হইয়া আমাদের সমস্ত অন্তর প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল। যুগ-প্রভাতের ঋষি রাজা রামমোহন অব্যর্থ সঙ্ক্ষেতে যে ভবিষ্য-ভারতের কল্পচিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তার প্রতি রেখা মানস-পটে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। সে আদর্শ ভারতের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে গম্যাক্ষাদিত বহির জায় তলে-তলে সঞ্চারমান হইয়া, জাতিকে কোন্ মহাবিপ্লবের জন্ত প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে, কে জানে! রাজার কাজ আজও বুঝি ফুঁবাব নাই। যুগপুরুষের উত্তরাধিকারী জাতি তাঁর aggressive orientation টুকু ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি চলে, তবেই তার মুক্তির পথ অব্যাহত হইবে। এই Aggressive Nationalism-এর বাণী ডাঃ শীল ঠিক একই রকম ভাষায় না বলিলেও, তাঁর সমস্ত অন্তরখানি অগ্নিমুখী হইয়া ইহারই তেজোরশি আমাদের অন্তরে ঢালিয়া দিল। আবেগভরে কহিলাগ “যুগদেবতার ইঙ্গিত এই aggressive orientation, এইটা বুঝে’ই আমরা একটা dynamic-philosophy আমাদের জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে’ তুলেছি। আমরা চাই জীবন—life—creative, divine; আর উহা জাতিগতভাবেই প্রবর্তন করতে চেয়েছি। জীবনের

ধর্ম—নির্বাণ, মোক্ষ, বা লব নম, জীবন ভগবানেরই expression, এই বাণীটিই আমাদের জাতিকে দিবার। আমাদের সাধনার অনুভূতি ইহাই—সমাধির পরেও জীবন আছে—সেই মহাজীবনেরই অধিকারী ভারত দিগ্বিজয়ে বাহির হবে। নির্বাণ বা মোক্ষবাদের মূল—জাতির চেতনা থেকে উপড়ে’ ফেলতে হবে।”

তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন—দ্রুত শ্বাসে বলিলেন—“না, না, ভারতের নির্বাণ বা মোক্ষবাদ এক কথাই উড়িয়ে’ দেওয়া যায় না। তা’ হলে সনাতন ভারতের সত্যতার বনিয়াদই ভেঙে’ পড়বে। ও হয় না! তবে মোক্ষ বা লবের নূতন interpretation দিতে পার বটে!” ভারতসত্যতার এই ভিত্তিপরিবর্তনের আলোচনা জমাইয়া তুলিবার আর অবকাশ ছিল না—ঠাকুর রামকৃষ্ণের নজীরও হাজির করিতে পারিলাম না—বনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকার কলিকাতার রাজপথে কাঁপিয়া আসিতেছে দেখিয়া, আমরা কথাটা সংক্ষেপে সারিয়া উঠিতে চাহিলাম। বলিলাম—“আপনার সহিত সকল কথা বিশেষ আলোচনার আজ আর সময় হ’ল না। তবু পরিচয়ই যথেষ্ট—আশা করি, আমাদের কথা মনে রাখবেন। আমাদের আশ্রমে একবার পদধূলি দেবেন।”

বিজয়বাবু এতক্ষণ চুপটা করিয়া বসিয়াছিলেন—এইবার মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—“আমি এতক্ষণ কিছু বলিনি। এ’র সম্বন্ধে একটা কথা—ইনি চিরদিন আড়ালে থেকেই দেশকে তাঁর দান দিয়ে এসেছেন। অনেকেই জানেন না—ইনি যে সব নূতন গবেষণা ও সিদ্ধান্ত করেছেন, নানা জনে তাঁর কাছ থেকে তা’ শুনে’ নিয়ে’, নিজেদের নামেই চালিয়ে দিয়েছে—এই কারণেই তাঁর চিন্তার দান কতখানি, দেশ তা’ জানে না। এ’র সঙ্গে আপনাদের পরিচয়ে আমি খুবই স্মৃখী হয়েছি!”

মহাচার্য্য মুহূ হাসিলেন—কহিলেন—“সত্য আমার-তার নয়—সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। আমার দাবী কোন সত্যেই নাই—সত্য আপনাকে আপনি আবিষ্কার করে’ চলেছে। আমি নিমিত্ত মাত্র।”

আমাদের বলিতে হইল—“তবুও এই নিমিত্ত বা

বা সত্যের আশ্রয় যিনি, তাঁকেও তো ভুলে' থাকি যাব না। সত্যের বিগ্রহ—তিনিও নমস্কার, শ্রদ্ধার পাত্র। মনীষির পূজায় আমরা মানবত্বেরই উপাদান সঞ্চয় করি। আপনাকেও আমরা প্রত্যক্ষভাবে একবার আশ্রমে পেতে চাই। এ কথাটি আপনি ভুলে' যাবেন না।”

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—“না, ভুলব না। তবে শরীর আমার খুবই খারাপ দেখছে-তো! এবার-তো যেতে ইচ্ছা থাকলেও, যেতে পাচ্ছি না। আমি পরশুই মহীশূর চলে' যাচ্ছি।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“কে আপনাকে এখানে দেখা'ছেন!”

—“কবিরাজ শ্রীমাদাস বাচস্পতি।”

পদধূলি লইয়া বিদায় লইব—তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে পদস্পর্শ করিতে মানা করিলেন—কিন্তু কে স্তনে! আশীর্বাদপূর্বক তিনি বলিলেন—“একটা অমিশ্র তাব নিয়ে' তোমরা রয়েছ—এ রকম অনেক জাযগায় দেখিনি—তোমাদের ওখানে খুব ভাল জিনিষই ফুটে' উঠবে।”

(প্রবর্তক, বৈশাখ, ১৩৩৬ হইতে উদ্ধৃত)



ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিমত ও “প্রবাসী”র প্রতিবাদ সম্পর্কে

বৈশাখের “প্রবর্তকে” “মনীষি-মন্দিরে” ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয়ের সহিত আমাদের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হইলে, শ্রাবণের “প্রবাসী”তে উহা লইয়া শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবু এক দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন। বৈশাখের “প্রবর্তকে” যথাসময়ে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের হস্তগত হওয়ার পরও শ্রাবণ মাস পর্যন্ত তিনি ইহার কোন-রূপ প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করেন নাই—কেননা, আমাদের প্রকাশিত সন্দর্ভে দেশপূজ্য রবীন্দ্রনাথ অথবা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা-প্রদর্শনের ভাব ছিল না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, তবুও রামানন্দ বাবু যে সামান্য ত্রুটিটুকু লইয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে স্তার ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তব্যটুকু

অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, ইহা অল্প লাভের কথা নহে।

“প্রবর্তকে”র পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ডাঃ শীলের সহিত কথোপকথন-কালে, আমাদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন বঙ্কু আচার্য্য বিজয় চন্দ্র মজুমদার সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। “প্রবাসী”র প্রতিবাদ পাঠ করিয়া আমাদের বিচলিত হওয়ার কারণ ছিল না। কেন-না বৈশাখ মাসের “প্রবর্তকে” দেশের এই দুই কৃতী সন্তান যথাসময়ে পাওয়া সম্ভবও, যখন কোন কথা উত্থাপন করেন নাই, তখন আমাদের নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ মনে হইয়াছিল। কিন্তু ভাদ্রের “প্রবাসী”তে স্তার ব্রজেন্দ্রের টেলিগ্রামটা বাহির হওয়ায়, আমরা এই বিষয় লইয়া সর্বপ্রথমে আচার্য্য বিজয়চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হই। তিনি এই প্রসঙ্গে স্বয়ং যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া ইহা যথাযথ “প্রবর্তকে” উদ্ধৃত করিলাম। শ্রদ্ধেয় বিজয়চন্দ্রের লেখাটা আমরা আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দিই—তিনি বিজয়বাবুর লেখার মধ্যে কেবল এক লাইন যোগ করিয়াছেন। যদিও শীল মহাশয়ের অনুমতি-গ্রহণের সময় নাই, তত্রাচ বিষয়টার বিশদ হওয়ায় জন্ত, তাঁর পত্রের কিয়দংশও এইখানে সর্বোপায়ে উদ্ধৃত করিতেছি। ডাঃ শীল লিখিয়াছেন—

“শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার পত্র পাইয়াছি। সুহৃদর শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা বেশ বিশদ হইয়াছে। তাহাতে আমি কেবল এক লাইন যোগ করিয়া দিয়াছি। (২ পৃষ্ঠায়* চিত্রিত স্থান দেখুন। মজুমদার মহাশয়ের বক্তব্যের অমূল্যলিপিটি এই সঙ্গেই পাঠাইতেছি)।

ইহা মুদ্রিত হইলে আর কোন ভ্রম বা সংশয়ের স্থান থাকিবে না।

আপনাকে এই বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছি। আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করার এই সুযোগ পাইলাম,—এই ভুলচূকের মধ্যে এইটুকু ভাল। ইতি

বিনীত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।”

এইরূপ হওযারও কারণ, চৈত্র মাসের প্রথমে স্তার ব্রজেন্দ্র কলিকাতায় আছেন শুনিয়া আমাদের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করেন এবং তাৎকালীন কথোপকথনের মর্ম বৈশাখের শেষে স্মৃতি হইতেই লেখা হয়। কাজেই এইরূপ সামান্য ত্রুটি হওয়া বিচিত্র হয় নাই। আর তাঁর অস্মৃতি না লইয়া ইহা প্রকাশিত হওয়ায়, তাঁর নিকট আমরা ততখানি অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হই নাই, যতখানি হয়ত “প্রবাসী”র বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আমাদের অপরাধী স্থির করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সামান্য ত্রুটি-শোধনের ফল ভাল বৈ মন্দ হয় নাই, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রামানন্দবাবুর নিকট আমরা রুতজ্ঞ।

ইহা-দ্বারা বিষয়টা বিশদ হইল। অতঃপর এই বিষয়ে আমাদের সামান্য কিছু বলিবার আছে, তাহা উক্ত প্রসঙ্গের সহিত সঙ্গদয পাঠকবর্গ এক করিয়া লইবেন না—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

আমরা একটা বস্তুর অন্বেষণ করিতেছি এবং এই অন্বেষণের ফলে বাংলার যে কয়জন মনীষির সহিত অন্তর-পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতে, প্রাচ্যের দান পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্যের দান প্রাচ্য গ্রহণ করিয়া প্রবৃদ্ধ হইবে। প্রাচ্যের যাহা দিবার আছে, তাহা যেন আজিও সম্যক্ অবিকৃত হয় নাই। পাশ্চাত্য প্রভাবে দেশের মনীষি-গণ্ডলীর অভ্যুদয় পাশ্চাত্যের মহিমাই বোষণা করে এবং ইহা খুবই স্বাভাবিক। একান্তবোধ অস্বভূতিগত না হওয়া পর্য্যন্ত দান ঋণরূপেই চাপিয়া বসে। পাশ্চাত্য উত্তমর্ণের আসন পরিগ্রহ করিয়াছে, আমাদের যে দান, তাহা ঋণশোধের দায় হইয়া উঠিতেছে। কেন-না, দেশের মনীষিগণ্ডলী যাহা ইউরোপকে দিতেছেন, তাহা যদি ইউরোপীয় culture-এর ফল হয়, তাহা হইলে “ভারতের যে দেওয়ার জিনিষ আছে...যা” তার খাঁটি নিজস্ব”, তাহা কি আমরা হারাইয়া ফেলিতেছি না?

ইউরোপীয় culture ব্যতিরেকে “আমাদের অভ্যুদয় সম্ভবপর নয়”, একথা মনীষি ব্রজেন্দ্রনাথ কেন, প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। আমরা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ

বসু মহাশয়ের জ্ঞানগবেষণার স্পর্শে আসিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জীবন-ব্যাপী সাধনার অমর সম্পদের পরিচয়ে বিস্মিত ও ধস্ত হইয়াছি—বাংলায় আজ যে সকল সুধী, অমূল্যজ্ঞান সাহিত্যবিশারদগণ নীরবে ভারতীর সেবা করিতেছেন, তাঁহারা সৃষ্টির কনকমন্দির গড়িয়া তুলিবার অবকাশ না পাইলেও, ভবিষ্য জাতি-গঠনের যে অমর উপাদান সংগ্রহ করিয়া যাইতেছেন, তাহা জাতির গৌরবময় যুগসৃষ্টির অব্যর্থ সহায় হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু এই প্রবেশার মূলে সত্যই ইউরোপের দান আছে, দীক্ষা আছে। আমাদের মনে হয়, ভারতের অতীত গৌরব যতই মহিমামণ্ডিত হউক, স্তরুদক্ষিণার দায়ে আমাদের মাথা নত করিতে হইবে—ভারতের সম্ভা অহঙ্কারবশতঃ অকৃতজ্ঞ হইবে না।

ইহাই যদি ভাগবত বিধান হয়, আপত্তি করিবার কিছু নাই। ভারতের অধ্যাক্ষগৌরব আমাদের হয়তো নিজস্ব খাঁটি জিনিষ, কিন্তু কোন বস্তুই যদি স্বয়ং-পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে সে বস্তুর আদর যোহের কারণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমরা যেন কি হারাইয়াছি এবং তাহা ফিরিয়া পাওয়ার পথও কল্প হইয়াছে, অথচ জীবনশক্তি গতিহীন নয়। কাজেই চলা আমাদের বন্ধ হয় নাই; আসা কিন্তু অন্ধ। আমাদের বুদ্ধিই আজ প্রবৃদ্ধ হইতেছে। সে বুদ্ধি নিজের অমর বীৰ্য্যে আত্মাহীন। আপনার ভিতব হইতে যে বৃহত্তর সৃষ্টি, তাহাই নিজস্ব খাঁটি বস্তু। এই আত্মস্ব সাধনায় ফলে যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহা বস্তুতঃ আত্মপ্রকাশের পথে বিশ্বের দানকে ছুই বাহ প্রসারিত করিয়া টানিয়া আনে; কিন্তু চেতনায় দ্বৈত-বোধ থাকে না। যাহা সে সঞ্চয় করে, সংগ্রহ করে, তাহা আপনার বস্তু বলিয়াই পরিগৃহীত হয়। এই ভারতীয় বুদ্ধি হইতে জাতি যেন ক্রমেই বঞ্চিত হইতেছে; এমন কি, ভারতের অনির্বচনীয় সাধন-বস্তুর যে ভাবে উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর, এই নবগঠিত বুদ্ধির যে ধারা ও ভঙ্গী পাইয়াছি, তাহা দিয়া ইহা গ্রহণ করায়, ইহার বিস্তৃত আশ্বাদ আর আমরা

প্রপঞ্চ শ্রীপ্রমোদাকান্ত আচার্য্য

বাপীর বয়স এই তিন। সে বড় চতুর। এই সামান্য বয়সেই মোটামুটি সব বলতে পারে। জ্ঞান কাণ্ড কম নয়। নিত্য নূতন খেলনা চায়। ঘণ্টায় দশ বারো দফা কাছে হাত দেয়। তার দাও তামাক খান। কঁক পেলে গড়গড়ার নলটায় শুটো টান দেয়। কারো বই পেলে পড়ে ফেলে। স্নেহে লিখতে তার ভাল লাগে। তা আবার সে নিজ পড়ে সকলকে শোনায়ে। তার দাওর সঙ্গে বাজারে যায়—যা কিছু কেনা হোক তার নাম বেছন। মাছকে বলে তাছ। খাবারের দোকানে গেলেই নসো চায় অর্থাৎ রসগোল্লা। কোন ছোট ডালা পেলেই মাথায় তুলে নিয়ে ফেরীওয়ালা সাজে। ডাক ছাড়ে চাই নম্বেশ, জয়মোহা। অর্থাৎ সন্মেশ জয়নগরের মোয়া। চিরুণী পেলেই মাথা আচড়িয়ে বাবু সাজে। কিন্তু পরণে হয়ত প্যাণ্ট বা জামা নেই। তাকে সবাই ভালবাসে। ভয় সে কাকেও করে না। কেবল মা একটু চোখ মোটা করলেই তার মুখ শুকিয়ে যায়। তখন মার কাছে খুব অহুসন বিনয় করে। মা বারণ করলে সে কাঁজ করতে সাহস হয় না। যত আদার বাবার কাছে। বাবা অফিসে যান। সেও কথায় কথায় বলে আমি অফিসে যাই। ভাল কাপড় জামা পরলেই তার অফিসের কথা মনে পড়ে। একদিন বাবা চলেছেন মেলায়। বাপী আজ একটা নূতন নাম শুনলো ‘মেলা’। বায়না আরম্ভ করলো আমি মেলায় যাব। বাড়ীর আর যারা মেলায় যাচ্ছে তারা একটু বেশ বড়; হেটে যেতে পারে। কিন্তু বাপী যাবে কি ক’রে। অগত্যা তাকে যখন রেখে গেল না, বাবা তাকে কোলে ক’রে নিলেন।

মেলায় গিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। সে বাবার হাত ধরে মেলার ভিতর চলে। ষ্টেশনারী দোকানে সাজানো গলির ভিতর দিয়ে যেতে দৌড়ে গিয়ে বাপী একখানা ছবি তুলে নিল। বাবা ছবিটার দাম দিয়ে দিলেন। কিন্তু ব্যস্তবাগীশ বাপী ফিরে আসতে একটা ছোট আয়নার পরে পড়ে গেল। আয়নাটা একটু ফেটে গেল। কাছেই বাবা সেটাও কিনলেন। এক জায়গায় দেখলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চতুর্দোলায় উঠে ঘুরে পাক খাচ্ছে, বাপী চতুর্দোলায় উঠবে। কিন্তু সে সেখানে একা বসতে চায় না। কাছেই বাপীর বাবাকেও চতুর্দোলায় চড়তে হ’লো। মিষ্টির দোকানে গিয়ে একটা নসো খেলো। ফিরে আসার সময়ে তার সব চেয়ে যে জিনিসটা ভাল লেগেছিল সেটিও কিনে নিয়ে এল।

একটি মাটির মাছ। যেন একেবারে জলজন্তু মাছ। চক্-চক্ করছে তাব দেহ। চোখ দুটা দিয়ে যেন বাপীর দিকে চেয়ে আছে। ঠোঁটটি কি সুন্দর লাল! গায়ের আঁশগুলি পর্যন্ত রূপালী সাদা। জলের মাছ ভাঙ্গায় দড়িতে ঝুলে সাঁতার কাটছে দেখে বাপীর আর আনন্দ ধরে না। সে ওটা নেবেই। বাবা আর কি করেন, তিনি তাই চার আনা দিয়ে মাছটিকে কিনে নিয়ে এলেন। বাপী সমস্ত পথটা বাবার কোলে উঠে বাড়ীতে ফিরে এল বটে, কিন্তু মাছটিকে সে কোন সময় ছাড়ে-নি। সেটিকে সে তার কোলে বা হাতে ক’রে বহন করে আনলো।

বাড়ী আসতে-আসতে বাপী ঘুমিয়ে পড়লো। মাছের

পাই না। আপনার মাঝে আপনার বৃহৎকৈ স্বীকার করিলেও, তাহা সবখানি দিয়া স্বীকার করার যে বীৰ্য ও সাহস, তাহা কি আমরা হারাইয়া ফেলি নাই?

এই প্রশ্নের সত্ত্বস্তর পাই তখনই—যখন আমরা আপনার গৃহে বসিবা আস্রার ছোয়া পাই; কিন্তু বিশ্বের দরবারে আশ্রপ্রত্যয়ের অগ্নিবাহী উচ্চারণ

করিতে বাধে। বাহিরের সহিত সামঞ্জস্য-বিধানের যে বুদ্ধি, তাহাই অন্তরায় হয়। এই বুদ্ধি ইউরোপের হাতে গড়া। এ অবস্থায় আমাদের অভ্যুদয় অসম্ভব নয়; কিন্তু তাহা নামে ভারতের হইলেও, ইউরোপেরই মহিমা বুদ্ধি করায়, ভারতের সত্তা তাহাতে পরিপূর্ণ সার্থকতা পায় কি?—[প্রঃ সঃ]

দড়িটার হাতে। কোন রকমে তার ছোট আঙ্গুল থেকে ছাড়িয়ে মাছটিকে মা রাখলেন তার শিয়রে। ঘুম ভেঙ্গে ছ' একবার বাপী কেঁদে উঠেছে রাত্রিতে। 'আমা তাছ।' মা মাছটিকে তার সামনে রাখলেন, বাপী আবার ঘুমলো।

রাত্রি প্রভাত হ'লো। সবাই জেগেছে। বাপীর ঘুম ভাঙে বিলম্বে। কিন্তু মা একেবারে অবাক—সে মাছ কি হ'লো। কে আবার নিল মাটির মাছটি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন। কেউ জানে না।

বাপীর ঘুম ভাঙলো। মাছ না দেখে সে কান্না জ্বর করে দিল। ছেলেকে আর শাস্ত করা যায় না। একবার মা, একবার বাবা, একবার দাঙ্গ কত সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু কোন প্রবোধ মানে না। ছেলে কেঁদে গড়িয়ে পড়ে। ন'সো এনে দেওয়া হ'লো। বাপী টান দিয়ে ফেলে দিল। কাঁদতে থাকলো।

এর ভিতর ঝি আসলো ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে। বলল—মা, বাবু বুঝি একটা রই মাছেয় পোনা কিনে এনেছিলেন। আশাবিত্তা হয়ে মা বললেন, "হাঁ হাঁ, এনেছিলেন, তা সেটা হ'লো কি? তাইতো সবার কাছে জিজ্ঞেস করছি। ঝি কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বনলে 'মা, আমি তা রক্ষে কর্তে পারিনি। তোমার ওঠার আগেই একটা বিড়াল দেখি একটা মাছ মুখে করে নিয়ে বেরুচ্ছে। দিলাম তাড়া, যেই না বিড়ালটা উঠানে নামলো আর কোথা থেকে একটা চিল এসে প'ড়ে বিড়ালের মুখ থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে উড়ে গেল। কথাটা আমি সাহস করে বলিনি—বাবু বকুবেন তাই।' "

গল্প শুনতে শুনতে মা হেসে দিলেন। বাপী শুধু আমার বোকা নয়। তুই একটা মানুষ, বিড়াল একটা জীব যে মানুষ চরিয়ে খায়, আকাশের পাখীটা বাজ যে পরের জিনিষ ছৌঁ দিয়ে আত্মসাৎ করে। সবাই দেখছি আমার বাপীর মতই অজ্ঞান।

ঝি কিছু বুঝলো না। বাপী খেলনার পরে খেলনা পেয়ে পেয়ে কতকটা নিরস্ত হলো কিন্তু মায়ের বিস্ময় গেল না। কি ব্যাপার। বাজটা যখন বুঝবে সেটা আসল মাছ নয় তখন নিশ্চয় মাটিতে ফেলে দেবে। সকলে

কয়েকদিন ধোঁয়াখুঁজি করলো কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। একদিন মা এসে দাঁড়িয়েছেন পুকুরের ঘাটে মিঁড়ির পরে। বাপী রয়েছে কোলে। মা হাত তুলে পুকুরের মাছ দেখাচ্ছেন। বড় বড় রুই কাত লারা মাঝে মাঝে ভেসে উঠে জলে খেলা করছে, বাপীর তাতে প্রথমটা আনন্দ হলো বটে। কিন্তু তার সেই মাছটির কথা মনে পড়ে গেল। সে খুঁত খুঁত করতে থাকলো। খানিকটা পরে হেসে উঠলো। তার কি আনন্দ। সেও হাত দিয়ে দেখালো—"ঐ যে আমা তাছ।" মা কিছু বুঝতে পারলেন না। পরে বাপীর উল্লাস দেখে বার বার দেখতে থাকলেন। হাঁ ঠিকই তো। বাপী যা বলছে সত্যিই ত ঠিক। সেই মাছটা জলের মধ্যে সাঁতার দিচ্ছে। সেই রকমই চেয়ে আছে। দড়িটা পর্যন্ত তার সেই পিঠের দিকে ঝুলছে। মা একেবারে বিম্বল হ'য়ে গেলেন। মাছটাকে ধ'রে তুলবেন ব'লে বাপীকে রেখে জলে নেমে গেলেন। মাছটা যেন ক্ষুদ্র মানবশিশু, বাপীর মতই হেসে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। লেজ নেড়ে নেড়ে আস্তে আস্তে সাঁতার কাটতে থাকলো। কিন্তু পিছন দিকে কি রপ্ ক'রে উঠায় মা ফিরলেন। দেখেন বাপীও জলে নেমে প'ড়েছে। মা তাড়াতাড়ি ফিরে বাপীকে কোলে নিয়ে ডাঙ্গায় উঠে এলেন। চিন্তা করতে থাকলেন তিনিও কি খিটার মত বোকা। আবার ফিরে জলে তাকালেন; সত্যিই তো, ঐ তো সেই মাছ। এখনও যে তার পুচ্ছ মূহু সঞ্চালনে ব্যস্ত। চোখ দুটা তার বাপীরই মত হাস্তোজ্জ্বল। সেও যেন মার কোল চায়। জল তার বুঝি আর ভাল লাগে না। মা হাত পাতলেন—লক্ষ্মী মাছ আমার কোলে এস। মাছ সেইখানেই রইলো, মায়ের আবেদনে সাড়া দিল না। মা ভাবলেন আমিও কি বোকা! জলের মাছ আমার কাছে আসবে কেন। একদিন লোকালয়ে থেকে সে মাতৃস্নেহ কি আর বুঝবে।

মা বিষম বদনে ঘরে ফিরলেন। সকলকে এ খবর দিলেন। বাপীর বাবাও এসে দেখলেন। কেহবা জলে নেমে মাছটিকে হাতে তুলে আনবে ব'লে চেষ্টা করলো। কিন্তু কি আশ্চর্য জলে নাড়া পড়তেই মাছটা হারিয়ে গেল। স্থির জলে বেশ দেখা যায়। ছ'-একদিন চেষ্টা

বৈষ্ণবকাব্যে রাধা-প্রীতি

শ্রীশরদ্দিন্দুনারায়ণ ঘোষ

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মের দর্শন হচ্ছে “অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ”। চৈতন্যদেব ভগবানের মধ্যে ভগবানের ঐশ্বর্যরূপকে স্বীকার করেন নি। তাঁর আদর্শ হচ্ছে—মাধুর্য বোধের মধ্যে ভগবৎ সাধনা। বাহ্যিক কোনো অমুঠানই প্রয়োজন নেই, অন্তরের আবেদনই হচ্ছে ভগবৎ প্রাপ্তির সত্য পথ। এই সত্যই তপস্শ্রা, সেই তপস্শ্রাই ধর্মঃ—“ঋতং তপঃ, সত্যং তপঃ”। উপনিষদে বলা হয়েছে, যাকে সবাই অমৃত বলেন, এই সত্য দিয়েই তা আচ্ছাদিত, “এতদমৃতং সত্যেনাচ্ছন্নম্”।

সর্বোপরি চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের উপাসক। বৈষ্ণবেরা চৈতন্যদেবের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ দেখেছেন। শ্রীরাধার দেবায়ণ সম্পূর্ণ রূপ পেল শ্রীচৈতন্যের মধ্যে। কৃষ্ণ বিরহের তীব্র ব্যাকুলতা যখন মূর্ত হল শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে, তখনই প্রত্যক্ষের মাহাত্ম্য পরোক্ষকে ছাপিয়ে গেল। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতি-কবিতা আদিরসের নির্মোক্ষ ত্যাগ করে শুদ্ধি ও প্রেম-রসের মহিমা বরণ করল।

প্রাচীন সাহিত্যাহুসারে দেখতে পাই যে, সেই যুগে সাহিত্যে পুরুষদেরই বিরহ হত। পুরুষদের বিরহ প্রধান

কাব্যসাহিত্যেই দেখি, পুরুষদের বিরহ থাকে প্রধানতঃ জ্ঞানপ্রভার কথা, জ্ঞানতত্ত্বের রসসমৃদ্ধতা। কালিদাস প্রভৃতির কাব্যেও তাই দেখা যায়। স্ত্রী বিরহে থাকে রস-তত্ত্ব, রসালতা। পদাবলী-সাহিত্যে এই বিরহও বিশেষ অঙ্ক রচনা করেছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রেম, প্রেমময় জগত—প্রেমের বিচিত্র প্রকাশই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান উপজীব্য। বৈষ্ণবদের ভগবান রসো বৈ সঃ। তাই এখানে প্রেম, বিরহ, অভিষার, অভিমান, রূপোল্লাস সবই রাধাকৃষ্ণের সমস্ত জীবনের সারবস্তু। এই কাব্যে মনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, দেহের নয়। মাঝে মাঝে কাহিনী আছে বটে, কিন্তু তা কীর্তনীয়াদের সুবিধার জন্য। তাইতো বৈষ্ণবের ভাষায় বলা হয়—“যখন পাই নি, তখন কাঁদি, যখন পাই তখনও কাঁদি; পেয়েও কান্না। না পেয়েও কান্না।”

অপূর্ব রসের অচিন্ত্যনীয় অভিব্যক্তির চরম প্রকাশ এই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণেরই আপন মহিমাময় গুণের রসমাধুরীতে স্ফুট। দার্শনিক বিচারে তাই বলে। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেম বাউল, প্রেমের ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ। এই দেবতা ও মানুষের মধ্যে অনেকখানি

ক’রে যখন মাহাটিকে ধরা গেল না—বাবা খবর দিলেন এক জেলেকে। তাকে দেখিয়েও দিলেন ‘ঐ যে মাহাটা লেজ নাড়ছে, যুত্ব লুছে, জেলে ভাল ফেল্লে কিন্তু কিছু নয়। দু’একটা ছোট পুঁটা মাহ ছাড়া আর কিছুই উঠ্লে না। জেলে চলে গেল, জল শাস্ত হ’লো। মা, আবার তাকিয়ে দেখলেন মাহ সেখানেই তার কোল চেয়ে অপেক্ষা করছে। এমন সময় আসলো তার বোনপো কমল। সে কলেছে বিজ্ঞানের ছাত্র। সেও মাসীর পাশে দাঁড়িয়ে বেশ ক’রে দেখতে থাকলো। আর মাহের আহুপুঙ্কিক সব ঘটনা শুনলো। কিছু সময় পরে খুব হেসে উঠলো। মাসী অর্ধাং বাপীর মাও হাসলেন। তোর আবার কি হ’লো। সব বুঝে হাসলি, কি না বুঝে হাসলি কিছু বুঝলাম না তো। কমল শুধু হাসে! সে হাসতে

হাসতে গিয়ে ঘাটলার উপরেই যে আমগাছটা পুকুরের দিকে ঝুঁকে প’ড়েছে তাতে উঠতে থাকলো! মাসী ভাবলেন কি পাগল! ওটাও কি আমার বাপীর মতই অজ্ঞান নাকি!

মাসী চেয়ে রইলেন। কমল গাছটার উঠে গেল। একেবারে মগডালে চ’ড়ে একটা বাঁশের চটায় জড়িয়ে কি যেন টেনে আনলো এবং নিজের কাপড়ের মধ্যে খুব সাবধানে জড়িয়ে নিয়ে নামলো। মাসী বিস্মিতা হ’য়ে দেখলেন সেই মাহাটা। কমল বুঝিয়ে বললে—মাসী তোমরা যেটা দেখেছিলে ওটা প্রতিচ্ছায়া। এই দেখ মাহাটা ছিল উপরের গাছে ঝোলানো।

বাপী তার মাহাটা পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে গেল!*

* প্রবর্তক সাহিত্য চক্রের অধিবেশনে গঠিত।

ফাঁক। এই ফাঁকটুকু পূর্ণ করার জন্ত অবতারের কল্পনা।
 মাহুয না হলে দেবতার এক মুহূর্তও চলে না। তাই দূর
 হতে দেবতা একদিন বে ভক্তের হাতের চন্দনামূলিগু
 অর্ঘ্যটুকু পেয়ে তুষ্ট হচ্ছিলেন, দেবতার সেই কৃতার্থতার
 মধ্যে মাহুয সঙ্গের নিবিড়তার অভাব তাঁহাকে পীড়া
 দিয়েছিল। তাই তিনি মাহুযবিগ্রহে সাধারণ মাহুযের
 মতই মাহুযের সমাজে আবির্ভূত হলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-
 দেব ও নদীয়ার প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য এই শ্রেণীর
 দেবতা। দৈব অনন্ত, তিনি নিরাকার। তিনি সর্বত্রই
 বিরাজ করছেন। তাঁকে সাকার মূর্তিতে, বিশেষ
 করে সাধারণ মাহুযের মূর্তিতে আমরা পেয়েছি
 শ্রীচৈতন্যের মধ্যে। সমগ্র সৃষ্টির যিনি রাক্ষা, সমগ্র
 সৃষ্টি যার ইন্দ্ৰিতে চলছে, সেই পরমব্রহ্ম রূপ
 গ্রহণ করলেন মাহুযের মধ্যে। সেই মাহুযটি হচ্ছেন
 নবদ্বীপের নিমাই। তাই একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
 বলেছেন—“দেবতাকে প্রেমের জন বলে, দেখেছেন
 বলে বাংলাদেশের সাধকেরা। তাঁদের রচনায় যে
 দরদ দেখিয়েছেন সে দরদ আমরা শাস্ত্রপন্থীদের কাছে
 আশাই করতে পারিনে।”

শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পাবার জন্ত প্রেমবিষ্মল
 হয়েছেন, তিনি যেমন “রাত্তি কৈলাম দিবস, দিবস
 কৈলাম রাত্তি করেছেন”, যেমন সর্বস্বত্যাগী প্রেমসাধনা
 করেছেন, পুরুষপ্রবর শ্রীচৈতন্যও তেমনি প্রেমপাগল
 হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে উদাসিনীভারে
 বিতোর। তাই বৈষ্ণব সাধনার চরম তত্ত্বাহমতে নারীরূপী
 সাধকদের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অতএব বিভিন্ন
 অভিনয়ে দেখি শ্রীচৈতন্য লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করে
 নবদ্বীপে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাই শ্রীচৈতন্য
 রাধাভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীমৎ নিত্যানন্দকে বলেছেন—
 “আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান।” মহাপ্রভুর
 মতে অন্তরের শুদ্ধাভক্তিই যথেষ্ট। মহাপ্রভুর
 অচিন্ত্যভেদাভেদ ও নিত্যব্রন্দাবনলীলা তাঁর আপন
 জিনিষ। অর্থাৎ তিনি ছিলেন প্রেমময়, প্রেমের ধন
 পরমপুরুষ। তাই বিষ্ণু ও লক্ষ্মী আপন আপন ঐশ্বর্যে
 ভিন্ন। ব্রজের রাধাকৃষ্ণ ঐশ্বর্যভাব দূর হয়ে গেল বটে

তবু ব্রজে রাধাকৃষ্ণ যুগল হয়েও ছুই হয়েই রইলেন।
 নবদ্বীপে রাধাভাব নিয়ে কৃষ্ণলীলার রসবজা বইল।
 ছুই সেখানে মিলে এক হয়ে গেল। একের মধ্যে আর
 ডুবে গেল। শ্রীগৌরাঙ্গে রাধাকৃষ্ণ দুই-ই মিলে
 আছেন।” এই রাধার সহিত বিহাররত শ্রীকৃষ্ণকেই
 বৈষ্ণবেরা পূর্ণ ভগবান বলেন। শ্রীকৃষ্ণ অথবা রাধাকৃষ্ণ
 তার নাম। শ্রী এখানে রাধা, শ্রীকৃষ্ণ শুধু কৃষ্ণ নয়।
 ভগবান রসিক, তাই তাঁর পূর্ণ পরিচয় হচ্ছে রাধার দ্বারা
 আলিঙ্গিত কৃষ্ণ। শুধু কৃষ্ণ কেবল ভগবান নয়।
 বৈষ্ণবের মতে সেই “সঙ্কিনী”, “সঙ্কিত” ও “হ্লাদিনী”—
 এই তিন শক্তির শেষ শক্তি আনন্দ অর্থাৎ হ্লাদিনী
 শক্তিই হচ্ছে মুখ্য এবং এই হ্লাদিনী শক্তিই হচ্ছে নারী
 অর্থাৎ রাধা।

অতএব দেখা যায় যে, বৈষ্ণব কবিতা এই সঙ্গীম ও
 অঙ্গীমের বিচিত্র মিলন সন্ধিস্থল। এই সঙ্গীমের মধ্যে
 নরলোকের যত সৌন্দর্য, বাণীকুঞ্জবীথির যত সার কবিত্ব,
 এবং সেই কবিতার যত পুর সব বদলে যায়; যাকে
 পাওয়া জিনিষ মনে করেছি তাও হারিয়ে যায়, যা কিছু
 পরিষ্কার মনে হয়েছিল, তা প্রহেলিকার মত অস্পষ্ট
 হয়ে দাঁড়ায়। তখন প্রগাঢ় আলিঙ্গনেও আলিঙ্গনের
 স্পৃহা মিটে না, শত শত বাসন্তীরজনীর ক্রীড়া-কৌতুকেও
 হৃদয়ের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। জনম অবধি রূপ দেখেও
 রূপের অমৃত তৃষ্ণা মিটে না। এ কি অফুরন্ত রহস্য।
 এই অপার আনন্দসাগরের পরপার দেখা যায় না।

“লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখছ

তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।”

রাগাহুরাগ ও রাগাঙ্ঘিক ভক্তির বিচিত্র ভাবময়
 প্রকাশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাতে। এখানেও নামক
 নামিকার কোন স্থান নেই। স্থান হচ্ছে একান্তভাবে
 আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ব্যাপার। স্তবের কথা আসলেই
 একটা জৈবিক তৃপ্তির কথা আসে। কিন্তু এই বিশ্ব-
 প্রকৃতিকে বৈষ্ণবেরা আনন্দের বিচিত্র রসে সিদ্ধ
 করে রূপ-রস-গন্ধে প্রকাশ করে তুলে ধরেছেন
 আমাদের কাছে। আনন্দ সম্পূর্ণরূপে আত্মার,
 এই আত্মার সাধনার জন্য আনন্দ প্রয়োজন। এই

মুক্তধারা

(সংস্কৃতাহুকল্পম্)

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ., বেদান্ততীর্থ

বহু শতাব্দীর মানব-মনীষার অতি বিস্ময়কর, অত্যাবশ্যকীয় ও সার্থক পরিণতি এই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতা। কিন্তু যন্ত্র যখন যন্ত্রীর শাসন মানে না, সৃষ্টি যখন স্রষ্টার শুভবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয় না তখন সে আঘাত করে বৃহত্তর কল্যাণকে—সার্বজনীন মানবতা-বোধকে। এমনি এক সংঘাতের নাট্যরূপে বিশ্বকবির “মুক্তধারা”—যন্ত্রদানবের নিষ্পেষণে আত্মপ্রাণের শুভ-মুক্তির জয়গান। যান্ত্রিক জীবনের অষ্টোপাশে মাহুষ হারিয়ে ফেলেছে প্রাণের স্ফুর্তি। তার বহির কর্ণকূহরে পৌছোয় না প্রাণের আত্ম আকৃতি। মুক্তধারার অভিজিৎ সেই নিলীয়মান প্রাণশক্তির নব উদ্বোধক। প্রাণের শক্তিতেই সে জীবনকে উৎসর্গ করে ধ্বংস করলো যন্ত্রদানবকে। আত্মত্যাগের যুগকাষ্ঠে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল আত্মবোধের। দরদী কবির এমন একখানি রূপকাক্ষরী, ভাবসমৃদ্ধ ও ধ্বন্যাত্মক সংলাপবহুল নাটকের ভাষান্তর প্রয়াস প্রশংসনীয় হ’লেও নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। বিশেষ ক’রে সে ভাষা যদি এমন একটি ভাষা হয়, যাকে দেশের জনসাধারণ দেবভাষারূপে ভীতি-মিশ্রিত

সম্মত জানিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছে বহু শতাব্দী ধরে, প্রাত্যহিক জীবনের কার্যসূচীতে যার অল্পপ্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ, তবে সে অহুবাদকার্য নিতান্ত দুঃস্বপ্ন বা অবাস্তব বলে মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই একথা মনে রাখা কর্তব্য যে উপনিষদের ভাবধারায় পরিপুষ্ট, বাল্মীকি, বেদব্যাস ও কালিদাসের সাহিত্য সম্পদে সমৃদ্ধ রবীন্দ্র-সাহিত্যের অহুবাদের বাহনরূপে সংস্কৃত ভাষার দাবী সর্বাগ্রগণ্য। কেননা সে ক্ষেত্রে অহুবাদে মূলের সহিত ভাবগত ঐক্য, রূপকল্পনার সাদৃশ্য ও কবির মৌলিকত্ব ও স্বাচ্ছন্দ্য অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার এই অহুবাদ-যোগ্যতা যোগ্য হস্তাবেলপের অপেক্ষা রাখে বৈকি। তবে এই যোগ্যতার পরীক্ষায় বিদগ্ধ অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সপ্রশংসভাবেই ইতঃপূর্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর ‘বার্তা গৃহম্’ রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের সংস্কৃতাহুকল্প সুদীপনাজে সাধুবাদ পেয়েছে, পেয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি। বর্তমান অহুবাদটিও চমৎকার। সহজ এবং স্থূললিত শব্দ চয়ন

আনন্দের উৎস হচ্ছে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি, অর্থাৎ আনন্দ আসে প্রেমে; তাই বৈষ্ণবধর্ম আনন্দময়, প্রেমময়; শ্রীচৈতন্যও তাই প্রেম-পাগল, প্রেমের ঠাকুর। প্রেমের রসে সিক্ত তাই নদীয়াবাসী, বাংলাবাসী। তাই বৈষ্ণবদের ভগবান রসের ঠাকুর,—রসো বৈ সঃ। এই মহাভাবময় বৈষ্ণবকবির মন। বৈকুণ্ঠবোধ সৃষ্টির মূলে এই রাধাকৃষ্ণের লীলা, এই লীলার বিচিত্র প্রকাশই পদাবলী সাহিত্য। শ্রীচৈতন্যের প্রেম আত্মিক প্রেমসাধনার সিদ্ধকল। শ্রীরাধার কান্তিলাভে সমর্থ শ্রীচৈতন্য তাই যুগাভীত চেতনার মিলনস্থল রূপে শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দ্বারা সাধে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য নদের পাগল, পথের পাগল; ধন্ত গোরার নামগান।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রূপের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানা দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না।” এই স্বাভাবিক স্বাধীনতারই এক চরম ও পরম প্রেমময় অভিব্যক্তি ঘটেছে এই পদাবলী সাহিত্যে। বৈষ্ণব-কবিদের কাব্যে কাহ্নর বাঁশীর সুর রাধার মর্মে প্রবেশ করেছে। রাধার কপালের চন্দন ফোটার ছটা কৃষ্ণের মর্মে গিয়ে লেগেছে। কিন্তু দেখা যায় প্রকৃতি সেখানে বিশেষরূপে পটভূমিকা। এই পটভূমিকার উপর ভিত্তি রচনা করেই বৈষ্ণবীয় কবিকুল রাধাকৃষ্ণের পবিত্র প্রেমের এক আধ্যাত্মিক মনোবিকাশের দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন।

এবং যথেষ্ট মূল্যগ্ৰাহকই বোধ হয় ইহার চমৎকারিত্বের কারণ। সর্বাগ্রে যে প্রশ্নটি উপস্থাপিত হতে পারতো, সবশেষে তার অবতারণা করে এবং সম্ভাব্য উত্তর দেবার চেষ্টা করে আলোচনা শেষ করছি। প্রশ্নটি এই—এ অমুখ্যদের কী প্রয়োজন ছিল? এ কথায় এর জবাব বোধ হয়, যা সুন্দর যা মধুময় সবতরুরূপে তারই আশ্বাদন। পদ্ম সুন্দর সরোবরে, গোলাপ সুন্দর শাকানো বাগানে, এতে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু এদেরই যখন দেখি টেবিলের ফুলদানীতে অথবা মালাকারের তৈরী সুবিন্যস্ত ফুলমালায়, তখন কি এরা অসুন্দর? নিশ্চয়ই না। একই সুন্দরকে বিভিন্ন পরিবেশে আশ্বাদন ক’রে মানুষ ভুগ্ন করে তার সৌন্দর্যপিপাসাকে, চরিতার্থ করে তার শিল্পীমনকে। তাই সাহিত্যের অমুখ্যে সাহিত্যিকের ধ্যানাত্মক দূরপ্রসারী করবার সাথে সাথে পুষ্ট করে পাঠকের সাহিত্য-সন্তোষকে। আরো একটি কথা এই যে, একটা জাতির সংস্কৃতি বেঁচে থাকে তার জীবন্ত ঐতিহ্যের ওপরে নির্ভর ক’রে। ভারতের ঐতিহ্য-বিশিষ্ট সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষা, তাই এ ভাষাকে মৃত ভাষা বলে সমাহিত করে রাখলে বহু বিচিত্র সংস্কৃতির মিলন-তীর্থ এই ভারতের সাংস্কৃতিক অপ-মৃত্যুকেই ডেকে আনা হবে। তা ছাড়া, সংস্কৃত ভাষা প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষার জননীস্থানীয়া। আজকের স্বাধীন ভারতে প্রাদেশিকতার ভেদবুদ্ধি যখন জাতীয় সংহতিকে গ্রাস করতে উত্তত, তখন সর্বভারতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনেও সংস্কৃত ভাষার চর্চা হওয়া একান্ত আবশ্যিক এবং এই পবিত্র কর্তব্য পালনের বাহনরূপে বিশ্বকবি কালজয়ী সাহিত্যের সংস্কৃতরূপায়ণ এক যুগোপযোগী বাস্তব পরিকল্পনারূপে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান ভারতে দেবভাষা সংস্কৃতকে সর্বজনবোধগম্য আদরণীয় করবার দুরন্তপ্রয়াসে যারা জীবনপাত করে চলেছেন—অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ তাঁদের অন্যতম। তাঁর এই অমুখ্যে যেমন সংস্কৃত প্রচার এবং ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসারে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ ক’রেছে, তেমনি তাঁর বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য অনন্যসাধারণ অধিকার প্রমাণিত করেছে। বিশেষতঃ অমুখ্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইটি একটি উল্লেখনীয় সার্থক সংযোজন। মূল্যের ভাব, ভাষা এবং রসের বৈশিষ্ট্য ভাষান্তরেও রক্ষা করার দুরূহ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। সাহিত্যরসিক এবং ভারতপ্রেমিক সম্ভ্রমের তিনি যথেষ্ট সাধুবাদের যোগ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে সকল অমুখ্যে হয়েছে, তার মধ্যে বর্তমান অমুখ্যে অনন্যসাধারণ। “প্রাকৃতখনম্” অংশে রবীন্দ্রমানস ও সংস্কৃত নিয়ে তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনাটি অনবদ্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির বিখ্যাত রচনাবলীর আরো সংস্কৃতানুবাদ আমরা অধ্যাপক চক্রবর্তীর কাছে আশা করি। জাতীয় সরকার এই সকল গ্রন্থ প্রকাশে এবং অভিনয়ে অগ্রণী হইলে দেশবাসী সুখী হইবে। ভারতের ভাবগত সংহতি সাধনে অধ্যাপক চক্রবর্তীর এই অমুখ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে।*

* মুক্তধারা-সংস্কৃত অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, সাহিত্য শাস্ত্রী, এম. এ., রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশিকা—শ্রীমতী উষা দেবী চক্রবর্তী এম. এ., বি. টি., ১৩২৫ শরৎ বোধ গার্ডেন রোড] কলিকাতা ৩১। মূল্য ৬ টাকা।



ছেলেধরা

কুমারী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়

[লেখিকা কুমারী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় প্রবর্তক সম্বন্ধে একনিষ্ঠ দীক্ষিত সন্তান শ্রীমনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কল্পা। কুমারী তৃপ্তি বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রী। পিতামাতার সঙ্গে আবাল্য সে বহুবার সম্বন্ধ গিয়াছে ও থাকিয়াছে। সম্ভবিদেহী সম্বন্ধসভাপতি শ্রীনলিনচন্দ্র দত্তের অত্যন্ত স্নেহের পাণ্ডী ছিল তৃপ্তি। শ্রীনলিনচন্দ্র সম্পর্কে তার একটা বাল্যের স্মৃতি অত্যন্ত সহজ স্মৃতিরূপে লেখিকা এখানে আঁকিয়াছে। প্রঃ সঃ]

“বাবা, উনি কে?” “উনি? ছেলেধরা।” বয়স তখন পাঁচ বৎসর হইবে। স্বয়ং প্রবর্তকের সম্বন্ধসভা আমাদের খেলার সাথী। আমরা যেন প্রবর্তকের বাগানের প্রকৃতির মুক্ত বিহঙ্গ। কোন বাধা নিষেধ, নিয়ম কাহ্ন কিছুই যেন আমাদের জন্য নয়। এমন দিনের একটি উৎসবদিনে বাবাকে প্রশ্ন করিয়া আমি ঐ উত্তর পাইয়াছিলাম। বাবার কথাটা বিশ্বাস করিতে পারি নাই, ব্যস্ততার মধ্যে বাবা আমাদের ভুলাইবার জন্য অনেক সময় এমন অনেক কথা বলিতেন। এমন শাস্ত, অভ-সাধারণ, মোটেই ভাব গম্ভীর নয়, এমন একটা মাহুষ কি কখনও ছেলেধরা হইতে পারে? একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিলেন কেউ জ্যাঠা। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম উনি কে? জানিলাম—উনি নলিন জ্যাঠা, সম্বন্ধের সহঃ সভাপতি। তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম “গল্প বলুন।” “কি গল্প শুনবে?” “যা আপনার ভাল লাগে। এই ধরুন দেশের গল্প আপনাদের গল্প।” নানা ধরনের নানা লোক তাঁর কাছে আসিতেছে। নানা প্রশ্ন করিয়া উত্তর শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর তাহারই মধ্যে তিনি আমাকে গল্প বলিয়া চলিয়াছেন। গল্প—তাঁহার ছোটবেলায়, ছাত্র অবস্থায় কি কি করিয়াছেন আর তার জন্য কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে এমন কত কিছু।

এই দিনটি আমার স্মৃতিতে আজও জ্বলজ্বল করিতেছে। এখন বুঝি ষাঁহার বড় হন তাঁরা যেন ছোটদের সঙ্গে মিশিবার সময় ঠিক যেন তাদেরই মত হইতে একটুও অসুবিধা বোধ করেন না, পরে একদিন বাবা ছেলেধরা

কেন বলিলেন জানিবার জন্য বাবাকে পীড়াপীড়ি করিতে বাবা এই মহান জীবনের যে চিত্রটি আমার কাছে খুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা ঐ মহান পুরুষের পদতলে আমার মাথাকে চিরকালের জন্য নত করিয়া রাখিয়াছে। শৈশব হইতেই এঁরা দেশমাতাকে একান্তভাবে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন এবং মায়ের দুঃখ মোচনের জন্য সমস্ত দুঃখ বরণ করিয়া লইতে তাঁরা স্থির সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর এই দলের দলপতি স্বয়ং সম্বন্ধসভা। এই মহান পুরুষ ছোটবেলায় খুব ভাল বাঁশী বাজাইতে পারিতেন। বি. এ. পাশ করিবার পরও বেশ কিছুদিন অবধি তাঁর এ অভ্যাস খুবই ভাল ছিল, তাই সম্বন্ধসভার বাঁশী দেশের ছাত্রদের কাছে পৌঁছিয়া দিবার জন্য হেঁচু বা কলেজ স্কোয়ার প্রভৃতি স্থানের একটি নির্জন কোণে বসিয়া তিনি বাঁশী বাজাইতেন। এই বাঁশী শুনিবার জন্য ছেলেরা তাঁর পাশে ভীড় করিত। তখন তিনি ছেলেদের কাছে তাঁর কথা বলিতেন। এইভাবে ছেলেরা প্রবর্তকে আসিয়া জড় হইত। ছেলেধরা নামের এই ইতিহাস। বাঁশী আজ আর তিনি বাজান না, কিন্তু কেহ আজ যদি তাঁর সঙ্গে আলাপ করে, সে বুঝিবে যে তিনিই আজ বাঁশী হইয়া গিয়াছেন, কাজেই বাঁশীর আর দরকার নাই, একবারের আলাপেই যেন তিনি যে কোনও লোককেই নিজের করিয়া লইতে পারেন, যৌবনের বাঁশীবাদক ছেলেধরা আজ যেন বিনা বাঁশীতেই মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন।

আলোচনা

ভারতের কুটীর-শিল্প

শ্রীরাধাবল্লভ দে

ভারতের কুটীর-শিল্পের বর্তমান সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধান—এই দুইটিরই কিঞ্চিৎ আলোচনা এই প্রবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রথমেই বলিতে হইতেছে যে, ভারতে কুটীর-শিল্পকে যাহারা জীবিকার উপায় হিসাবে গ্রহণ করে, জীবিকার্জন আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মূলধনের স্বল্পতা হেতু প্রতি পদে বাধা প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশের শিল্পীদের অধিকাংশকেই উপাদান সংগ্রহ, বাজার বুঝিয়া নমুনা ঠিক করা, প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করা প্রভৃতি সব কাজ এক জনকেই করিতে হয়। সুতরাং নূতন গবেষণা করিবার তাহার সময় এবং স্থিরতা কোথায়? আর মূলধন স্বল্পতার দরুণ যে কেবল শিল্পীর শক্তি এবং সময়ের অপব্যবহার হয় তাহাই নহে, প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য কিছু কিছু বাজারে বাকী পড়িয়া যায় এবং সেই ক্ষুদ্র কাজ ঘন ঘন বন্ধ হইতে হইতে শেষে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুটীর-শিল্পী মাত্রেই নিজের অবলম্বিত শিল্প ভিন্ন অন্য প্রকারের শিল্প শিক্ষা করিবার অসুযোগ থাকে না। পিতৃ-পিতামহের অবলম্বিত জীবিকা সহায়ে কোন রকমে গ্রামাচ্ছাদনেই তাহারা সঙ্কষ্ট। কোন পরিবর্তন তাহারা চাহে না। সেইজন্য স্বজনীশক্তির উন্মাদনা তাহাদের মোটেই নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ—ভারতের শিক্ষারতনগুলিতে কোন রকম শিল্প শিক্ষার উপর মোটেই জোর দেওয়া হয় না। বালক বালিকারা হাতে-কলমে বিশেষ কিছু শিখিবার সুযোগ পায় না। লোক-সংখ্যার অসুপাতে শিল্প-বিদ্যালয়ের সংখ্যাও খুব কম। সেইজন্য পরিণত বয়সেও কুটীর-শিল্পীদের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং শিল্পে অনভিজ্ঞ। স্বল্প শিক্ষিতেরাও

অগ্রাণু দেশের মত শিল্প সম্বন্ধে পত্রিকা বা পুস্তকের কোন সাহায্য পায় না বলিলেই হয়। সেইজন্য তাহাদের অবলম্বিত শিল্পে তাহারা মামুলী পছা অবলম্বন করে।

এইবার এই সমস্যার সমাধানের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। এই শিক্ষাহীন নিঃসম্মল কুটীর-শিল্পীদের বাঁচাইতে হইলে সমবায় ভিত্তিতে হিতকর প্রতিষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বিভাগ থাকিবে এবং প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র কাজ থাকিবে। একটি বিভাগের কাজ হইবে কুটীর-শিল্পীদিগকে মালমসলা, যন্ত্রপাতি দ্বারা সাহায্য করা এবং কিস্তিতে কিস্তিতে পাওনা টাকা আদায় করা। দ্বিতীয় বিভাগের কাজ হইবে শিল্প সম্বন্ধে লিখিত পুস্তক, পত্রিকা প্রচার করা, উন্নত ধরনের শিল্প-কৌশল হাতে-কলমে অথবা ছায়াচিত্র যোগে শিক্ষা দেওয়া। তৃতীয় বিভাগের কাজ চলন্ত দোকানদের সাহায্যে গৃহস্থের নিকট হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করা এবং প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করা। চতুর্থ বিভাগ—অর্থহীন কুটীর-শিল্পীদের দরকারমত অর্থের সাহায্য করিবে এবং অল্প অল্পে সুবিধামত এ ধরন আদায় করিবে।

এই প্রসঙ্গে আর এক উল্লেখযোগ্য বিষয়—বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পের সহিত কুটীর-শিল্পের সংযোগ। বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র-শিল্প পরস্পরের পরিপূরক হইবে অর্থাৎ একটি অপরের সহায়ক হইবে। কোন শিল্পদ্রব্য প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের সাহায্যে তৈয়ারী হইবে। ক্ষুদ্রশিল্পের আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হইবে। মৃতপ্রায় কুটীর-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

নাগা সমস্যা ও ভারতবর্ষ

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে একটা ছোট্ট রাজ্য—নাগাভূমি। দুর্গম পাহাড় অঞ্চল। হিমালয়ের দেহ থেকে প্রলম্বিত হাতের মতন সুদীর্ঘ নাগা পাহাড় উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। অরণ্য-বুহেলীতে বাঁশ-জলপাই আর সাল-সেগুনের জটলা। বুনো হাতি, চিতাবাঘ আর ময়ালের রাজত্ব। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। মোহন্য বায়ুপ্রভাবে অকুরন্ত বৃষ্টির ধারা নামে যখন তখন পাহাড়ী ঢল থেকে স্রষ্ট হয় ছোট ছোট বরগা—পাখ-পাখালির ডাকের সঙ্গে, বুনো জন্তু জানোয়ারের হাজারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বরগাগুলো অবিরাম নাচতে নাচতে নীচে নামতে থাকে। সবুজে-সোণায় মেশামিশি করে কখনো রৌদ্র-ছায়া খেলা করে।

এখানে এই পাহাড়ী পরিবেশে বাস করে লক্ষ লক্ষ মানুষ। নৃতত্ত্ববিদদের বিচারে তারা আদিম মঙ্গোলিয়ড গোষ্ঠীর মানুষ। আবার কারো কারো মতে এই আরণ্যক মানবগোষ্ঠী নেগ্রিটো-নিগ্রোবটু জনসৌণ্ডের অন্তর্গত, ভাষায় সিনো-টিবেটান-মঙ্গোলীয় ছাপ। বনাঞ্চলে শিকার, পাহাড়ী উপত্যকায় ধানের চাষ এবং আদিম প্রাণায় তাঁত চালনা এদের প্রধান উপজীবিকা।

আদিম কাল থেকে নাগারা দুর্ধর্ষ। নাগা-হিলসের অরণ্য-ছায়ায় প্রায় বোলটা গোষ্ঠী বাস করছে। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। অরণ্যভীত কাল হতে তারা নিজেদের মধ্যে বিবাহে রত। একটা সময় ছিল যখন অগ্র গোষ্ঠীর মানুষের মাথা কেটে নিয়ে আসা নাগা-যুবকদের কাছে মন্ত বড় বীরত্বের কাজ ছিল। গোষ্ঠী-গুলোর মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের একান্ত অভাব ছিল।

নাগাভূমিকে ঘিরে রয়েছে ব্রহ্মদেশ ও ভারতের সীমান্ত। আয়তন প্রায় ছ' হাজার বর্গমাইল। এখানে ওখানে নাগাদের গ্রামগুলো বিক্ষিপ্ত। সর্বত্র দারিদ্র্যের চিহ্ন বর্তমান।

এই পাহাড়ী অঞ্চল পূর্বে ছিল আসামের অহোম রাজাদের অধিকারে। কিন্তু দুর্গম এই পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করে নুমুণ্ড-শিকারী নাগাদের শাসন করবার মতন

ক্ষমতা অহোম রাজাদের ছিল না। বরং নাগারাই মাঝে মাঝে তাঁর ধনুক নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের সমতল অববাহিকায় নেমে আসত। নিরীহ আসামীদের ঘর-দোর জালিয়ে লুণ্ঠপাট করে নিয়ে এবং নির্বিচারে হত্যা করে আবার বনান্তরালে গা-ঢাকা দিত। দুর্বল অহোম রাজারা নাগা সর্দারদের কাছে মাঝে মাঝে নানা রকম উপঢৌকন পাঠিয়ে তাদের অভিযাত্রা বন্ধ করতে চাইতেন। কিন্তু নির্মম নাগারা কোনদিন সম্পূর্ণভাবে বশীভূত হয়নি।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তস্থিত এই বিস্তীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চলটার দিকে ব্রিটিশ শাসকদের নজর পড়লো ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। সমগ্র জায়গাটা জরীপ করা প্রয়োজন। ক্যাপ্টেন জেনকিন লোক-লস্কর নিয়ে মণিপুর থেকে জরীপের কাজ শুরু করবেন। কিন্তু নবাগত এই মানুষদের কার্যকলাপে দেশে নুমুণ্ড-শিকারীরা অস্ত্র হয়ে উঠলো। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ক্যাপ্টেন জেনকিনের লোকজনের উপর চড়াও হতে লাগল। জরীপ সম্পূর্ণ না করেই জেনকিনের দল ফিরে এলেন।

এবার ব্রিটিশ-সরকারের টনক নড়ল। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার সশস্ত্র সেনাদল পাঠাল সমগ্র নাগা হিলস সাম্রাজ্যভুক্ত করার জন্ত। কিন্তু দুর্গম অঞ্চলে সেনা-বাহিনী চালনা করা খুবই শক্ত। তার ওপর নাগারা সামনাসামনি যুদ্ধ এড়িয়ে চলছিল। ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত আরও পাঁচবার অভিযান চালান হল। কিন্তু নাগাদের পাহাড় অঞ্চল ব্রিটিশ বাহিনী অধিকার করতে পারল না। হিংস্র নাগারা পাহাড়ের আরও দুর্গম অঞ্চলে সরে গেল। ব্রিটিশ সরকার তখন সামন্তটিও বেঙ্গ-ক্যাম্প বসিয়ে নাগা-ভূমি শাস্ত করতে চাইল। কিন্তু সেও সাময়িক। সুযোগ বুঝে অভিযানরত নাগারা হাবিলদার বোগটানকে হত্যা করল। বিশাল ব্রিটিশ-বাহিনী ১৮৫০ সালে আবার অভিযান শুরু করল। আতঙ্কিত নাগা নেতা নিলহোলি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সমস্ত নাগা গোষ্ঠীকে একতাবদ্ধ করলেন। নাগাভূমিতে স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্তে হাজার হাজার নাগা-যোদ্ধা সমবেত হল। কামান-বন্দুকের সঙ্গে

তীর ধমকের লড়াই—অসম হলেও বীরত্বের অভাব ছিল না নাগাদের মধ্যে। কোহিমার কাছে খনোমা গ্রামে লড়াই হল। নাগারা পরাজিত হয়ে আরো গভীর জঙ্গলে সরে গেল।

এরপর ব্রিটিশ-বাহিনী নাগাভূমিতে আর কোন অভিযান চালায়নি। তবে আসাম সীমান্ত বরাবর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকত। নাগাদের সঙ্গে ছোট-খাট সংঘর্ষ তাদের প্রায়ই বাধত। সামনাসামনি লড়াই হলে ওরা পরাস্ত হয়ে গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিত। তারপর আবার স্বযোগ পেলেই সমতলভূমিতে নেমে এসে লুণ্ঠপাট চালাত। তাই ওদের অত্যাচারে আসাম, মণিপুর এবং ব্রহ্মদেশ সব সময় শঙ্কিত হয়ে থাকত।

অজ্ঞ প্রভাবে নাগাদের জয় না করতে পারলেও, পাদরীদের সেবার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশরা নাগাদের একটা অংশের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হল। বিগত শতাব্দীর শেষদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে হিংস্র নাগাদের মধ্যে খৃষ্টান পাদরীরা নির্ভয়ে প্রবেশ করেছিল। আদিম জীবনে অভ্যস্ত নাগাদের ধর্মজীবন দৃঢ়ভিত্তিক ছিল না। সুতরাং খুব সহজেই খৃষ্টধর্ম এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। তার উপর পাদরীরা সেবা-পরায়ণ। তারা এ অঞ্চলে যেমন ডাঙনালয় তৈরী করল, তেমনি খুলল ইংরাজী স্কুল আর হাসপাতাল। পাদরীদের চেষ্টায় নাগাভূমিতে নূতন জীবনের সঞ্চার হ'ল। নরমুণ্ড শিকার করার প্রবণতা কমে এল। নাগাভূমির বাইরে যে একটা সভ্য জগৎ আছে—সেই জগতের কথা জানল নাগারা পাদরীদের মাধ্যমে। আর এই পাদরীদের জন্তেই নাগাদের মধ্যে জাতীয় ভাবের কোন উন্মেষ ঘটেনি—তারা ইংরাজ পাদরীদের বন্ধু বলে মনে করত।

ফলে ব্রিটিশ ভারত যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের একটার পর একটা আন্দোলন করেছে তখন সমগ্র নাগাভূমি ভজনাঙ্গে বীণুর মহাবাণী শুনেছে। পাদরীরা তাদের শুনিচ্ছে ইংরাজদের মহাহুতবতার কথা। তাই কোনদিন নাগাদের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠেনি। বরং ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের আন্দোলন নাগারা বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে বিচার করেছে।

১৯২৯ সালে সাইমন কমিশন যখন কোচিমায় পৌঁছাল তখন পাদরীভক্ত নাগাদের সংগঠন নাগা ক্লাব দাবী জানাল যে, তারা আর আসামের একটা জেলা হিসাবে থাকবে না। নাগাভূমিকে ব্রিটিশ-ভারতের অধীন একটা স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এই দাবীর আড়ালে পাদরীদের কঠোর ধ্বনিত হয়ে উঠছিল। কারণ স্বতন্ত্র নাগাভূমির কতৃৎ সরাসরি চলে যাবে পাদরীদের হাতে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে নাগাদের সঙ্গে ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের সংযোগ ঘটল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ-হিন্দ কোজের পরিচয় পেয়ে নাগারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে পারল। শিক্ষিত নাগাদের একটা অংশ বুঝতে পারল যে, ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে নাগা ভূমির স্বাধীনতাও জড়িত। খৃষ্টান পাদরীদের প্রচেষ্টায় নাগা ভূমির অন্ধকার দূর হয়েছে সত্য কথা, কিন্তু পাদরীরা নাগাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী।

যুদ্ধের শেষে ১৯৪০ সালে জাতীয়তাবাদী নাগাদের প্রচেষ্টায় নাগা-হিলস্ ডিস্ট্রিক্ট টাইবাল কাউন্সিল গঠিত হল। পাদরী-ভক্ত নাগা-ক্লাবের প্রত্যাব ক্ষুদ্র হল। এই সংগঠন পরিণত হল নাগা গ্রাশছাল কাউন্সিলে। নাগা-ভূমির স্বাধীনতার দাবীকে বিপথে চালাবার জন্তে ১৯৪৬ সালে ক্যাপল্যাণ্ড-প্রানে বলা হল যে, ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের পাহাড়ী অঞ্চল নিয়ে একটা স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করা হোক। এটা হবে স্বতন্ত্র ব্রিটিশ উপনিবেশ—নিউ ইংল্যান্ড। এই দাবীর পিছনে ছিল কয়েকটা ইংরাজ কোম্পানীর বড়বস্তু। তারা নাগা হিলসের বিস্তীর্ণ জায়গা ইজারা নিয়েছিল। ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রকাশ যে, এ অঞ্চল খনিজ সম্পদে প্রভূত সম্পদশালী।

স্বাধীনতা অর্জনের পর নাগা কাউন্সিল ভারতের শাসনতন্ত্রকে মেনে নিল। শাসনতন্ত্রে বলা হল যে, সমগ্র নাগা হিলস্ আসাম রাজ্যের অধীনস্থ একটা স্বায়ত্ত শাসনশীল জেলায় পরিণত হবে। কিন্তু নাগা কাউন্সিল বীরে বীরে ফিছো ও ভারত-বিরোধী নাগা-নেতারা অধিকার করে বসল এবং তাদের বড়বস্তুর ফলে নাগারা ১৯৫২ সালের নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত করল।

নাগা পাহাড়ের তিনটি অঞ্চলে বৈরী নাগাদের প্রভাব বৈরী। এই তিনটি অঞ্চলে কোন আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইল না।

এর পর থেকেই শুরু হল বৈরী নাগাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ। ভারত-ভুক্ত নাগাদের গ্রাম পুড়িয়ে নাগা কাউন্সিলের ফিজো-বিরোধী নেতা শখরিকে (Sakhrie) হত্যা করে আসামের সমতল ভূমিতে আক্রমণ চালিয়ে বৈরী নেতারা সমগ্র নাগা অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টি করল। কত সরকারী কর্মচারী এদের হাতে লাঞ্চিত হল, গ্রাম-মোড়ল নিহত হল, সেতু ধ্বংস হল। ফিজোর নেতৃত্বে গঠিত হল ফেডারেটেড নাগা গবর্নমেন্ট।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নাগাদের রক্ষার জন্তে ভারতীয় সেনা বাহিনীর অভিযান শুরু হল নাগা অঞ্চলে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারত-ভুক্ত নাগারা ভারতীয় সেনা-বাহিনীকে সাহায্য করতে লাগল। প্রবল ভারতীয় অভিযানের সামনে বৈরী নাগারা দাঁড়াতে পারল না। তারা নাগাভূমির প্রত্যন্ত অংশে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়ল এবং সুযোগ পেলেই বনাস্ত্রাল থেকে ভারতীয় ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাতে লাগল।

নাগাভূমি ছেড়ে ফিজো পূর্ব পাকিস্তানে পালাল এবং সেখান থেকে চলে গেল ইংলণ্ডে। পশ্চিম দুনিয়ার ভারতবিরোধী রাজনীতিকরা এখন ফিজোর সমর্থক। সেখান থেকেই গোপনে নাগাভূমিতে অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্য আসছে। নাগা-সমস্তা ভারত-বিরোধীদের হাতে তুরপের টেকা। এই সমস্তার কথা তুলে তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে হেয় করার চেষ্টা করছে। ইংলণ্ডে নাগাদের সবচেয়ে বড় সমর্থক পাদরী মাইকেল স্কট। কলকাতায় থাকবার সময় এই মাইকেল স্কট নাগাভূমিতে ঘুরতেন। ভারত-বিরোধী নাগাদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট দহরম-মহরম ছিল। তা ছাড়া অনেকের ধারণা যে চাকরী জুড়ে তিনি যে ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেই কোম্পানী নাগাভূমিতে অনেক জমি ইজারা নিয়েছে। বৈরী নাগারা আজ যদি স্বাধীনতার নামে নাগাভূমিকে অবশিষ্ট ভারত থেকে স্বতন্ত্র করতে পারে তা হলে অনায়াসে নাগাভূমি নিউ ইংলণ্ডে পরিণত হবে।

গণতান্ত্রিক ভারত-সরকার যে-পথ অবলম্বন করেছে নাগাভূমির শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্ত সে-পথই একমাত্র পথ। একদিকে বৈরী নাগাদের শক্তি ধ্বংস করা এবং অত্রদিকে শান্তিকামী নাগাদের নিয়ে নাগাভূমিতে সরকার গঠন করা। তাতে যেমন শান্তিকামী ও গণ-তন্ত্রপ্রিয় নাগাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকবে, তেমনি নাগাভূমিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে বৈরী নাগারা জনসমর্থন হারাতে পারে।

নাগাভূমি এখন ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ অঙ্গরাজ্য বিগত ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই অঙ্গরাজ্য ভূমিষ্ঠ হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন শেষ হয়েছে। নাগাভূমির আইনসভার মোট সদস্য সংখ্যা ছ'চল্লিশ। নাগানেতা শিলু আওয়ের নেতৃত্বে নাগাভূমিতে মন্ত্রী-সভাও গঠিত হয়েছে।

এই অঙ্গরাজ্যের মোট লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ সত্তর হাজার। প্রায় আট শ'বার্টাট গ্রামে নাগারা বাস করে। নাগাদের শতকরা আশী ভাগ এখন চাষবাসে অত্যন্ত। কৃষি জমির পরিমাণ প্রায় দু'লক্ষ সত্তর হাজার একর। কিন্তু নাগাভূমির কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় সাত লক্ষ একর। নাগাভূমিতে শান্তি স্থাপিত হ'লে এই বিস্তীর্ণ ভূমিতে চাষবাস করা সম্ভব হবে। সমগ্র নাগাভূমিকে বোলটা উন্নয়ন রকে ভাগ করা হয়েছে। শতকরা উনিশজন নাগা ইংরাজী ভাষা জানে। তাদের মাতৃ-ভাষা সিনো টিবেটান হলেও, ইংরাজী ভাষা এখন নাগাভূমিতে বহুল প্রচারিত। নাগাভূমিতে দু'টো কলেজ এবং প্রায় সাত শ' স্কুল আছে। যাতায়াতের সুবিধার জন্ত প্রায় দু'হাজার মাইল রাস্তা তৈরী হয়েছে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে হাসপাতালের সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি।

নাগাভূমির উত্তরোত্তর উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা বৈরী নাগাদের বিদ্রোহ এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ। সম্প্রতি বৈরী নাগাদের বড় সমর্থক মাইকেল স্কট সংবাদপত্রে বিবৃতি মারফৎ নাগাভূমির অশান্তির জন্ত সব দোষ ভারতের উপর চাপিয়ে দিয়ে শেষে বলেছেন :
...“সেখানকার মানুষ ব্যাকুলভাবে শান্তি ও স্বাভাবিক

গোত্রভিদ ইন্দ্র

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

ইন্দ্রের গোত্রভিদ নাম সম্বন্ধে পুরাণের অভিমত—এক সময় গোত্র অর্থাৎ পর্বতসকলের পাখীদের মত পক্ষ ছিল। তাহারা সেই পক্ষের উপর ভর করিয়া সর্বত্র উড়িয়া বেড়াইত। তাহাদের গমনাগমনের সময়ে পক্ষাঘাতে অনেকের ক্ষতি হইত। দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট এই ক্ষতির সংবাদ পৌঁছিলে, তিনি তাঁর হাতের বজ্রদ্বারা গোত্র-সকলের পক্ষ ভিন্ন করেন তাই তাঁর নাম হয় গোত্রভিদ। কিন্তু গোত্রভিদ ইন্দ্র সম্বন্ধে আধুনিক বেদজ্ঞ ঋষিদের সাধনলব্ধ এবং বিজ্ঞানসম্মত অতিব্যক্তি হইতেছে ইহাই যে, ‘ইন্দ্র আকাশাভিমানী দেবতা। আকাশ শূন্য পদার্থ নহে—ইহা জসরেণু দ্বারা পরিপূর্ণ। জসরেণু অর্থে ধূলিকণিকা নহে—ইহা দীপ্তিশীল রেণু’ অথবা ‘সূর্য্য ডার্য্যা-বিশেষ’ অর্থাৎ সৌরশক্তি। দর্শনযোগ্য ভাষ্যরসঃ বা রশ্মিকণাকেই জসরেণু বলা হয়। এই জসরেণুবহুল আকাশাভিমানী দেবতাই ইন্দ্র। এইজন্তই ক্রতিতে আছে—‘ইন্দ্রময়াভি পুরুষরূপে দ্বৈতে।’ আকাশই ইন্দ্রের মায়াময়ী আর জসরেণু ইন্দ্রের ব্যষ্টি-মায়। হিরণ্য-গর্ভের অংশসম্মত ইন্দ্র যে ভাবে সঙ্কল্প করেন—জসরেণু-রূপে মায়। ঠিক সেইভাবেই প্রবর্তিত হয়। আকাশজ্ঞে বলা হয়—আকাশই সৃষ্টির জননী। আকাশ হইতেই বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ, অপ হইতে পৃথিবী—সৃষ্টির এইরূপ ক্রমে শাস্ত্রে দেওয়া আছে। তাহা হইলেই বোঝা যাইতেছে যে, আকাশে সব রকম রশ্মি-কণিকাই বর্তমান আছে। জননীস্থানীয়া এই আকাশের গুণ যেমন শব্দে তেমনই বায়ু নিত্যধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক

বেদজ্ঞ ঋষিদের মতে বায়ুকে বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া গিয়াছে—তাই রকম বায়ু আকাশে প্রবাহিত হয়। এক স্থিতিশীল অপর গতিশীল। গতিশীল বায়ুরা প্রবাহিত হইতে হইতে মাঝে মাঝে স্থিতিশীল বায়ুদের সহিত আসিয়া মিলিত হয়, তখনই বজ্র ও বিদ্যুতের সৃষ্টি। বজ্র বিদ্যুতের মিলিত মূর্ত্তিই অপ বা অম্বু। ইন্দ্রের প্রেরণাতেই এরা পরিচালিত হয়। প্রদীপের জ্যোতিঃ যেমন প্রদীপের চতুর্দিকে প্রকাশিত হয়, তেমনই অম্বুগত বজ্রের চতুর্দিকে বিদ্যুতের প্রদক্ষিণহেতু বিদ্যুৎকণাটি অম্বুর বা অপের জ্যোতিঃরূপে শোভা পায়। ইন্দ্রই এই সব জ্যোতিঃ-কণাকে ধারণ করিয়া থাকেন। কালে এই সব জ্যোতিঃ-কণা সমস্ত অস্তরীক্ষলোকে ছড়াইয়া পড়িয়া এক বিশাল মেঘের সৃষ্টি করে। এই মেঘকে বেদে “বিশ্বমেঘ” বলা হয়। মেঘ, অদ্রি, বৃজ, পর্বত—“বিশ্বমেঘেরই” এক একটি অংশ। প্রতিটি অংশেরই স্বল্প স্বল্প পার্থক্য আছে, তথাপি সকলে মিলিয়া অস্তরীক্ষলোকে এক ভীষণ চাপের সৃষ্টি করে। আকাশাভিমানী দেবতা ইন্দ্র ওই চাপের দ্বারা ক্লিষ্ট হইলেও নিস্তেজ হন না; বরং তাঁর উত্তেজনা অধিকতর প্রবল হয়—যাহার ফলে তিনি বজ্র নিক্ষেপ করেন ঐ বিশ্বমেঘের উপর। বজ্রাঘাতে বিশ্বমেঘ বিগলিত হইয়া অপ-রূপে প্রবল বর্ষণে পৃথিবী ও প্রজা সৃষ্টির কারণ হয়।

ইন্দ্রের গোত্রভিদ নাম হওয়ার ইহাই বৈদিক বাখ্যা। আধুনিক প্রথম বেদজ্ঞ ঋষিদের ইহা শুধু জ্ঞানকৃত অতিব্যক্তি নহে, ইহা ধ্যানলব্ধ সত্যদর্শনও।

জীবনযাত্রা ফিরে পেতে চাইছে” (কম্পাস ২৪শ সংখ্যা)। ভারত সরকারও নাগাভূমিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে বন্ধপরিকর। বৈরী নাগা-নেতার। যদি তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং অস্ত্রসংবরণ করে আত্ম-সমর্পণে রাজী হয় তবেই তা সম্ভব। কিন্তু বিদেশী

উদ্ধানীদাতারা আজ নাগাভূমিতে শান্তি-রচনার পথে প্রধান শত্রু। সুতরাং এই বাধা দূচিয়ে দেশপ্রেমিক নাগাদের মিয়ে গঠিত নাগা মন্ত্রিসভার শক্তি বৃদ্ধি করতে পারলে বৈরী নাগারা জনসমর্পণ হারাতে বাধ্য হবে।



ভারত-জাতীয়তার সাংগঠনিক ভিত্তি :

১৯৬১ সালে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী বর্ষে ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ জার্মানীর ষ্টাটগার্টে ইন্সো-জার্মাণ সোসাইটিতে “রবীন্দ্রনাথ ও ঈশ্বর উপলব্ধি” (Tagore and the realisation of God) বিষয়টির উপর বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সারমর্ম জার্মাণ প্রহকার জে. এম. হার্ড তাঁর ‘ইণ্ডিয়া টুমরো’ (India Tomorrow) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ শুধু করেন নাই, ইহাই মানবজাতির আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের মর্ম কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ বলিয়াছেন : “I am Indian in spirit, but my India is not a geographical entity. It is a spiritual personality.” এবং এই “spiritual personality is unbounded by seas and frontiers.” কিন্তু এই নির্বিশেষ আত্মিক ব্যক্তিত্ব যে আকাশকুসুম নহে, ভূমা যে ভূমির সম্পর্কবিহীন নহে, নির্বিশেষ তবু যে বিশেষ দেশ জাতি সভ্যতার আধার আশ্রয়েই প্রকাশ পায়, এ কথাও তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। জার্মাণ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া চমৎকার ভাষায় ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ বিষয়টি ব্যক্ত করিয়াছেন : “You must have your roots in the ground in which you are born, from which you are bred and open yourselves to all the winds that blow and make your spirit universal in its character. Emancipation from the bondage to the soil is not real freedom for the tree ; so also emancipation from the roots of your civilisation cannot give rise to true freedom so far as your culture is concerned.”

ভাবে ও ভাবনার মাহুব বিশ্বচেতনার সঙ্গে একাত্ম হইতে পারে, বস্তুতঃ তার প্রকাশটি সীমিত আধার আশ্রয়ের মাধ্যমে হইতেই হইবে। বিশ্বে ব্যষ্টির ক্ষেত্রে যুগে যুগে এমন ভৌম বিকাশের দৃষ্টান্ত মিলে, কিন্তু ভারত ভিন্ন কোন কালে আর কোথাও একটা সমগ্র জাতিকে এই বৃহত্তর চেতনার উদ্ভীত তথা বিশ্বমৈত্রী বোধে উদ্ভুদ্ধ

করার আহুকূল্যে বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণের নজীর নাই। অত্যন্ত স্বঃখের কথা, শত-শত বৎসরের পরাধীনতার আনলে যাহা হয় নাই, মাত্র সতর বৎসরের স্বাধীন ভারতে তাহাই ঘটিতে চলিয়াছে। সুপ্রাচীন কালের ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ সাধনা, ভাবনা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবনবোধ ও জীবনের মূল্যায়ণের মান বিসর্জিতপ্রায় বলা যায়। অজ্ঞতা হইলে নৈরাশ্রের কারণ ছিল না। অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, উপেক্ষার সঙ্গে অন্ধ পরাস্থকরণতা ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে যে পরাজয় আনিয়াছে তাহাই আজকের জাতি-সংগঠনের ক্ষেত্রে শোচনীয় ট্রাজেডি। ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এ অনেকটা মাটি হইতে বিচ্ছিন্ন-মূল বৃক্ষের মুক্তির মতই আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষ আত্মসংগঠনের নামে আত্ম-হত্যা করিতে বসিয়াছে। কিন্তু এ উন্ন্যাসগামী মানসের পরাশ্রয়ী প্রবৃত্তি রোষিবে কে এবং কোন্ ভিত্তিতে ?

বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় ভারত যখন পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তখন স্বামী বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বিশ্ব জয়ের। স্বামীজিরই কথা— “আমরা ধর্মবলে অধিকার করিব, জয় করিব—“নান্দ পন্থা বিদ্যতেহনায় ।”...এখন এই মন্ত্র—ইংলণ্ড বিজয়, ইউরোপ বিজয়, আমেরিকা বিজয়—তাইতেই দেশের কল্যাণ।” ধর্মই ভারতীয় জীবনধারাকে সহস্র সহস্র বৎসর সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। ধর্মই ছিল ভারতীয় জীবন-বিকাশের মৌল ভিত্তি। কিন্তু আজকের আমাদের বাস্তব পরিণতি দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ধর্ম আমাদের অক্ষয়ের বাঁচার মত বাঁচাইলেও, উচ্চ শিরে বিশ্বের সর্বস্বয় অভি-বাদন আহ্বান করার মত বীর্য-বিক্রম দিতে পারে নাই। নিশ্চয়ই তবে ধর্ম ধারণায় ও সাধনায় কোথাও না কোথাও ক্রটি রহিয়া গিয়াছে।

একদা বিশ্বতপ্রায় অতীতে এই ভারতই সারা পৃথিবীতে সার্বভৌম সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। পরবর্তীকালে এই ভারত হইতে আলোকদূত সারা বিশ্বের সর্ব প্রান্ত-প্রত্যন্তে বিচরণ করিলেও তার সার্ব-ভৌমত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই। শুধু বহির্বিবেশ নয়, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও ভারত বহুদা বিভক্ত হইয়া পড়ে। ঐতিহাসিক কোন যুগেই অথবা ঐক্যে ভারত বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। বর্তমান

চীনেরই এক পূর্বপুরুষ চেন্সিও ষাঁ মুষ্টিমেয় অশুচরসহ ঢাল-তলোয়ারের সাহায্যে কত নদী-কান্তার-পর্বত-প্রান্তর পার হইয়া ভারতের জনপদ দলিত-মখিত করিয়াছে, কিন্তু এদেশের জনগণ সমষ্টিগত ভাবে বাধা দিতে পারে নাই। শক হুন মোঘল পাঠান ইংরাজ সম্পর্কেও সেই কথাই খাটে। ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী। বিশ্বগগনে আলোকদিশারী হইয়া চিরদিন ভারত বিরাজমান। কিন্তু ধর্মের বীৰ্য্য-বিক্রম ভারত দেখাইতে পারে নাই। অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে, এত বৈদেশিক আক্রমণের তরঙ্গ-অভি-ঘাতেও ভারতীয় জনগণের ব্যাপক ধর্মপ্রাণতা তাকে রক্ষা করিয়াছে, তার কৃষ্টি সভ্যতাকে বিনষ্ট হইতে দেয় নাই।

এই রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক পরাজয়ের হেতু কি? ভারতের ধর্মপ্রাণতার মাঝে নিশ্চয়ই কোথাও অপূর্ণতা আছে। নিশ্চয়ই ধর্মের সর্বাঙ্গীন স্ফুর্তি ঘটে নাই। ঘটে নাই বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রাণের প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ শ্রীমতিলাল ভারত-ধর্মের এই অপূর্ণতার চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রবর্তক সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়া তিনি এই শুদ্ধ প্রাণের সাধনারই ইঙ্গিত দিয়াছেন: “ভারতের জ্ঞান আছে, হৃদয় আছে, নাই প্রাণ। ধর্মজ্ঞান থাকলেই প্রাণ জাগে না। প্রাণের চাই অহুশীলন। উপনিষদ, বেদ, যোগ এসব দেবার নাই—ভারতীয় ভাঙার পরিপূর্ণ অতীতের দানে। যদি জাগাতে পার এই প্রাণ—নূতন দান ভোমার মহোৎসবে গৃহীত হবে—চতুর্দিকে জয়ধ্বনি উঠবে। জাগো জাগো বললেই কি প্রাণ জাগে। ঘুমন্ত মানুষকে জাগাবার বেদ পুরাণ বিজ্ঞান অস্ত্র কিছু নয়। কেবল তার কাণের কাছে চীৎকার করা—তার ঝুটি ধরে টান দেওয়া উদ্ভিষ্ট জাগ্রত। এই কাজ যে করে তারও অসাধারণ প্রাণশক্তি। এই অসাধারণ প্রাণের মানুষই আজ প্রয়োজন।”

বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সম্ভবতঃ এই প্রাণ-জাগানোর অসাধারণ মানুষকে একত্রিত ও একই লক্ষ্যে একাত্ম করিয়া প্রবর্তক-সম্ভব সংগঠনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহার অর্ধ শতাব্দী পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের নামে জাতির প্রাণহীনতা লক্ষ্য করিয়া বড় ধ্বংস

মন্তব্য করিয়াছিলেন: “There is too much talk, talk, talk, we are great! We are great! Nonsense. We are imbeciles, that is what we are!” জাতির এই নপুংসকতা দূর করিয়া প্রাণের আগরণ আনার জন্যই স্বামীজির প্রেরণাবাহী: “Death is better than a vegetating ignorant life; it is better to die on the battle field than to live a life of defeat.” ধর্ম জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে ধর্ম বিলাসের পর্য্যায়ে পরিণত হইয়াছে। সম্ভবতঃ স্বামীজিরই কথা: “ধর্ম জ্ঞান নয়, কর্ম নয়—অহুষ্ঠান নয়, ধর্ম জীবন। সমস্ত জীবন যদি ধর্মের না হয়, ধর্মের যে কি অমৃতময় আশ্বাদ তা কোনদিন উপলব্ধি হবে না।” ধর্মের ইহাই বলিষ্ঠ এবং সত্যকার সংজ্ঞা। এই ধর্ম-ধারণা হইতে বিচ্যুতিই আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ধর্মকে করিয়াছে পচনশীল ও বীৰ্য্যহীন।

বাংলা দেশে বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এমনি ধর্মভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জীবন গঠনের একটা সক্রিয় প্রয়াস চলিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রবক্তা। বিংশ শতাব্দীর অগ্নিবিল্ব ইহার ফলশ্রুতি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথায় “বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা।” নেতাজীর মধ্যেও এই প্রাণময় ধর্মভিত্তিক জাতি-গঠনের ইঙ্গিত মিলে।

বাঙালীর এই প্রাণিক শক্তি-সাধনার ক্রমবিকাশ ব্যাহত হইয়াছে গান্ধীযুগে রাজনীতিক প্রয়োজনে। প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, কিন্তু মোহ কাটে নাই। স্বাধীনতা-উত্তর মাত্র সত্তর বৎসরে অবিরাম দুর্বলের শাস্তির বুলি গোটা জাতির চিত্ত-মনে আফিণ্ডের নেশা ধরাইয়াছে। প্রাণের বীৰ্য্য স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। এত বড় একটা দেশ ও জাতি আনুষ্ঠানিক তিক্তকে পরিণত। অন্নবস্ত্রের হাহাকারে জনগণ দিশাহারা। স্বয়ং সমৃদ্ধ হইয়া যে জাতি আবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী না হইতে পারে, সেই জাতির ভবিষ্যৎ কখনও সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ হইতে পারে না। সবচেয়ে বড়

অভিশাপ এই যে, স্বাধীনতা পাইয়া পরাম্ভকরণের বহুদৈবের মধ্যে আমরা ভাবময় ভারতবর্ষকে পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি যাহাই যুগে যুগে শত বৈদেশিক আক্রমণ ও পরাধীনতার মধ্যেও আশ্রয়স্থান হইয়াছে। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের কথা “Emancipation from the roots of your civilisation cannot give rise to true freedom.” স্বকীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার নোঙর-বিচ্ছিন্ন হইয়া আজকের ভারত স্থিতিস্থাপক বিনষ্টের পথে। জীবন বিকাশের বিচিত্র ধারা—শিক্ষা, সমাজ, অর্থ, রাষ্ট্র, সব কিছুকেই আমরা নির্মিতার পরাম্ভকরণে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছি। যাহা লাভ হইয়াছে তাহা হইতেছে দুর্বলের নিষ্ফল আশ্রয়, শূন্যগর্ভ তরঙ্গ, আর ঘরে-বাহিরে অভাব অনটন অশান্তি। শান্তি শান্তি করিয়া গলাবাজি করিলেই শান্তি আসে না। শান্তি শক্তি ও শক্তিমানের সাধনার ফল।

চীন আণবিক বোমা ফাটাইয়াছে। ভারত রামধুন ও বৃন্দাবন-লীলা গান করিয়া আর অহিংসা ও শান্তির বাণী আওড়াইয়া আসার মাত করিতেছে। নেহেরু-মুগের হিন্দী-চিনী ভাই-ভাই যদি আজও বজায় থাকিত তাহা হইলে চীনের এই বোমা-ফাটানোর হয়তো আমরা গর্কই অমুভব করিতাম! অস্ত্রাস্ত্র আফ্রো-এসিয়াবাসীর অবচেতনে যে এইরূপ মনোভাব নাই তাহাও হলফ করিয়া বলা যায় না। বিগত কালের কালা আদমীর সম্বন্ধে খেতাজ অতি মানুষের অশ্রদ্ধে ধারণার উপর এই ঘটনা আর একটি রক্ত আঘাত হানিয়াছে। মাত্র ষোল বৎসরের স্বাধীন সংহত চীন, আফ্রিকা-এর নেশা কাটাইয়া সারা বিশ্বের প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া সে শক্তি ও সংকল্পের পরিচয় দিয়াছে তাহা অবজ্ঞা তুষ্টি মারিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এই যে, শক্তির সাম্য একমাত্র ঐক্যবদ্ধ শক্তির দ্বারাই হইতে পারে। এই অভিজ্ঞতা উদাসীন হইলে রাষ্ট্রীয় ভারতের অতীত ইতিহাসেবই পুনরাবৃত্তি হইবে। আধুনিক কালসম্মত শক্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠাই আজকের দিনের বড় প্রয়োজন। এই প্রাণশক্তির উদ্বোধন জৈব-প্রবৃত্তিরই মাত্র চরিতার্থতার স্তম্ভ নহে। বিশ্ব-সমস্তার সমাধানের

পথে কল্যাণ-দীপ পুনশ্চ জ্বলিবে ভারতের শুদ্ধ ভৌম-প্রাণের জাগরণ।

ধারণ করার কার্য্যকারণ লক্ষণে ধর্ম, প্রেম, প্রাণ একার্থবাচক। সুতরাং ধর্মই হইতেছে ভারত-জাতীয়তার ভিত্তি, ইহাতে উন্নাসিকতা অস্তিত্বই পরিচায়ক। সম্ভ্রান্ত শ্রীমতিলালের সংজ্ঞায় ‘ধর্মই জীবন এবং জীবনই ধর্ম’। স্বামীজির কথা, “ধর্ম যদি মানুষের সর্বাবস্থায় তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা কতকগুলি ব্যক্তির মতবাদ মাত্র।” জীবন-বিচ্ছিন্ন আজকের ধর্ম তাই অধর্মেরই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই জাতির আজকের এই বিপর্য্য। ভারতজাতীয়তার সাংগঠনিক ভিত্তি যে ধর্ম সেই ধর্ম সম্বন্ধে সম্ভ্রান্ত শ্রীমতিলালের ভাষায় তাঁরই স্পষ্ট প্রবর্তক সম্বন্ধে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন : “কে স্বীকার করবে ভীষণতা, পরমুখাপেক্ষিতা, ঘোরতর তামসিকতাকে ধর্ম বলে? ধর্মের নাম মুখে এনো না বতর্কণ না ধর্মের বিগ্রহ হও। ধর্মহীন জীবন অক্ষম পশু—এমন অক্ষমের মুখে ধর্মপ্রচার হয় বলেই ধর্মের অপমান, ধর্মের প্রয়োজন বিশ্ববাসী অস্বীকার করে। প্রমাণ কর ধর্মের প্রাণ আছে, ধর্মের বৈজ্ঞানিক শক্তি আছে। ধর্মপ্রাণ অসাধারণ। ধর্মের সেই শাশ্বত মূর্তি তুমি। তুমি নিজে অলস, অসংযমী, পরলীকাতর, স্বার্থাঙ্গ—মহাপুরুষদের চরিত-চর্কণ বচন উচ্চারণ করে ধর্মের মহামন্ত্র কেমন করে রক্ষা করবে? ধর্মকে মূর্ত্ত করতে হবে জীবনে। ধর্ম আচার-বিচার নয়, ধর্ম জীবন, ধর্ম সমস্ত আবু আশ্রয় করে মূর্ত্তি নেয়। ধর্মের পরশমণির স্পর্শই এই মহাজাতির মুক্তি ও পরিত্রাণ।”

এই জীবনধর্ম সাম্প্রদায়িকতা নহে, ইহা সার্ব-ভৌম ও সার্বজনীন। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে স্বামীজির কণ্ঠে এই ধর্মভিত্তিক জাতিগঠনের যে কলঙ্কজন উঠে তাহাই বর্তমান শতকের মধ্যাহ্নে মুখর ও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে দেখি সম্ভ্রান্ত শ্রীমতিলালের বাণী ও কণ্ঠে। ভারতাস্থার এই মৌলিক আত্মবিকাশ রুদ্ধ হইবার নহে। নানা আবর্তন-বাবর্তনের মধ্য দিয়া এই পুণ্য ভারতভূমির

শনিবারের বৈঠক

ইন্দু গুপ্ত

শনিবারের বারবেলা বৈঠকে নিম্নমিত ষাঁরা যোগ দেন তাঁদের মধ্যে আছেন ভবতোষ মহলানবীশ, বিনতা স্রীমানী আর যজ্ঞেশ্বর ভৌমিক। এঁরা ছাড়া আরো ষাঁরা প্রায়ই আসেন তাঁদের মধ্যে রত্নেশ্বর সাম্র্যাল ও প্রিয়া চৌধুরী অন্ততম।

এই বৈঠকে আলোচনার বিষয় বলে কিছু নেই। সাহিত্য, সমাজ, অর্থ, ধর্ম, দর্শন কোন কিছুই বাদ যায় না। ভবতোষ বলেন শনিবারের বারবেলা বার বার আসে। সীমিত হয়েও সে সীমার গন্তীকে আঁকড়ে ধরে থাকে না। তাকে বিছৃত করে দেয়ই। এই ব্যাপকতাই এর বৈশিষ্ট্য।

বিনতা ষাড় নেড়ে সায় দেয়। প্রিয়া চৌধুরী পরম পরিতোষের সঙ্গে উপভোগ করেন। বলেন, তা যা বলেছেন ভবতোষবাবু, সীমার গন্তীকে কেইবা আমরা ধরে রেখেছি বলুন।

সত্যিই তো! রত্নেশ্বর সাম্র্যাল আবেগ কণ্ঠে বলেন, এই দেখুন না—বাক্সেরে চাল নেই কিন্তু চাল কি কম্ছে। বেচাল হবার জো কি আছে।

যজ্ঞেশ্বর ভৌমিক এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হয় তো বা মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার খসড়া রচনা করছিলেন। তিনি জলদগন্তীর স্বরে বলেন, শুধু চাল? তেলও নেই। কিন্তু তেল দিয়ে দেখুন প্রচুর তেল বাড়ীতে এসে যাবে।

ভয় এবং ভাবনা এ দুটোই দুমুখো সাপ এক মুখ চেপে যদি ধরেন অস্ত্র মুখের ছোবল পড়বে নির্খাত। দুটো মুখই যদি চেপে ধরেন আপনার দফা ইতি। কেননা তখন আপনি গীতার সেই নিকাম পুরুষ। চালও নেই, তেলও নেই। তা হলে থাকলো কি?

পূর্ণাঙ্গ ভাগবত জীবন-প্রকাশের স্বপ্ন সফল হইবেই। আজিকার সাময়িক বিদ্রোহ ও বিকৃতিতে তাই আমরা নিরাশ নহি। স্বামীজিরই ভবিষ্যদ্বাণী: “আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি—ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া বর্তমানের বিবাদ-

বিনতা চীৎকার করে ওঠে, কচু।

ঠিক বলেছেন তা হলে—থাকলো কচু অর্থাৎ কিনা ক আর চু—কালি আর চুণ।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন কবি উদয়ভানু। একটা সরল রেখা টানলে যেমনটি হয় তেমনি ঝঞ্ঝু তাঁর দেহখানি। চুলগুলো অবিভক্ত—চোখ দুটো উদ্ভাস্ত—অনেকখানি কোটরগত। গলার স্বর স্থির নয়।

বিনতা দেবী প্রিয়া চৌধুরীর গায়ে চিমটি কাটলেন, প্রিয়া চৌধুরী অজুতভাবে চোখটার একটা মূদ্রা দেখালেন।

এই যে আপনিও এসেছেন।

কেন আমার আসতে মানা নাকি!

না না, সেকি বলছেন! আপনার অহুপ্রেরণাতেই তো আমার খড়কুটো।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন কবি উদয়ভানু একখানি কবিতার বই লিখেছেন। বইখানার নাম খড়কুটো। সাধারণ লোকে তাই উদয়ভানুকে দেখলেই বলেন—এইরে সেই খড়কুটো। খড়কুটো-খ্যাত উদয়ভানু কিন্তু ভ্রক্ষেপ করেন না। তাঁর ধারণা এই একখানি বই-ই একদিন তাঁকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করে তুলবে।

বিনতা দেবী কবিকে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাড়ীতে। চা এবং প্রচুর জলখাবার থাইয়েছিলেন এবং একটা ছোটখাটো সম্বর্ধনা সভার আয়োজনও করে-ছিলেন। কবির খড়কুটো যে একদিন সাহিত্য সংসারে সমাদর পাবে সে কথা জোর দিয়েই বলেছিলেন। কিন্তু এ কথাও বলতে ভোলেন নি যে, সাহিত্য সংসারে সেদিন এই নিকোঁধ মানুষ নামধেয় অর্ক্যাতীনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবেই এবং ঘোড়া গরু ছাগল ইত্যাদি পশুরা বিবর্তনের

বিশৃঙ্খলা, ভেদপূর্বক মহামহিমময় ও অপরাধেয় শক্তিতে আগিয়া উঠিতেছেন।”

সত্যাকার ভারত জাতির সাংগঠনিক ইঙ্গিত এই বিবেকবানীর মধ্যেই নিহিত। ইহারই প্রতি আমরা উদীয়মান তরুণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ধাপ ধরে কাব্যরসিক হবে উঠবে। ওরা হয়ত কবিকে সেদিন নোবেল প্রাইজ দেবার প্রস্তাবটি বিবেচনা করবে।

উদয়ভানু বলেছিলেন—আমার খড়কুটোর এই সমাদর সম্ভাবনায় আমি পুলকিত। অতএব বিনতা দেবীকে আমার অন্তরের অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কিন্তু—

বিনতা দেবী ঠোট ঝটালেন।

উদয়ভানুর সরল রেখাটা হঠাৎ বেঁকে গেল। নব্বই ডিগ্রির এক সমকোণে রূপান্তরিত হতে দেখে প্রিয়া চৌধুরী হাতভালি দিয়ে উঠলেন।

একটা পোজ।

প্রিয়া চৌধুরীর হাত আছে। স্বেচ আঁকবেন নিশ্চয়ই। ওদিকে কবির অবস্থা শোচনীয়। কাদো কাদো মুখ-চোখ, কি যেন বুঝেছেন তিনি।

বল্লেন বিনতা দেবী—মাইভঃ। এবার আমার ‘জাবর’ বইখানা আপনাকেই উৎসর্গ করবো দেখবেন।

চিহ্নটা হঠাৎই মনে পড়লো বিনতার। প্রিয়ার চোখ

জলতে লাগলো। কবি বল্লেন, সভাসদগণ অবহিত হোন। আমি আমার নব রচনা চাল-চুলো এবং চুলোচুলি থেকে কয়েকটা কবিতা আপনাদিগকে পড়ে শোনাব।

সাধু সাধু।

কবি কবিতা নিয়ে পড়লেন।

চমৎকার।

সমস্বরে ধ্বনি উঠলো।

হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করলেন গৃহকর্তী স্বয়ং। ভয়ংকরী মূর্তিতে।

ব্যাপার কি?

কবিতা।

সে আবার কি? গৃহিণী ব্যাখ্যা করলেন ছেলেরা কবিতা লিখেছে।

সেকি! গৃহকর্তী বিচলিত হলেন।

শনিবারের বারবেলা আবার বুঝি, ফিরে এলো। মন্তব্য করলেন ভবতোষবাবু।

বক্রেশ্বর মহাপীঠ

ত্রিশীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর ধাম যেমন শৈব্য তথা ভক্ত-জনের প্রিয়তীর্থ, তেমনি শাক্ত বা কোলাচারিগণের নিকটও একটি মহাতীর্থ। কারণ, ইহা দেবীর একম পীঠের মধ্যে একটি জাগ্রত মহাপীঠ। এখানে দেবীর অদ্বৈতকালে ভ্রমুগল পতিত হইয়া একটি মহাপীঠরূপে তজ্জে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহিষমর্দিনী এবং তাঁহার ভৈরব বক্রেশ্বর শিব।

সেই অবগাতীতকাল হইতে এই মহাপীঠ কোলাচারী সাধকদের দুর্য্যাক বেগে আকর্ষণ করিয়াছে। মহামুনি পরম কোলাবধূত অষ্টবক্রমুনি এখানে সাধনার জন্ত আগমন করেন এবং তত্ত্ব সাধনা করিয়া সিদ্ধ হন। এই আত্মকাম মহামানবের পরশে সহসা জাগিয়া ওঠে যুগ যুগান্তরের বক্রেশ্বর মহাপীঠ—যাঁর সদা জাগ্রত ভৈরব হলেন বক্রেশ্বর নাথ।

অষ্টবক্র মুনির পর বহু সাধক, অনেক কোলাচারী এখানে সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। কালে-কালে বক্রেশ্বর ধামের মাহাত্ম্য-মহিমা দেশ-দেশান্তরে বিস্তার লাভ করে।

এই মহাপীঠের মহাদেবী মহিষমর্দিনী প্রস্তরনির্মিতা বহু প্রাচীন মূর্তি। পরম নিষ্ঠার সহিত এই দেবী তন্ত্রাচারে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। বিশেষ অমাবস্তার মহা-নিশায় মহামায়ার মহাপূজা মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেবীর প্রস্তরীভূত ভ্রমুগলও এই সঙ্গে পূজিত হন। দলে দলে ভক্ত আসেন বক্রেশ্বর দেবাদিদেবকে পূজা দিতে।

প্রতি বৎসর দেবীপক্ষের শারদীয়া তিথিতে বহু আড়ম্বরে দেবী মহিষমর্দিনীর চারিদিনব্যাপী মহাপূজা হইয়া থাকে। বক্রেশ্বর এবং তাহার আসপাশ অঞ্চলে আনন্দের হাট বসে বাষ এই উপলক্ষে। এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর মেলা বসে। বহু দূর দূরান্তর হইতে গৃহী-সাধক-ভক্ত, ভ্রমণবিলাসীর সমাগম হয় এই মেলায়। বক্রেশ্বর মহাপীঠের উচ্চ প্রস্তবণও এখানকার অত্যন্ত আকর্ষণ। এই উচ্চ প্রস্তবণের জল পরম বলকারক এবং বহু ছুরারোগ্য ব্যাধির মহৌষধ। দশমী পূজান্তে মেলাও শেষ হয়। তীর্থযাত্রীরা সব ফিরিয়া যান, কিন্তু জাগ্রত প্রহরায় নিযুক্ত থাকেন ভৈরব বক্রনাথ।

সংখ্যা

পত্রালী—লেখক : অতুল্য ঘোষ। প্রকাশক :
সুহৃদ দত্ত। 'নবজীবন', ১০ ক্লাইড রো, কলিঃ-১।
মূল্য ২'৫০ পং।

শ্রীঅতুল্য ঘোষের লেখকসত্তার পরিচয় ও অন্তরঙ্গ সত্তার পরিচয়
'পত্রালী'র পত্রগুচ্ছের মধ্যে পাওয়া যায়। চিঠিগুলি অতুল্যাব্য
লিখেছেন তাঁর ভাইয়ের কাছে। চিঠিগুলির ঠাইল ৮জওহরলাল নেহরুর
কম্পা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে লেখা বিখ্যাত চিঠিগুলির কথা স্মরণ করিয়ে
দেয়। চিঠিগুলিতে কখনো কোন জাতিগত কথা, কখনো কোন
ব্যক্তি-বিশেষের কথা, কখনো বা কোন মতবাদের কথা স্থান পেয়েছে।
কয়েকটি চিঠি কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্যবহুল হয়ে পড়েছে। ববীন্দ্রনাথের
আঁকা আত্মপ্রতিকৃতি, নন্দলাল বসুর আঁকা 'শান্তিনিকেতন মধ্যাহ্ন',
অজিত গুপ্তের আঁকা দক্ষিণেশ্বর ও বিষ্ণুপুরের জোড়া বাংলা মন্দিরের
ছবি পত্রালীর মূল্য ও শোভা বৃদ্ধি করেছে। অতুল্যাব্যর সাবলীল
লেখার গুণে বইটি পড়তে ভালই লাগে। অজিত গুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদটি
অতি সুলভ। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

এক বতি দুই ছন্দ (উপভাস)—লেখক : মণি দাস।
প্রকাশিকা : শ্রীদীপ্তি দাস। বারুইপাড়া, হুগলী। মূল্য
আড়াই টাকা।

লেখক মণি দাস তাঁর উপস্থানের কাহিনী নির্বাচনে শরৎচন্দ্রকেই
অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এ যুগের লেখক তিনি—তাই
আধুনিকতার ছোঁয়াচ আছে এই উপস্থাসটিতে। শরৎচন্দ্রের 'পদ্মী
সমাজের' অন্ততম অংশ রমা ও রমেশের প্রণয়-কাহিনী। 'এক
বতি দুই ছন্দ'—এরও এক অংশ আছে বিধবা সরলা ও সিদ্ধেশ্বরের
ভালবাসার কাহিনী। সরলা আর সিদ্ধেশ্বরের জীবনে রমা আর
রমেশের পরিণাম ঘটেনি; মিলনে তাদের প্রণয় বার্থ্য হয়েছে।
সরলাকে পাঠকের ভাল লাগবে। এক বতি দুই ছন্দের কাহিনীতে
কোন কোন ক্ষেত্রে মেলোড্রামার ছোঁয়াচ আছে। ক্লাশবাক্যে কয়েকটি
ঘটনার উপস্থাপনা আরও হঠাৎ হলে ভাল হ'ত। লেখকের প্রথম
রচনা হিসাবে অভিনন্দনীয় হলেও, রচনা পরিণত হবার অপেক্ষা রাখে।

শ্রীলক্ষী মজুমদার

শাব্দী—(মাসিক সঙ্কলন) প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা,
১৩৭১ সাল, আশ্বিন মাস। সম্পাদক : শ্রীদীপ
কর্মকার। শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক আইডি প্রেস
নবদ্বীপ হইতে মুদ্রিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১'২৫ পয়সা,
বার্ষিক ১৫'০০ টাকা।

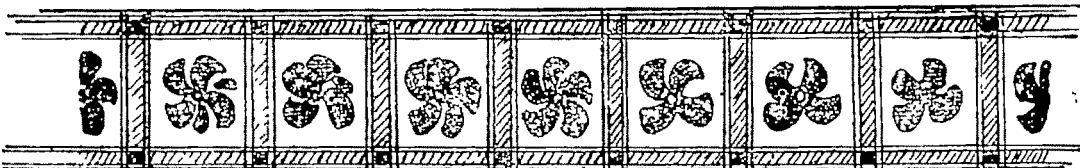
শাব্দীর প্রথম সংখ্যা শারদীয়া সংখ্যাক্রমে আত্মপ্রকাশ করিবারে।
সর্বমোট ১৪টি কবিতা, ১০টি গল্প, ২টি প্রবন্ধ ও ২টি ভ্রমণ-কাহিনী
এই সংখ্যায় সম্মিলিত হইয়াছে। রচনাগুলি সুশীলিত এবং সম্ভাবনাব্য
প্রতিশ্রুতিময়। সম্পাদকের মন্তব্যেব সহিত আমরাও একমত যে,
"একটা একক জীবনের সঞ্চয় সীমিত কিন্তু সাহিত্যেব অব্যাহত প্রাঙ্গণে
বা পাই তা বহু জীবনের বিভিন্ন জীবনবাদের একক সংহতি।" শাব্দীর
আদর্শ মহৎ। পত্রিকাখানির আবুঃ দীর্ঘ হোক, এই কামনা কবি।

শ্রীহিন্দু গুপ্ত

জ্ঞানের চাবুক—স্বামী শ্রীশ্রীরামানন্দ পুরী বিরচিত।
যোগাশ্রম, ২৪।৭।১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কদমতলা,
হাওড়া। মূল্য : আড়াই টাকা।

জ্ঞানের চাবুক সহজ সরল ভাষায় লিখিত একখানি ধর্মপুস্তক।
জপ, তপ ও গুরুবাদের উপরে প্রাধান্য আরোপ করে সাধনার বিভিন্ন
মিক সহজ সরল ভাবেই আলোচনা করেছেন স্বামীজি। নির্দেশ ও
উপদেশসমূহ দিয়ে সাধকের কর্তব্য সম্পর্কে তাকে সচেতন করতে চেষ্টা
করেছেন। শুধুকে যথেষ্ট সাবধান করে দিয়েছেন। স্বলন পতন
ক্রটির কারণগুলির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গুরু ও সাধক
উভয়েরই। গুরু-শিষ্য সম্পর্কেরও বখাষ আলোচনা আছে। গৃহীদের
কর্তব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলেছেন তা প্রণয়নযোগ্য। বইখানা
সহজ সরল ভাষায় লিখিত হলেও, সাধাবগতঃ যোগাক্ত ব্যক্তি ব্যতীত
সাধারণ পাঠক আলোচ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হবেন কিনা সন্দেহ। সেদিক
দিয়ে মনে হয় বইখানার কালোচিত মানবতা ও নীতিধর্মের উপর
আরও জোর দিবে আলোচনা করলে ভাল হত। বইখানার নামকরণে
একটু চমক আছে। বিবেকের কষাঘাত, জ্ঞানের আলো বা বিকাশ
বহু ব্যবহৃত। কিন্তু চাবুক কথাটি যেন কেমন এক রক্তপ্ৰাণক ভাবের
অভিব্যক্তি বলে মনে হয়। বীরা সত্যিকার ভগবৎ সাধনা করেন তাঁরা
স্বামীজির নির্দেশ, উপদেশ ও বার্ষিক সাধন-পদ্ধতি দ্বারা উপকৃত হবেন,
আশা করি।

জ্ঞে. বি.



সাধারিক

শ্রীশ্রীসঙ্ঘজননী :

বিশ শতাব্দীর সূচনার আতি-সাধনার ক্ষেত্রে যে অগ্নিবিদ্যুৎ হ্রস্ব হয় তার তরঙ্গ-ভঙ্গ বধন বিতাইয়া আসে সেই সময়ে অন্ততম বিদ্যাবী নারক শ্রীমতিলালের দিবা আতিগঠনের আকুল আস্থানে যে তরঙ্গের দল চন্দ্রনগরের অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাগীরথী কূলে আসিয়া একত্রিত হয় সেই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসমূহকে একত্র দান করিয়া প্রবর্তক সঙ্ঘরূপে বিশিষ্ট করিয়া তুলে এই দিব্যামাতা সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীরাধারানী দেবী ও তাঁর পরমা মাতৃ। প্রবর্তক সঙ্ঘরূপটি তাঁরই সমর্পণ-বীজের অকুরিত গলবিত প্রকাশ। আজন্ম জীবন মরণে তিনি ছিলেন মা। এই মাতার অগ্র কট-তিথির আরাধনা প্রতি বৎসর প্রবর্তক সঙ্ঘ সনিষ্ঠায় অধ্যাপক-অমুষ্ঠানেব মধ্য দিয়া প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। এবারও যথানিয়মে ২১-এ অগ্রহায়ণ সন্ধ্যার অধিবাসের উদ্বোধন করেন সজ্ঞাচার্য গণ্ডিত শ্রীহর্যনারায়ণ তর্কতীর্থ এবং মাতৃ-বন্দনা করেন সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়। সঙ্ঘ-কল্যাণ এই উপলক্ষে দেবীস্তুতি ও মাতৃ-কীর্তন করেন। পরদিন ২২-এ অগ্রহায়ণ দোমবার বাকসমূহ হইতে হর্যাস্ত পর্যন্ত মৌন-নিবিড় মাতৃ-অস্থান চলে। সমবেত উপাসনা, সমবেত গীতা ও চণ্ডীপাঠ, বোড়শোপচারে পূজা ও ভোগারতি, হর্যাস্ত পর্যন্ত হোম, দিবসব্যাপী উপবাস ও উপবাসপালন এবং সন্ধ্যায় নবাম-প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ছিল এই মাতৃ-আরাধনার অঙ্গ। ২৩ হইতে ২৪-এ অগ্রহায়ণ প্রতিদিন সন্ধ্যায় অথও গোয়লীলা গীতি-কীর্তন করেন গীতরত্ন শ্রীঅমিরগোপাল দাস, কীর্তন-রসনিধি এবং ২৬-এ সন্ধ্যায় সমবেত উপাসনান্তে কৃষ্ণলীলা কীর্তন করেন শুক্লরস কীর্তনীবা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সদনমোহন লীলা সন্ধ্যায়)। মাতৃ-স্মরণমূলক উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৮-এ অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্নে। সঙ্ঘ-কল্যাণকর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত ও স্বামী প্রদ্বানন্দজী কর্তৃক বৈদিক প্রশস্তির গর শ্রীরাধারমণ চৌধুরী সভানেত্রী অধ্যাপিকা শ্রীসান্ধনা দাশগুপ্তাকে মাল্যদান প্রদক্ষে শ্রীমতী দাশগুপ্তার পরিচয় প্রদান করেন। সঙ্ঘ-সম্প্রতি শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দত্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ এক ভাষণে সঙ্ঘ ও সঙ্ঘজননীর অন্তর্ভুক্ত পরিচয় প্রদান করেন। সভানেত্রী অত্যন্ত শান্ত সংবেত ও মধুর কণ্ঠে এবং অনুগম্য সাহিত্যপ্রসাদমণ্ডিত ভাষায় সেই বৈদিক যুগ হইতে সেদিনের শ্রীমা সাবনামণি ও সঙ্ঘজননী রাধারানী দেবী পার্শ্বস্থ কালে কালে ভারত-নারীর মহিমা কীর্তন করেন। বিমুক্ত বিষয়ে অগণিত শ্রোতা শ্রীমতী দাশগুপ্তার হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করেন এবং পরিতৃপ্ত প্রশংসায় বিগলিত হন। স্বামী প্রদ্বানন্দ ধর্ম্মবাদ দিবার পর সমবেত উপাসনান্তে উৎসব সভা সমাপ্ত হয়।

ভারত-বন্ধু হলডেন :

মহামানব বৈজ্ঞানিক জে. বি. এস. হলডেন ভুবনেশ্বরে পরলোক গমন করিয়াছেন। এ সম্পর্কে 'কম্পাস' সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করিয়াছে : "মহাসাগরের সাগর তীরে ভারত-তীর্থের ভুবনেশ্বরে নবর দেহ বেধে গেলেন একটি বিশ্বভূবন-চেতন মহাপ্রাণ। ভুবনেশ্বর ধ্বংস হল, ভারত-তীর্থ সমুদ্র হল। অধ্যাপক হিসাবে তাঁর সার্থকতার একটি নমুনা হল এই যে, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিশজন রয়েল সোসাইটির সদস্য হয়েছেন এবং তিনজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।" শ্রীহলডেন ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতকে গৌরব দান করিয়া গিয়াছেন। উদার সহনশীল ভারতকে তিনি মনোশ্রমে ভালবাসিয়াছিলেন। এই মহাপ্রাণের বিষয় বিস্তারিত প্রবর্তকে বারান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

এই বছরের নোবেল পুরস্কার :

এই বৎসর রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন অক্সফোর্ডের অধ্যাপিকা শ্রীমতী ডরোথি ক্রুফট হজকিন। পদার্থ বিজ্ঞানে

আর মিডের

স্মারক

তিল তৈল



বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাকতীয় শিরোগ্রোগ অধিষ্টিত

আর মিডের সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

- ডক্টর মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী
- ১ প্রথম অষ্টক) কাব্যসু-বাদ ৫৮
 - ২ স্বাধিকার (উপন্যাস) ৬৮
 - ৩ The Solu of India ১২৮
 - ৪ Indian Culture ১০৮
 - ৫ Vaishnava Syries ৩৮
 - ৬ লগুন তীর্থে ৪৮
 - ৭ ভারত সংস্কৃতি ৫৮
 - ৮ রাজ্যবর্দ্ধন (নাটক) ২৮
 - ৯ একলব্য (নাটক) ১৮
 - ১০ চলার পথে (উপন্যাস) ৩৮
 - ১১ সহযাত্রিনী (উপন্যাস) ৩৮
 - ১২ বিশ্বপরিভ্রমণ ৩৮
 - ১৩ বৈদিক জীবন বাদ ১৮

আলোকতীর্থ, ব্রহ্ম কে, পৃষ্ঠ ৪৬৭
নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩

দুইজন সোবিয়েৎ ও একজন আমেরিকান বিজ্ঞানীকে বৃত্তভাবে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। ইঁহারা হইতেছেন চার্লস টাউনস (আমেরিকান), অধ্যাপক প্রথোভ (রুশ) এবং অধ্যাপক ব্যাসন (রুশ)। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন ফ্রান্সের জঁ পল সঁত্রো। কিন্তু তিনি নোবেল পুরস্কার গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন। আকাদেমীর নিকট পত্র লিখিয়া এই ফরাসী দার্শনিক জানাইয়াছেন, ব্যক্তিগত কারণে তাঁহার পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কিন্তু কারণটি কি তাহা জানা যায় নাই। জঁ পল সঁত্রো ফরাসী দেশে একাদশ ব্যক্তি যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইলেন। এই বৎসর সর্বোচ্চ স্কলোর (২৭০০০ ফ্রাউন) পুরস্কার দেওয়া হইবে। আমরা পুরস্কার বিজয়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

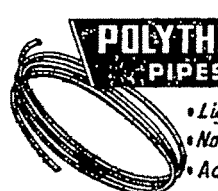
পরম বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন :

গত ১৬ই ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় ১নং নিবেদিতা লেনে পরম বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তিস্তারতী ভাগীরথী ৭৩তম জন্মতিথি নিবিড় নিষ্ঠায় তাঁর দীক্ষিত শিষ্যমণ্ডলী ও অনুরাগী ভক্তজনের সমাবেশে

উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে পূর্বদিন অধিবাস, নগর-কোর্তনাদি এবং গরের দিন প্রাতে গুরুপূজা, মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগরাগ ও সন্ধ্যায় বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গৌবোহিত্য করেন ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত। কলিকাতাবাসী রাসমণি দিশন ও সিঁধি বৈষ্ণব সম্মিলনীর পক্ষ হইতে ভক্তিস্তারতীকে মানপত্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মানপত্র ও মালাদান করা হয়। সন্ধ্যায় প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীধারমণ চৌধুরী, পাঠবাড়ীর শ্রীবিপিনবিহারী দাস, কবিরাজ শৈলেন্দ্রনাথ প্রমুখ বক্তাপন ভক্তিস্তারতীর জীবন ও সাধনার বিস্তারিত দিক বেধাইয়া বক্তৃতা করেন। সভাপতি ডাঃ সেনগুপ্ত সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট সঙ্গীত ভাষণে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষা নিবেদন করেন। ভক্তপ্রবর বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসেন তাঁর ভাষণে কৃপার মহিমার বিষয়ই ব্যক্ত করেন।

তরুণের সাফল্য :

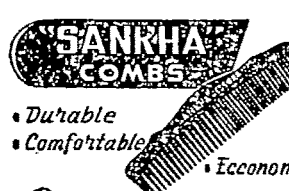
গত ১৮ই অক্টোবর এক তরুণ বাঙ্গালী অভিযাত্রী দল পাড়োয়াল হিমালয়ের দেবদেখানে শৃঙ্গ (২০ হাজার ফিট) জয় করিয়াছেন। ইঁহারা



**POLYTHENE
PIPES**

- Light Flexible
- Non-Corrosive
- Acid Proof

P.V.C. PIPES.



**'SANKHA'
COMBS**

- Durable
- Comfortable
- Economic

Purnima TOOTH BRUSH

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

ESTD. 1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO.-10813

। শ্রীবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ.
পি. আর. এস. ॥
শুদ্ধার্থ তত্ত্ব ৫-০০ শব্দ তত্ত্ব ১৫-০০
জাতিতেদ ১ বেদ ও
কোরাণের সাদৃশ্য ১
। পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ॥
শ্রীশ্রীনামাঙ্কুর ২-২৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০
। কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥
পরার্থকথা ২-২৫
প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

শ্রীমহাপ্রভু বলেছেন—

“এই তো কহিলু তক্তির দিগ্‌দরশন
ইহার স্বরূপ মনে করহ ভাবন।”

আত্মদান করুন

মহাপ্রভুর মতামুযায়ী গীতার
ভক্তি ব্যাখ্যা

ভক্তিস্তারতী শ্রীবঙ্কিম সেনের

গীতা-মাধুরী—১২.০০ ও

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষেপে—৩.০০

প্রকাশক : শ্রীরাইমোহন আচার্য্য

৭ ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা—৩

উৎসব অনুষ্ঠানে—

ইন্দ্রবাসুদেব

অপ্রতিরোধ্য

৮৬, আমহাস্ট্রী স্ট্রীট কলি: ৯

ফোন-৩৫-১৩৮৩

৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২

ফোন-৩৪-২৫৩৩

ক্যালকাটা ক্লাইবাস ক্লাব-এর উদ্যোগে ও শ্রীহাজিত বহুর নেতৃত্বে অভিবান কবিরা ছিলেন। পূর্বতারোহণে বাঙ্গালীর এই কৃতিত্বে বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

নেহেরুর অসতর্ক প্রতিচ্ছবি :

জম্মুরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবলবন্ত রায় মেহতা কংগ্রেসের সেক্রেটারী থাকাকালে নেহেরুর হিজিবিজি-কাটা কতকগুলি কাগজ সংগ্রহ করিয়া রাখেন। সম্প্রতি সেই অর্থহীন কাগজের টুকরাগুলি বিরাট অর্ধের বিনিময়ে ক্রয় কবিরার প্রস্তাব করিয়াছে আমেরিকার সংগ্রাহকমহল। কংগ্রেস কাগ্যানিবর্ত্তক কমিটির বৈঠকে বসিয়া নেহেরু বহন অস্ত্রের কথা শুনিতে ন বা গভীরভাবে চিন্তা করিতেন, তখন অজ্ঞাতে সাদা কাগজের উপর নানা রকম দাগ কাটা তাঁব অস্ত্রাস ছিল। এইগুলি অনেক সময় একটা অদ্ভুত ছবি বা নকশা হইয়া দাঁড়াইত। খেয়ালখুশীমত কাগজের টুকরাগুলি সরাইয়া ফেলিয়া দিতেন বাজে কাগজের বাজে। শ্রীবলবন্ত রায় সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখেন। মার্কিন সংগ্রাহকগণের মতে ঐগুলি নেহেরুর নানা মন্ত্রাজের অসতর্ক প্রতিচ্ছবি, তাই তার মূল্য সীমাহীন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিচ্ছবিতার এই হিজিবিজি ছবিগুলির কবেক হাজার ডলার দাম উঠিয়াছে।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর আবির্ভাবোৎসব :

গত ২রা হইতে ৬ই অগ্রহায়ণ বারাকপুর ৩৮ নং পার্ক রোডস্থ শ্রীঅকণেশ্বরকিশোর রায়চৌধুরীর বাসভবন 'শরণাগতি'-তে পঞ্চ দিবস ব্যাপী শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর শুভ আবির্ভাব তিথিব আরাধনা হব বিচিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সিদ্ধ যোগাচার্য শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি ও উপদেশে উৎসবটি আনন্দ ও প্রেরণায় হইয়া উঠে। অবিবাস, পূজা, পাঠ, কীর্তন, বন্দনা, সাংস্কৃতিক ও বহু শ্রেণী গায়ক-বায়কের সমাবেশে নানা বিচিত্রানুষ্ঠান এই পঞ্চ দিবস ব্যাপী উৎসবধর্মের আদিক ছিল।

নকল হৃদপিণ্ড :

সংবাদে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে তিন হাজার ব্যক্তি বৈদ্যাতিক হৃদপিণ্ড ব্যবহার করিয়া জীবিত আছেন। বৈদ্যাতিক ঘাটারির সাহায্যে এই সকল ব্যক্তির হৃদপিণ্ড সচল রাখা হয়। অতি ক্ষুদ্র এই মডেল বস্ত্র অস্ত্রোপচারের সাহায্যে রোগীর হৃদ থেকে অথবা তলপেটে চামড়ার নীচে বসাইয়া দেওয়া হয় এবং বস্ত্রের বিদ্যুৎপ্রবাহ তারের সাহায্যে সরাসরি হৃদপিণ্ডে প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞানের অদ্ভুত কৃতিত্ব বলা চলে।

পরলোকে কবি গোলাম মোস্তফা :

বিশিষ্ট বাঙ্গালী মুসলমান কবি গোলাম মোস্তফা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ১৩ই অক্টোবর রাত্রিতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৭ বৎসব বয়স হইয়াছিল। গোলাম মোস্তফা স্কুলের হাজিরাখাতীর নিকট প্রিয় কবি ছিলেন। অবিভক্ত বাঙ্গালায় একদা তাঁহার রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল। কবির উল্লেখযোগ্য রচনাংলী : রক্তরাগ, ধোঁশরোজ, হান্নাহানা, সাহাবা, কবির কাহিনী, তারা নাই, পাঁকিডান মহাকাব্য, বনি আদম, বুলবুলহান (কাব্য সঙ্কলন), বিখনবী (গল্প গ্রন্থ) প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীমোস্তফার অবদান তাঁকে অরণীয় করিয়া রাখিবে, ইহা অনিশ্চিত।

ইঁদুর খাও :

মাকার্তার এক সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোনেশিয়ার কমুনিষ্ট পার্টির নেতা মি: জি. এন. আইদিং ইন্দোনেশিয়ার কৃষকগণকে ইঁদুর খাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন, ইঁদুর খাইতে শুরু করিলে ইঁদুরকুল নির্বংশ হইবে, খাতের অনটনেরও সুরাহা হইবে। চীনারা তো পেটের জ্বালায় পোকা মাকড় ইঁদুর কিছুই খাচ্-বিচার করে না। ভারতেরও এমন দিন আগতপ্রায়।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্ম

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল, আলোয়ান ও হোসিয়ানী পোষাক বিক্রেতা
রামকানাই ষানিনীরঞ্জন পাল প্রঃ লিঃ
২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা। ফোন : ৩৩-২৩০৩

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।



৪৯ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

প্রবন্ধ

পৌষ, ১৩৭১

জীবনের আলো

পূর্ণ যোগের জন্ম চাই পূর্ণ তত্ত্বের অনুসরণ। পূর্ণ তত্ত্ব ভগবান, তাই ভগবানে আত্মসমর্পণ—পূর্ণ যোগের একমাত্র অমুঠান। আত্মসমর্পণ কেমন করিবা করিতে হয়, এ প্রশ্ন তাহার আগে না, বাহার বস্তু নির্দেশ হইয়াছে। দীক্ষার বস্তু নির্দেশ হয়। বস্তু, তত্ত্ব, ইষ্ট, ভগবান—একেরই নামান্তর মাত্র। এই দীক্ষা লোকাচার-প্রবর্তিত কোন অমুঠান নহে। ইহার কোন আয়োজন নাই, শব্দ-মন্ত্বেরও প্রয়োজন হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষা হইল কিনা মনও জানিতে পারে না। কোথায় কে দীক্ষা দিল, তাহাও বুঝা যায় না; কিন্তু যোগের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর আবির্ভাব হয়, তখন গুরু বস্তু, ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই ঈশ্বর-তত্ত্ব আত্মা নহে, ব্রহ্ম নহে, ইহা তুরীয় নহে—স্বয়ং ভগবান, পঞ্চতত্ত্বে গড়া রসধন শৃঙ্গার মূর্তি। আত্মসমর্পণ যোগী এইজন্ম লয় চাহে না, সমাধি চাহে না, সান্তি, স্বাক্ষর, এমন কি সাযুজ্য লাভেও সে উদাসীন। সে চায় বিগুহ্ণ ভক্তি—যাহা দিবা সে তাহার সবখানি তরাইয়া তুলিবে রসাস্বাদের অশেষ তৃপ্তিতে। আত্মসমর্পণ যোগ মাহুকের কোনও অঙ্গ অর্পণ রাখে না, প্রতি শোণিতবিন্দুটি পর্য্যন্ত শুদ্ধ ও সিদ্ধ হইয়া ভূষিত চাতকের মত রস-মাধুর্য্যে ভরিয়া থাকিতে উন্মাদ হইয়া উঠে। তাই সাধক সর্বদা সর্বভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানেরই ভজনা করে। ইহাতেই সে সিদ্ধ হয়, তৃপ্তি পায়, অমরত্ব লাভ করে। কিন্তু অস্ত্র সকল যোগ একরূপ নহে। জ্ঞানযোগে জ্ঞানীরা ঈশ্বরকে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে; জীবনের অনেক কিছু বর্জন না করিলে ইহা ঘটে না। এইরূপ যোগ-সমাধিতে সাধকের আত্মদর্শন হয়, কিন্তু দেহীর সকল অংশ ইহাতে বিকশিত হয় না; কারণ এই প্রকার সাধনায় সবখানি সার্থক করার প্রয়োজন নাই, বরং অনেক অংশই বর্জন করিয়া ইহা সিদ্ধ করিতে হয়। এমন কি, ভক্তিযোগও আত্মসমর্পণ যোগ নহে। ভক্তিতে হৃদয়ের বিকাশ হয়, প্রেম, বিহ্বলতা, স্বেদ, কাম্প, অশ্রু, পুলক প্রভৃতি আনন্দের ঘোরে ভক্ত উন্মাদ হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মসমর্পণ যোগের জায় জীবের আধার স্বেদ্যের শক্তিতে অটল, সর্বদা অমৃতময় হয় না। আত্মসমর্পণ যোগীর কিছুই ত্যাগ করিবার থাকে না, পূর্ণ ভোগের আনন্দে সর্বাবয়ব পুষ্ট ও সুস্থ হয়। বসন্তের আবির্ভাবে তরু-লতা যেমন শ্রীসম্পন্ন হয়, আত্মসমর্পণ যোগের প্রভাবে সাধকও তেমনি অন্তরে বাহিরে দিব্যকাস্তি ও মাধুরীমণ্ডিত হইয়া উঠে। এই ঐশ্বর্য্য ভগবানের—ভগবন্ময় হওয়ার ফলে, সাধকের আধারে ভগবানই অবতরণ করেন। সৃষ্টির তো ইহাই পরম লক্ষ্য।

(“আত্মসমর্পণযোগ” গ্রন্থ হইতে সংকলিত)।

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

ঐশ্বর্য

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । অষ্টত্রিংশং স্তবং ।) প্রথমঃ ঋক্

(সম্ভবতঃ শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীমনিবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

কন্ধ নুনং কধপ্রিয়ঃ পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ ।

দধিধেব বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ১ ॥

অর্থ—[বিশ্বপ্রপঞ্চের নিয়ন্তা যিনি, তিনি] “বৃক্তবর্হিষঃ” (বন্ধন বিহীন) “কধপ্রিয়ঃ” (স্তুতিপ্রিয়, অর্চনার দ্বারা প্রসন্ন হন), [হে মরুতঃ—হে মরুদেবগণ] “কংহ” কবে) “নুনং” (অবশ্যই) “ন” (আমাদিগের) “হস্তয়োঃ” (হস্ত দুইটি) “দধিধেব” (ধারণ করিবেন), “পিতা পুত্রং” (পিতা যেমন পুত্রের হস্ত ধারণ করেন, সেইরূপ) ॥ ১ ॥

সরলার্থ—বিশ্বপ্রপঞ্চের নিয়ন্তা যিনি একমাত্র তিনিই বন্ধনবিহীন, মুক্ত—কিন্তু স্তুতিপ্রিয় । প্রার্থনা দ্বারাই তাঁকে লাভ করিতে হয় । হে মরুদেবগণ ! পিতা যেমন পুত্রের হস্ত ধারণ করেন, আপনারাও তদ্রূপ কবে আমাদের হস্ত ধারণ করিবা সেই পরম মহতের সহিত যুক্ত করিবেন ॥ ১ ॥

বিশদর্থ—এই অষ্টত্রিংশং স্তবটিও পূর্ব স্তবের ভাষ্য মরুদেবগণের উদ্দেশ্যেই রচিত । ধোর পুত্র কধ-ঋষি এই স্তবেরও উদগাতা । পূর্ববর্তী স্তবের ভাষ্য এই স্তবেরও ঋক্মন্ত্র পনেরটি । পূর্ববর্তী স্তবে আমরা দেখিয়াছি, ঋষি মরুদেবগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিয়া পরিশেষে স্তবটির কারণ যিনি, তাঁরই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন—বিশ্বচরাচর যার বলে বলীয়ান, মরুদেবগণও তাঁরই শক্তি দ্বারা পরিচালিত । স্তব মরুদেবগণের পশ্চাৎ স্রষ্টা একজন অবশ্যই আছেন । সেই স্রষ্টা কেমন ? এই স্তবের প্রথমেই ‘কধপ্রিয়ঃ’ ও ‘বৃক্তবর্হিষঃ’ এই দুই দুইটি পদে ঋষি তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছেন ।

“বৃক্তবর্হিষঃ” বস্তীর একবচন, “কধপ্রিয়ঃ” প্রথমার একবচন—অর্থ হয় ‘বৃক্তবর্হিষের কধপ্রিয়’ । আচার্য্য শাষন ‘বৃক্তবর্হিষঃ’ পদের অর্থ করিয়াছেন—‘বৃক্তং ছিন্নং বর্হিঃ দর্ভঃ’ অর্থাৎ কুশছিন্ন । দর্ভ অর্থে কুশও যেমন হয়, তেমনি বন্ধন অর্থও করা যায় । সেই অর্থে বৃক্তবর্হিষঃ শব্দের অর্থ হয় ছিন্নবন্ধন বা গ্রন্থিবিহীন মুক্ত পুরুষ । গ্রন্থিবিহীন কে হইতে পারেন ? কারণেরও কারণ যিনি—একমাত্র সেই ঈশ্বর । যোগশাস্ত্রে তাই ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিকূপণ করা হইয়াছে “ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টপুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ” । যিনি সবার অতীত, তাঁকে কিসের দ্বারা ভুট করা যায় ? কি তিনি ভালবাসেন ? কেমন করে তাঁকে পাওয়া যায় ? ঋষি বলিতেছেন—তিনি “কধপ্রিয়ঃ” স্তুতিপ্রিয়ঃ । একমাত্র স্তুতি দ্বারা, প্রার্থনা দ্বারা, নিত্য স্মরণ ও মননের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায় । নিত্য স্মরণে রাখারও তো আবার একটা শিক্ষা আছে, সাধনা আছে, তপস্বী আছে—কে সেই শিক্ষা সাধনা আমাদের দান করিবেন ? সেইখানেই আসে গুরুকরণ । অথগুমণ্ডলাকারে যিনি পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন—তার চরণকমল দু’খানি দেখাইয়া দিবার জন্ত প্রতীকরূপে প্রয়োজন হয় শ্রীগুরুর । আর্ঘ্য ঋষিগণ ছিলেন স্বয়ংই গুরুমূর্ত্তি—তাই তাঁরা গুরুরূপে বরণ করিতেন দেবতাদের । এখানেও মহর্ষি কধ বেদ-ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভের জন্ত প্রতীকরূপে আশ্রয় করিতেছেন মরুদেবগণকে । তাঁদের কাছে তাই প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছেন—হে মরুদেবগণ ! পিতা যেমন সন্তোহে পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলেন—পুত্রের পতনের আর কোন আশঙ্কা থাকে না, তদ্রূপ করে আপনারাও আমাদের হাত ধরিয়া সেই পরমের পথে লইয়া চলিবেন—“হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা আমি যে পথ চিনি না ।”

বৈদিক-সর্পরাজ্ঞী

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি. ই., তত্ত্বভূষণ

পূর্ব নিবন্ধে (বৈদিক-সর্প—প্রবর্তক, কার্তিক-১৩৭০)

বলা হইয়াছে যে, বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে সৃষ্টির আদি-কারণ স্পন্দনের অন্তর্নিহিতা শক্তি—বাক্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বপদার্থ ও জীবজন্তুর মধ্যে বিদ্যুৎরূপে অধিষ্ঠিতা এবং জীব ও বৃক্ষপ্লাম্বাদির প্রাণাপানের সহিত সতত-সঞ্চরণশীলা। আবার বলা হইয়াছে যে, বেদের ঋষির দৃষ্টিতে বিশ্বের বৃক্ষপ্লাম্বাদি সহ সর্বভূতের প্রাণশক্তির উৎস হইল অন্তরীক্ষের সদা-চঞ্চলতা তথা স্পন্দন। আধুনিক জার্মেন দার্শনিক জাঙ্গের (Jung) উক্তি—*Prana is life-breath which is the same as the dynamism of the cosmos*, বৈদিক ঋষির উক্তিই প্রতিধ্বনি। বেদের ঋষির মতে অগ্নি, ওষধি, বিদ্যা ও সূর্য রশ্মির মধ্যেও অহি বা সর্প রহিয়াছে, এবং ঐগুলি হইতে উদ্ভূত সর্প হইতে মহাশক্তির বিকাশ হয়।—“যেবাংজাতানি বহুধামহাস্তি”; ঋষি ঐ সব সর্পকে নমস্কার জানাইয়াছেন। স্পষ্টই দেখা বাইতেছে, বেদের ঋষির লক্ষ্য আধুনিক বিজ্ঞানের ইলেকট্রিসিটি (Electricity)।

ঋগ্বেদে তিনটি মন্ত্রযুক্ত সর্পরাজ্ঞী নামক একটি স্তব্ধ (১০।১৮৯) আছে। ইহাতে উপরোক্ত বাক্শক্তির মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে, ঐ শক্তি জীবের, তথা বিশ্বের প্রাণাপানের মধ্যে ঝিলিক্ দিয়া সঞ্চরমানা হইয়া প্রাণ ও অপানের গতাগতি সাধন করেন—“অস্তরুরতি রোচনা অস্ত্রপ্রাণাদপানত (১০।১৮৯)। সসর্পরী-বাক্ প্রাণবায়ুর মধ্যে ঝিলিক্ দিয়া চলেন। তাই তিনি সর্পরাজ্ঞী। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, উক্ত স্তব্ধের তিনটি ঋক্ (মন্ত্র) বিশ্ব-সৃষ্টির তিন ব্যাখ্যতি—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ-র প্রতীক ও বর্ণনাস্বক। (২।২।৩।১)।

বৈদিক যুগে প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য-উপাস্ত্র অগ্নিকুণ্ড থাকিত; ইহার নাম ছিল গার্গপত্য-অগ্নি। ইহা কখনও নির্বাপিত হইত না, ইহা ছিল—অখণ্ড-জ্যোতিঃ। প্রত্যহ ঐ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দেওয়া হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতা বলিতেছেন, যদি কোন কারণে দৈবাৎ গার্গপত্য অগ্নি

নির্বাপিত হইয়া যায়, তাহা হইলে আবার অরগ্নি-মণ্ডন করিয়া নূতন অগ্নিপ্রজ্জ্বালন না করিয়া সর্পরাজ্ঞী স্তব্ধের মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়া অগ্নি পুনরাধান করিতে হয়। কেননা, “সর্পা বৈ জীর্ঘস্তোহমন্ত্রস্ত, স এতৎ কসন্নীরঃ কাঙ্গবেয়ো মন্ত্রমপশ্রুং, ততো বৈ তে জীর্ঘান্তনূরপায়ত, সর্পরাজ্ঞিয়া ঋগ্ভিঃ গার্গপত্যাদধাতি” (১।৫।৩-৪) অগ্নির অন্তর্নিহিত সর্পগুলি নিজেকে জীর্ঘ ও মৃত মনে করিয়া শুষ্ক থাকিলেও কঙ্কবংশীয় কসন্নীর ঋষির দৃষ্ট সর্পরাজ্ঞী স্তব্ধের ঋক্গুলির উচ্চারণ হওয়া মাত্র তাহারা তাহাদের জীর্ঘ তম্বর খোলস দূরে ফেলিয়া দিয়া নবতম ধারণপূর্বক উচ্চ সজীব হইয়া জাকাইয়া উঠে।

অস্ত্রদিকে বিচার করিলে দেখা যায় যে,—অগ্নি এবং প্রাণ ওতঃপ্রোতভাবে সংযুক্ত। জীবদেহের উষ্ণতা এবং আহার পরিপাক—অগ্নির ক্রিয়া, এবং যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ ঐ অগ্নি ক্রিয়মান। অগ্নির এক নাম মাতরিখা, প্রাণেরও নামান্তর মাতরিখা। মাতরিখা শব্দটির অর্থ আবার মাতার মধ্যস্থিত (মাতরি—মাতৃশব্দের সপ্তমী,—মাতা=অদিতি) ঋ (কুকুর=মহাপ্রাণ)। সুতরাং অগ্নির সর্প, জীবদেহের প্রাণের সর্প, এবং অন্তরীক্ষের মহাপ্রাণের সর্প এক এবং অভিন্ন।

আবার বলা হইয়াছে যে, স্পন্দনাত্মিকা শক্তিই সর্পিনী এবং তাহার অপর নাম বাক্। অথর্ববেদের ঋষি বাকের পরিচয়ে বলিতেছেন—“স তে কাম হুহিতা ধেমুক্রচ্যাতে যামাহর্বাচং কবয়োবিরাজম্” (৯।২।৫)—হে কাম! তিনিই তোমার হুহিতা—যিনি ধেমু বা গাভী (গো) নামে পরিচিতা, এবং কবিরা যাহাকে বাক্ এবং বিরাজ বলেন। এখন প্রশ্ন হইল—বাকের জনক ‘কাম’ কে? ঋগ্বেদে সৃষ্টিরহস্তমূলক নাসদীয় স্তব্ধে (১০।১২২) বলা হইয়াছে যে, প্রাক্-সৃষ্টিকালীন শাস্ত্রাতীত অবস্থায় যখন দিবা-রাত্রি, অমৃত-মৃত্যুর কোনও প্রভেদ জ্ঞান ছিল না, তখন বায়ুহীন অবস্থায় প্রাণক্রিয়া থাকার স্থায় অব্যক্ত পুরুষ ধারিক ও আশ্রিতা শক্তি স্বধার সহিত ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িতাবস্থায় একক রূপে ছিলেন এবং ঐ পরম

একক ভিন্ন আর কিছুই ছিল না—“আনন্দবাতং স্বধরা তদেকং তস্মাৎ হ অস্ত্রং ন পরঃ কিঞ্চিনাস” (ঋ. ১০।১২২। ২)। তারপর সেই একক হঠাৎ তপের মহিমায় সাড়া দিয়া উঠিলেন—“তপসন্তম্বহিসা জায়তেকম্” (ঐ-৩)। তপ=নিয়ন্ত্রিত ধারার তলে—(ত=canalised plane) প্রকাশ হওয়ার (প) ভাব। তখনই “কামন্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ” (ঐ-৪)—সর্বাগ্রে মনের রেতঃ (স্রাব) রূপে কামের আবির্ভাব হইল। ঠিক যেমন শিলাময় পর্বতের চাপের তাপে নিজের দেহের অভ্যন্তর হইতে স্রাবরূপে শিলাজিৎ নির্গত হয়।

এখন প্রশ্ন হইল—মনস্ বা মন কোথা হইতে আসিল? ঋগ্বেদের ঋষি দীর্ঘতম সৃষ্টির আদিকারণ বাক্ বা ‘গৌ’র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—যিনি অধোলোকে পরলোকের সাহায্যে এবং পরলোকে অধোলোকের সাহায্যে অধুধাবন করিয়া বিশ্বশ্রষ্টা-পিতা-প্রজাপতিকে জানিতে পারিয়াছেন, এইরূপ কবি-মনীষা-সম্পন্নকে বলিতে পারেন যে, সদা-দ্যোতমান্ বিদ্যাংবৎ চঞ্চল মন কোথা হইতে উপজাত হইয়াছে—“কবীন্মহানঃ ক ইহ প্রবোচেদ্ দেবং-মনঃ কুতো অধিপ্রজাতম্” (ঋ. ১।১৬৭।১৮)। বড়ই সমস্তার প্রশ্ন। তবে ইহা অনুমান করা যায় যে, অব্যক্ত পুরুষ ও স্বধা-প্রকৃতির একীভূত হইয়া থাকার মধ্যে কেন্দ্রীকরণ রূপে মনস্ অধিষ্ঠিত ছিল; সে ই তার বিদ্যাহং চঞ্চলতাগুণে তাপের সৃষ্টি করিয়াছে এবং তার ফলে তার স্রাবরূপে কাম প্রকটিত হইয়াছে। কামই সৃষ্টি ব্যঞ্জনার অতি-মানস স্তরের প্রাথমিক উপাদান-সৃষ্টির কামনা (cosmic elemental passion)। কামকে দোহন করিয়া নির্গতা হইলেন স্পন্দনাত্মক শক্তি বাক্ গাভী (Dynamism in the spirit of vibration)। তিনিও বিদ্যাহং চঞ্চল, এবং কাম হইতে উৎপন্ন হওয়ায়—বৎস প্রসবের জন্ত উদগ্ৰীবা অর্থাৎ স্পন্দনের পর স্পন্দন, তথা শব্দ তরঙ্গের পর শব্দ-তরঙ্গ উপাদান করিবার জন্ত অস্থির। তাহারই বৎসগুলির আবর্তন-বিবর্তন, ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতের ফলে (mutation, chain

reaction, fission, fusion) ত্র্যসরেণু, পরমাণু, অণু ও প্রাথমিক উপাদান সৃষ্ট হইয়া বিশ্বের বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি হয়। এবং ঐরূপে সৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থে তিনি চিত্ত নির্মাণ করিয়া ঐ চিত্ত-পদার্থ নিজে বিদ্যাং-রূপে অধিষ্ঠিত থাকেন—“স চিত্তিভির্গি হি চকার মর্ত্যং বিদ্যাদ্ভবন্তী প্রতি বত্রিমোহত” (১।১৬৪।২২)।

এখন প্রশ্ন করা স্বাভাবিক—বাস্তব জগতে দেখা যায় যে, বৎসকামী একটি গাভী উদ্বেজিতা ও রিরংসাসম্পন্ন (গরম) হইয়া গৌজরাইতে গৌজরাইতে গোশালা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মাঠে ছুটাছুটি করিতে থাকে। ইহাকে পাল খাওয়া বলা হয়। সৃষ্টিকারিকা আদ্যাশক্তি-রূপিনী বাক্গাভী বৎসকামী হইয়া কিরূপভাবে কার সাহায্যে বিশ্বময় ছুটিয়া বেড়ান এবং নানা ধরণের অসংখ্য সন্তান (sounds of different wave-lengths and pitch) প্রসব করেন? এই প্রশ্নের সমাধানে দীর্ঘতম ঋষি বলিতেছেন—“হিঙ্করুধতী বস্তুপত্নী বস্নাম্ বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাসাৎ” (১।১৬৪।২৭) গৌজরণ-কারিণী জ্যোতিঃপ্রকাশসমূহের (বস্তু-বস্তু-উষ্) অধীশ্বরী গাভী মনসের সহিত (মনস্ যোগে, মনস্ বাহনে) ছুটিয়া চলেন। এবং এইভাবেই “স বর্ষতাং মহতা মৌভগায়” (ঐ)—এই বিশ্বের সৌভাগ্যের জন্ত বিরাট ভাবে বর্ষিতা হন। এই বিরাটই হইল অনন্ত-বিস্তৃতি, আধুনিক বৈজ্ঞানিকের “space continuum—something that is continuous”—বৈদিক ঋষির—“যাবৎ ব্রহ্ম বিষ্টিতং তাবতি বাক্” (ঋ. ১০।১১৪।৮); ব্রহ্ম=বৃহ্+মন্—the spirit of ever-expansiveness. মনস্—প্রকৃতি; কেননা তাহা হইতে রেতঃ বা স্রাব নিঃসৃত হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ ব্যঞ্জনার ব্রহ্ম ভাণ্ডারকে (ম—ব্যঞ্জন পঞ্চম বর্গের শেষ অক্ষর) নিরাস্রত ধারার (দস্ত্যবর্গের) শেষ কর্মস্তরে (ন) প্রসব (স্=discharge forth) করার ভাব। এই মনসের সঙ্গে বা মনস্-বাহনে (মনসা বাক্-প্রকৃতির প্রবাহ। পূর্বে বলা হইয়াছে,—বৈদিক ঋষির মতে সসর্পরী বাক্ স্থালোক ছাদ যুক্ত মনের রথে চড়িয়া বেড়ান “মন অস্ত্রা অনঃ আসীৎ দ্যৌরাসীদুতচ্ছদি” (ঋ. ১০।৮৫।১৫)।

তাহা হইলে দেখা গেল যে, বাক্ মনসা বাহিনী এবং মনসাও বাক্ বাহিনী।

আবার যখন বাক্ই সর্ব সৃষ্টির মূল কারণ, তাহা হইলে প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে বাকের সঙ্গে অতি অবশ্য মনসও অধিষ্ঠিত। পূর্বোক্ত ঋগ্বেদের মন্ত্বে বলা হইয়াছে—বাক্ প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে চিত্ত নির্মাণ করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক Berkeleyর উক্তি “All the choir of heaven and furniture of earth, in a word, all those bodies which compose the mighty frame of the world, have not any substance without the mind”.*

বৈদিক ঋষির উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র। আবার বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন, বাক্দেবী বিদ্যাকপিনী হইয়া প্রত্যেক পদার্থের মধ্যস্থিত মনস বা চিত্ত-পদার্থ স্বয়ং অধিষ্ঠিতা থাকেন। এখানেও তিনি মনস-বাহিনী বা মনসা। ঋষি ত প্রথমই বলিয়া রাখিয়াছেন,—তার পরিভাষায় বিদ্যাক মানে সর্প। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন বিদ্যাক মানে Electricity বা Energy; শৈবদর্শন ও যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—শক্তি, কুণ্ডলিনী (বৈদিক ‘হবার’ শব্দের সহজরূপ)। ডক্টর আইন্সটাইন্ বলিতেছেন—পদার্থই (matter) শক্তি (Energy), এবং শক্তিই পদার্থ; উভয়ের পার্থক্য একটা সাময়িক স্থিতিবস্থা মাত্র—“Matter is Energy and Energy is matter, and the distinction is simply one of temporary use” (P. 64). তিনি আরও বলেন—পদার্থ মাত্রেই (matter=m) শক্তির (Energy=E) আলো-জ্যোতিঃর প্রবাহের (velocity of light=C) অংশ মাত্র— $m=E/c^2$. বৈদিক ঋষির পরিভাষায় অংশ মানে অংশ—“অংশ অংশেন ব্যাখ্যাতঃ” (নিরুক্ত)—অর্থ ক্ষুর-জ্যোতিঃ (effulgence) মাত্র। তিনি বলেন প্রত্যেক পদার্থের মূলে রহিয়াছে ঐ আদ্যাশক্তি-বাক্—“বিদ্যাক্ত্যন্তী”। তাহা হইলে দেখা গেল যে,—আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইন্সটাইন্ বৈদিক ঋষি দৈর্ঘ্যতমার

উক্তির এবং গীতার “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়াছেন।

বৈদিক ঋষির সৃষ্টি-ব্যবস্থার শৃঙ্খলার ধারণা আরও একটু স্পষ্ট। বাস্তব সৃষ্টি করিবার জন্য একজন কার্যকর্তার প্রয়োজন; তিনি আত্মশক্তি বাকের কৃতি হইতে বাস্তব সৃষ্টি করিবেন। তিনি হইলেন—পিতা, ব্রহ্মা—ব্রহ্মপতি—প্রজাপতি। এই পিতাকে সৃষ্টি করে কে? ঋগ্বেদে বাক্দেবী বলিতেছেন—দেবতা বা মনুষ্যেরা যে কথা বলে তা আমিই বলাই; আমি যাকে ইচ্ছা করি, তাকে উগ্র, ঋষি, মেধাবী করি। সর্বদেবতার শক্তি আমিই প্রদান করি; আমিই ছালোক-পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া বিরাজিতা আছি (ঋ. ১০।১২৫)। আবার—আমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্য আমার যোনির মধ্যস্থিত বীজোচ্ছাসের মধ্যে পিতাকে প্রসব করি—“অহং স্বে পিতরং মুখ্যানমস্য মমযোনির-প্লুতঃ সমুদ্রে” (১০।১২৫।৭)। অথর্ব বেদের ঋষি বলিতেছেন এই প্রথম জ্ঞাতা আত্মশক্তিই পিতার বাহ্য-পালিকা। তাহার তৃপ্তির জন্য ঋষি কুণ্ডলিত চমকপ্রদ সর্পের স্তায উষ্ণ সোমরসের আহতি প্রদান করেন। সর্পিণীর পূজায় সর্পই উপযুক্ত উপাদান।

“ইয়ং পিত্র্যা রাষ্ট্রী এতু অগ্রে, প্রথমায় জহুবে ভুবনেষ্ঠাঃ।

তস্মা এতং জুরুচং ধ্বারমহ্যং ধর্ম্যং শ্রীগন্ত প্রথমায়-

ধাস্তবে ॥” (৪।১।২)

পূর্বে বলা হইয়াছে, বাক্-গাভী যেমন সৃষ্টির আত্মশক্তি, তেমনি বাক্য, জ্ঞান, প্রজ্ঞা আদিরও উৎস। তাঁরই গর্ভজাত পুত্র-পিতা—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বাক্-পতি, ব্রহ্মপতি। সুতরাং কেহ যদি ঐ সর্পরাজ্ঞী বাকের সাধনা করিতে পারে, তাহা হইলে সে নিজে প্রজাপতি হইতে পারিবে। কিন্তু সাধনা করিতে গেলেই বাকের সহগামী মনস অতি অবশ্য আসিয়া পড়ে, যেহেতু মনসের সহিত বাকের নিত্য-সাহচর্য, বাক্-মনসা। প্রথম বৎস প্রসবের সময় তিনি “মনসা অভ্যাগাৎ”। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, গার্হপত্য অগ্নির মৃত সাপগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার, উপায়—সর্পরাজ্ঞী সৃজের মন্ত্র উচ্চারণ। সুতরাং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন (২।২।৬),

* The Universe and Dr. Einstein—P. 19.

সাধক “প্রজ্ঞাপতেরাষ্ট্র্যে” প্রজ্ঞাপত্তি লাভার্থ সর্পরাজ্ঞী-স্বক্তের ঋক্গুলিকে—“মনসা প্রস্তোতি, মনসা উদগায়তি, মনসা প্রতিহরতি”।

ঋগ্বেদের কতকগুলি মন্ত্রকে সুর-তাল-লয় সহকারে গীতরূপে গাওয়া যায়, ঐগুলিই সাম-গান। সোমযজ্ঞের সময় (পূর্বে বলা হইয়াছে, বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে সোমরস ও চাক্টিক্যময় সর্প) উচ্চৈঃস্বরে বিবিধ সুর-তাল-লয়-যোগে যে সাংগান করা হইত, তাহাব প্রধানতঃ তিনটি সুর বিভাগ ছিল—প্রস্তাব, উদগীতি ও প্রতিহার। সর্পরাজ্ঞী সাধনায় সর্পরাজ্ঞী-স্বক্তের মন্ত্রগুলি সামের ছন্দে গাহিতে হইবে—কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে নয়—মানস-বিধান, ইহা অতিমানস (Supramental) স্তরের গীতি-সাধনা।

মানবদেহে ঐ সর্পরাজ্ঞীর গতাগতি কোথায়? সর্পরাজ্ঞী-স্বক্তেই বলা হইয়াছে তিনি “অন্তশ্চরতি রোচনা অস্য প্রাণাদপানীতি”—প্রাণের গতাগতি রূপ প্রাণ ও অপানের মধ্যে। ঐ গতাগতি চলিতেছে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত ষট্চক্র বা পদ্ম (অথর্ব বেদের মতে অষ্টচক্র) যুক্ত সুষুম্না নাড়ীর (নালী, নালা, নদী) মধ্যে। ঋগ্বেদেও ইহার নাম জ্বোমা, উপনিষদে ইহার নাম হিতা-নাড়ী। ঐ সর্পিণী-মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তে কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া থাকেন এবং সর্বদা ঐ পদ্মানদীতে মনের রথে, মনসা হইয়া উজ্জান-ভাটি গতাগতি করেন। মন্ত্রকের ব্রহ্মরজ্জ-পথে তাহার রথের ছাদ হইল দ্ব্যলোক—“তৌরাসী-

হুতচ্ছদি”। সুরাং সোম্ভা কথায় দাঁড়াইল—মনসা-সর্পরাজ্ঞী সাধনা—যৌগিক কুণ্ডলিনী জাগরণের সাধনা। কুণ্ডলিনী সর্পিণী জাগরিতা হইয়া ফোস্ করিয়া-উর্ধ্বগতি করিতেই তাহার সর্বাঙ্গে জ্যোতির ঝিলিক প্রকটিত হয়; এই ঝিলিকই তাহার “ভাস”—“যন্তভাসা সর্বমিদং বিভাসতে”। সুরাং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণোক্ত সর্পরাজ্ঞী-স্বক্তের মনসা-সামগীতি—মনসার “ভাসান” গীত। বঙ্গদেশে প্রচলিত মনসা-ভাসানগীত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণোক্ত বৈদিক সাধনার সাম-মনসাগীতের অম্লকরণে রচিত গীত।

বঙ্গদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-সাহিত্যিক পণ্ডিতমহলে মনসামঙ্গল গীতিকাব্য ও তত্ত্বালোচনা বহু প্রচলিত। তাঁহাদের দৃষ্টিতে মনসা-পূজা অনার্য-সাঁপুড়েদের জাজুলী দেবীর পূজা এবং নৃত্য-গীত অনার্য-পাহাড়ীদের ঝুমুর গীত ও ঝুমুর নাচের অঙ্ক-অম্লকরণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতি মধ্যযুগে হুনিয়ায় আর কিছু না পাইয়া সাপুড়ে সাঁওতালদের নিকট হইতে তাহাদের দেবীপূজা ও নৃত্য-গীত ধার করিয়া আনিয়া “দস্ত করি বিষহরি” পূজা করিত (চৈতন্যভাগবত), এবং অদ্যাপি শ্রাবণ মাস আসিলেই “অনার্য জুইমঙ্গল্যমকীর্তিকরম্” ভাবে উন্নত হইয়া যায়। ঋগ্বেদে, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতার যুগে সর্পরাজ্ঞী-স্বক্তের মনসা-সর্পরাজ্ঞী ও মনসা সাধনা-গীতিও ছিল, সে দিকেও বাঙ্গালী জাতির দৃষ্টি পড়া হইত অসম্ভব ছিল না।

আবিষ্কার

শ্রী বৈদ্যনাথ বিশ্বাস

সারাটা দিনের ক্লান্তি। অবসাদের আচ্ছন্নতা সারাটা দেহ-মনে।

প্রাণাঙ্ককাব ঘর। নীরব নিমুদ্র।

আনমনা একাই বসে আছি।

একটা ক্রতিকটু শব্দ। তাকালাম। দেখি ঘুরন্ত একটা চামচিকে। কড়িকাঠে ঠোকুর খেতে খেতে এদিক ওদিক করছে ও।

বাইরে যেতে চায়।

ঘরের জানালা দরজাগুলো মুক্ত করে দিলাম।

কিন্তু পায়ের শব্দে পতঙ্গটির গতি হল আরও দ্রুত।

ঠোকুর খেতে লাগলো ঘন ঘন একই চক্রাকার পথে।

খোলা জানালা দরজার পথে একবারও গেল না।

ধুপ্। কড়িকাঠে ধাক্কা খেয়ে সজোরে মেজতে পড়লো একবার চামচিকেটি।

কাছে গেলাম ভাল করে দেখতে। দেখলাম, কিন্তু

বিশ্ময়ে চম্কে উঠলামঃ ওকি। এ যে আমি!

গতি ও পথ দু’-এরই এক।*

* প্রবর্তক সাহিত্যচক্রে পঠিত।



শিল্পীমন

— শ্রী ব্রজেন মোহন বসু —

(পূর্বাহ্নবৃত্তি : অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ সংখ্যার পর)

দিনে দিনে দেবকুমার সুস্থ হতে থাকে। দেশীয় ঔষধির চর্চায় তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। চরক ও শুক্রতের পরে জীবক ভেষজবিদ্যায় অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর বিদ্যার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে এই বিদ্যাকে ভিক্ষুরা প্রকৃত উন্নত করেছিলেন। শুধু রোগের নিরাময় করেই তাঁরা বিজ্ঞা শেষ করেন নি। পচনশীল ক্ষতকে নিরাময় করতে না পারলে অনেক সময় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেও তাঁরা দেহীকে সুস্থ করে তুলতেন। তদানীন্তন চিকিৎসা-বিদ্যানে অঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারটা ছিল এক পরম বিষয়। অধ্যাত ও উপেক্ষিত গাছপালা সম্পর্কেও তাঁদের বিশেষ জ্ঞান ছিল। হুরারোগ্য হতাশ রোগীকে সামান্য লতাপাতার রস পান করিয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতেন। তাছাড়া সেবার কাছে ভিক্ষু ও ভিক্ষুগীরা ছিলেন অনন্ত-সাধারণ। সাধারণ মানুষেরা এজ্ঞা তাঁদেরকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তার উপর আদর্শ জীবন-যাপন রীতি ও অসাধারণ জ্ঞান সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত

করতো। রোগে শোকে যিনি একবার এঁদের সংস্পর্শে এসে পড়তেন, তিনিই আর এঁদের সংস্পর্ক ছাড়তে পারতেন না। কেউ কেউ স্ববিরের কাছে দীক্ষা নিয়ে সাধন-ভজন শুরু করতেন, কেউ আবাব সজ্জ্ব গিয়েও যোগ দিতেন। জনমানসে মহাস্ববিরের আসন ছিল রাজারও উপরে।

বৌদ্ধ সজ্জ্ব যখন যেখানে অবস্থান করতো, সেইখানেই প্রতি সন্ধ্যায় ধর্ম-উপদেশের আসর বসতো। কোন গাছতলায় বসে সজ্জ্বাচার্য সমবেত নরনারীকে ধর্মকথা বলতেন। কেউ কোন প্রশ্ন তুললে তার সহজ সরল ব্যাখ্যা করে দিতেন। জীবন-জিজ্ঞাসার সামাধান খুঁজতে তাপিত শোকাক্ত মানুষ এসে সমবেত হতেন সেই সন্ধ্যা-ধর্মসভায়।

নিরালাদের সজ্জ্বাচার্য মহাস্ববির জ্ঞানপুত্র ধর্মালোচনা করতেন সামনের প্রাঙ্গণে। সামনে গঙ্গাতীর অবধি রশি-দুয়েক স্থান উন্মুক্ত ছিল, সেইখানেই এক বটগাছের নীচে তিনি বসতেন। দিনে অল্প সময় তিনি কক্ষের বাইরে আসিতেন না। জনশ্রুতি ছিল যে, তিনি রোগীর শির স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলে রোগ নিরাময় হয়, সেই কারণে অনেক অসুস্থ জনপদবাসী সেখানে সমবেত হতো। ধর্ম-উপদেশের শেষে তারা জ্ঞানপুত্রের আশিস্ ভিক্ষা করতো। মহাস্ববির জ্ঞানপুত্র প্রত্যেক রোগীর মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করতেন। অনেক দিন রাত্রি এক প্রহর অতীত হয়ে যেতো তবু বুদ্ধ মহাস্ববিরের কোন বিরক্তি প্রকাশ পেত না।

যেদিন থেকে দেবকুমারের চলার মত শক্তি হলো, সেইদিন থেকে সে প্রাঙ্গণে এসে বসতে লাগলো। ভৈরবের কথার মধ্যে যে রুক্ষ দৃঢ়তা সে শুনেছিল, মহাস্ববিরের কথায় তার বিপরীত স্রষ্টুকুই সে শুনেলো। ভৈরব কথা বলতেন আত্মপ্রতিষ্ঠার পৌরুষে, আর মহাস্ববির কথা বলেন বিচারদৃষ্টি স্নিগ্ধ উপলব্ধি দিয়ে। স্ববিরকে স্বীকৃতি না দিলেও কোন বিরোধ নেই। দেবকুমার যত মহাস্ববিরের কথা শোনে ততই মানুষটিকে তার ভাল লাগে।

ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানে আবার সাজো সাজো রব উঠেছে।

হর্ষবর্ধন কান্ধকুজ থেকে ফিরে এসেছেন। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত তিনি যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ তাঁকে করতে হয়নি। মালবরাজ্য দেবগুপ্ত কান্ধকুজের প্রাসাদ লুণ্ঠন করে প্রভূত ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। তত্পরি রাজবধূ রাজ্যশ্রীকেও তিনি বন্দী করেছিলেন। রাজ্যশ্রীর প্রতি দেবগুপ্তের আসক্তি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন রাজ্যশ্রীকে নিজ অন্তঃপুরে উপরাণী হিসাবে স্থান দিতে। এ ব্যাপারটা কিন্তু গোড়পতি শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের মনঃপূত হয়নি। রাজ্যশ্রী তাঁর মাতুলকন্যা। সম্ভবিধবা মাতুলকন্যার এই অপমান তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। মুখে কিছু না বললেও কোঁশলে তিনি দেবগুপ্তের বন্দিরাজ্যশ্রীকে মুক্ত করে পলায়নের সুবিধা করে দেন। দেবগুপ্তের কু-অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়। পরে দেবগুপ্ত শশাঙ্কের কুটিলচক্র আবিষ্কার করে রুষ্ট হন। মদমত্ত অবস্থায় শশাঙ্ককে কয়েকটা কটুক্তি করেন। শশাঙ্ক এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিলেন, তিনিও রুষ্টতাব দেখিয়ে সেই রাতেই সন্মিলে গোড়ে যাত্রা করলেন। শশাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠানের রাজবংশ যেন বেলী শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে, তাহলে শশাঙ্কের পক্ষে পাটলিপুত্র অতিক্রম করে বারাণসী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করা সম্ভব হবে। পুরাতন মগধসাম্রাজ্য আবার পূর্বগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং গুপ্তবংশ আবার উত্তরাপথে রাজচক্রবর্তীর মর্যাদা লাভ করবে। সেইদিক থেকে দেবগুপ্ত যখন মৌখারী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলো, শশাঙ্ক তখন তাঁর সহযোগী হন। গ্রহবর্মার মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠানের রাজশক্তি দুর্বল হলো। শশাঙ্কের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। তিনি এবার ফিরে গেলেন গোড়ে।

মালবরাজ্য দেবগুপ্ত যোদ্ধা হিসাবে বড় ছিলেন না। শশাঙ্কের উপর তাঁর অনেকখানি ভরসা ছিল। শশাঙ্ক চলে যাবার পব তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। মৌখারী রাজবংশেব প্রভূত ধনরত্ন তিনি সংগ্রহ করেছেন, সেই সব নিয়ে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করাই তিনি লাভজনক ভাবলেন। হর্ষবর্ধন যখন কনৌজে পৌঁছিলেন তার বহু পূর্বেই মালবের দেবগুপ্ত সন্মিলে স্বরাজ্যে প্রস্থান করেছেন।

হর্ষবর্ধন দেবগুপ্তের পশ্চাদ্ধাবন করতেন, কিন্তু শঙ্কর ভৈরব সঙ্গে ছিলেন, তিনি উপদেশ দিলেন—আগে পলাতক ভগ্নীর সন্ধান কর, প্রতিশোধ গ্রহণের অবকাশ পরে অনেক পাবে।

কয়েকদিন অহুসন্ধানের পরে পার্বত্য কিরাতজাতির সহায়তার হর্ষবর্ধন বিদ্যারণ্য মধ্যে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করলেন। রাজ্যশ্রী চিতা প্রজ্জ্বলিত করে আত্মাহুতি দেবার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সেই শেষ মুহূর্তে হর্ষবর্ধন সেখানে উপস্থিত হয়ে বোনকে রক্ষা করলেন।

ভৈরব উপদেশ দিলেন—আগে রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা কর। যুদ্ধযাত্রা করো তারপর।

বোনকে নিয়ে হর্ষবর্ধন প্রতিষ্ঠানে ফিরলেন।

হর্ষবর্ধন রাজ্যভার গ্রহণ করলেন, কিন্তু অভিষেক হলো না। হর্ষবর্ধন পণ করলেন—শত্রুকে শেষ না করে আমি সিংহাসনে বসবো না।

প্রথম শত্রু মালবরাজ্য দেবগুপ্ত। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্ত হর্ষবর্ধন প্রস্তুত হলেন। সমগ্র প্রতিষ্ঠানে সাজো সাজো রব উঠলো। প্রতিদিন সীমান্তের দুর্গগুলি থেকে মাণ্ডলিকদের নেতৃত্বে দলে দলে নতুন সৈন্য আসতে লাগলো। মহামাত্য ভাণ্ডীর পরামর্শ অমুযায়ী হর্ষবর্ধন এবার চিরাচরিত যুদ্ধনীতির ধারা বদল করতে চাইলেন। দূর থেকে শত্রুকে আঘাত হানা ও ছুরিত-গতিতে আক্রমণ চালানোর জন্ত তিনি তীরন্দাজ অস্বারোহী ছাড়া অস্ত্র কোন বাহিনী সংগঠন করলেন না। রথী ও রণহস্তী তিনি বর্জন করলেন। ইতিপূর্বে রাজারা হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধযাত্রা করতেন, হর্ষবর্ধন বললেন—আমি অশ্বপৃষ্ঠেই যাবো।

সম্রাট প্রতাকরবর্ধনের রাজত্বকালে শেষ কয় বছর উত্তরাপথে বেশ শান্তি ছিল, উল্লেখযোগ্য যুদ্ধবিগ্রহ কিছু ঘটেনি। সম্রাটের মৃত্যু কয়েক মাসের মধ্যেই উত্তরাপথে যুদ্ধের ভেরী বেজে উঠলো। প্রথমে কান্ধকুজের রাজবংশ লুপ্ত হলো, এবার মালবের পালা। সন্মিলে হর্ষবর্ধন যুদ্ধযাত্রা করলেন। বড় বড় নৌকায় সারাদিন ধরে সৈন্যবাহিনী গঙ্গা পার হলো, এবারকার যুদ্ধ-যাত্রায় বাত সমারোহ ছিল না, হর্ষবর্ধন বলেছিলেন—বিজয় গৌরবে যেদিন

প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসবো সেদিন বাজনা বাজবে; আজ নয়। সৈন্স পরিচালনায় সাহায্য হবে বলে তিনি সামান্য সংখ্যক ভেরীবাদক মাত্র সঙ্গে নিয়েছিলেন। নাগরিকেরা গঙ্গাতীরে জড়ো হয়েছিল এই অভিযান দেখতে। দেবকুমারও একপাশে একটা গাছতলায় এসে বসেছিল। এখান থেকে ভালো ভাবে সব কিছু দেখা যায় না। শুধু চোখে পড়ে আরোহীপূর্ণ নৌকা ওপারে যায় আর শূন্য নৌকা এপারে ফিরে আসে! যেন একখানি ঢাকা জলের উপর ঘুরছে, তার অর্ধেক পূর্ণ আর অর্ধেক শূন্য।

সন্ধ্যা সমাগমে পারাপারের কাজ শেষ হয়। দর্শকেরা ফিরে যায়। সব শেষে দেবকুমারও উঠে আসে। সম্ভাবাসের সামনে জ্ঞানপুত্র আলোচনা সভায় এসে বসবেন। পুণ্যার্থীদের সমাবেশ হতে শুরু হয়েছে। দেবকুমার সকলের পিছনে বসবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় নিরাল। এসে ডাকলো—ভদ্র, ঘরে পথ্য রেখে এসেছি, এখানে নিয়ে আসবো কি?

—না না, আমি যাচ্ছি,—দেবকুমার তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লো।

অস্থির দেহে যদি ক্লান্তি বোধ করেন তো আমিই নিয়ে আসছি।

—না আমি যাচ্ছি।

দেবকুমার ঘরে ফিরলো, একপাত্র দুধ ঢাকা দেওয়া ছিল, নিরাল। পাত্রটি এগিয়ে দিল দেবকুমারের হাতে। দুধটুকু পান করে দেবকুমার বললো—তোমার ঐকান্তিক সেবাতেই এবার আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।

—ভগবান তথাগত বুজের করুণায় সুস্থ হয়ে উঠেছো, আমরা নিমিত্তহীন।

—এই নিমিত্তের যোগাযোগ বড় বিস্ময়কর। তোমাকে যখন আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখনই তুমি আমার কাছে এসে পৌঁছে গিয়েছ।

—সে তথাগতের করুণা!

—হয়তো তাই। এর পিছনে অদৃষ্টের ইঙ্গিতও হয়তো আছে। একবার শঙ্কর ভৈরবের সঙ্গে দেখা হলে জেনে নিতাম তুমি আমার যুগ্মাঙ্গা কি না।

—শঙ্কর ভৈরব রাজগুরু? তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

—তাঁর সঙ্গেই আমি খজুরপুরী থেকে এখানে এসেছি।

তিনি তো রাজকুমারের সঙ্গে কাঙ্ক্ষাজ গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তো ফেরেন নি। শুনলাম তিনি হিমালয়ে চলে গেছেন।

—তাই হবে, ফিরে এলে তিনি নিশ্চয়ই আমার সন্ধান করতেন। তিনি আমাকে যে কাজের ভার দিয়েছিলেন তার কিছুই তো করা হয়নি।

—এইবার কিছু কিছু কাজ করার মত সামর্থ্য তোমার হবে। আমরা চলে গেলে তুমি অতিথিশালায় গিয়ে থাকবে। পাশে মন্দিরে বসে বসে কাজ করবে।

—তোমরা চলে যাচ্ছ?

—পরশু প্রত্যুষে আমরা এখান থেকে যাত্রা করবো। রণভূমির পিছনে আম'দের থাকতে হয়। যুদ্ধে আহত ও আর্তদের সেবা করাই আমাদের প্রধান কাজ। রাজকুমার উজ্জয়িনীর পথে অগ্রসর হলে আমাদের যেতে হবে তাঁর পশ্চাতে।

—তুমি চলে যাবে? আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি না?

—দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমার নেই। তাছাড়া তুমি আমাদের অহুগামী হবে কেন? মহাশুভির অহুমতি দেবেন না।

—আমি যদি তোমার মত ভিক্ষু হয়ে যাই?

—কেন?

—তোমার সঙ্গ আমার ছাড়তে ইচ্ছা হয় না।

—না। আমার আশা তুমি ত্যাগ কর। আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছি আমাকে আমার পথে চলতে দাও। তুমি তোমার নিজের পথে চল।

—নিরাল।

—নিরাল। নয়। ভিক্ষুণী উত্তমা।

দেবকুমার করুণ দৃষ্টিতে তাকালো নিরালার মুখের পানে। নিরাল। চোখ ফিরিয়ে নিল। বললো—মহাশুভির সভায় এসেছেন, আমি যাই।

নিরালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
দেবকুমার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল, তারপর
নিরালার অহুগমন করলো।

সেদিন যুদ্ধের আবহাওয়া নাগরিকদের চিন্তা
প্রভাবিত করেছিল। জ্ঞানপুত্র সেই মানসিক পরিবেশে
যুদ্ধের অহিংসা ও ক্ষমার আখ্যান বিবৃত করলেন।
মহারাজ বিদ্বিসারের পুত্রকামনায় ছাগ বলি দেবার
ইচ্ছা, এবং সেই ছাগ বলির জন্ত যুদ্ধের আশ্রয়দানের
আবেদন।—সামান্য পশুপ্রাণের জন্ত এক মহাপ্রাণের
আত্মনিবেদন, সর্বজীবের সমভাব। মহারাজ অজ্ঞাতশত্রুর
সমস্ত অনাচার ক্ষমা করে তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করে
অসামান্য মানবতা-বোধের পরিচয়,—মহাযুদ্ধের মধ্যে
দেবত্বের স্বীকৃতি দান। অহিংসা ও ক্ষমার মাধ্যমে
মানুষ যে পূর্ণতা লাভ করে সেইখানেই মানবের মহত্ব।
জ্ঞানপুত্র বললেন—যে ক্ষমা করে সে-ই যে মহৎ হয় তা
নয়, যে ক্ষমা পায় তার চিন্তেও মহত্বের উদ্বোধন হয়,
আর যারা নিকটে থেকে এই মহত্বের দর্শকমাত্র থাকে
তাদেরও চিন্তাভ্রমণ ঘটে। জীবদেহে মহাযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ
জন্ম। এ জন্মে ক্ষমাই চিন্তাবৃত্তি নিরোধের শ্রেষ্ঠ পন্থা।
এবং চিন্তাভ্রমণ হলে নির্বাণলাভের সাধনা অগম হয়।
নির্বাণলাভই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য।

জ্ঞানপুত্র ব্যাখ্যান শেষ করলেন। চিন্তাশীল
প্রবীণেরা বুঝলেন রাজকুমার হর্ষবর্ধন যে প্রতিশোধ
স্পৃহা নিয়ে আজ মালবে যুদ্ধযাত্রা করলেন, আজকের

এই আখ্যানের অন্তরালে সেই জিঘাংসাবৃত্তির কথা
প্রচ্ছন্ন আছে।

একে একে কয়েকজন রোগাতুরের মস্তক স্পর্শ করে
মহাস্থবির আশীর্বাদ করলেন। তারপর একে একে
ভীড় হালকা হতে শুরু হলো।

সকলে চলে যাবার পর দেবকুমার এগিয়ে গেল
মহাস্থবিরের সামনে। বললো—প্রভু, আমার একটি
নিবেদন আছে।

—কী বল ?

—আমি সেবাত্রতী হতে চাই।

—কোন বাধা নাই।

—আপনার অহুমতি পেলে আমি আপনাদের
অহুগামী হবো।

—দীর্ঘ পদযাত্রার সামর্থ্য তোমার এখন নেই।

দেবকুমার আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না। তার
মুখে হতাশা ফুটে উঠলো। জ্ঞানপুত্র কয়েক মুহূর্ত মৌন
থেকে বললেন, সেবার জন্ত কোন দলের প্রয়োজন হয়
না। ঋণ ও আতুরের অভাব কোন স্থানেই নেই, নিকাম
সেবাত্রতী অল্পই দেখা যায়। সেবাই যদি তোমার ব্রত
হয়, স্বেচ্ছায়ের অভাব হবে না কোনখানেই। ভগবান
তথাগতের রূপায় তোমার শুভেচ্ছা সার্বক হোক।

কথা শেষ হলো। মহাস্থবির চক্ষু মুদ্রিত করে
ধ্যানস্থ হলেন। সত্যশেষে কয়েক দণ্ড ধ্যানস্থ থাকাই
তাঁর রীতি। দেবকুমার স্থবিরের পদধূলি গ্রহণ করে
বিরস চিন্তে ঘরে ফিরলো।

(ক্রমশঃ)

জননী

শ্রীগণেশচন্দ্র সামন্ত

তোমায় জেনেছি মাগো, বারে বারে আমি যে চিনেছি,
সেই আমি তোমাতে প্রকাশি নানা রূপে নানা রসে ;
কহু জলে কহু স্থলে, অস্তরীক্ষে কহু বা মিশেছি,
আবার এ পৃথ্বী-বক্ষে গান গাই—যশ-অপযশে।

তোমাতে দেখেছি বিশ্ব চিনিবার দৃষ্টি সীমাহীন,
কোমল-চরণে তব কমলের পেয়েছি স্বেচ্ছাণ ;
অন্তায়ের ধ্বংস লাগি প্রলয়ের তুমি যে অধীন।
বরাভয় দানি' পুনঃ হুঃস্বজনে ক'রে যাও ত্রাণ !

বৃদ্ধদের মত মোরা শ্রোতে ভাসি তব স্পর্শ তরে ;

পথ-পরিক্রমা মাঝে মগ্ন আছি তব স্মৃতি ধরে।

দেখে এলাম চন্দননগর

শ্রীহংস

চন্দননগর ষ্টেশনে ট্রেন থামলো। নামলাম। ভোর
সাড়ে চারটে।

এখনও রাত আছে, আকাশ ভর্তি তারা আছে।
অস্পষ্ট অন্ধকারে একটা সরু গলির মুখে এসে রিক্সাটা
দাঁড়াল।

গলির পাশের দু' একটা জানালা থেকে আলোক
রেখা ছড়িয়ে পড়েছে গলিতে—অন্ধকারটা সহনীয় করে'
তুলেছে।

—গলির শেষের ঐ ডান-হাতি বাড়িটার কড়া
নাড়ুন। ঐ বাড়িতেই থাকেন তিনি।

সমঝোচিত উপদেশ দিবে আর যথোচিত দক্ষিণা নিয়ে
রিক্সাওয়ালা তো বিদায় নিল। কিন্তু অমনি অসময়ে
কড়া মেড়ে' কোনো ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙাতে মন
কিছুতেই সাড়া দিচ্ছে না। রিক্সাওয়ালার পাল্লার পড়ে
কেন যে এত ভোরে 'চলে' এলুম। ষ্টেশনের ওয়েটিং
রুমে ঘন্টারই বিশ্রাম নিয়ে এলেই হত ভাল। সংবাদ
অবস্থা দেওয়া ছিল, কিন্তু সঙ্কোচ আর কাটে না। অথচ
অন্ধকার গলিতে হু'ধন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকারও বিপদ
আছে; হঠাৎ কারও নজরে পড়ে' গেলে, শেষে না আবার
লালঘরে গিয়ে নজরানা দিতে হয়।

দ্বিধা-জড়িত পদে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম সরু
গলির শেষ দরজায়। ডান-হাতি একটা জানালা-পথে
আলো এসে পড়েছে গলিটার। দুয়ার রুদ্ধ। কিন্তু
জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরের ভিতরটা। গাদা গাদা
বই, কাঁইল পত্র, চেয়ার-টেবল আলমারীতে ঘরখানা
বোঝাই। টেবলে টেলিফোনও রয়েছে দেখছি। এইটেই
স্তবে অফিস-ঘর, তথা বৈঠকখানা।

স্বভাবতঃই জানালা-পথে দৃষ্টি এগিবে গেল অন্ধরের
দিকে। প্রথম জানালার মুখোমুখী দ্বিতীয় জানালা।
তারপর একটু সরু চত্বর পেরিয়ে আর এক জানালা।
জানালা পথেই দেখলুম জেগে আছেন এ যুগের অতল
সাধক প্রবর্তক সংস্করণ মতিলাল রায় আর তাঁর 'জীবন-
সঙ্গিনী' সম্বজননী। ছ'খানা ছবি। কিন্তু সেই মুহূর্তে

মনে হ'ল, 'তুমি কি কেবলই ছবি?.....নও ছবি, নও
শুধু ছবি'। তুমিতো জেগেই আছ, তবে আর ঘুম
ভাঙাবার সঙ্কোচ কেন?

অভাব অসঙ্কোচে ডাকলুম এবার,—অরুণদা আছেন?

তৎক্ষণাৎ সাড়া পেলুম। সদ্যস্নাত, প্রভাত পুষ্পের
মত স্নিগ্ধ একটি বালিকা দরজা খুলে' সাধর অত্যাশ্রয়
করল—আমুন। দাদামণি স্নান করছেন। একুনি
আসবেন।

অসঙ্কোচ আহ্বান। আগন্তকের পরিচয়েরও প্রয়োজন
নেই? এখানে কি সকলেই স্বাগত?

সেই বৈঠকখানা ঘরেই বসতে বসে বালিকাটি। তার
মারকৎ আত্মপরিচয় পেশ করলুম।

মিনিট খানেকের মধ্যেই অরুণদা এসে জড়িয়ে ধরলেন
হাসিমুখে—বাধা দেবার আর অবকাশই দিলেন না।
অথচ আমাদের পরিচয় মাত্র একদিনের। কয়েক
মিনিটের।

পূণ্যদেহস্পর্শে-নিজে তো ধস্তা হলাম, কিন্তু যে মানুষ এই
মাত্র স্নান করে' শুদ্ধবাস শুভ্র উত্তরীয় ধারণ করে'
এসেছেন, তাঁকে যে আবার স্নান করতে হবে। এই
অস্বস্তিকর অমুভূতিটা বড় পীড়া দিতে শুরু করল।

সংক্ষেপে কুশল প্রশ্ন সেরে, আমাকে কোন কথা
বলবার অবকাশ না দিয়েই তিনি বাজেন, চলুন, প্রায়
পাঁচটা বাজে। কথা পরে হবে, আগে মাতৃমন্দিরে প্রণাম
করে' আসি।

সম্মোহিতের মত অহুসরণ করলুম। বলাই হল না যে,
আমার বাসি কাপড়, এখনও হাত-মুখ ধুইনি, স্নান তো
দূরের কথা। মনে-মনে ভাবলুম, যে মন্দিরই হোক, বার
থেকে প্রণাম করব। এই অস্বস্তি দেহে মন্দিরে ঢুকব না।

যেতে যেতে বলছেন, এটা আমাদের নারী-মন্দির।
সত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগের মহিলাকর্মীরা থাকেন। আমি
এখানকার দ্বাররক্ষক প্রহরী।

মনে-মনে বললুম—হাঁ, 'দ্বাররক্ষকই বটে—পূণ্য-ব্রহ্ম-
ভূমির মহামূল্য নারীরত্নদের সংরক্ষক!

অল্প একটু দূরেই মাতৃ-মন্দির। অরুণদা তো মন্দিরের বারান্দায় উঠে আমার জন্ত একখানা আসন পেতে আহ্বান জানালেন। আমি জুতো খুলে প্রথম সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে পড়লুম শুক বিস্ময়ে। নিজের অপবিত্র জামাকাপড়ের কথা আর ভাবছি না এবার, এবার ভাবছি সমুদ্রের ঐ অপার্থিব বিষয়ের কথা।

শ্বেতপ্রস্তর বেদীর উপর লাল পাড় শাড়ী-পরিহিতা, সুবর্ণ কঙ্কনশোভিতা, ললাটে সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদূর-রেখাঙ্কিতা কে ঐ সদ্যস্নাতা দিব্যদেহী মানবী! আহা! গরমে বুঝি নাসিকা-নিম্নে, দক্ষিণ জ্বর উপরটায়-একটু ধেমে উঠেছে। একটু হাওয়া করলেই ঘামটা শুকিয়ে যাবে। চোখ দুটি কী অপক্লপ করুণা-ঘন। সে চোখ যেন দ্বিধাগ্রস্ত এক সন্তানকে পরম স্নেহে আহ্বান করছে। সেই আহ্বানেই ধীরপদে উঠে এলুম মন্দিরে। এ মূর্তি যে জীবন্ত নয়, এ যে মৃন্ময়ী, তা জানে জেনেও মনে স্বীকার করতে পারছি না, স্বীকার করতে চাইছে না আমার চোখ। এর যে প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত জীবন্ত। এর নির্মাতাকে প্রশংসা। তিনি সিদ্ধসাধক। মাতৃমন্দিরে সজ্জ-জননী মূর্তি তাই সাধকের ধ্যানলোকের জীবন্ত বিগ্রহ। ধারা তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, তাঁরা এখানে এসে একটিবার তাকালেই পূর্ণ-মনস্কাম হবেন। যেমন আজ পূর্ণ হল আমার কামনা। সজ্জজননীকে স্বচক্ষে দেখিনি, একথা বললে যেন এখন মিথ্যা বলা হবে।

পরে শুনেছিলাম, এ ভ্রম শুধু আমার নয়, এমনি আরও অনেকে প্রথম দর্শনে সজ্জজননীকে জীবন্তই ভেবেছেন। বারে বারে প্রশ্ন করেও দ্বিধা কাটেনি।

বাংলার মৃৎশিল্পের এ এক পরমাস্ফুট নিদর্শন।

সজ্জকর্মীরা, তৎসহ অরুণদাও, বেদমন্ত্র, স্তোত্র ইত্যাদি পাঠ করে' মাকে প্রভাতী-বন্দনা করছেন। অদূরে গঙ্গা প্রভাত সূর্যের প্রথম আলিঙ্গনে মধুর ঐশ্বর্যাগে রাঙা হয়ে উঠেছে। ভক্তগণের ধ্যানলোক মৃন্ময়ী না চিন্ময়ী হয়ে উঠেছেন। ধীরে-ধীরে ঘুম ভাঙছে বিশ্বচরাচরের। আহা, এই মধুব সময়টা আমি কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম টেশান-প্রাটফর্মে! ঋষি বলেছেন, “মধুকরন্তি নিত্যস”। মধু তো নিত্যই ক্ষরিত হচ্ছে সৃষ্টির মূলধার থেকে,

কিন্তু দেখবার মত চোখ যে নেই, নেই যে অল্পতব করার মত হৃদয়। তাইতো মাতৃমন্দিরে আত্মকের এই ব্রহ্মমুহুর্তে ভক্ত কণ্ঠের ব্রহ্মনাম গানে যে ঋণধারায় মধুকরণ হলো, তার ক্ষণিক অমুভূতিতে এতটা বিহ্বল হয়ে পড়েছি।

এইখানে বসে' অন্নাত বলে আর অপবিত্র মনে হল না নিজেকে। ‘মন না রাঙায়ে ঘোণী কাপড় রাঙালে কি হবে’। অরুণদার রাঙান মন বলেই আমার বাসি কাপড় ঠুঁর মনকে স্পর্শ করেনি। তাই তো আলিঙ্গনে ঠুঁর দ্বিধা হল না। তাই তো মন্দিরে আমার জন্ত আসন পেতে দিতে পারলেন অসঙ্কোচে।

প্রভাতী বন্দনা শেষ করে' এবার অরুণদা আমার নিয়ে এলেন মাতৃমন্দিরের সামনে দোতলা বাড়ীটায়। একতলার একটা ঘর খুলে দিয়ে বলেন, এই ঘরেই থাকুন আপনি। এটা রাধারমণদার ঘর।

প্রাতঃকৃত্যাদির সমস্ত ব্যবস্থা নিজে সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে' করে' দিলেন। কোথায় জল, কোথায় মগ, এমন কি কোথায় কাপড় শুকোতে দিতে হবে, তার সবটুকু খুঁটিনাটি পর্যন্ত নিজে না করে যেন ঠুঁর তৃপ্তি সেই।

স্নান করে, জামা-কাপড় বদলে এবার সহজ হলুম। বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন অরুণদা।

—বেশ তাড়াতাড়ি সেরেছেন তো! হাসিমুখে বলেন,—আমুন উপরে।

খড়ম পায়ে আগে চলেছেন অরুণদা। পেছনে আমি। দোতলায় উঠলুম।

দোতলার দক্ষিণাংশে পাশাপাশি দু'খানা ঘর। পূব-দিকের ঘরটির দেয়াল ঘেরা সজ্জগুরুর বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন মনীষীসহ এবং একক অসংখ্য আলোক-চিত্রের বিভিন্ন প্রদর্শনী। ছবিগুলি একে-একে বর্ণনা করলেন অরুণদা।

পশ্চিমদিকের ঘরখানিতে একটা শুক গাভীর্ষ।—এই ঘরেই সজ্জগুরু দেহরক্ষা করেছিলেন।

অরুণদার কণ্ঠ তারাক্রান্ত।

শয্যাটি তেমনই রয়েছে, পরিচ্ছন্ন, প্রাণবন্ত। সজ্জগুরুর ব্যবহৃত বহু জিনিষপত্র আজও যেন লেগে রয়েছে তাঁর পূত স্পর্শ। পালঙ্কোপরি সজ্জগুরুর মালা-চন্দন-

ভূষিত পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। মেঝে ধ্যানরতা এক মাতৃমূর্তি। হয়তো সজ্জের কোন কর্মী নারী, হয়তো সজ্জগুরু পরিবারেরই কেউ। পরিচয় নিতে গিয়ে এই দিব্য পরিবেশ বিস্মিত করতে সাহস হল না। নীরবে প্রণাম জানিয়ে চলে' এলাম একটা অনাস্বাদিতপূর্ণ আনন্দ-নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে।

প্রাতঃকালীন চা-পর্ব দোতলার বারান্দায়ই সমাপ্ত হল। তখন অরুণদা পরিচয় করিয়ে দিলেন আরও কয়েকজন সজ্জকর্মীর সাথে।

—আজকের দিনটা থাকতে পারবেন না? অরুণদার প্রশ্ন।

—দশটা পর্যন্ত পারব। গোটা বারোর মধ্যে কলকাতা পৌঁছতে চাই যে! একটু স্করুরী কাজ আছে। সন্ধ্যাচের সহিত বলতে হল।

—তা হলে আর দেরি নয়। আসুন যতটা সম্ভব দেখিয়ে দেই।

সেই যে দেখান শুরু হল সাড়ে ছয়টায় আর শেষ হতে প্রায় এগারটা।

বয়সে অরুণদা আমার অনেক বড়। শুনেছি রমণদার চেয়েও দু'তিন বছরের বড়। স্বাস্থ্যটাও দেখে মনে হবে আমার চেয়ে অনেক রোগী, অনেক দুর্বল। চুলগুলি তো সব তুষারভূষ। অথচ ঐ মাহুটি যে খড়ম পায়ে সমানে পাঁচ ঘণ্টা পরিক্রমা করে', আর অনর্গল কথা বলে' এতটুকুও ক্লান্ত হলেন না; একবারও বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করলেন না, এ-ও একটা বিস্ময়। খাবার সময়ও সারাক্ষণ পাশে বসে'-বসে' গল্প করলেন। প্রায় সাড়ে এগারটায় যখন আবার রিক্সা উঠছি, তখনও অরুণদা পাশে। রিক্সাও ডেকে দিলেন তিনি। ঠিক করে' দিলেন ভাড়া।

ইতিমধ্যে আমার সবল হাঁটু কয়েকবার প্রতিবাদ করেছে। লজ্জায় নীরব থেকেছি, আর পরম বিষয়ে ভেবেছি ঐ শুকনো হাড়গুলির মধ্যে এত শক্তিও সংহত রয়েছে। সবদিকে অরুণদার সমান নজর। মুখে হাসিটি লেগে আছে সারাক্ষণ। টেলিফোনে যখন কথা বলছেন জনৈক মহামান্য মন্ত্রী সঙ্গে তখনও যে শ্রু, যখন কথা

বলছেন তাঁতঘরের একটি অতি সাধারণ মেয়ে কর্মীর সাথে তখনও সেই শ্রু। প্রতিটি কথায় শিল্প সারল্য, প্রস্তার দার্ঢ্য। স্নেহ-মমতা যেন ঝরে পড়ছে কথার সাথে। বড়দের অরুণদা আর ছোটদের দাদামণি এই মাহুটি, বিশ্বসংসারকে একেবারে আপন করে' নিয়েছেন। কেউ পর নয়, কেউ দূর নয়।

এই পাঁচ ঘণ্টায় অরুণদার মুখে যত কথা শুনেছি, সবটুকু মনে রাখতে পারিনি। যেটুকু ধরে' রাখতে পেরেছি, তার মধ্যে ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, শাসন-ব্যবস্থা, স্বাধীন সরকারের স্বরূপ-বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে তাঁর যে উদার দেশপ্রেম আর অন্তহীন তত্ত্বজিজ্ঞাসু একটি মনের পরিচয় পেয়েছি, সেটুকু বর্ণনা করতেও একখানা পূর্ণ গ্রন্থের প্রয়োজন। সে প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে' কি দেখলুম তাই বলি।

প্রথমে নিয়ে চলেন ডেস্টিটিউট হোম-এ। চলার পথে বর্ণনা করে' চলেছেন চন্দননগরের ইতিহাস। জব চার্ণকের কলকাতার চেয়েও প্রাচীন এই চন্দননগর। স্মৃতিটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা তিন গ্রাম নিয়ে যেমন কলকাতা, তেমনি চার্ণকের অনেক আগে ফরাসীরা এখানেও তিনটি গ্রাম—বোডরুপপুর, খলিসানী, গোলন্দাপাড়া নিয়ে পত্তন করেন চন্দননগরের। এখান থেকেই নাম চুরি করে' কলকাতার রাস্তার নাম, পাড়ার নাম—যেমন হাটখোলা, বোঁবাজার, বাগবাজার ইত্যাদি।

বিভিন্ন জেলার, বিশেষ করে' পূর্ববঙ্গের নিরাশ্রয় কতগুলি বাস্তুহারা বালক-বালিকা নিয়ে একদা শ্রামাশ্রমাদ মুখার্জীর প্রেরণায় এই অনাথ আশ্রমের স্তম্ভপাত করেন সজ্জগুরু। আজ শতাধিক সংখ্যক বালক-বালিকা সেখানে আশ্রয় পেয়েছে, শিক্ষা পাচ্ছে, বিভিন্ন হস্তশিল্প শিখতে-শিখতে স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠছে। কেল্লটি ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। একতলার উপর উঠছে দোতলা। দোতলার মস্ত হলঘরের ছাদও উঠে' গেছে। পরিচয় হল কয়েকটি মেয়ের সাথে। আহা, কী নম্র আচরণ, কী শাস্ত আনন্দময় মুখশ্রী। কেউ বসে নেই। কেউ কাজ করছে তাঁত ঘরে, কেউ প্রেসে, কেউ সেলাই

শিক্ষণ-কেন্দ্রে। অরুণদা এদের সকলের দাদামনি। এদের একান্ত আপনার জন। এদের খেলার সাথী। এদের বন্ধু। এমন-একটি আপন জনের স্নেহাশ্রয়ে বারা রয়েছে, কে বলে তারা অনাথ। তাইতো একটি মুখেও নেই মসিনতার ছায়া। পরম আশ্রয়ের অশঙ্ক অঙ্কে অগঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করে' এরা ভুলেই গেছে এদের অনাথত্ব। আজ ওরা স-নাথ, তাইতো সানন্দ।

তীতধর, ছাপাখানা, চেয়ারের কারখানা, সেলাই শিক্ষণ-কেন্দ্র ইত্যাদি দ্রুত পরিক্রমা করে' এগিয়ে চলেন অরুণদা।

—আজ্ঞন এবার শ্রীমন্দিরে।

পৌহলুম এসে গোস্বামী ঘাটে দু'শ বছরের প্রাচীন এক মন্দির-প্রাঙ্গণে। এই প্রাঙ্গণেই সজ্জের বিভিন্ন উৎসব হয়। এইখানেই ছেলেদের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মেয়েদেরটা অল্প দিকে। আশ্রমের কাছে।

নানা হাত-বদল হতে-হতে এক কালের এই শক্তি মন্দির কি করে' সজ্জগুরু হাতে এসে প্রবর্তক শ্রীমন্দিরে রূপান্তরিত হল সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। মন্দিরের মূল বিগ্রহ আজ আর নেই। তার পরিবর্তে এক তলায় সজ্জগুরু পরিকল্পিত নব বিগ্রহ, ঠিকার-বিজড়িত শিবলিঙ্গ। পশ্চাৎপটে একখণ্ড স্বেতপ্রস্তরে অপরূপ ভাস্কর্যের নিদর্শন একটি প্রতীক। ব্যাখ্যা বয়ে' বুঝিয়ে দিলেন অরুণদা; ওহা নিহিত ধর্মরহস্য, পুরুষ-প্রকৃতির অনন্ত কালের সাধনা এই রহস্যোদ্ঘাটন। আর শেষে সেই সাধনা-লব্ধ সত্যকে চতুষ্টিকলায় বিশ্বময় বিকীরণ।

এই বিকীরণই তো করে' গেছেন সজ্জগুরু, করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। আর এখনও করে' চলেছেন তাঁদের উত্তর-সাধকগণ বিরাট কর্মসজ্জের মাধ্যমে।

সরু সিঁড়ি বেয়ে' বক্রগতিতে দোতলায় উঠতে-উঠতে অরুণদা বলছেন—এ সিঁড়িও একটা প্রতীক। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ পথ।

ব্যাখ্যা শুনে' একটা আশ্চর্য অমৃভূতিতে সার্বদ শিহরিত হয়ে' উঠল। মুহূর্তে যেন অমৃতব করলুম মূল্যধার থেকে স্বাধিষ্ঠান-মণিপুরপথে সেই জাগরণের সাড়া আজ্ঞাচক্র অতিমুখে।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি সম্মুখে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টিত পুতসলিলা ভাগীরথী। বর্ষায় খরস্রোতে চঞ্চলা, নৃত্যগরা। উজ্জ্বল সূর্যকরাঘাতে হাস্তানাস্তময়ী। উর্ধ্বে অনন্ত অধরে শরতের লঘু মেঘের নয়ন-ভুলানো লীলা-বিলাস—“আনন্দাঙ্কোব স্বধিমানি ভূতানি জায়ন্তে”—বিশ্ব-চরাচর আনন্দমাগরে মত্তরগ-রত। জলে স্থলে-ব্যোমে আনন্দের বহু বইছে যেন।

—এই বারান্দায় বসে' সজ্জগুরু অনেক শাস্ত্রাধ্যয়ন, সাহিত্যচর্চা করেছেন,—বলেন অরুণদা। তাইতো তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একটি সুরই বিশেষ করে ধ্বনিত হয় : “আনন্দরূপমৃতম্ যদ্বিতাতি”। এই আনন্দময় পরিবেশ-জাত আনন্দ সুরটি ছড়িয়ে আছে চন্দননগরের পথে-ঘাটে। এই সুরেরই পরশ পেয়েছে সজ্জের প্রতিটি কর্মী, প্রতিটি শিশু, বৃদ্ধ, নর নারী।

—ঐ যে চেয়ারগুলি দেখছেন, আর ঐ ব্যাঙ্গচর্চ, ঐগুলির ব্যবহার হত যখন সজ্জগুরু তাঁর অন্তরঙ্গদের নিয়ে বৈঠক বসাতেন এখানে।

দেখলুম আজও সযত্নে রক্ষিত রয়েছে সব। মন্দির-বেদীতে সজ্জগুরু মনোরম প্রতিকৃতি নিত্য পুজিত হচ্ছে।

তেতলার মন্দিরগর্ভটি অপেক্ষাকৃত ছোট—কারণ মন্দিরশীর্ষ ক্রমেই সরু হয়ে গেছে। এখানে বারান্দাটিও ছোট। তেতলার বেদীতে সজ্জজননীর অয়েল পেইন্টিং চিন্ময়ী মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠিত। এত উঁচু থেকে সামনের দৃশ্যপট আরও অপরূপ দেখায়।

ভাগীরথী পশ্চিমকূল, বারানসী সমতল—তা'ছাড়া গঙ্গার এই অর্ধচন্দ্রাকার রূপ চন্দননগর ব্যতীত একমাত্র কাশীতেই দেখা যায়। দীর্ঘকাল ধরে' এখানে এই কার্ভটি (Carve) অবিকৃত রয়েছে, বলেন অরুণদা। তাই অনেকে বলেন,—চন্দননগর দ্বিতীয় কাশী।

সিঁড়ি শেষ হয়েছে এখানে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ-পথের শেষ ধাপ। এই বুঝি আজ্ঞাচক্র। এইখানেই বুঝি সত্যোপলব্ধি করেছিলেন সজ্জগুরু।

হ্যাঁ, সজ্জগুরু জীবন-দর্শন আর আত্মবিকীরণ এইখানে বসেই।

দেখলুম সাধন-আসনটি আঙ্গণে তেমনই রয়েছে। মাথা আপনিই নত হয়ে' এল। হে যুগন্তর, প্রণাম! শত শত প্রণাম!

অদীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে' নামতে-নামতে হাঁটু ভেঙ্গে আসে। কিন্তু ক্লান্তি নেই সামনের ঐ রোগা যাহুটির।

অকম্পিত দৃঢ়পদে সম লয়ে খড়মের ছন্দিত শব্দ করতে-করতে এগিয়ে চলে।

—কটা বাজল? চলতে চলতেই প্রশ্ন করেন।

—প্রায় সাড়ে ন'টা।

—এখনও যে অনেক দেখতে বাকী! পায়ের গতি হল দ্রুততর। আসুন সংক্ষেপে সারি।

কিরে' এলুম সেই গলির প্রান্তের প্রথম বাড়ীটিতে। পথে এক নজরে বালিকা বিদ্যালয়টি দেখালেন। দেখালেন রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত আশীর্বাণী।

অফিস-ঘরে কয়েকজন দর্শনপ্রার্থী অপেক্ষা করছিলেন। কয়েক মিনিটে তাঁদের যথাযথ নির্দেশ দিয়ে, একটা জরুরী টেলিফোন কল সেরে' আমায় নিয়ে এলেন তিনি সেই বাড়ীর অম্বরমহলে।

—এইটি আমাদের সজ্জ-মন্দির।

চারিধারে ছোট-ছোট কামরা। মাঝখানে সর্ব একফালি ক্ষুদ্র চাতাল। চাতালটি চতুর্দিকে সমস্ত-লালিত ফুলের টবে সাজান। এই ক্ষুদ্র চাতাল ধস্ত হয়ে আছে অনেক বৃহত্তর, মহত্তর পদক্ষেপে। বাঁ-হাতের দেয়ালে এক দীর্ঘ প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে অগ্নি-যুগের সব বীর সৈনিকদের নাম। এঁদের কেউ-কেউ আজও বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন সেদিনের সেই অবিভক্ত বাংলা আর অধুনা ভারতের স্বপ্ন বুকে নিয়ে। এ স্বপ্ন কি সত্য হবে না? সফল হবে না কি তাঁদের সেই মরণ-পন সাধনা!

সেকালের বৃটিশ শক্তির অনেক মহারথীই শুধু নয়, নয় শুধু সেই অগ্নিহোতৃদল, এই চাতালে পদার্পণ-করে' গেছেন রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, নেতাজী, শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ অনেক মহামনীষী। এ চাতাল এ যুগের ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র।

চাতালের সামনের ঘরটিতে সজ্জগুরু ও সজ্জজননী

মালাভূষিত তৈলচিত্র। এখানেও নিত্য পূজা হয়। জানালা পথে ভোরে প্রথম দর্শন করেছিলাম এই যুগল-বিগ্রহ। এবার স্পর্শ করে' প্রণামের সৌভাগ্য হল। ধস্ত হলুম।

—আসুন এই সেল-এ। বাঁ পাশের ক্ষুদ্র একটি অন্ধকার কুঠরীতে প্রবেশ করে' দেয়াল-গাভের অইচ্-টিপলেন অরুণদা। বেলা দশটায়ও বাতি না জ্বাললে চলে না। সত্যিই যে সেল! জেলখানার কয়েদীদের সেলও বোধ হয় এর থেকে অনেক বড় থাকে!

আজ আর এটি সেল নয়। বরং বলা চলে শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি-মন্দির। শ্রীঅরবিন্দের তৈলচিত্র সম্মুখে শোভিত রয়েছে বেদীর উপর। ঐ বেদীর পেছনের দেয়ালেই একদা ছিল এই চোরকুঠুরীর পশাদ্দার। সেটি বন্ধ করা হয়েছে দেয়াল গঁথে'। সেই দ্বারপথেই সেদিন.....

বর্ণনা করলেন অরুণ-দা শ্রীঅরবিন্দের আলিপুর জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর কর্মযোগিন অফিস থেকে চন্দননগর আসা, আর মতিলালের সহযোগিতায় এই চোরকুঠুরীতে আত্মগোপনের রোমাঞ্চকর কাহিনী। সে যুগে গোপনচারী পলাতক, ইংরেজের আতঙ্ক, এক সর্বনাশা বিপ্লবীকে নিজের ঘরে অভয় আশ্রয় দিতে যে পরিমাণ বৃকের পাটা দরকার, তা' একমাত্র মতিলালেই সম্ভবপর।

আলিপুর জেলের এক সেল-এ শ্রীঅরবিন্দের বাহুদেব-দর্শন, আর চন্দননগরের এই সেল-এ তাঁর মা কালী-দর্শন। বাংলার মাতৃসাধনার যে ধারা হালিসহরে শুরু, দক্ষিণেথরে হল তার চূড়ান্ত বিকাশ, আর চন্দন-নগরের এই ক্ষুদ্র সেল-এ রচিত হ'ল তার শেষ অধ্যায়। শ্রীঅরবিন্দ সিদ্ধ হলেন মাতৃ-মন্ত্র-সাধনায়। সাক্ষাৎ দর্শন পেলেন মায়ের।

অপূর্ব কাহিনী! বর্ণনা করতে-করতে অরুণদার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে' উঠছে ভাবতন্ময়তায়। আমি শুক্ন বিষয়ে তাকিয়ে আছি সেই চোখের দিকে।

কর্মযোগিন অফিসে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে আসার প্রাক্‌মুহূর্তেই নাকি শ্রীঅরবিন্দ দৈববাণেশ পেয়েছিলেন

“Go to Chandernagore”, সে দৈবদর্শনের পশ্চাতে ছিল কি, এই দৈবদর্শনের ইঙ্গিত ?

মতিলাল তো অরবিন্দকে এনে আশ্রয় দিলেন এই চোরকুঠুড়ীতে। বিবাহিত গৃহস্থ যুবক। অথচ নিজের অঙ্গসংস্থানের তেমন ব্যবস্থা নেই। তার উপর জুটল এক অতিথি। আর এ কি যে সে অতিথি! সংসারে কাউকে বলবার উপায় নেই এর কথা—এমন কি সহধর্মিণীকেও নয়। লুকিয়ে-লুকিয়ে ফাঁক বুঝে স্নান করিয়ে নেন, আর নিশ্চুতি রাতে শাল পাতার ঠোঙ্গায় এটা-ওটা খাবার এনে দেন। এমনি দিন যায়। অরবিন্দ কিন্তু নির্বিকার, নির্ভয়। একাকী এই ক্ষুদ্র কুঠুরীতে প্রায় সারাক্ষণই ধ্যানমগ্ন থাকেন।

এ কুঠুরীটা বরাবরই নানা পরিত্যক্ত আবর্জনায় ভর্তি থাকে। হঠাৎ খেয়াল হ’ল রাধারাণীর এটাকে একটু ঝেড়ে-মুছে’ পরিষ্কার করবেন। সামান্য একখানি গামছা পরে’, আর একখানি কোন রকমে গায় জড়িয়ে’ পূর্ণ যুবতী শ্রীমাদী রাধারাণী সম্মার্জনী হস্তে দাঁড়ালেন এসে সেই পিছনের দরজায়। যে মুহূর্তে দরজায় শিকল খুলে’ পদার্পণ করেছেন ঘরে, ধ্যানী অরবিন্দের চোখের সামনে ভেসে’ উঠল দিগ্‌বসনা শ্রীমা মায়ের বরাভয় মূর্তি। মুহূর্তে প্রণত হলেন।

ততক্ষণে রাধারাণী উধাও।

সম্বন্ধনীর সত্যরূপের দর্শন পেলেন ভক্ত সাধক।

অতঃপর স্বামীকে তিরস্কার করেও কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের সেবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন রাধারাণী। যা ছাড়া আর কে পারে এমন করে গ্রহণ করতে দামাল ছেলেকে।

সেই বিশেষ মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দ কি চোখে দেখেছিলেন সম্বন্ধনীকে সেইটুকুই তো শুধু কাহিনী নয়, কাহিনীর অপরাধ হলো সম্বন্ধননীই বা কি চোখে দেখেছিলেন তাঁকে ?

এ প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধননীর মুখ থেকে আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু পাওয়া যাবে না কি ইতিহাসের কাছ থেকেও ?

সেই ইতিহাস-রচনার স্বপ্নই দেখছেন অরুণদা।

অরবিন্দ-মতিলাল-রাধারাণীকে কেন্দ্র করে’ চন্দ্রন-নগরের পটভূমিকায় যে নব ইতিহাসের বীজ ছড়িয়ে আছে, তাতে নিত্য জলসেচন করে’ বাঁচিয়ে রাখার, বিবর্জন করার দায়িত্ব কি একা অরুণদার ? শুধু প্রবর্তক সম্বন্ধ ? সে দায়িত্ব আজ সমস্ত ভারতবাসীর।

* * * *

জীবনে কত দিন তো এল, আর চলে’ গেল। কিন্তু ১৩৭১-এর ২০-এ তাত্র (৫১৯৬৪) দিনটি দীর্ঘকাল উজ্জ্বল হবে’ থাকবে আমার জীবনে। একটি ভরপুর দিন। একটি সার্থক দিন।

৩৫

আমি কবি

শ্রীসমীরণ কর

আমি কবি,
কর্পোরেশনের সিটি আর্কিটেক্ট নই,
আমি চীন নই,
আমার হাতে আণবিক বোমা মজুত নেই,
সে সম্বন্ধে যে সম্মেলন
তাতে আমার আগ্রহ নেই।
আধুনিক সভ্য মানুষ ওয়ে প্রস্তর যুগের মানুষ

এ জেনেও মানুষকে কেবল মাত্র আমিই ভাই বলেছি।
বাস ও ঠেলাগাড়ীর সংঘর্ষে যে ব্যক্তিটি নিহত]
সে কে না জেনেও
আমি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিই।
একখানি ফেরী জাহাজ জলমগ্ন হবার কলে,
একশো সতেরোজন মারা গেলে আমিই শুধু কেঁদেছি।
আমি কে সম্ভবত এর পর আর কিছু বলার নেই।

জননী রাধারাণীর স্বরূপ

মহর্ষি প্রেমানন্দ

শক্তির সাধনা—মায়ের আঁচল ধরিয়া সত্বকে জানা।
সত্বা ত নীরব, নিধর নিস্তব্ধ—ভাবময়। শক্তির
দোলনেই সত্বার অভিব্যঞ্জনা। তাইত শক্তিই বিশ্বের
প্রসবিনী, প্রতিপালিনী, পরিবাহিনী ও পরিপোষিনী।

এই শক্তির অভিপ্রকাশ বিদ্যাতে। নিখিল বিশ্ব
বিদ্যাতেরই রূপায়ণ। জড়বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান
সকলেরই এই অভিমত। উপনিষদে আছে “বলং ইতি
বিদ্যাতি”—জড়বিজ্ঞানেরও কথা Electricity is
energy। এই বিদ্যানায়ী শক্তি আশ্রয় করিয়া আছেন
অক্ষরকে। শ্রীচণ্ডী বলিয়াছেন—

“সুধাত্বং অক্ষরে দেবী (সুধা=বিদ্যা)।

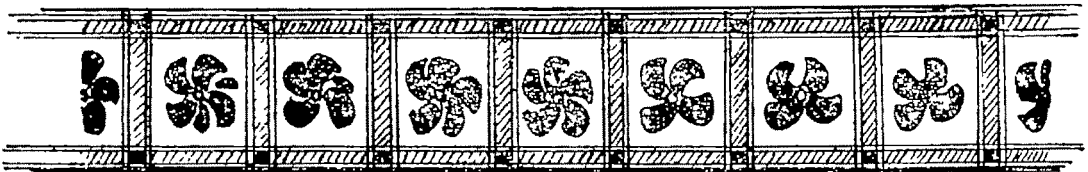
এই অক্ষর ত জীবের অমুচ্চার্য্য পরাবাক ওম্কার।
ওম্কারই নিখিল বিশ্ব বিকাশের উৎস। শাস্ত্রও বলেন—
“বাসেব বিশ্বাঃ ভুবনানি যজ্ঞে”। নাদের অন্তরাল
কারণই চিন্ময়ী বিদ্যুৎ শক্তি। তিনি নিত্য চলমান—
“পদ্ম সুধা”। তাঁর শাস্ত্রত অবস্থাকে অমুভূতির জন্তই
সাধকের অভীক্স প্রচেষ্টা। সত্বা ত সর্ব বিলয়ে অমুভব্য।
লীঘমানতায় সাধক সত্বা বিলম্ব, বিমুহ। ‘আমি’ হারা,
‘ভূমি’তে সমাসীন। “অনেন্দ্রদেকম্”—এ রূপান্তরিত।
তাই ওম্কারের সাধনাই শক্তিসাধনা, মাতৃ সাধনা।
সাধক মাঝেই সন্তানব্রতী—মাতৃ-উপাসক।

পর্য মাতৃকা ধর্মের পরম প্রকাশ জগতে দেখিতে
পাই জননীর মাঝে। কি গর্ভধারিণী, কি অধ্যাত্মজননী
উভয়েই পরামাতৃকা ধর্ম্যে স্তমহীষসী ও সমুজ্জ্বলা।
তাইত জীবের সকল কর্ম প্রেরণার, শক্তির ও বিশ্রামের
আশ্রয় মায়ের কোল। শাস্ত্র জীব বিশ্রান্তির আশায়,
নবীন কর্মপ্রেরণার জন্ত ছুটিয়া যায় মায়ের কাছে।
তাইত দেখিতে পাই শত শত সন্তানব্রতী নিকাম

কর্মযোগী সাধকদল জননী রাধারাণীর কোল আলো
করিয়া আছেন।

পরামাতৃকা ছন্দে যে সকল মহীষসী মহিলার জীবন-
প্রকাশ সমাজে দেখা যায়, একটু সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন
করিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহাদের নামই প্রকাশ করে
তাঁহাদের স্বরূপ। জীবনের মূলে সার দেন বলিয়াই
তিনি সারদা। আনন্দের উৎসমূল বলিয়াই আনন্দময়ী।
জীবনের মূলে সার দান করা, জীবনকে আনন্দোজ্জ্বল
করা সকলই শক্তিরূপা সেই চিন্ময়ী বিদ্যাশক্তিরই
ক্রিয়া। তেমনি জননী রাধারাণীর নামটিই প্রকাশ
করে—তিনি যে একটি মুক্ত চেতনাবান বিগ্রহ। রাধা
অর্থে বিদ্যাৎ। চিন্ময়ী চেতনার শ্রেষ্ঠা আধার বলিয়াই
তিনি রাধারাণী।

সত্বা ও শক্তির সম্মিলিত মৌন পরা মিথুন তত্ত্বের
প্রথম অভিব্যঞ্জনা মহানাদ ওম্কারে। সেখানে সত্বাকে
অন্তরালে রাখিয়া শক্তিরই অভিশুরণ। সেখান হইতেই
সৃষ্টির প্রত্যুৎপন্ন এবং সেখানেই প্রত্যাবর্তন। সেটিই
বিশ্বের চুম্বক ক্ষেত্র (magnetic field)। দেহাবসানে
সেখানে মিলিত হইবার জন্তই আত্মজিজ্ঞাসুর সাধনা।
মাতৃত্বের রূপাবন স্নেহশীতল আশ্রয়ে বসিয়াই ওম্কার
অবলম্বনে সাধক করে সেই সাধনার অমুশীলন। সাধনার
চরম ফলরূপে জননী ও ওম্কার এক অচ্ছদ্য, অচ্ছন্দ্য ও
অভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় সাধকের অধ্যাত্ম জ্ঞানে।
তাইত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“ভক্ত যাকে
ভগবান বলে, যোগীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, আমি তাকেই
মা বলি।” সেই কারণেই প্রবর্তক আশ্রম শোভা
করে যে চিন্ময়ী মাতৃমূর্তি বিরাজমানা সেই সজ্জননী
শ্রীরাধারাণী দেবীও অরূপতঃ ওম্কারই।



বকুল গাছের তলায়

শ্রীসাদনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

চিল্ড্রেন পার্কের পেছনের গেট দিয়ে পাঁচ বছরের মেয়ের হাতটি ধরে সকাল বেলায় ধীরে ধীরে চুকলে। মন্ডাকিনী।

মেয়ের নাম পদ্মা। এই প্রথম সন্ধান। যদিও বিয়ে হয়েছিল অনেক বছর আগে। ভয়ানক কষ্ট-পাওয়া রোগ ছপিং কাশি ধরেছিল নিষ্পাপ এই পবিত্র শিশুটিকে। ডাক্তাররা বলেছিলেন খোলা জায়গায় নিয়ে মেয়েকে বেড়াতে। তারা যেখানে থাকতো, তার কাছে-পিঠে পার্ক ছিল না। তাই মেয়েব জন্ম বাড়ী বদলিয়ে কাল তারা এ পাড়ায় এসেছে এই চিল্ড্রেন পার্কের মোহে।

নিরাপদ খোলা জায়গা দেখে পদ্মা মার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে ছোটোছুটি আরম্ভ করে দিল আর পাঁচ-জন বালক বালিকার মত। হঠাৎ থেমে কি যেন কুড়োতে থাকে। একটা গাছের তলায় বাচ্চাদের বেশ ভীড়। সকলেই বসে বা নত হয়ে কি যেন কুড়োচ্ছে।

“কি কুড়োচ্ছিস, পদ্মা?”

“বকুল ফুল।”

“কত লোক মাড়িয়ে যাচ্ছে। আর সেই ফুল তুই কুড়োচ্ছিস? ছিঃ ছিঃ।”

“সবাই তো কুড়োচ্ছে মা।”

“আমি কোনদিন কুড়োইনি। চলে আয়। হাত নোংরা হবে।”

“হাত নোংরা হবে না মা।”

“ফুল নিয়ে করবি কি?”

“মালা গাঁথব।”

মেয়েকে আটকাতে পারে না মন্ডাকিনী। হাল ছেড়ে তাই এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে দেখে পার্কটি। দেখবার অবশ্য তার অনেক কিছুই আছে এখানে। কারণ, সে এই জায়গায় নবগত।

প্রধান গেটটি বেশ সুন্দর। তার পাশে একটি কাঠের বোর্ড ঝুলছে। তার মধ্যে লেখা আছে পার্কের নিয়ম-কাহন। পড়তে পড়তে শেষে এসে চমকিয়ে ওঠে

মন্ডাকিনী। আইন-কাহনের নীচে একজনের নামধাম। যথা, ডাঃ সদাপ্রসন্ন বসু, এ-এ, পি-এইচ-ডি, বার-এট-ল, আই-সি-এস, চেয়ারম্যান, চিল্ড্রেন পার্কের ম্যানেজিং কমিটি।

একবার মেয়ের দিকে তাকালে মন্ডাকিনী। দেখলো। আপন মনে বকুল ফুল তুলে চলেছে পদ্মা। সে কিন্তু কোন দিন তুলেনি। সদাপ্রসন্নই তুলতো আর তুলে এনে তাকে দিত জল দিয়ে ধুয়ে। কোনদিন সে গ্রহণ করত, কোনদিন সে গ্রহণ করত না। কিন্তু সেইজন্ম নিরুৎসাহ হয়নি কোনদিন সদাপ্রসন্ন। পরদিনই মুঠো মুঠো বকুল ফুল কুড়িয়ে এনে হাজির হয়েছে সে মন্ডাকিনীর সামনে।

এক যুগ আগের কথা। তবু সব মনে আছে মন্ডাকিনীর। সদাপ্রসন্ন ছিল গ্রামের পোষ্ট মাষ্টারের ছেলে আর সে ছিল গ্রামের জমিদারের মেয়ে।

পোষ্ট অফিসটি জমিদার বাড়ীর বাইরের দেয়ালের পাশে। পোষ্টমাষ্টারের কোয়ার্টার পোষ্ট অফিসের মধ্যেই। জমিদার বাড়ীর বাইরের দেয়ালের দক্ষিণ দিকের দরজা খুললেই বকুল গাছটি। তার সামনেই পোষ্ট অফিস।

সেদিন সকালে এই দক্ষিণের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল বালিকা মন্ডাকিনী। একটি বালক বকুল ফুল তুলছিল তখন। হঠাৎ সে মন্ডাকিনীর সামনে এসেছিল এগিয়ে।

“তুমি ফুল তুলবে না?”

“না।”

“কেন?”

“মাটিতে পড়ে থাকে। হাত নোংরা হয়ে যাবে যে।”

কথা শুনে আর দাঁড়ায়নি সদাপ্রসন্ন। দৌড়ে গিয়েছিল পুকুরে। এক মুঠো বকুল ফুল ধুয়ে এনে সামনে ধরেছিল। গ্রহণ করেছিল সেদিন রাজনন্দিনী সাধারণের দান।

বকুল ফুল থেকে এল ফলে। জমিদারের বাগানের পাকা পাকা ফল গাছে উঠে তুলে আনতো সদাপ্রসন্ন মন্ডাকিনীর জন্ত। এর জন্ত বাহবা পায়নি সে কোন-দিন তার কাছ থেকে। কিন্তু সে জন্ত দুঃখিত হয়নি সদাপ্রসন্ন। মন্ডাকিনীর হাতে তুলে দিতে পারলেই সে সুখী। হবার তাকে 'খুসী' করবার জন্ত প্রাণ যায় যায় হয়েছিল সদাপ্রসন্নের। তবু দমেনি সদাপ্রসন্ন।

মগডালে ছিল পাকা পেয়ারা। মন্ডাকিনীর আদেশ। সদাপ্রসন্ন পেয়ারা ভেঙেছিল, পড়েও গিয়েছিল। কিন্তু মাটিতে পড়বার আগেই আর একটা ভাল ধরে নিজেকে বাঁচিয়েছিল সে। এত বিপদের মধ্যেও তার হাতের মুঠোতে ছিল মন্ডাকিনীর জন্ত সেই পেয়ারা।

পুকুরের জলে ফুটেছিল কমলিনী। রাজকন্ডার দৃষ্টি পড়লো তার ওপর। তাকে আনতে শেওলায় পা বেঁধে গিয়েছিল সদাপ্রসন্নের। অনেক সংগ্রামের ফলে মুক্ত হয়েছিল সে। যখন সে স্থলে এসে দাঁড়ালো, তার হাতে ছিল মন্ডাকিনীর জন্ত সেই পদ্ম। মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও পদ্ম সে হাতছাড়া করেনি।

দিন যায়। তারা বড় হয়। ঐ সঙ্গে নজর পড়ে জমিদারের সদাপ্রসন্নের ওপর। গবর্ণমেন্টের চাকুরে হোক না কেন তার বাপ। তাঁর মেয়ের সঙ্গে মিশবার যোগ্যতা নেই তার। ফলে, বন্ধ হয়ে গেল মেলামেশা। ঐ সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল দক্ষিণের দরজা।

এর এক বছর পরেই পোষ্ট মাষ্টার বদলী হলেন জেলা সহরে। সদাপ্রসন্ন চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। আর আসেনি।

আর দেখা হয়নি কি? হবেছিল। মাত্র একবার। তবে দেখাটা না হওয়াই হয়তো উচিত ছিল।

জেলা সহরের রাস্তা কাঁপিয়ে জমিদারের মোটর ছুটছিল। স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সকল হবার খবর শুনে ঘরে ফিরছিল ওধারে সদাপ্রসন্ন। জনতার চাপে মোটরকে থামতে হয়েছিল এক জায়গায়। এগিয়ে এসেছিল তখন সদাপ্রসন্ন।

“জানো, মন্ডা, ম্যাট্রিকে আমি ‘ফাষ্ট’ হয়েছি।”

গাড়ীতে ছিলেন তার বাবা আর ছিল পাইক পেয়াদা।

বাবার জুঁটিতে সদাপ্রসন্নের হাসি কান্নায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

তারপর আজ পর্যন্ত সদাপ্রসন্নের সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি।

তারপর ঘটনা পতনের ইতিহাস। সমান ঘরে বিয়ে হল মন্ডাকিনীর। হাজার বিধা জমি, গোয়ালভরা গরু আর পুকুরভরা মাছ যার, সেই মন্ডাকিনীর স্বামী। কিন্তু সুখ সইলো না। দেশ ভাগ হয়ে গেল। জমিদারী হারিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিল তারা পশ্চিম বঙ্গে। তার বাবাও উদ্বাস্ত হয়ে দেখা দিলেন।

এখন তার পরিচয় স্কুলের শিক্ষিকা। স্বামীও হয়েছে চাকুরে। এক কোম্পানীর ক্যাশিয়ার। চাকরী করবার কোন যোগ্যতা তার স্বামীর না থাকলেও কিছু টাকা কলকাতার ব্যাঙ্কে ছিল। ঐ টাকা ভাড়া দিয়ে এই চাকরী পেয়েছে সে।

আর ভাববে না মন্ডাকিনী। ভাবলে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে। তাই, আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো বকুল গাছের তলায়। এখানে এসে একটু আশ্রয়ও হল। মুখ গভীর করে বসে আছে বছর আটকের এক সুদর্শন বালক। পয়া বকুল ফুল কুড়িয়ে এনে এনে তাকে দিচ্ছে। আর বালকটি আরও গভীর হয়ে সেই ফুল তার পকেটে ঢোকাচ্ছে। মেয়ের এই দাসী-মনের ভাব দেখে রাগ করল মন্ডাকিনী। বকতে যাচ্ছিল পয়াকে। কিন্তু বালকটির মুখ চেয়ে পারল না। মায়া এসে বাধা দিল।

বেশ ছেলেটি। মেয়ের সঙ্গে মানায় ভাল। কথাটা মনে আসতেই হেসে ওঠে মন্ডাকিনী। কি সে ভাবছে পাগলের মত।

সামনে পেছনে অনেক দোলনা। হঠাৎ ফুল কুড়ানো বন্ধ করে পয়া ছুটলো এক দোলনার দিকে। কিন্তু হাত ধরে নামিয়ে দিল তাকে পার্কের দারোয়ান। মেয়েদের দোলনা এটা নয়।

জলে ওঠে মন্ডাকিনী। এ রকম ভৃত্য অনেক ছিল তাদের। স্পর্ধা কম নয় এর। কোন্ বাড়ীর মেয়ের হাত ধরেছে সে।

বিস্ফোরণ হল না। নিজেকে দমন করল মন্ডাকিনী।

সেদিন আর নেই। আজ সে সাধারণ লোক, সাধারণ লোকের জ্ঞী। মেয়ে কিন্তু শাস্ত্র হল না। সামনে এসে বলে, “বকে দাও মা ওকে। বকে দাও।”

তুলে গেল মন্দাকিনী তখন যে তার মেয়ে অবোধ শিশু। বলল, “ওকে বকতে পারি। তবে বকব না। ওকে এখান থেকে দূর করে দিতে পারি। তবে দেব না।”

“ওকে দূর করে দিতে পারবে?”

“হ্যাঁ, মা। এই পার্কের চেয়ারম্যান সদাপ্রসন্ন বসুকে আমি জানি। ছোটবেলার আমাকে বকুল ফুল তুলে দিত। আমি বললে একুনি দারোয়ানকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে।”

এবার খামলো মন্দাকিনী। সখিৎ ফিরে এল। কাকে সে কি বলছে। এখন তার চোখ গেল পষার খেলার সাথী সেই বালকের ওপর। সে অবাক হয়ে মন্দাকিনীর কথা শুনছে।

পার্কের বাইরে মোটরের হর্ন বাজে। ড্রাইভারের সীটে বসে আছে সান-ব্লাস পরা এক ভদ্রলোক। আয়া তাড়াতাড়ি সেই বালককে নিয়ে গাড়ীতে ওঠে। গাড়ী ছাড়ছিল। কিন্তু খোকার প্রশ্নে থেমে গেল।

“বাবা, ঐ যে ঐ, হোলদে সাড়ী, তুমি চেনো?”

“না তো। কেন, কি হয়েছে?”

“ও পষার মা। বললে, তুমি নাকি ছোটবেলায় ওকে বকুল ফুল তুলে দিতে। তুমি নাকি চেনো। পষার মা আরও বললে তুমি নাকি দারোয়ানকে দূর করে দেবে। সত্য বাবা?”

ভদ্রলোক আবার তাকালেন পার্কের দিকে। তারপর সান-ব্লাস খুলে আর একবার দেখলেন।

গাড়ীর দরজা খুলে গেল। ভদ্রলোক নামলেন। নেমে ঢুকলেন পার্কে। মুখে তাঁর হাসি। চরণে ধীর গতি।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মন্দাকিনী। এই অবস্থায় এবং এই ক্ষণে সে সদাপ্রসন্নকে আশা করেনি। কি বলবে, কি করবে সে? সে এখন পরজী আর সদাপ্রসন্ন পরপুরুষ। সদাপ্রসন্ন নিশ্চয়ই তাকে চিনতে পেরেছে। তাইতো আসছে। যেমন সে আগেও এসেছে। কিন্তু আগের আসার এবং আজকের আসার মধ্যে কত প্রভেদ। স্বামীর চেহারা চোখে ভাসে। জীবনযুদ্ধের পরাজিত সেনানীর ব্যর্থক্লান্ত মুখছবি। আর সদাপ্রসন্নের? সফলতার ভরা উজ্জল চেহারা। এর সঙ্গে তার বিশেষ হতে পারত। কিন্তু হয়নি। কিন্তু কেন?

নাম তাঁর মতিলাল রায়

শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ফ্রান্সে যখন ‘হুনিভার্সাল কো-ম্যাসনরি’-র
জন্ম হল, সেই আঠারো শ’ বিরাটীর
পবিত্র বৎসর
ফরাসীর চন্দননগর
অন্ত এক জাতকের জন্মের গান
সুনে’ছিল।—তিনি একা এক প্রতিষ্ঠান,
মুতিমান সংগঠন সেই সম্ভায়,
—নাম তাঁর মতিলাল রায় ॥

এই শুভজন্মের মাত্র চার বৎসর আগে
ধর্ম-নিরপেক্ষ অধ্যাত্মের অমুরাগে

মাদাম ব্লাভাৎস্কি এই ভারতে আসেন,
আন্তর্জাতিক ব্রহ্মবিজ্ঞা কেন্দ্রে এখানে রাখেন।
তখন ব্রহ্মানন্দ কেশব সকল ধর্মে অন্তর্নিহিত
অভিন্ন একক সত্য-উন্মোচনে নিত্য-সমাহিত;
আর দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চাটী-তল
‘যত মত তত পথ’-সনন্দ ঘোষণার স্থল।

এই পটভূমি নিয়ে জন্ম তাঁর,
এই সাধনায় তাঁর উত্তরাধিকার,
মুতিমান অধ্যাত্ম সেই সম্ভায়,
নাম তাঁর মতিলাল রায় ॥

সজ্জ শরণং

শ্রীশশী রায়

সজ্জ !

সজ্জ বলিতে কৈশোরে একটি সুরই কানে বাজিত—
বৃদ্ধ শরণং গচ্ছামি, সজ্জ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম শরণং
গচ্ছামি। সেদিন সেই গম্ভীর আরাব বার বার
শুনিয়াছি। সেই উদাস্ত পৌরুষ কণ্ঠ শুধু কর্ণে একটা
সুরের মাষাঝাল বিস্তার করিয়াছিল। সে সুর আমাকে
অল্প লোকে লইয়া চলিত। কি লোক কেমন তার
স্বরূপ, তাহা কিছুই বোধ জন্মায় নাই। শুধু হৃদয়ে বোধ
করিতাম তাহা এ জগতের নহে।

কৈশোরের সমাপ্তি পথে পরিচয় হইল রক্ত-রুধিরের
অভিযাত্রীর দলের সহিত। গোপন সমিতি গড়িয়া
তাহারা মাঘের সন্তান গড়িতেন। শোনাইতেন দেশ
বিদেশের মাতৃভূমির অল্প জীবন আহুতি দানের বীরত্ব
গাথা। পড়িতে দিতেন নিষিদ্ধ পুস্তকাদি। সেই পুস্তকে
প্রথম অগ্নির স্পর্শ পাইলাম। আজও চক্ষু মুদ্রিত করিলে
চলার পথের সেই পর্বতগাজবাহী মোটর চালকের রূপ
দেখি। মনে মনে জিজ্ঞাসা করি আরও কতদূরে। সেই
তরুণ বীরের কধুকণ্ঠে উত্তর শুনি “টু ওয়াট গোর্জ”—
ঐ অস্ত্রহীন খাদের মধ্যেই মোটর সহ আমার অবলুপ্তির
আর সেই সঙ্গে জীবন শেষ এক দেশদ্রোহীর। একটি
অস্ত্রের নিধনের জন্য একটি জীবন। জীবন মৃত্যু
পায়ের ভৃত্য। মনে মনে জাগিয়া উঠিত এই সব তরুণ
তরুণীদের ভগ্ন গৃহের অভ্যন্তরে নিভৃত আবাস। মাঘের
অল্প সকলেই বলি প্রদত্ত। শুনিয়াছিলাম সেই গোপন
দলের নাম সজ্জ। জীবনের অপেক্ষা তাহারা সজ্জকে
বড় মানিত। জীবন গেলেও সজ্জের কণামাত্র সংবাদ
কাহাকেও জানান হইবে না। তাহাদের কথায় প্রথম
শুভব করিয়াছিলাম সজ্জই শক্তি। সেই সজ্জের সৈনিকরা
আমায় স্বপ্নে দর্শন দিতেন। তাহাদের মিলিত মার্চ পাষ্ট
আমার বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইত। শুনিতে
পাইতাম তাহাদের গান—‘হুগম গিরি কান্তার মরু
যাত্রীরা হুশিয়ার’। আবার শুনিতে পাইতাম তাহাদের
অভিষেক সঙ্গীত—‘ওরে আমার রক্ত উবার যাত্রীদল’—

ঠিক সুরে নাই সঙ্গীতের ভাষা। সুর কর্ণে বাজে।
সুরকে ধরিলে সুরকে পাইব। শুনিয়াছিলাম সেই সজ্জ।

ইহার পরে নিষিদ্ধ পুস্তক ‘পথের দাবী’ হস্তে
আসিল। আভাষ পাইলাম পথ কি ? বোধ হইল না।
ভারতীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাক্তারের সন্মুখে
আসিয়া নির্ঝাঁক হইয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিতাম।
চোখের সন্মুখে হিমালয় আর ভিস্মভিষাসকে একত্র
দেখিতাম। ভয়ে ঠক ঠক করিয়া পা কাঁপিত। নিষতই
মনে হইত আমি অপূর্ণ। কোন মুহূর্ত্তে কি একটা করিয়া
ফেলিব। শত শত ধিকারে কর্ণপটে বিদীর্ণ হইত। মস্তক
তুলিয়া চাহিয়া দেখিতাম—আমার দিকে চাহিয়া শিশুর
মত হাসিতেছেন ডাক্তার। সেই প্রথম শুনিলাম আর
বোধ করিলাম সজ্জগুরু।

পূর্ণ বোধ না হইলেও প্রতীতি হইল এ মহামানব
জীবনকে আকর্ষণ করেন। ইহার নেতৃত্বে প্রাণ দান
তুচ্ছ।

ঠিক এই সময়ে হাতে আসিল প্রবর্তক। রক্ত উবার
উদয় তালুর পশ্চাৎপটে সপ্ত অশ্ববাহী রথচালক প্রচ্ছদপটে
অঙ্কিত। কাণে বাজিয়াছিল আর এক কধুকণ্ঠ—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী

ভয় নাই ওরে ভয় নাই।

শুনিলাম, ‘প্রবর্তক’ প্রবর্তক-সজ্জের মুখপত্র।

আবার অগ্নির উত্তাপ পাইলাম। প্রতিটি অক্ষরে
অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। যত পাঠ করি ততই
মর্মে দাহ করিতে লাগিল। তরুণের স্বপ্নে বহ্নি-উৎসব
লাগিল। স্বপ্নে আমি বোমা ছুঁড়িতে লাগিলাম। স্বপ্নে
মনে হইল আমি সজ্জের সন্তান।

তারপর কতজন কাঁসীর মধ্যে জীবনের জয়গান
গাহিয়া গেল। আমি অপূর্ণের ভ্রাতা জীবনে ক্ষুদ্র স্বপ্নের
সম্মানে চাকুরি লইলাম। স—ব গেল। সত্য
তুলিলাম, শক্তি হারাইলাম—সজ্জ ছায়ামূর্ত্তি হইয়া স্মৃতিতে
রহিয়া গেল।

এক যুগ পরে। এক হারানো তরুণীর সম্মানের স্বপ্নে

পার্ল প্রেসের মালিক মধুবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দুষারের বাহিরে জুতার পাহাড় দেখিয়া অহুমান করিলাম গৃহমধ্যে প্রকোষ্ঠে কিছু একটা ঘটিতেছে। যে ব্যক্তিকে সন্ধান করিতে গিয়াছিলাম তিনিই হারমোনিয়ম ধরিয়া বসিয়া আছেন। অতএব আসনে উপবিষ্ট হইতে হইল। আমি একটি প্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলাম, আসনে উপবিষ্ট হইলাম কেহ চাহিয়া দেখিল না। সকলেই নাভি হইতে নাদ তুলিয়া সমস্তরে বলিতেছে—

ঔং সচ্চিদানন্দময়ী মা।

আমি সুরে সুর মিলাইতে পারিলাম না। সকলেরই সমচিন্তা, সমস্তর, সমলক্ষ্য। আমি শুধু একা নীরবে মাতৃ-আহ্বান শ্রবণ করিতেছি। মন বলিতেছে কণ্ঠ মিলাও, লজ্জা কণ্ঠ রোধ করিতেছে। লাজ মান ভয় এ তিন থাকতে নয়।

অমুষ্ঠানের সমাপ্তি সমাপন্ন, এমন সময়ে এক কিশোরী আসিয়া ললাটে চন্দনবিন্দু পরাইয়া দিল ঠিক ভ্রুবিচ্ছেদের মধ্যদেশে। কি যেন একটা আলোড়ন বোধ করলাম ললাটে মধ্যে। নেত্র ধ্যানস্তিমিত করিয়া ললাটে চিত্তস্থির করিবার সময়ে এমন হয়। উপস্থিত সকলেরই ললাটে চন্দনবিন্দু। মনে হইল আমিও ইহাদের মধ্যে মিশিয়া গেলাম। আমার আর ভিন্ন সত্তা নাই। ইহার পরেই আরম্ভ হইল সজ্জগুরু বন্দনা। শুনিলাম সমবেত সকলেই সজ্জাশ্রিত। প্রবর্তক সজ্জের একটি কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছি। অল্পক্ষণেই বোধ জন্মাইল—সত্তাবৃণ্ড মিলিত জীবনই সজ্জ। এক মন, এক প্রাণ, এক লক্ষ্য, এক নাম। এক স্রোতে বহিয়া সাগর যাত্রা। প্রার্থনা-সভা পরিচালনা করিতেছিলেন একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। সকলের মাঝে থাকিয়াও যেন তিনি নাই। মন তাঁহার উর্দ্ধলোকে। মুখে তাহারই পূর্ণ আভাষ। উপাসনা শেষ হইতেই হঠাৎ আমাকেই প্রথমে বলিলেন—আপনি কিছু বলুন। প্রাণে কথা আসিতেছিল। পরিপূর্ণ অহং-এর তাগিদ। বক্তৃতাপ্রদান করিয়া আমার অন্তস্থ সকলকে অহুভব করাইব। কেমন করিয়া সভা-পরিচালক জানিলেন আমার আত্মপ্রচারের কামনা। বলিবার আনন্দে চমক লাগিল না। যাহা যত ভাবে বলিব তাবিয়াছিলাম তাহা কিছুই বলা

হইল না। কে কণ্ঠে বলিয়া বলিয়া গেল হিন্দুধর্মের বহু ধারা বহু বিভক্ত পথে চালিত করিতেছে সমগ্র জাতিকে। শৈবর সঙ্গে বৈষ্ণবের মিল নাই, রামনামী রাধাকৃষ্ণ শুনিলে রাগিয়া ওঠে। বহুধা বিভক্ত হইয়া হিন্দুর মিলিত শক্তি ব্যাহত হইতেছে। সমগ্র হিন্দুর এক জাতি, এক প্রাণ একতা বোধ জন্মাইতেছে না। প্রকারান্তরে সজ্জেরই মহিমা গাহিলাম। পথে বাহির হইয়া তাবিলাম কি করিতে আসিলাম কি করিয়া গেলাম। হঠাৎ পৃষ্ঠে কাহার স্পর্শ অহুভব করিলাম। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম সেই সভাপরিচালক শুদ্ধশ্রী প্রৌঢ়। হাসিতে মুখ তরিয়া বলিলেন—বেশ বলেছেন। আবার আসবেন। মুখে আসিয়াছিল—আমি বলি নাই—কে আমাকে দিয়া বহাইয়া লইল। কিন্তু বলিতে পারিলাম না। তিনি চলিয়া গেলেন। পরিচয় পাইলাম তিনি প্রবর্তক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী। সকলে রমণদা বলিয়াই সম্বোধন করে।

আসিবেন বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই রমণবাবু। ইহার কিছুদিন পরে সজ্জের এক সেবক শ্রীসৌবীর ঘোষের গৃহে চাতুর্মাস্ত্রের উদ্‌যাপন সমাপ্তি অমুষ্ঠান হইতেছিল। উৎসবের হোতা বেশ দাবীর সঙ্গেই আমাকে জানাইলেন—আমাকে যাইতেই হইবে।

অল্পপরিসরে বহুলোক সমবেত হইয়াছে। গায়ে গায়ে এক হইয়া গিয়াছে, নড়াচড়া করিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। তবু কেহ কোন কণ্ঠ অহুভব করিতেছে না। কারণ সকলেই ধূপ ও দীপের ধোয়ার সঙ্গে একমনে সজ্জগুরু ও সজ্জমাতার পটে মন নিবিষ্ট করিয়া বেদমন্ত্রে ডুবিয়াছিল। আমি সেদিনও নির্বাক। দেখিতেছি পুত্র যেমন পিতামাতার সেবা করে, গৃহবর্তী সৌবীরবাবু ঠিক তেমনি করিয়া সজ্জগুরু ও সজ্জমাতার সেবা করিতেছেন। দুটি পট তাঁহার সম্মুখে পরিপূর্ণ জীবন্ত বলিয়াই মনে হইল। মনে হইল তিনি পটে প্রাণের স্পর্শ পাইতেছেন। অশ্রম আত্মপ্রচারকামী আমি ভবিতে-ছিলাম যদি বলিবার আদেশ হয়। ঠিক তাহাই হইল। যাহা বলিলাম তাহা অসংলগ্ন ও অর্ধসমাপ্ত। পশু্যদন্ত হইল আমার আমিত্ব। আমার পরেই সজ্জের এক

সেবিকা শ্রীমতী আরাধনা দেবী তাঁহার মন্ত্রপ্রাপ্তির কামনা ও তাহার ক্ষুদ্র বেদনা বোধের সুন্দর বর্ণনা করিলেন। আর্তি ও আরাধনার মূর্ত্তি আমি দেখিলাম সেই ভদ্রমহিলার মুখে। আমার আমিষ আনত হইল তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তপ্ত বালুকায় মুখ ঘসিয়া কাঁদিয়াছিলেন—দেখা দে মা, দেখা দে। এঁরও আর্তি এমনই আকুল! মনে মনে প্রস্তুত হইলাম হযোগ পাইলেই তাঁহার চরণের ধূলি মাথাষ লইয়া আত্ম-প্রচারকামী আত্মার পাপস্থান করিব।

আর্তিবতীর পদধূলি গ্রহণ করিবঃ এই মনে করিয়া বাহিরের ভাঙ্গা আসরের ভীড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছি সজ্জমাতার সার্বক সেবিকার নির্গমনের পথ চাহিয়া। সহসা আমার পদযুগলে কাহার স্পর্শ লাগিল। চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম ষাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিব বলিয়া মুহূর্ত্ত গণিতেছি তিনিই আমার পদধূলি লইয়া নীরবে মস্তকে রাখিতেছেন। মুখ দিয়া বাক্যক্ষুরণ হইল না। পরাজয়ের আত্মপ্লানিতে মস্তক আনত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম তাঁহার মুখের কথাগুলি “যেদিন খবর পেলাম যে সজ্জ থেকে আমার দীক্ষা দেওয়া হবে না, সেদিন অঝোরে কেঁদেছি সারা রাত। কত সাত্বনা দিয়েছেন, স্বামী বলেছেন প্রবর্ত্তক না হয় আরও কত আশ্রম আছে। বলেছি আমি আত্মসমর্পণ করেছি সজ্জে। সজ্জ আমার না নিলেও জানব আমার দেহ মন প্রাণ সব সজ্জের। সজ্জই আমার জীবন, সজ্জই আমার মরণ।”

দেখিলাম সজ্জাশ্রিতা এক কণ্ঠাকে। দেখিলাম মূর্ত্তিমতী সমর্পিতাকে। সজ্জজননী আদর্শে গড়া জলন্ত দীপশিখা।

অবশেষে আত্মান আসিল সজ্জের প্রাণকেন্দ্র চন্দন-নগর হইতে। সজ্জজননী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীর তিরোভাবোৎসব। কন্ঠের বাধা আসিল, গৃহের গঞ্জনা পথরোধ করিল, অশ্রুজল নয়নে জগন্মাতাকে বলিলাম—‘মা, এই আমার ভবিতব্য? ইহাই কি তোমার বিধান?’ মুহূর্ত্তে সবকিছু পরিবর্ত্তিত

হইল। সহধর্ম্মিণী আমার জোর কথিয়া পথে রওয়ানা করিয়া দিলেন।

পথে সজ্জগুরুর লেখা সজ্জজননীর জীবন-কথা—“জীবন সঙ্গিনী” পড়িতে পড়িতে আসিলাম। স্টেশনে আসিয়া ট্রেনে উঠিয়া বেশ বোধ করিলাম করালিনী মূর্ত্তিতে আমার আরাধ্যা দেবী মা পেছনে দাঁড়াইয়া আছেন। যতদূর গেলাম গাড়ীতে ততদূরই লোলভিষ্মা রক্তনেত্রী, অবিকৃতকেশা, মা আমার ঘিরিয়া আছেন।

এমন কখনও পূর্বে হয় নাই।

কত মনে মনে ভাবিলাম মা কি আমাকে নূতন পথ ও নূতন মত হইতে রক্ষা করিতেছেন? ঠিক এমনই মনে হইয়াছিল যখন কৃষ্ণনগরের সজ্জন হইয়া কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কালীকে ধরিলাম। তারপর কখন কৃষ্ণ আসিয়া কালীতে আসিয়াছে, কখন ভাবাবেশের শ্রীরামকৃষ্ণ... ব্যাকুল আঁধি শ্রীচৈতন্যে মিশিয়া গিয়াছে। শুধু আবেগ, শুধু আকর্ষণ সার হইয়াছে। তাঁহাকে ডাক, তাঁহাকে মনে প্রাণে চাও। যখন যে মূর্ত্তিতে হোক সবই তিনি।

চন্দননগর স্টেশন হইতে হাঁটা শুরু করিলাম। একবার আসিয়াছিলাম, আরবার সেই পথে যাইতে পারি কিনা পরীক্ষা করিব। চলিতে চলিতে দেখিতেছি রিক্সার পর রিক্সা ভরিয়া লোক চলিয়াছে প্রবর্ত্তক সজ্জের অভিযুখে।

প্রায় সাযাছে গিয়া পৌঁছিলাম আশ্রমে। সজ্জ-সন্তানদের ছোট্টাছুটি। কে কোথায় রাত্রিবাস করিবে এই চিন্তা। আমি ইহাদের কাহাকেও চিনি না। শুধু ভরসা করিয়া আসিয়াছি, আমি নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি, একটু স্থান মিলিবে। আর না মিলিলেই বা ক্ষতি কি? একটু নূতনের স্বাদ পাইব শীতের রাত্রে।

রাধারমণবাবুকে দেখিলাম সমুখে। তিনি আমার স্বস্তির তারটী নামাইয়া লইয়া গেলেন। বলিলাম—আমার স্তার আপনি লইলেন—অর্থ বুঝিলেন তো? হাসিয়া রাধারমণবাবু বলিলেন—আমরা যাহা করি শ্রীগুরুর প্রেরণায় করি। করে ভাবি না।

কথার অবসর নাই। দ্বিতলে সজ্জগুরুর মহাপ্রয়াণের ঘরের পাশে ডাক পড়িল। রেণুদি চা খাওয়াইবেন। সজ্জসন্তানদের হুই একজনের কাছে রেণুদির নাম এত

শুনিয়েছি যে, মনে মনে এক প্রসন্নবদনা মাতৃমূর্তির ছবি মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। রেণুদি সন্তানদের সবার সমস্তা আশ্রমে বসিয়া ভাবেন। কে রোগজীর্ণ হইয়াছে, কে সংসারের খরচ না দিয়া আপনার আদর্শের পথে পাগল হইয়া পড়িয়া আছে, কে সমস্তা লইয়া কাঁদিতেছে স-ব রেণুদির চিন্তা। তিনি চিন্তা করেন আর সকলকে পত্র দেন। পত্রে থাকে প্রেরণা আর আশ্ব-উদ্বোধনা। সেই রেণুদিকে দেখিলাম। মনে হইল আমার এক দিদিকেই দেখিলাম। আমার বহুদিনের পরিচিত দিদি, ইহাকে সঙ্কোচ করিবার কিছু নাই। রেণুদি মুড়ি তরকারী সহযোগে চা দিলেন। মুড়ি তরকারী দিলেন বলিয়াই মনে হইল দিদির বাড়ীতেই থাইতেছি। তবু রেণুদি বলিলেন—আপনাকে মুড়ি খেতে দিলাম কিন্তু।

সম্ভের প্রবুদ্ধ সন্তান সম্ভবগুরুর প্রিয় শিষ্য সৌবীর বাবু আমার ভার গ্রহণ করলেন। তাঁহার সহিত একই ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করিলেন। আশ্রমের অতিথিশালায় সে ঘর।

ইচ্ছা ছিল না ঘরের সন্ধান করিব। পথে বাহির হইয়াছি আবার ঘরের ঠিকানা কেন? তবু সৌবীরবাবুর পীড়ানীড়িতে গেলাম। মন্দির সংলগ্ন জমিতে সারি সারি কতকগুলি ঘর। ঘরের পাশেই স্নানাগার ও শৌচাগার। অল্প সময়ে ঘাসের বৃকে খোলা জমির উপর দিয়া ঘাইতে হয়। আজ আর সে জায়গা খোলা নাই। বিরাট প্যাণ্ডেল উঠিয়াছে। এই আচ্ছাদনের তলেই উৎসবের ব্যবস্থা।

ঘরে গিয়া দেখিলাম শয্যার সবকিছু আসিয়াছে। তোষক, চাদর, লেপ, মশারী, বালিশ। লেপ ও বালিশের আচ্ছাদন একেবারে নূতন। খুবই ক্ষুদ্র মনে হইল নিজে। সবার স্পর্শে নিজের স্পর্শ মিলাইতে পারিব না তবে সম্ভবোধ আসিবে কি করিয়া। সম্ভের সন্তান বা সম্ভবসেবী সবাই যে এক। বিভেদের ভাব আসিবে কেন? কাহার ধর্মসিক্ত চাদরে আমি কেন আরামের শয্যা রচনা করিব না।

ভাবিতেছি এই সব, ঘন অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া

আছে। সহসা শঙ্খনাদ শুনিলাম। পুরুষ কণ্ঠে শঙ্খনাদ পাঞ্চজন্তুর মত শোনাইতেছে। উপরন্তু শঙ্খনাদ মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। শুনিলাম উৎসব সুর হইতেছে, তরায় ঘাইতে হইবে।

মাতৃমন্দির সম্মুখস্থ প্যাণ্ডেলে গিয়া বসিলাম। কণকাল পূর্বেও যে স্থান শূন্য ছিল সে স্থানে তিল ধারণের স্থান নাই। খেত আবরণের উপরে এক দিকে পুরুষ একদিকে নারী উপবিষ্ট। এই অল্প সময়ে এই কঠিন শীতের রাজ্যে এত জনসমাগম হইল কোথা হইতে কেমন করিয়া।

প্রার্থনা সুর হইল। সকলের নয়ন মুদিত। মানসলোকে এতগুলি নরনারী এক হইয়া গিয়াছে। এক মন, এক প্রাণ, একতা। নর নাই নারী নাই শুধু মিলিত প্রাণের মিছিল। উর্দ্ধলোকে বৃষি আমরা সবাই এমনি করিবা দেহমুক্ত হইয়া মিলিত হই। কাহারও সত্তা বোধ থাকে না। অধলোকে সম্ভ আমাদের মিলাইয়াছে। কাহারও অন্ত পরিচয় নাই—শুধু সন্তান। মায়ের সন্তান মাতৃ আরতি গহিতেছে

ও সচ্চিদানন্দময়ী মা।

প্রার্থনা শেষ হইল, আরও মন্ত্র গীত হইল, শাস্তি মন্ত্র আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল। জগতের সর্বত্র শাস্তি বিরাজ করুক, আমরা সবাই সেই শাস্তি সাগরে তাসমান হই। আমার শাস্তি নহে, তোমার শাস্তি নহে, ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র সকল প্রাণীর শাস্তি হউক। সত্তা ভুলিলে, নিজের মর্ম্মবিদারী চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলেই শাস্তি। চিন্তাই অশাস্তি। এরা মায়ের শরণে সকলেই চিন্তা ত্যাগ করিয়াছে। সচ্চিদানন্দ সাগরে মায়ের চরণে সকলেই লুটাইতেছে।

সহসা আমার নয়ন সম্মুখে দেখা দিলেন আমার আরাধ্য দেবী ঋগ্‌যজুর্‌সামি রক্তাপ্লুতা করালিণী কালী। বক্ষমাঝে উক্ত রক্তের ঝলক উঠিতে লাগিল। মা আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, আমাকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন। যে নয়নে মাকে ছাড়া আর কিছু দেখিব না সেই নয়ন, কাহার সন্ধানে চলিয়াছে। মা কি আসিয়া আমার নয়ন

আড়াল করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন? শঙ্কায় সৰ্বদেহে সেই হিমশীতল রাত্রিও স্বেদোদগম হইল।

ক্লমপরে মাতৃবন্দনা সঙ্গীত আরম্ভ হইল। সজ্জকন্ঠা-গণ গাহিতেছেন, নেতৃস্থ লইয়াছেন এক বিবাহিতা, অলঙ্কারগরঞ্জিতা মহিলা। কয়টি কণ্ঠ মানসলোকে হাজার কণ্ঠে রূপান্তরিত হইল। সারা পৃথিবী যেন সুরের সাগরে প্রাবলিত হইয়াছে। সুর আর রূপ, রূপ আর সুর এক হইয়া গিয়াছে। এই সুর-লহরীর মাঝে দেখিলাম মন্দির হইতে সজ্জজননীর মূর্তি মধ্যস্থলে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন। আমার আরাধ্যা করালিনী নরকপালিনী মাতৃমূর্তি সজ্জজননীর মূর্তিতে বিলীনমান হইয়াছে। অজ্ঞান অসহায় অচৈতন্য আমাকে সজ্জজননী শিশুর মত অন্ধ স্থান দিয়াছেন। তাঁহার কম্পিত অধর হইতে কি বাণী নিঃসৃত হইতেছে কর্ণগোচর হইতেছে না। অপলক নেত্রে সেই মুখখানির দিকে অবাক হইয়া চহিয়া আছি।

সেই কৈশোরে বে প্রশ্ন মনে উদ্ভিত হইত যাহার উত্তর কোনদিন পাই নাই সেই প্রশ্নের উত্তর মিলিল। কাহার মুখচন্দ্রিমা দর্শন করিয়া সম্ভানগণ জীবন তুচ্ছ করিয়া ভারতমাতার মুক্তিযজ্ঞে প্রাণ আহুতি দিতে যাইত। এই সেই মূর্তি। দশপ্রহরণধারিণী মা এই নবরূপ ধারণ করিয়াছেন। তিরোভাবের দিনে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে।

দেবী মানবী হইয়া আসিয়াছেন। নয়নে সেই দৃশ্য উদ্ভিত হইল। সজ্জগুরু লিখিয়াছেন “আমি আহারের জন্ত ঘরে যাইতেই বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি আহার্য্যদ্রব্য দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—একেবারে সপাত্ৰকা তাঁহাকে প্রহার করিলাম। জুতার তলায় পেরেক ছিল, তাহার আঁচড় লাগিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। আমার মধ্যমা আঙ্গুলিকা তাহা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠায় তিনি তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, “চুপ-চুপ, মা বাবা মারেনি। হয়তো আমার কি দোষ শুনে এসেছেন শাসন করবেন বৈকি। ন বছর বয়সে এসেছি—ওনার শিক্ষা শাসনেই তো মানুষ হচ্ছে।” সৰ্বসহা রমণী! দেবী মানবী

হইয়া আসিয়াছিলেন, মানবী দেবীতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন।

গান তখন প্রাণ মাতাইয়া তুলিয়াছে। ষাঁহার কণ্ঠ নাই তিনিও কণ্ঠ মিলাইবার জন্ত উন্মুখ হইয়াছেন। আমার দুটি পার্শ্বে দুটি বালক অতিকণ্ঠে কণ্ঠ রোধ করিয়াছিল। আমি দুই বাহু দ্বারা তাহাদের কাছে টানিতেই যন্ত্রের মত তাহারা গাহিতে লাগিল। ছেলে দুটি সজ্জের বিভ্রালয়ের ছাত্র। শিরুক মূর্তিমান ডিসিপ্লিনের মত পিছনে বসিয়াছিলেন তাই তাহারা এতকণ গাহিতে পারিতেছিল না। এক্ষণে আমি আড়াল করিতেই তাহারা গাহিতে সুরোগ পাইল।

আবার অমৃতব করিলাম আমরা বালক-বুদ্ধ নারী-পুরুষ শ্রদ্ধেয়-শ্রদ্ধাবান সব এক হইয়া মাতৃসঙ্গারে ডুবিয়াছি। ইহাই সজ্জের অবদান।

সেদিনের নৈশ উৎসব সমাপ্ত হইল। অন্নপূর্ণা মন্দিরে আহার সমাধা করিয়া আসিয়া নূতন শয্যায় শয়ন করিলাম। বহুকণ নয়নে নিদ্রাকর্ষণ হইল না। মন্দির অভ্যন্তরের সেই মানবীর দেবীমূর্তি কেমন করিয়া শিশুর মত আমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন তাহাই ভাবিতেছি। কখন নিদ্রা আসিয়াছে, কখন ব্রাহ্ম মুহূর্তের সূচনা হইয়াছে তাহা বুঝতে পারি নাই। আপনিই ঘুম ভাঙিয়া গেল। মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। সৌবির বাবুকে ডাকিয়া তোলাইয়া দিলাম। প্রভাতী বন্দনায় তিনি অংশ গ্রহণ করিবেন। সকলেই মন্দির-প্রাঙ্গণে গেল, আমি ঘরে বসিয়া আমার আরাধ্যা দেবীকে স্মরণ করিলাম। দুই মাতৃমূর্তি পর পর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অন্ধকারের বন্ধ চিরিয়া কোথা হইতে যেন অগ্নির আভাষ দেখা দিল। মনে হইল কোথাও আগুন লাগিয়াছে। এই উষাকালে শীতশয্যা হইতে কেহ জাগিয়া উঠে নাই। অগ্নিদেব আপনার মনে জলিয়া যাইতেছেন। দেখিব বলিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিতেই চক্ষু স্থির হইল। আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না, সম্মুখেই সে অগ্নিরেখা অন্ধকারের বন্ধ বিদীর্ণ করিয়া অনেকখানি আকাশ লাল করিয়াছে। সেই কৈশোরে ফিরিয়া গেলাম। একদা ঠিক এই অগ্নির রক্তরাগ দেখিয়াছিলাম

প্রবর্তকের প্রচ্ছদপটে। সপ্তাশ্বাহিত অগ্নিদেব এই রক্তরাগেই মধ্য দিয়া প্রকাশমান হইতেছেন। এ সেই অগ্নিরেখা—এ সেই প্রকাশমান আদিত্য, তেজোময় ওজোময় রক্তরঞ্জন রবিদেব। এমন করিয়া উদিত ভাহুর দর্শন কখনও মিলে নাই। করজোড়ে তাঁহার বন্দনা করিব বলিয়া মন নিবিষ্ট করিলাম, কর্ণে মন্দির হইতে মাতৃমন্ত্রের মিলিতকণ্ঠের একতান শ্রুত হইল। মনের মধ্যে উদিত ভাহুর রক্ত রাক্ষা পশ্চাৎপটের সম্মুখে সজ্জামাতা দেখা দিলেন। এই সেদিনের শেষ মাতৃদর্শন।

ক্ষুদ্র কর্ম করি। কর্ম করিয়া আনন্দের অপেক্ষা বিতৃষ্ণা বঞ্চিত হইতেছে। সে বিতৃষ্ণ কর্মের জন্ম নহে, কর্মস্থানের জন্ম নহে, সে আমার মনোবিকার। মাতৃনাম নিষা বিরাট বিশ্বে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাই। শুধু একটি মাত্র কথা সার করিব—শুধু তুমি আছ আর কেহ নাই। কর্ম আমার মর্মের বেড় দিয়া রাখিয়াছে। সেই কর্মস্থলের জন্মই সেই প্রভাতেই সজ্জ হইতে বওয়ানা হইলাম। আসিবার সময়ে দেখিলাম একজন শৌচাগার পরিষ্কার করিতেছেন। ভাল করিয়া তাঁহার মুখখানি দেখিলাম। কাল সন্ধ্যায় ইঁহাকেই দেখিয়াছি সজ্জের একটি প্রধান কর্মীর কার্য্য করিতে। আজ তিনি দু'টি হাতে বহুজনের মূত্র, গবের অন্নানবদনে পরিষ্কার করিতেছেন। মনে মনে আবার নিজেই ধিক্কার দিলাম। আমি এই সজ্জ আসিয়া আনকোরা নব শয্যায় রাত্রি কাটাইয়া গেলাম। সবার মাঝে আসিয়া সকলের হইতে পারিলাম না।

পথে সজ্জের প্রধান অরুণবাবুর সহিত আলাপ হইল। বজ্রাচ্ছাদিত একজন কাঁচা সোনার মূর্তি। অরুণাংশুর প্রচ্ছন্ন প্রভা তাঁহার বদনে। ইনি প্রধান হইলেও ইঁহার কোন প্রাধাত্যের বেড়া দেখিলাম না। শুনিয়াছি নেতাজী সবার প্রধান হইয়া সবার নায়ে সবার কাছে আপন হইয়া থাকিতেন। সকলেই তাই তাঁহাকে আপনজন বলিয়া জানিত। অরুণবাবুও তাই। গতকাল পংক্তি-ভোজনে বসিয়া সবার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আসন ত্যাগ করেন নাই। কে কোথায় কি খাইল, আরও কি

প্রযোজন সব তদারক করিয়াছেন। আমার মনে যাহা ছিল সেই বিষয় লইয়াই আলোচনা করিলেন আমার সঙ্গে। অপূর্ব মরমীজন তিনি। তাঁহাকে সহজে ভুলিতে পারা যায় না।

রুক্ষবাবু অল্পস্থ হইলেও প্রভাতের কার্য্যভার লইয়া বসিয়াছেন। দেহ আগে না কর্ম আগে। এক প্রাণ এক মন হইয়া সজ্জের সেবা করিতে আসিয়াছি। আমি সবার সহিত একাত্ম হইয়া কর্মে লাগিয়াছি। সজ্জামাতা আশীষ বর্ষণ করিতেছেন, সজ্জগুরু শিলা লইয়া শিবের মতন পথ প্রদর্শন করিতেছেন। আর কাহারও মুখ চাহিবার নাই। কেহ নাই আমার আছে শুধু সজ্জ-পিতা আর সজ্জামাতা, আর আছে আমার সম্মুখে আদর্শ। আমার পুরাতন, আমার আমিত্বকে নবায়নের অগ্নিধজে আহুতি দিয়া আসিয়াছি। শিবের সঙ্গী হইয়া চলিয়াছি আমরা, বিশ্বকল্যাণ করিব। সর্বশক্তিমান আমরা। মাতা শক্তি বর্ষণ করিতেছেন—পিতা পথ প্রদর্শন করিতেছেন। আমাদের পদতরে পৃথিবী কম্পমান। একদিন ভাবী প্রবর্তক সজ্জ হইতে অগ্নিযুগের সূচনায় সজ্জসন্তান ভারতে অগ্নি জ্বালিয়াছিল। সেই অগ্নি আজ নির্দীপ হইয়া আসিতেছে। সন্তানগণ সেই নবায়ন আজও সজ্জের আকাশে রহিয়াছে, সেই সজ্জামাতা মুনসী চিন্নাই হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সেই পাঞ্চজন্ম নাদ হইতেছে। আত্মাহুতি দিয়া আদর্শের পথাসূচন কর। আত্ম উন্নতি, আত্মার গতি, পুণ্যলোকের পথ সন্ধানে একাকী পথ খুঁজিয়া না। বিকৃত, ক্লিষ্ট ভারতজননী তোমাদের মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন। সজ্জগুরু দেশমাতার চরণতলে দণ্ডায়মান হইয়া আহ্বান করিতেছেন, সজ্জ-মাতা সেই পথে অভয় দিতেছেন—বাহির হইয়া কর্মের যজ্ঞে ঝাঁপাইয়া পড়। তবেই প্রবর্তক সজ্জের প্রবর্তনা হইবে। ভাবিতে ভাবিতে কখন আসিয়া গিয়াছি আমার কর্মক্ষেত্রে। মুহূর্ত্তে আবার আমার সেই পুরাতন পোষাক পরিয়া কাজে বসিয়া সব ভুলিয়া গেলাম। একটি রজনীর স্বপ্ন কি শুধুই স্বপ্ন?

সাহিত্য সম্মেলন

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সে ১৯০৫ সালের কথা। কানপুর থেকে দু'জন স্বনামধন্য সাহিত্যিক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদীর কাছে একখানি চিঠি লিখলেন—
উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রবাসী বাঙালীদের নিয়ে একটা সাহিত্য সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করা হোক।

সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হলো পনেরো বছর পরে—বারাণসীতে। 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এব প্রথম অধিবেশন বসলো ১৯২২ সালে বারাণসীতে, সভাপতি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাকাপাকিভাবে সম্মেলনের নামকরণ তৈরী হলো 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন', নিয়মকানুন তৈরী হলো বছরখানেকের মধ্যেই। ১৯৫২ সালে এই নাম বদলে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' দেওয়া হয়।

এত বড় সাহিত্য সম্মেলন ভারতে আর নেই। সমগ্র ভারতে বাঙালী যেখানে আছেন, সেইখানেই এর সদস্য আছে, উত্তর পশ্চিম পূর্ব দক্ষিণ—সব অঞ্চল থেকেই এই সম্মেলনে আসে প্রতিনিধি পুরুষ ও মহিলার দল, সংখ্যায় তাঁরা তিনশোর বেশী। 'এই বার্ষিক অধিবেশন বসে বড়দিনের সময়, ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেই এর অধিবেশন বসেছে। উত্তর ভারতে বারাণসী, এলাহাবাদ, লখনউ, কানপুর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা, গোরক্ষপুর, রাঁচি, পাটনা, চণ্ডীগড়; পশ্চিম ভারতে বোম্বাই, আমেদাবাদ; মধ্য ভারতে ইন্দোর, নাগপুর, জয়পুর, জবলপুর; পূর্ব-ভারতে গোহাটি, কলিকাতা; দক্ষিণ ভারতে কটক, মাদ্রাজ, বাংগালোর প্রভৃতি স্থানে আজ অবধি এর চল্লিশটি বার্ষিক অধিবেশন বসেছে। সাহিত্যকে কেন্দ্র করে বাংলার বহুমুখী সাধনার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। আর তারই প্রতিবেশী সাহিত্যের সঙ্গে বিনীত যোগসূত্র রাখাও এর আরেক ভাবনা।

এবার কটকে এর ৪০তম অধিবেশন হয়ে গেল। বারো বছর আগে কটকে সম্মেলনের ২৮তম অধিবেশন হয়েছিল। সেবার মূলসভাপতি হয়েছিলেন

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ। এবাকার মূল সভাপতি ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। সেবার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন—'ভারতের প্রধান লক্ষ্য বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যস্থাপন। সাহিত্যের মাধ্যমে এই লক্ষ্যের কল্প-প্রবাহ তিরদিন ভারতের প্রদেশে প্রদেশে চলিযা আসিয়াছে। ইহা অরণ্য রাখিয়া ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষাই ঘাহাতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আজ আস্তঃ-প্রাদেশিক ভাববিনিময়ের ব্যবস্থার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির পঠন পাঠনের দ্বারা এই কাজ সূচুভাবে হইতে পারে। তাই আজ প্রযোজন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে যেগুলি সমধিক ঐশ্বর্যশালী তাহারা ঘাহাতে আপন আপন ক্ষেত্রে উন্নত হইয়া উঠে, গৌরবময় হইয়া উঠে, নব নব ভাবধারায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া। এক ভাষাকে দাবাইয়া রাখিয়া অল্প ভাষার প্রসার ও প্রভাব বিস্তৃতির চেষ্টা উচিত নহে, সমর্থনযোগ্যও নয়। ভাষা লইয়া যদি পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উঠে, তাহার অপেক্ষা মর্যাস্তিক ধ্বংস আর কিছুই থাকিতে পারে না।' এবাকার মূলসভাপতি ডঃ সুনীতিকুমার বলেছেন, ভাষাশ্রমী রাজ্যবিভাগ আমার মতে ভারতীয় মৌলিক সংস্কৃতিগত একতার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইতেছে।.....দিল্লীতে বসিয়া একই প্রকারের formula বা নীতি সর্বত্র প্রবর্তিত করিতে গেলে বিভ্রাট ঘটবে।...সমগ্র ভারতের বিভিন্ন ভাষাপ্রাণ ও প্রদেশকে Linguism-এর রাহগ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে পুনরায় এক করিয়া দিতে যেন আমরা আমাদের ভাবগুরু সমবেত চেষ্টায় সমর্থ হই।

সম্মেলনের আগের দিন একটা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার কথা ছিল, কিন্তু তা হল না। শ্রীকালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী অস্থূল থাকায় বঙ্গ সাহিত্য শাখার উদ্বোধন করার জন্ত তিনি আসতে পারলেন না, লিখিত ভাষণ তিনি পাঠিয়ে দিলেন। এ ছাড়া এই সম্মেলনের কোথাও কোন কাঁক ছিল না।

বাঙালী ক্লাবের প্রাক্ষেপে তিনদিন সম্মেলন হলো, ২৫ শে, ২৬ শে ও ২৭ শে ডিসেম্বর। বঙ্গসাহিত্য, ওড়িয়া সাহিত্য, শিশুসাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি, সংবাদ সাহিত্য ও চারুকলা সম্পর্কে আলোচনা হলো। এই সব বৈঠকে শুধু বাঙালী ও বাংলাসাহিত্যের সমস্তুই বাঙালীরা আলোচনা করলেন তা নয়, ওড়িয়া বিদগ্ধজনদেরও ছিলেন তার মধ্যে। শিশুসাহিত্যের আলোচনার উদ্বোধন করলেন শ্রীউদয়নাথ ঘড়ঙ্গী, সমাজ-সংস্কৃতির অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব, সংবাদ সাহিত্যের আলোচনা বৈঠকের উদ্বোধন করলেন শ্রীবাধানাথ রথ, চারুকলা আলোচনার উদ্বোধন করলেন শ্রীজ্যোতীকুমার সাহা। এবং সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অস্থানে একদিন অভ্যাগতদের সঙ্গীতে পরিতৃপ্ত করলেন শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক।

এবারকার সম্মেলনের আলোচনা প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাষণ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। ইংরাজি স্থলে হিন্দিকে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে হিন্দি-ভাষীরা যে মনোভাব দেখাচ্ছেন, সেই সম্পর্কে সুনীতিবাবু সুচিস্তিত দৃষ্টি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি স্পষ্ট বলেন—‘উপস্থিত ক্ষেত্রে, ভারতের কোনও আধুনিক ভাষা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বাহনরূপে বিশ্বসত্যতার প্রকাশরূপে, ইংরাজীর স্থান লইতে পারে না—বাঙ্গালা, হিন্দি, মারাঠী তামিল ইত্যাদির একটিও না।...কেবল উত্তর-ভারতের কতকগুলি অংশের প্রতি চাহিয়া এবং ভারতের অন্ততঃ অর্ধেক অংশের কথা ভুলিয়া গিয়া, তাহাদের কথা একেবারে না ভাবিয়া, কেবল হিন্দিকে ইংরেজীর স্থানে বসাইবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ভারতের সংহতির বিপক্ষেই কার্য করিবে।...আমাদের দেশে বহু রাজনীতিক নেতা কার্যতঃ চাহেন যে, জনসাধারণ ইংরাজী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকুক এবং ইংরাজীর সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করিয়া দেশের সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব করুক তাহাদেরই সম্মানেরা; এই হেতু মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষার দোহাই পাড়িয়া, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইংরেজীর চর্চা জনসাধারণের মধ্যে সীমিত ও রুদ্ধ করিয়া দিয়া সকলকে কেবল ভারতীয়

ভাষায় পঠন-পাঠন ও চর্চায় নিযুক্ত রাখিতে উপদেশ দিতেছেন, সরকারী আইন ও বিধিনিষেধ প্রচলন করিয়া জবরদস্তী এই কাজ চালাইতে চাহিতেছেন। এইরূপ কার্যক্রম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতির অমুসারী নয়, তাবস্তদ্ধ ও সাধুও নয়।...আমার মতে হিন্দীর মত একটি প্রাদেশিক ভাষা, যাহা বিশেষ জনগণের মাতৃভাষা, এবং অল্প ভাষার তুলনায় আপেক্ষিক উৎকর্ষ যাহার তেমন নাই, তাহাকে অহিন্দীভাবী অনিচ্ছুক জনগণের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা না করিয়া সংস্কৃত ও ইংরাজীর মত দুইটি নিরপেক্ষ ভাষার প্রচলন পূর্ববৎ শিক্ষায় ও সরকারী কার্যে বহাল রাখিলে, দেশের লোকের মধ্যে বিক্ষোভের কারণ থাকিবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রসারিত ও সহজলভ্য হইবে, এখন সর্বত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে ও অন্ততঃ যে মানসিক অবনতি দেখা বাইতেছে তাহার অবসানও ঘটিবে; এবং Linguism-এর মত অভিযাপ হইতে আমরা রক্ষা পাইব।...প্রস্তাব করা হইতেছে ভারতীয় সমস্ত ভাষা নাগরী লিপিতে লেখা হউক, তাহা হইলেই পূর্ণ একতা হইবে।...এক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইউরোপে রোমান-লিপি ব্যবহার করে এমন জাতি-সমূহের মধ্যেও রাজনীতিক ঐক্য বা সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।...অর্থনৈতিক দিকে ভারতবর্ষ তো এখন দেউলিয়া হইয়া পড়িতেছে, ঋণ ও ভিক্ষা মিলিতেছে না, পরে হয়-তো মিলিবেও না—ভারত এখন পথে বসিতেছে। ইংরাজীকে তাড়াইয়া হিন্দীকে বসাইবার জন্ত নানা প্রকট এবং অপ্রকট উপায়ে যে লক্ষ লক্ষ, এমনকি সাক্ষ্যে কোটি কোটি টাকা বেপরোয়াভাবে খরচ হইতেছে, তাহার সার্থকতা কি?...ভারতের জনগণের সমক্ষে যে সমস্ত দুর্বীর প্রাথমিক সমস্যা, বাঁচিয়া থাকিবার সমস্যা রহিয়াছে সেগুলির কাছে মাহুষের তৈয়ারী এই কৃত্রিম ভাষাগত ‘সমস্যা’ নিতান্তই তুচ্ছ, নগণ্য।’

উৎকলের সর্বজনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবাধানাথ রথ সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রকাশ করলেন, আমাদের প্রগতি যে ভাবে চলছে তা সর্বসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন, শ্রীঅশোককুমার মিত্র চারুকলার রীতি-পদ্ধতি নিয়ে জানার যোগ্য অনেক কথাই বললেন। তাঁদের ভাষণ মুদ্রিত হয়নি, সেজন্য তাঁদের ভাষণের মধ্যে যে সহজবোধ্য পাণ্ডিত্য ছিল তার স্থায়ী অমুখ্যান থেকে শ্রোতারা বঞ্চিত হলেন।

সাহিত্য শাখার ভাষণে শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী বর্তমান বাংলা বইয়ের আকারের গুরুত্ব ও সংখ্যার প্রাচুর্য সম্পর্কে ভালো কথা বললেন—‘মাঠের সব ধানই কিছু আর কামিনী, গোবিন্দভোগ হয় না, হয়তো হিসেব করে দেখলে তার নিরানবুই ভাগই মোটাসোটা, তবু বাক্য মাটির রিক্ততার চাইতে সেটা ভাল বৈকি। প্রাচুর্য আশাপ্রদ, প্রাচুর্য সম্ভাবনার বাহক। হয়তো অজ্ঞাত আগাছার মাঝখান থেকেই সহসা দেখা দিতে পারে একটা দৃষ্ট প্রতিশ্রুতির অঙ্কুর। সেটাই পরম প্রাপ্তি।... বেশী লিখলেই যে লেখা খারাপ হয়ে যাবে তার কোনো মানে নেই। কোনো কাজ বা কোনো শিল্পকর্মই কি চর্চার ফলে ক্ষুদ্র হয়? সাহিত্যই বা তবে হবে কেন?’

ছোট গল্পেব চাহিদা যে কমে যাচ্ছে এর কারণ সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—কেন এমন হলো?

শিশু সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীস্বধীরচন্দ্র সরকার একটা কথা বললেন—‘কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি শিশুপাঠ্য স্কুল বইকে জাতীয়করণের ব্যবস্থা করেছেন, অর্থাৎ সাধারণ লেখকরা স্কুল বই লেখার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবেন। এইরূপ স্বাধীনতায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা, তা আপনাদের বিবেচনা করতে বলছি।’

এবারকার সম্মেলনের বিশেষত্ব হলো নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে চিন্তানায়কেরা যেমন ভাবনামূলক শক্তিত হয়েছেন, সেই ভাবনায় তাঁরা ভাবিত করে তুলতে চেয়েছেন সমাগত শ্রোতাদের; এই ভাবনা যদি আত্ম-সমীক্ষার উৎস হয়ে জাতিতে আত্মস্থ করতে পারে তা হলে সেটা হবে খুব বড় সার্থকতা।

বহুরে বহুরে এই সম্মেলন বসে, কিন্তু একটা ব্যাপার অত্যাশ্চর্যের মত এবারও দেখা গেল—এক বছরের সাহিত্য নিয়ে কোন আলোচনা হলো না। তা ছাড়া গল্প-উপন্যাসের আলোচনা হলো নাটক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ সম্পর্কে কোন কথা ওঠেনি। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী সে কথা বললেন। একাঙ্কিকা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে নব নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে একটা কথাও কেউ তুলেন না।

এই ক্রটিটুকু বাদ দিলে এবারকার সম্মেলন ভালই হয়েছিল। প্রতিনিধিদের সাম্য অধিবেশনে আনন্দ বর্ধন করেন শ্রীমন্তোষ সেনগুপ্তের দল রবীন্দ্রনাথের শাপমোচন অভিনয় ক’রে ও শ্রীজনন্দা পট্টনায়ক সঙ্গীত পরিবেশন ক’রে।

ধাকা-খাওয়ার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা করেছিলেন অত্যাধুনিক সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকেরা। এদের কর্তা ছিলেন কটকের প্রবীণ আইনজীবী শ্রীললিতকুমার দাশগুপ্ত।

শেষ দিনে কর্মকর্তারা সমবেত প্রতিনিধিদের ভুবনেশ্বর ও কোণারকের মন্দির দেখাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন।

কটকের সম্মেলন থেকে সবাই প্রসন্ন মনে বিদায় নিয়েছেন। এই চিন্তাপ্রসাদের জন্য স্থানীয় বাঙালী ও ওড়িয়াদের সহায়তা অনস্বীকার্য।



ঐতিহাসিক

পূর্ব দিগন্তে নব সূর্যোদয় :

প্রাক স্বাধীন যুগে, জাতির এক নৈরাশ্রময় জীবন-মরণ সঙ্কট মুহূর্তে ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন : “অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে [পরিজ্ঞাপকর্তা] নিষে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাতে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।.....আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আশ্বপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।”

ঋষি কবির এই ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি ছিল বাঙালীর বিশ্বতোমুখী সাধনা ও ঐতিহ্যের বীজগত সত্য এবং ভারতীয়তার মর্মগত আত্মশক্তি। এই বাংলা দেশ ও বাঙালীর মানসাকাশে মানবসভ্যতার নূতন অরুণোদয় হইবে, ইহা কবীন্দ্রের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। ভারতের স্ব-শক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরই কথা : “বহু দুর্গতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের এই অস্বর্নিহিত স্থির শক্তিই আমাদের রক্ষা করিয়াছে এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠাদ্রিষ্টি শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপর আপন বরাডয়হস্ত প্রসারিত করিবে।”

ঋষি-দৃষ্টি মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর আজকের ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া নৈরাশ্র হইয়া জাগে। মনে হয় যেন ভারতবর্ষ আপনহারা হইয়া আত্মঘাতী হইতেই চলিয়াছে। স্বাধীনতার পরে বিগত সতের বৎসরে আমাদের নেতৃত্ববৃন্দের, আমাদের মত ও পথের দিশারী যারা তাঁদের দৃষ্টি, বুদ্ধি এবং আত্ম ও দল-কেন্দ্রিক কার্যকলাপ দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের চোখের সামনে কবির এই ভারতবর্ষ নাই। ভারতের সত্তা ও তার মিশন সম্বন্ধে হয় তাঁরা অজ্ঞ, নম্রতো তুচ্ছ ক্ষমতার মোহে উদাসীন। আজকের যে কোন দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দের কার্য-কলাপ হইতে ধারণা করা যায় না যে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক

দেহ ছাড়াও যে একটা শাস্ত্র রূপ আছে, চিরন্তনের ধর্ম আছে, চরিত্রবৈশিষ্ট্য আছে, তার সঙ্গে তাঁরা পরিচিত। ভারতের এই স্বরূপ-ধর্মের সঙ্গে পরিচয় ঘটিলে সে বৃহৎ, মহৎ, উদার আর উৎসর্গাকৃত না হইয়া পারে না। আজকের মত ভারত-জাতীয়তার এমন নির্লজ্জ নষ্ট অপব্যবহার ভারতের ইতিহাসে আর কোন কালে সংঘটিত হয় নাই, এ কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে। যারা ভারতের কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্ত উষ্ণিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাঁহাদের সর্বপ্রথম এই কথাটা বুঝিতে হইবে যে, ভারতের ঐতিহ্য, তার ভাব ও ভাবনা, তার ধাতু ও মানস-গঠন ঠিক যুরোপ বা অন্য দেশের মতন নহে। জীবনের মূল্যবোধ ও সার্বিকতার ধারণা তার স্বতন্ত্র। বস্তুগত জৈবধর্মের অবাধ লীলার মাঝেই যেন জীবনের চরিতার্থতা, এইরূপ ধারণায় অভিভূত হইয়াই ও-দেশের মানুষ বিজ্ঞান ও তার শক্তি এবং সমৃদ্ধিকে জীবনবিকাশের সারসর্কস্ব করিয়াছে। বৈষয়িক মান বাড়াইবার উৎকট প্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বোচ্চ ক্ষতবিক্ষত। স্বাধীনতান্তর ভারতবর্ষে নির্বিশ্রামে প্রতীচ্যের এই একবগ্না প্রগতিকে এ দেশের মাটিতেও বপন এবং ফলস্ব করিয়া তোলায় আশ্রয় অন্ধ অমুদ্রণ চলিয়াছে। খাওয়া-পরা ও বৈষয়িক মানোন্নয়নের যে প্রবন্ধ বুলি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দ অহোরাত্র আওড়াইতেছেন তাহাই আমাদের স্ব-মহিমা সম্বন্ধে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছে। দেড় যুগ এখনও হয় নাই, কিন্তু -ইতিমধ্যেই জনগণ মানোন্নয়নের অকুল পাথারে হাবুডুবু খাইতে সুরু করিয়াছে ভবিষ্যৎ মায়ামরীচিকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে, বস্তুবিজ্ঞান ও কারিগরী শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে পশ্চিমী সমাজ খানিকটা দারিদ্র্য-ব্যাধি-মুক্ত হইলেও, অপ্রয়োজনীয় ভোগ-লালসা, অহেতুক প্রতিযোগিতা, অগভীর অসংযমী মানসিকতা পশ্চিমের সমাজ-জীবনকে স্নায়বিক উত্তেজনায় বিধাইয়া তুলিয়াছে। জীবনের এই একান্ত বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গী জনগত পশু মানুষকে একটা বৃহৎ পশুতেই পরিণত করিতে পারে, তদতিরিক্ত আর কিছু নহে। শ্রীঅরবিন্দের কথায় : “...The vital wants to be a glorification of its own desires; the

physical wants it to be a rich prolongation of its own comforts and pleasures and habits. If it were to be that, it would be only an exaggerated and highly magnified consummation of the animal and the human nature, not a transition from the human into the Divine.”

বস্তুত: বলা যায়, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও বৈষয়িক সভ্যতার জীবনধারা বিশ্রুত বাহ্য বহুমুখীনতার মাঝে পথ হাবাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতবর্ষ এই বস্তুসর্বস্ব জীবনপ্রণালীকেই অ-স্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়: জড়বাদী “পশু প্রকৃতির গর্ভে আবৃত মানুষ এখনও প্রবৃত্তি নাড়ী দিবে প্রকৃতি থেকে রক্ত শুষে জড়ভাবে পুষ্ট হয়।” বর্তমান ভারত-রাষ্ট্র যে একান্ত বৈষয়িক নীতি ও জীবনদৃষ্টি লইয়া মাতিয়াছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ, সমাজ, শিক্ষার গডন দিতে চলিয়াছে তাহাতে অদূরভবিষ্যতে ভারতীয় জনগণের একটা “highly magnified consummation of the animal” হইয়া দাঁড়াইবারই সম্ভাবনা, যার নমুনা এখনই প্রত্যক্ষ করা বাইতেছে।

মানব সভ্যতার ভারতবর্ষের অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও অবদান হইতেছে মানুষকে জড়ত্বের অষ্টোপাশ হইতে মুক্তি দিয়া চৈতন্যের এক ও অখণ্ড উন্নীত করিয়া ধরা। ভারতবর্ষের বিশ্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা এইখানেই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: “প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সাগুণী কি সে উদ্ভাবন করিতেছে, ইহার সচুস্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।” সুপ্রাচীন কালের ভারতবর্ষ পূর্ণাঙ্গ বাষ্টি ও সমষ্টি জীবন-বিকাশের চরম অবদান সুনিশ্চিত দিয়াছে। ভারত-ইতিহাসের অন্তর্ধারার মর্ম ও ইহাই। ভারতের উপলব্ধি এই যে, দৃশ্যমান অনন্ত বিচিত্রতার আধার এক স্বল্প চৈতন্য বস্তু, বাহাই বহু বিচিত্ররূপে নিত্য প্রকাশশীল—যাহাই নিরন্তর নানাভাবে দেশ-কাল-পাত্রের প্রকটন ঘটাইতেছে। জৈব অভিব্যক্তির পরম চরিতার্থতা এই চৈতন্যের উপলব্ধি, তার সহিত যুক্তি ও সম্বন্ধে। ইহাই মানব জীবনের মৌল সত্য এবং

সনাতন আর্থ্য সভ্যতার ইতিবৃত্ত। যে সত্যকে অবলম্বন করিয়া পশু-মানবের মনুষ্যত্ব তথা পূর্ণত্ব উজ্জীবনের ক্রমটি বিধৃত—যাহার মাধ্যমে নিত্য চৈতন্য ও নিরন্তর চলমান পরিবর্তনশীল জীবনধারা প্রবাহিত সেই দৃতি বা ধারণাশক্তির নামই ভারতবর্ষ দিয়াছে ধর্ম। শুধু নামই দেয় নাই, ইহা অর্জনের একটা প্রণালীও ভারতবর্ষ দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় “যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মই মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা নিতে হইবে।” রবীন্দ্রনাথ আরও বিশিষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—“হিন্দু সমাজের ধর্ম প্রাণের ধর্ম, বিকাশের ধর্ম, পরিবর্তনের ধর্ম, নিয়ত গ্রহণ-বর্জনের ধর্ম।”

ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে ধারণাক্রমের লক্ষণে ধর্ম, অহিংসা-প্রাণ, প্রেম ও মানবৈক্য একাধ্বাচক।

বিগত শতকে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারত-জাতীয়তার তিত্তি এই ধর্মকেই বলিয়াছেন। যেহেতু ভারত সভ্যতার মূল স্রুটিই হইতেছে ধর্ম। স্বামীজী ভারত-জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন: “In each nation as in music, there is a note, a central theme upon which all others turn. Each nation has a theme, everything else is secondary. India's theme is religion. Social reform and everything else are secondary.” কিন্তু স্বামীজির পরবর্তীকালে শুধু ভারতবর্ষেই নহে সারা দুনিয়ায় ধর্মতিত্তিক বাষ্টি ও সমষ্টি জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। ধর্মকেই কেন্দ্র করিয়াই বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলিম পার্থক্য উৎকট হইয়া উঠে যাহারই ফলে শেব পর্য্যন্ত অখণ্ড ভারত দ্বিধা-খণ্ডিত হইয়াছে। ধর্ম নিরালস্য অবস্থা ধরা-ছোয়ার বাহিরে থাকিয়া যায়। আচারে ইহা আকারিত হইয়া বিবোধের কারণ হইয়া উঠে। সম্ভ্রান্ত শ্রীমতীলাল এই ধর্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন: “ব্রহ্ম বস্তুর জ্ঞান ধর্ম নিরবয়ব নয়, তাহা গুণ ও কর্মে মুর্ত্ত। স্থিতিতে তাহা লীলায়ত।” ধর্ম সর্বত্র মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে বাধ্য বলিয়াই বিশ্বমানুষের মহামিলন ধর্মের ভিত্তির উপর সম্ভবপর হইয়া উঠিতে পারে নাই। শ্রীশ্রবিন্দ তাই

অধ্যাত্মবাদের উপর এই মহামিলনের ইঙ্গিত করিয়াছেন। “Human cycle” গ্রন্থে এই দৃষ্টিদর্শনই তিনি দিয়াছেন: A spiritual society would live like its spiritual individuals, not in the ego but in the spirit, not as the collective ego, but as the collective soul.”

বর্তমান শতকের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ক্রমশঃ ধর্ম ও অধ্যাত্ম ভিত্তি হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। গত চারশো বছরের ইউরোপীয় চিন্তা-ভাবনার গতি-প্রকৃতি এবং জীবন-বিকাশের পন্থা ও প্রণালী ইহারই সাক্ষ্য বহন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর করাসী বিপ্লব এই মোড় পরিবর্তনের স্পষ্ট জ্ঞাপক-চিহ্ন বলা যায়। ধর্ম ও সমাজ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া উগ্র ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন করিয়াছে ইউরোপীয় এই বিপ্লব। ব্যক্তি-মুক্তির এই অত্যাগ্র বিদ্রোহের ফলে ইউরোপে ধর্ম ও সমাজের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে রাষ্ট্র। পাশ্চাত্যের চেহারা দেখিলে আজ বেশ বোঝা যায় যে, সেখানে মাথার উপর সর্কাস্কর রাষ্ট্র আর পায়ের নাচে সমাজ-বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি। রাষ্ট্রের পাবাণভারে ইতিমধ্যেই ব্যক্তির আত্মনাদ উঠিয়াছে। এ শতকের ইউরোপীয় সভ্যতাব ইতিহাস রাষ্ট্র-পিষ্ট ব্যক্তির আত্মনাদ ও তাদের রাষ্ট্রের অক্টোপাশ হইতে মুক্তির সংগ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রুশ-বিপ্লব ইহারই ফলশ্রুতি। অর্থনৈতিক সমাজ-তন্ত্র, শ্রেণীহীন সাম্যবাদের আওতায় আত্ম মাহুষ স্বস্তি খুঁজিয়াছে। কিন্তু মাহুষের উদার মুক্তি কি মিলিয়াছে? ব্যক্তির মুক্তি যে মিলে নাই, ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কি করাসী বিদ্রোহ, কি রুশ-বিপ্লব, উভয় ক্ষেত্রেই গায়ের ছোরে সমস্ত পার্থক্য মুছিয়া ফেলিতে গিয়া রক্তস্নানই সার হইয়াছে, ফল ফলিয়াছে উন্টা। রাষ্ট্র ও অর্থমুখ্য জীবন বিকাশের দুইটি স্পষ্ট ধারার বাহক অ্যাজ সর্কাস্কর মানববিধ্বংসী অঙ্গসজ্জায় সজ্জিত হইয়া মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছে। ইহার পরিণতি আত্মবিনষ্টিতে। ছিন্ন-মস্তার মত আপনার কণ্ঠনালী কাটিয়া রুধির পানেই ইহার পরিশেষ পরিভ্রম।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ আত্মসংগঠনে হবহু এই পশ্চিমকেই অনুকরণ করিয়া চলিয়াছে। বিগত শতাব্দীর নব জাগরণের সমাজদেহ ভাঙ্গার ও ব্যক্তি-প্রাধান্তের উত্তরাধিকার স্বত্রে ইহাই স্বাভাবিক। আজ সমাজ বিলুপ্তপ্রায়। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক প্রতি-পূরক প্রভাব বিনষ্ট। ফলে রাষ্ট্র আজ নষ্ট, নির্লক্ষ্য, ক্ষমতার মোহমুগ্ধতায় ভয়ঙ্কর। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্র-নিষ্পিষ্ট সমাজ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি অসহায়তার মাঝে ধুকিতে শুরু করিয়াছে। লক্ষ্যহীন দিশাহারা মাহুষ আজ রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় “একটু ফাঁক পাইলেই মদ খাইয়া প্রমোদে মাতিয়া বলপূর্বক নিজের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। যাহারা ভোগী তাহারা ভোগের নব নব উদ্ভেদনায় ক্রান্ত। নিমন্ত্রণ, খেলা, নৃত্য, ঘোড়দৌর, শিকার, ভ্রমণের ঝড়ের মুখে শুক পত্রের মত দিনরাত্রি নিঃশব্দে আবর্তিত করিয়া বেড়াইতেছে।” জাতি সংগঠনে আমরা আমাদের আত্ম-প্রকৃতি ও সভ্যতার মূল মর্মের গোড়ার কথাটিই ভুলিয়াছি। ঋষিকবি এদিকেও অজুলি নির্দেশ করিয়াছেন: “আমাদের সভ্যতার মূলে সমাজ, ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। আমাদের কাছে সমাজ প্রথম, ব্যক্তিবিশেষ তাহার পরে।” “পরম্পরের প্রতি আমাদের দাবী আছে আমাদের সমাজগঠনই সেইরূপ। পরম্পরের দাবীতে আমরা পরস্পর বাধ্য।”

বিচিত্র গোষ্ঠী, সমাজ, ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। সবকিছুকে সামঞ্জস্য করিতে গিয়া পাশ্চাত্যের সব ‘বাদের’ গোঁজামিলের মধ্যে আমরা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করিতে চলিয়াছি। ব্যক্তি ও পরিবার বিকাশের সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্র আজ অক্টোপাশের মত মাহুষকে বাঁধিয়াছে। রাষ্ট্রের পাবাণভারে ব্যক্তি-পরিবার, সমাজ রুদ্ধবাস। শুধু ভারতেই নয়, সর্বদেশেই কমবেশী ব্যক্তি-মুক্তির সমস্যা এই একই। গণতন্ত্র তার অসন্তোষশূন্যতা প্রকট করিয়াছে। সমাজতন্ত্রের সর্কাস্কর (totalitarianism) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার চাপে সাধারণ মাহুষ অতিষ্ঠ, সন্ত্রস্ত। পশ্চিমী জাগরণ চাহিয়াছিল ব্যক্তির সাম্য, সৌভাগ্য, স্বাধীনতা, কিন্তু পাইয়াছে ঈর্ষা,



৪৯, বর্ষ ১০ম সংখ্যা।

প্রবাস

মাঘ, ১৩৭১

জীবনের আলো

তোমরা কি জ্ঞাতবেদার নাম শুনিষাছ? তাহার পরিচয় জান? বলি শোন—ব্রাহ্মণ, কৃত্তিম, মহর্ষি, রাজর্ষিগণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আহুতি প্রদান করেন। ঋত্বিকের কণ্ঠে স্বাহা, স্বধা, বসুট মন্ত্র উচ্চারিত হয়। উদ্যাতার কণ্ঠে বেদধ্বনি উঠে। অগ্নিগর্ভে হব্য স্ফটিকরূপে পরিপক হয়। সেই অগ্নি-শুদ্ধ হব্য বহন করিয়া জ্ঞাতবেদা দেবতাদের পুরোভাগে লইয়া যান। যজ্ঞভাগ পিতৃগণকে, দেবগণকে, ঋষিগণকে তিনিই বণ্টন করিয়া দেন। যাজ্ঞিকের কর্ম সুসমাপ্ত হয়। যজ্ঞ দ্বারা তিনি প্রবুদ্ধ হন। ঋত্বিক, পুরোহিত, নিখিল প্রজা, দেবতা ও পিতৃগণ “পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ” হইয়া প্রজালোকের সহিত অমর লোকের সংযোগ রক্ষা করেন। ইহাতে অমরলোক বিদেহা হইয়া উঠে। জ্ঞাতবেদাকে নিহত করার ভ্রম সর্বদা প্রচেষ্টা করে। অমরলোকবাসীরা জ্ঞাতবেদাকে রক্ষা করাব-জন্ত সর্বদা সতর্ক থাকে। এই জ্ঞাতবেদা কে জান? স্বয়ং অগ্নিপুত্র। অগ্নি হইতে জ্ঞাত বলিয়া তাঁহার মূর্তি উজ্জ্বল। সবখানি তাঁর অগ্নিময়। নতুবা সে বহন করিবে কেমন করিয়া আহুত সামগ্রী সর্বত্র দেবলোকে, পিতৃলোকে, ঋষিলোকে? আজ এই জ্ঞাতবেদা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। অমর কর্তৃক নিপীড়িত। ওগো নরনারী! আজ সর্বত্র এই জ্ঞাতবেদাকেই পুনর্জাগরিত কর। আমাদের সকল বর্ষ আজ জ্ঞাতবেদার অভাবেই ব্যর্থ হইতেছে। ইহা উপকথা বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিও না। উদাহরণ দিয়াই বলি—বাংলায় যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল, দীর্ঘ যুগ ধরিয়া অসংখ্য নরনারীর অবদান উৎসর্গীকৃত হইয়া যে হোমানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, জ্ঞাতবেদার অভাবেই কি তাহা নিপ্ত হইয়াছে? অমর কর্তৃক কি জ্ঞাতবেদা বিনষ্ট হইয়াছে? তাহা না হইলে জীবন-যজ্ঞ তো অব্যাহত রহিয়াছে আজও, তথাপি যাজ্ঞিকেরা প্রবুদ্ধ হইতেছে না কেন? জ্ঞাতবেদার অভাবেই নয় কি? তাই বলি, জাগাও জ্ঞাতবেদাকে। জাগরণের আবাহন মন্ত্রে মুখরিত হোক তোমাদের কণ্ঠ। “যে শিখা জ্বলেছে প্রাণে বিন্দু বিন্দু স্রুধা দানে, দীপ্ত রেখা, স্রুপ্ত হয়ে নিভায়ো না তায়।” তোমাদের প্রাণে আজ যে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহাতে জ্ঞাতবেদার জন্ম হোক। যদি তাহা না হয়, এত তপস্বী, এত উৎসর্গীকৃত প্রাণের অকুণ্ঠ অবদান সবই যে ব্যর্থ হইবে। ব্যর্থ হইবে যজ্ঞানল, আহুতি, বেদ মন্ত্রের উদ্যান। জাগাও আপনার মধ্যে সেই জ্ঞাতবেদাকে—যাহার সবখানিই অগ্নিময়, তেজোদ্বীপ্ত তবেই তো তোমার অগ্নিময় জীবনের আলোয় দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। (পুরাতন নবসম্মত হইতে)

সঙ্ঘবন্ধু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকঃ । অষ্টত্রিংশৎ স্তবঃ ।) দ্বিতীয়া ঋক্

(সম্বন্ধক শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

ক নুনং কদ্বো অর্থং গন্ত দিবো ন পৃথিব্যাঃ ।

ক বো গাবো ন রণ্যস্তি ॥ ২ ॥

অর্থ—[হে মরুদেবগণ! আপনারা] “নুনং” (এখন) “ক” (কোথায়) “বঃ” (আপনারা) “কং” (কখন) “অর্থং” (দেবযজ্ঞন দেশে) “দিবঃ” (দ্যুলোক হইতে) “গন্তা” (আগমন করিবেন) “পৃথিব্যা” (পৃথিবী হইতে) “ন” গন্তা (গমন করিবেন না) “বঃ” (আপনাদের) “গাবঃ” (কিরণসমূহ) “ন” (আমাদিগের নিকট) “ক” (কখন) “রণ্যস্তি” (শক্তি হইবে?)

সরলার্থ—হে মরুদেবগণ! এখন আপনারা কোথায় অবস্থান করিতেছেন? কখনই বা আপনারা দেবযজ্ঞন দেশে আগমন করিবেন? দ্যুলোক হইতে ধরাধামে অবতরণ করুন। পৃথিবী হইতে বিদায় লইবেন না। বায়বীয় রশ্মিসমূহ কখন শক্তি হইবে?

বিশদার্থ—ঋকটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা মরুদেবগণের নিকট। ঋষির নিকট মরুদেবগণই অনাদি অনন্ত পরম ব্যোম তত্ত্বের প্রতিভূ। সৃষ্টির আদিভূতা সনাতনী শব্দগুণময়ী জননীস্বরূপা যে মহাকাশ—সেই মহাকাশ হইতে নিত্য তেজসপদার্থ সমূহ নির্গত হইয়া তৈজস বায়ুর সৃষ্টি করে। সেই বায়ুই দ্বাবা পৃথিবী পরিবাপ্ত হইয়া প্রবাহিত হয়। তৈজস বায়ু হইতেই আপোময় এই স্থূল জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। এ কথা আমরা সপ্তত্রিংশৎ স্তবের পর পর কয়েকটি ঋকে পাইয়াছি। এই ঋকে সেই বায়ুরই আবাহন মন্ত্র উদগীত হইয়াছে, যে বায়ু গতিশীল এবং সৃষ্টিধর্মী। সৃষ্টির স্থূল রূপ আপোময় এই পৃথিবী, সূক্ষ্মরূপ অন্তরীক্ষ লোক আর কারণরূপ পরম ব্যোমরূপী মহাকাশ। যাহা কারণে না থাকে, তাহা স্থলে কখনই রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না। কারণে সৃষ্টিসম্ভার বীজাকারে পরমের মাঝে নিহিত আছে বলিয়াই তো মানবদরদী জীবনধর্মী ঋষি পৃথিবীর কল্যাণ কামনায় সেই ঐশ্বর্য্যকে মর্ত্যের বৃকে নামাইয়া আনার জন্ত মরুদেবগণের শরণার্থী। তাইতো ঋষিকণ্ঠে প্রার্থনা-মন্ত্র বাক্যর তুলিয়াছে—কোথায়? হে মরুদেবগণ! কত দূরে আপনারা অবস্থান করিতেছেন? কখন আপনারা এই সম্বন্ধক্ষেত্রে আগমন করিবেন? আপনাদের আগমনে ছাবা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কতক্ষণে অহরপিত হইবে? ছন্দিত শব্দ তরঙ্গের মধুময় হিল্লোলে মর্ত্যবক্ষ কখন উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে?

শব্দ বায়ু গুণ নব—উহা আকাশেষ গুণ। বায়ু শব্দকে বহন করে বলিয়া তাহার নাম শব্দবহ বা সমীরণ। বায়ু প্রবাহিত হইবার সময় আকাশে শব্দগুণকে আশ্রয় করিয়াই বহিয়া চলে, তাই বাতাসে এক প্রকার শব্দ উথিত হয়। রণ্যস্তি পদে ঋষি তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

আত্মস্বরিতা, সৃষ্টির অহমিকা বিসর্জন দিয়া দেবাত্মগ্রহে এমন আত্মগত্যা বুদ্ধি সেই ঋষিযুগেই সম্ভবপর হইয়াছিল। ঋষি বক্ষিমচন্দ্রের মত বলিতে সাধ যায়—‘আবার আসিবে কি মা, এমন সম্ভান আবার গর্ভে ধরিবে কি’?

বাংলা সাহিত্যে উইলিয়ম কেরী ও রামরাম বসু

শ্রীকালীপদ মণ্ডল

যে বাংলা সাহিত্য বর্তমান ফলে ফুলে সমৃদ্ধিত, তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস দীর্ঘ এবং বহু তথ্যপূর্ণ। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—খৃষ্টীয় দশম শতকের কোন এক সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম এবং উড়িষ্যা, আসামী ও বাংলা ভাষা সমগোত্রী। ১৩০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ হয়। পৰ্তুগীজ ও ইংরেজরা আমাদের দেশে আসায় আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল এবং তাহা ইতিহাসসম্মত। ইংরেজেরা এদেশে কেবলমাত্র বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসেন নি, বাণিজ্য ও বসতিব সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খৃষ্টধর্ম প্রচারে পাদ্রী নিযুক্ত করেন। এই সময় ভারতের বিভিন্ন ভাষার সহিত তাঁরা অঙ্গ-বিস্তার পরিচিতি হন। ভাষা বুঝবার জন্ত এবং বিশেষ করে দোভাষীর কাজ করবার জন্ত তাঁরা এদেশের উৎসাহী পণ্ডিত ব্যক্তিদের মূল্যবান পদে নিযুক্ত করতেন। মাসিক একটি বেতন দিতেন তাঁদের এবং তাঁরাও ইংরেজদের সঙ্গে মিশে তখন ইংরাজী ভাষা শিখতেন। এইভাবে ধীরে ধীরে ইংরাজী ভাষার সঙ্গে এ দেশের ভাষার আদান-প্রদান শুরু হয়। এই আদান-প্রদানের মাধ্যমেই এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ হয়। প্রথম বাংলা গল্পলেখক—রামরাম বসু উইলিয়ম কেরীর মূল্যী ছিলেন। রামরাম বসু ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ নামক একখানি বাংলা গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তনের বিস্তৃত আলোচনা না করে আমরা বাংলা সাহিত্যে উইলিয়ম কেরীর ও রামরাম বসুর অবদান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

উইলিয়ম চেম্বার্স সুলীম কোর্টের ফার্সী ইন্টার-প্রিটার ছিলেন। রামরাম বসু ফার্সী থেকে বাংলায় অম্ববাদ করতেন। এই সময় জন টমাসকে বাংলা দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্ত নিযুক্ত করা হয়। জন টমাস তখন

বাংলা ভাষা শিখবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং উইলিয়ম কেরীর শরণাপন্ন হন। উইলিয়ম তখন নিজের মূল্যী রামরাম বসুর সঙ্গে টমাসের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই সময় জন টমাস কলিকাতায় রামরাম বসুকে গুরুপদে বরণ করেন এবং রামরাম বসুর কাছে বাংলা ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। রামরাম বসুর সাহায্যে টমাস ম্যাথু, মার্ক ও জেমস্ প্রভৃতির বাংলায় অম্ববাদ করেন। জন টমাসের সঙ্গে পরে রামরাম বসু মালদহে যান এবং সেখানে খৃষ্টধর্ম প্রচারে জন টমাসকে সাহায্য করেন। জন টমাস ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। রামরাম বসু তাঁর দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেন, টমাস তার কিছুই বুঝতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ টমাস ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, যার ফলে তিনি ঋণের দায়ে অশান্তির তুহানলে তিলে তিলে দগ্ধ হতে থাকেন। তাঁর ধারণা ছিল, রামরাম বসুই সর্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। রাম-রাম বসু সর্বদা খৃষ্টধর্মের গুণগান করতেন বটে, কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে খাঁটি হিন্দু ছিলেন। জন টমাস দীর্ঘদিন ধরে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে এ দেশের কোন লোককেই খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারেন নি এবং হতাশ হয়ে মনের দুঃখে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। জন টমাসের সঙ্গে রামরাম-বাবুর বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এমনি কয়েক বছর ক্রমাগত আলোচনা ও অধ্যাপনা হয়েছিল; এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল।

উইলিয়ম কেরী এ দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্ত সপরিবারেই আসেন এবং দীর্ঘ একচল্লিশ বৎসর তিনি এই বাংলা দেশেই বাস করেন। রামরাম বসুর নিকট তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেন। বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। টমাস, ওয়ার্ড, আর্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীগণের সহযোগিতায় তিনি বাংলাদেশে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে

মিশন স্থাপন করেন। এবং এই মিশনের ছাপাখানা হতে ভারতের নানা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে প্রচার করা হতো। তাঁর চেষ্টায় এই মিশন-প্রেস থেকে অনেক প্রাচীন বাংলা কাব্য মুদ্রিত হয়েছিল। বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি 'A Dictionary of the Bengali Language' (১৮০০ খৃঃ) নামক একখানি অভিধান লেখেন। এইভাবে তৎকালে বাংলাদেশে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ক্ষীণধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। সুতরাং দেখা যায়, বাংলা গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে উইলিয়ম কেরী ও রামরাম বসু যেন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। কেরী সাহেব বাংলাদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারে আসলেও দীর্ঘদিন বাংলা দেশে বাস করে বাংলার জলবায়ু, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালীকে মনে-প্রাণে ভালবেসেছিলেন। ডেভিড হেয়ার যেমন এ দেশে ঘড়ির ব্যবসায় করতে এসে এ দেশের ছেলেমেয়েদের ভালবেসে ছিলেন, এবং তাদেরই সেবা ও উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, উইলিয়ম কেরীর অবস্থা কতকটা সেই রকমই।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্লির প্রচেষ্টায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজে আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, বাংলা, তেলেগু, মারাঠী ও তামিল ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে

বাংলা দেশে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ যুগান্তর সৃষ্টি করে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরী এই কলেজের বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন; এবং তাঁর সহকারী পণ্ডিতরূপে কাজ করেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় সৈদিন বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। তারপর রামমোহন রায়, দ্বৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নবযুগ সৃষ্টি করলেন। এমনিভাবে সৈদিন বাংলা সাহিত্যে মন্বাকিনী প্রবাহিত হয়। পরবর্তীকালে সেই সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে বিশ্বদরবারে জয়মাল্যের গৌরবটাকা পরেছে। সুতরাং দেখা যায়, শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রধান উৎস।

কেরী সাহেব দীর্ঘদিন এ দেশে বাস করে এবং পণ্ডিতদের সঙ্গে মিশে পরবর্তীকালে তাঁর মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তাঁর সঙ্গে রামরাম বসুর যোগাযোগ যেন মণিকাঞ্চনের যোগ। এই মণিকাঞ্চন যোগই বাংলা সাহিত্যের প্রধান বাহক। সুতরাং, বাংলা সাহিত্যে উইলিয়ম কেরী ও রামরাম বসুর অবদান চিরস্মরণীয়।

উর মা বাণী !

ঠাকুর ধনঞ্জয় চক্রবর্তী

নগসম মুঢ়জনে উর মা বাণী !

মুকজন জ্ঞাত্রী ! বেদ-জ্ঞান-দাত্রী ! বীণাপাণি !

মরালবাহনা ! বেদ-বীণাকরা,
জ্ঞানজ্যোতিরূপা ! অজ্ঞতা-তমোহরা !
গজমতিহার সজ্জিতা ধবলা !
আরাধিতা সুর-নর, বিদ্যারূপী !

পশ্চিমে দেহ জড়-বিজ্ঞান-বুদ্ধি,
আর্য্যভূমে দিলে চিস্তের শুদ্ধি !
বিশ্বের জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানী প্রতিভা—
ঝরণাধারে আন ভারতে টানি' ॥

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের শিক্ষা

ডক্টর মতিলাল দাশ

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ভারতীয় আধ্যাত্মসাধনার রত্নখনি। পুস্তকটির রচয়িতা কে নিঃসংশয়ে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে মহামুনি বশিষ্ঠ প্রবক্তা আর নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র শ্রোতা।

এই মহাগ্রন্থে দুঃখসাগর পার হবার পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। আন্তিক, নাস্তিক ভারতীয় সব দর্শনেই দুঃখকে ধর্মজিজ্ঞাসার মূল কারণ বলে স্থির করা হয়েছে। সংসারে জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, দুঃখ, দৌর্ময়নস্ত আছে বলেই দুঃখনিরোধের জন্ত মানুষের নতন চেষ্টা। যোগবাশিষ্ঠও এই দুঃখকে স্বীকার করেছেন।

কান্তা দূশো যামু ন সন্তি দোষাঃ

কান্তা দিশো যামু ন দুঃখদাহঃ।

কান্তা প্রজা যামু ন ভজুরহম্

কান্তা ক্রিয়া যামু ন নাম মায়া।

কোথায় সেই দিক যেখানে নেই দোষ? কোন্ সে দিক যেখানে নেই দুঃখদাহ, কোথায় সে প্রজা যাদের নেই মৃত্যু? কোন্ সে ক্রিয়া যেখানে নেই মায়া?

এই মায়ায় দুঃখকঠিন সংসারে কাতর জীবের উদ্ধারের একমাত্র পন্থা অবিজ্ঞা নিরাকরণ এবং আত্মজ্ঞান লাভ। যোগবাশিষ্ঠ তার সমগ্র অমূল্যলতনে এই সত্যটি বিস্তৃতভাবে প্রকটিত করেছেন।

হে জনা অপরিজ্ঞাত আত্মা বো দুঃখসিদ্ধয়ে।

পরিজ্ঞাতত্বনস্তায় সুখায়োপশমায় চ।

হে শোকতাপিত জনগণ! আত্মা যতক্ষণ অপরিজ্ঞাত, ততক্ষণ তোমার দুঃখোদ্ভব—আর যখন আত্মা পরিজ্ঞাত হবে, তখন আদবে পরমানন্দ এবং পরমা শান্তি। আত্মজ্ঞানেই সমস্ত দুঃখের উপশম ঘটে। আত্মলাভ না হওয়া পর্যন্ত দুঃখের বিজ্ঞাপ্তি নেই।

সে আত্মা কি যাকে জানলে সব জানা হয়, সব পাওয়া মেলে? বশিষ্ঠ বলেন, পৃথিবীতে আত্মা সম্বন্ধে চার রকম মতবাদ প্রচলিত আছে—তার প্রথম তিনটি ভ্রান্ত চতুর্থটি গ্রাহ্য।

কেহ কেহ বলেন আমি দেহ, কেহ কেহ বলেন আমি

মন, কেহ কেহ বলেন আমি সর্বভাবাতীত স্বল্প পদার্থ। আর চতুর্থ মতে আত্মা আর ব্রহ্ম অভিন্ন। আমিই সমগ্র বিশ্ব, ব্যোমসম শূন্য। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আমার অংশ।

কুশুম্বেদহম্যমোদঃ পুষ্পপত্রৈঃ ছবিঃ।

ছবিদ্বং রূপকলা রূপেদহুতবোহপ্যহম্॥

কুশুম্বেদ সৌরভ আমি, পুষ্পপত্রের সুষমা আমি—
দৌন্দর্বেয় রূপকথা আমি, সমস্ত রূপের অমুভব আমি।

জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সবই আমি, কর্তা, হেতু, ক্রিয়া সবই আমি—আত্মাই ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ, পৃথিবীতে যা কিছু আনন্দ সবই সেই আনন্দ থেকে জ্ঞাত—জীবনের কাম্য ও লক্ষ্য এই সচ্চিদানন্দ আত্মা।

জ্ঞাত, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় অবস্থায় আমাদের ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। ব্রহ্মকে আমরা জানতে পারি তুরীয় অবস্থায়। সেই প্রবুদ্ধ আত্মায় ব্রহ্মই হয়ে যাই। বশিষ্ঠ রামকে বলছেন—

প্রবুদ্ধানাং মনো রাম ব্রহ্মৈব হি নেতরং।

হে রাম, প্রবুদ্ধ মানুষের মন ব্রহ্মস্বরূপই—ইতর বস্তু নয়।

বশিষ্ঠ অবৈতবাদী বৈদাস্তিকের মত বলেন—সেই পরমকে লাভের পথ বিজ্ঞা বা জ্ঞান—অন্ত কোনও পথই নেই।

ন তীর্থেন, ন দানেন, ন স্নানেন, ন বিত্তয়া।

ন ধ্যানেন, ন যোগেন, ন তপোভি ন চাধ্বরৈঃ॥

ন শাস্ত্রায় গুরোর্বাক্যায় দানাদ্বেষরার্চনাং।

অত্র জ্ঞানমহুষ্ঠানং ন কৃত্বত্বপুযুক্ত্যতে॥

তীর্থযাত্রায় কোন ফল নেই—দান বা স্নান নিরর্থক—
লৌকিক বিজ্ঞা অপ্রয়োজনীয়, ধ্যান বা যোগে পরম তত্ত্ব-
লাভ হয় না—তপস্যায় বা যজ্ঞেও আত্মজ্ঞান অদুর্লভ, শাস্ত্র-
পাঠ, গুরুবাক্যাহরণ, দান বা ঈশ্বরার্চন কিছুই কোনও
কাজে আসে না—আত্মাকে জানতে হলে একমাত্র জ্ঞানই
অমুঠেয়—অন্ত উপায়ের কোনই উপযোগিতা নেই।

ভক্তির পথ তাই বশিষ্ঠের নম্র—শরণা গতি

তিনি ধারেন না, কপার গ্রন্থই ওঠে না—আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু—আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উপলব্ধি করতে হয়, আত্মা যদি আত্মাকে উদ্ধার না করে, তবে মুক্তির আর কোনই উপায় নেই। আত্মযন্ত্রে যা লাভ হয়, তাছাড়া ত্রিভুবনে আত্মাকে পাওয়ার আর কোনই পথ নেই।

শঙ্করাচার্যের মত বশিষ্ঠ কিন্তু সন্ন্যাসের উপর জোর দেন নাই। বুদ্ধ এবং শঙ্কর মানুষকে গৃহধর্ম বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বারংবার বলেছেন, কিন্তু বশিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের মত নিকাম কর্মযোগে বিশ্বাসী।

ন ক্রিয়ামাঃ পরিত্যাগো ন ক্রিয়ামাঃ সমাশ্রয়ঃ কর্মকে পরিত্যাগ করবে না—তাতে লিপ্তও হবে না। পদ্মপত্রে নীর সম জীব নিরাসক্ত হয়ে জীবন যাপন করবে।

কর্মের বাসনা যতক্ষণ অন্তরে জাগ্রত, ততক্ষণ বাহিরে কর্মত্যাগ বৃথা। আত্মজ্ঞানের অল্প সংসার ত্যাগের কোনও প্রয়োজন নেই—এই সংসারেই কর্মজালের মধ্যেই মানুষ মুক্তির স্বাদ লাভ করতে পারে। অন্তরে শান্তি লাভ হলে সংসারই অরণ্যস্বরূপ—আর মনে শান্তি না থাকলে অরণ্যও সংসারের ঝঞ্ঝাটে ভরে ওঠে। নির্বাণ প্রকরণে চূড়লা এবং শিখিন্দ্রের উপাখ্যানের মধ্যে এই তত্ত্ব বিশদভাবে প্রকটিত করা হয়েছে।

আত্মজ্ঞানের স্বরূপ কি? যে জ্ঞানে মানুষ ভাগবত বোধে উদ্দীপ্ত হয়, দেবস্বরূপ লাভ করে সে জ্ঞানে মানুষ বোধে জগতে যা কিছু দুষ্টমান, সকলই ব্রহ্ম—সেই ব্রহ্মই আমার আত্মা। জীব ও ব্রহ্মের এই অভেদ অমুভূতি সত্যকার জ্ঞান। এই উপলব্ধি আসে।

সুন্দরযা নিজয়া বুদ্ধ্যা প্রজ্ঞয়েব বয়স্তয়া।

পদমাসাদ্যতে রাম ন নাম ক্রিয়বাহিন্য।

হে রাম! নিজের সুন্দর বুদ্ধি দিয়ে—সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায় এই উপলব্ধি আসে, অল্প কোনও ক্রিয়ায় আসে না।

মানুষকে বিচার করতে হবে—জগৎ কি সেটা ভাবতে হবে, দৃঢ় একাগ্র ভাবনায় কি সত্য আর কি অসত্য জানা যাবে—অতএব সত্যকে অমুসরণ কর। সত্যামুসরণেই প্রত্যক্ষ অমুভূতি হবে। প্রত্যক্ষ অমুভূতি না হলে জ্ঞান হয়নি বুঝতে হবে।

বুদ্ধির পথে প্রাপ্তি নেই—আছে বোধির পথে। সেই বোধি আসে অভ্যাসে ও বৈরাগ্যে। মানুষকে ভগবান হতে হবে—ব্রহ্মভূত মানুষ ব্রহ্মের মতই চিন্তা করেন। ব্রহ্মের মতই অমুভব করেন।

জন্মান্তরশতাভ্যন্তা রাম সংসারসংস্থিতিঃ।

সা চিরাত্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীযতে কচিৎ ॥

শত শত জন্ম ব্যাপ্ত করে চলছে সংসার-সংস্থিতি—এই দুর্বীর সংসারবেদনা নিরন্তর অভ্যাস যোগ ছাড়া কিছুতেই লীন হয় না।

অভ্যাস যোগের তিনটি পথ। প্রথম এক তত্ত্বের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস, দ্বিতীয় মনোবিনিগ্রহ, তৃতীয় প্রাণশক্তির বিলম্ব। এই তিনটির মধ্যে মনের নিগ্রহ করতে পারলে সাধনা সহজ ও সুগম হয় ও সত্ত্বর শান্তিলাভ হয়, মনো-বিনিগ্রহের দ্বারা সেই পরম একের জ্ঞান আসে এবং প্রাণশক্তির সর্ববিধ চেষ্টা বিলুপ্ত হয়।

ত্রিষেতেষু প্রযোগেষু মনঃ প্রশমনং বরম্।

সাধ্যং বিদ্ধি তদেবাস্তু যথা ভবতি তচ্ছিবম্ ॥

উপরের তিনটি প্রযোগের মধ্যে মনসংযম সর্বশ্রেষ্ঠ—কারণ সেটি আস্ত সাধ্য এবং সত্ত্বর শান্তি আনয়ন কবে।

বশিষ্ঠ মনের উপর খুব জোর দিয়েছেন। মন যখন শান্ত এবং নিশ্চল তখন ব্রহ্মের সহিত অভেদ, যখন সচল, তখন জীব ও জগৎ সৃষ্টি করে। মনের চাক্ষুশ্য দূর্ব করতে পারলেই জীবত্ব ধ্বংস হয় এবং আমরা ব্রহ্মশক্তিতে লীন হই।

প্রথমে দৃঢ় ভাবনায় স্থির করতে হবে অহং মায়ী—অহংবোধ ভ্রমসঞ্জাত। সেই ভ্রম, অজ্ঞান বা অবিদ্যার নাশ হলে আমরা যে অনন্ত, অখিল এই বুদ্ধি জাগ্রত হবে।

মনে নানা সঙ্কল্প মুহূর্মুহ উঠছে—বিপরীত সঙ্কল্প করতে পারলে ভাব বিপর্যয়ে প্রথম সঙ্কল্পের বিপরীত সঙ্কল্পের দ্বারা উভয়ই বিনষ্ট হবে, ভোগেচ্ছা ত্যাগ করতে হবে—ভোগে অরতি না হলে মুক্তি নেই। ভোগে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা জাগতে পারলে ভোগেচ্ছা বিনষ্ট হবে।

বাসনা ত্যাগ করলে ভোগ ত্যাগ সহজ হয়। বাসনাই ব্যক্তিত্ব—বাসনা বিনাশে ব্যক্তিত্বেরও বিনাশ ঘটে। ভগবানকে পেতে হলে অহংভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিবে।

অহঙ্কারের কারাগারেই আমরা বন্দী, যে মুহূর্তে মমত্ব ত্যাগ করতে পারব, তখনই আমরা বিরাতের সাথে এক হয়ে বিরাতের মাঝে লীন হব।

বৈরাগ্য পরম সহায়। দেহভাবে আমরা বদ্ধ হয়ে পড়ি—দেহভাবনা ত্যাগ হলে—আমরা কণিকাত্ম ও অপূর্ণত্ব থেকে পূর্ণতায় এবং শাস্ত্রতভাবে প্রোচ্ছল হব। সমতার অভ্যাসে ভেদবুদ্ধির বিলোপ হয় এবং অভেদ জ্ঞানে মুক্তি আনে।

ত্যাগ এবং বৈরাগ্য মানস কর্ম। সেই মানস বিকাশে মমত্বের স্থান কোথায়—যখন সর্বজগৎ আমি, তখন বিশেষ-বস্তুকে আমার বলা বুধা। সর্বদাই ভাব কোনও বস্তুই কারও নয়, সবই ভগবানের।

পরব্রহ্মের যে ভাবনায় সমাধি উৎপন্ন হয়, সেই সমাধি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরমানন্দ দায়ক।

সংশাস্তে চিন্তবেতালে যামানন্দকলাং তমুঃ।

যাতি তামপি রাজ্যেন জাগতেন ন গচ্ছতি ॥

মন যখন পরিপূর্ণ শাস্ত্র হয়ে বিলীন হয়ে যায়, তখন যে পরমানন্দ অমৃতত্ব হয়—বিশ্বরাশ্যের অধীশ্বর হলেও সে আনন্দ পাওয়া যায় না।

মন সংযত ও শাস্ত্র হলে প্রাণের ক্রিয়া ও চেষ্টাও শাস্ত্র হয়ে যায়।

বশিষ্ঠের নির্দেশিত একতত্ত্বের অধ্যয়ন, মনঃসংযম

এবং প্রাণ-সংযমের ফলে আত্মোপলব্ধি ঘটে। সহজ ভাষায় এটি হল আমিহ্মের প্রসার—নিজেকে খণ্ড এবং পৃথক মনে করে অহংবোধে নিজেকে আবরণ করেই আমরা দুঃখ বেদনায় পীড়িত হই। আত্মজ্ঞানে আমিহ্মের রূপান্তর ঘটে। খণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন তখন অখণ্ড ও পূর্ণকে আলিঙ্গন করে। অনন্ত এবং অসীমের স্পর্শে সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং মৃত্যুজ্বালার শেষ। মাহুয অমৃত আলোকে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

অসীমের সাথে এই মিলনে সাতটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে জীবের বৃহৎ হওয়ার স্তম্ভেচ্ছা জাগে, দ্বিতীয়ে আসে বিচারণা—তখন সে আত্মা এবং জগতের স্বরূপ নির্ণয়ে চেষ্টা করে, তৃতীয় স্তরে তত্ত্বমানস—তখন জগত মাষাময় এই বোধে অহং ভাব প্রশমিত হয়, চতুর্থ সত্ত্বাপত্তি—তখন আপন অন্তরে সে চরম সত্যকে অমৃতত্ব করে—পঞ্চমে অসংসক্তি, তখন সমস্ত আসক্তি দূর হয়, মাহুয হয় বিতৃষ্ণ এবং বিরাগী, ষষ্ঠে পদার্থ-ভাবনা—মাহুয আপনাকে পরম ও চরমের সাথে অভিন্ন মনে করে—সপ্তমে তুরীয় অবস্থা—তখন মাহুয আপনাকে ব্রহ্মবলে অমৃতত্ব করে পরমানন্দ লাভ করে। এই সপ্ত যোগ-ভূমিকা বা জ্ঞান-ভূমিকার মাধ্যমে বশিষ্ঠ মাহুযকে জীবনুজ্ঞ হতে অধ্যাত্মসাধনার চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে আহ্বান করেছেন।

কালচক্র

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

প্রগতি তীর্থের স্নাপক, হে বর্তমান,
তুমি কি এনেছ হাতে
জন্মের নবীন প্রাতে
অনাগত ভবিষ্যের হ্রলভ সম্মান!
নরকের গ্লানি আজ পুত গঙ্গাজল,
সেই তো সজ্জন যে অতি বড় ধল—
বিশ্ব মাঝে শিখ গাহে তব কীর্তিগান।

তোমার চক্রের চূষক, হে ভাগ্যদাতা,
টানিছে কি পৃথিবীরে
ধ্বংসের সাগর তীরে
কিরে দিতে মানবের নব শাস্তি গাথা?
চঞ্চল জীবন মাঝে কেহ কি দেখিছ আজ
জননীর কি করুণ শোকাতুরা সাজ!
পুনঃ কি দেখিছ তারে হাস্তময়ী মাতা?



শিল্পীমন

—শ্রী ব্রজ লাল দত্ত—

(পূর্বাহ্নবৃত্তি : পৌষ, ১৩৭১ সংখ্যার পর)

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত প্রায়।

এক রোগিণীর পরিচর্যা করে নিরলা ফিরছিল,
চোখে পড়লো দরজার পাশে হেলান দিয়ে দেবকুমার বসে
আছে। বললো—এ কি তুমি এখনও ঘুমোও নি? এই
দুর্বল দেহে রাত জাগা অসুচিত।

দেবকুমার শুককণ্ঠে বললো—ঘুম আসছে না।

—তোমার চিন্তাচঞ্চল্য ষটেছে।

—হবে।

—আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হলেই ভাল ছিল।
যাক, আমরা তো পরশু প্রত্যুষেই চলে যাবছি। চিন্তা
সংযত করার তুমি তখন দীর্ঘ অবকাশ পাবে।

—আমিও এখান থেকে চলে যাবো।

—কোথায়?

—জানি না।

নিরলা এবার আরো কাছে এগিয়ে এলো, বললো—
দেখ, তুমি একজন শিল্পী। জীবনে বড় কিছু সৃষ্টি করাই
তোমার ধর্ম। একটা ক্ষণিকের মোহে নিজেকে বিভ্রান্ত
করো না। সাময়িক চিন্তাবিকারের চেয়ে জীবন অনেক

বড়, জীবনকে সম্যকপথে পরিচালিত করাই মনুষ্যত্ব।
তুমি শিল্পী, শিল্পের সাধনায় তুমি আত্মনিয়োগ কর—সেই
তোমার ধর্ম।

—প্রেম, সেবা, তত্ত্বি এগুলো কি তাহলে শিল্পীর
জীবনের ধর্ম নয়?

—যা তাকে সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত করবে তা-ই
তার কাছে অধর্ম,—বর্জনীয়।

—তুমি বল তাহলে শিল্পী কাউকে ভালবাসবে না?

—শিল্পী ভালবাসবে তার শিল্পকে।

—তোমার কথা আমি মেনে নিতে পারলাম না।
মানুষ শিল্পের চেয়ে বড়, মানুষই শিল্প সৃষ্টি করে, মানুষের
ভালবাসা আগে। শিল্প তার পরে।

—তাহলে তোমার শিল্প কোনদিনই সার্থকসৃষ্টি
হবে না।

—না হোক। মানুষের ভালবাসাকে আমি চিরদিন
শিল্পের উপর স্বীকৃতি দেব। তুমিও তাই দিয়েছ।

—আমি?

—হ্যাঁ। ভালবাসা প্রত্যাখ্যানের বেদনার তুমি
ভিক্ষুণী হয়েছ। সেবা ও ধর্মতত্ত্ব দিয়ে তুমি প্রেমকে ঢাকা
দিতে চাইছ, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছ। এখনও তুমি আমাকে
ভালবাসো, তোমার মুখের পানে তাকিয়ে আমি তা
বুঝতে পারি।

নিরলা কয়েক মুহূর্ত শুক হয়ে তাকিয়ে রইল দেব-
কুমারের মুখের পানে। তারপর বলে উঠলো—না-না।
আমি তোমাকে ভালবাসি না।

দেবকুমার নিরলার একখানি হাত চেপে ধরলো।
ডাকলো—নিরলা।

নিরলা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো কিন্তু
পারলো না। সহসা সে কঁদে ফেললো। চোখের জল
গড়িয়ে পড়লো কপোল বেয়ে।

দেবকুমার নিরলাকে আরো কাছে টেনে নিল। বসনের—
প্রান্ত দিয়ে নিরলার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললো—নিরলা,
চল আমরা দু'জনে এখান থেকে চলে যাই।

রুদ্ধকণ্ঠে নিরলা বলে উঠলো—না না। তোমার পথ
আমার পথ আজ ভিন্ন। তুমি শিল্পী, আমি ভিক্ষুণী—
ভগবান তথাগতের আমি সেবিকা। আমি নিরলা নই,
আমি ভিক্ষুণী উত্তমা।

সাস্ত্রনা দেবার জন্ত দেবকুমার নিরালাকে বুকের উপর টেনে নিলে।

—উত্তমা!

হু'জনেই চমকে উঠলো। বাইরে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রবীণা ভিক্ষুণী সুমিত্রা। সজ্বপালিকা সুমিত্রা কখন যে সেখানে এসেছেন তা কেউ জানে না। নিরালা চকিতে নিজেকে বাহুমুক্ত করে নিয়ে তফাতে সরে গেল।

সজ্বপালিকা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—উত্তমা, এই যুবক কি তোমার পরিচিত?

নিরালা বললো—হ্যাঁ, আমার পিতৃগৃহের প্রতিবেশী।

—আমি ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি। এই যুবকের উপর তোমার আসক্তি বড় প্রবল, যেজন্ত ধর্ম ও সজ্জের মর্যাদা তুমি রক্ষা করতে পারছ না। চিন্তাবিকার জয় করতে না পারলে তোমার পক্ষে সংসারধর্মে ফিরে যাওয়াই কর্তব্য।

নিরালা মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

সুমিত্রা বললেন—তোমার আচরণ ভিক্ষুণীদের আলোচ্য বিষয় হয়, এ আমরা কেউই চাইনা। সম্ভবকৈ নিন্দনীয় ও নীতিভ্রষ্ট করার চেয়ে সম্মত ত্যাগ করাই কি শ্রেয় নয়?

নিরালা এবার ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—না না, আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আমি সম্মত ছেড়ে যাবো না। আমি যদি নিন্দনীয় কিছু করে থাকি, আপনি বলুন আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো—আত্মশোধন করবো।

সজ্বপালিকা কঠিন দৃষ্টিতে একবার দেবকুমারের মুখের পানে তাকালেন, তারপর নিরালার উদ্দেশ্যে বললেন—এসো।

দেবকুমার হয়তো কিছু বলতো, কিন্তু বলার ভরসা পেলো না।

এমন সময় শান্ত গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—দাঁড়াও।

সে কণ্ঠ মহাত্মবির জ্ঞানপুত্রের। জ্ঞানপুত্র সামনে এসে তিনজনের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন—ভিক্ষুণী উত্তমা, প্রারম্ভ কর্ণের সংস্কার নিয়ে জাতক এই পৃথিবীতে আসে, সেই সংস্কার

তার চিন্তাবৃত্তির মধ্যে প্রকাশ পায়। সেই আসক্তির যেটুকু শুভ তাকে বিকাশ করিয়ে যেটুকু অন্তত তাকে বর্জন করতে শিক্ষা দেওয়াই ধর্মের বিধান। সেইজন্তই সকলের জন্ত ধর্মের নীতি এক রকম নয়। সংস্কার অনুযায়ী পথের নির্দেশ আছে। তোমার পথ প্রীতি ও ভালবাসার পথ, তোমাকে সেই পথেই অগ্রসর হতে হবে। সেই পথের যেটুকু কল্যাণকর তাই গ্রহণ করে অকল্যাণকে পরিহার করার উপযোগী চিন্তাসংযম অভ্যাস করতে হবে। এজন্ত কোন ক্রটি কোন প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন নেই। নিজের সন্তাকে যেনে নিয়েই তোমাকে এগোতে হবে। আত্মসংযমের মধ্যে দিয়ে অন্তরের শক্তিকে জাগাতে হবে। সেই হবে তোমার নির্বাণ-লাভের সহায়ক।

জ্ঞানপুত্র কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বললেন—চিন্তের শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্নেহ প্রেম প্রীতি ও ভক্তি। সত্য শিব ও সূন্যের সাধনায় চিন্তাবৃত্তি বিকাশ করে তোলাই জীবনের ধর্ম। স্নেহ প্রেম প্রীতি ভক্তি এই ধর্মসাধনার সহায়ক। তাদের নিরোধ করে চিন্তাবিকাশ সম্ভব নয়। চিন্তাকে বিকল করে মহুগাত্বের পথে এগিয়ে যাওয়া যায় না। চিন্তাক্রান্ত সৃষ্টি করা ধর্মনীতি নয়। সাধনার পথ আনন্দের পথ, সূন্যের পথ।

আর একবার হু'জনের মুখের পানে তাকিয়ে নিয়ে জ্ঞানপুত্র বললেন—তোমাদের পরম্পরের প্রতি যে আসক্তি তা মোহ মাত্র। তোমাদেরকে নতুন কর্মচক্রে জড়িয়ে ফেলার জন্ত এই চিন্তাবিকার দেখা দিয়েছে। মহত্তর সাধনার মাধ্যমে এই বিকারকে জয় করতে হবে। শিল্পীর সাধনা সৌন্দর্য সৃষ্টি, নারীর সাধনা সেবা ও প্রীতি। তোমরা দুজনে পরম্পরের সান্নিধ্যে থেকেই এই সাধনাকে সার্থক করে তোল। ভগবান তথাগতের রূপায় তোমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠুক।

—সুমিত্রা,—জ্ঞানপুত্র এবার সজ্বপালিকার প্রতি ফিরলেন,—আমাদের অবর্তমানে এরা দুজন এই সজ্ঞা-রামেই অবস্থান করবে। তুমি এদের প্রতি কোন বাধা নিষেধ আরোপ করো না। এই শিল্পীকে পরে আমার প্রয়োজন হবে।

জ্ঞানপুত্র মন্ডর পদে চলে গেলেন।

নিরাল। ও দেবকুমার অভিভূত হয়ে তাঁর পানে তাকিয়ে রইল।

সম্মপালিকা স্তম্ভিতাও শুদ্ধ।

উষালোকে তিস্কু ও ডিস্কুগীরা সমবেত হলেন।

যাত্রার জন্ত সকলে প্রস্তুত।

দেবকুমার ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে জ্ঞানপুত্র মহাস্থবিরের পদধূলি গ্রহণ করলেন। জ্ঞানপুত্র আশীর্বাদ করলেন—সুভমস্তু।

দেবকুমার বললো—আবার কবে আপনার দর্শন পাবো?

—কর্ম শেষ হলেই ফিরবো।

—ততদিন আমি কি করবো?

—অচঞ্চল চিন্তে নিজ কর্ম কর, ফিরে এসে তোমাকে আমি নতুন কর্ম দেব।

এবার জ্ঞানপুত্র সমবেত তিস্কু-তিস্কুগীরা পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের সকলে এসেছে?

—হ্যাঁ প্রভু।

—তাহলে আমরা এবার যাত্রা শুরু করি। বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম শরণং গচ্ছামি, সম্ম শরণং গচ্ছামি—জ্ঞানপুত্র ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন।

শতাধিক তিস্কু ও ডিস্কুগী একক সারিতে তাঁর অঙ্গুগমন করলো, সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম শরণং গচ্ছামি, সম্ম শরণং গচ্ছামি।

সামনেই ঘাট, ঘাটে নৌকা প্রস্তুত ছিল। পরপর কয়েকখানি নৌকায় তিস্কু-তিস্কুগীরা গঙ্গা পার হলেন। ওপারের গঙ্গাতীরে তাদের গৈরিক বসনের প্রাস্ত খানিকক্ষণ দেখা গেল। তারপর সবুজ বনভূমির গাছ-পাতার আড়ালে সে বসনের গৈরিক রেখা অদৃশ্য হয়ে গেল। কাঁচা সোনার একটা রশ্মি মিলিয়ে গেল দিগন্তের স্তম্ভলিমার মধ্যে। এবার পূর্বগগনে অরুণোদয়ের রক্তাভা দেখা দিল।

দেবকুমার এবার সজাগ হলো, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নিরাল।

নিরাল। বললো—আমার যাওয়া হলো না। তোমার

সঙ্গে আমার দেখা না-হলেই ভাল ছিল। তুমিই আমার পথের বাধা হলে।

—আমি তো তোমার পথের বাধা হতে চাইনি, আমি তোমার সঙ্গী হতে চেয়েছিলাম।

নিরাল। সে কথার কোন জবাব দিল না।

কিছু শোনার প্রত্যাশায় কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে দেবকুমার বললো—আরেকটু সামর্থ্য হলে আমি এখান থেকে চলে যাবো নিরাল।

—না, তা আর হয় না। মহাস্থবির তোমাকে এখানে অবস্থান করতে বলেছেন, তুমি চলে গেলে আমি আর মহাস্থবিরের সামনে মুখ দেখাতে পারবো না। তিনি আমাকেই এর হেতু বলে মনে করবেন।

—বতদিন তিনি না ফেরেন ততদিন এখানে থাকতে হবে?

—হ্যাঁ, তাঁর নির্দেশের অর্থ তো তা-ই।

—তাহলে তুমি আমার কাজ দাও, নিরাল। আমি কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই, সব চিন্তা থেকে আমি মুক্তি চাই।

—মহাস্থবির তোমার কাজের ব্যবস্থা করে গেছেন।

দেবকুমার বিস্মিত হলো।

সম্মারামের প্রাঙ্গণের একপাশে এক বিশাল আমগাছ তলে বাঁধানো বেদীর উপর কয়েকখানি বড় বড় পাথরের চাপড়া পড়েছিল, সেইগুলি দেখিয়ে নিরাল। বললো—এই সব পাথর রয়েছে তোমার কাজের জন্ত।

দেবকুমারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে আমগাছের নীচে এসে দাঁড়ালো। বেদীর উপর পাথরগুলির গাষ হাত বুলিয়ে বললো—ভাল পাথর, কোন ফাটাসুটি নেই। আমি এই পাথর কেটে মূর্তি গড়বো। কিন্তু কি মূর্তি গড়বো?

—যে মূর্তি দেখে মহাস্থবির খুশী হবেন।

—কি মূর্তি?

—ভগবান তথাগতের মূর্তি।

—তথাগত ভগবান বুদ্ধ! বেশ, আমি মহাস্থবিরকে প্রসন্ন করার জন্ত বুদ্ধমূর্তিই খোদাই করবো। আজ থেকেই শুরু করবো আমার কাজ।

—তোমার দেহ তো এখনও সবল হয়নি।

সজ্জগুরু-স্মরণে

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

তোমার উদ্দেশ্যে আজ রেখে যাই আমাদের

প্রশস্ত প্রণাম ।

হে গুরু মহাশয়, অনিবার্ণ জ্যোতির্ময়, সিদ্ধতপা

তুমি সত্যকাম ।

রেখে যাই আমাদের প্রাণের প্রণাম ।

তোমার কীর্তির একা—এ ভুবনে তুমিই তুলনা ।

সমুদ্রের ধারে বসে বুধা ঢেউ গোণা ।—

তোমার ছোঁয়ায় ধ্বংস আমাদের মতো ক্ষুদ্র

মাছের নাম ।

সক্ষাৎ নিয়ম-ধর্ম-বেদান্তস্বরূপ :

সুখ-দুঃখে সমদৃষ্টি সমস্নেহ ঐশ্বর্যে অরূপ

দেখালে তুমিই গতি দোলায়িত দিনাস্তের স্বন্দময় পথে,

ললিতে কঠোরে অটুবিজ্রপের ছমুঁলা শপথে ।

গরল মম্বন করে' সুখাপাত্র এনেছিলে হাতে,

দান করে' গেলে তাই জগতেরে—কবেকার

পরম প্রভাতে !

স্তব্ধ হল মৃত্যুর মুখে অতশ্রী জীবন ।—

ফুল গেল—নির্ধাউল হল অমৃতের ধন ।

স্বার্থের তিস্তিতে কবে জেগেছিল সেই এক দুর্জয় দানব,

যত না করুণা তার—তারও বেশি ছিল উপদ্রব !

পরাদীন গণতন্ত্র মজ্জায় মজ্জায়

শাসকের সংহাররূপ দেখেছিল সে কী রূঢ়—

শোষণ-পর্যায় ।

পূর্বাচল শিখরচূড়া আলো করে' তুমি এসে দাঁড়ালে সেদিন,

দানবদলনমন্ত্র দিলে দীনে হাতে নিয়ে প্রজ্ঞার দূরবীন !

ক্ষতচিহ্নসাহিত পথে রক্তশক্তি আত্মার সহায়,

শিবই জীবের মাঝে অজ্ঞেয় যে—পাঞ্জা কষে'

ঝঞ্ঝারে হঠাৎ :

পৃথিবীর চক্রতীর্থে এ মন্দেরই ছিল তো সাধনা,

তোমার দীক্ষা তো তাই অগ্নিগর্ভ ধরণীর উত্তপ্ত কামনা ।

শাস্তি কই কালাস্তক বিজ্ঞানের সার্বভৌম পথে ?

তাই তো নিমেষশুল্লি উন্মীলিত অব্যবহিত

তালবৃন্তে

তুলসী মঞ্চে

ভাঙা ঘাটে

গজার সৈকতে !

দেবতার মন্ত্র দেখি অরণ্যে-বাতাসে

আশ্রমের আকাশ হয়ে ঝিকিঝিকি হাসে !

এ মাটিকে তুমিও ভালোবেসেছিলে জানি,

ষড়ঋতু তাই আজো তোমার চাঁপার বনে ঘন রাতে

কুমারী কলাগী ।

বর্ষার নবীন মেঘ আকাশে উদয় হলে কাঁপে কিনা

নিম-কলাপাতা,

যে গান পাখিরা গায় আত্মকুঞ্জে সত্য ডেকে—সেকি নয়

কারো জয়গাথা ?

কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া অম্লান শাখায় আজো ফোটায় আলোক,

তোমার পরশপূত সৃষ্টিকাই মনে করি—

আমাদের ললাটে হবে বিজয়-তিলক !

—ও কিছু না। কাজ করতে করতে সবলতা আসবে।

সেইদিন মধ্যাহ্ন থেকে দেখা গেল, দেবকুমার সেই আমগাছ তলে একখানি পাথরের গায় ঠুক ঠুক করে ছেদনী ও হাতুড়ি ঠুকছে।

স্বর্ষোদয় থেকে স্বর্ষাস্ত পর্যন্ত দিনের পর দিন ধরে কাজ চললো। এক অপরূপ বুদ্ধমূর্তি ফুটে উঠতে লাগলো পাথরের গায়। মূর্তির মধ্যে দেবকুমারের সত্তা হারিয়ে গেল।

[আগামীবারে সমাপ্য]

যুগপুরুষ শ্রীমতিলাল

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যু বরণ করে—এটা বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু তাদের মধ্যে আঙুলে গোণা যায়, এমন কিছু চিহ্নিত মানুষের জন্মই আবির্ভাব-উৎসব অথবা তিরোধান-দিবসের আয়োজন হয়। ভারতবর্ষের সেই কতিপয় চিহ্নিত মানুষদেরই একজন শ্রীমতিলাল রায়। চিহ্নিত মানুষ আমরা তাঁদেরই বলি, যারা দৈহিক মৃত্যু সত্ত্বেও অমর। তাঁদের অস্তিত্ব জড়জগতে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে বিদ্যমান থাকার মধ্যেই সীমিত নয়। আকাশের উজ্জ্বল তারকা যখন কক্ষচ্যুত হয়ে ধসে পড়ে, পিছনে সে রেখে যায় সুদীর্ঘ আলোকরেখা, যা স্বয়ং তারকার চেয়েও উজ্জ্বলতর। যে মহাজীবন মৃত্যুর পরও তাঁর পশ্চাতে ওই উজ্জ্বলতর আলোকরেখার মতো তাঁর স্মরণ কীর্তি রেখে যান, তিনিই বিশ্বের চিহ্নিত মানুষ। মৃত্যু কোনোটিনি নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। তাঁর কীর্তি তাঁর মৃত্যুকে অস্বীকার করে তাঁকে অমরত্ব দান করে। সেই কীর্তির দিক দিয়ে শ্রীমতিলাল রায় দেশের বরণ্য সন্তান, যুগের প্রণয় পুরুষ।

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসকে স্থূলভাবে দুইটি অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম সাতচল্লিশ বছর স্বাধীনতাপূর্ব যুগ। এবং পরবর্তী সত্তেরো বছর স্বাধীনতা-উত্তর যুগ। এই দুই যুগে ভারতবাসীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক কল্লনাভীত পরিবর্তন, এক অদ্ভুত আশ্চর্য ওলটপালট লক্ষ্য করা যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই: স্বাধীনতাপূর্ব যুগে রাজনীতিতে যোগদানের অর্থ ছিলো, ত্যাগ, দুঃখবরণ, কারাবাস, ভোগ ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো। আজ কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আজকের রাজনৈতিকতার সার ধর্ম: কিঞ্চিৎ গুহিয়ে নেওয়া,—ছূর্ণীতির আশ্রয়ে অথবা সদাচারের আবরণে কিছু বাগিয়ে নেওয়া,—লোভীর মতো অর্থ ও কর্তৃত্বের দিকে লোলুপ ধাবা বাড়ানো। বিশ্ববরণ্য আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ ডঃ রাধাবিনোদ পাল যে পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণ করে

আইনজ্ঞের ভাষায় বলেছেন: After independance there seems to have been a time when our leaders came to make a compromise between their NEW POWER and OLD PRINCIPLES.

শ্রীমতিলাল রায়ের রাজনৈতিক জীবন কিন্তু স্বাধীনতাপূর্ব যুগের। যে যুগে রাজনীতির অর্থ ছিলো মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পাঞ্জা কষা। সেই যুগের রাজনৈতিক যোদ্ধা তিনি; স্বাধীনতা-যুদ্ধের মরণ-পণ সৈনিক; বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখের সহকর্মী। 'তদানীন্তন ভারত-শাসক ও শোষক অর্ধেক পৃথিবীর রাজা দুর্ধর্ষ ইংরেজের হাজার হাজার অজস্রজিত সৈনিকের বিরুদ্ধে, তাদের অজস্র বন্দুক-কামান-গোলা-বারুদের বিরুদ্ধে, যে কয়জন মুষ্টিমেয় দামাল ভারতসন্তান সেদিন নিজেদেরই হাতে তৈরী সামান্য হাত-বোমা নিয়ে রক্তচক্ষে রুধে দাঁড়িয়েছিলো—তাদেরি একজন শ্রীমতিলাল রায়। তাই তিনি দেশের স্বরণীয় সন্তান, তাই তিনি জাতির বরণীয় পুরুষ।

কিন্তু বিপ্লবের বজ্রাঘাতে বিদেশী ও বিজাতীয় শাসক বিতাড়নই তাঁর জীবনের শেষ কথা ছিলো না। তাই তিনি সংগে সংগে স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতির জন্য সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন,—যার সার্থক পরিণতি প্রবর্তক সঙ্ঘ ও প্রবর্তকের বিভিন্ন মানবতা ও সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র, ব্যবসা ও বাণিজ্যের নানান শাখা-প্রশাখা। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে বাঙালি ও বাঙালী জীবনের অর্থনৈতিক কাঠামো তখন ধ্বংসোন্মুখ। বাঙালী তখন জাতিগতভাবে চাকুরি-পাগল। সে চাকুরী সরকারীই হোক, কিম্বা কোনো বৈদেশিক অথবা মারোয়ারী কার্মেই হোক। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের আশ্রয় অনীহা। বাঙালী শ্রমিকসমাজ পোড়া রক্ষণশীল ও পুঁজিপ্রবণ। অবশিষ্টাংশ বিস্ত্রহীন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালী প্রায় দেউলিয়া। এই সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বার-বার বাঙালীর মনের দুয়ারে করাঘাত করে আবেদন জানাচ্ছেন: তোমরা ব্যবসা করো। সাবধান বাণী শোনাচ্ছেন: যদি ষাঁচতে চাও তো হে বাঙালী তোমরা

ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু রত্নশীল বাঙালী পুঁজিপতির দল সে আহ্বানে সাড়া দিতে সাহসী হয়নি। এমনি এক দুর্ভোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুঃসাহসী শ্রীমতিলাল এগিয়ে এলেন। অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে তিনি নিঃস্ব। কিন্তু মানস-সম্পদে বিজ্ঞান-শ্রীমতিলাল বহুবাক্যের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করলেন সমস্ত দায়-দায়িত্বের বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে। সেই ঋণের বোঝা ও অন্তরের আকৃতি সম্বল করে শ্রীমতিলাল ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। এর পরের মরণপণ সংগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র এ নয়। তবে শেষ পর্যন্ত যে শ্রীমতিলালের ঐকান্তিক সাধনা, তাঁর সুযোগ্য শিষ্যবর্গের সহযোগিতায় সার্থক হয়েছিলো, তার প্রমাণ : প্রবর্তক ফার্নিশার্স, ব্যাঙ্ক, কমার্শিয়াল কর্পোরেশন, জুট মিল, পাবলিশার্স, প্রিন্টিং ও হাকটোন, কৃষি ও খাদ্য বিভাগ প্রভৃতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি।

কথিত আছে : অর্থই অনর্থের মূল। কিন্তু সম্রাসী মতিলাল রায়, তাঁর সুযোগ্য অমুগামীর দল এবং তাঁদের পরিচালিত প্রবর্তক প্রতিষ্ঠানগুলি ভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিলো। ব্যবসায়ে বিপুল সার্থকতা ও প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়েও এঁদের দেখা গেলে like a lotus in the water but not of the water. প্রস্ফুটিত পদ্মের সার্থকতা যেমন তগবানের পূজায় নিবেদিত হওয়ায়, তেমনিই প্রবর্তকের বাণিজ্যিক সার্থকতা ও অর্থের প্রাচুর্য আত্মসেবা ও ভোগের পরিবর্তে নিয়োজিত হলো মানুষের সেবায়, মানবিকতার পূজায়। শ্রীবুদ্ধ যেমন কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হওয়ার পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন : “ইহাসনে শুদ্ধত্ব মে শরীরং তগচ্ছিয়াংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু, অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প জলভাং নৈবাসনাং কামমত-শলিয্যতে”—তেমনই সর্বসমর্পণের পণ নিয়ে কী রাজ-নৈতিক সাধনায়, কী ব্যবসায়িক সাধনায়, কী সমাজ ও মানব সেবার সাধনায়, কী ধর্ম ও সংস্কৃতির সাধনায়, আত্মনিয়োগ করে গেছেন শ্রীমতিলাল রায়। আবার শ্রীবুদ্ধেরই মতো নিজ সাধনালব্ধ সমস্ত কিছুকে “বহুজন-

হিতায় বহুজন সুখায়” তিনি বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। যার ফলশ্রুতি প্রবর্তক যোগাশ্রম, প্রবর্তক লাইব্রেরী, প্রবর্তক নারীমন্দির ও উচ্চবিদ্যালয়, প্রবর্তক ম্যানুটি-পারপাস্ স্কুল, প্রবর্তক বেসিক স্কুল, প্রবর্তক পাঠশালা, প্রবর্তক মহিলা-সদন, Welfare Home ইত্যাদি সংস্থাগুলি। প্রবর্তকের অর্থপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যেমন বেকার সমস্জাকর্ষিত বাঙলা দেশের এক উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যার অন্নসংস্থান হয়, তেমনিই আবার এই সব ব্যবসায়িকক্ষেত্রের জ্ঞাত্য মুনাফা কোনো ব্যক্তির সাদা অথবা কালো টাকার অঙ্ক স্ফীত না করে প্রবর্তকের মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলিতেই নিয়োজিত হয়।

কী অব্যাহত ক্ষেত্রে, কী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এতগুলি সার্থক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি শ্রীমতিলালের অসাধারণ সৃষ্টি-প্রতিভারই পরিচয় দেয়। প্রবর্তক প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে এবং এঁদের আদর্শ ও তার বাস্তব রূপায়ণের বিশ্লেষণ করে তাই রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী, দেশবন্ধু, প্রফুল্লচন্দ্র, নেতাজী প্রভৃতি মনীষি ও চিন্তানায়করা শ্রীমতিলালের গঠনযন্ত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। সে সবার উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। শুধু ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের অল্পলেখার মাঝ থেকে সামান্য একটু উল্লেখ না করে পারলাম না :

“মতিবাবু খণ্ডে খণ্ডে অঞ্চলেরই পরিচয় মিলিয়ে পেয়েছেন বলে কি শিশুদের শিক্ষা, নারীদের জাগরণ, কি সমাজের সেবা, কি আর্থিক প্রতিষ্ঠান রচনা—নানামুখী প্রয়াসকে একটি পারমাণবিক লক্ষ্যের বশীভূত করে নির্ভয়ে দেখতে পেরেছেন। এ তপস্বী সহজ নয়।.....”

বাংলার বরেন্দ্র মনীষি, প্রবর্তকের সজ্জবদ্ধ শ্রীমতিলাল ছিলেন কর্ম ও ধর্ম, অর্থ ও পরমার্থ, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সেতুস্বরূপ। সেই মহাপুরুষের পুণ্য স্মরণ-সভায় আমি প্রবর্তক কর্মবৃক্ষের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে সাদর স্বাগত জানাই।*

* বিগত ২২শে জানুয়ারী ১৯৬৫, ভারত-সভা হলে শ্রীশ্রীসজ্জবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ৮০-তম জন্ম-স্মরণ-বার্ষিকী-স্মরণ সভায় পঠিত স্বাগত ভাষণ।

একখানি চিঠি

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি. ই., তত্ত্বভূষণ

[প্রবর্তক সম্পাদককে লিখিত পত্র। বহু গ্রন্থপ্রণেতা শ্রেয় লেখক শুধু চিন্তাশীল মনীষী পণ্ডিতই নহেন, নিরপেক্ষ অকুণ্ঠতাযী তত্ত্বদর্শীও বটে। বক্ষ্যমান পত্রে আলোচ্য সমস্তর উপর তিনি বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহা অমূল্যবোধযোগ্য। সম্পাদকের পত্রে যে অর্থনীতিক সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সম্পাদকের ব্যক্তিগত উপরিচর উক্তি মাত্র—প্রবর্তক পত্রিকার ভাবনা বা মত নহে। পত্রখানির প্রকাশে একটু বিলম্ব হইলেও, বর্তমানেও লেখকের দৃশ্যদর্শনের মূল্য সমানই বজায় আছে।—প্রঃ সঃ]

প্রিয় রাধারমণবাবু!

আপনার ১৮।৫।৬৪ ইং তারিখের পত্র পেয়েছি। আপনি লিখেছেন—“দেশের যে দুর্দিন এবং ভারতের জাতিগঠনের যে সমস্ত তাতে অর্থনীতিভিত্তিক সমাজ-তত্ত্ববাদ ছাড়া সামাজ্যের কোন উপায় পাওয়া শক্ত।”

এই সম্পর্কে একটি কথা ভেবে দেখতে অমরোষ করি। ১৯৬১ ইংর সেল্যাসমতে ভারতের লোকসংখ্যা ৪৪ কোটি। নবজাত শিশু থেকে মুমূর্ষু বৃদ্ধ পর্যন্ত এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। ধরুন, যদি ভারত সরকার প্রত্যেকটি প্রাণীকে নগদ ৫০ লাখ টাকা, ১০ বিঘা জমি এবং প্রত্যেক পরিবারের বাসোপযোগী একখানা গৃহ দান করেন, তা হলে কি দেশে সামঞ্জস্য ও শান্তি এসে যাবে? ধনসাম্যতা ও ভূমি-সাম্যতার দ্বারা মন-সাম্যতা সাধিত হবে কি?

যজ্ঞাগতি-পশ্চাদ্ধাবতি ইতি ধনং—যার পশ্চাদ্ধাবন করা হয় তার নাম ধন। ধন একটি মৃগতৃক্ষিকা, কোনদিনই ভূকা মিটায় না; যত পাই আরো চাই। উপরোক্ত বিধান মতে ১০ জনের পরিবার ৫ কোটি টাকা, ১০০ বিঘা জমি এবং একখানা গৃহসম্বিত বাড়ী পেলেও সন্তুষ্ট হবে না। তাদের প্রবৃত্তি হবে পার্শ্ববর্তী পরিবারকে কোন মতে বিপদে ফেলে তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিজেকে অধিকতর ধনী করা। তখন দেশে অশান্তি, চুরি ডাকাতি, অত্যাচার, অনৈতিকতার মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। আমাদের দেশে একটা কথা আছে—“পেয়ে পরের ধন—বাপে পুতে কীর্তন।” মন-সাম্যতা না হলে ধন-সাম্যতার কীর্তনের রোলের সৃষ্টি করে, এবং সেই রোলে সমাজ হয় ডুবুডুবু—মহাশয় যায় ভেসে।

আমাদের ভারতবর্ষের পূর্বাচার্যগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করে গেছেন,—তারা ধন ও ভূমি-সাম্যতার চেয়ে

মন-সাম্যতাকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। তাই মন-সাম্যতার দিগদর্শক “মুনি” কপর্দকহীন হয়েও ছিলেন রাজার নমস্—“মহারাজ্ঞ”। “ভিক্ষাং দেহি” বলে দ্বারে উপস্থিত তিথারীর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে এক বিরাট রাজ্যের সিংহাসনাধিকারী “নৃপতি বিহিসার নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল পদনখকণা তাঁর।”

জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু জীবনের চেয়ে অর্থের মূল্যায়ণ বেশী, মহাশয়ের চেয়ে অর্থই বেশী মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়—বর্তমান যুগের এই চিন্তাধারার বিরুদ্ধে আর্থধর্মিরা চিরকাল অভিযান চালিয়ে গিয়েছেন। চাকল্যের প্রতীক জগতে চাকল্যময় জীবগোষ্ঠীকে যে দিগদর্শক শক্তি জ্যোতিঃ বিকাশক বা স্বপ্রকাশক বৃত্তির দ্বারা আবরিত করে রেখেছেন—“দৈশাশান্তমিদং সর্বং যৎকিঞ্চি জগত্যাং জগৎ”, তিনি দয়া করে উচ্ছিন্নরূপে যা ত্যাগ করেছেন, সেই দানের দ্বারা নিজে নিজেকে ভোগ কর—“তেন ত্যক্তেন ভূজীথাঃ” (আত্মনেপদে নিজে নিজে ভোগ) অল্প কোন ধনের প্রতি লোলুপ হয়ো না—“মা গৃধঃ কস্তস্মিৎ ধনম্”। এইত পুত্র-বিস্তলোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃত যজ্ঞবিধির শাস্ত্র গুরুযজ্ঞবল্লভের অন্তিম নির্দেশ। আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেছে, আমাদের জাতি-সৌধের ভিত্তি শিথিল হয়ে গেছে। দেশের প্রত্যেকটি প্রাণীকে অর্থলোলুপতার তথা ধন-গুরুতার চৌপ গিলিয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা শাসন-মগনদে আরোহণ করেন। বিনা অর্থে একটি ভোটও আজকাল সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। এই ধন দানের সঙ্গে নিজে একই উপায়ে অর্থ লাভের প্রচেষ্টা বিজড়িত। এবং উভয় ব্যাপারই মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদিত।

রাজ্য-সভা, লোক-সভা, গণ-সভা, জন-সভা—প্রত্যেকটি সৌধের ভিত্তি ঐরূপ মিথ্যাভিনয় সিমেন্ট দ্বারা গ্রথিত, অর্থলোলুপতা ইষ্টকের উপর নির্মিত। এই দৃষ্টিতে দেশের আধুনিক সমাজ এক প্রকার “অর্থনীতিভিত্তিক সমাজ-তত্ত্ববাদ” হয়ে গেছে। ইহা আর্থ-ভূমির বৃক্কে নূতন বিধানে উৎপন্ন বৃক্কের মধুরসহীন, স্বদৃশ ও সুপুষ্ট ফল, সারা সমাজ এই ফলের প্রতি লোলুপ।

উপরোক্ত যজ্ঞবৃন্দের ঋষির দৃষ্টিতে ছিল—“সংস্কৃতি: প্রথমা বিশ্ববারা প্রথমো বরুণ: প্রথমো মিত্রা” (৭।১৪)—সারা বিশ্ব, সারা সমাজ, সারা গোষ্ঠীকে এক ভাবধারায় আবৃত করার প্রাথমিক প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি। কিন্তু আধুনিক ভারতে চিত্ত বিভ্রান্তিকর, উন্মাদক ও রাজসিক নৃত্য-গীত-নাট্যাভিনয়ই হয়েছে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির প্রথম লক্ষ্য ও একমাত্র আচরণ।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের বর্তমান প্রচেষ্টার প্রতিও লক্ষ্য করা উচিত। স্বাধীনতা লাভের পরই নেতৃবৃন্দের প্রধান লক্ষ্য ছিল উৎপাদক শ্রেষ্ঠ শিল্পের (Producer goods—Heavy Industry) প্রতি এবং এই রৌক এখনও চলছে। Consumer goods—Light Industry এখনও নিম্ন স্তরে। প্রথমটির কর্মিবৃন্দ নাগরিক, খাদ্য বিষয়ে পরের মুখাপেক্ষী, তারা খাদ্য উৎপাদক নয়, শুধু তক্ষক। দেশবিভাগের পর পাকিস্তান থেকে যারা ভারতে এসেছিল, তাদের প্রায় সবাইকে ভারত সরকার দোকান-পাট ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা নগর-প্রধান ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার জন্তে ঋণ দান ও ষ্টল নির্মাণ করে দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তরা গ্রাম ছেড়ে এসে রাতারাতি হয়ে গেছে নাগরিক, লাজল ছেড়ে এসে রাতারাতি সেজে গেছে পান-বিড়ি-লজ্জেল-কাটা-কাপড়ের দোকানদার। তাদেরই কিছু অংশ উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পে যোগদান করে নাগরিক হয়েছে। ধনাঢ্য উদ্বাস্তরা বাস-সার্ভিস, মালবাহী লরী, সিনেমা-হাউস আদি প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে নাগরিকই হয়েছে। পূর্ববঙ্গের একদল লোক জাতিগত ব্যবসায় তাঁত-কাপড় বোনা কুটির শিল্প আঁকড়ে ধরেছিল, কিন্তু তারাও নগরে

এসে ভিড় করেছে এবং মিলের কাপড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে নি। তাদেরও অনেকে ছোটখাটো দোকান দিয়ে নগরবাসী হয়ে গেছে। পূর্বের চাষী ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদক উদ্বাস্ত হঠাৎ নাগরিক হয়ে এবং সরকারের নস্ট ব্যবসায়ার্থ ঋণ পেয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে পূর্বের এক আনা মূল্যের লাউটি চার আনা মূল্যে কিনে এনে নগরের হাটে আট আনা মূল্যে বিক্রী করে সওদা করতে শিখেছে। পাকিস্তান হতে আগত এত বিশাল সংখ্যক লোকের অধিকাংশই যদি নগরবাসী হয়ে শুধু প্রাক্তন অধিবাসীদের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের ভক্ষক হয় তা হলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি ঠিক থাকে কি করে এবং সমাজতত্ত্ববাদই স্থাপিত হয় কি করে বুঝা শক্ত।

১৯৫০ সনের উদ্বাস্ত প্রবাহের সময় যারা পাকিস্তানে রয়ে গিয়েছিল, তাদের প্রায় সবাই খাদ্যদ্রব্য-উৎপাদক গোষ্ঠী। এখন তারাও উৎপীড়িত হয়ে আমাদের দেশে আসছে। আসামেও কয়েক লক্ষ এসে গেছে এবং আরও আসছে। তারা এদেশে এসে মাথা গুঁজবার একটু স্থান এবং খাদ্যোৎপাদনের জন্ত এক ষণ্ড ভূমি পেলে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার তাদের পুনর্বাসনের যে পরিকল্পনা করছেন বলে কাগজে পড়ে সংবাদ বেরচ্ছে তাতে দেখা যায়, তারা এই সব লোকদের জন্ত মাড়ে দশ কোটি টাকা খরচ করে কাছাড়ে চিনিকল, গোয়ালপাড়ায় পাট ও সূতা কল, মিকির পাহাড়ে কাগজ কল, গোঁড়াটিতে স্ফুপাত্র (ceramic) নির্মাণ কল স্থাপন ও চারদুয়ারের সূতার কলের প্রসারণ করবে স্থির করেছেন (অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩০, ৫, ৬৪, শিলচরের খবর)।

যারা পাকিস্তান থেকে আসছে, তারা যদি জাতি বা স্বভাবগতভাবে ঐসব শিল্পপারদর্শী হত, তা হলে অবশ্য বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু মূলতঃ তারা চাষী, মৎস্য-জীবী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক। পুনর্বাসনের সময় তাদের নাগরিক ও পরোৎপাদন ভক্ষক অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত করলে সমাজের কোন ব্যাপারেই সাম্যতা থাকা সম্ভবপর নয় বলিয়াই মনে হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন আসামে চা-বাগান প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছিল এবং বিলাতের লক্ষপতিরা দলে দলে এসে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে বিরাট চা বাগান প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন আসামের তৎকালীন কমিশনার জেনারেল জেন্‌কিন্স বিবেচনা করে দেখলেন যে, বিগত বহু বৎসরাধি অস্বাভাবিক ও ধর্মান্বেষণ হেতু আসামের প্রজারা উৎপীড়িত হওয়ায় চাষ-ভূমি সব অনাবাদী হয়ে পড়ে আছে। এখন যদি চা-করদের নগদ টাকার চাকচিক্য দেখে এসব লোক সেদিকে ছুটে যায়, তা হলে দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব চিরকাল থেকে যাবে; লোক অনাহারে মরবে; টাকায় পেট ভরাবে না। তাই তিনি চা-করদের উপর কড়া হুকুম জারি করেছিলেন—তারা নিজেদের বাগানের কাজের জন্য আসামের বাহির থেকে শ্রমিক জোগাড় করবে এবং ঐ শ্রমিকদের আহার্য নিজেরা বাগানের বন্দোবস্তী জমিতে ফসল উৎপাদন করবে। তারা করলে জমির বন্দোবস্তী সর্ব বাতিল করে দেওয়া হবে। চা-কররা তাই করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য তার ফলে আসামে এক নূতন মানব-গোষ্ঠী শ্রেণীর সমাবেশ হয়েছে; এবং এখন আবার চা-বাগানগুলিতে ঋণশস্ত্র উৎপাদনের রেওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক রাশিয়ার আদর্শ-অনুকরণশ্রিয়। রাশিয়ায় স্টেলিনের দিন পর্যন্ত Producer goods—Heavy Industries-র প্রতি লক্ষ্য ছিল বেশী; কিন্তু ক্রুশ্চেভের দিন হতে অনাবাদী ভূমি (Virgin lands) আবাদ করে শস্তোৎপাদনের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সন পর্যন্ত সাড়ে সাত কোটি একর অনাবাদী ভূমিকে শস্তোৎপাদনক্ষম করা হয়েছে। এই ব্যাপারে জোর করে প্রাচ্য বাধ্যবাধকতামূলকভাবে কর্ম নিযুক্ত করা হয়েছিল; যারা চাষী ছিল না, তাদেরও চাষবৃত্তি অবলম্বন করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। আর আমাদের দেশে চাষী এলে তাকে অচাষা সাজাবার জন্য আমরা তৎপর হয়ে পড়ি। আর খাতের জন্য আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকি। ক্রুশ্চেভের

ধ্বনি—অধিক শস্ত, অধিক মাংস, অধিক ডিম্ব, অধিক মৎস্যই জাতির লক্ষ্য—আমাদের কাণে পৌঁছায়নি, পৌঁছালেও তাঁর আদর্শে আমরা কাজ করছি না। দেশের ও সমাজের বর্তমান সর্ববিধ বিশৃঙ্খলার মূলে রয়েছে পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য প্রবাদ—“ফুরাইল গাইটের চাউল বরে লাগাইল আউল ঝাউল।”—উৎপাদন ব্যবস্থার অভাব হেতু খাদ্য ও নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের অভাব। তার ফলে উদ্ভূত হয়েছে নৈতিক জ্ঞানহীনতা পরাশ্রয়পূর্ণ-মনোবৃত্তি, বিনাশ্রমে যেনতেন প্রকারে অর্থলাভ। তার সঙ্গে আধুনিক যুগের নৈতিকতা ধ্বংসকারী ও অর্থব্যয়ী বিলাসিতার মাজা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সকলেই সমস্তের চীৎকার করছেন—পেটের ভাত পিঠের কাপড় যোগান দায় হয়ে উঠেছে, কিন্তু প্রত্যহ দুপুর ও বিকেলে সিনেমার ঘারে ভিড় করে টিকিটের জন্য যারামারি করে যারা, তাদের শতকরা ৯০ জনই ঐ ‘নাই-অন—নাই-বজ্র’ শ্রেণীর লোক। পঞ্চাশ টাকা মূল্যের “টেরেলিন” শার্ট কোন্ শ্রেণীর যুবকরা বেশী পরিধান করে—স্বল্পদৃষ্টি নিয়ে হিসেব করলে চক্ষু স্থবির হয়ে যায়। এরূপ মনোবৃত্তি সৃষ্টির মূলে কে? শত্রুকবলিত দেশের অর্থান্ধাঘস্ত দেশোন্নতিমূলক পরিকল্পনার জন্য বিদেশে কর্মপ্রার্থী রাজকীয় কর্ণধারগণ যদি স্বীয় স্বত্বস্ববিধার জন্য চলমান পুরাতন যান পরিবর্তন করিয়া ৭০৮০ হাজার টাকা দামের নূতন সখের গাড়ী ক্রয় ও গৃহসজ্জার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে কুষ্ঠিত হন না, তা হলে সাধারণ লোকের আদর্শ কোথায়? যারা অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য ও সমাজ-সাম্যতার চীৎকার করছেন, তারাই ত অসামঞ্জস্য ও অসাম্যতার জলন্ত উদাহরণ! যে শস্তে ভূত থাকে, সেই শস্যের ভূত তাড়ানোর শক্তি থাকে না—এই প্রবাদটি গ্রাম্য নিরক্ষর চাষা-ভূষাও জানে।

মোট কথা, আর্য ভারতের সংস্কৃতিভিত্তিক সমাজ মন গঠিত না হলে, দেশের ও জাতির কোনও প্রকার উন্নতির আশা আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা এখন স্থির করে জেনে নিয়েছি—অর্থাৎ আমাদের তাই শিক্ষা হয়েছে যে, প্রাচীন ভারত বলে কিছু ছিল না, এই দেশে যারা মুনি-ঋষি বলে খ্যাত ছিলেন, তারা

পুতুল সুনীল চৌধুরী

চৈত্র মাসের রাস।

টালিগঞ্জের রাসের মেলা বসেছে অরণ্যভীতকাল ধরে। কে কবে যে এ মেলার পত্তন করেছিল তা জানতে হলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। নতুন লোক প্রশ্ন করে, কবে এ মেলার হয়েছিল উদ্বোধন। উত্তর আসে, আমার ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি, তাঁর ঠাকুর্দাও নাকি তত্ত্ব ঠাকুর্দার কাছে শুনেছে টালিগঞ্জের রাসের মেলা। এক কথায়, প্রাচীন এই মেলা।

এ মেলার জন্ম থেকে আজ অন্ধ নারায়ণ বৈরাগীর বংশপরম্পরায় যোগ দিচ্ছে। নারায়ণ শুনেছে ওর ঠাকুর্দার কাছে, তার ঠাকুর্দাও নাকি পুতল বেচত টালিগঞ্জের রাসের মেলায়। জাত-ব্যবসা ওদের। আগে ছিল নাকি একচটিয়া, তারপর অনেকে ভাগ বসিয়েছে—প্রতি-যোগিতা হ'য়েছে। হেরেছে সবাই। হারেনি,—হার-মানেনি কেবল নারায়ণ বৈরাগীর বাপ-ঠাকুর্দা। তবেই না আজও সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে একই বটগাছের নিচে আসর জমাতে পারছে।

কালের হাওয়া বদল হয়েছে। পালটাচ্ছে অনেক কিছু। প্রথম প্রথম বাপের সঙ্গে আসত মেলায়। দেখত বাপের হাতে গড়া পোড়া মাটির লালুচে পুতুলগুলোর কদর। পাকা কাঁঠালে মাছি পড়ার মত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হামলে পড়ত পুতুল কেনার জন্ত। নৌকো থেকে মাল নামাবার আগেই দৌড়াদৌড়ি—কাড়াকাড়ি। বাবা

ছিলেন গাঁজার কব্বিতে দম দেওয়া অথবা সোমরস নামক কলস-ভর্তি মদ পান করা স্বপ্নবিলাসী “বুড়বকে”র দল। তাঁরা বিজ্ঞানের কিছুই জানতেন না, আর জ্ঞান ছিল সভ্যতার শৈশব স্তরের চাষার জ্ঞান। সুতরাং এখন বিদেশীর আদর্শের অন্ধ অনুকরণ করে ভারতকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে গড়তে হবে। “বিস্ত হতে চিন্ত বড়—এই ভারতের পুণ্যবাণী”—নিতান্ত অবাস্তব আহ্বানকের উক্তি বলে—বইয়ের পাতা থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে। এক্লপ বদ্ভাবধারা যতদিন ভারতের চিন্ত হতে বিদূরিত না হবে, ততদিন যতই পরিকল্পনা করুন না কেন,—

হেসে বলত, বাবুশাষরা একটুন সবুর কর। ষ্টগাছের নিচে মালটুকুন অগ্রে তুলি তারপর নেবেখন যত খুসী।

আটদিনের রাস, আর দু'দিনের ভাদ্যারাস। নারায়ণ কিন্তু ঐ আটদিনের ভরা রাসের মেলার পরই চলে যেত। ভাদ্য হাটে থাকত না। কারণ ঐ আটদিনেই এক নৌকাভিত্ত মাল বিক্রী হয়ে যেত। অল্প দোকানীরা যখন ভাদ্য হাটে গলা ফাটিয়ে চিংকার করে নিজেদের মালের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে প্রাণান্ত হত, তখন নারায়ণ আর ওর বাপ গ্রামের ঘরে বিশ্রাম নিত।

সত্যি হাওয়া বদলেছে যুগের।

গতবছর কার্তিক মাসের বড় রাসের মেলাও স্বীকার করতে চায়নি নারায়ণ। স্বীকার করেনি ধীরেনের যুক্তি। সেবার বাজার মন্দ, কেনাবেচা নেই একদম। পুকুর পাড়ের বড় বটগাছের ছায়ায় বসে লোক গুণছিল নারায়ণ। ধীরেন বিড়ি টানতে টানতে বলেছিল—দিনকাল পালটে গেল যেগো নারায়ণকা। মাহুগুস্তোর ট্যাকে কি একটা নয়া পয়সাও নেই? তিন দিন হয়ে গেল অথচ এক বস্তা মালও কাটলো না। তাম্বব ব্যাপার!

নারায়ণ তাকাল ধীরেনের মুখে। বলল—হবে রে ধীর হবে। আটদিনের মোটে তো তিনদিন আজ, বাকী পাঁচটা দিনে মাল সবই বিক্রি হবে। বাবুরা অল্প মালপত্র কেনা-কাটা করছে। শেষ কিনবে পুতুল। তখন দেখিস দিয়ে কুল পাবি না।

ধীরের ভারত উন্নতির পথে না এগিয়ে অধঃপতনের গভীরতম প্রদেশের দিকে ধাওয়া করবে,—কেউ রোধ করতে পারবে না।

তবে আমরা প্রাচীনপন্থীরা আশাবাদী,—দেখছি এখনও স্থানে স্থানে অশ্রু ভয়ে ভীত “সৌদন্তি” দেবতাস্বারা ভারতের মঙ্গলার্থ নিজ ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে চেঁচা করছেন, এবং তাঁদের করুণাঙ্কনে “পরিভ্রাণায় সাধুগাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্” পরমকারুণিক একদিন সমুদ্রত হবেন। তাঁর আগমনের পথ সুগম করবার জন্তে আপনারা অক্লান্ত প্রচারণা চালালে কাজ হবে।

হাসিল ধীরেন। বলল, তোমার আশা বলিহারী। তিনদিনে আধবস্ত্র মাল কাটল না, আর বাকী পাঁচদিনে এই এত মাল কাটতি হবে?

—হবেই।

—হবে না। লোকে এখন আর পোড়া মাটির খেলনা পুতুল কিনতে চায়না গো। পেলাসটিক পুতুল এখন বাবুদের চোখে ধরেছে।

—ধরুক। গম্ভীর জবাব দেয় নারায়ণ।

ধীরেন খানিক চুপ করে ওর একরোখা নারায়ণের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—সামনের বছর শালার পেলাসটিক পুতুল বেচব। মাটিতে আর পয়সা নেই।

—হেই ধীর! ধমকে উঠলো নারায়ণ। অমন অলঙ্ঘ্যে কথা বলিসনি রে। মাটি আমাদের মা, আর সেই মাটির বদনাম করছিস। আমার তোর বাপ পিতেমো এই মাটি দিয়েই না আমাদের পেট চালান, বড় করল। অমন কথা ক'সনি ধীর, পাপ হবে। নারায়ণের শেষ কথা কটা করুণ শোনাল।

এবারের মেলায় এসে বুর্তে পারছে, ধীর অজ্ঞান বলে গতি বছর। সত্যি যুগ পালটাচ্ছে। কিন্তু নারায়ণ কি করতে পারে এই হাওয়া বদলের বিরুদ্ধে।

—পুতুল ক' পয়সা করে?

এক শিশু ক্রোতার ডাকে চমক ভাঙল নারায়ণের। কি নেবে খোকাবাবু?

—এই পুতলটা। কত দাম?

—এক আনা।

—ও বাব্বা, এক আনা! এই মাটির পুতুল এক আনা দাম!

শিশু ক্রোতা চলে গেল। নারায়ণ দেখল ছেলেরা ধীরেনের দোকানের দিকে যাচ্ছে। খানিক বাদে একটা প্লাষ্টিকের পুতুল নিয়ে হাসি মুখে গেল ঘরের দিকে।

যুগের হাওয়া পালটাল সত্যি সত্যি।

নারায়ণ ভাবছে। কত কি ভাবছে। কিন্তু ভাবনাগুলো খাপছাড়া। খাপছাড়া ভাবনাগুলোর মাঝে রাখার মুখ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। রাখা নারায়ণের একমাত্র কন্যা। এবার মেলায় আসার আগে রাখা বলে দিয়েছে ছাপা

শাড়ী আনতে। প্রতি বছরই একটা না একটা আবদার করে। নারায়ণ হাসিমুখে তামিল করে মেয়ের দাবী। ঐ তো একটা মাত্র মেয়ে, তার আবদার না রাখতে পারলে চলবে কেন?

কিন্তু এবারের বাজার দেখে তো চক্ষু কপালে ওঠার অবস্থা। খন্দের নেই বললে মিথ্যে বলা হয়। খন্দের আছে। তবে ওর মাটির পুতুল কেনার নয়, সৌখিন জিনিষ কেনার। সে দিক দিয়ে ধীরেনের বোল বোলাও। মালম্মী যেন ওকে ছপ্পর ফেঁড়ে দিচ্ছে। দিক, হিংসে করে না নারায়ণ। তবে নিজেরও তো কিছু চাই, তাই এই ভাবনা। না হয় পথ খরচ উঠে গিয়ে মেয়ের একটা ছাপা শাড়ীর দাম উঠলেও তো হয়।

মেলার মেলায় শেষ হতে চলেছে। টাল দিয়ে পোড়া মাটির পুতুল আর খেলনার সেট বস্তাবন্দী হয়ে পড়ে আছে। নৌকার ভাড়াও ওঠেনি। গ্যাটের পয়সা খরচ করে রাহা খরচ চালাতে হচ্ছে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত মেলা কমিটির পাওনা ট্যাক্সের তাড়া। ব্যাট্রা করার জন্তও মোটা চাঁদা হাসিমুখে দিয়ে এসেছে নারায়ণ আর এখন ট্যাক্সের সামান্য কটা পয়সা দিতে জর আসছে গায়ে। জর আসবেই তো,—গ্যাটের পয়সা গেলে কার না অমন হয়।

চৈত্রের ঘুর্ণি হাওয়ায় পথের মাঠের ধুলিরাশি উড়ছে। মাঠগুলো কেমন যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই। আকাশে সূর্যের রোহদৃষ্টি। খাল-বিল-পুকুর ডোবাগুলো শুকনো, কাঠ কাটা রোদে স্ফুট কাটা। রিক্তা প্রকৃতি শূন্য দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে যেন।

নারায়ণ যেন দৃষ্টি শূন্য—চিন্তাশূন্য হয়ে তাকিয়ে আছে মাঠের শেষ প্রান্তে তেপান্তরের মাঠের দিকে, যেখানে আগুনঝরা আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে মিতালী পাতাবার ছলে ঝুঁকে পড়েছে।

যুগ যে এতটা পালটেছে ভাবতে পারছে না। ওর চোদ পুরুষের ব্যবসার আজ কোন কদর নেই। অথচ ও নিজ চোখে দেখেছে, মেলায় মাল নামাবার আগেই খোন্দেরদের মধ্যে পড়ে যেত কাড়াকাড়ি। বৈরাগীদের গড়া পুতুলের কদরই আলাদা। মাটির খেলনার

সেটগুলো সত্যকারের বাসন কোসন থেকে কোন অংশে কম ছিল? সহরের মানুষগুলো সত্যি যন্ত্র হয়ে গেছে। শিল্পের মর্যাদা দিতে ভুলে গেছে। না হলে একটা বস্তা মালও এবার বিকোয় নি। অথচ ধীরেনের প্লাসটিকের খেলনা আর পুতুল পড়ে থাকেনি। লুট হয়ে গেছে বলতে গেলো। এবার মোটা পরমা কামিয়েছে ধীরেন।

সহরের মানুষ যন্ত্র হলেও গ্রামের মানুষ এখনো মানুষই আছে। তারা শিল্পীর কদর করতে জানে। কিন্তু পারে না পরসার অভাবে। তবু যা তারা দেয় তার মূল্যও কম নয়।

ওলাইচণ্ডীর মেলার দিন তো এসে গেল। চৈত্রের একটা দিন কেটে গেলেই বৈশাখের প্রথম দিন বসবে মেলা। চলবে সপ্তাধীনেক। ওসমানের গজ্জ গরীব মানুষের হলেও কুপণতা নেই সেখানে। টালিগঞ্জের মেলার খেদ এখানে মিটেবে। মিটেবে রাধার আবদার।

এবারের মেলায় ঐ একটা মস্তবড় ব্যতিক্রম হয়ে গেছে। প্রতি বছরই মেয়ের জন্ত, জীর জন্ত নোতুন কিছু না কিছু একটা নিয়ে এসেছে। কিন্তু এবার শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে। রাধার শুকনো মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি নারায়ণ। ছাপাশাড়ী কিনে দিতে পারেনি রাধাকে।

* * *

—নারায়ণকা, তোমার মাটির পুতুল আর খেলনা এবার ছাড়। বাজারে অচল হয়ে গেছে.....

ধীরেনের কথা শেষ হবার আগেই বিজ্রপের তরঙ্গীতে বলে ওঠে নারায়ণ, তোমার পেলাস্টিকের ব্যবসা করব। ওটা বড় সচল, না?

—এবারের মেলায় তো টের পেয়েছ। নৌকো ভাড়াও ওঠেনি।

—না উঠুক। ওখানে চলেনি, আর এক জায়গায় চলবে। খানিক চুপ করে থেকে বলে, বাপ পিতেমোর ব্যবসা, এক কথায় ছেড়ে দোব। ব্যবসায় মন্দা আক্রা তো আছেই, তা বলে একটা শিরকে নষ্ট করব ধীর।

—উপায় কি কাকা! দিন বদলেছে, আমাদেরও বাচার তাগিদে ব্যবসা বদলাতে হবে।

—আমার যে মন চায় না ধীর।

—চাইতে হবে। সংসারের দিকে চেয়ে করতে হবে। আগে পেট তারপর তোমার জাত-ব্যবসা, আমার নিজেরও কি কম কষ্ট হচ্ছে কাকা? এখনও ছাঁচগুলো সময় পেলেই নেড়ে চেড়ে দেখি। চোখ কেটে

জল আসে, কিন্তু চোখের জলে তো আর পেট ভরবে না।

ধীরেনের সঙ্গে আর তর্ক করে না নারায়ণ। ভাল লাগে না তর্ক করতে। তবু বলে—জাত-ব্যবসা ছাড়া আমার ঘারা সম্ভব নয়। দেখি না কত দূর কি হয়। ও হাতে হয়নি, এ হাতে হবে—নিশ্চয়ই হবে।

ধীরেন হার মানল। বুঝল, ওই প্রাচীন-মনের মানুষটাকে বোঝানো তার কর্ম নয়।

চৈত্র সংক্রান্তি। ধূসর প্রকৃতি আরো ধূসর। আকাশে মেঘের কোন চিহ্ন নেই। আগুন ছড়াচ্ছে সারা বিশ্বে। নারায়ণ পোড়ামাটির পুতুলগুলোয় শেষ রং দিচ্ছে। বুঝিবা শেষ সাজে সাজাচ্ছে। এরপর ওগুলো গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে বেরবে ওসমানের গজ্জ ওলাইচণ্ডীর মেলায়।

এ ক’দিন মনে মনে অনেক ছবি এঁকেছে নারায়ণ বৈরাগী। এক হাটের ব্যর্থতা আর এক হাটে পুষ্টিয়ে নেওয়ার আশায় রঙিন ছবিগুলোয় দাগা বোলানো। জীর জজ্জ বেগমপুরের আশি স্তার কাপড় আর রাধার ছাপাশাড়ীর কল্লনা কাছের মত সারা মন জুড়ে ফুলে উঠেছে। যুগ পালটালেও মানুষ সব সময় পালটায় না। কদর করার মানুষ কদর করে, করবে চিরকাল।

গরুর গাড়ীতে ঝড় বিছিয়ে দিয়ে সাবধানে তুলছে পুতুল আর খেলনার বস্তাগুলো। ওগুলো সবই ফিরেছে টালিগঞ্জের রাসের মেলা থেকে। সহরের মানুষ নেয়নি পোড়া মাটির পুতুল আর খেলনা। ওগুলো নাকি অচল। শিশুরাও বুঝতে শিখেছে। ওর মেটে খেলনা দেখে নাকি নাক সিঁটকায় ছেলে-মেয়েরা, তাই ধীরেনের প্লাস্টিক পুতল খেলনা মেলায় পড়তে পায়নি। তিনদিনেই সমস্ত মাল বিক্রী করে ট্যাক ভারী করে গ্রামে ফিরেছে। যেমন ফিরত নারায়ণ। ফিরত ওর বাপ-পিতামহ।

গরুর গাড়ীতে মাল তুলে দিয়ে হাসল মুহূ নারায়ণ। ওসমান গজ্জের ওলাইচণ্ডীর মেলায় ঐ ঝুঁকো প্লাস্টিক পুতুল কেমন দাঁড়ায় দেখবে ওর সব্ব তৈরী পোড়ামাটির পুতুলের কাছে।

মেটে পথে গরুর গাড়ীর জীর্ণ চাকা কক্ষণ শব্দে ককিয়ে উঠে চলতে শুরু করেছে। বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এলো রাধা। গাড়ী থামল। নারায়ণ হাসিমুখে তাকাল মেয়ের দিকে।—কিছু বলবি।

—আমার একটা পেলাস্টিক পুতুল এনো বাবা মেলা থেকে।

সজ্জগুরুর তিরানিতম জন্ম-জয়ন্তীতে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ঘটে চন্দননগরে বিরাট
প্রাণের আবির্ভাব !
হয়েছে পরম পুণ্যের ফলে
স্বজাতির মহালাভ !
বহু সাধকের সাথে হলো ধীর
সংগ্রব বহুবার,
সাধু সন্তের পুণ্য প্রভাবে
প্রজ্ঞা বাড়িল তাঁর ।
তখনো আত্মস্বাতন্ত্র্য তাঁর
হারানো যায়নি তাতে ;
গুণ প্রোক্ষণ হয়েছিল জীবন
চিন্তের মহিমাতে ।
তিনি ছাড়া আর তুলনা তাঁহার
দ্বিতীয় ছিল না কেউ ;
ভাসিয়ে নেননি তাঁহারে প্রবল
বাধা-বিঘ্নের ঢেউ ।
ভোগের জীবন অরু হলো যবে,
বিসৃষ্টা এলো ভোগে ;
মহাবিপ্লবী মন্ত হলেন
কঠোর কর্মযোগে ।
ধর্মের সাথে কর্মের তিনি
ঘটানু সমন্বয় ;
চির-আশাবাদী, অন্তরে তাঁর
ছিল না মৃত্যুভয় ।
মুক্তি-মোক্ষ চান নি নিজের,
মানবদরদী প্রাণ
সকলের মাঝে বিলায়ে দিলেন,
নাহি চান প্রতিদান ।
নিত্যযুক্ত জীবন তাঁহার
স্বাবলম্বনপ্রিয় ;
আর্য্যহিন্দুসংস্কৃতির
রক্ষক বরণীয় ।
প্রত্যাসন্ন যুগের দিশারী
ভাঙন করিতে রোধ
সারা বাঙলায় ভ্রমিলেন একা
জাগাতে আত্মবোধ ।
সজ্জবদ্ধ হয়েছিল সকলে
প্রাণের আকর্ষণে ;

হোলো অষ্টদশ সজ্জ গঠন
যুগের সন্ধিক্ষণে ।
অগ্নিযুগের যুবারা সবাই
তাঁর মনোবল পেয়ে
মুক্তির তরে সারাটা ভারতে
ছড়িয়ে পড়িল যেরে !
ধর্মের কর্মে নবজীবনের
করিতে উদ্বোধন
এক মতিলাল অসংখ্য কাজে
ঢেলে দিল প্রাণ মন ।
স্বাধীনতা এলো, দুঃখ রহিল,
ক্রমশঃ যায় তা বেড়ে ;
যাহার এখন বড় প্রয়োজন,
অসময়ে যান ছেড়ে ।
অসম্পূর্ণ কার্য্য অনেক,
কে আজি করিবে শেষ ?
প্রেরণা দানিতে কে আজি মাতাবে
তুলিবে সারাটা দেশ ?
যুগের দিশারী কোথা সেই ঋষি
সজ্জ-প্রবর্তক ?
কোথায় প্রজ্ঞানয়নে আশ্রয়
জলিতেছে ধ্বংস ?
সমাজ স্বজাতি স্বদেশের হিতে
কোথা কাদে কার প্রাণ ?
কে আছে দ্বিতীয় হাতে লয়ে প্রাণ
হবে পুনঃ আশ্রয়ান ?
একটা জীবনে একাধারে তুমি
বিমুক্ত সংসারী !
রূপলোভী কবি, তুমি সুলেখক,
তুমিই ব্রহ্মচারী !
ব্রৈদান্তিক, ব্রহ্মবাদী হে,
বক্তা, ধর্মবীর,
সতীতে পেয়েছ বিপুল শক্তি
বিশ্ববিধাত্মর ।
অরবিন্দের দিব্যচক্ষে
ভাই দেবী রাধারানী
ভাঙিল সহস্রা মহামায়া রূপে,
কয় জনে তাহা জানি !

তুমি সদাশিব, সঙ্গুরু তুমি,
ধ্যানী ঋষি মহামুনি !
তব প্রজ্ঞার সমিধে হেথায়
সতত অলিবে মূমী !
জাতীয় জীবনে দুর্বল নীতি
আনিবে কি দুর্গতি ?
আইনের সমদৃষ্টিতে পেলো
প্রশ্নের দুর্গতি !
উচ্ছ্বাস যুবা যুবতীর
ব্যক্তিচারী-পরিণয়
বর্ণে চর্ম্মে কর্ম্মে ধর্ম্মে
আর দোষণীয় নয় !
চলচ্চিত্রে ভেসে চলে যায়
তরুণ তরুণী এবে !
চিন্তাশীলেরা বিনীত রাতি
মারিতেছে গুণু ভেবে !
বয়স্ক বধে ফাঁস নির্ধাত,
জগৎ বধে সাজা নাই !
হিন্দুর বেলা একটি বিবাহ,
অস্বনিরোধ চাই !
ভারতে হিন্দু যেন নাহি বাড়ে,
বাড়ুক অস্ত্র জাতি,
একটিও যেন হিন্দু না থাকে
জাতির জ্বালাতে বাতি !
সারাটা ভারত জুড়িয়া হউক
বিরাট পাকিস্তান ।
ফ্যাসানের এক নেশানু গড়িতে
চলিয়াছে অভিযান !
রাষ্ট্রদ্রোহী জাতিদ্রোহী
শত্রুতা সারা দেশে !
সব সমস্তা বিদূরিতে কেবা
দাঁড়াবে বীরের বেশে ?
যরে ও বাহিরে এ-জাতি এখন
পদে পদে নাহেহাল !
ধর্ম্মবীরের শূন্য আসনে
বসো এসে, মতিলাল !

নূতন তীর্থে পরিণত হোলো
তোমার প্রতিষ্ঠান !
ঘোষিবে গর্বে ইতিহাস তব,
শাশ্বত সম্মান !
তব অবদান নাহি হবে স্নান
সুদূর ভবিষ্যতে !
শ্রদ্ধার সাথে নরনারী হেথা
এসে যাবে শতে শতে ।
চিরজীবী তুমি, জয় হোক তব,
প্রেরণা জোগাতে থাকো ।
রহি' অলঙ্ঘ্য পুণ্যের পথে
সবারে সত্যত ডাকো !

বলিষ্ঠ এক নূতন জাতির
হোক অত্যাধার !
তোমার পছা অহুসরি' তারা
রাখুক জাতির মান !
তোমার স্বরূপ বোঝাবার মতো
ভাষা কোথা পাবো আর !
আকাশের মতো বিশাল তুমি হে,
তোমারে নমস্কার !
ধরণীর মতো বুকে ঠাই দিলে
সবারে চমৎকার !
হিমালয় সম ধ্যানগন্তায়,
তোমারে নমস্কার !

বর্ণার মতো ভাষণে সত্যত
করিয়াছ হ' নিয়্যার !
গঙ্গার মতো পবিত্রকারী,
তোমারে নমস্কার !
অন্তরে তুমি বজ্রনিদারী
বীর্যের অবতার !
মানবের মাঝে হে অতিমানব,
তোমারে নমস্কার !! *

* ২২শে জানুয়ারী ১৯৬৫, ভারতসভা
হলে সজ্জগুরুজীর ৮৩তম জন্ম-স্মরণবার্ষিকী
সভার পটিত।

সজ্জগুরু শ্রীশ্রীমতিলাল

শ্রীশাস্ত্রশীল দাশ

প্রতিদিন কত লোক আসে এই পৃথিবীতে :
আসে আর তারা চলে যায় ।
এমন করেই কত এসেছে, আসছে, আসবেও ।
তাদের আসার পথে কিছু হাসি, কিছু বাঁ উল্লাস ;
তারপর চলে-যাওয়া পথে শুধু ছুই চারি বিন্দু অশ্রুজল :
সব শেষ এইখানে তার ।

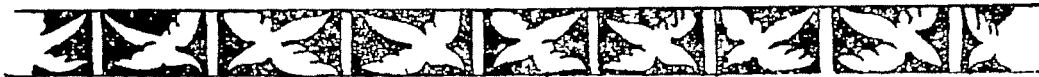
এই অতি সাধারণ যাওয়া আর আসা, তার মাঝে
হু'চারিজন আসে—আসা নয়, সে যে আবির্ভাব ।
হয়তো তখন কেউ চেনেনাক', যোগ্য সমাদর
পায়নাক' । ধীরে ধীরে বিকশিত হয় তার রূপ ।
পত্র পুষ্প ফল ছায়া মহীকুহ অজস্র যেমন
দেয়, সেও দিয়ে যায়, ধ্বংস হয় পেয়ে কত জন ।

আর তার চলে যাওয়া পথে পথে কত জয়ধ্বনি !
দেহ তার পঞ্চভূতে মিশে যায়, এইটুকু শুধু :
সে থাকে সৌরভ হয়ে চিরদিন শ্রদ্ধার আসনে,
সে থাকে স্মৃতির মাঝে দীপ্যমান এধারে ওধারে ।

ভূমিও এমনি এক মহীকুহ, রেখে গেছ দান
অজস্র ; সে দানে হ'ল কত শত সমৃদ্ধ হৃদয় :
একটি সবিভা তার কিরণের সহস্র ধারায়
আলোকিত বহু ভূমি, তাপগুহ অঅংখ্য জীবন ।

তুমি তো যাওনি চলে, তুমি আছ কত না হৃদয়ে ;
শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়ে সেখানেতে নিত্য পূজা চলে ।
সে-পূজার আড়ম্বর নেই কোনো, অন্তরে অরণ
ভক্তিনন্দন কীর্নতার, আর শ্রদ্ধানত কৃতজ্ঞতা ।

অনেক অঞ্জলি সাথে আমার প্রণাম অর্ঘ্যখানি
দিয়ে ধ্বংস হুই, আর নিয়ে যাই শাশ্বত সঞ্চয় ।



ভাষাতত্ত্বের গোড়ার কথা

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম্. এ., পি. আর. এস্.

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ফিলিপ সাসেটি (Philippo Sassetti) নামে একজন ইটালি দেশীয় ব্যবসায়ী ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত গোয়া জেলায় আগমন করতঃ ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। এই ভ্রমলোকটি শিক্ষিত, তীক্ষ্ণবী ও অল্পসন্ধিংসু ছিলেন। কিছুকাল গোয়া অঞ্চলে বাস করিবার পর তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহার নিজের দেশের বহু শব্দের সঙ্গে গোয়া-অঞ্চলে প্রচলিত শব্দের প্রভূত সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভ্রমলোকটির কৌতূহল জন্মিল এবং তিনি এই বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়া পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। (১)

ইহার প্রায় ২৫০ বৎসর পরে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হুগ (Hug) ও গোবেট (Gobet) নামে দুইজন ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারক তিস্তে গমন করেন। তথায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়া পরিভ্রমণ করিবার কালে তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে, তিস্তে প্রচলিত বহু শব্দ তাঁহাদের মাতৃভাষার শব্দের অনেকটা অনুরূপ। এই দুইজন ভ্রমলোকও উল্লিখিত বিষয়ে প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়া বিশ্বের বিদ্বন্মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ফিলিপের লেখা দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে কিছুটা কৌতূহলী হইয়াছিলেন; এখন ধর্মপ্রচারক দুইজনের লেখা দেখিয়া তাঁহাদের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল। এই সময় হইতে বিশিষ্ট শিক্ষাজ্ঞতীরা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ইহার সহিত পারসিক, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, জার্মান, ফরাসী, স্পেনীয় প্রভৃতি ভাষায় প্রচলিত বহু শব্দের অপূর্ণ সাদৃশ্য দেখিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিরা স্থির করিলেন যে, উল্লিখিত প্রত্যেকটি ভাষা একই আকর-ভাষা হইতে উদ্ভূত। অতঃপর তাঁহারা এই আকর-ভাষার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন এবং খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সকল বিচক্ষণ মনীষী এই বিষয়ে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে,

অপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা হইতেই উল্লিখিত অসংখ্য ভাষাগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত যে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা ইহা নিঃসন্দেহ। এই বিষয়ে একজন বাঙ্গালী কবি গাহিয়াছেন—

“অন্ত জাতি যবে পরিত দিগ্বসন।

ভারতে ঋগ্বেদপাঠ হইত তখন।”

অর্থাৎ, যে সময়ে পৃথিবীর অসংখ্য দেশের লোকেরা কাপড় পরিতেও শিখে নাই, সেই অদূর অতীতে ভারতীয় আর্যগণ ঋগ্বেদ প্রণয়ন করতঃ উহা পাঠ করিতেন (২)। বাস্তবিক ঋগ্বেদ প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃত ভাষাময় গ্রন্থই যে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ, ইহা নিঃসন্দেহ।

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাই যে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন আর্যভাষার জননী, কিছুদিন পর্য্যন্ত এই মতটি প্রায় সকল দেশের মনীষীরাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে কোন কোন ইউরোপীয় মনীষী উল্লিখিত মতের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষ ইংরেজদের শাসনাধীনে ছিল; সম্ভবতঃ এই কারণে ইংরেজ ও অসংখ্য ইউরোপীয় জাতিরা ভারতবর্ষের কোন ভাষাকে তাঁহাদের নিজস্ব মাতৃভাষার জননী বা মাতামহী বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মান বোধ করিয়াছিলেন। ইউরোপের কোন ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার জননী বলিয়া প্রমাণ করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না; অথচ সংস্কৃতকেও ইউরোপীয় ভাষাগুলির জননী বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহারা নারাজ। এইরূপ অবস্থায় কয়েকজন বিচক্ষণ ইউরোপীয় মনীষী কল্পনা করিলেন যে, সংস্কৃত এবং পারসিক সহ অসংখ্য ইউরোপীয় আর্য-ভাষাগুলি সকলেই অল্প এক অধুনালুপ্ত ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

এইরূপ বলিতে গেলে উল্লিখিত অধুনালুপ্ত ভাষাটি

(২) বর্তমান লেখকের মতে অধর্ক বৈদ প্রাচীনতম। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের রচিত ‘শব্দতত্ত্ব’ গ্রন্থ প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, মিনবিহারী প্লাস্ট্রী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২; মূল্য—১৫।

কি, কোথায় তাহার প্রচলন ছিল এবং তাহার স্বরূপই বা কি?—এই সকল বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যিক। আকাশ-কুসুম, বক্ষ্যাপুত্র, শশশব্দ, কুর্শক্ষীর প্রভৃতি শব্দ যেমন মাহুকের কল্পনামাত্র প্রসূত; বাস্তবিক ক্ষেত্রে আকাশে পুষ্প, বক্ষ্যার পুত্র, শশকের শিং বা কচ্ছপের দুধ থাকা কোন মতেই সম্ভব নহে, তেমনি উল্লিখিত পণ্ডিতেরা কল্পনার সাহায্যে এমন একটি নূতন ভাষা প্রণয়নে ত্রুটি হইলেন, যাহার অস্তিত্বের কোন বাস্তব প্রমাণ নাই। এই কল্পিত নূতন ভাষায় আকাশ-কুসুম প্রভৃতির মত কল্পিত শব্দ তাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাটিকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে অত্মাপি সমর্থ হন নাই, এবং সম্ভবতঃ কোন কালে সমর্থ হইবেনও না।

আমাদের বিবেচনার আকাশকুসুম, বক্ষ্যাপুত্র, কুর্শক্ষীর প্রভৃতির মত বস্তুতঃ সম্ভবহীন এই কল্পনিক ভাষার সম্মানে বুধা শ্রম ও কালক্ষয় না করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর উচিত—বিশ্বের প্রাচীনতম, সর্বভাষার জননী সর্বসম্পদ-বিভূষিতা সংস্কৃত-ভাষাকেই অন্তান্ত ভাষার জননীরূপে স্বীকার করিয়া সত্য ও ত্রাসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা।

ঐতিহাসিকেরা বলেন—আর্য্যজাতি অতি প্রাচীন-কালে মধ্য এশিয়ায় বাস করিতেন এবং তথা হইতেই তাঁহারা নানাদিকে অগ্রসর হইয়া এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়েন। বস্তুতঃ আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান যে ভারতবর্ষই ছিল এবং এই দেশ হইতেই যে তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে অন্তান্ত দেশে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অন্তর্য প্রদর্শন করিয়াছি (৩)। আর্য্যেরা ভারতবর্ষ হইতেই বিদেশে গিয়া থাকুন বা মধ্য এশিয়ার কোন স্থান হইতে এদেশে আসিয়া থাকুন, আদি পিতৃভূমি পরিত্যাগের পর কয়েক-শত বৎসর যে তাঁহারা পারস্যদেশে বাস করিয়াছিলেন, ইহা সর্ববাদীসম্মত। যদি মধ্য এশিয়া হইতে আর্য্যেরা ভারতে আসিতেন তাহা হইলে ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বে কয়েকশত বৎসর তাঁহারা পারস্যে বাস করিয়া-ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহার অপরিহার্য্য

ফল—পারসিক ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি স্বীকার করিয়া লওয়া। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ প্রমাণ করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় অতি প্রাচীনকাল হইতে যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়—সংস্কৃত ভাষা হইতেই পারসিক ভাষা উদ্ভূত হইয়াছে; পারসিক ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উদ্ভূত হয় নাই। প্রাচীন কাল হইতে সংস্কৃত ভাষায় শব্দ-সঙ্কোচনের একটি রীতি প্রচলিত আছে। কখনও কোন শব্দের প্রথমমাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারাই সমগ্র শব্দার্থটিকে বুঝানো হয়। দেবদত্ত শব্দ স্থানে শুধু 'দেব', সত্যভামা শব্দ স্থলে শুধু 'সত্য', পদ্মালয়া শব্দ স্থলে সংক্ষেপে 'পদ্মা' এইরূপ ব্যবহার প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যথেষ্ট পাওয়া যায়। আবার কোন কোন সময়ে কেবলমাত্র শব্দের শেষমাংশ গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারাই সম্পূর্ণ শব্দার্থটিকে বুঝানো হইয়া থাকে। দেবদত্ত স্থলে শুধু দত্ত, সত্যভামা স্থলে শুধু 'ভামা' প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিয়া নিঃসন্দেহেই এই তথ্য অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন পারস্য ভাষায়ও এইরূপ শব্দসঙ্কোচন রীতির প্রচলন ছিল।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মূল সংস্কৃত শব্দের প্রথমমাংশ বা শেষমাংশ লইয়া পারস্য ভাষায় বহু শব্দ রচিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। সংস্কৃত শিরস্ শব্দের প্রথম ভাগটিকে লইয়া পারস্য ভাষায় 'শর' রূপে একটি শব্দের ব্যবহার আছে। আবার ইহার শেষমাংশ 'রস'টুকুকেও শিরস্ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। কখন কখন আবার মূল সংস্কৃত শব্দের প্রথমমাংশ বা শেষমাংশকে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অন্তান্ত নূতন অক্ষর যোগেও কোন কোন পারসিক শব্দ গঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত মুখ শব্দ হইতে পারস্য ভাষায় 'মসবির' এবং 'খুর' (khur) (বা খোর) রূপে দুইটি পৃথক্ শব্দ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্পূর্ণ মুখ শব্দের উভয় ব্যঞ্জন বর্ণকে লইয়া 'মদখল'-রূপেও একটি পারসিক শব্দ আছে। সংস্কৃত উরু শব্দ হইতে উম্বক এবং রণ্, সংস্কৃত মন্তক হইতে মন্ডা ও কন্ডা, সংস্কৃত কর্ণ হইতে কুর্ন, মুখিক হইতে মুব, মাস হইতে মা,

(৩) The Earliest Abode of the Aryas (part I and II)
Calcutta Review, August and December 1963,

কেশ হইতে শব্দ, তাম্র হইতে মস—এইরূপ অসংখ্য শব্দ প্রাচীন ও মধ্যযুগের পারসিক গ্রন্থসমূহের পাতায় পাতায় রহিয়াছে। যদি পারসিক ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় উদ্ভব হইত, তাহা হইলে একই সংস্কৃত শব্দের উল্লিখিত প্রকারের বিভিন্ন রূপ পারসিক ভাষায় দৃষ্টিগোচর হইত না; বরং একটিমাত্র পারসিক শব্দকে লইয়া সংস্কৃত ভাষায়ই বিভিন্ন শব্দ রচিত হইত। অতএব, নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ হইতেই আর্যেরা তাঁহাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা বহন করিয়া পশ্চিম দিকে বাওয়ার কালে পারস্য দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় যে সকল সংস্কৃত বা তদ্ভব শব্দ রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া বুঝা যায় ভারতীয় আর্যগণ কয়েক শত বৎসর পারস্যদেশে বাস করিবার পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন সময়ে ইউরোপের নানা দেশেও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া আর্যেরা সর্বপ্রথম পারস্য দেশেই যে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পিতৃভূমি ভারতের বিভিন্ন স্থান, নগর, নদী, পর্বত প্রভৃতির নামের অনুকরণে নূতন বাসস্থানের নগর, পর্বত, নদী প্রভৃতিরও নাম দিয়াছিলেন, আবেস্তা প্রভৃতি প্রাচীন পারসিক গ্রন্থসমূহে তাহারও নিদর্শন আছে। আর্যাবর্তের নামানুসারে তাঁহারা পারস্যের শস্যসমৃদ্ধ অংশের নাম আর্যাবর্তই রাখিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে উহা বিকৃত হইয়া ‘ঐরানাবজ্জা’ রূপে পরিণত হয়। ভারতের সরস্বতী নদীর নামানুসারে তাঁহারা যে নদীটির নাম রাখিয়াছিলেন, তাহাও পরে বিকৃত হইয়া ‘হরবেতী’তে রূপান্তরিত হয়। এইরূপে পারস্যদেশের বহু নগর, নদী ও পর্বতের নাম প্রমাণ করিতেছে যে, ভারতবর্ষ হইতেই পারসিক আর্যগণের পূর্বপুরুষেরা ঐ দেশে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

আক্ষর্যের বিষয়, বর্তমান যুগের প্রবীণ ভাষাতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন আর্য ভাষার জননীরূপে ‘ইন্দো-ইউরোপীয়’ নামে যে ভাষাটিকে কল্পনা করিয়াছেন (কেহ কেহবা ‘ইন্দো জার্মানিক’ বা ‘ইন্দো-কেল্টিক’ নামও দিয়াছেন), তাহাতে শব্দ কল্পনা করিবার কালে সর্বদাই তাঁহারা

লক্ষ্য করিয়াছেন, বাহাতে গ্রীক ভাষার শব্দ হইতে উহা দূরে না যায়। সংস্কৃত ‘পরি’ উপসর্গটি গ্রীকভাষায় ‘পেরি’ রূপে ব্যবহৃত হইত, অতএব তাঁহারা ধরিয়া লইলেন মূল ভাষায় শব্দটি ‘পেরি’ ছিল, ‘পরি’ নহে। সংস্কৃত ‘মাতর’ গ্রীক ভাষায় ছিল ‘মেতের’, সুতরাং তাঁহারা অবশ্যই ধরিয়া লইলেন যে মূল ভাষায় ইহা ‘মেতের’ ছিল; কিন্তু ভৌরিক নামক গ্রীক উপভাষায় এবং ল্যাটিন ভাষায় শব্দটি ‘মাতের’রূপে রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা কিছুটা অন্ববিধায় পড়িলেন। মূল শব্দটি যদি ‘মেতের’ হইত, তাহা হইলে ভৌরিক নামক গ্রীক উপভাষায় এবং ল্যাটিন ভাষায় উহা কি করিয়া ‘মাতের’ হইল, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহারা বলিলেন—মূল ভাষায় শব্দটি ছিল ‘মাতের’। পাঠক মহোদয়গণ লক্ষ্য করুন—সংস্কৃত ‘মাতর’ শব্দটিই যে মূল শব্দ ইহা তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ ‘অস্তি’ গ্রীক ভাষায় ‘এস্তি’ রূপে ব্যবহৃত হইত; অতএব ভাষাতত্ত্ববিদগণ বলিলেন—মূল ভাষায় শব্দটি ‘এস্তি’ ছিল; ‘অস্তি’ নহে। সংস্কৃত ‘পতামি’ এই ক্রিয়াপদটি গ্রীক ভাষায় ‘পেতোমৈ’ রূপে ব্যবহৃত হইত; অতএব কল্পনা করা হইল—মূল ভাষায় শব্দটি ছিল ‘পেত’; সংস্কৃত ‘পত’ নহে। সংখ্যাবাচক সংস্কৃত ‘দশ’ শব্দটি গ্রীক ভাষায় ‘দেক’ রূপে ব্যবহৃত হইত; অতএব ধরিয়া লওয়া হইল—মূল ভাষায় শব্দটি ছিল ‘দেক’; সংস্কৃত ‘দশ’ নহে।

বস্তুতঃ গ্রীসদেশ বা তাহার পার্শ্ববর্তী কোন অংশ যে আর্য জাতির আদি বাসস্থান ছিল না, ইহা ঐতিহাসিকেরা সকলেই স্বীকার করেন। এমতাবস্থায় গ্রীক ভাষার প্রতি উল্লিখিত প্রকার পক্ষপাতিত্ব কি সত্য নির্ণয়ের সহায়ক? এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি অল্প যে কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করিলাম, তাহা দেখিয়া নিরপেক্ষ পাঠক-পাঠিকাগণ বিচার করিয়া দেখুন—বর্তমান যুগের ভাষাতত্ত্ববিদেরা কি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতেছেন? এইরূপ অসংখ্য তথ্য আমি সংগ্রহ করিয়াছি। আশা করি শীঘ্রই পুস্তকাকারে উহা পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিব। শিবমন্ত্ৰ।

ভারতের সরকারী ও জাতীয় ভাষারূপে সংস্কৃতির স্থান

শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার

পর্যায়নতার নাগপাশ হতে মুক্তির পর হতেই ভারতে 'সরকারী (অফিসিয়াল) ও জাতীয় ভাষার প্রসঙ্গ উঠেছে বা তাই নিয়ে নানা বিতর্ক চলেছে। বিদেশী শাসনে রাজভাষা ইংরাজী ছিল, সেটা সহজে পদত্যাগ করল না। তারপরে হিন্দুস্থানী বা হিন্দী, বাংলা, সমস্ত উল্লেখযোগ্য প্রাদেশিক ভাষাগুলি ও সংস্কৃত—এগুলি ইংরাজীর উক্ত স্থান গ্রহণ করতে বা বিকল্পরূপে থাকতে চেয়েছে। দীর্ঘকাল নানা আলোচনা বিতর্কের পর ইংরাজী ও হিন্দীর স্থান হয়েছে ও রবেছে। এখন আলোচ্য বিষয়—উক্ত সমস্যা পূরণে কোন ভাষা বা ভাষাগুলির স্বাভাবিক ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান হতে পারে।

যারা এখন মাথা তুলেছেন তাঁদের বাস্তব ও ভবিষ্যৎ মূল্য বা যোগ্যতার কথা ভেবে দেখা যাক। ইংরাজী ভাষায় এদেশীয় ও বিদেশীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু সম্ভান পাওয়া গেছে ও যাবে, বহু দেশে এই ভাষার সম্মান থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু তাই বলে এই স্বাধীন দেশে চিরকাল তাকে মাথায় তুলে নাচতে হবে আর নিজের দেশের সমৃদ্ধ ভাষাগুলিকে অনাদৃত বা অবহেলিত করে রাখতে হবে—এ আবার কেমন কথা! ওটা বিদেশী ভাষা, জনকতক ঋণান বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের ভাষা হলেও ওটাকে ভারতীয় ভাষারূপে ভাবতে বোধ হয় তাঁদেরও সঙ্কোচ হবে, যদি নাও হয় তবু তাঁরা সংখ্যানগণ্য ও তাঁদের অনেকে ইংরাজী-আবরণে এ দেশকে ঘূর্ণা করেন; গঠনতন্ত্রে (১৯৫১) উল্লেখযোগ্য এদেশীয় ভাষার মধ্যে ইংরাজীও বর্জিত দেখছি, বোধ হয় সংখ্যানগণ্যতার অন্ত। বিদেশীকে চিরকাল মাথায় রাখলে দেশী ভাষা অনেক স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হবে, আর বহু দিক দিয়ে পরোক্ষে আমরা দাস হয়ে থাকব। পাশ্চাত্য দেশে কোন উল্লেখযোগ্য ভাষার লোক কি অন্ত সমৃদ্ধ বা সমৃদ্ধতর ভাষাকে মাতৃভাষা করেছে? উত্তর—না। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত কথাস্থলির ভাবার্থ মনে আসে; দীর্ঘরপ্ত বলেছেন, “দেশের কুঁকুর পুঞ্জ বিদেশের ঠাকুর কেলিয়া”; সিংহকে পশুরাজ বলা যায়, “তথাপি সিংহ: পশুরেব নাত্তঃ” অর্থাৎ তিনি পশু।

এবারে হিন্দীর লক্ষণ (ও হিন্দী-সংস্কৃত সংঘর্ষ-কথা) দেখি। বিশ-ত্রিশ বছর আগে হিন্দী, হিন্দুস্থানী, উর্দু প্রভৃতি ভাষার লোকদের পৃথক গণনা হোত; পরে এগুলিকে (নানা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকলেও) ‘হিন্দী’ নামে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে ও যে কোন এ দেশীয় একটি ভাষার তুলনায় এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখান হয়েছে; যদিও সারা ভারতের অধিবাসীসংখ্যা তুলনায় এঁরা আসলে প্রায় ১/৫ অংশ।

হিন্দীর তুলনায় বাংলা অনেক সমৃদ্ধ; অথ ২৪টি ভাষাও তুল্য সমৃদ্ধ বা ন্যূনাধিক রূপে গর্ব করতে পারে; একেই বা মাথায় তুলতে হবে কেন? তা ছাড়া ভাববার (১) হিন্দীর প্রাধাত্তে হিন্দী দেশের সরকারী অর্থে পরিপুষ্ট হবে, (২) হিন্দী ষাঁদের মাতৃভাষা তাঁরা সহজেই অন্ত প্রদেশে মাতৃকরী করে অর্ধোপার্জন করবেন, আর (৩) অন্ত ভাষাগুলি সে তুলনায় ক্ষীণতর হবে ও (৪) একমাত্র হিন্দীজ্ঞানের স্বল্পতায় (অন্তর্য দক্ষতা, বিজ্ঞতা থাকলেও) অহিন্দীভাষীরা পিছনে থাকবে—এ কথাস্থলি কি কম দুশ্চিন্তার কথা? হিন্দীর প্রচারে কি ঢাকা মিনাদ! একসময়ে যত্নাথ সরকার মশায় অমৃতবাজারে লেখেন—নানা সভায় ভাড়াটিয়া লোক রেখে বলান হয়েছে, “অহিন্দী বুঝি না, হিন্দীকে কহিয়ে ইত্যাদি।” ২য় কোশল পূর্বেই বলেছি। এঁদের দল এত প্রচণ্ড বা উগ্র যে বৎসর খানেক পূর্বেই এক অলু ইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কন্ফারেন্সে (বোধ হয় আমেদাবাদে) ‘কমিটি মিটিং’—এ এঁরা জিগীর তুললেন: এবার হতে হিন্দী নামে এর একটি বিভাগ থাকবে, কারণ হিন্দী রাষ্ট্রভাষা, তার সমর্থক (বাহালীবাবু) এখানে সভাপতি, ইত্যাদি। সে সভায় অহিন্দী দল সংখ্যাধিক; তাঁদের চাপে বা স্বেচ্ছায় সভাপতি মশায় বলেন—আমি হিন্দীর পক্ষে বটে, তবে সে হিন্দী বর্তমানের হিন্দী নয়—তা তৈরী হতে যাচ্ছে (‘...ইন্-দি মেকিং’) ইত্যাদি। এবারে গোহাটিতে (৪।১।৬৫) উক্ত কন্ফারেন্সের ‘ক্লাসিক্যাল’ বিভাগে ‘কমিটি-মিটিং’—এর প্রস্তাব ‘সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা হউক...’ এই

কথা শোনান হল; হিন্দী দল বিপক্ষে গেল; কেউ কেউ বিকল্পত প্রভৃতি সম্বন্ধে বললেন। আমি অন্ততম প্রতিনিধি হিসাবে সংস্কৃতের পক্ষেই বললাম, তবে সেই সংস্কৃত গুরুপাক ও গুরু যাতে না হয় বা 'ব্রাহ্মণ-প্রাধান্ত'র ভয় না থাকে, বিশেষতঃ যাতে সর্বস্তরে কার্যকরী হয় সেজন্য সংস্কৃতের মধ্যে পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এমন কি বহু প্রচলিত ইংরাজী শব্দাদির ও যোগ্য স্থানের কথা বললাম; কেউ এর বিরোধিতা করেন নি; পক্ষেই অনেকে—তা বুঝলাম। প্রসঙ্গতঃ বর্তমান নিয়মে দক্ষিণ-ভারতের লোক মাতৃভাষা, ইংরাজী ও হিন্দী শিখতে বাধ্য হওয়ায় সংস্কৃত মৃত্যুমুখে—এ দুঃখের কথাও শুনলাম। ৮।১০ বৎসর পূর্বে নাগপুরে অজ্ঞ ইতিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্সে একবার সাধারণ সভায় A. B. T. A.-র সত্যপ্রিয় রায় মশায় মাধ্যমিক শিক্ষায় সংস্কৃতের স্থানকে বাদ দিতে বা গোঁণ করতে চেয়েছিলেন; আমি অন্তমনস্কে তাঁকে সমর্থন করতে যেয়ে সংস্কৃতের নানা বিষয়ে গৌরব ও সারা ভারতের ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতিতে তার অতুলনীয় দানের কথা বলে সংস্কৃতের পক্ষেই সমর্থন করি। ফলে সত্যবাবু তাঁর মত প্রত্যাহার করেন ও সভার নানাশূল বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের দল আমাদের সংস্কৃতকেই সমর্থন করেন।

প্রসঙ্গতঃ সংস্কৃতের স্বরূপ ও প্রভাব সম্বন্ধে কিছু পূর্বেই বলেছি। ২।৪টি সংস্কৃত পত্রিকাও আমাদের প্রসঙ্গ সমর্থন করে ও বাজারে চালু আছে দেখেছি। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় (সম্প্রতি) ও অন্ত বহু স্থলে এ সম্বন্ধে লেখা বার হয়েছে দেখেছি। রাজাগোপালাচারী, কাটজ, কে. মুন্সী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি মহাশয়দের অনেকেই এ পক্ষ বা সংস্কৃতের দিগন্ত-ব্যাপী ঐর্ষ্যের কথা বারবার বলেছেন। মনোবৈজ্ঞানিক গিরীন্দ্র শেখর বসু মশায়-এর বিশেষ মন্তঃ একরূপ ছিল শুনেছি। 'সংস্কৃত গ্রীকের অপেক্ষা পূর্ণতর, লাতিনের তুলনায় প্রাচুর্যময়' এ ইউরোপীয় মত। এ কথাও সত্য যে, প্রাদেশিক ১৫টি ভাষাতালিকায় সংস্কৃতও গণ্য হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কিছু আবজ্ঞানা বা কুসংস্কার

থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি সরিয়ে যতটুকু সার উপাদান পাওয়া যায় তা নিয়ে জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতার বোধ কেন আমরা জাগিয়ে তুলব না? সংস্কৃতকে দৈনন্দিন শিক্ষা ও প্রয়োজনে চেষ্টা করলেই লাগান যাবে, অবশ্য আধুনিক সংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃত—এর কথা ভাবতে হবে। 'সংস্কৃত প্রভাবিত 'হিন্দী'র তুলনায় উক্ত সংস্কৃত বা ভারতীয় ভাবাপ্রভাবিত 'সংস্কৃতকে মাধ্যম রাখতে কোন ভারতীয়ের আপত্তি থাকতে পারে? সংস্কৃত হচ্ছে দেবভাষা আর বৈদিক সংস্কৃত বা তার সহোদরা বা জননী প্রাচীনতর প্রাকৃত আমাদের দেশের ও অধিবাসীর পূর্বপুরুষ বা পূর্বস্বরূপ—এ কি অস্বীকার করা যায়? একে বাদ দিলে ভাষাতত্ত্ব ও কৃষ্টিতত্ত্বের আর কি থাকবে? ইংরাজ ও ইংরাজী আধ্যাত্মিক আর আর্থ্যভাষা বলে গর্ব করে, আবার ভারতীয়দের মূলতঃ অনাধ্যাত্মিক; আমরাও কি তুলব? বরং ইংরাজী আর্থ্যভাষা, জর্মন, রুশীয় প্রভৃতিও আর্থ্যভাষা, তথাকথিত বহু অনাধ্যাত্মিক পূর্ণ আর্থ্যভাষা সংস্কৃত প্রাকৃতের শাখা বা তৎপ্রভাবিত—এ আলোচনাই আমাদের করতে হবে। মোগগঞ্জ, কল্যাণ প্রভৃতির পালি ব্যাকরণ বা ছন্দোগ্রন্থও সংস্কৃতের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে বা প্রাকৃতের মত সংস্কৃতের আত্মীয়। প্রাকৃত কবি রাধেশ্বর বলেছেন "পল্লব সন্ধি (সংস্কৃত) বন্ধা পাউদ (প্রাকৃত) বন্ধো বি হোই মুউমারো....."। প্রাদেশিক ভাষাশিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ে সংস্কৃতের আধুনিক প্রয়োজনানুসারে সংস্কৃতি শিক্ষা বিস্তৃত হয়ে সংস্কৃত বেঁচে থাকুক এই কামনা করি, আর ভারতীয়েরা বিশেষতঃ বাঙ্গালীও এই দাবী উচ্চকণ্ঠে উত্থাপন করুন, এই আশা করি।

লিপি সম্বন্ধে দেবনাগরী বা ব্রাহ্মীলিপির স্থান—রোমান প্রভৃতির উর্দ্ধে থাকুক এ আশাও রাখি, বরং এই লিপিশুলিকে প্রয়োজনবোধে সম্প্রসারিত করা হলে কাজে লাগবে।

সংস্কৃতের মধ্যে আমরা সারা ভারতবাসী নিজেদেরই দেখতে পাব। অথ কোন ভাষাব নয়।

বন্দেমাতরম্।



স্বৈ মহিল্লি রাজতে :

ব্যষ্টি, সমাজ, জাতিজীবনের আদর্শ-পরাকাষ্ঠার নির্দেশ দিতে গিয়া ছান্দোগ্য ঋত্বির দিগদর্শন হইতেছে 'স্বৈ মহিল্লি রাজতে'। স্ব-মহিমার রাজ্য-ভূমিতে অপ্রতিষ্ঠ হবারই ইঙ্গিত ইহা বহন করে। আধুনিক ভাষায় এই রাজ্য বলিতে বুঝায় সভ্যতা-সংস্কৃতি। আর্ধ্য-বোধির উপলব্ধি—'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মহুয়াঃ'। মর্ত্য-মানুষের কাছে ইহা ধ্বির শ্রেয়ঃ বার্তা। মহুয়া জীবন পরিতৃপ্ত ও পূর্ণ হইবার নহে কেবল মাত্র বিত্ত, ঐশ্বর্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বারা। জীবনের চরিতার্থতা নিহিত ভূমির সহিত ভূমার সম্বন্ধ ও সংযুক্তিতে। যেহেতু 'যদাঙ্গং তদমর্ত্যং' আর 'যো বৈ ভূমা তদমৃতম্'। যাহা অঙ্গ তাহা মরণশীল এবং যাহা বৃহৎ, যাহা ভূমা তাহা অমৃত—মরণরহিত। ভারতের রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি তাই উর্দ্ধমূল এবং অঃশাখ। তার সমস্ত পার্শ্ব প্রযত্ন-প্রচেষ্টা বর্জিতা থাকিতে চাহিয়াছে এই অমর্ত্য, অমৃত ভৌম চৈতন্তের সহিত যোগযুক্ত হইয়া। গীতার ভাষায় ইহাই স্বধর্ম। গীতার ভগবান নির্দেশ দিয়াছেন 'স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ'। এই আত্মধর্ম মুক্ত্যুও শ্রেয়ঃ দিয়া থাকে। জীবনের এই অপ্রাকৃত মূল্যায়ণ-বোধের জন্মই ভারতবর্ষে কোনদিন আজকের মানব-পীড়নমূলক রাষ্ট্র বা অর্ব-নৈতিক সাম্রাজ্যবাদ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই এবং যাহাও উঠিয়াছে তাহা মানব শোষণের কারণ না হইয়া শোষণেরই প্রশস্ত সোপান হইয়াছে। অতীত ভারতের রাষ্ট্রধর্ম ও রাষ্ট্রপরিমণ্ডলী তার অধ্যাত্ম সাংস্কৃতিক অত্মাধান ও বিস্তারেরই আত্মকূল্য করিয়াছে। এই ভৌম-চৈতন্তযুক্ত যে অহং তাহাই ঋগ্বেদে বাকুরূপে আত্ম-পরিচয় দিতে পারিয়াছে 'অহং রাষ্ট্রী' বলিয়া। রাষ্ট্র এখানে স্বরাজ্যে অধ্যাত্ম-তাৎপর্যমণ্ডিত। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি এই অন্তর্নিহিত সভ্য-প্রতিষ্ঠা বলিয়াই কালের অভিঘাত সহ করিয়া অচল সনাতন হইয়া কালকে অতিক্রম করিয়া নিত্য চলমান রহিয়াছে। গীতার এই আত্মসংস্কৃতিকেই বলা হইয়াছে 'অচলোহং

সনাতনঃ'। বহির্ভারতে একান্ত মর্ত্য-অস্তিত্ব-কেন্দ্রিক কত সভ্যতার উত্থান-পতন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কাহিনী হইয়া রহিয়াছে। আইলান্টা, মায়্যা, গ্রীস, রোম, মিশর ইহার দৃষ্টান্ত। মৃতের পিরামিড, স্মৃতিসৌধ, মর্ম্মর মূর্তি কোন কিছুই এই সব সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে নাই। তারতবর্ষ মৃতকে অগ্নিসং করিয়াও এষাবৎ বাঁচিয়া আছে। সাময়িকভাবে মর্ত্য-মানবতার একটা অত্যাঙ্গন ব্যঞ্জনা চোখ ধাঁধাইলেও গ্রীক, রোমক, মিশর প্রভৃতি সভ্যতার স্মৃতি ও পুষ্টি পৌর-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক মতবাদ ও রাষ্ট্র-সংস্থার অপূর্ণতা ও অসারতাই এইসব অতীত সভ্য জাতির স্বম্মাদেবের হেতু বলা যায়। একান্ত গ্রাসাচ্ছাদন-কেন্দ্রিক পার্শ্বিক ভোগলুপ আর দেহসর্বস্ব জাতি ও সভ্যতার ইহাই অপরিসংখ্য পরিণতি। জীবন ও জগৎ এবং জীবনের সমস্ত পার্শ্বিক প্রচেষ্টার মূল্যায়ন-পূর্ণতার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বভূমিতে একমাত্র ভারতবর্ষই আলো ও অমৃতের দিশারী হইয়া আজও বিদ্যমান, ইহা অতুষ্টি নহে—ঐতিহাসিক সাক্ষ্য।

॥ সংস্কৃত ও সংস্কৃতি ॥

ইংরাজ কবি লংফেলো বলিয়াছেন, "A national literature is the expression of a national character." তাহা ভাবেরই ব্যঞ্জনা। ভারতীয় অতিপ্রাকৃত মৌল ভাবের হবহ রূপটি সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে আকারিত। বৃহৎ অমৃত ব্রহ্মচৈতন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে শব্দে—শব্দব্রহ্মে। "পৃথিবীতে এমন কোন জ্ঞান নাই যাহা শব্দ-মহলিত নহে। জ্ঞান ও শব্দ (ফোন্ট) ফলতঃ অভিন্ন। বস্তুর নাম বা পরিচয় শব্দ ভিন্ন প্রকাশিত হয় না, মনোভাবও শব্দ ব্যতীত (জ্ঞাত বা) অভিব্যক্ত হইবার নহে। শব্দ না হইলে জ্ঞান সম্ভব হয় না। জ্ঞানের প্রকাশ না হইলে চেতন বা জড় তাহাও নির্ণয় হয় না। শব্দ থাকিলেই চৈতন্তের অভিব্যক্তি হয়। শব্দ না থাকিলে চৈতন্ত অনভিব্যক্ত থাকে। চৈতন্তের প্রকাশক বা চেতনশীলতা শব্দেরই অধীন। অথবা বলা যায় বাক্যের শক্তিই চৈতন্ত। কারণ প্রকাশশীলতাই চৈতন্তের স্বভাব।" শব্দ স্বভাষিক—ধ্বনিই বিচিত্র বিজ্ঞান। ধ্বনি সৃষ্টির মতই অনাদি। বস্তুতঃ সৃষ্টির পূর্ব ধ্বনিত। ধ্বনি তাই

ভৌম চৈতন্তের মতই স্বয়ম্ভু। এই ধ্বনির ধরে অত্রঙ্গ স্বাবর-জঙ্গম সৃষ্টি, মানুষ আর তার ভাষা সবই সমান। এখানে বক্তব্য এই যে, পৃথিবীতে এক সংস্কৃত ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষাতেই ধ্বনির শুদ্ধ নির্ভেজাল রূপটি হৃত হয় নাই। এই হেতুই বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলা চলে সংস্কৃত বিশ্বের সমস্ত ভাষারই অনতিক্রান্ত আদি জননী—সমস্ত ভাষাই সংস্কৃতের অপভ্রংশ। সমস্ত ভাষাই প্রাকৃত—শুদ্ধ ধ্বনিসম্মত সংস্কৃতের মত প্রকৃত ভাষা নহে।

শ্রীগণেশ লালওয়াণী বিষয়টি চমৎকার সহজবোধ্য ভাষায় বলিয়াছেন (সংহতি, ভাদ্র ১৩৬৭): “তবে একথা যদি কেহ বলেন যে, ধ্বনির অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার সমস্ত শব্দকে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে আমি বলিব না। তার কারণ আমাদের সমস্ত ভাষাই প্রাকৃত। যেখানে ধ্বনি হতে শব্দের অর্থ এসেছে সেখানে একথা সত্য হলেও, ধ্বনির ওপর যেখানে অর্থ চাপানো হয়েছে সেখানে নয়। এমন কি সংস্কৃত যাকে আমরা দেবভাষা বলি সেখানেও শব্দের ওপর এমন অনেক অর্থ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পতঞ্জলি সেই সব শব্দ থেকে শুদ্ধ শব্দকে রক্ষা করার জন্য শুদ্ধ শব্দের নাম দিলেন ‘সিদ্ধ’ শব্দ। সিদ্ধ শব্দ এইজন্যই সিদ্ধ যে, নিজ হতেই তার অর্থ প্রকাশিত হয়, আভিধানিক কোন অর্থের উপর নির্ভর করে না। সিদ্ধ শব্দই প্রকৃত দেবভাষা। সিদ্ধ শব্দের দ্যোতনা নিরবধি কালের এবং বিপুল। পৃথিবীর। আমাদের বেদ, আমাদের উপনিষদ অর্থাৎ বা কিছু আর্থ সে সমস্তই ঐ সিদ্ধ শব্দে। × × তাঁরা (ঋষিরা এই সিদ্ধ শব্দের) কেবল দ্রষ্টা। যেহেতু দ্রষ্টা সেহেতু সেগুলি সত্য। এবম্ এবম্। ইঁ এইরূপই এইরূপই, এর অত্যাধিক কখনও সম্ভব নয়।”

ভারতের এই সিদ্ধ সম্পদ সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্ব-মহিমায় মহীয়ান—‘স্ব-মহিমা’রাজ্যতে।’ যুগে যুগে বহু বিচ্ছিন্ন বিশাল ভারতের রাজনৈতিক বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য ও অখণ্ড রক্ষা করিয়া ভারতীয় দিব্য জীবন বিকাশের হেতু হইয়াছে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহা মূলতঃ সংস্কৃত ভাষার এই শুদ্ধ-সিদ্ধ শব্দ দ্বারা। শুদ্ধ মিশ্র অর্থারোপিত শব্দজ্ঞান বস্তুর স্বরূপ

ধারণা করিতে অক্ষম। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের পরিমীমা শব্দ সংকেত পর্য্যন্ত। কিন্তু এই শব্দপারাবারের পারেই নিত্য, সত্য, সেই অপরিবর্তনীয় সচ্চিদানন্দের অবস্থান যাহাকে পৃষ্ঠভূমি করিয়াই এই দৃশ্যমান জগতের উদয় বিলয়। এই বিজ্ঞানানন্দ-লোক না থাকিলে দৃশ্যমান বিশ্বভূবন থাকে না, অথচ জগৎ না থাকিলেও যাহা অটুট থাকেন। ইংরাজ-কবির উপলব্ধির আলোতেও সেই অপরূপ লোক ভাসিয়া উঠিয়াছে :

“Eye hath not seen it my gentle boy
Ear hath not heard its deep songs of joy
Dream cannot picture a world so fair
Sorrow and death may not enter there.”

বিশ্বের একটি মাত্র ভাষা এই সংস্কৃত, এই দেবভাষা, যার সিদ্ধ শব্দসম্পদ ইন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিযে লইয়া যাইবার সামর্থ্য রাখে। একদা পতঞ্জলির যোগভাষ্য পাঠান্তে সংস্কৃত ভাষার এই অপ্রাকৃত অমূপম গুণে বিশ্বয় বিমুগ্ধ হইয়া একজন ফরাসী দেশীয় প্রাচ্যবিদ্যারদ যন্তব্য করিয়াছিলেন, “Glory be to the land that can produce a book as this.”

স্বাধীন ভারতবর্ষ তার সংস্কৃতির মধ্যমণি সংস্কৃত ভাষার সিদ্ধসম্পদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঔদাসীন্য তথা মহিমার কথা বেমানম্য বিশ্বত হইয়াছে এবং ইহাই দেড়শো বছরের ইংরেজ শাসনের সর্বাপেক্ষা গ্লানিময় পরাজয় যাহা তার পূর্বে দীর্ঘ পরাধীনতাবৎ সংঘটিত হইতে পারে নাই!

॥ দিগ্ভ্রান্ত স্বাধীন ভারত ॥

দীর্ঘকাল পরে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইয়াছে। কেবলমাত্র রাষ্ট্র-স্বাধীনতাই স্বাধীনতায় লক্ষ্য হইতে পারে না। স্বাধীনতার তাৎপর্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা আত্মসংগঠনের স্বাধীনতা। দেশবাসীর মানোন্নয়নের সহায়ক স্বাধীনতা নিশ্চয়ই, কিন্তু অন্ধ অহুসরণের মধ্যে তাহা করিতে গিয়া মানুষের নিম্ন প্রবৃত্তির অবাধ অসংযত লীলাখেলার রাশ আত্মগা করিয়া আমাদের নেতৃবৃন্দ দিগ্ভ্রান্তিই পরিচয় দিয়াছেন। ভারত-সংস্কৃতিসম্মত জীবনবিকাশের অস্বীকৃতিই এই

অবিস্মৃয় মনোভাবের কারণ। বিগত ২৬এ জাম্বুয়ারী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে তাড়াহড়া করিয়া প্রাদেশিক হিন্দী ভাষাকে ভারত ইউনিয়ন রাজ্যের সরকারী ভাষা রূপে রাজ্যভিত্তিক করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের এই স্বার্থান্ধ বুদ্ধি-ভ্রংশতা অদূর ভবিষ্যতে ইংরাজ শাসনের আশীর্বাদ স্বরূপ প্রাপ্ত সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক এককের বিনষ্টন পথই সুগম করিল। নেহেরুর কংগ্রেস ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে এবং তাঁরই উত্তরাধিকারী শাস্ত্রী-নন্দ খণ্ডিত ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মূলে হিন্দীর আদিখ্যেতা দেখাইতে গিয়া কুঠারাত্মক করিলেন। ভারতের ভাগ্য-বিধাতার কি ইচ্ছিত ইহার মধ্যে নিহিত কে জানে! কিন্তু আমরা যুগি ভারতের অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির উপর আস্থাশীল। আমরা প্রত্যয় করিব, বিপ্লব-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া পুনশ্চ ভারতবর্ষ আপনাতে আপনি পুনরাবর্জন করিবেই।

॥ ভারতের জাতীয় ভাষা ॥

ভারতের জাতীয় ভাষা কি হওয়া উচিত ছিল, ইহা তর্ক-বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি ও স্বার্থান্ধতা এই সত্যবোধকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আমরা জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৩ বৎসর বয়স্ক প্রাক্ত অধ্যাপক ডঃ ফ্রেডারিক হিলারের একখানি পত্রের অবিকল নকল এখানে তুলিয়া দিলাম। পত্রখানি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীকে লিখিত।

Munichen 19, Klugstr.
Federal Republic Germany.
24 7. 64.

Dear Sri Chakravorty,

I was most delighted to receive your Sanskrit translation of Mukta-Dhara. I thank you heartily for your kindness of sending me this valuable booklet. I love Sanskrit as the most perfect language of the world, the earthly expression of the eternal rtam. Every Sanskrit verse is heavenly music for my ears. I only regret that the independent Indian state did not accept Sanskrit as the official language of India.

Just as Israel has adopted the ancient language of the Old Testament to modern condition. India could do the same with regard to Sanskrit. I hope to come once again to my beloved India where I passed four unforgettable months in 1959, the first of them in Calcutta.

With many thanks and with kindest regards,

Yours very Sincerely,
Sd/Friedrich Heiler.

I am now teaching history of religions at the University of Munich where 50 years ago my master Prof. Ernst Kulun, introduced me to the Sanskrit language.

Prof. Fr. Heiler

অধ্যাপক ফ্রেডারিক হিলার ভারতে সংস্কৃতকে রাষ্ট্র ভাষা করার সপক্ষে ইসরাইল রাষ্ট্রের হিব্রু ভাষার নজীর দেখাইয়াছেন। মরুপ্রান্তরের ছোট্ট রাজ্য ইসরাইল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের, এশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভাষাভাষী ইহুদির সমাগম। অল্প সময়ে মরুভূমিতে সোনা ফলাইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই মৃত হিব্রু ভাষাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। হিব্রু ভাষার পুরাতন (old) নূতন (new) আছে, কিন্তু সিদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কোন পুরাতন-নূতন নাই—সৃষ্টির মতই ইহা চির নূতন—আদ্যন্তহীন। এখনও নিখিল ভারতেই শুধু নহে, বিশ্বের প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়েই ইহার পঠন-পাঠন হইয়া থাকে। ইংলণ্ড, হল্যান্ড, জার্মানী, রাশিয়া, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি স্বাধীন দেশের মনীষিদের নিকট সংস্কৃত ভাষা শুধু সমাদরণীয় নহে, সাস্থনা ও প্রেরণার উৎস। ভারতের সর্বপ্রান্তিক রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের এখনও ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহৃত, অমুশীলিত। প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার শব্দ সম্পদের আকরগুপ্ত সংস্কৃত। কেবলমাত্র ভারতেরই নহে, বিশ্বমানবের যদি কোনদিন একটি ভাষা নির্বাচনের প্রয়োজন হয় তবে অনিশ্চিততাহা হইবে সংস্কৃত এবং একমাত্র সংস্কৃতেরই সে যোগ্যতা ও গুণ পরিপূর্ণভাবে আছে। কথটা মুরাইয়া বলা যায়,

যদি কোন মহাপ্রলয়ের পরে নব সৃষ্ট মানুষের মধ্যে ভাবের* আদান-প্রদানের জন্য ভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন হয় তবে তাহা হইবে সংস্কৃত ভাষারই ধ্বনিক্রম ধরিয়া। একদা সুদূর অতীতে জগতের সর্বত্র ‘ব্যবহারিকী ভাষা’ সংস্কৃতই ছিল। মনোবী অধ্যাপক Franz Bopp (1791-1867) the founder of Comparative philology) তাঁর তুলনামূলক ভাষা-গবেষণার মধ্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “At one time Sanskrit was the one language spoken all over the world.”

আমাদের মনে হয়, স্বাধীনতা-উত্তর ভারত রাষ্ট্র তার নীতি-নির্ধারণে ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুগামী না হইয়া গোড়ায়ই ভুল করিয়া বসিয়াছে। একান্ত অর্থনীতিসর্বশ্ৰেণী গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছে ভারতের বিচিত্র জাতিধর্মের মুখ চাহিয়া। ভারতের ধাতু ও প্রকৃতির সঙ্গে অপরিচয়েরই ইহা সূচক। আশ্চর্য্য মহাত্মাজীর দূরদৃষ্টি! ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে গান্ধীজী কংগ্রেসের এই অগভীর মানস অনুভব করিয়াই মন্তব্য করিয়াছিলেন: “we must recognise the fact that the socialism of our dreams cannot come through the Congress party.” মাত্র আঠারো বৎসর হইয়াছে, ইহারই মধ্যে কংগ্রেসের বিচিত্র ও বহুধা-প্রদেশ বিভক্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার একীকরণ রীতি-নীতি এই বিশাল উপ-মহাদেশকে পুনশ্চ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত করার পথই শুধু সূচক করে নাই, পারস্পরিক ঘেঁষ-বিঘেঁষ বন্ধিকে আরও উগ্রতর করারও ইচ্ছা যোগাইতেছে। ভারতের মত বিশাল দেশের প্রতি প্রান্তের বিচিত্র ভৌগোলিক প্রকৃতি, জাতি-মানস, স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে হিসাবে না আনিয়া ভাষা, শিক্ষা, শ্রেণী প্রভৃতির ক্ষেত্রে একই ছাঁচে ঢালার (standardisation, categorisation) অপপ্রবৃত্তি মৌল মানব প্রকৃতির বিষয়ে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

সম্প্রতি অপরিপুষ্ট ও অনভিজাত হিন্দীকে সর্বভারতীয় রাজ্যাভিষেক দিয়া হিন্দীভাষাভাষী-গরিষ্ঠ কেন্দ্র যে ক্ষমতা কায়মের মোহাচ্ছন্ন জ্ঞান-পাপ করিয়াছেন তাহার কুফল সুদূরপ্রসারী হওয়ারই বোল আনা সম্ভাবনা। লোকসভায়

একটি মাত্র ভোটের আধিক্যকে বিধানতন্ত্রসম্মত বলিয়া মপক্ষে সাফাই গাওয়া উগ্র হিন্দীবাদীদের ভণ্ডামীকে আরও নগ্ন করিয়া ধরিয়াছে। দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলেও এই অপ্রিয় সত্যের মন্তব্য করিতে হয়তো অহিন্দীভাষীরা খানিকটা ইতস্ততঃ করিত। এখনও অতিবিলম্ব হয় নাই। আমরা আশা করিব, কেন্দ্রীয় সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে এবং উগ্র হিন্দীবাদীদের সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তারের চুরাশী ও দিবাস্বপ্ন বিদূরিত হইবে।

॥ অন্তর্বর্তীকালীন কর্তব্য ॥

যে ভাষা নিখিল ভারতের ঐক্য বিধান করিতে সামর্থ্য রাখে সেই ভাষাই ভারতের জাতীয় তথা রাষ্ট্রভাষা হইবে। এই বাস্তব সত্য প্রাদেশিক স্বার্থান্ধ মানস ছাড়া সবাই স্বীকার করিবে। এই ভাষা যে সংস্কৃত তাহা অতিপ্রগতিশীল পণ্ডিত নেহেরুও ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোতে বুঝিয়াছিলেন। পণ্ডিতজীরই কথা (১৯৫১): “Though the Country was split up in the past into various political entities, the basic language of Sanskrit and thought it represented continued to keep and preserve India as a whole.” এই ঐতিহাসিক চেতনার অন্তই হিন্দীর রাষ্ট্রমর্যাদা লাভ সবেও, পণ্ডিতজী সর্বভারতে হিন্দী প্রচলনে ইতস্ততঃ করেন নাই, ইংরাজীকে সহযোগী রাখার ভরসাও বরাবর দিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যতীত সর্বভারতীয় ঐক্যের সুনিশ্চিত বিনষ্টির যে আশঙ্কা সর্দার পাণিকর করিয়াছেন তাহা দিবালোকের মতই সত্য। সর্দারজীর কথা: “Sanskrit is the one common national inheritance of India. The unity of India will collapse if it breaks away from Sanskrit and the Sanskrit tradition.”

অহিন্দী দক্ষিণ ভারত এবং আরও অনেক ইংরাজী-নবীশ ইংরাজীকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সনির্বন্ধ। ইংরাজীর জাতীয় ও সামাজিক অপরিহার্যতা স্বীকার করিয়াও একটা স্বাধীন দেশ ও জাতির পক্ষে এইরূপ

শ্রীশ্রী অর্দ্ধনারীশ্বর

শ্রীরমণ

বামার্দ্ধেন প্রসূতে জগদখিলম হো ধারয়ন্ মাতৃ-মূর্তিং
পূজান্ রক্ষন্ পিতৃব প্রবিলসতি শিবো

দক্ষভাগেন জঙ্ঘন ।

এবং যোঃসাবভেদং প্রকৃতিপুরুষয়োর্দর্শয়ন্মেকতত্ত্বে
ব্রহ্মণ্যোবেদমাগ্ধং সতিচিতি স্মৃশ্বেনোহর্ধ-

নারীশ্বরোহব্যাহ ॥

যিনি বামার্দ্ধের দ্বারা মাতৃ-মূর্তি ধারণ করতঃ সমগ্র
জগৎ প্রসব এবং দক্ষিণার্দ্ধের দ্বারা পিতৃরূপে সমগ্র
জগতের জীবকে পালনপূর্বক প্রকৃতি ও পুরুষের অভেদ
প্রদর্শন করতঃ একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্বেই জগতের পর্যাবসান
প্রমাণিত করিতেছেন সেই অর্দ্ধনারীশ্বর আমাদের গকে
রক্ষা করুন ।

যিনি অর্দ্ধনারীশ্বর, তিনিই লক্ষ্মীনারায়ণ আবার
তিনিই রাধাকৃষ্ণ । যেমন একই বিগ্রহমূর্তিতে
অর্দ্ধনারীশ্বর তদ্রূপ একই বিগ্রহে লক্ষ্মীনারায়ণ (অর্দ্ধাঙ্গ
লক্ষ্মী, অর্দ্ধদেহ নারায়ণ) এবং রাধাকৃষ্ণকে বিরাজিত
দৃষ্টিগোচর হয় । যোগিবর বালানন্দ ব্রহ্মচারী

মনোভাব অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া আমরা মনে করি ।
অনেক স্বাধীন রাষ্ট্র ইংরাজী ব্যতিরেকেও স্বীয় মাতৃভাষার
মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রচুর সমৃদ্ধ, এইরূপ দৃষ্টান্ত বর্তমান ।
সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের রক্ত-মেধ-মজ্জা এখনও ইংরাজীর
মোহমুক্ত নহে এবং ইহার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য ।
এই দিক দিয়া আপাততঃ আমরা ডঃ সুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি :
“We should maintain English and Sanskrit
in our public life and education side by side
with the mother tongue. In this way we
shall be able to bring about the true
integration which all desired.”

পরিপূর্ণভাবে সংস্কৃতকে সর্বভারতে আন্তঃপ্রাদেশিক
ভাষা হিসাবে গণ্য করার লক্ষ্যে অন্তর্জাতীকালীন এই

মহারাজের সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য ও সাধক, রিষড়া প্রেম-
মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী
দীর্ঘকাল তপস্তানিরত থাকিয়াও সংশয়-উদ্বেলিত চিন্তে
বিচলিত হইয়া পড়িলেন । মন্দির নির্মাণ কার্য চলিতেছে
কোন দেবতাকে মন্দিরে স্থাপনপূর্বক প্রগাঢ়ভাবে
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মনোনিবেশ করিবেন ? এই সংশয়
দূরীকরণপ্রয়াসে একাগ্রচিন্তে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ।
সর্বসিদ্ধিদায়িনী সিন্ধেশ্বরীর তপস্তা আরম্ভ করিলেন ।
দীর্ঘ তপস্তার পর তাঁহার মনোবাহ্য সিদ্ধ হইল ; জগদম্বা
নির্দেশ দিলেন ‘তোমার এই শরীরের জনক জননীকে
প্রতিষ্ঠা কর’ । তপস্তা বিধৌত চিন্তামল ব্রহ্মচারীশ্রীর
সন্দেহ ভঞ্জন হইল । বহু পূর্বেই স্বীয় গর্ভধারিণীর মর-
দেহাবসানে ব্রহ্মচারিণী মাতার পবিত্র স্মৃতিতে মাতৃমূর্তি
(শৈলীনন্দিনী দেবীর) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এক্ষণে দেবী
সিন্ধেশ্বরীর নির্দেশক্রমে জন্মদাতা (৮শশিভূষণ) এবং
জন্মদাত্রীকে একই দেববিগ্রহমূর্তিতে শ্রীশ্রী অর্দ্ধনারীশ্বর-
রূপে স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিলেন । তাঁহার হৃদয়াকাশ

ইংরাজী ও সংস্কৃতের ব্যবস্থা সমীচীন এবং অপরিহার্য্যও
বটে । আগামী পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতকে অধিতীয়
করিয়া ইংরাজীর অপনয়ন সম্ভবপর । বর্তমান ভারতে
নিরক্ষর নারী ও পুরুষের আত্মপাতিক সংখ্যা যথাক্রমে
শতকরা ৯১ ও ৭১ । এরূপ ক্ষেত্রে এখন হইতে সংস্কৃত
নিখিল ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে আবশ্যিক ও অমূল্যলিভ
হইলে, পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতের জাতীয় ভাষা
সম্পর্কে আর কোন বিতর্কেরই অবসর থাকিবে না ।
অবশ্য জ্ঞানাত্মস্বকীর নিকট সর্বকালে সর্বদেশেই জ্ঞান-
বিজ্ঞান সমৃদ্ধ ভাষার সমাদর রহিয়াছে এবং থাকিবেও ।
সেইদিনই ভারত স্ব-মহিমায় ও স্বকীয় মর্যাদায়
সুপ্রতিষ্ঠ হইবে । এবং ভারতের পুণ্যতীর্থে বিশ্বের
জ্ঞানী, গুণী ও আলোক-সম্বানী তীর্থ যাত্রা করিবে এবং
ভারতীয় মন্দিরে মাথা নত করিবে ।

দেবভাবে উদ্ভাসিত হইল। অভীষ্ট দেবের কৃপা প্রাপ্ত হইলেন। সেইজন্যই তো যোগ্য যোগিস্বরের উপযুক্ত শিষ্য। অধ্যাপকপ্রবণ ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন যত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা তদনুরূপ শিষ্যসম্পদ লাভ করিয়া স্ব স্ব ধর্ম আচার প্রচারপূর্বক ধন্য হইয়াছেন, যশস্বী হইয়াছেন এবং কীর্ত্তি রাখিয়া জনগণের কল্যাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের যশঃসৌরভে দিগ্দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

অভীষ্ট দেবের কৃপা লাভ করিয়াও ব্রহ্মচারিজীবী পুনরায় বিপ্রম উপস্থিত হইল :

উত্তমো ব্রহ্মসম্ভাবো ধ্যানভাবসু মধ্যমঃ।

স্বতীপূজাধমোভাবো বাহু পূজাধমধমঃ ॥

অধিকারী পুরুষ কচিতেদে শ্রীভগবানকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীঅর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে পাইলেন, কিরূপে ধ্যান করিবেন। অনেকে দেবতার বহিঃপূজা করিয়াই তৃপ্তিলাভ কবেন, কেহ কেহ স্তবস্তোত্র পাঠে, কেহ কীর্ত্তনে পরিতৃপ্ত হয়েন, আবার অনেকে নির্জনে, নিশিচিন্তে, নিশ্চলভাবে উপবেশনপূর্বক ধ্যান করিয়া থাকেন। এই ধ্যান বাহ্যপূজা হইতে ব্রহ্মসম্ভাব পর্য্যন্ত সর্বস্তরেই অন্বেষ্যত। প্রত্যেক দেবতারই পূজায় ‘ধ্যান’ নামে একটি বিষয় সম্মিলিত থাকে। ধ্যান শব্দের অর্থ চিন্তা। দেবতাকে কিরূপে ভাবিতে হইবে সেই নির্দেশ যাহাতে দেওয়া থাকে তাহাই ধ্যান নামে অভিহিত। এই ধ্যান লইয়াই ব্রহ্মচারিজীবী পুনরায় চিন্তাবিপ্রম ঘটিল।

শ্রীশ্রীঅর্দ্ধনারীশ্বরের শাস্ত্রোক্ত ধ্যানের সহিত তাঁহার দৃষ্টমূর্ত্তির স্বরূপে কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইল। শাস্ত্রোক্ত মূর্ত্তির হস্তচতুষ্টয়ে রুদ্রাক্ষমালা, পাশ, অঙ্কুশ এবং বরমুদ্রা

উল্লিখিত হইয়াছে এবং দেবতার অঙ্গকাস্তি বন্ধুক কাঞ্চন সদৃশ প্রভৃতি—

বন্ধুককাঞ্চননিভং রুচিরাক্ষমালাং

পাশাকুশৌ চ বরদাং নিজ্বাহদধৌঃ।

বিভাগমিন্দুশকলাভরণং ত্রিনেত্রম্

অর্ধাঙ্ঘ্রিকেশমনিশং বপুরাশ্রয়ামি ॥

পক্ষান্তরে তিনি দেখিলেন চারি হস্তে অভয়, অরুণ কমল, বর এবং ত্রিশূল দেহের বর্ণ নীলপ্রবালসন্নিভ। একই দেবতা বিভিন্ন রূপে বিরাজিত এবং তাঁহাদের ধ্যানও নানাপ্রকার, মন্ত্রও পৃথক পৃথক শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মচারিজীবী নিঃসংশয় হইয়া গুরু ও পূর্বস্মরী-গণের দর্শিত মার্গ অবলম্বনপূর্বক ধ্যান করিলেন—

নীলপ্রবালরুচিরং বিলসন্ত্রিনেত্রং

অভয়াঙ্কুশোপল বর ত্রিশূলক হস্তম্।

অর্ধাঙ্ঘ্রিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূবং

বালেন্দ্রবন্ধুকুটং প্রণমামি রূপম্ ॥

বাংলাদেশে শ্রীশ্রীঅর্দ্ধনারীশ্বর শিবের বিগ্রহমূর্ত্তির ইহাই সর্বপ্রথম আবির্ভাব। দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চিভরমের অন্তর্গত শিবকাঞ্চিতে কৈলাসনাথের মন্দিরে হরগৌরী মূর্ত্তি স্থাপিত—বিগ্রহটী অর্দ্ধনারীশ্বর—তিনিও অর্দ্ধাঙ্গে নারী অপরাধাঙ্গে পুরুষরূপে বিরাজিত, তাঁহার এক হস্তে বীণা-যন্ত্র এবং শিব বুঝোপরি উপবিষ্ট এতাদৃশ মূর্ত্তি ভারতবর্ষে অপর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদ্ব্যতীত বোধায়ৈ দ্বারপুরীর অন্তর্গত মন্দিরের ভিত্তিগোজে বহুবিধ মনোহর ভাবময় বিগ্রহ খোদিত আছে—তন্মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর অগ্রতম। উক্ত খোদিত মূর্ত্তিসমূহ কোন্ সময় কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে উহা যে দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন তাহা স্পষ্ট।

॥ প্রবর্তকের গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন ॥

‘প্রবর্তক’ প্রবর্তক-শব্দের মূলপত্র। কোন ব্যবসায়মূলক উদ্দেশ্য পত্রিকার নাই। নাই বলিয়াই উপরিচর লোকমতের স্রোতে ইহা ভাসিয়া চলে না। ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতি-ভিত্তিক জাতিগঠনের লক্ষ্যে প্রবর্তক পরিচালিত। সম লক্ষ্য ও আদর্শে আশ্রয়ী গ্রাহক-গ্রাহিকার সঙ্গে সম্বন্ধই পত্রিকার সম্পদ। এই সব অমুরাগী লোকদের স্বেচ্ছাপ্রণীত দায়িত্ব-সচেতনতার উপর প্রত্যয়শীল বলিয়া আমরা প্রবর্তকের দক্ষিণার জন্ত যখন-তখন তাগাদা পত্রও দিই না। নিয়মিত চাঁদা আদায় না হইলে বর্তমান অগ্নিমূলের বাজারে পত্রিকা-পরিচালন ব্যাপারে অস্ববিধা সৃষ্টি স্বাভাবিক। আমরা আশা করিব, আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে বকেয়া চাঁদা পাঠাইয়া দিয়া গ্রাহকগণ আমাদের আগামী চলার পথ স্পষ্ট করিবেন। ইতি— পরিচালক : প্রবর্তক।

একটি একাক্ষ নাটিকা

ইন্দু গুপ্ত

[সময় : বিংশ শতাব্দী : ইতিহাসের এক বিশ্বয়কর
সঙ্কীর্ণ। স্থান : কলকাতা। পাত্র পাত্রী : তুমি,
আমি ও সে।]

পৃথিবীতে নতুন যুগ আসছে। বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের
আগুন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ঘরে ঘরে হাহাকার।
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটে প্রতীতি
মাহুয় অতিষ্ঠ।

তুমি, আমি ও সে আর পাঁচজনের মতো বিশ্বাস
অবিশ্বাসের দু' নৌকা পা দিয়ে হাল ছেড়ে বসে আছি।

তুমি এলে। পরণে ছেঁড়া লুঙ্গি। হাতে রেশমের
ব্যাগ ও তেলের টিন। গায়ে আধময়লা গেঞ্জি। পায়ের
স্যাণ্ডেল। বিবর্ণ, বাতিল।

আমি একমনে বসে ধবরের কাগজ পড়ছি। যে
ঘরে বসেছি সে ঘরের লজ্জাবস্ত্র ছিঁড়ে গেছে সেই কবে।
চারদিকে হিংস্র অস্তর নখাঘাতের চিহ্ন। সেই পরিবেশে
সে দিব্য গলায় গাইছে—“তুমি ধন্ত ধন্ত হে—”

একদিকে অসাধু ব্যবসায়ীদের মাষ্টার প্ল্যান, অল্পদিকে
সম্মানের অধিকারী রাষ্ট্রনেতাদের হামবড়াই ভাব।
স্বাধীন সলিলে সবাইকে ডুবিয়ে মারার আশ্রয় চেষ্টা।

নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অভিযান সাফল্য সম্বন্ধে কারো
মনে সন্দেহ নেই। তবু সংশয় আছে—

দুর্নীতি দমন হোক বা না হোক উদ্বেজিত কণ্ঠের
ঘোষণা দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা যায় কিনা এ সম্বন্ধে প্রচুর
গবেষণা চলছে।

ঠিক এইরকম সময়ে তুমি এলে, এসে বসে, দশটা
টাকা ধার দিতে পার ?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। দশটা পয়সা নেই—
দশটা টাকা।

—আজ তিনদিন অফিস যাই নি। কারণ
অনিশ্চিত। উদ্ভেলকের বেদনা যে কত গভীর সে
কথা আর কটা লোকে বোঝে। মহুয়া ও মর্ষাদাবোধ
মাহুয়কে বাঁচতে দিতে চায়না। তবু বাঁচতে যখন
হবেই—তখন অনাবশ্যক ওসব……না থাক, অহেতুক
কথার অপব্যয় ভাল নয়।

হেসে বললাম, হঠাৎ টাকার দরকার হলো
যে বড়।

তুমি ভূতাবিষ্টের মতো ক্যাল ক্যাল করে
চাইলে—

অফিসে এখন বিশেষ হাওয়া বইছে। নতুন ম্যানেজার
নিযুক্ত হয়েছেন। ব্যয়ের অংক বেড়ে চলেছে। দিগন্ত
বিস্তৃত বনভূমিকে রাঙিয়ে শিমূল বৃক্ষের সগর্ভ অবস্থান
সর্বত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেখানে সেখানে গন্ধরাজের
ঝাড় থাকলো বা না থাকলো কিইবা এসে যায়।

সামান্য বেতনের কর্মচারী আমি। আমি থাকবো
কি থাকবো না তার নিশ্চয়তা নিয়ে কেইবা মাথা ঘামাই।
তোমাকে বিমুগ্ধ করার ইচ্ছা নেই। তবু তা গোপন
রাখতে হোল।

তুমি বসে, ঘরে আগুন লেগেছে। কলে জল নেই
যে নেভাব। চাল ডাল ছুন তেল সবই উধাও। মাছ
সাঁতার কাটছে কিন্তু কোন পুকুরে বা নদীতে নয়,
ডালায়—যেখানে জলজ্যান্ত মাহুয় সর্ব্বেষে ফুল দেখে।

বেতন পাই মাসে দেড়শ টাকা। ঘর ভাড়া দিতে
হয় পঞ্চাশ। ট্রাম বাসে বাছড় ঝোলা হয়ে অফিস
যাওয়ার আর ফিরে আসার ব্যয় তার পনের। অষ্ট ঘণ্টা
অষ্টম প্রহর করে বাড়ী কিরতে হয় তাই যৎসামান্য কিছু
মুখে দিতেই উড়ে যায় মাসে পনের। ধুঁকীর স্কুলের
বেতন দশ। অফিসে খোপছুরত্ব হয়ে না গেলেই নয়
তাই লণ্ডীকে দিতে হয় পনের। ঠিকে ঝি একটি আছেন
তিনি নেন দশ। কাঠ কয়লা এবং গয়লা কুড়ি। আরো
টুকিটাকি এবং গিন্নীর প্রসাধনের সামগ্রী মিলিয়ে
যখন হিসাব মেলাতে বসি তখন দেখি দেড়শ কাঁক হয়ে
গেছে বিরাট এক কাঁক দিয়ে। অতএব এখন তিনটি
প্রাণীর প্রাণধারণের সামগ্রী তা পাই কোথায়। ধার
করতে ছুটি। কিন্তু দেয় কে। যারা দেয় তারা হয়ত
জানেন না থাকলেও ফেরৎ দেওয়ার সম্ভাবনা আমার নেই।

আমি জানি সবই। তাই চুপ করেই থাকি।
সে এগিয়ে আসে। বলে, তুমি ধন্ত ধন্ত হে—

কিছুদিন পরের ঘটনা :
তুমি আত্মহত্যা করলে। সে পাগল হয়ে গেল।
আর আমি—

শীঘ্র সম্মেলনে তখন শাস্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে
গেছে। নিউক্লিয়ার বোমা ফাটছে ওখানে। লোক
মরছে হাজার হাজার।

প্রবর্তক পাবলিশাস
কলিকাতা-১২

আলোচনা করেন। অমুঠানে তাঁর নিরামর দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। কবিতা, গান, উপভাস, নাটক প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের সর্ব বিভাগেই অরেশচন্দ্রের অবদান প্রচুর, কিন্তু দ্বঃধের বিবর বাঙালীর নিকট তিনি যথাযোগ্য সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করেন নাই, সম্ভবতঃ ঢাক পিটাইবার লোক ও পত্র-পত্রিকার প্রচারভাবে।

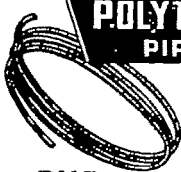
নরেন্দ্রনাথ বসু :

ইবীন্দ্রনাথ ও খাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞাত রবিবাসবের সম্পাদক ও কিছুকালের সর্বাধক্ষ্য নরেন্দ্রনাথ বসু গত ১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৪ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭২ বৎসর বয়স হইরাছিল। সংবাদটি পরিবেশনে অসমতর্ক বিলম্বের ক্ষম আমরা দুঃখিত। প্রবর্তকের তিনি চিরস্থায় ছিলেন। একাল নরেন্দ্রনাথের মত সজ্জন, সরল প্রাণ, অস্বাভিক, অজ্ঞাতশত্রু ও মজলিদী দ্রাহু্য বিরল। তাঁর সমসাময়িক কালে কবি, সাহিত্যিক, মনীষী প্রায় সবারই সঙ্গে তাঁর চির জীবিত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। নরেন্দ্রনাথ এক সময়ে 'বীণাবী' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং নানা বিষয়ে

করেকথানি গ্রহণ লিখিয়াছেন। 'প্রবর্তক'-হইতে প্রকাশিত সঙ্গের সেনের আত্মজীবনী গ্রন্থের অনুলেখক হিসাবে তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

দুর্গাপুর কংগ্রেস শিবিরে সজ্জোপাসনা :

বিগত ৬ই জামুয়ারী শ্রীশ্রীসত্যজগৎজীৱ : ৮০তম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রবর্তক সজ্জের তত্ত্ব সন্তান ও সজ্জের প্রিয় শিশু শ্রীসৌবীর বোধ বিগত দুর্গাপুর কংগ্রেসে পুলিশের কর্তব্যরত থাকায় কেন্দ্র-সজ্জ ঐ শুভদিনে উপস্থিত হইতে না পারায়, দুর্গাপুরের হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগীয় নব নির্মিত এক বাসায় শ্রীজগৎ জন্মতিথি পালনের আয়োজন করেন। পুষ্পমালায়শোভিত শ্রীজগৎ চিত্রপটের সামনে ভোর ৪টা হইতে উপাসনা, আধার, গুরুবাণী পাঠ, পূজা, ভোগারতি, ভজন, সঙ্গীত প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক আঙ্গিক সবই যথাযথ পালিত হয়। গুণ-চন্দন-সুগন্ধিত সনিষ্ঠ আবহাওয়ার এই অনুষ্ঠান উপস্থিত সবাইকে পরিতৃপ্ত করে এবং আনন্দ দান করে। অনুষ্ঠানান্তে সকলকেই প্রদান বিতরণ করা হয়। শ্রীযোবের সহকর্মীদের অনেকেই এই অনুষ্ঠানে ভক্তি আদ্রুত অন্তরে বোণদান ও প্রদান গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত লাভ করেন।



**POLYTHENE
PIPES**

- Light Flexible
- Non-Corrosive
- Acid Proof

P.V.C. PIPES.



**"SANKHA"
COMBS**

- Durable
- Comfortable
- Economic

Purima TOOTH BRUSH

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

ESTD. 1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO-10813

। শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ.

পি. আর. এস. ।

শ্রদ্ধার্থ তত্ত্ব ৫-০০ শ্রদ্ধা তত্ত্ব ১৫-০০

জাতিভেদ ১ বেদ ও

কোরানের সাদৃশ্য ১

। পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ।

শ্রীশ্রীনামামৃত ২-২৫

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০

। কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য ।

পরার্থকথা ২-২৫

প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

শ্রীমদ্রহাপ্রভু বলেছেন—

“এই তো কহিঁলু ভক্তির দিগ্‌দরশন
ইহার স্বরূপ মনে করহ ভাবন।”

আত্মদান করুন

মহাপ্রভুর মতামতাদ্বী গীতার
ভক্তি ব্যাখ্যা

ভক্তিতারতী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনের

গীতা-মাধুরী—১২.০০ ও

জীবন-মৃত্যুর সঙ্কীর্ণ—৩.০০

প্রকাশক : শ্রীরাইমোহন আচার্য্য

৭ ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৩

উৎসব অনুষ্ঠানে—

ইন্দ্র'র সন্দেশ

অপরিহার্য্য!

৮৬, আমহার্ট স্ট্রীট কলি: ২

ফোন-৩৫-১৩৮৩

৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২

ফোন-৩৪-২৫৩৩

প্রবর্তক বিভাগীঠের পারিতোষিক বিতরণোৎসব :

গত ৩০শে জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্নে প্রবর্তক উচ্চতর মাধ্যমিক বিভাগের (মহিলা বিভাগ, বেলঘরিয়া) বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ও পারিতোষিক বিতরণ করেন শ্রীযুক্ত মিলবোর্গ কোম্পানীর বিভাগসাহী ও ক্রীড়ামুখ্য সঞ্চালিকা শ্রীঅরুণকুমার বসু। নির্ণায়মান বিভাগীঠের নানারূপ অব্যবহার মধ্যেও বর্ধাসম্ভব হৃৎকলার সঙ্গে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। বালিকাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিভাগের সংলগ্ন মাঠে মধ্যাহ্ন স্নান ও সন্ধ্যায় শেষ হয়। উদ্বোধন পরিবেশে এই বিভাগবহর সেবামূলক পরিচালনার জন্য সভাপতি শ্রী বসু প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা মৌলিক ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকা প্রশংসা করেন। সভাপতিব সহিত শ্রীবালাদেব দে সরকার ও প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীরাধাবরণ চৌধুরী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় :

গত ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৪, প্রবীণ শ্রীযুক্তায়া সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিউ আলিপুরহাট আবাসে পরিণত ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। বয়সের ভাব তাঁর সেবা ও শ্রুতিকে মলিন করিতে পারে নাই। গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান, কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সকল লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় ৫০খানি গল্প-উপন্যাসেব রচয়িতা। মানুষ হিসাবেও তিনি অত্যন্ত বসিক ও অমায়িক ছিলেন। আত্মপ্রচারণাবিশেষ ছিলেন বলিয়া বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রাপ্য স্বীকৃতি তিনি পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এ বৎসর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অবস্থায় তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য করিয়া সম্মানিত করিয়াছিল।

ছন্দগীতিকার বার্ষিক সম্মানবর্ধন উৎসব :

বিগত ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত সঙ্গীত ও নৃত্যশিক্ষারতন ছন্দ-গীতিকার চতুর্দশ বার্ষিক সম্মানবর্ধন ও পুরস্কার বিতরণী উৎসব সাড়ঘরে

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মাননীয় রাজ্যশিক্ষামন্ত্রী শ্রীসৌরভমোহন মিত্র, পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল শ্রীউপেন্দ্র মুখার্জি ও জিলা স্কুল পবিত্রীক শ্রীঅমিতা দাশগুপ্ত যথাক্রমে প্রধান অতিথি, উদ্বোধক ও সভানেত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা দাশগুপ্ত কৃতি ছাত্রীদেব “সঙ্গীতজ্ঞী” “স্ববিনীতি” ও “ছন্দ” ডিপ্লোমা এবং শ্রীবিভা মুখার্জি পুরস্কার ও ‘সুশীলা স্মৃতিপদক’ বিতরণ করেন। অধ্যাপক শ্রীমদীপোপাল মিত্র, নৃত্যকলানিধি মহাশয়ের নৃত্য ও হিমময় রায়চৌধুরী সঙ্গীতপরিচালনা ছাত্রীজন কবিগুরু “চিত্রাঙ্গদা” নৃত্যনাট্য সাক্ষ্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। সর্বাদ্বহুলর অভিনয় ও সঙ্গীত ছন্দগীতিকার পূর্বতন সুনাম অক্ষর রাখিয়াছে। আমরা শিক্ষার-তনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

পরলোকে নেপালচন্দ্র বসু :

গত ৫ই অগ্রহায়ণ নব বারাকপুত্র (পূর্বে নড়াইল-বশোহর নিবাসী) শ্রীনেপালচন্দ্র বসু সজ্ঞানে প্রায় দুই শতাব্দী ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হইয়াছিল ৮৬ বৎসর। মৃত্যু পর্যান্ত তিনি নীরোগ কর্মক্ষম ছিলেন। অমায়িক অভিজ্ঞত সঙ্গীত ও স্বাধীন ছিলেন নেপালচন্দ্র। ৮ পুত্র, দুই কন্যা ও বহু নাতি-নাতিনীপূর্ণ এক বৃহৎ একাদমবর্তী পরিবার তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। সম্ভান কয়টি সকলেই শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠ ও পিতৃভক্ত। এই বংশ-পরিবারের মত বৃহৎ অথচ সম্ভাব্য একাদমবর্তী পরিবার আজিকার দিনে কল্পনা। পূর্ণ এক মান অশোচ পালনাশ্রে গত ৬ই পৌষ মহাদমারোহে তাঁর আত্মশ্রদ্ধিক্রিয়া বিনম্র নিষ্ঠায় সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ সন্ধ্যায় বিগত :আজীব তৃত্যার্থে প্রবর্তক সজ্জের স্থানীয় সন্তা-সন্তাদের সমবেত উপাসনা-অনুষ্ঠান আত্মবাসদের বৈশিষ্ট্য ছিল এবং ইহা উপস্থিত সকলকেই আকৃষ্ট করে।

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্ম

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

৩

সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল আলোয়ান, ও হোসিয়ারী পোষাক বিক্রেতা
রামকানাই'সামিনী'রঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা। ফোন : ৩৫-২৩০৩

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধাবরণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধাবরণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পবিত্রীকৃত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাক্‌স্টোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণবায় কর্তৃক মুদ্রিত।

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্বধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সস্তার

সস্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্মল : পিরামিড : অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

ব্রাহ্মনস্বামী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

Gram. : "MASHINARIS"

Office : 22-5275
22-7372

S. K. Bhattacharjee & Co.

(Electrical & Mechanical Engineers)

138, Canning Street,

Calcutta-1 (1st floor)

For all sorts of Motors, Pumping sets, Starter Switches, Alternators and spare parts for Blackstone and Lister Diesel Engines.

Proprietor's Residence : 47-2915

একমাত্র নিত্যমোক্ষ

বয়েল

সর্বাপেক্ষাকম পাক বিশিষ্ট
ফ্রুড অয়েল ইঞ্জিন

একমাত্র পরিবেশক

মিলবোর্গ এন্ড কোং

২৪, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা-১

স্বাভিকায় মৃত

দুর্ভাগ্যে সজীবনা

জবে সুখা

বাতে মন্ত্রের ন্যায় কার্য করে

প্রতিষেধক প্রথম প্রস্তুতকারক

ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্মাসী লি.

কলিকাতা

অভিজাত কোম-তৈল
নগেন্দ্রনাথের
হিমকল্যাণ
বড়-মামারী-ছোট
তিন সাইজে
সর্বত্র পাওয়া যায়



হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্
প্রা. সি. ০ কলি-৪

UPCO

॥ সত্যগুরু শ্রীমতিলাল ॥

বেদান্তদর্শন (৬৫০ পৃঃ) ৭-৫০; গীতা
(২ খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃঃ) প্রতি খণ্ড ৫,-
জীবনসঙ্গিনী (প্রায় ৬০০ পৃঃ) ৫,-
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২-৭৫।

শ্রীরাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ
উপনিষদে সাধন রহস্য ৩-৫০, গোরক্ষ-
বালী ১ম ১-৫০, ২য় ৩-৫০ পঃ।
মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা ৩-০০,
নাথযোগী তত্ত্ব-৭৫ পঃ।

রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪-০০

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের আলোকে অরবিন্দ
দর্শনের গূঢ় রহস্যের অঙ্গকার যবনিকা
উন্মোচিত হয়েছে। 'যুগান্তর'-এর অভিমত :
“বইখানি শুধু পাঠযোগ্য নয়, বিভিন্ন
পাঠচক্রে পাঠ করিয়া শুনাইবার উপযোগী।”

প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক; সম্পূর্ণ; নির্ভরযোগ্য
বুক বাইন্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয়
বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২

ডি. রতন ঙ্গ কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফি. ২২১, কণ্ঠওয়ালিস ট্রাট, কলি. ৬
ফোন: ৩৪- ৩৭১১

PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD.

Gram : 'PRABARTAK'

Mg. Agents—PRABARTAK TRUST

Phone : 34-3088 & 89

IMPORT :
Machineries
Papers, Boards,
Synthetic Resin
Milk products
Caseln and Chemicals
and Sundry Goods.

**Expert Buying Service available
at a very Moderate Charge.**

EXPORT :
Jute Manufactures
Shellac, Kapok,
Myrobalan,
Cattle foods.
Spices, Rosin and
other India Products

61, Bepinbehari Ganguly Street

::

Calcutta-12

Codes used : A. B. C. 5th. 6th. & 7th. Edition; Bentley's Complete
Phrase, Western Union, Universal and 5-Letter, Acme
and Com. Phrase with Supplement; Schofields 3-Letter.

সূচীপত্র. প্রবন্ধ

ফাল্গুন : ১৩৭১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশান্তি	৪০১
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	৪০২
ভারতের ভাষা সমস্যা	প্রবন্ধ	৪০৩
মুক্তির মোহ	গল্প	৪০৭
হিমালয়-কন্ঠা ভূটান	প্রবন্ধ	৪১০
ভারতের রাষ্ট্রভাষা	প্রবন্ধ	৪১৩
শিল্পীমণি	উপন্যাস	৪১৭
ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর মহাসিদ্ধি	আলেখ্য	৪২০
ভারতের বেকার সমস্যা	আলোচনা	৪২২
মৌন মিছিল	নিবন্ধ	৪২৩
সংহতির অপমৃত্যু	প্রবন্ধ	৪২৫
সম্ভবগুরু জম্মোৎসব	কবিতা	৪২৬
নিউ দিল্লীর নেপথ্যে	আলোচনা	৪২৭
সম্পাদকীয়	...	৪২৯
স্বীকৃতি	চিত্র	৪৩২
সাময়িকী	...	৪৩৩



MRITASANJIBANI SURA

GIVES LIFE TO THE DYING. REVITALISES THE CONVALESCENT AND THE LADIES AFTER CHILD BIRTH.

Ashyaksha Mathur Balu's
SAKTI OUSHADHALAYA DACCA Private LTD.

52/1 BEADON STREET, CALCUTTA-8.

**আহারের পর
দিনে দু'বার..**

**দু'বার খাত্তে
প্রাণ্য লীড়ের
শ্রেষ্ঠ উপায়**

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান



স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতা • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নবিশ চন্দ্র
ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-
আচার্য, ৩৬, গোয়া ল পা ডা
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লন্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ১৮ ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-
ত্রাকারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-
ত্রাকারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি,
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করিতে অত্যধিক
ফলপ্রসূ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও
বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।



৪৯, বর্ষ ১১শ সংখ্যা

প্রবন্ধ

ফাল্গুন, ১৩৭১

জীবনের আলো

পরী ও অপরা ভেদে দ্বিবিধ সৃষ্টি জগতে বিদ্যমান আছে। সত্য, অহিংসা, শম-দমাদির গুণ লইয়া পরী জগৎ; আর দম্ভ, দর্প, অভিমান, অহংকার প্রভৃতি গুণ সৃষ্টি অপরা। এইরূপ দ্বিবিধ সৃষ্টি-চাতুর্য্য লইয়া এই জগতে দ্বিবিধ লীলা চলিয়াছে। এই দুইটি ধারায় জগতের কাজ অবধারিত হওয়ায়, সুখের সহিত দুঃখের মিশ্রণ, শাস্তির সহিত অশাস্তির সংযোগ আমরা লক্ষ্য করি। পাশাপাশিই দুইটি শ্রোত বিদ্যমান থাকায়, যখন পরী শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করি, তখনই সেখানে যুগপৎ অপরাধ খেলাও সন্দর্শন করিয়া বিন্ময়ে বিম্বল হই। কিন্তু জন্ম-জন্ম কৰ্ম্মবশে অপরাধ খেলাও পরায় পরিণত হয়। আজ বাহার মনে দম্ভ, সংশয়, অভিমান, দর্প দেখা দেয়—কাল আবার তাহাকে দেখা যায় নূতন মুষ্টিতে। এই জন্ত পরী ও অপরাধ লীলা আমরা বৃত্তিতে অক্ষম হই আর সেই জন্তই পরায় সহিত অপরাধকেও সঙ্গ লইয়া আমাদের ছুটিতে হয়। বলিতে হয় ত্রিনিত্যানন্দের ভাষায়—“মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।” দেখা যায়, জগাই মাধাই—এর মত মহা পাতকীও কালে সংমাহুষে পরিণত হয়। জাতির কল্যাণ কামনায় এই হেতু অপরাধ সহিত একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্গভাবে চলিতে নাই। অপরাধ শক্তির খেলা দেখিয়া অতীতের মহাপুরুষগণ এই কারণেই হাত গুটান নাই। পরন্তু অপরাধকে পরায় ক্ষেত্রে টানিয়া তোলার জাহারা চেষ্টা করিয়াছেন। অবশু অপরাধ বীজ লইয়া বাহার জন্ম, সে অপরাধই হইবে—তথাপি কৰ্ম্ম সংস্কারে আমরা প্রতিদিনই অপরাধকে পরায় পরিণত হইতে দেখিতেছি। এই জন্ত পরী ও অপরাধ উভয়কে লইয়াই আমাদের পূর্ব ঋণিগণ মন্তোচ্চারণ করিয়াছেন—“আমরা দেবতার জাতি, দেবতাই হইব।” ইহাতে কোন যুক্তিদোষ স্পর্শ করে না। কৰ্ম্ম সংস্কার বশতঃ পরায় বীর্য্য কাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা যখন জানিবার উপায় নাই, তখন পরী ও অপরাধ ভেদে সকল মাহুষই দেবতা হউক—এ কথা মহাপুরুষগণ বলিতে বাধ্য হন। জন্মজন্মান্তরের কৰ্ম্ম সংস্কার মাহুষের গতি নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়াই পরায় বীজ লইয়া বাহার জন্ম, তাহাকেও অপরাধ ভায় কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য হইতে হয়। জগাই মাধাই—এর দৃষ্টান্তে তাহা সুপরিষ্কৃত। তাইতো যুগে যুগে মহাপুরুষগণ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, আত্ম-সাধনার বলে আচ্ছন্ন পরী প্রকৃতির মাহুষকে উদ্ধার করিবার জন্ত। অল্পাধম অপরাধ কোনদিন পরী হইবে না। সে অপরাধই থাকিবে। বর্ত্তমান জগৎ ইহাদের জাণের উপায় নাই বলিয়া চমকিয়া উঠিবেন। কিন্তু শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে হইলে, এই কথাই বলিতে হইবে যে, সৃষ্টির আদিতে যে প্রকৃতি লইয়া বাহার জন্ম, সে তাহাই হয়। পরী কোনদিন অপরাধ হয় না। অপরাধ জগৎ কোনদিন পরী প্রকৃতির জীবন লইয়া আসে না। এই দ্বিবা ও আত্মরিক জীবনের দ্বন্দ্ব চিরদিন চলিয়াছে, চিরদিন চলিবে। (পুরাতন ‘নবঙ্গ’ হইতে)

সঙ্কল্প শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । অষ্টত্রিংশৎ সূক্তং ।) তৃতীয়া ঋক্

(মজ্জস্কর শ্রীমন্তিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

ক বঃ সূমা নব্যাংসি মরুতঃ ক সুবিতা ।

কো ত বিশ্বানি সৌভগা ॥ ৩ ॥

অর্থ—“মরুত” (হে মরুদেবগণ) “বঃ” (আপনাদের) “নব্যাংসি” (নবতর) “সূমা” (ধন বা ঐশ্বর্য সকল) “ক” (কোথায়) “সুবিতা” (শোভন বা সুপ্রাপ্য ধন) “ক” (কোথায়) “ক” ইতি (কোথায়) “বিশ্বানি” (বিশ্বের সকল) “সৌভগা” (সৌভাগ্য) ॥ ৩ ॥

সরলার্থ—হে মরুদেবগণ! আপনাদের নবতর ঐশ্বর্য সকল কোথায়? শোভন বা সুপ্রাপ্য ধনই বা কোথায়? বিশ্বের সকল সৌভাগ্যই বা কোথায় নিহিত?

বিশদার্থ—স্থূল পৃথিবীর বুকে যে সৃষ্টিসম্ভার ধরে ধরে স্তুটিয়া উঠে কারণ জগতে সে সমৃদ্ধি কোথায় লুকান আছে ঋষি কণ্ঠে সেই অমুসন্ধিৎসাই এই ঋকে স্ফুটতর হইয়াছে।

সৃষ্টির স্থূল রূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। দৃক্‌সিদ্ধ আর্ষ্য ঋষিগণের কাছে সূক্ষ্ম রূপও অপ্রত্যক্ষ নয়—তাই অমুসন্ধেয় বিষয় কেবল কারণরূপের। সেই কারণের তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য সূক্ষ্ম দেহধারী মরুদেবগণের নিকট ঋষির জিজ্ঞাসা—হে মরুতঃ, বঃ নব্যাংসি সূমা ক? ক সুবিতা? ক ইতি বিশ্বানি সৌভগা?

হে মরুদেবগণ! আপনারা পৃথিবীর বুকে যে নবতর “সূমা” সকল সৃষ্টি করেন তাহার মূল উৎস কোথায়? কোথায় সেই “সুবিতা”? কোথায় বা বিশ্বের “সৌভগা”?

‘সূমা’, ‘সুবিতা’ ও ‘সৌভগা’ তিনটি শব্দই ধনবাচী। আচার্য্য সায়ন ধনার্থক এই তিনটি শব্দের তিন প্রকার অর্থ সম্মিলিত করিয়াছেন। তিনি বলেন—‘সূমা’ অর্থে প্রজা পশুরূপানি ধনানি। তাঁর যুক্তি—ঋতস্বত্রে আছে—প্রজা বৈ পশবঃ সূমমিতি। স্থূল পৃথিবীর বুকে প্রজা ও পশু সকল অল্পতম শ্রেষ্ঠ ধন-সম্পদ বৈ কি! আর ‘সুবিতা’ বলিতে তিনি মনে করেন—শোভনানি প্রাপ্যানি মণিমুক্তাদীনি। আপোময় পৃথিবীর সমুদ্রগর্ভ হইতে সুপ্রাপ্য মণিমুক্তাদি, স্থূল ঐশ্বর্যের যে শোভন রূপ, ইহা কে অস্বীকার করিবে? সমুদ্রই এই মণিমুক্তাদির জন্মদাতা। আর সমুদ্রের জন্মদাতা ঐ সূক্ষ্ম দেহধারী মরুদেবগণ—বাহাদেবরাই আলোড়ন ও বিলোড়নে অন্তরীক্ষ লোকে সৃষ্টি হয় ‘বিশ্বমেধের’, আবার তাহাদেরই বর্ষণে নিম্নোপে বিন্ধমেঘ দ্বারা বর্ষণে আপতিত হয় পৃথিবীর বুকে, সৃষ্টি হয় রত্নগর্ভা মহাসমুদ্রের। মাহুষ ভোগ করে মহৈশ্বর্য। সৃষ্টির স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থই রূপই আর্ষ্য দৃষ্টিতে প্রতীয়মান—তাই ঋষির জিজ্ঞাসা কোথায় এর কারণ রূপ? সর্বশেষ ‘সৌভগা’ বলিতে আচার্য্যদেব বলেন—সৌভাগ্যরূপানি গজাশ্বাদীনি। প্রজা, পশু, মণিমুক্তাদি ধনরত্ন গজ, অশ্ব সব কিছুই পার্থিব ঐশ্বর্যের নিদর্শন। ঋষির অমুসন্ধিৎসা কোথায় নিখিল বিশ্বের সকল সৌভাগ্যের মূলীভূত কারণ?



ভারতের ভাষা-সমস্যা

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম. এ., (কলিঃ) এইচ. ডিপ্. এড্. (ডাবলিন)

অসংখ্য ভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষ। এত ভাষায় পৃথিবীর কোন দেশের লোকই কথা কয় না। এক অংশের ভাষা আর এক অংশে দুর্বোধ্য। এই ছিল ভারতের চিরদিনের অবস্থা। মুসলমান যুগে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিল। সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে চলিত হল উর্দু ভাষা। এই ভাষা শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের এক যোগসূত্র স্থাপন করল। তারপর ইংরেজ রাজত্বে উর্দুর স্থান অধিকার করল ইংরেজী ভাষা এবং তা শুধু উত্তর ভারতবর্ষে সীমিত থাকল না—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্রই শিক্ষিত লোকের মধ্যে এ ভাষার চলন হল। শুধু ভারতবর্ষ বলি কেন? ব্রহ্ম ও সিংহল দেশেও ইংরেজী কায়ম হল। যে ইংরেজী ভাষা দু'শ বছর ধরে সমগ্র ভারতে ভাবের আদান-প্রদানের এক মিলন সেতু গড়ে তুলেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় যা হল অপরিহার্য, তা হঠাৎ ১৯৬৫ সালের ২৬শে জাভুয়ারীতে হয়ে পড়ল অপাওক্তেয়—আর তার স্থান অধিকার করল একটি প্রান্তিক ভাষা—হিন্দী। চৌদ্দটি প্রধান প্রধান ভাষা হয়ে পড়ল কোণঠাসা। যদিও এই চৌদ্দটির মধ্যে দুই তিনটি ভাষা অন্তত হিন্দীর চেয়ে সর্বাংশে উন্নত। এখন হতে সর্বভারতীয় প্রতियোগিতা-মূলক পরীক্ষাগুলিও হিন্দী অথবা ইংরাজীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে—অন্ত কোন ভারতীয় ভাষা সেখানে পাস্তা পাবে না। একটি মাত্র ঘোষণায় হিন্দী বসল প্রধান মহাবীর সিংহাসনে। অষ্ট সংবিধানে ১৪টি প্রধান প্রধান ভাষা জাতীয় মর্যাদা লাভ করেছে এবং এইসব ভাষায় লেখা পুস্তকও নিয়মিতভাবে প্রস্তুত পাচ্ছে। এইসব ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীরা সংগত কারণে আশা করতে পারে, তারাও নিজ নিজ মাতৃভাষায় শুধু সর্বোচ্চ শিক্ষা পাবে না, সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলিতেও আপন আপন ভাষা ব্যবহার করতে পারবে; কিন্তু হল ঠিক উল্টা। হিন্দীভাষী রাজ্যগুলি হিন্দী প্রচারে এমন উদগ্র হয়ে পড়েছেন যে, সংবিধানের বাধানিষেধ না মেনে অহিন্দীভাষীরা যাতে হিন্দী ছাড়া আর অন্য কোন

ভাষায় শিক্ষা না পায় তার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে অন্ত্রবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে বাঙালীদের; কারণ তাঁরা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন এবং তাঁদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহও অত্যন্ত প্রবল। বাংলা, তামিল প্রভৃতি দু'তিনটি ভাষা হিন্দী অপেক্ষা বহু গুণে, বাচনে ও প্রকাশভঙ্গিতে সমৃদ্ধ হলেও, তারা রাষ্ট্রভাষার সম্মান পেল না; কারণ ৪৫ কোটি লোকের দেশের মধ্যে হিন্দীভাষীরা বলেন, তাঁরা নাকি সাড়ে তের কোটি এবং সেই হিসাবে তাঁরা হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই যুক্তির বলেই মাত্র একটি বেশী ভোটের জোরে (তাও সেটি সভাপতির বিশেষ ভোট) হিন্দী রাষ্ট্রভাষার আসনে অধিষ্ঠিত হল।

হিন্দীওয়ালাদের এই যে সাড়ে তের কোটি সংখ্যার দাবী; এটিও সম্পূর্ণ অবাস্তব, কাল্পনিক। প্রকৃতপক্ষে সাড়ে তের কোটি লোক হিন্দী বলেন না। ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অকুমার সেন প্রভৃতি বলেন, হিন্দীর দাবীদার হচ্ছে উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ আর বিহার; কিন্তু মজার ব্যাপার হল এরা কেউই পুরাপুরি হিন্দীভাষী নয়। বিহারের মুখ্য ভাষা তিনটি—মৈথিলী, ভোজপুরিয়া, মগহী (এদের সংখ্যা হল দেড় কোটি; সেনসাসে এদের হিন্দীভাষী বলে চুপিসারে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে)। এর কোনটিই হিন্দী নয়। উত্তর প্রদেশের মুখ্য ভাষা ছয়টি—অবোধী, কনৌজী, ব্রজভাষা, কথ্য হিন্দুস্থানী, বগার এবং উর্দু; আর মধ্য প্রদেশের মুখ্য ভাষা হচ্ছে—বাঘেলি, ছত্তিশগড়ী, বুন্দেলী এবং আদিবাসীদের ভাষা। এদের কোনটাই হিন্দী নয়, তবে হিন্দীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে। এই বারটি ভাষাভাষী সাড়ে তের কোটি লোক হিন্দীভাষী নয়, তবে হিন্দী এদের কাছে সহজবোধ্য। রাজনৈতিক কারসাজির ফলে এই বারটি ভাষাকে হিন্দী বলে চালিয়ে দিয়ে হিন্দীর দলপুষ্টি করা হয়েছে এবং তার ফলে কৃত্রিম উপায়ে দেখান হয়েছে হিন্দীভাষীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই তঞ্চকতা সাধারণ লোকে

অবগত নয়, তাই তারা মনে করে সত্যি বৃষ্টি হিন্দী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা। ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একজন সোভিয়েট পণ্ডিতের মত উদ্ধার করে বলেছেন, বড় জোর শতকরা ২৫ জনের ভাষা হিন্দী হতে পারে, ৪২ জনের নয়, যা হিন্দীওয়ালারা দাবী করে থাকেন।

একটি মাত্র ভোটের আধিক্য বা সামান্য মাত্র সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জন্তে, যে কারণেই হোক হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত হওয়ায় দেশের ঐক্য ও সংহতি যার উপর কেন্দ্রীয় সরকার এত জোর দিচ্ছেন, তা বিপন্ন হবার যোগাড় হয়েছে। সমগ্র দক্ষিণ ভারতবর্ষ জলে উঠেছে—এ আশুনা দাবানলের মত অগ্নিস্রাব রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এর পরিণতি কোথায় ভাবতে আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠছি। এই ভাষা সমস্যার অচিরে সমাধান না হলে, সমস্ত জাতিকে এক মন, এক প্রাণ করে গড়ে তোলা যাবে না। কিন্তু হিন্দী-ওয়ালাদের এসব চিন্তা নেই; তারা যেমন তেমন করে হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষা করে তুলতে চায়—তাতে দেশ রসাতলে যাক, সংহতি চূর্ণ হোক ক্ষতি নেই। তাই দেখা যাচ্ছে আজ ক'বছর হল বিহার বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করেছেন, অহিন্দীভাষীদেরও স্কুল ফাইনাল ও প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তর হিন্দী ভাষায় লিখতে হবে। এই অশোভন ব্যস্ততায় লোকে সন্দেহ করছে, সমগ্র ভারতের উপর হিন্দীর প্রভুত্ব চাপিয়ে দেবার জন্তেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভাষা ধর্মের মত মানুষের কাছে অতি পবিত্র বস্তু ও গর্বের বিষয় এবং ধর্মের জন্তে মানুষ যেমন আত্মত্যাগে কুণ্ঠিত হয় না, ভাষার জন্তেও মানুষ তেমনি সর্বস্ব ত্যাগে কাতর হবে না। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীদের মনে রাখা উচিত, তাঁরা হিন্দী ভাষাকে যেমন ভালবাসেন, অহিন্দী-ভাষীরাও তেমনি তাদের নিজ নিজ ভাষাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে। হিন্দীর সর্বভারতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবার যোগ্যতা আছে কিনা, সে প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েই বলতে চাই, হিন্দীকে যেন জোর করে সমস্ত রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে না দেওয়া হয়। সবগুলি রাজ্য

যদি স্বেচ্ছায় হিন্দীকে বরণ করে নেয়, তা হলে অবশ্য আপত্তি করবার কিছু নেই।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার তুলনা করলে নিতান্ত অসংগত হবে না। ভারতেরই মত বিশাল সোভিয়েট রাষ্ট্র বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্ম ও জাতির দেশ। কিন্তু সে দেশেও দেখতে পাই, কারণ কোন অসুবিধা না ঘটলে ভাষা সমস্যার অতি সহজ ও সুন্দরভাবে সমাধান করা হয়েছে। রাশিয়ার যদি সম্ভব হয়, আমাদের দেশেই বা তাহলে সম্ভব হবে না কেন? এই প্রবন্ধে সোভিয়েট রাশিয়া কিভাবে ভাষা সমস্যার সমাধান করেছে এবং তার সেই সমদর্শী ও কল্যাণময় নীতি আমাদের দেশেও প্রয়োগ করা যায় কিনা, তারই আলোচনা করব। সোভিয়েট ইউনিয়ন হল কুড়ি কোটি নব্বই লক্ষ লোকের দেশ, আর সেখানে বাস করে এক শ'র উপর বিভিন্ন জাতির লোক, আর ভাষাও তাদের বিভিন্ন। সোভিয়েট সরকার এইসব জাতি ও উপজাতীয় লোকদের ভাষা—তা সে যতই অসুন্দর হোক না কেন—দমন করবার চেষ্টা তো করেনই নি, বরং এই সব ভাষা ও উপভাষাকে উন্নত ও প্রকাশধর্মী করবার জন্তে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছেন—যাতে এইসব ভাষা-ভাষী লোকেরা নিজ নিজ ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক হইতে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়গুলি পার হয়ে জনাগরিক হতে পারে, আর দেশের বৈচিত্র্যের মাঝে এক মহান মিলন ঘটতে পারে। যে সমস্ত উপভাষার কোন কোন বর্ণমালা ছিল না, সেগুলির জন্তে প্রথমে রোমান বর্ণমালা, পরে (১৯৩০ সালে) রাশিয়ান বর্ণমালার প্রচলন করে সেগুলিকে লিখিত ভাষার পর্যায়ে আনা হল। এর জন্ত প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা হয়েছিল; কারণ নতুন বর্ণমালা সৃষ্টি করে এইসব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্য রচনা করতে যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম খরচ করতে হয়েছিল। এইভাবে প্রতিটি জাতি আপন আপন ভাষায় ভাবের আদান প্রদান করতে ও স্কুল কলেজে শিক্ষা-পাবার অধিকারী হল—শুধু এটি মাত্র সর্ব থাকল যে, রাশিয়ান ভাষা সকলকে শিখতে হবে, আর রাশিয়ান ভাষা হবে সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে

সংযোগরক্ষাকারী এক সর্বসম্মত সাধারণ ভাষা। সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় এই জন্তে ৫৮টি বিভিন্ন ভাষায় প্রাথমিক হতে সর্বোচ্চ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাষা-জনিত ঘেষ, হিংসা বা কলহ নেই—নেই বিমাতৃহুলভ ব্যবহার। উত্তরাংশে নেনটিস্, ইভেনস্ফি, কোরিয়াফি, এসকিমো প্রভৃতি উপজাতিদের কোন লিখিত ভাষা ছিল না; এখন তারা পেল লিখিত ভাষা। এছাড়া আজারবৈজান, কাজাক, খিরগিজ, তুর্কোমান, উজবেগ, উঘির, ইষাকুত, তাতার, বাসগির, চোভান, উদমুরং, মারিস, তাজিক, ও-সেটিয়ান প্রভৃতি যে সমস্ত জাতির লিখিত ভাষা ও বিভিন্ন মর্ণমালা ছিল, মূরণ ও টাইপরাইটিং প্রভৃতি কাজের সুবিধার জন্তে সেগুলি সমস্তই রাশিয়ান বর্ণমালায় লেখা আরম্ভ হল। এই-ভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রে ৬৩টি বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য গড়ে উঠেছে।

লেলিন মনে করতেন, রাশিয়ার সমস্ত জাতি ও উপজাতিদের ভাষা ও কৃষ্টির উন্নতিতে রাশিয়ান সাহিত্যও সমৃদ্ধ হবে, দেশের বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও সমাজের মধ্যে এক বিরাট ঐক্য ও প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠবে। এই জন্তেই তিনি বলেছিলেন, রাশিয়ার বিভিন্ন ভাষাকে মুক্তি দিতে হবে, যাতে তারা নিজেদের সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পায়। তাই দেখা যায় গত ৪৫ বৎসরের চেষ্টায় সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় এই সমস্ত বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের শিক্ষার জন্তে হাজার হাজার “জাতীয় বিদ্যালয়” খোলা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ উপজাতীয় ছেলে-মেয়েরা, যাদের জারের আমলে শিক্ষা লাভের কোন আশাই ছিল না, আজ তারা নিজেদের স্কুলে নিজেদের ভাষায় শিক্ষা পাচ্ছে।

ভাষা বিষয়ে এই উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে রাশিয়ায় ভাষাবিদ্বেষ বলে কিছু নেই, তার ফলে গড়ে উঠেছে এক মহান ভাব-সংহতি। যে সমস্ত ভাষা এতদিন অম্লমত উপজাতীয় ভাষা বলে অনাদৃত হয়ে পড়েছিল, আজ সেগুলি সরকারী সাহায্যে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে; প্রতি বৎসর এইসব ভাষাভাষীরা

সাহিত্যের নব নব অবদান দিয়ে ভাষা-জননীর মুখ উজ্জ্বল করছে। অসংখ্য ভাষা ও উপভাষাকে অবজ্ঞা দেখিয়ে একমাত্র রাশিয়ান ভাষা সমগ্র দেশের উপর চাপিয়ে দেবার কোন চেষ্টা সরকার করেন নি। কারণ তাঁরা মনে করেন, কোন জাতিই আপন ভাষার মাধ্যম ছাড়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে না। সমস্ত পাপড়িগুলি বিকশিত হলে শতদল হেসে উঠবে, তবেই না সেই শতদলের মালা দেশজননীর কণ্ঠে শোভা পাবে, দশদিক গন্ধে আমোদিত হবে।

সোভিয়েট রাশিয়ার এই মহান আদর্শ আমাদের দেশেও গ্রহণ করলে, ভাষাসমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। চৌদ্দটি ভাষায় নিজ নিজ রাজ্যে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, সমান সুযোগ সুবিধা সকল ভাষাকেই দিতে হবে, সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলি হয় ইংরাজী ভাষায় নয়ত এই সবগুলি ভাষায় গ্রহণ করতে হবে। শুধু হিন্দীতে ব্যবস্থা করলে এক শ্রেণীর লোকই সুবিধা পাবে, তাতে অম্লময় লোক শুধু নিজের ভাষার জোরেই প্রশাসনিক ব্যাপারে কর্তৃত্ব করতে থাকবে—ফলে শাসন ব্যবস্থা অচাঞ্চল্যে চলবে না।

অহিন্দীভাবী রাজ্যে হিন্দী সাহিত্য হিসাবে শিক্ষণীয় হোক তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু সকলকেই আপনাপন মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যারা ইংরেজী চান, তাঁদের জন্তে সে দুয়ার খোলা রাখতে হবে। তাছাড়া আর একটা কথা ভাববার আছে। ইংরেজী যাদের মাতৃভাষা এদেশে তাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। এংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রীষ্টানরা গত দুশ’ বছর ধরে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা পেয়ে আসছে, ইংরেজী তাদের মাতৃভাষা হয়ে গিয়েছে। তাদের ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার পক্ষে কোন যুক্তি দেখা যায় না। প্রত্যেক রাষ্ট্রের উচিত ইংরেজী ও মাতৃভাষা ছাড়া যে কোন একটি প্রাদেশিক ভাষার পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আবশ্যিক করা। এক রাষ্ট্রের লোককে অন্য রাষ্ট্রের ভাষা ও কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

হিন্দী ভাষার প্রতি কোন রকম বিদ্বেষভাব পোষণ

না কয়েই বলতে পারি, ইংরেজীর স্থান হিন্দীর মতন একটি প্রান্তিক ভাষার দ্বারা পূরণ হতে বহু বৎসর লাগবে। এ ছাড়াও সবচেয়ে আপত্তির বিষয় হল, হিন্দীকে রাজসিংহাসনে বসানর ফলে অহিন্দীভাষীদের অস্ববিধা দূর করবার জন্তে হাজার হাজার অস্ববাদক নিযুক্ত করতে হবে এবং তার জন্তে যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হবে সে টাকা দিতে হবে অহিন্দীভাষীদের, আর অস্ববাদক যারা হবে, তারা সকলেই হিন্দীভাষী। যে দেশে জনসাধারণের পেটের ভাত ও পরণের কাপড় যোগাড় করতে হিমসিম খেতে হয় সেখানে কোটি কোটি টাকা এইভাবে অপব্যয় করা কতদূর সমীচীন তাও ভেবে দেখা দরকার।

যদি ভারতবর্ষকে সামগ্রিকভাবে অগ্রসর হতে হয়, সমষ্টির কল্যাণের কথা ভাবতে হয়, তাহলে সংবিধানে স্বীকৃত শুধু ১৪টি ভাষাতেই শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই চলবে না; যে সমস্ত পাহাড়ী ও আদিম অধিবাসী আছে, তাদের ভাষাগুলিরও উন্নতিসাধন করতে হবে—ঐ সব জাতিকে তাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কোল, ভীল, সাঁওতাল, শবর, মুণ্ডা, চাকমা; নাগা, কুকী নিজেদের ভাষায় উন্নয়ন করতে হবে। এইসব জাতির বহু লোক-সংগীত, পুরাণ, উপাখ্যান আছে; সেওতো মুখে মুখে পুরুষাভ্যাসক্রমে চলে আসছে; সাহিত্যের রূপ দিয়ে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে তাদের লাভ হবে, জাতীয় ঐক্য ও পুষ্টি ও পরিবর্ধিত হবে।

সব শেষে বলি, দেশ আজ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে আমাদের একটা নিজস্ব ভাষাও একান্ত কাম্য। কোন প্রান্তিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার সিংহাসনে বসালে অশান্তির আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। সব দিক দিগে বিচার করলে মনে হয়, জাতীয় ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র সংস্কৃতেরই রাষ্ট্রভাষার গৌরব লাভ করবার দাবী হবে সর্বজনস্বীকৃত।

সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষার পদে বসাবার প্রস্তাব করছি বলে আতঙ্কে শিউরে উঠবার কোন কারণ নেই। মনে হতে পারে, যে-ভাষার ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে বার বৎসর

লেগে যায়, সে ভাষা কিভাবে রাষ্ট্রভাষা হতে পারে? আমি সেই পাণিনিদিক সংস্কৃত ভাষার কথা বলছি না। সংস্কৃত ভাষাকে আধুনিক ও কালোপযোগী কবে নিম্নে রাষ্ট্রভাষাব গৌরব দেওয়া যায়। ইসরায়েল রাষ্ট্রের নজির আমাদের চোখের সমুখেই রয়েছে। বহু পুরাতন হিব্রু ভাষা বিভিন্ন ভাষাভাষী ইহুদিরা রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে; তবে সে ওল্ড টেস্টামেন্টের হিব্রু নয়, আধুনিক হিব্রু ভাষা, যেমন আরব ছনিয়ায চলে বর্তমান যুগের আরবি, ইরানে চলে একালের পারসী—প্রাচীন আরবি বা পারসী নয়। সংস্কৃতকেও তেমনি আধুনিক করে নিতে হবে, তার ব্যাকরণের জটিলতার বন্ধন শিথিল করতে হবে—যাতে সব ভাষাভাষী লোক তাকে সহজে আয়ত্ত করতে পারে। কিভাবে এ কাজ সম্ভব তা আভাসে বলা যেতে পারে।

ক্রিয়াপদে পরস্মৈপদ বা আত্মনেপদ যে হয় একটা রাখলেই চলবে। লট, লোট, লং, বিধিলিং ও লুট এই কটি কালের বেশী রাখা দরকার নেই, সমস্ত ক্রিয়াপদ হবে ভাবীগণীয়, লিঙ্গ হবে ইংরেজীর মত স্ত্রীচাচরেল জেগুৱা, কারক তিনটি কি চারটির বেশী রাখার দরকার হবে না; বচন দুটি—একবচন ও বহুবচন রাখলেই হবে। বিধ্বংসেরা ও ভাবাবিদেরা এই দেব-ভাষাকে কিভাবে সহজ, সরল ও কালোপযোগী করা যায়, সে বিষয়ে নির্দেশ নেবেন। এখানে আইরিস ফ্রি স্টেটেরও নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আয়ারল্যান্ড স্বাধীন হয়েই তাদের বহু পুরাতন, ভুলে-যাওয়া আর্ল বা আইরিস ভাষাকে সম্ভবিত করে জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাতে কোন অস্ববিধা বোধ করছে না।

সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হলে ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম কোন অংশের লোকেরই মনে হয়, তাতে অস্ববিধা হবে না; কারণ ভারতের অধিকাংশ ভাষার উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে। দক্ষিণের দ্রাবিড়ী ভাষাগুলি অবশ্য ব্যতিক্রম; কিন্তু দক্ষিণের হিন্দুবাও পুন্ডা, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি মঙ্গলকাজে সংস্কৃত মন্ত্রাদি ব্যবহার করেন এবং সংস্কৃতকে তাঁরা ধর্মীয় ভাষা বলে গ্রহণ করেছেন;

মুক্তির মোহ

শ্রীকণা দেবীভারতী

মনমোহিনী দেবী কি করে ভৈরবী-ঠাকুরগণ নামে গ্রামে পরিচিত হলেন, তার পিছনে একটি ইতিহাস আছে। প্রোচা বয়সেও তাঁর রূপের খ্যাতি ও দাপটের কথা এ অঞ্চলে বিখ্যাত। ধপ্পে গায়ের রং—বলিষ্ঠ চেহারা। মাথার চুলগুলি ছিল তামাটে রংএর। সেগুলি চূড়ো করে বাঁধা থাকত মাথার উপর। কপালে ঢাকা প্রমাণ একটি মিছুরের টিপ জ্বল জ্বল করছে। গলায় স্বর্নদ্রাক্ষের মালা, পরণে গেরুয়া। এই মূর্তিতে গ্রামের আপদে-বিপদে তিনিই সবার আগে এসে দাঁড়াতেন। দীন-দুঃখীদের আপন জন; কিন্তু দুষ্ট লোকের কাছে সত্যকারের ভৈরবী মূর্তি! সংসারও তাঁর মোটামুটি সচ্ছল। ছেলেমেয়েগুলি বাধ্য, শাস্ত-শিষ্ট। সংসারে একমাত্র দুঃখের কারণ ছিলেন স্বামী ভবতারণবাবু। অবশু ভবতারণবাবু মন্দ চরিত্রের লোক, এ কথা তাঁর অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না। তবু তিনি একটু ঢিলে ঢালা গোছের লোক। সুগৃহিণীর পরিচালনায় তাঁর সংসার-তরণী তর তর করে বয়ে যাচ্ছে, অতএব ভবতারণবাবু কতকগুলি খেয়াল নিয়ে মেতে রইলেন। তাতেও কোন অশান্তি জন্মাবার কারণ ছিল না। বিপদ বাধল, যখন তিনি জানতে পারলেন—

আমাদের দেশে একখানা প্রাচীন পুঁথি আছে; যার ভিতর সব আশ্চর্য-আশ্চর্য কথা আছে। সেই পুঁথি এখনও খোঁজ করলে পাওয়া সম্ভব। মাহুষ একটু চেষ্টা করলেই তা থেকে অসাধ্য সাধন করতে পারে। যেমন নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে আসা, মন্ত্রবলে জংগলের সাপ ও বনের বাঘ এনে কুকুরের মত পা চাটানো। সব চেয়ে বিস্ময়কর—‘খেচর যোগ’! যার সাহায্যে মাহুষ পাখী না হয়েও শূন্যে উড়তে পারে। এই খেচর-আসন আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণীর সাধকদের অনেকে জানতেন বলে শোনা যায়। সাধারণ মাহুষও ঐ দেবদুর্গত শক্তির অধিকারী হতে পারে জেনে ভবতারণবাবু জীবন পণ করে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই অমূল্য পুঁথি তাঁকে সংগ্রহ করতেই হবে। সেই থেকে পুঁথির অজ্ঞ তিনি সাধু-তিথারী-বোষ্টম—যাকে পেতেন তার সঙ্গ ধরেই বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হতে লাগলেন। এক মাস, দু’ মাস পরে প্রায় আধমরা হয়ে বাড়ি এসে, চুপচাপ ঘরে বসে দিন কাটাতেন। নিয়মমত খাওয়া-দাওয়া করে আবার একটু ভাল হলোই বাড়ি ছাড়তেন।

ভৈরবী ঠাকুরগণ সংকল্প করলেন—স্বামীকে এই ছদ্ম-

কাজেই মনে হয় সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হলে, তাঁদের বিশেষ আপত্তির কারণ হবে না। এ যদি সম্ভব না হয়, তাহলে স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী ১৯৫২ সালের ৭ই আগস্ট লোকসভাকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, লোকে যতকাল চাইবে ততকালই “একটি সহযোগী অতিরিক্ত ও বিকল্প ভাষা” হিসাবে ইংরেজীর ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। সংবিধান সংশোধন করে, সেই ঘোষণাই বলৎ হউক। স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী ১৯৫৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে সংসদে অমুদ্রণ ঘোষণা করেছিলেন:—(১) ইংরেজী গোপভাষা হিসাবেই থাকতে পারে, (২) লোকশিক্ষার বাহন আমাদের নিজস্ব ভাষাকেই হতে হবে, (৩) যে কোন

রাজ্য ইংরেজী ব্যবহার করতে পারে, (৪) কোন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম সেই রাজ্যের ভাষাতেই সম্পন্ন হবে, (৫) ভারতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর স্থান থাকবে। এ ঘোষণার হঠাৎ পরিবর্তনের প্রয়োজন হল কেন দেশ-বাসী তা জানতে চায়। দেশ ঐক্যবদ্ধ হবে, এই আশায় আমাদের সংবিধান রচয়িতারা হিন্দীকে জাতীয় ভাষার স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু প্রজাতন্ত্র দিবসে হিন্দীর অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র নাটকীয়ভাবে করা হয়েছে তাতে কান্ডিত সংহতির উদ্ভবের বদলে এই ভাষাই গুরুতর বিচ্ছেদ ও বিবাদের সৃষ্টি করেছে। ফিরবার পথ এখনও খোলা আছে। সংবিধানের সংশোধন কাম্য।

ছাড়া মতিবুদ্ধি থেকে রক্ষা করতেই হবে। ভাগ্যক্রমে সেই সময়ই কাশী থেকে গুরুদেব শিবানন্দ স্বামী এসে উপস্থিত হলেন তাঁর বাড়িতে। ভৈরবী ঠাকরণ অকুলে কুল পেলেন। কঁদে কঁদে জানালেন গুরুদেবকে সব কথা। শুনে গুরুদেব কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—“মা, ভবতারণ বাবাজীর কোণীটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। মনে হয় গ্রহশাস্তির আবশ্যক হয়েছে।”

একটি শুভদিন দেখে গুরুদেব কোণী পরীক্ষা শুরু করলেন। পাযের কাছে হাত ঘোড় করে বসে ভৈরবী ঠাকরণ। তাঁর মুখে চিন্তার স্পষ্ট ছাপ। বুক টিব টিব করছে; শুক না জানি কী বলেন! চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিতে নিতে গুরুদেব জোর একটা নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন—“না, ভয়ের কিছু নেই। তবে”—‘তবে’র এটাতে জোর দিয়ে উনি নিশ্চয় যাওয়া হ’কোটাতে একটা মূহুটান দিলেন।

কঁদে উঠলেন ভৈরবী ঠাকরণ—“যত টাকা লাগে, বাবা, আপনি গ্রহশাস্তি করুন।”

“না-না, সে সব কিছু নয়; তবে জান কি মা, অদৃষ্টের লেখা সে তো মুছে যাবার নয়—মানে সংসার অনিত্য—স্বামী পুত্র সবই মিথ্যা।”

“বুঝলাম না, বাবা!” বেশ ভিজ্ঞ স্বরেই কথা কইলেন ভৈরবী ঠাকরণ।

“মা, বাবাজীবনের অদৃষ্টে সন্ন্যাস যোগ আছে।”

চমকে উঠলেন ভৈরবী ঠাকরণ। সন্ন্যাস যোগ! মানে—উনি সাধু হবেন—কেন? কী হুখে? ভৈরবী দেবীর অন্তর হাহাকার করে উঠল। যদিও বাক্যবাণে ভালমামুষ স্বামীটিকে প্রায়ই তিনি বিদ্ধ করে থাকেন; তবু তিনি পতিব্রতা। স্বামীর পাদোদক পান না করে জল গ্রহণ করেন না। কিন্তু গুরুদেবের ঐ এক কথা—‘এটা সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব লক্ষণ; তাই সংসারে অনাসক্ত ভাব। ঘর তাকে বাঁধতে পারবে না।’ এর পরে ভৈরবী ঠাকরণ শাস্ত্র মূর্তি ধারণ করলেন। ভাবলেন, মূর্তির পথ ঘর মনকে টানে, সে কি আর ঘরের বাঁধনে ধরা দেয়? সবই ঈশ্বরের লীলা ভেবে নিজেকে সংসার থেকে প্রায় সূরিয়ে ফেললেন ঠাকুরঘরে। ইষ্টদেবতার

কাছে নীরবে প্রার্থনা জানান—‘ঠাকুর, আমি আর বাধা দেব না তাঁর কোন কাজে; তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।’

আবার স্নেহে বুরে ভবতারণবাবু একদিন সেই যে বাড়ি থেকে পালালেন, আর তাঁর কোন সন্ধানই কেউ পেল না। কয়েকটা বছর কেটে গেল। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ছেলেটি সংসারী; ছ’ একটি নাতি-পুতিও ঘর আলো করছে। সংসার মোটামুটি স্নেহেরই বলা চলে। শুধু ভৈরবী ঠাকরণের মনে একটা ব্যথা কাটার মত বেঁধে। ‘উনি কোথায়, কী ভাবে সাধনা করছেন—যদি একটু জানতে পারা যেত।’

একদিন এ-কথাই জানতে পারলেন অপ্রত্যাশিত ভাবে। এক দেওরপো এসে সংবাদ দিল, “জ্যাঠামশাই কাশীতে আছেন, কৈদার ঘাটের কাছে। এক তান্ত্রিকের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। গংগার ধারে বসে আছেন ধূনী জালিয়ে। সাক্ষাৎ ভৈরব মূর্তি। আমাদের চিনতে পারেন নি।” আনন্দে চোখে জল এসে গেল ঠাকরণের। চট করে মুছে নিয়ে হাসিমুখে তিনি বলেন—“ই্যা বাবা নকুল, তোর ভুল হয়নি তো তাঁকে চিনতে?”

“ভুল কী রাঙা-জ্যোঠা! জ্যাঠামশায়ের বাঁ গালের দেই জড়ুলটা এখনও তেমনি আছে। তুমি যদি দেখতে চাও—নিযে যাচ্ছি চল।”

ছ’হাত কপালে ঠেকিয়ে কার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন তিনি। একটু স্নান হাসি হেসে বলেন,—“ওদের পরিজনের সংগে দেখা করতে নেই, পাগলা ছেলে। তোর জ্যাঠা আর কী সংসারের লোক? ওদের পথ আলাদা—কিন্তু দেখিস বাবা! এ কথা কাউকে বলিস নি। তাতে তাঁর খেতি হবে।”

ঠাকরণ বেশ কতকগুলি নারকেলের নাড়ু খেতে দিলেন নকুলকে। খুদী মনে নকুল সেগুলি সদ্যব্যহার করতে থাকে। চিবুতে চিবুতে বলল সে—“কিছু ভেবনা রাঙা জ্যোঠা! এ কথা আমি কাউকে বলব না। আমরা সংসারী লোক, সাধু সন্ন্যাসীর কথায় দরকার কী বল?”

এর পরেও কয়েক মাস কেটে গেল। ভৈরবী ঠাকরণ এবার নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। চণ্ডা পাড়ের শাড়ি ছেড়ে ধরলেন গেরুয়া বাস। মাথায় তেল

আগেও ভাল করে দিতেন না। এখন সেগুলি প্রায় জটায় দাঁড়ালো, গলায় রুদ্রাক্ষ। সিঁহুরের টিপ আকারে আরো বড় হ'ল। লোকে আড়ালে আড়ালে বলত ভৈরবী ঠাকুর লোকসঙ্গ ছেড়ে বেশী সময় কাটাতেন ঠাকুরঘরে। এদিকে বারো বছর প্রায় হয়ে এল। হিন্দু-শাস্ত্র মতে বারো বছর কেউ নির্বোজ হয়ে থাকলে তাঁকে মৃত বলেই ধরে নেওয়া বিধি। কুশপুন্ডলিকা দাহ করে শ্রাদ্ধ শাস্তি করতে হয়। একদিন বড় ছেলে হেরষও বলল কথাটা। ভৈরবী ঠাকুর মহা সমস্তায় পড়ে গেলেন। স্বামী বেঁচে থাকতে বৈষম্য বেশ ধারণ করে এই পোড়া সংসারের দয়ার পাজী হয়ে বেঁচে থাকতে হবে? কিন্তু তিনি যে বেঁচে আছেন—মায়ার সংসার থেকে মুক্ত হয়ে। কেউ জানতে পারলে বলবে—জীর জ্বালাতেই তাঁর এই বৈরাগ্য—ছিঃ ছিঃ, তা ছাড়া শুনেছেন সাধুদের পারলৌকিক কাজ সংসারীদের মত করার নিয়ম নেই। তবে? অনেক ভেবেও যখন কোন সমাধান খুঁজে পেলেন না, তখন ঠিক করলেন নিজেই যাবেন তীর্থ-দর্শনের ছুতোয়। সচক্ষে দেখে আসবেন সেই ঘরভোলা ভোলানাথকে। তারপর দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে যথাকর্তব্য স্থির করা যাবে। ছেলে বউদের অনেক বলে-কয়ে রাজী করালেন। ৮পুজোর আগেই ফিরে আসবেন, এই আশ্বাস দিয়ে দুর্গা বলে যাত্রা করলেন তীর্থে। গন্তব্য স্থল কাশীধাম। এর পরে সুবিধামত অস্ত্র ব্যবস্থা। পুজো প্রায় এসে গেল। আজ দুই মাস হ'ল মা গেছেন তীর্থে; তাঁর কোন খবর না পেয়ে বড় ছেলে হেরষ অস্থির হয়ে উঠল। নিজেই যাবে খুঁজতে,—না কি করবে? এই সব ভেবে তার রাতের ঘুম ঘুচে গেল। এমন সময় একদিন চিঠি এল। চিঠি পড়ে হেরষ অবাক। হ্যাঁ, এ তো মায়ের হাতেরই লেখা। পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে; লেখাপড়া ভালই জানেন। হাতের লেখা মুক্তোর মত। কিন্তু মা এসব কী লিখেছে? বিমূঢ় হেরষ বার বার পড়তে থাকে চিঠিখানা।

‘নিরাপদে, প্রাণপ্রতিম বাবা হেরষ, প্রাণাধিক! তোমাদের ছাড়িয়া এখানে দিনরাত্র মনস্তাপ ভোগ করিতেছি। কিন্তু সব ঠাকুরের বিধান। লোকমুখে জ্ঞাত ছিলাম—তোমরা সে কথা জানিতে না; আমি জানিতে দিতে চাহিনাই—তোমাদের পিতাঠাকুর ৮কাশী-ধামে সন্ন্যাসব্রত লইয়া সাধনাধ নিযুক্ত আছেন। কারণ—

তাঁহার কোষ্ঠীতে তাহাই লিখা ছিল। স্বয়ং গুরুদেবের শ্রীমুখের বাণী ক্রম সত্য বলিয়া আমি মনোমুগ্ধে নিবারণ কাতর হইলাম। কিন্তু আমার সংসার ও পুত্রকন্তা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া; আমার তুলিবার উপায় কোথায়? সব দুঃখ-জ্বালা বুকে লইয়া নিজের কর্তব্য পালন করিতে থাকি। লোকে আড়ালে অনেক কিছু বলিত; তাহা উপেক্ষা করিয়াছি তোমাদের মুখ চাহিয়া। দূর হইতে তাঁহাকে একবার দর্শন করিব; এই সাধ মনে হইত। তোমরা এখন বড় হইয়া সংসার বুদ্ধি লইতে পারিলে দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। তাবিল্য উনি তো ৮কাশীধামেই আছেন; তাঁকে দেখিয়া বিশ্বনাথ দর্শন করিব; ছুটিয়া আসিয়াছি এখানে। কিন্তু বাবা, আজ আমার দুঃখ-লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? গংগার ঘাটে ঘাটে বেড়াইয়াছি। কিন্তু দর্শন মিলিল না। কী করিব? পাগলিনীর মত অলি-গলি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি; এমন সময় তাঁর দেখা পাইলাম। বাবা, এ দেখা না হইলে ভাল হইত। আমার এতদিনের বিশ্বাস জাতিয়া চুরমার হইল। বলিতে গেলে, তিনি সন্ন্যাসী হন নাই, রাজা হইয়াছেন। তোমার পিতাঠাকুর রূপবান ছিলেন। মুখে দিন কাটাইবার কলে বয়স অপেক্ষা তাকে যুবা মনে হইত। কি প্রকারে জানি না এই দেশীয় এক ধনীকন্তাকে বিবাহ করিয়া মণ্ড বড় ব্যবসায়ী হইয়াছেন। কাল মোটর গাড়ী হইতে তাঁকে নামিতে দেখি। পরণে দামী পোষাক, হাতে চার পাঁচটা দামী আংটা, চোখে সোনার চশমা। মুখে—হাসি। একটা বেনারসী শাড়ির দোকানে ঢুকিলেন। পাশের পান দোকানের ছোকরাটি পরিচয় দিল—‘ওনি নবীনবাবু, মন্ত রহিস আদমী।’ আমার আর দেখিবার সাধ ছিল না। চোখের জল চোখে লইয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢুকিলাম। আমার বলিতে যাহা কিছু সবই সেদিন তাঁহার চরণে সঁপিয়া দিয়া আসিয়াছি। বাবা, তোমাদের সংসার তোমরা বুদ্ধি লও, আমি আর সংসারে ফিরিব না। তুলসী মাতাজী আমাকে ভগিনীর মতই স্নেহ করেন। আমাকে তিনি তাঁহার পথের সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছেন। এখন হরিদ্বারের পথে; তারপর কংখল; এরপরে আরও দূরে, আরও। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে।

৮বিশ্বনাথের চরণাশ্রিতা দাসী
ইতি তোমাদের দুঃখিনী মাতা।



হিমালয়-কথা ভূটান

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

ভূটানীরা ওদের মাতৃভূমির নাম দিয়েছে বজ্রভূমি—
Lands of thunderbolts. হিমালয়ের অঙ্কে জন্ম।
তাই আকাশ-ছোঁওয়া হিমালয়ের শিখর দিয়ে ধেরা।
প্রাকৃতিক-শোভার লীলার ক্ষেত্র ভূটান। অজস্র
ছোট বড় পাহাড়ী নদী—শীতে শীর্ণকায়। আবার বর্ষায়
কুলপ্রাবিনী। মুহূর্হ হিমবাহ সগর্জনে নেমে আসছে
বরফাবৃত শিখর থেকে উপত্যকার বুক। বাঁশ আর
পাইনের জঙ্গল। ও জঙ্গলে হাতীর পাল চরে বেড়াচ্ছে
নিশ্চিন্ত মনে। চিতাবাঘ লুকিয়ে থাকে নিরীহ হরিণের
উপর লাফিয়ে পড়ার আশায়। আর হরিণের পালের
যেন শেষ নেই। চিত্রল, সম্বর, বার্কিঙ ডিম্বার, হগ
ডিয়ার—প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে দেহ মিশিয়ে ওরা
বাস করছে। হিংস্রতা আছে সত্য—কিন্তু মৌন
হিমালয় তার কন্ঠাদেহে দিয়েছে অসুরস্ব শাস্তি।

এক কালে বিদেশী পর্যটকরা বলত—Sleeping
land—ঘুমের দেশ। সভ্যতার দিকে পিঠ কිරিয়ে ওরা
ঘুমের মধ্যে, জড়তার মধ্যে, হাজার বছরের কুসংস্কার
আর ধর্মাস্ততার মধ্যে নিজেদের মগ্ন করে রেখেছিল।
বাইরের জগতের সঙ্গে তখন ভূটানীদের সামান্যতম
যোগাও ছিল না। আর সে সময় সহজ ও সাবলীল সম্পর্ক
গড়ে তোলাও ছিল কঠিনতম কর্ম। একমাত্র পথ ত
নাথু-লা গিরিপথ। সেই পথে অরণ্যভীত কাল থেকে
ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল ভূটানের। ও পথেই
ভূটানী সৈন্ত অভিযান চালিয়ে কোচবিহার পর্যন্ত
একদম্বর রাজ্য বিস্তার করেছিল। আবার ও পথেই
শোনা যায় বাঙলার ধর্মগুরু অতীশ দীপঙ্কর গিয়েছিলেন
তিব্বতে। তাঁর পাদস্পর্শে ভূটানীদের—তিব্বতীদের
শতাব্দীর ঘুম ভেঙেছিল। এখনও ভারতের সঙ্গে
ভূটানের সম্বন্ধ এ পথেই গড়ে উঠেছে।

‘ভোটন্ত’ কথাটির অপভ্রংশ ভূটান। ভোট্ট অর্থাৎ
তিব্বতের অন্ত—তাই ভোটন্ত। শিক্ষায়-দীক্ষায়, ধর্মে,
আচারে-ব্যবহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে—সব দিক দিয়ে
ভূটানের সঙ্গে তিব্বতের মিল রয়েছে। তবু ভূটান

তিব্বত নয়—কিংবা নয় তিব্বতের অংশ। অবশ্য
হিমালয়ের চারিটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে একটা
পারস্পরিক মিল আছে। তিব্বত, নেপাল, সিকিম ও
ভূটান। এদের মধ্যে জলবায়ুগত মিলও রয়েছে।

বজ্রভূমি ভূটানের মধ্য দিয়ে তিব্বতে একদিন বৌদ্ধ-
ধর্মের আলোক-বর্তিকা নিয়ে গিয়েছিলেন অতীশ
দীপঙ্কর—সঙ্গে সঙ্গে ভূটানের বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল।
পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে যখন আবার
হিন্দু-সংস্কৃতি জোরদার হয়ে উঠেছিল তখন আবার ভূটানে
হিন্দু-সংস্কৃতির জোয়ারের আঘাত লেগেছিল। সে আঘাতে
ভূটানে বৌদ্ধধর্ম উৎখাত না হলেও বৌদ্ধধর্মের উপর
হিন্দুধর্মের প্রভাব পড়েছিল। ভূটানে তাই আজ মহাযান-
পন্থীদের প্রভাব বেশী। তন্ত্রের প্রভাবও রয়েছে যথেষ্ট।

ভূটানের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া
যায় না।

তবে ষষ্ঠের জন্মের প্রায় দু’শ বছর আগে একজন
কোচ-বংশীয় রাজা ভূটানে অভিযান করেন এবং এই
সুন্দর পাহাড়ী মালভূমিতে রাজত্ব স্থাপন করেন। এই
কোচবংশ বহুকাল ভূটানে রাজত্ব করেছিলেন। এই
বংশের রাজত্বকালেই ভূটানে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে।
নবম শতাব্দীতে তিব্বতের একজন পরাক্রমশালী লামা
ভূটানে অভিযান করেন এবং কোচবংশীয় রাজাকে দেশ
থেকে তাড়িয়ে দেন। তখন থেকে ভূটানে লামাতন্ত্রের
প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূটানে ধর্ম ব্যাপারে এই
লামাতন্ত্রের প্রভাব আজও রয়েছে।

বজ্রভূমিতে ‘হুগপেন’ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় তিনশ’
বছর আগে। তখনকার ধর্মরাজ দেপটাম লা-ফাকে
হারিয়ে দিয়ে যুগরচু হুগপেন ভূটান রাজত্বকে সংগঠিত
করে তোলেন। তিনি একাধারে ছিলেন দেবরাজ এবং
ধর্মরাজ। সারা ভূটানকে তিনি প্রদেশ এবং জেলায়
(পেনলপ এবং জঙপেন) ভাগ করেন এবং ভূমি-ব্যবস্থার
আরও অনেক সংস্কার করেন। এক একটা জঙ বা
জুর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক একটা জঙপেন।

তখন থেকেই ভূটানীদের জীবনে নূতন দিন সূত্র হয়েছে। হুগপেনবংশীয়দের রাজত্বকালে ভূটানীরা দক্ষিণে রাজত্ব বিস্তারে মন দেয় এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্ব ও কোচবিহারের কিছু অংশ তাদের অধিকার ভুক্ত হয়। পরাধীনতার কালও তাদের শেষ হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে হুগপেন রাজবংশের পতন ঘটে। ১৮৮৫ সালে তখনকার ধর্মরাজের মৃত্যু হলে চৌগুসা প্রদেশের শাসনকর্তা নগুইন ওয়াঙচুক ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ব্রিটিশের সমর্থন লাভ করেন। শাসন ক্ষমতা দখল করার পর ওয়াঙচুক ভূটানের ধর্ম-রাজের পদও গ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র ভূটান তাঁর আয়ত্তে আসে। তিনি হন ভূটানের মহারাজা। ব্রিটিশরাজ তাঁকে নাইট উপাধি দিয়েছিল; এখনকার মহারাজা জিগমী দোরজী ওয়াঙচুক তাঁর নাতি।

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তরাঞ্চলকে প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে সবল করে তোলার জন্যে হিমালয়ে কয়েকটি বাফার স্টেটের সৃষ্টি করেছিল। তিব্বত, নেপাল, সিকিম, ভূটান এবং আদিবাসীদের অধিকৃত নেকা অঞ্চল। এমন ধরণের বাফার স্টেটের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তা'ছাড়া চীন এবং রাশিয়ার শ্রেণদৃষ্টি যখন নিবদ্ধ ছিল সুজলা সুফলা শস্ত্রশাখলা ভারতবর্ষের দিকে তখন এমন বাফার স্টেট সৃষ্টি রণশাস্ত্রসম্মত।

ব্রিটিশ সরকার ভূটানের উপর নজর দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর বষ্ট দশকে। জলপাইগুড়ির ডুম্ফার্স অঞ্চল তখন ভূটান সরকারের হাতে। ব্রিটিশ সরকার ডুম্ফার্স অঞ্চল অধিকার করার জন্য বড়যন্ত্র সূত্র করল। ১৮৮৪ সালে ভারত-ভূটান সন্ধি স্বাক্ষরিত হ'ল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তা' মানল না এবং ডুম্ফার্স ভূটানীদের হাত থেকে কেড়ে নিল। ভূটান রাজ্য সীমিত হয়ে রইল হিমালয়ের পাহাড় অঞ্চলে। পরের বছর সিংলিতে আবার এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। ডুম্ফার্স হারানোর জন্য ভূটান সরকার এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ লাভ করল। তারপর ওয়াঙচুক মহারাজার গদী অধিকার করলেন ব্রিটিশ ভারতের সমর্থনে। ১৯০৬ সাল থেকে

ভূটানের ব্যাপার সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পিত হয়। ভূটানের রক্ষা ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক অধিকার ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে। একমাত্র আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মহারাজার অধিকার ছিল নিরঙ্কুশ।

নামে স্বাধীন হলেও ভূটান ছিল ইংরাজের আশ্রিত রাজ্য।

স্বাধীনতা অর্জন করার পর ভারত সরকার নূতন করে ভূটানের সঙ্গে এক সন্ধি করল। সেটা ১৯১২ সাল। ব্রিটিশ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিমালয় অঞ্চলের রাজ্য-গুলোতে ধীরে ধীরে ভারত-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠছে। এর দুটো কারণ রয়েছে। প্রথমত ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অল্প রাষ্ট্রকে দখল করা গণতন্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং নিজের ইচ্ছা অর্থাৎ শাসন-ব্যবস্থা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে ভারত বরাবরই অনিচ্ছুক। নেপালে তাই যখন জাতীয়তা আন্দোলন ছুঁবার হয়ে উঠেছিল তখন ভারত দূরেই থেকেছে এবং নেপালের মহারাজাকে কোন সাহায্য করেনি। চীন যখন অস্ত্রায়-ভাবে তিব্বত দখল করেছে এবং তিব্বত চীনের একটা অংশ বলে প্রচার করেছে তখন পঞ্চশীলের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভারত সরকার কোন প্রতিবাদ করেনি। এশিয়ার বুকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করার জন্য তার প্রয়োজন হয়ত ছিল। কিন্তু রণ-নীতির বিচারে তিব্বতের মতন একটা বাফার স্টেটের অবলুপ্তি নিঃসন্দেহে ভারতের উত্তরাংশের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলেছে। অস্ত্রায় বাফার স্টেটগুলিতেও এতদিন ভারতের শক্তির উপর যে আস্থা ছিল সেই অটল আস্থায় ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে ভারত দুর্বল বলে প্রতিভাত হ'চ্ছে। দ্বিতীয়ত কমুনিষ্ট চীনের আগ্রাসী মনোবৃত্তি এবং যুদ্ধ ছঙ্কার। ক্ষমতা দখলের পর থেকে চীনের সাম্যবাদী সরকার হিমালয়ের রাষ্ট্রগুলোর উপর শ্রেণ-দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। সাম্যবাদের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তিব্বতের মতন অনগ্রসর স্বাধীন রাষ্ট্রকে উন্নত ধরণের সমর-শক্তির দাপটে দখল করে নিয়েছে। নেপাল, সিকিম ও ভূটানে চীনের দালালরা ভারত-বিরোধী প্রচার জোরদার করে তুলছে। নেপাল-সিকিম-ভূটান

রাজ্যগুলির সীমান্ত বরাবর বিশাল মেকানাইজড সেনা-বাহিনী সমাবেশ করে রেখেছে। হিমালয়ের এই সব রাজ্যগুলো প্রতিরোধ-ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী। সাম্যবাদী চীন নিজের সমর-শক্তি দেখিয়ে এই রাজ্যগুলোকে যদি ভীত করে তুলতে পারে তা'হলে এই রাজ্যের জনসাধারণের একটা অংশ চীনের উপর আস্থাশীল হতে চাইবে। ধীরে ধীরে চীনের প্রভাব এখানে ছড়িয়ে পড়বে। আর এই উদ্দেশ্য নিয়ে হয়ত চীন শান্তি ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে সংগঠিত বিশ্ব-ব্যাপী আন্দোলনকে উপেক্ষা করে এশিয়ার বৃক্ক পরমাণু-বোমার বিস্তারণ ঘটাবে।

এদিক দিয়ে বিচার করলে তিব্বতের ব্যাপারে প্রতিবাদ না করায় ভারতের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে। কিন্তু সারা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের আদর্শ থেকে ভারত বিচ্যুত হয়নি। ভারত-ভূটান সন্ধিপত্রের বয়ানে ভারত ঠিক এই মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। পররাষ্ট্র ব্যাপারে ভূটান ভারতের পরামর্শ গ্রহণ করবে কিন্তু আত্মসম্মত ব্যাপারে ভারত কোন রকম হস্তক্ষেপ করবে না। ভারত ও ভূটান বিনা শুষ্কে (Free trade) ব্যবসা করবে। নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য ভূটান সরকার বিশ্বের যে-কোন সরকারের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র-রসদ আমদানী করতে পারবে এবং সে রসদ ভারতের বৃক্কের উপর দিয়ে আনা যাবে তবে এসব অস্ত্রশস্ত্র-রসদ ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না এ কথা যদি ভাবত সরকার নিঃসন্দেহ হয়, তবেই। এর উপর বছর বছর পাঁচ লক্ষ টাকা ভূটানকে সাবসিডি দেবে। এ সন্ধি এখনও বর্তমান।

ভারত-ভূটানের এই ঐতিহাসিক সন্ধি সম্পাদিত হলে তখনকার ভারতের প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন : 'তু' দেশের জনগণের মধ্যকার সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করার জন্য এ সন্ধি প্রয়োজন। হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্যই এটা দরকার। যাতে বহিঃশত্রুর আক্রমণে স্বাধীনতা বিপন্ন না হয়। ভারত ও ভূটানের মধ্যে এই সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলেই ভূটানকে প্রদেয় সাবসিডির পরিমাণ বেড়েছে। প্লানিং

কমিশনে অভিজ্ঞ একদল অফিসার ভূটানের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর কাজে সাহায্য করার জন্য ভূটানে গিয়েছেন। ভূটানের এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচ হবে প্রায় সাড়ে সতের কোটি টাকা। দান হিসাবে এর সবটাই ভারত থেকে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ভূটানের সীমান্তে জলঢাকা নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্নের জন্য বৈদ্যুতিক প্ল্যান্ট স্থাপিত হচ্ছে। এখানে যে বিদ্যুৎ শক্তি তৈরী হবে তাতে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভূটান উপকৃত হবে। ফুন্টসোলিড-পারো, সমরুপ-ঝাড়ার-তাসিগড, সারভঙ-হাতিসার-তঙসা রাজপথ দ্রুত নির্মিত হচ্ছে। এইসব রাজপথের দ্বারা ভূটানের সঙ্গে ভারতের যেমন সংযোগ স্থাপিত হবে তেমনি ভূটানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। আর এর সব কটা পরিকল্পনা রূপায়ণে ভারত হয় আর্থিক আর না হয় কারিগরী সাহায্য ভূটানকে প্রদান করছে।

ভারত-ভূটানের সম্পর্ক তাই দিন দিন আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে।

হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব ঢালু অংশে ভূটান রাজ্য। সমগ্র রাজ্যটি মালভূমি। চারিদিকে সুউচ্চ ও দুর্ভেদ্য হিমালয়ের শিখর। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বদিকে তিব্বতের সীমান্ত। আর দক্ষিণদিকে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম। প্রাকৃতিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, ভূটানের সমগ্র দক্ষিণ অংশ ডুমুরের অন্তর্ভুক্ত—গভীর অরণ্য অঞ্চল। উত্তর দক্ষিণে ভূটানের বিস্তৃতি প্রায় নব্বুই মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে কোথাও কোথাও প্রায় দু'শ মাইল। মোট আয়তন আঠার হাজার বর্গ মাইল। ভারত-ভূটান সন্ধি ('৪৯ সাল) স্থাপিত হলে ভূটান দেওয়ান গিরি অঞ্চলটি লাভ করেছে—এটার আয়তন প্রায় বত্রিশ বর্গ মাইল।

লোকসংখ্যা কিন্তু আয়তনের তুলনায় খুবই কম—মাত্র সাত লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় তেরিশ জন। লোকসংখ্যার তিন ভাগ তিব্বতী-বংশজাত। এদের ভাষার সঙ্গেও তিব্বতী ভাষার যথেষ্ট মিল রয়েছে। নৃতত্ত্ববিদদের মতে ভূটানীরা মঙ্গোলিয়

ভারতের রাষ্ট্রভাষা

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, এম্. এ., পি. আর. এস.

রাজতন্ত্রের আমলে রাজার মাতৃভাষাই তাঁহার রাজ্যের যাবতীয় রাজকার্য্যে ব্যবহৃত হইত ; কারণ রাজা ছিলেন রাজ্যের মালিক এবং তাঁহার বাহাতে কোন রাজকার্য্য বুঝিতে অসুবিধা না হয়, ইহাই ছিল রাজকার্য্যে ব্যবহার্য্য ভাষা নির্বাচনের একমাত্র লক্ষ্য। এই কারণেই মুসলমান-শাসনকালে পারসিক ভাষা এবং ইংরেজ-শাসনকালে ইংরাজী ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুসলমান ও ইংরেজ শাসকেরা সকল সময়ে শুধু তাঁহাদের নিজস্ব স্বার্থ ও সুবিধার দিকেই দৃষ্টি রাখিতেন ; ভারতের সংহতি-সাধন কদাপি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। বরং তাঁহারা বুঝিতেন—ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিবাসি-

গণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতে পারিলে ইহাতে শাসকদের সুবিধা হইবে।

সম্প্রতি ভারতবর্ষ স্বাধীন। এখন আর আমাদের কোন রাজা নাই ; সুতরাং রাজভাষাও নাই। এখন রাজকার্য্যে এমন এক ভাষা ব্যবহার করা আবশ্যক, যাহা ভারতের সকল অংশের লোকেরই কিছু না কিছু জানা আছে এবং যাহার সহিত ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য, মহতী সংস্কৃতি ও হুমহান নীতিজ্ঞান অদ্বাদিভাবে জড়িত, যে ভাষা আয়ত্ত করিতে ভারতের সকল অংশের লোকেই সমান শ্রম স্বীকার করিতে হইবে এবং যাহা অতীতে রাষ্ট্র-কার্য্য-পরিচালনায় ও বৈদেশিক যোগাযোগ রক্ষায় নিজের

গোষ্ঠীভুক্ত। হিমালয় অঞ্চলের সব ক'টা রাজ্যের অধিবাসীদের দেহে মঙ্গোলিয় রক্তধারা প্রবাহিত।

রাজধানী পুনাখা উত্তর ভূটানে অবস্থিত। তবে ভূটানের শীতকালের রাজধানী পারো পশ্চিম-দক্ষিণ ভূটানে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে পারো অপূর্ব। আধুনিক ধরণের বাড়ী এখানে তৈরী হচ্ছে। বড় বড় হোটেলও রয়েছে। বিদেশী পর্যটকদের কাছে পারো এবং পুনাখা লোভনীয় স্থান।

আজকের পৃথিবীতে রাজতন্ত্র প্রতিক্রিয়াশীল। সে বিচারে ভূটানের রাজা নিঃসন্দেহে প্রতিক্রিয়াশীল। তার উপর রাজার চারিদিক ঘিরে রয়েছে একটি সামন্ত প্রতিভূদের চক্র। এই অভিজাত গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজার যেমন রক্তসম্পর্ক রয়েছে তেমনি এই অভিজাতরাই রাজকার্য্যে রাজাকে সাহায্য করেন। তাই ভূটানের সাধারণ মানুষের জীবন দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের পঙ্করুণে নিমজ্জিত। স্বাধীনতা এমন নিবিড়ভাবে সারা দেশটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, রাজাকে ভূটানীরা আজও দেবতার প্রতিভূ বলে বিশ্বাস করে।

অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে অন্তর্বিরোধ। তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

হন। এর উপর রয়েছে সাম্যবাদী চীনের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস। এই অন্তর্বিরোধের জন্মই জিগ্মী দরজীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। জিগ্মীর ছোট ভাই লেগুপ দরজী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু লেগুপ ভূটানকে আধুনিক-করণের ছুতা করে নরপতি-বিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন কয়েকজন ভারত-বিরোধী সমরনায়ক। ভূটানে রাজার আসন টলে উঠেছিল। কিন্তু বজ্রভূমিতে এই অশাস্ত বড় এখন থেমে গেছে। ক্ষমতাচ্যুত লেগুপ দরজী এখন বিদেশিনী অভিনেত্রী নিয়ে ব্যস্ত। বিদ্রোহী সমরনায়করা দেশত্যাগী।

সম্প্রতি কলকাতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ভূটানের মহারাজার মধ্যে এক সন্ধি-সর্ত স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারত ও ভূটানের মধ্যকার সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা হয়েছে। হুঁচকি প্রতিবেশী রাজ্য আজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অন্তর্বিরোধ এবং বহিঃশত্রুর সীমান্ত লঙ্ঘনের হুমকি কোন কিছুই এই বন্ধুত্বের প্রচেষ্টা বিফল করতে পারবে না। প্রতিক্রিয়া-শীলদের সমস্ত প্রয়াস বিফল করে ভারত ও ভূটান দৃঢ়পদে এগিয়ে চলবে।

যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছে। কোন্ ভারতীয় ভাষার মধ্যে উল্লিখিত প্রত্যেকটি গুণ রহিয়াছে?—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে আমরাদিগকে বেশী দূর অগ্রসর হইতে হইবে না। ভারতের সমুদয় প্রাদেশিক ভাষার জননী, হিন্দুজাতির ধর্মকর্মে সর্বদা ব্যবহৃত, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবাহিনী মহতী সংস্কৃত ভাষাই যে উল্লিখিত প্রত্যেকটি গুণের অধিকারিণী এবং ইহাই যে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন একমাত্র ভাষা—ইহা বিবেচক ব্যক্তিমাঝেই বুঝিতে পারিবেন।

দুঃখের বিষয়, সংস্কৃত ভাষাকে অগ্রাহ্য করিয়া হিন্দী নামক প্রাদেশিক ভাষাটিকে রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করিয়া আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কগণ চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ইংরেজ জাতি যেমন নিজেদিগকে ভারতের শাসক মনে করিত, হিন্দী অঞ্চলের অধিবাসীরাও কি তেমনি তাঁহাদিগকে ভারতের শাসক মনে করেন? ইংরেজেরা যেমন Rule Britannia Rule বলিয়া সমস্ত ভারতের জনগণের উপর অত্যাচার করিতেন, হিন্দী অঞ্চলের অধিবাসীরাও কি তেমনি “Rule Hindi Rule” নীতির সাহায্যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসিগণের উপর অবিচার ও অত্যাচার করিতে চাহেন? আমরা জানি—অন্তরে যাহাই থাকুক না কেন, প্রকাশ্যে কেহই উল্লিখিত নীতি ঘোষণা করিতে সাহস পাইবেন না। হিন্দী অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি ভারতের শাসক না হন, তাহা হইলে কোন্ অধিকারে তাঁহাদের ভাষাকেই সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহার করিতে চাহিতেছেন?

মনে রাখিতে হইবে—বর্তমানে ভারতের প্রশাসন প্রভৃতি কার্যে যে ভাষা ব্যবহৃত হইবে, তাহা রাজভাষা নহে; তাহা ভারতের রাষ্ট্রভাষা—অর্থাৎ সমগ্র ভারত রাষ্ট্রের জনগণের একটি সাধারণ ভাষা। কোন আঞ্চলিক ভাষাকে এই মর্যাদা দিলে কার্যতঃ সেই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে রাজার জাতিতে উন্নীত করিয়া অন্যান্য ভাষাভাষীদিগকে তাঁহাদের প্রজার পর্যায়ে ফেলা হইবে। এই গুরুতর পক্ষপাতিত্ব মহাভারতের বিশাল জনসমুদ্র মানিয়া লইতে পারে না, এবং তাহারা যে ইহা মানিয়া

লয় নাই, ভারতের দিকে দিকে জনগণের প্রবল অসন্তোষ তাহার প্রমাণ। দক্ষিণ ভারতে জনগণের এই প্রবল অসন্তোষকে দাবাইয়া রাখার জন্য গবর্ণমেন্ট দানবোচিত চণ্ডনীতি প্রয়োগ করিয়া আরও বেশী পরিমাণে জনগণের শ্রদ্ধা হারাইতেছেন। আমরা অনুরোধ করিব—ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা বাস্তব বিচার-বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করতঃ তাঁহাদের সর্বনাশা ভাষানীতি পরিবর্তন করুন। এ পর্যন্ত তাঁহারা যে ভুল করিয়াছেন, ভারতের জনগণ তাহা ক্ষমা করিতে পারিবে; কিন্তু তাঁহারা যদি এই বিপদে আরও বেশী অগ্রসর হন, তাহা হইলে এ দেশের সংহতি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি প্রচুর রক্তপাতের সম্ভাবনাকেও উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না।

অতীতের দিকে চাহিয়া দেখুন—বহু রাজ্যে বিভক্ত এই বিশাল উপমহাদেশের প্রত্যেকটি রাজ্যে একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই ছিল একাধারে রাজভাষা ও রাষ্ট্রভাষা। এই ভাষার সাহায্যে শুধু ভারতের অভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন রাজ্যের সহিতই যোগাযোগ রক্ষা করা হইত না; চীন, গান্ধার, পারস্ত, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশের সহিতও যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হইত। খ্রীষ্টের জন্মের শতাব্দিক বৎসর পূর্বে রোমসম্রাটের সহিত দক্ষিণ ভারতের কোন প্রভাবশালী নৃপতির যে দূতবিনিময় হইত, তাহাতেও সংস্কৃত ভাষাই যে ব্যবহৃত হইত ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফা-হিয়েন, হিউ-এন্স-সাং, ই-সিং প্রভৃতি চৈনিক পর্যটকেরা একমাত্র সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের, এমন কি সিংহল প্রভৃতি দেশের নৃপতিগণের সহিতও আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, সমুদ্র-গুপ্ত প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত হিন্দুনৃপতিরা একমাত্র সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই রাষ্ট্রের বাবতীয় কার্য পরিচালনা করিতেন। একমাত্র এই সংস্কৃত ভাষায়ই ভারতের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি প্রভৃতি নিবদ্ধ আছে। শুধু বৈদিক ধর্মই নহে; বৌদ্ধ এবং জৈনগণের ধর্মগ্রন্থগুলিরও অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। অতএব এই সংস্কৃতকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা না করিবার কোন সম্ভব কারণ নাই।

উত্তর ভারতের তো বটেই, দক্ষিণ ভারতের তামিল প্রভৃতি ভাষাতেও শতকরা ৮০টি সংস্কৃত শব্দ রহিয়াছে। গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি ইউরোপীয় এবং পারসিক, কশ প্রভৃতি এশিয়া মহাদেশের ভাষাগুলিতেও অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ রহিয়াছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যে সংস্কৃতের দাবীই অগ্রগণ্য, ইহা অস্বীকার করিবায় উপায় নাই। আর্য্যসংস্কৃতির জননী সংস্কৃতভাষা বর্তমানে পৃথিবীর সর্বদেশের বিশিষ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে অধীত ও আলোচিত হইতেছে; কিন্তু ভারতের কোন প্রাদেশিক ভাষাকেই ঐ সকল বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্কৃতের মত মর্যাদা দিবে না, ইহা অনিশ্চিত। ভারতকে জানিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই জানিতে হয়; এই জন্তই বিদেশে সংস্কৃতের এত আদর। হিন্দী বা অল্প কোন ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে সমগ্র ভারতকে জানা কোন মতেই সম্ভব নহে; অতএব বিদেশে সংস্কৃতের স্থানে হিন্দী বা অল্প কোন ভারতীয় ভাষাকে কোন দেশের মনীষীরাই স্থাপন করিবেন না।

দুঃখের বিষয়—ইংরেজ শাসনকালে সংস্কৃত ভাষার অনতিদূর শাসকেরা ‘মরা ভাষা’ বা dead language বলিয়া সংস্কৃতের উপর যে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিল আজও ভারতের এক শ্রেণীর লোক তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ হইতে একজন ইংরাজীভাবাপন্ন ভারতীয় সংস্কৃতভাষাপক জার্মানী দেশে গেলে তথাকার এক বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের (বার্লিন?) জার্মান সংস্কৃতভাষাপক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। জার্মান অধ্যাপক সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্ন করিলে যখন ভারতীয় অধ্যাপক ইংরাজীতে উত্তর দিতে লাগিলেন, তখন বিরক্ত হইয়া জার্মান অধ্যাপক প্রশ্ন করিলেন—আপনি ভারতের লোক এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক, তবে কেন সংস্কৃতে কথা বলিতেছেন না? উত্তরে ভারতীয় অধ্যাপক বলিলেন—“উহা যে মরা ভাষা।”

ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষাপকের মুখে উল্লিখিত মন্তব্য শুনিয়া জার্মান অধ্যাপক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে থাকিলে নিরুপায় ভারতীয় অধ্যাপক

নিজের অশোভন মন্তব্যের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। বহু বৎসর পূর্বে ১১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত Truth নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই সংবাদটি পরিবেশিত হইয়াছিল এবং কয়েক বৎসর পূর্বে অখিল-ভারত সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে কলিকাতার স্বনামধন্য প্রবীণ চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহোদয় উক্ত অধ্যাপক এবং জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়টির নামও বলিয়াছিলেন। এতদিন পরে নামগুলি আমার মনে পড়িতেছে না। সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে যাহারা ছেয় মনে করে, তাঁহাদের বিদেশ গমনের ফলে বিদেশে ভারতের মর্যাদা যথেষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না।

সংস্কৃতবিরোধীদের নামক লর্ড মেকলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এক বিশাল স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজটিকে তুলিয়া দিতে চাহিলে যখন সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সংস্কৃতভাষাবিদ মহাপ্রাণ উইলসন (H. H. Wilson) সাহেবের কাছে, মেকলের আক্রোশ হইতে সংস্কৃত কলেজটিকে রক্ষা করিবার জন্ত আবেদন করেন, তখন ইংলণ্ডে বসিয়া মহামতি উইলসন যথার্থই ইহার প্রতিকার করিয়াছিলেন। এই মহাপ্রাণ ইংরেজ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কাছে সহানুভূতিশূচক এবং উৎসাহ-ব্যাঞ্জক যে পত্রখানা সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা প্রশিধানযোগ্য। পাঠকগণের অবগতির জন্ত উক্ত পত্র হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। যথা:

“ন জানে বিদ্যাতে কিন্তুম্মাধুর্য্যমজ সংস্কৃতে।

সর্বদৈব সমুদ্রস্তা ধেন বৈদেশিকা বয়ম্॥”

[না জানি সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কি এক অপূর্ব মাধুর্য্য রহিয়াছে, যাহার ফলে আমরা বিদেশবাসী হইয়াও এই ভাষা শিখিবার জন্ত সর্বদাই অধীর হইয়া থাকি]

“অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোহধিকম্।

দেবপ্রাহ্মমিদং বস্মাদ্ দেবতাস্যেতি কথ্যতে॥”

* [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ‘শাস্ত্রী’। জার্মান অধ্যাপকের নাম Paul Deussen.—প্রঃ সঃ]।

[অমৃত অতিশয় মিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে ; কিন্তু সংস্কৃত ভাষা অমৃতের চেয়েও বেশী মধুর। যেহেতু দেবতারা সংস্কৃত ভাষাটিকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন, এই কারণেই ইহাকে দেবভাষা বলা হয়]

“যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিদ্যা-হিমাচলৌ।

যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্।”

[যতদিন ভারতবর্ষ থাকিবে, যতদিন বিদ্যা ও হিমা-
লয় পর্বত থাকিবে, যতদিন উত্তর ভারতে গঙ্গা ও দক্ষিণ
ভারতে গোদাবরী নদী থাকিবে ততদিন সংস্কৃত ভাষার
বিলোপ হইবে না]

বিদেশের বিচক্ষণ মনীষীরা সংস্কৃত ভাষাকে কোন চক্ষে
দেখেন, উল্লিখিত কথাগুলি দ্বারা তাহা ভালভাবেই বুঝা
যাইতেছে। সংস্কৃত যে ‘মরা ভাষা’ নহে, তাহার প্রমাণ
হিসাবে পাঠক-পাঠিকাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই
যে, আজও ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে সংস্কৃত ভাষায়
বহু সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক ও
পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। আজও ভারতের
বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতভক্ত লোকেরা এই সুমধুর ভাষায় নানা
শ্রেণীর বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। আজ ভারতের
বিভিন্ন নগরে সংস্কৃত ভাষায় পুনঃ পুনঃ নাট্যাভিনয়
হইতেছে। এমন কি, শেষ পর্য্যন্ত সর্বভারতীয়
বেতার যন্ত্র (All India Radio)-ও সংস্কৃত ভাষায়
বক্তৃতা, নাটক ইত্যাদি পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিয়া-
ছেন। ইহার পরেও যদি কেহ বলে—সংস্কৃত মরা ভাষা
(dead language), তাহা হইলে সেই ব্যক্তির গর্ভদেশে
চপেটঘাত করিলে কি অস্ত্রায় হইবে ?

পৃথিবীর যাবতীয় জীবন্ত ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই
সর্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ ভাষার প্রাণ যে রস ও মাধুর্য্য, তাহা
সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক। ধ্বনি, অলঙ্কার,
রীতি প্রভৃতিতেও সংস্কৃতের সমকক্ষ অন্য কোন ভাষা নাই।
অধ্যাত্মবিজ্ঞা সংস্কৃত ভাষায়ই প্রথম লিপিবদ্ধ হয় এবং
আজও এই বিষয়ে সংস্কৃতের সমকক্ষ দ্বিতীয় ভাষা পাওয়া
যায় না। হিন্দুজাতি সংস্কৃত ভাষার অনাদর করিতে
পারে না ; কারণ তাহার ধর্ম, তাহার সংস্কৃতি, তাহার
পিতৃপিতামহের মহানু ঐতিহ্য, তাহার ধর্ম্ভার্য্যে পঠনীয়

মন্ত্র, তাহার সামাজিক বিধানাবলী—সব কিছুই সংস্কৃত
ভাষায় লিপিবদ্ধ। ভারতের বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করিতে
করিতে এই সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া মহাত্মা
শঙ্করাচার্য্য রাজপ্রসাদপুত্র, ঐশ্বর্য্যসম্বলিত সমৃদ্ধ, আত্মিক
শক্তির উৎস বৌদ্ধ প্রভৃতি শক্তিশালী ধর্ম্মকে বিনা
রক্তপাতে পরাস্ত করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ মহানু
মহীরহের অশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত ভাষার শক্তি আর্থিক শক্তির চেয়েও বড় ;
কারণ ইহা হিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে ; অঞ্চ সমৃদ্ধ
অস্ত্রবলকে পরাস্ত করিতে সমর্থ। সংস্কৃত ভাষায় যে
সকল রাজনীতিশাস্ত্র লিখিত আছে, তাহা একবার পাঠ
করিলে বর্তমান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিকও বিস্ময়ে
বিমূঢ় হইবেন। এত গুণের আধার সংস্কৃত ভাষাকে যে
আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কেরা কেন রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা
দিতেছেন না, ইহাই বিশ্বের বিষয়।

একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমরা কিছুটা স্বস্তিবোধ
করিতেছি। হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় যে সকল
পরিভাষা রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিই সংস্কৃত
হইতে গৃহীত। রাষ্ট্রপতি, রাজপাল, রাজভবন, প্রধানমন্ত্রী,
প্রচার-সচিব, মুখ্যমন্ত্রী, নগরপাল, বিশ্ববিদ্যালয়, মহা-
বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সর্কার্গাধক বিদ্যালয়,
করণিক, পরিবহন, সরণি, সেতু প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের
প্রত্যেকটি শব্দই ঋগ্ভিৎসংস্কৃত। এইগুলির সহিত অল্পস্বর,
বিসর্গ এবং অস্তি, যাতি, ভবতি, খাদতি প্রভৃতির মত
সহজ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলেই ঋগ্ভিৎসংস্কৃত ভাষা হইয়া
যাইবে। দেবনাগর অক্ষরটিকে তো হিন্দীপ্রেমীরাই
চালাইয়া দিতেছেন।

দক্ষিণ ভারতে ভাষা লইয়া আজ যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম
আরম্ভ হইয়াছে, ইহা বাহাতে সমগ্র ভারতে হুড়াইয়া না
পড়ে, তাহার জন্য আমাদের সরকারের উচিত—অবিলম্বে
সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করিয়া বর্ণাধ
রাজনীতি, দূরদর্শিতা, চিন্তাশীলতা ও নিরপেক্ষ বিচার-
বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া। ইহা ছাড়া—

“নাতঃ পছাঃ বিদ্যতে অয়নায়।”

(ভারতের সংহতি রক্ষার অন্য কোন উপায় নাই)।



শিল্পীঘন

— শ্রীধর লোকে ধীর —

(পূর্বাহ্নবৃত্তি : মাঘ, ১৩৭১ সংখ্যার পর)

শিল্পী সারাদিন বসে বসে পাথর খোদাই করে।
স্বর্ষোদয় থেকে স্বর্ষাস্ত।

নিরালা এসে কাছে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে
তারপর অরণ্য করিয়ে দেয়—শিল্পী, আহারের সময় হলো।

কখনো বা বলে—এভাবে পরিশ্রম করা তোমার
দেহে সস্থ হবে না। শিল্পী, তোমার দেহ এখনও অপটু,
কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও।

দেবকুমার তদগতভাবে উত্তর দেয়,—তুমি কিছু ভেবো
না নিরালা, মূর্তিটা আগে শেষ করে নিই তারপর কয়েক-
দিন একেবারে বিশ্রাম-করবো—খাবো আর ঘুমবো।

অপরায় বেলায় নিরালা শিল্পীর কাছে এসে বসে,
সারাদিনে কতটা কাজ হলো দেখে। সম্ভার অঙ্ককার
ঘনিষে ওঠা অবধি দেবকুমারের হাতের বিরাম নেই।
অঙ্ককারের আভাষ দেখলে ছেদক, ক্ষোদক প্রহারকগুলি
সম্পূর্ণে লাল সাপের থলিটির মধ্যে রেখে দিয়ে বলে—আর
একটু আলো পেলে আজ আঙুলের কাজটা শেষ করতে
পারতাম, মূর্তির ডান হাতের আঙুলগুলি আজ আর
হলো না।

নিরালা বলে—চল, একটু নদীর ধারে গিয়ে বসি।

নির্লিপ্তভাবে দেবকুমার বলে—চল।

নদীর ধারে চূপ করে দেবকুমার বসে থাকে, কথা-
বার্তা বিশেষ কিছু বলে না।

কোন এক সময় নিরালা বললো—কি ভাবছ ?

—ভাবছি আমার মূর্তিটা সর্বাদ্বন্দ্বের করতে পারবো-
কিনা কে জানে। যদি কোথাও এতটুকু ব্যর্থতা দেখা
দেয় তাহলে সব পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।

—ব্যর্থ হবে না—নিরালা বললো।

—সত্যি ?

—সত্যি।

—কি করে তুমি বুঝলে ?

—তুমি যতক্ষণ মূর্তি গড়, আমি ততক্ষণ ভগবান
তথাগতের রূপা প্রার্থনা করি।

—আমি তো সারাদিন ক্ষোদাই করি।

আমিও সারাদিন দেবতাকে জানাই।

এবার দেবকুমার নিরালার মুখের পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে
তাকালো। নিরালার চোখে সে কি দেখলো সে-ই
জানে, মূহুর্তে ডাকলো নিরালা।

—শিল্পী।

দেবকুমার নিরালার একখানি হাত নিজের হাতে
নিয়ে তার আঙুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে
লাগলো। নিরালা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শিল্পীর
মুখের পানে।

দিন যায়। স্বাধীশ্বরের বর্ধনবংশের যুবরাজ
শিলাদিভ্য হর্ষবর্ধন ইতিমধ্যে উত্তরভারতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি
করেছেন। মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত
করে তিনি কান্তকূজের পথে স্বাধীশ্বর অবধি ঘুরে
এসেছেন। স্বাধীশ্বর, কান্তকূজ ও মালবের শাসন ব্যবস্থা
অদৃঢ় করে দিগুণ সৈন্য নিয়ে তিনি ফিরে এলেন
প্রতিষ্ঠানে। পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, হুড়ি হাজার
অঝোরোহী ও পাঁচ হাজার রণহস্তী নিয়ে তিনি এবার
গৌড়বঙ্গে অভিযান করবেন।

গৌড়বঙ্গে রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের প্ররোচনায়
মালবরাজ কান্তকূজ আক্রমণ করেছিলেন। এবার

রণক্ষেত্রে শশাঙ্কে তার মূল্য দিতে হবে। মালবরাজ দেবগুপ্ত প্রাণ দিয়ে হঠকারিতার প্রায়শ্চিত্ত করেছে, শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তও হর্ষবর্ধনের কাছে ক্ষমা পাবেন না। চাণক্যের শাস্ত্রে আছে—শত্রুর শেষ রাখতে নেই। শ্রীহর্ষ শত্রুর শেষ করবেন।

মহাস্থবির জ্ঞানপুত্র তিস্তু-তিস্তুগীর সেবাদল নিয়ে ফিরে এসেছেন।

দেবকুমারের বুদ্ধমূর্তি দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন, বললেন—শিল্পী, অপূর্ব তোমার সৃষ্টি! এতো অল্প বয়সে এমন কৃতিত্বের পরিচয় বড়-একটা দেখা যায় না।

পরদিন অপরাহ্নে যুবরাজ শ্রীহর্ষ সেনা পরিদর্শন করছিলেন। দুর্গ প্রাকার থেকে সংঘারাম অবধি গঙ্গা-তীরের বিস্তৃত ভূমিতে সেনাবাহিনীর ছাউনি পড়েছে। দেখতে দেখতে সম্ভারামের কাছে যখন তিনি এসেছেন, জ্ঞানপুত্র তাঁকে আহ্বান জানালেন,—রাজকুমার, আমি আজ তোমাকে এক অপূর্ব শিল্পকর্ম দেখাবো, তুমি একবার সম্ভারামে এসো।

আমগাছের নীচে বুদ্ধমূর্তিটি দেখে শ্রীহর্ষ বিস্মিত হলেন, বললেন—অপরূপ মূর্তি। কোন্ ভাস্করের তৈরী প্রভু?

জ্ঞানপুত্র দেবকুমারের সঙ্গে শ্রীহর্ষের পরিচয় করিয়ে দিলেন। যুবরাজ বললেন—শিল্পী, কাল তুমি সভার যেও, তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে।

তারপর জ্ঞানপুত্রকে বললেন—প্রভু, এ মূর্তিতেও এভাবে রাখা অসুচিত। এক উপযুক্ত চৈতন্য নির্মাণ করে এই মূর্তিটি স্থাপনা করুন। চৈতন্য নির্মাণের ব্যয় আমি বহন করবো।

জ্ঞানপুত্র যুবরাজের কল্যাণ কামনা করলেন।

প্রতিষ্ঠান দুর্গমধ্যে শ্রীহর্ষের রাজসভা।

প্রাসাদের বিরাট সভাঘর। কারুকার্যখচিত বড় বড় পাথরের থামের বারান্দা। বারান্দার কেন্দ্রে উচ্চ পাথরের বেদীর উপর স্তূর্ণখচিত সিংহাসন। ছপাশে পর পর সারি সারি আরো কয়েকটি আসন। তারপর

সেই আসন সমান্তরালে দু'পাশের বারান্দার দুই বাহুতে বিস্তৃত। দুই বাহুর মাঝে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মাথায় সোনার ঝালর দেওয়া চত্ৰাতপ। স্বর্ষোদয় থেকেই একে একে সন্তাসদেরা সমবেত হয়েছেন। প্রাঙ্গণ ও বারান্দার দুই বাহু পদমর্যাদা অনুসারে পূর্ণ হয়ে গেছে। দক্ষিণ বাহুতে সুসজ্জিত সেনানায়কগণ, বাম বাহুতে অভিজাত ও শ্রেষ্ঠীর দল আসন গ্রহণ করেছেন। সামনে প্রাঙ্গণের চাঁদোয়া ঢাকা নিম্নভূমিতে সাধারণ নাগরিকদের স্থান। সকলেই প্রতীক্ষা করছেন, যুবরাজ এখনই এসে পড়বেন।

দু'দণ্ডের মধ্যে ঘোষক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলো—বর্ধনকুলভিলক দিগ্বিজয়ী যুবরাজ মহাপরাক্রম মহামাভ যুবরাজ শিলাদিত্য শ্রীহর্ষবর্ধনের জয় হোক।

ভেরী বেজে উঠলো। যুবরাজ শ্রীহর্ষ পাশের দরজা দিয়ে সভা-ঘরে প্রবেশ করলেন। দু'পাশে দু'জন মুক্ত রূপাণ হস্তে দেহরক্ষী, তার পিছনে মহামাভ ভাতী, রাজ-দ্রোতা মাধবগুপ্ত ও কয়েকজন বিশ্বস্ত মাণ্ডলিক—ভদ্রেস্বর দুর্গের অঘোর ভট্ট, স্বস্তিকা দুর্গের বিরতিবজ্র, সৌরভ হৃদের বেঙ্কটেশ প্রভৃতি। শ্রীহর্ষ আসন গ্রহণ করার পর অপরে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। সমবেত সভাস্থ ব্যক্তিরা সগম্মানে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, এবার তাঁরাও বসলেন।

এবার সভাকবি দক্ষভট্ট সামনে এগিয়ে এসে কয়েকটি শ্লোকে শ্রীহর্ষের প্রশংসা পাঠ করলেন। তারপর ঘোষক ঘোষণা করলেন—এবার সভার কাজ আরম্ভ হলো, নবগত মাণ্ডলিক ও নায়কেরা প্রস্তুত হোন।

দক্ষিণ বাহুর কয়েকজন উঠে দাঁড়ালেন। আসনের ক্রমাহুযায়ী পর পর এগিয়ে এলেন শ্রীহর্ষের সামনে। প্রথমে করে নিজ পরিচয় ও অধীনস্থ সৈন্য সংখ্যা উল্লেখ করলেন। যুবরাজের পাদপীঠের পাশেই দু'জন লিপিকার বসেছিলেন, তাঁরা সবকিছু লিপিবদ্ধ করতে শুরু করলেন।

মাণ্ডলিক ও নায়কেরা নিজ নিজ স্থানে ফিরে আসার পর ঘোষক ঘোষণা করলেন—এবার আমন্ত্রিত শ্রেষ্ঠী ও অভিজাতরা প্রস্তুত হোন।

বাম বাহর কয়েকজন শ্রেষ্ঠী ও অভিজাত দণ্ডায়মান হলেন। তারপর আসনের ক্রম অনুযায়ী শ্রীহর্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রণাম করে নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে প্রত্যেকেই এক এক মূর্তি সামনে রাখলেন, তার সঙ্গে নিজ নিজ রাজত্বের হিসাবের উল্লেখ করলেন। লিপিকার সবকিছু লিখে নিলেন।

এবার ঘোষক ঘোষণা করলো—রাজসমীপে মিবদন করার জন্য কারও কোন অভিযোগ থাকলে প্রস্তুত হোন।

এবার কাউকে কোথাও উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল না। শ্রীহর্ষের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, মিতহাস্তে তিনি এবার সামনের চম্ভাতপ তলের নাগরিকদের মুখের পানে তাকালেন। শেষ সারির মধ্যে এক স্তম্ভের গায় হলান দিয়ে দেবকুমার সভার কাজ দেখছিলেন, এমন সময় শ্রীহর্ষের দৃষ্টি পড়লো, অল্পক্ষণে তিনি আহ্বান জানালেন—শিল্পী।

দেবকুমার সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। পিছন থেকে দৌবারিক বললো—এগিয়ে যান।

দেবকুমার সিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়ালো, প্রণাম করলো।

শ্রীহর্ষ বললেন—শিল্পী, তোমার তৈরী অপরূপ প্রস্তর-মূর্তি কাল আমি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তোমাকে আমি রাজসভায় যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। হৃগ্নমধ্যে যে প্রয়াগেশ্বর বিখ্যাতের মন্দির আছে, তার অলিন্দের খিলানগুলি যোগ্য শিল্পীর অভাবে শূন্য হয়ে আছে, তুমি সেখানে কয়েকটি দেবমূর্তি তৈরী করে দাও। শিবমন্দিরে শিবের কয়েকটি পৌরাণিক মূর্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তুমি প্রতিভাবান ভাস্কর, আমি তোমার উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

পার্শ্বদ সকলের দৃষ্টি পড়লো দেবকুমারের মুখের উপর—কে এই শিল্পী? কি এর পরিচয়?

এতোগুলি মানুষের চোখ পড়েছে তার উপর দেখে দেবকুমার বিচলিত হয়ে পড়লো। সহসা কোন কথা উচ্চারণ করতে পারলো না। শ্রীহর্ষ তার মুখের পানে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—তুমি এখন থেকেই কাজ শুরু কর, আমি বিজয় অভিযান থেকে

ফিরে এসে তোমাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দানের ব্যবস্থা করবো।

—যথাস্থা!—দেবকুমার বহু চেষ্টায় শব্দটি উচ্চারণ করলো। তার পা তখন কাঁপছে। তাড়াতাড়ি মাথা নত করে প্রণাম জানিয়ে, কোন মতে সে নিজ স্থানে ফিরে এসে বসে পড়লো। তখনও সবাই তার পানে তাকিয়ে আছে দেখে সে মাথা নত করলো।

আরো কয়েকজনকে ডেকে আরো কয়েকটি নির্দেশ দেবার পর সভা ভাঙলো। দেবকুমার কোন কিছুই আর মুখ তুলে দেখলো না। না দেখেই সে অল্পভব করলো চারিপাশের বহুজনের দৃষ্টি তার গায়ে এসে বিঁধছে। ঘোষক যেই ঘোষণা করলো—‘আজকের মত সভা ভঙ্গ হলো’, বর্ধনকুলভিলক মহাপরাক্রম যুবরাজ শ্রীহর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের জয় হোক! দেবকুমার সর্বপ্রথম উঠে দাঁড়ালো এবং সবার আগে সভাকক্ষ থেকে যেখানে এলো।

সম্ভারামের প্রাঙ্গণে নিরালার সঙ্গে দেখা, হেসে বললো—যুবরাজ কি বললেন?

দেবকুমার বললো—আমি আজই এখান থেকে চলে যাবো নিরানা।

—কেন, কি হলো?

—মন্দিরে দেবমূর্তি ক্ষোদাই করতে হবে, সে আমি পারবো না।

—কেন, সে তো ভাল কাজ।

—মন যা চায় না, সারাক্ষণ তা করবো কেমন করে? আর ওই রাজসভায় ভীড়ের মধ্যে গিয়ে আমি বসে থাকতে পারবো না। আমার মর্যাদায় দরকার নেই। আমি চলে যাবো। আমি নিজের ঘরে বসে নিজের মনের মত কাজ করবো।

নিরাল্য নীরবে কয়েক মুহূর্ত শিল্পীর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

সারাটা দিন দেবকুমার আমগাছ তলে বৌদ্ধ মূর্তিটির সামনে বসে রইল। স্বর্ষের আলো এসে পড়েছে মূর্তির

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর মহাসিদ্ধি

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ

বিংশ শতকের প্রারম্ভ। ভারতে বিরাট পরিবর্তনের যুগ। উনবিংশ শতকের শেষে সংস্কার যুগের পরিসমাপ্তি। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সর্ব ক্ষেত্রেই অপূর্ব বিপ্লবের স্তম্ভ স্থচনা। নৈতিক শক্তিই এই বিপ্লবের প্রাণ। যুগ যুগান্তে অধ্যাত্ম সম্পদের সাহায্যেই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে সেই তেজ ও বীর্য, সেই শক্তি ও সম্পদ। ভারত বিশ্বত হয় আর্থ ঋষির ধ্যান-ধারণা ও তপস্তার আদর্শ।

দেশ ও জাতির সম্মুখে সেই আদর্শ নুতন করিয়া স্থাপন করেন শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু। জাতীয় জাগরণকে দান করেন নুতন গতি, বিচিত্র ছন্দ। প্রাচ্য অধ্যাত্ম জ্ঞান তাঁহার সাধনা ও মহাসিদ্ধির মধ্য দিয়া লাভ করে অস্তিনব ব্যঞ্জন। রহস্যপূর্ণ মানব-প্রেম অভিযুক্ত হয় তাঁহার অপার তত্ত্ব ও মাধুর্য বিকাশে। যুগ প্রয়োজনে তিনি প্রচার করেন শাস্ত্র ও সদাচার, সত্য ও অহিংসা, ধৈর্য ও ব্রহ্মচর্য। ঘোষণা করেন : ভারতের সাধনা গুরুমুখী; সঙ্গুরর আশ্রয় গ্রহণ তিন্ন এই সাধনার মর্মমূলে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

এই নির্দেশ অহুসারে যুগের সঙ্গুর বিজয়কৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন সর্বশ্রী বিপিনচন্দ্র পাল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ যুগনায়কগণ। তাঁহারা দেশ ও জাতিকে সজীবিত করেন নবশক্তি ও প্রেরণায়। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্ম জ্যোতিঃপুঞ্জের স্নযোগ্য প্রতিভুরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন তাঁহারই মানসপুত্র নীলকণ্ঠ শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। স্বকঠোর সাধনায় মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া প্রচার করিলেন গোস্বামী-প্রভু প্রবর্তিত প্রেমধর্ম ও শক্তি সমন্বিত শ্রীনাম। গুরুবাদের অপার মহিমা, সঙ্গুর লীলার অহুপম মাধুর্য বিকশিত হইল তাঁহার নামসিদ্ধি, বৈরাগ্যদীপ্ত দিব্যজীবনে।

শ্রাবণ মাস, ১৩০২। গয়াধাম আকাশগঙ্গায় ধ্যান ও সমাধির বিমল আনন্দে দিন কাটিয়া যায় ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের। মেঘের কোলে ঘন মেঘের কোলাহুলি—গগনে গগনে বর্ষণের বিপুল আয়োজন।

নীলকণ্ঠ কুলদানন্দের মন-প্রাণ উদাস হয়ে ওঠে সেই বর্ষা-সঙ্গীতে। ধ্যানমোহ আকাশগঙ্গা পাহাড়ে নিত্য

গায়। দেবকুমার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দেখে, অক্ষ কর্মের কোথাও কোন ক্রটি আছে কিনা। অপরাহ্ন বেলায় রোদ বখন সরে যায় দেবকুমার মূর্তিটির উপর হাত বুলায়, মূর্তিটির সর্বাঙ্গ স্পর্শ করতে চায় নিজের সমস্ত অহুভূতি দিয়ে। স্পর্শ করে উপলব্ধি করে, এ মূর্তি যেন ফুরায় না। দিনশেষের অন্তরাগে সন্ধ্যাকাশ রক্তিম হয়ে ওঠে। কালো পাথরের পাশিশ করা মূর্তিটির উপর রক্তিম জীবন্ত আভা ফুটে ওঠে। দেবকুমার গুন গুন করে ওঠে—বৃষ্ণ শরণং গচ্ছামি, সন্ধ্যং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্যং শরণং গচ্ছামি।

অন্ধকার বনিয়ে আসে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেবকুমার যন্ত্রপাতিগুলি ঝোলার মধ্যে তুলে নেয়। বেদী থেকে নামতে গিয়ে দেখে সামনে নিরাল! দাঁড়িয়ে আছে।

—শিল্পী?

—তুমি এসে পড়েছ, চল আমরা এখনি বেরিয়ে পড়ি।

—কোথায় যাবো?

—জানি না। তবে এখান থেকে আমাকে যেতে হবে। রাজসভায় আমি যেতে পারবো না। রাজার হুকুমে আমি মূর্তি গডতে পারবো না।

নিরাল! কি যেন বলতে চাইল। কিন্তু বলতে পারলো না। দেবকুমার তার হাত ধরলো, বললো—চল—

নিরাল! হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো না। দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে চললো।

গঙ্গাতীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ। ওপারে গাছের মাথায় চাঁদ দেখা দিয়েছে। এপারের পথ নিঃসীম ধূমেল প্রান্তরের পানে প্রসারিত। মাঝে মাঝে শাখা প্রশাখাবহল এক একটা গাছ। রাত্রির ছায়াঘন অন্ধকারে স্তিমিত চন্দ্রালোক এক স্বপ্নজড়িত রহস্য সৃষ্টি করেছে। সেই অশ্রুত রহস্যময় পথে দুটি গম্যমান তরুণ তরুণীর ছায়া ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে গেল।

শেষ

নিয়ত আত্মসমাহিত। ধীরে ধীরে ভাসিয়া ওঠে লক্ষকোটি আত্মের সঙ্করণ মুখচ্ছবি। দিগ্দিগন্তে প্রতিধ্বনিত শতসহস্র কণ্ঠের আকুল আবেদন : কৃপা করে আমায় শ্রীচরণে আশ্রয় দেবেন।

অজ্ঞাতে তাঁহার চক্ষু দুটি সজল হইয়া আসে।

প্রাণ দিয়া তিনি অমৃতভব করেন মুক ধরিত্রীর বৃক্ষাচ্ছাদিত সঙ্করণ আর্দ্রনাদ। মনে পড়ে শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ—অন্তর্লোকে ভাসিয়া ওঠে তাঁহার প্রসন্ন অপরূপ রূপশ্রী। কামধেনুর মত পুণ্য পীযুষধারা পরিবেশনের ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া ওঠেন ধ্যানমগ্ন নীলকণ্ঠ।

একদিন সহসা উপস্থিত হইলেন কুনুসুহুর এক আগরওয়াল—জয়পুরের মাড়োয়ারী তীর্থধাত্রী, তাঁহার হস্তে তিনি সাগ্রহে সাধুদের ভাণ্ডারা দিতে চাইলেন। কুলদানন্দজী অহমতি দিলে সানন্দে বহু সাধুকে, বৈষ্ণবকে, সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণকে পরিতৃপ্তিসহকারে প্রসাদ বিতরণ করিলেন আগরওয়াল।

ব্রহ্মচারীজীর মনে পড়িল ঠিক বার বৎসর পূর্বে ১২ই শ্রাবণের কথা। এইদিন শ্রীগুরুদেবের নিকট তিনি লাভ করেন দুর্লভ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত। ছয় বৎসর পূর্বে গুরুজীর নির্দেশে তাঁহার ব্রত আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ঘাষিত হয় বটে; তবুও এই ব্রতের নির্ধারিত কাল পূর্ণ হইল। এতদিনে, সূত্বর্গম সাধনার পথে গুরু কৃপায় আজ সার্বক তাঁহার জয়যাত্রা। তাই কি দয়াময় শ্রীগুরুদেব অপ্রত্যাশিতভাবে আজ এই ভাণ্ডারার মধ্য দিয়া সুসম্পন্ন করাইয়া লইলেন অধম সন্তানের সিদ্ধির উৎসব?... ভাবিয়া শ্রীগুরুর অনন্ত কৃপা ও অপরিমিত স্নেহে কুলদানন্দের চক্ষে দেখা দিল পরাতত্ত্ব ও আনন্দের ধারা।...বুঝিলেন অতঃপর সদগুরুর মহিমা প্রচারে তাঁহাকে ব্রতী হইতে হইবে...অগ্রসর হইতে হইবে প্রেমধর্ম প্রচারের পথে...শতসহস্র পতিত ভূষিত তাপিত জীবকে আকর্ষণ করিতে হইবে তগবান বিজয়কৃষ্ণের অত্যন্ত শ্রীচরণে। গুরুকৃপায় যে পরম বস্তু লাভ করিয়াছেন তাহা এবার বিলাইয়া দিতে হইবে জগতের হিতার্থে। তবেই তো দেখা দিবে ব্রত ও সংগ্রাম, সাধনা ও সিদ্ধির

পরম সার্থকতা। জীবন-পারাবারে যে স্মৃধার স্বাদ পাইয়াছেন গুরু-নির্দেশে তাহাই তাপিত জগৎকে দান করিবার সংকল্প করিলেন।

এই মহাসিদ্ধি লাভের পর পর্বতশৃঙ্খল সমাধিস্থ থাকিতে পারেন নাই কুলদানন্দ। তিনি অবতীর্ণ হইলেন সমাজ ও সংসারের মাঝে—সিদ্ধিলাভের পঞ্চম ও চতুর্থ স্তরে। আবার নিরলায় সপ্তম স্তরে সমাধিস্থ হইয়া সম্ভোগ করিতেন পরমানন্দ।

ভাল কিছু লাভ করিলে প্রেমিক তাহা আপন জনের মাঝে বিলাইয়া দিতে ব্যাকুল হইয়া উঠেন, ব্যথিতের বেদনায় হন পরহিতে তৎপর। এইজন্ত সিদ্ধকাম সম্যাসী ফিরিয়া আসেন জনসমাঙ্গে, তাপক্লিষ্ট নরনারীর অন্তরে বর্ষণ করেন পরমা শান্তি ও সাধুনা, স্মৃতিসমাঙ্গে পরিবেশন করেন সাধনালব্ধ সত্য ও প্রজ্ঞা; ভগবান বৃন্দদেব ফিরিয়া আসেন গুরুত্যাগী ভক্তদের মাঝে, প্রচার করেন প্রেম ও অহিংসার বাণী। আচার্য রামানুজ নিজের অমল্ল তুচ্ছ করিয়া বিশ্বকল্যাণে গুরুদত্ত অতি গোপন মন্ত্র ঘোষণা করেন উচ্চ কণ্ঠে। শ্রীমায়ের কৃপা লাভ করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে উন্মুখ হন শ্রীরামকৃষ্ণ। আকাশগঙ্গা পাহাড়ে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর কৃপায় গোস্বামীপ্রভুও মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া পরম কল্যাণের তাগিদেই ফিরিয়া আসেন সমাজ ও সংসারে।

যোগিরাজ কুলদানন্দের জীবনেও দেখা দিল তাহারই পুনরাবৃত্তি। গোস্বামীপ্রভু সত্য প্রচারে ব্রতী হন নিজ গুরুর আদেশে। কুলদানন্দজীর কল্যাণ-ধর্ম প্রচারের পন্থাতেও ছিল শ্রীগুরু গোস্বামীপ্রভুর প্রত্যক্ষ নির্দেশ। শ্রীগৌরাজ মহাপ্রভু তথা নবগৌরাজ গোস্বামী প্রভুর অজ্ঞাপা সাধন, প্রেমধর্ম ও সদগুরুর সেবাপূজার প্রচারের জন্তই কুলদানন্দের এই মহাসিদ্ধি লাভ, এই ব্যাপক প্রস্তুতি।...গোস্বামীপ্রভু নিজের আরও কর্মধারা উপযুক্ত আধারের মাধ্যমে অপূর্ব কৌশলে সুসম্পন্ন করাইবার জন্তই সমুদ্রবক্ষে নিশ্চিত মৃত্যুর ঘার হইতে উদ্ধার করেন মানসপুত্র কুলদানন্দকে; আর আজ এইভাবে তাঁহাকে মহাসিদ্ধি লাভের মাধ্যমে যথোচিতভাবে প্রস্তুত করিয়া নিয়োজিত করিলেন জনকল্যাণ-ব্রত উদ্ঘাপনে।

ভারতের বেকার সমস্যা

শ্রীরাধাবল্লভ দে

ধন সম্পদ, শ্রম সম্পদ, বুদ্ধ-লভা-শুভ সম্পদ, জল ও মৃত্তিকা সম্পদে ভারত পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়—ভারত হইতেই সমস্ত কাঁচা মাল পৃথিবীতে রপ্তানী হয়, তবুও ভারতের বেকার সমস্যাটি চিরন্তন। এ বেকার সমস্যাটিকে মোটামুটি তিনভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) কৃষি কার্যের বেকার, (২) শিল্পের বেকার, (৩) চাকুরির বেকার। ভারত শিল্প-প্রধান দেশ। এখানে শতকরা ৬৫-৭০ জন কৃষিজীবী আর ৩০-৩৫ জন অন্যান্য উপায়ে জীবিকার্জন করে। এই কৃষিজীবীদের মধ্যে কতক উপার্জনশীল, অর্থাৎ নিজেদের পরিবারের প্রতিপালন করিতে পারে, কতক আংশিক উপার্জনশীল অর্থাৎ তাহাদের উপার্জন পরিবার পালনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, বাকি অর্ধেক লোক সম্পূর্ণভাবে বেকার-পোষ। এ বেকার সমস্যার কারণ অসুস্থকান করিতে গেলে দেখা যায় অনুন্নত সনাতন চাষ ব্যবস্থা। অনুন্নত শিল্প, ক্রম-বর্ধমান বিরাট জনসংখ্যা এবং শিক্ষিত লোকের বৃদ্ধিও বেকার সমস্যার ইচ্ছন যোগায়।

কৃষিকার্যকে নিয়েই আরম্ভ করা যাক। কৃষির সুব্যবস্থা যে একান্ত প্রয়োজন ইহা সর্ববাদীসম্মত। বহু কৃষিজমি আবাদযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পতিত আছে। এ সমস্ত জমি আবাদ হইলে খাদ্য সমস্যা ও বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। আর চাষের ব্যাপারে পাশ্চাত্য চাষ-রীতি অনুসারে আধুনিকতম যন্ত্রপাতির দ্বারা কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। তবে ভারতবর্ষের মত অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশে যে রকম প্রবর্তন প্রযোজ্য সেই রকম প্রবর্তনই প্রয়োগ করিতে হইবে। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। আর একটি বড় কথা ভারতের মত দরিদ্র দেশের কৃষকদের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে রাষ্ট্র ও হনিক সম্প্রদায়ের অর্থ সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। শহরে এবং পল্লীতে কৃষি-শিক্ষার অনুষ্ঠান এবং কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল।

বেকার সমস্যা

ভারত দরিদ্র দেশ। পাশ্চাত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক-পরিচালিত শিল্পপ্রধান দেশের পক্ষে যাহা প্রযোজ্য তাহা ভারতবর্ষের মত সর্বপ্রকারে অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশের

পক্ষে সম্পূর্ণ অচল। এখানে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয় করিয়া মেশিনকে শ্রমিকের সাহায্যে আনিতে হইবে, কিন্তু শ্রমিককে বিভাড়িত করা চলিবে না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ জিনিষটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি কারখানায় হইবে না। সূতা তৈরি এবং কাপড় বয়ন এই দুইটি কাজের প্রথমটি মেশিনে হইবে। দ্বিতীয়টি তাঁতিদের ঘরে ঘরে হইবে। কিন্তু ছোট কারখানার তাঁতিরাও বড় কারখানার মত বিদ্যুৎ ও আধুনিকতম যন্ত্রপাতির দ্বারা কাপড় বয়ন করিবে। ইম্পাত বড় কারখানায় হইবে, কিন্তু ইম্পাতের দ্রব্যগুলি ছোট কারখানায় হইবে। বৃহৎ শিল্প ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করিবে। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারতা নির্ভর করিবে বৃহৎ শিল্পের উৎকর্ষের উপর, আবার বৃহৎ শিল্পের বিস্তার হইবে ক্ষুদ্র শিল্পের সাফল্যের দ্বারা—এইরূপ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয়ে শুধু শিল্পের কেন কৃষিরও বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারিবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বেকার সমস্যার প্রধান কারণ বর্তমানে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই বি. এ., এম. এ., বি. এসসি., এম্. এসসি. পাশ করিয়া কেরাণী, মাষ্টারি, জ্যোর প্রফেসারির চাকুরি চায়। শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য কৃষির কাজ কি অল্প কলকলার কাজকে ঘূণার চক্ষে দেখে। একটা পাশ করিবার পর যদি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষার্থী কোন কারখানায় শিক্ষানবীশী করিয়া স্বাধীন ব্যবসা করে তাহা হইলে এ পেশা কেরাণী ও মাষ্টারির চেয়ে বেশী লাভদায়ক হয়। বর্তমান শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আমি টেকনিক্যাল ট্রেনিংয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে চাই। রাষ্ট্র ও হনিক সম্প্রদায়ের সমবেত আর্থিক সাহায্য এবং শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দ্বারাই শিক্ষিত বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান আশা করা যায়। টেকনিক্যাল শিক্ষার অনুষ্ঠানের যথেষ্ট অভাব আছে।

বেকার সমস্যার আর একটি কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা হ্রাসের সমাজ সমস্যা এখন জটিল রাষ্ট্রীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। অনুনিয়ন্ত্রণ দ্বারা জনসংখ্যা হ্রাসের কার্যকরী প্রচেষ্টা ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাতে ভবিষ্যতে স্ফল আশা করা যায়।

মৌন মিছিল

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

মৌন মিছিল। প্রাথমিক থেকে মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কলিকাতার রাজপথে দীর্ঘ মিছিল বের করলেন, কোন সাড়া নেই। শুধু নীরব অভিযোগ। বহু জ্ঞানী গুণী শিক্ষাবিদেব এই নীরব পথ-পরিক্রমা বাংলা শিক্ষিত সমাজের কাছে এমন এক আবেদন যা স্বতঃই অভিতাবক সমাজকে দুর্ভাবিত করবে।

জাতির ঐতিহ্য রক্ষার একমাত্র অবলম্বন শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার ধারক ও সহায়ক শিক্ষকরা, জাতিকে বড় করতে হলে এই শিক্ষক শ্রেণীকে সমাদরে পোষণ ও পালন করতে হবে। শিক্ষকেরা যদি অনাদৃত থাকে তাহলে জাতি-মানস অবনমিত হবে। শুধু ব্যবসা বাণিজ্য ও কল কারখানার লেনদেনের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি রক্ষা পাবে না, সমৃদ্ধিও স্থায়ী হবে না। ইংরাজী আমলে ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করার কোন দায় ব্রিটিশ সরকারের ছিল না, তারা কেরানী তৈরী করতে চেয়েছিল, শিক্ষার গতি ও প্রগতি সেইদিকেই কেন্দ্রীভূত করা ছিল। তার বাইরে কিছু করতে হলেই জবাব মিলতো—টাকা নেই।

স্বাধীনতার পর শিক্ষার ধারা বদলের প্রয়োজন হয়েছে, জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন প্রগতি রক্ষা করার জন্ত। এই দিকের গুরুত্ব বিচার বিবেচনা করার জন্ত ১৯৩৯ সালে ওয়ার্ল্ড ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন বসে। মহাত্মা গান্ধী তাতে উপস্থিত ছিলেন, তখন কথা ওঠে : শিক্ষা হবে জাতীয় ও জীবনমুখী। তারই ফলে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হলো। তারপর আবার এক শিক্ষা কমিশন বসলো ডক্টর মুনালিয়রের সভাপতিত্বে। সেই কমিশনের বিবরণের ভিত্তিতে ১৯৫৭ সালে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হলো। মাধ্যমিক পাঠ্যকাল এক বছর বাড়িয়ে তাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার চেষ্টা হলো।

এই স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এক ভীতিজনক ব্যাপার।

নবম ও দশম শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হলো একাদশ শ্রেণী।

নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে ১৩০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা দিতে হয়, কিন্তু একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা হয় ১০০০ নম্বরের মধ্যে।

নবম শ্রেণীতে উঠলেই নিজ নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ ঠিক করে নিতে হয়, কে সারাজীবন সাহিত্য নিয়েই কাটাবে, কে শুধু বিজ্ঞানের চর্চা করবে আর কে পড়বে বাণিজ্য পদ্ধতি। তার সারা জীবনই সেই লাইনে থাকতে হবে। তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়ের পক্ষে এ বড় সহজ ব্যাপার নয়। যে এই সময় সাহিত্য পড়বে, বিজ্ঞানের সঙ্গে তার আর যোগ থাকবে না। যে বিজ্ঞান নিয়ে পাস করবে সে সাহিত্যের কোন বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে না। তেরো বছরের ছেলের রুচি তেইশ বছরে যদি বদলায়, স্বাধীন দেশের উচ্চশিক্ষার দরজা সেজ্ঞা খুলে দেওয়া চলবে না। আর যদি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভুল ঘটে যায় সে ভুল তাকে বহুতে হবে সারা জীবন।

এই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার জন্ত নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর একটি ছাত্রের ৩০ থেকে ৩৬ খানি বই অবশ্য পাঠ্য। এই সব বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা মোটামুটি ৮০০০ থেকে ৯০০০ পৃষ্ঠা। এর উপর আছে নোট বই, টেষ্ট পেপার, সাজেসশন প্রভৃতি।

এবার ইস্কুলে বছরে ক'দিন ক্লাস হয় সেই কথা উঠে : বছরের প্রথমে বই কেনা ও সরস্বতী পূজা প্রভৃতি ব্যাপারে প্রায় ১৫ দিন ক্লাস হয় না।

পুরো জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্মের ছুটি। পূজার ছুটি একমাস। পুরো ডিসেম্বর মাস পরীক্ষা ইত্যাদির ব্যাপারে ক্লাস হয় না। ছুটি টার্মিঙাল পরীক্ষায় অন্ততঃ পনেরো দিন ক্লাস হয় না।

এইতো গেল চার মাস। বাকি আট মাসের মধ্যে স্নাতক দিবস (১) গণতন্ত্র দিবস (১) ঈদ (১) সরস্বতী পূজা (২) দোল (১) চৈত্র সংক্রান্তি ও নব বর্ষ (২) গুড-ফ্রাইডে (৪) মূহরম (১) স্বাধীনতা দিবস (১) জন্মষ্টমী (১) মহালয়া (১) রবীন্দ্র জন্মতিথি (১) স্পোর্টস্ ও প্রাইজ

বিতরণ (২) বিশ্বকর্মা পূজা (১) এইভাবে অন্ততঃ কুড়ি দিন ক্লাস হয় না।

বাকি ২২৫ দিনের মধ্যে ৩২টি রবিবার আছে। কাজেই ইস্কুলে পড়ানো হচ্ছে বছরে দুশো দিনেরও কম।

ইতিমধ্যে যিনি যে বিষয়ে শিক্ষা দেন, তিনি বছরে ১৫ দিন ‘ক্যাজুয়েল’ ছুটি পাবার অধিকারী। কাজেই বছরে ১৮০ দিনের মত ইস্কুলে পড়ানো হয়।

কিন্তু এই হিসাবের মধ্যে প্রচণ্ড বর্ষায় পথে জল জমা ও ছাত্র ধর্মঘটের হিসাব করা হয়নি।

এ থেকে সহজেই ধরা পড়ে যে শিক্ষার দিবসগুলির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের সামঞ্জস্য নেই। ঠিক মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে, ছু’দিকের সমতা রাখতে হবে। পাঠ্য বিষয় কমাতে হবে, শিক্ষার দিবস বাড়াতে হবে। যেখানে বিদ্যুৎ শক্তিতে পাখা চলে সেখানে গ্রীষ্মের ছুটির প্রয়োজন কি? পূজার ছুটি ১০।১২ দিন হলেই তো যথেষ্ট।

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভালমত পড়ানোর কথা উঠবে। ভালো কাজ পেতে হলে ভালো বেতন দিতে হবে। প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য গগনম্পর্শী হতে থাকলে শিক্ষকদের বেতনকেও গগনম্পর্শী করতে হবে। স্থানীয় সদাগরী আপিসের এক গ্রাজুয়েট বড়বাবু ৫০০ টাকা বেতন পাবেন, আর সেইখানকার ইস্কুলের এক এম-এ পাশ-করা হেডমাষ্টার মশাই ২৫০ টাকা বেতন পাবেন, এ ব্যবস্থা থাকলে হেডমাষ্টার মশাইয়ের সম্মান ও কার্যধারা বড়বাবুর চেয়ে যে মর্যাদাসম্পন্ন সে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। বর্তমানে অর্থের যে সামাজিক মর্যাদা তাতে তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়ে বুনো রামনাথ হবার ইচ্ছা কোন শিক্ষকের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সংকট আজ দেখা দিয়েছে এর মধ্যে আমাদের দেশের অর্থনীতি যে দায়ী, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। সদাগরী প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রব্য-মূল্য ক্ষীণ করে যেভাবে লাভ করে ও কর্মচারীদের বেতন দেয় সেই লাভকে যদি আমরা সংযত করতে না পারি তা হলে বিপর্যয় ঠেকাবো কি করে? অন্ততঃ এমন

একটা আইন থাকা উচিত যে, এতটা লেখাপড়া ছানা কর্মচারীকে এত টাকার বেশী বেতন দেওয়া চলবে না। যাতে কোন ক্ষেত্রেই কোন কর্মচারী ইস্কুলের হেডমাষ্টার বা কলেজের অধ্যক্ষের চেয়ে বেশী বেতন না পেতে পারে। এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লাভের একটা মোটা অংশ স্থানীয় শিক্ষা প্রসারে অবশ্য ব্যয় করতে হবে।

আর সেই সঙ্গে আরেকটি বিষয়েই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। তা হোল কোন ইস্কুল-কলেজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত পরিচালিত হতে পারবে না। সমস্ত ইস্কুল কলেজের কর্তৃক জাতীয় সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ শিক্ষার উপর জাতীয় ঐতিহ্য নির্ভরশীল এবং তা কারও ব্যক্তিগত কর্তৃত্বাধীন হওয়া অস্বাভাবিক। পরিচালনার ব্যাপারে সমসংখ্যক শিক্ষক ও সমসংখ্যক অভিভাবকের একটা কমিটি থাকতে পারে, এবং সমস্ত দায়-দায়িত্ব বর্তাবে হেডমাষ্টার বা অধ্যক্ষের উপর।

মাধ্যমিক শিক্ষানীতি নির্ধারিত হবে সেকেন্ডারী বোর্ডের নিয়মামুযায়ী। এখন কোন কোন ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। বিশেষ করে ইস্কুলে ভর্তি হবার সময়। এক ইস্কুলের ছেলে আরেক স্কুলে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে গেলেও তাকে পরীক্ষা প্রকৃতি নানা ভাবে হয়রানি হতে হয়। ভর্তি হবার সময়ে ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ এমন একটা ভাব দেখান যেন ছেড়ে-আসা ইস্কুলটি নেহাৎ বাজে, সেখানে কোম পড়াশুনা হয় না। একটি বালক বা বালিকার মধ্যে যে জাতীয় ঐতিহ্য বিকাশের সম্ভাবনা আছে এবং তাকে উপযুক্তভাবে সুশিক্ষিত করে তোলা যে একটা জাতীয় দায়, অনেক ক্ষেত্রেই ইস্কুল কর্তৃপক্ষ সে কথা মনে রাখেন না। প্রসঙ্গতঃ কোন কোন ইস্কুলে ছাত্রসংখ্যা সীমিত রাখার কথা ওঠে। যদি সেই অঞ্চলে ছেলেমেয়ে বেশী থাকে, এবং অল্প ইস্কুল না থাকে তা হলে সেই সব ছেলেমেয়ে যার কোথা? বর্তমান কালে নাগরিক ছাত্রছাত্রীদের বাসে-ট্রামে-ট্রেনে চড়ে ইস্কুল যাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, সকল অভিভাবকের পক্ষেও সে-টাকা খরচ করা সম্ভবও নয়। তাহলে এইসব ছেলেমেয়ের জীবন কি নষ্ট হবে?

সংহতির অপমৃত্যু ?

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষা-যুদ্ধে আজ ভারতবর্ষ খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত। জাতীয় সংহতি জরিফ। নেশান হিসাবে ভারতবাসী আত্ম আত্মঘাতী।

ভারতীয় একশো উনআশীটি ভাষার মধ্যে হিন্দী ভাষাই তুলনামূলকভাবে বহুজনকথিত। সুতরাং জাতীয় সংহতির জন্ম দেওয়ার খোঁড়া যুক্তি অবলম্বন করে একমাত্র হিন্দী ভাষাকেই সরকারী ভাষারূপে অতিথিত করার পক্ষে ভারতীয় সংসদের নির্দেশ দানই এই আত্ম-ঘাতী যুদ্ধের মূল উৎস।

অথচ শতকরা ষাটজন ভারতীয়েরই কথ্যভাষা হিন্দী নয়। সুতরাং তারা হিন্দী ভাষার স্বপক্ষে এই ডিক্রী দানকে অবিবেচনাগ্রস্ত, অভিসন্ধি-কলুষিত ও ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ-কলঙ্কিতও বলে মনে করে। উত্তর ভারতের হিন্দী ভাষা-ভাষীদের এই জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে তাই অহিন্দীভাষীদের এই যুদ্ধ-ঘোষণা। যে যুদ্ধ শাসক-গোষ্ঠীর জাতীয় সংহতি-সৃষ্টির যুক্তিকে নেহাংই খোঁড়া প্রতিপন্ন করে সংহতি-বিনাশের বারুদ সারা ভারতে যত্রতত্র ছড়িয়ে দিলো।

দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যেই তামিলভাষী ছাত্রেরা পথে-প্রান্তরে প্রায় গেরিলা যুদ্ধের অবতারণা করে ছাড়লো। এক কোটি টাকার জাতীয় সম্পত্তি তাদের হাতে বিনষ্ট হয়েছে। বাঙলাদেশে প্রকৃত যুদ্ধ না হলেও যুদ্ধেরই অন্তত পদধ্বনি শোনা গেছে। পথে-ঘাটে অসংখ্য ছাত্র ও জনতার সমাবেশ। উত্তেজিত

প্রতিবাদে হিন্দী বই, হিন্দী গানের গ্রামোফোন রেকর্ড হিন্দী ছাত্রাচিত্রের প্রাচীরপত্রে অগ্নি সংযোগ এবং হিন্দী সিনেমা গৃহের প্রদর্শনী বন্ধ ইত্যাদি অমুষ্ঠিত হ'লো।—হিন্দীবিরোধী অভিযানের নির্ভূতম অভিব্যক্তি দেখা গেলো ছোট্ট সহর তিরুপুুরে। ক্রোধাক্ত জনতার হিংস্র উন্মত্ততা দুইজন স্বাধীন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে জীবন্ত দহন করে মারতেও ইতস্ততঃ করলো না। এই ভাষা-যুদ্ধের হিংস্রতার মোটামুটি মৃতের সংখ্যা সম্ভবজন, আহতের সংখ্যা অগণিত ও বন্দীর সংখ্যা তিন হাজার। এ ছাড়াও এই ভাষা-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় যে আজ সমগ্র নেশন ধ্বংসের প্রায় মুখোমুখী দাঁড়িয়ে—এইটাই সবচেয়ে মর্মান্তিক।

অবশেষে ছই সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার এক জরুরী অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে পাঁচজন অপর মন্ত্রী অমরোধ জানালেন যে, অবিলম্বে তিনি যেন হিন্দীর পাশাপাশি ইংরাজী ভাষাকেও সমান সরকারী মর্যাদা দিয়ে জনতার উন্মত্ততা প্রশমনে সাহায্য করেন। অর্থাৎ হিন্দীর স্বপক্ষে সংসদের ডিক্রী-প্রদানের আগে যে ব্যবস্থা ছিলো, তারই স্থিতিবস্থা মাত্র। কিন্তু হিন্দীভাষী শাস্ত্রীজী অতোখানি অগ্রসর হ'তে নারাজ। তিনি মাত্র এইটুকু মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েই দায় সারতে চাইলেন যে, অহিন্দীভাষীদের সরকারী চাকুরী সংগ্রহে অথবা চাকুরীতে উন্নতি লাভে কোনো অন্ত্রবিধা হবে না। কিন্তু সংগত কারণেই প্রধান মন্ত্রীর এই মৌখিক

আবার শিক্ষকদের কথাটাতেই ফিরে আসি। ছেলে-বেলা থেকে শুনে আসছি, প্রাইভেট ইন্সলের শিক্ষকেরা যে টাকা মাইনে পান বলে সই করেন, বেতন পান তার চেয়ে কম। এর দুটি প্রতিকার হয়: এক, প্রাইভেট ইন্সলের কর্তৃক লোপ করা এবং দুই, শিক্ষকদের সমস্ত বেতন 'পোষ্টাল চেক' দেওয়া। পোষ্ট অফিস সব জায়গাতেই আছে। আমাদের দেশের শিক্ষকদের বেতন অন্তত আর প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। এমন কি

একজন সাধারণ কেরাণীর পক্ষেও একজন শিক্ষক কৃপার পাত্র, এর আশু প্রতিকার নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। এবং সেই সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও আজ এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষা ব্যাপারে চিরাচরিত দুর্বলতা সংশোধন করে অভিভাবকদের দৃষ্টিভ্রামুক্ত করার কাজে।

না হলে অভিভাবকেরাও হয়তো একদিন শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশাপাশি আর-এক মৌন-মিছিল বের করে জন-মানসে সাদা তুলতে চাইবেন।

প্রতিক্রিয়াতে নির্ভর করতে না পেরে এবং সঙ্কট হ'তে না পেরে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীচিদাম্বর সুব্রহ্মণ্যাম এবং পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ও. ভি. আলাগেশ্বন প্রধান মন্ত্রীর কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন। অথচ শ্রীসুব্রহ্মণ্যাম শাস্ত্রী মন্ত্রীসভার একজন কৃতি, সুদক্ষ ও নির্ভরযোগ্য সভ্য।

ভারতবর্ষের দার্শনিক রাষ্ট্রপতিও নীরব থাকতে পারলেন না। শ্রীশাস্ত্রীর এই মানসতার পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি খোলাপুলিভাবেই সমালোচনামুখর হ'য়ে উঠলেন। প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তৎসনার সুরেই তিনি প্রশ্ন করলেন, প্রশ্ন করলেন অবশ্য ইংরাজী ভাষাতেই : Have we done all we could to avert these developments ? অর্থাৎ এই পরিণতি এড়াইবার জন্ত যাহা কিছু করা সম্ভব ছিল, তাহা কি আমরা করিয়াছি ?

নেহেরু-তনয়া শ্রীমতী ইন্দিরাও স্বাভাবিকতা ও শাস্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কঠিন কঠেই বললেন : জাতীয় সংহতির উদ্দেশ্যেই হিন্দীভাষাকে বাছাই করা হ'য়েছিলো। কিন্তু সেই সংহতিই যদি ভেঙে পড়ে, সে ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা একান্তই প্রয়োজনীয়।

অবশেষে সেই পুনর্বিবেচনা অস্বীকৃত হ'লো। গত সপ্তাহের প্রথম দিকে শ্রীশাস্ত্রী আপোষের ভঙ্গিতেই

শ্রীসুব্রহ্মণ্যাম ও শ্রীআলাগেশ্বনকে জানানলেন যে, তিনি ইংরাজীভাষাকে সহযোগী সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাবকে স্বীকার ক'রে নিতে প্রস্তুত। অতএব পদত্যাগী মন্ত্রী দুইজন পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। এইখানেই ভারতবর্ষে ভাষা-সংকটের অবসান হওয়া উচিত ছিলো।

কিন্তু তা' সম্ভব হ'লো না। শ্রীশাস্ত্রীকে এবার দাড়াতে হ'লো হিন্দী-প্রেমিকদের কঠিন বিরোধের মুখোমুখি। এঁদের অপ্রতিরোধ্য দাবী : এই মুহূর্তে ইংরাজীর সর্বৈব বিসর্জন। রাজধানী দিল্লীতে চরমপন্থী জনসংঘ দলের চার হাজার স্বেচ্ছাসেনানী নতুন যুদ্ধ ক্ষেত্র রচনার জন্ত প্রস্তুত রয়েছে। সে যুদ্ধের প্রথম স্তরে তা'রা সহরের কোথাও কোনো ইংরাজী লেখা চোঁখে পড়লেই তার বিলোপসাধন করবে আর বহু্যংসব করবে ইংরাজী পুস্তকপুস্তিকার। জনসংঘনেতা শ্রীইউ. এম. জিবেদী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন : ইংরাজী তো আর আমাদের জাতীয় ভাষা নয়।

অতএব মনে হয় ভাষা-যুদ্ধ এবার দ্বিতীয় স্তরের প্রবেশ ঘারে। জাতীয় সংহতি সেখানে মুঘুঁ। সর্বনাশা বিজ্ঞানতাবাদের এই রণদামামাকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে জাতীয় সংহতিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে এমন নেতৃত্বের পথ চেয়ে সারা ভারতবর্ষ আজ অপেক্ষমান।



সজ্জগুরুর জন্মোৎসবে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আচটল বঙ্গভূমে বারংবার কষুকণ্ঠ ধ্বনিয়েছে বার,
বিসোধিত বঙ্গবাণী জাগাতো হৃদয়ে আলোড়ন,
অস্তহিত আজি সেই ত্যাগপুত প্রদীপ্ত জীবন।
আছে ভাবধন মূর্তি, র'বে তাহা যাবৎ সংসার।
কর্মভূমি বঙ্গে রহি', ব্যাপ্ত হয়ে ভারত মাঝার,
ধর্ম্মে কর্ম্মে বাঙালীর প্রাণে তোলে মহাজাগরণ;
জাতীয় জীবনযাত্রা সর্বরূপে করিতে শোভন,
হিন্দুর মহান্ শক্তি দেশ ব্যাপি' করেন সঞ্চার।

মহাপুরুষের মৃত্যু নাই নাই, দেহান্তর ঘটে।

স্তব্ধ ভাবকের দেহে নিশ্বাসে প্রাণাসে স্পন্দমান।
সমুজ্জ্বল আজি তিনি সকলের হেথা চিত্তপটে।
ভাবের ভুবনে তাঁরে হেরিতেছি শাশ্বত মহান্।

বর্ষে বর্ষে অনদিনে সবে তাঁরে করিয়া স্মরণ,
রক্ষিতে মহৎ কীর্ত্তি করি যেন পদাশ্রয়ণ।

নিউ দিল্লীর নেপথ্যে

অমিয়া সেন

উনিশ শো চৌষট্টিতে রাজধানীর জীবনে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা নেহরুর তিরোধান। এটা যদিও রাজধানীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তবু এই নগরীই সেই শোকোঘেল দৃশ্যের একমাত্র প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

তিনমুন্ডি ভবন থেকে রাজঘাট—মাহুঘের পারের চাপে আর গাড়ীর চাকার ধুলো উড়েছে দিল্লীর আকাশ অন্ধকার করে। তেমনি উড়েছে ফুলের পাণ্ডি। মাহুঘ আর ফুল। রাজধানীর সব পুষ্প-বিপণি শূন্য করে নেহরুর প্রিয় ভারত পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছে তাঁর পায়ে। শেষ শয্যা সুরভিত সন্দের স্মরণীয় হয়েছে ফুলে ফুলে।

কিন্তু সব কিছুই ঐ দুদিনের জন্ম। রাজধানী ছুটলো, কাঁদলো, ফুল ঢাললো, নেহরুর নামে জয়ধ্বনি দিল। কিন্তু চঞ্চল হলো না। এমন ঘটনা, অথবা বলা চলে এর চেয়ে মনোস্তম্ভ ঘটনা এর আগেও এসেছে তাঁর জীবনে। গান্ধীজীর শেষ প্রার্থনা-সভা—সে তো এই সেদিনের ঘটনা। চঞ্চলতা বোধ হয় উচ্ছ্বলতারই নামাস্তর। তাই রাজধানী কেবল দেখে, চঞ্চল হয় না। যা দেখে তাতে গুরুত্ব আরোপ করে না। কিছু শোনে, বেশীই শোনে না। যা শোনে তাতে কান দেয় না। নইলে বছরের শুরুতেই জাহ্নসারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের ওপারে যা হয়ে গেল, গোটা রাড়ীটায় বিক্ষোভের ঘটাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল; তারো আগে উনিশশো বাষট্টিতে চীনাদের বর্বর আক্রমণ...রাজধানী নিশ্চর।

যদিও এই সতের বছরে রাজধানীর নাবালকত্ব অনেকখানি ঘুচেছে। কারণ, এখন আর এটা শুধু সরকারী অফিসিয়ালদের বাসভূমি নয়। উড়ো আপদের মত অনেক বাইরের লোক এসে হাজির হয়েছে এর আম দরবারে। অনেক লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা এসে পসরা মেলে বসেছেন এর বিপণিশালায়। এতেই অচলায়তনের দেয়ালে কাটল ধরেছে যত্র তত্র।

তবুও রাজনৈতিক আন্দোলনের জায়গা এটা এতদিনেও হতে পারেনি।

আকালীরা অনেক চেষ্টা করলো। দিল্লী হাই তুলে পাশ ফিরলো। ডাঙ্গের দল একটা ডেমনস্ট্রেশন বের

করে তাক লাগিয়ে দিল সবাইকে—‘ছ’ লক্ষ, এত লক্ষ—পঞ্চাশ—না কত হাজার—, সংখ্যাটা শেষ পর্যন্ত কেউ আর গুণেই উঠতে পারল না। তাও রাজধানী তাকিয়ে দেখল না। এখানে সব কিছুই যেন সেই ছোট ছেলের পুকুরে ঢিল ছোঁড়া। চক্ষের পলকে সব শান্ত। নিশ্চর।

কিন্তু এবার এই '৬৪ সাল মূল্যবুদ্ধির হাতুড়ি দিয়ে সারা দেশের মাথায় এত জোরে ঘা দিল যে ইথারে তরঙ্গ তুলে তার চেউ এসে ধাক্কা দিল দিল্লীর প্রাণের ছম্বারে। সব যেন কেমন ওলোট-পালট হয়ে গেল।

আন্দোলনের অভিধায় নতুন একটা শব্দ সংযোজন হলো ‘বন্ধ’। মহারাষ্ট্র বন্ধ। গুজরাট বন্ধ হয়ে গেল।

এই সূযোগে কম্যুনিষ্টরা এগিয়ে এলেন রাজধানীর বন্ধ ছম্বার ভেঙ্গে দিতে। পুরানো দিল্লীতে ছোটখাট কয়েকটা মিছিল বেরুল। কিছু লোক প্লোগান দিল ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের বিরুদ্ধে। হাজতবাস করতে গেলেন কয়েকজন।

এর পবে এলো ভারত বন্ধ।

দিল্লীতে সেদিন সকাল থেকে এখানে-সেখানে ঘির-ঝিরে রুষ্টি। গুটিকয় লোক “ভারত বন্ধ”—এর গৌরব রক্ষার্থে পার্লামেন্ট ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে মিছিমিছি খানিকটা ভিজল। উদ্যোক্তারা বোধহয় বেশী লোক জোগাড় করতে পারেন নি।

কিন্তু মিছিলে মিটিং-এ লোক হোক বা না হোক, লোকের পকেটে টান পড়তে শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই। নেহাৎ খাদ্য নিয়ে হ্যাংলামি করলে গ্রেপ্তার থাকে না তাই আভিজাত্য বজায় রাখার শুক প্রচেষ্টা চলছিল উপর উপর। অবশেষে আর ধৈর্য্য রইল না।

রাজধানীর জীবনতিহাসে এই প্রথম সে জুকম্পনের স্বাদ পেল। ইংরেজ আমলের স্ববির মন কংগ্রেস আমলে পঞ্চাষাতগ্রস্তের মত এলোমেলো ভাবে কেঁপে উঠলো। হোক এলোমেলো, তবু এই প্রথম যথার্থ দিল্লী নড়ে উঠলো। রাজনৈতিক কারণে নয়, ক্ষুধার তাড়নায়।

এতকাল দিল্লী বড়ো আরামে ছিল। সেই আরামেই তার শিরায় শিরায় এনে দিয়েছিল আফিং-এর নেশা।

উনিশশ তেতাল্লিশে বাংলা দেশের পথঘাট, গ্রাম, নগর যখন বুড়ু মাছের মিছিলে আর শবদেহে ভরে উঠেছিল, দিল্লী তখনো চোখ বুজে ঘুথের বাটিতে চুমুক দিয়েছে। ভোজ্যপ্রাচুর্যে তার টেবিল সমাকীর্ণ। দু' ছটো মহাযুদ্ধের এতটুকু তাপও তাকে লাগেনি। রেশনিং যুগে চাল আটা চিনি বাদে আর সব জিনিষ দুধ, ঘি, মাছ, মাংস, তরিতরকারী, ফল মেওয়া তার সর্বাঙ্গ বেয়ে উপছে পড়েছে।

সতের বছরে লোকভারে বিপ্লাষতনা হয়েছে রাজধানী তা সত্যি, কিন্তু খাদ্য-খানায় এমন টান কখনো পড়ে নি।

নাগরিকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

মিলিটারী কুপ হলো না বটে, তবে জনপথের কফি-হাউস বয়কট করে প্রায় পানিপথের যুদ্ধ জয় করলেন তাঁরা। ইতিপূর্বেই খাদ্য আন্দোলনে 'ভারত বন্ধ'-এর ব্যর্থ অম্বুতরণে যা হয়নি, এবারের কফি বিদ্রোহে তাই হলো। কর্তৃপক্ষের টনক নড়লো। তাঁরাই এগিয়ে এলেন অথবা তাঁরাই আগে বাড়িয়ে গেলেন কে জানে, রাজধানী সর্বিস্বয়ে দেখলো, এই নগরীর প্রথম বিপ্লবীরা সরকারী আশীর্বাদ লাভ করেছে।

নবগঠিত কফি কমিটি অথবা বারান্দার কফি হাউস রাতারাতি কেবল দিল্লীর নয়, সারা দেশের কেন্দ্র সংবাদ হয়ে উঠলো। এই হলো রাজধানীতে Price Rise Resistance Movement বা P. R. R. M.-এর জন্ম-ইতিহাস এবং চলতি বৎসরের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা।

ভারতবর্ষের মধ্যে দিল্লী বরাবরই একটা 'বিশেষ'। এ ব্যপারেও সে তার বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখলো। চতুর্দিকে যখন মানুষ নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যের ব্যাপারে যুদ্ধকালীন অরাজকতার ফলে ক্ষেপে গিয়ে নানান কাণ্ড করছে, গোলাগুলি, লাঠির বাড়িতে হাড়গোড় ভাঙছে, রাজধানী তখন স্বয়ং দাড়িপাল্লা ধরলো মূল্যমান নিয়ন্ত্রণ করতে।

দিল্লী জুড়ে তৈরি হলো ক্ষেতা সমবায় ভাণ্ডার। দশটা-পাঁচটা অফিস করার আগে পরে অফিসিয়ালরা সকাল সন্ধ্যায় দোকানদারী মক্স করতে লাগলো।

এঁদের প্রথম কীর্তি কফি। দ্বিতীয় কীর্তি সজী। তৃতীয় কীর্তি দেওয়ালীর মিষ্টি। চতুর্থ কীর্তি গোয়ালাদের সঙ্গে মারামারি। পঞ্চম কীর্তি জুটার এবং প্রাইভেট বাড়ী ভাড়া প্রতিরোধ।

রাজধানীর জীবনে প্রথম ষথার্থ গণ-আন্দোলন-শিরোণা পেল পার্লামেন্ট বিতর্কে। শাসক-কর্তৃপক্ষ স্বাগত জানালেন এই সাধু প্রচেষ্টাকে। বাংলাদেশের কোন কোন পত্র-পত্রিকায় সাড়স্বরে এ সংবাদ প্রচার করে রাজধানীকে বাহবা দেওয়া হল মূল্য-গতিরোধের সার্থক পরিকল্পনাকার বলে। কেউ কেউ আবার সেই সঙ্গে কলকাতাকে একচোট দিক্কারও দিয়ে নিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা হলো পর্বতের মৃষিক প্রসব। মূল্যের বাজারে অরাজকতার প্রতিষেধক হিসেবে বেসরকারী চেষ্টা যে ব্যর্থ হতে বাধ্য, এই তিস্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া এতে নাগরিকদের আর কিছু লাভ হয় নি। প্রতিটি পদক্ষেপে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিবে P. R. R. M. বেঁচে রইল শুধু কাগজে কলমে আর কর্তৃস্থানীয়দের মিটিং মোলাকাত।

৩০শে নভেম্বর স্থানীয় ষ্ট্রেটস্ম্যান পত্রিকা Priceless chance শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লিখল—An opportunity is being lost in Delhi where consumers have at last turned against high prices. ...the spirit of the movement caught the imagination of the people in the Capital (and elsewhere) the bitter truth is that some two months after it began, the movement is completely disorganised.

এমনটি যে হবে তা যারা স্মর থেকেই এই আন্দোলনের প্রকৃতি লক্ষ্য রাখছিলেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন।

দিল্লীতে এটি প্রথম আন্দোলন, কিন্তু গণ-আন্দোলন নয়। যারা মূল্য প্রতিরোধে নামলেন, মনে রাখা দরকার, তাঁদের সংগ্রাম সীমাবদ্ধ রইল কফি হাউস, গোয়ালি ও খুচরো দোকানদারদের বিরুদ্ধে। ব্যবসায়ী বা আড়ম্বারদের বিরুদ্ধে নয়, কারণ তাঁদের পিছনে আছেন স্বয়ং গভর্নমেন্ট। আন্দোলনকারীরা সবাই সরকারী অফিসিয়াল। এক হাতে তাঁদের আন্দোলনের বলগা আর এক হাতে চাকরীর রশি।



ভারতীয় 'মিশন' ও বর্তমান ভারত-রাষ্ট্র :

বর্তমান শতাব্দীর ঋষিবি রবীন্দ্রনাথ ঞপ্রাচীন কালের ভারতবর্ষের ভাব ও ভাবনা, আদর্শ ও লক্ষ্যকে আপনার মধ্যে সমাহৃত করিয়া তারই যুগ-দর্শন বিস্তার করিয়া গিয়াছেন যুগের ভাষায় এ-যুগের মানুষের জ্ঞত তাঁর কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টিতে। এই ভারতবর্ষকে অমুভব করিয়াই তিনি আশা পোষণ করিয়াছিলেন : “জয় হইবে, ভারতবর্ষের জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বীক, তাহারই জয় হইবে।”

বিগত শতকের শেষ দশকে, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, আর একজন ভারতীয় বরিষ্ঠ বরপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিমের মাটিতে দাঁড়াইয়াই পাশ্চাত্যের জড়-বিজ্ঞানের উপাসকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন :
The whole of western civilisation will crumble to pieces in the next fifty years if there is no spiritual foundation.” সভ্যতার এই অধ্যাত্ম-ভিত্তির কথা বলিতে গিয়া স্বামীজী ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, “we can teach the world only what it is waiting for.” একমাত্র ভারতই সভ্যতার এই অধ্যাত্ম-ভিত্তি দিবার অধিকার রাখে।

সারা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যুগধ্বি শ্রীধরবিন্দ আমরণ ভারতের অধ্যাত্ম-জাতীয়তারই রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন এবং জীবনবিকাশের সর্বক্ষেত্রে ইহার বাস্তব রূপায়ণের সঙ্কল্পে দিয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ও পরে জাতির প্রতিটি সম্বট-সন্ধিক্ষণে পণ্ডিতেরীর ধ্যানমগ্ন ঋষি তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টিপ্রসূত উপদেশ নির্দেশও দিয়াছিলেন যাহা শ্রদ্ধাষ অবহিত হইলে ভারতের আত্মস্বরূপ চেহারা ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আজ অল্প রকম হইত। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শ্রীধরবিন্দ তাঁর বিপ্লব-সহচর ও অধ্যাত্মমগ্ন প্রথম দীক্ষিত শ্রীমতিলালকে নির্দেশ দিয়াছিলেন বিপ্লব হইতে গতি ফিরাইয়া অধ্যাত্ম জাতীয়তার সংগঠনে আত্ম-নিয়োগ করিতে। শ্রীধরবিন্দের টেলিগ্রাফিক সঙ্কেত

ছিল : ‘Mati Halt’, ‘T. S. M.’ (True spiritual movement)। সজ্জগৎ শ্রীমতিলাল তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রবর্তক সঙ্কেত মাধ্যমে এই অধ্যাত্ম জাতীয়তার সংগঠনে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। বিগত শতকের আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ গুরুমণ্ডলী হইতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রায় সবাই প্রাক্ স্বাধীনতার কালে ভারতের এই মহান লক্ষ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্মযোগাশ্রয়ী হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা ছিল গোণ, মুখ্য ছিল ‘মিশন’। এই মিশন প্রচার-প্রতিষ্ঠার আহুকুল্যের কাজেই রাষ্ট্রেরও তাৎপর্য্য নিহিত। রাষ্ট্র উপায়, উপেয় মিশন। ব্যষ্টির মতই প্রত্যেক জাতিরই একটা সামগ্রিক সত্তা আছে যার পূর্ণ স্বাভাবিক বিকাশ করিয়া তোলাই এই বিচিহ্ন বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। ইহাই স্বামীজির ভাষায় : ‘Central theme’ : “in each nation as in music, there is a note, a central theme upon which all other turns.”

এক কথায় অরণ্যভীত কাল হইতে ভারতের ‘মিশন’ ও লক্ষ্য ইহাই। বিশ্বসভ্যতা ও বিশ্বের চিন্তাক্ষেত্রে ভারতের যদি কোন বিশিষ্ট অবদান থাকে তবে তাহা এই অধ্যাত্ম জাতীয়তা—ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন-মূল্যায়নে জীবনের দিব্য উজ্জীবন। মানব ইতিহাসের এক পরম সন্ধিক্ষণে আজ বিশ্ব মানবগোষ্ঠী উপনীত। কালো, ধলা, পীত সর্ব জাতি আজ একই মঞ্চে আদান-প্রদানরত। প্রতিটি গোষ্ঠীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য আজ স্বীকৃত হইতে চলিয়াছে। এবং এই ধারণাও ক্রমশঃ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে যে, আগামীকালের মানব-জাতীয়তার বনিয়াদ ও প্রগতি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ও সমাহারের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু কেবল মাত্র একত্রিত হইলেই জাতিসমূহের একাত্ম হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? বিরোধের বীজ থাকিয়াই যাইবে এবং উহাই আবার বিচ্ছিন্নতাকে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিবে। যেহেতু একাত্ম ইহসর্বস্ব সভ্যতার মাঝে সমুন্নয়নের এই বীজটিরই অভাব। ইহার নিগূঢ় রহস্য ভারত সভ্যতার মর্ম্মকথা। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যাত্মত্বের আত্ম-বিজ্ঞানটি অরণ্যভীত কাল হইতে ভারতের অধিগত ও অবিচলিত শ্রদ্ধা অমুশীলিত। শ্রীধরবিন্দ তাঁর “Human Cycle” গ্রন্থে মানব সমাজ ও সভ্যতার

বিবর্তনের দিগ্‌দর্শন দিতে গিয়া এই অধ্যাত্ম সমাজের জীবনধারা সঙ্ক্ষে ইঙ্গিত দিয়াছেন: "A spiritual society would live like its spiritual individuals, not in the ego but in the spirit, not as the collective ego but as the collective soul." ভারতে সংখ্যালব্ধি (ইহারাই ব্রাহ্মণ) এই আদর্শের ধারক বাহক থাকিলেও, মোটামুটি ভারতের গণসমাজও অস্বরূপ আদর্শ-লক্ষ্যেই অমুপ্রাণিত ছিল।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে ভারত সভ্যতার এই একান্ত নিজস্ব মত, পথ ও লক্ষ্য ভারতীয় জীবন-ধারা বিকশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, অর্থ, সমাজ, রাষ্ট্র এই মহৎ আদর্শ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আবর্তিত হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক হইত। প্রাক্ স্বাধীন যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিগূঢ় ভারতের এইরূপ সুবৃহৎ মিশন ও মহৎ কর্তব্য সঙ্ক্ষে একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট সচেতনতা ছিল বলিয়াই সংগ্রামীদের মধ্যে বৈরাগ্যের দীপ্তি ছিল, ত্যাগে ছিল আনন্দ, আর প্রাণদানে উল্লাস-অকুণ্ঠতা ছিল। ভারতবর্ষ বার বার স্বাধীনতা হারাইয়াছে, কিন্তু তার এই স্মহান জীবনদর্শনকে কখনও হারায় নাই। পরাধীনতার শ্রানি, বহু আগন্তুক বড়-ঝড়ার মধ্যেও সে অগ্নান রহিয়াছে তার এই দিব্য আদর্শের দীপ্তালোকে। অহুস্তেজিত শাস্ত সমাহিত চিত্তে আজকের স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের চেহারা চাহিয়া দেখিলে শিরিয়া উঠিতে হয় যে, লক্ষ্যভ্রষ্ট দিশাহারা ভারত কোন্ পথে?



ডঃ ভাস্কর রাও নিউ ইয়র্ক হইতে আজকের এই লক্ষ্যহীন দিশাহারা ভারতের চেহারার একটা ছবি আঁকিয়াছেন (এ. বি. পত্রিকা ৫. ৩. ৬৫): "India's prestige abroad is at an all time low. Even our foreign minister Sardar Swarn Sing admitted in his report after his visit to Nepal, Afganisthan and Burma that India's image abroad was tarnished, and that many of our Asian and African friends are either hostile, or indifferent towards us."

The rout at Bomdilla in 1962 has cost us more than loss of men and territory. It has cost us our reputation. India is no longer an Asian power, but a regional power.

"Instead of being recharged with a new brand of courage, to sink our differences and rally as one people, we are now immersed in clashes over language and wasteful expenditure over translation projects, thereby making some of the world's leading press including the "New York Times" to say "Indians can be stirred much more deeply by what language to use than they can by a Chinese nuclear menace."

"Thus we are now a nation with neither a vision nor a goal, and as Selig S. Harrison comments in the January issue of 'Foreign affairs' "India is pottering along with no clear determination yet in mind."

ইহা স্পষ্ট যে, সারা দুনিয়া বুঝিয়া লইয়াছে, ভারতের কোন শক্তি-সামর্থ্য নাই, ধর্ম নাই, সংস্কৃতি নাই, আদর্শ নাই, লক্ষ্য নাই, না আছে কোন সঙ্কল্প। বিশ্বজগতে সতের বৎসরের স্বাধীন ভারতের পরিচয় ইহাই। ইহাই তার আত্মগঠনের মোটামুটি কলঙ্ক। বিভ্রান্ত বলিলেও ভুল হইবে। ভ্রান্ত মত-পথের সঙ্কল্প সিদ্ধিতেও বীৰ্যের প্রকাশ দেখা যায়। হিটলারের আদর্শ ভ্রান্ত হইতে পারে কিন্তু তাঁর সঙ্কল্প ও শক্তি সারা বিশ্বে ভূ-কম্পন সৃষ্টি করিয়াছিল। শক্তি 'প্রান্তিকপেন সংস্থিতা' হইলেও, শক্তি তো বটে! 'সত্যমেব জয়তে' আমাদের রাষ্ট্রদর্শ, কিন্তু আচরণের অভাবে উহা কাগজ-কলমেই নপুংসক নির্বীৰ্য হইয়াই আছে। গীতার ভগবান বলিয়াছেন 'সত্য ধর্মের এক কণাও মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে'। ইহা নিছক ক্লীবত্ব। ক্লীবত্ব ধর্মও নহে, সত্যও নহে। ক্লীবত্বকে গীতায় পাপ বলা হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, দুর্বলতাই পাপ। নিজেকে মিরিয়া যে অবর মন আবর্তিত তাহাই দুর্বল হয়, মরণভয়ে কাতর হয়, হয়

সংগ্রামবিমুখ। ব্যাট্টির পক্ষে যা সত্য, সমষ্টি বা রাষ্ট্রের পক্ষেও তা সত্য। এমন হতচেতন রাষ্ট্রই নারীহরণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন নিবারণে উৎসাহ না, স্বাধিকার (sovereignty) অপহরণেও উদাসীন থাকে।

কি ব্যাট্টি, কি সমষ্টি, কি জাতির যদি কোন 'মিশন' বোধ না থাকে তবে সেই ব্যাট্টি, সমষ্টি, জাতি উদগ্র প্রাণবান, বীর্যবান ও আগ্রাসী আত্মবিস্তারের জন্য নিরন্তর নিরলস গতিশীল হইতে পারে না। সভ্যতার জন্ম, গতি ও স্থিতির মাপকাঠি এই জীবনবিকাশমূলক আদর্শের গভীরতা ও মনোহারিত্ব। বর্তমান ভারত-রাষ্ট্র আধুনিক ভূচ্ছতার পক্ষে পচিয়া মরিতেছে ভারতের এই সুমহান 'মিশন'-বোধটির অভাবে। পশ্চিমের জীবন বিকাশের একান্ত ইহসর্কস্ব অর্থতাত্ত্বিক ধারার অক্ষয় অহুসরণ করিতে গিয়া আজকের ভারত রাষ্ট্র বিদেশে কেবল ভারতকে ভিক্টুকে পরিণত করে নাই, স্বদেশের অসংখ্য অপগ্রবৃদ্ধির দ্বার মুক্ত করিয়া মানুষকে অগভীর উত্তেজনায় মাতাইয়াছে। চিরকালের মহান ভারতের আজকের ছরবস্থা দেখিলে মনে হয় যেন এই সুপ্রাচীন জাতিটার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে। ঋষিকবির বাণী 'জয় হইবে সেই প্রাচীন, প্রচ্ছন্ন, উদার মহৎ ভারতের জয় হইবে' যেন মিথ্যা হইতে বসিয়াছে। স্বাধীনতার ভবিষ্যদর্শন 'ভারতের অবদানের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষমান বিশ্ব' বুঝিবা কাঁকা আওয়াজে পর্য্যবসিত হইবে। কোথায় সেই ভারত যার সর্বসম্মানব কল্যাণমূলক আর্থিক অবদানের মৌলিকতা বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিবে—আকর্ষণ করিয়া আনিবে ভারতীয় মন্দির দুয়ারে ?

আমরা বার বার প্রবর্তকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে অরণ্যে রোদন করিয়াছি যে, আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গোড়াতেই ভুল করিয়াছে জাতি-সংগঠনের পরিকল্পনার রীতি-নীতিতে ভারতের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ এবং তার মৌল স্ব-ভাব ও প্রকৃতির ক্রমটিকে অহুসরণ না করিয়া। নানা জাতি-ধর্মের মুখ চাহিয়া জৈব মানোন্নয়নের প্রদূর পরিকল্পনার মাধ্যমে নিছক রাজনীতি ও অর্থনীতিগত ভারতীয় অর্থশৃঙ্খ ও ঐক্য সাধনে প্রয়াসী

হইয়াছে ভারত-রাষ্ট্র। ইহার যে অবশুস্বাভাবী কুফল তাহা ইতিমধ্যেই কলিতে সুরূপ করিয়াছে। বৈষম্যিক উন্নতি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইলে, এই লক্ষ্য সিদ্ধির পথে মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, লোভী, ঘেবী, অসহিষ্ণু ও চঞ্চল করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। মনুষ্যপ্রকৃতি এমনি সংযমহীন অবস্থায়ই ব্যাট্টি ও সমষ্টি জীবনের 'মিশন' বোধ হইতে বিচ্যুত হইয়া উত্তেজনা-উন্মাদনায় গ্রসিত আত্মহারা হইয়া পড়ে। বৃহৎ লক্ষ্যের অভাবে আত্ম-কেন্দ্রিক মানুষ চোর জোচ্চোর, ঠগ-প্রবঞ্চক; কালো-বাক্সারী হইয়া উঠে। ভারতের সতের বৎসরের কল্যাণ-মূলক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থ ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় মিলিতেছে শাসক শাসিত প্রায় সর্ব স্তরেই।

সম্প্রতি রাষ্ট্রভাষা লইয়া যে ভারতের ঐক্য বিপন্ন হইয়াছে তাহাও ভারত-রাষ্ট্রের লক্ষ্যহীন অবিমূঢ়-কারিতার অন্ততম দৃষ্টান্ত। যে জীবনবোধের মূল্যায়নের কষ্টপাথরে মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও ঐশ্বর্য্যবান থাকিতে পারে, শত প্রলোভনেও সত্য ও সাধুতা বজায় রাখিতে পারে, মিথ্যার আশ্রয়ে প্রাণ রক্ষায়ও ঘৃণা বোধ করে, আত্মদমনের জন্য অনশনেও কাতর হয় না, তেমন বোধটি, তেমন আত্মশক্তির জাগরণ ও অহুশীলনের কোন সুব্যবস্থাই আমাদের শিক্ষা ও রাষ্ট্র-পরিকল্পনার মধ্যে টাই পায় নি। ইহা লক্ষ্য করিয়াই মনীষী কে. এম. মুন্সী মন্তব্য করিয়াছেন : "It is, therefore, essential that struggling nations like India, when embarking upon a programme of material advance should maintain their inner strength which their spiritual outlook has given them. For, spirituality is a necessary element in every creative culture, without which no nation can grow." রবীন্দ্রনাথ গীতার বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কর্মফল-বাসনা পরিত্যাগের কথা বলিয়া গীতায় লোভের বিষদাঁতটি ভাদিয়া ফেলা হইয়াছে। এই যে অধ্যাত্মদৃষ্টি ইহা যে কোন দেশে সমাজ-মানুষের সর্বস্তরে সঞ্চারিত করিতে পারিলে রাষ্ট্র পরিকল্পনা কত স্বাভাবিক, সুন্দর, সুস্থ ও সঙ্গত হইতে

পারে।* এবং বিশ্বের যে কোন দেশের মানুষের চেয়ে ভারতে ইহা করা কত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল!

ভারত রাষ্ট্র আজ যে আর্থিক, নৈতিক, আঙ্গিক এমন কি রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন ইহার শেষ পরিণতি কোথায়, কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। ভাবিলে নৈরাশ্রে ভাঙ্গিয়া পড়িতে হয়। কিন্তু আমরা প্রত্যয় করি ভারতের অন্তঃশক্তি অন্তর্হিত হইবার নহে। ইহা সমস্ত ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে নিজেকে অটুট অন্নান রাখিয়া আবার স্বকীয় ঐজ্জল্যে আত্মপ্রকাশ করিবেই। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথেরই ভরসা-বাণী : “আমরা বাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, আফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—‘মিলি মিলি যাওব সাগর লহরী সমান’। তাহাতে নিস্তরু সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। তন্মাজ্জর মৌনী ভারত, চতুর্পাথে যুগচর্চা পাতিয়া বসিয়া আছে...সে শাস্তিচক্রে আমাদের পৌত্রদের জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না।”

আজকের লক্ষ্যহীন দিশাহারা ভারত রাষ্ট্রের মন ও মানস, তার তুচ্ছতা ও উন্নয়নগামিতা, আজকের রাষ্ট্রহীন সংস্কৃতি-সঙ্কট দেখিলে মনে হয় বুঝিবা ঋষিকবির এ প্রত্যাশা ব্যর্থই হইতে চলিয়াছে। কিন্তু না—ভারতের ঋষিদৃষ্টি অমোঘ অব্যর্থ। চিরকালের শাশ্বত ভারতের সঙ্গে পরিচয় এখনও যে মুষ্টিমেয় মানুষের

আছে তাঁরা ঋষিকবির এই প্রত্যাশার পথ ধরিয়াই সেই বিশ্বমানবের আলোকদিশারী যে অমর ভারত সেই ভারতবর্ষের পুনরুত্থানকল্পে সাধনা করিয়া চলিবে। হিমগিরি হইতে কতাকুমারিকা পর্যন্ত আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে এখনও বহু যোগী, তপস্বী, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, ভারতদরদী চিন্তাশীল মনীষী ভারতের এই পুনরুত্থান-কামী। প্রবর্তক পত্রিকাও এই লক্ষ্যেই পরিচালিত। প্রবর্তক সঙ্ঘের (যার মুখপত্র প্রবর্তক) শ্রুতি ও প্রাণ-পুরুষ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জন্ম ও কর্মের তাৎপর্য্যও ইহাই। বর্ষশ বৎসর পূর্বে ১৯৩৩ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠারী পুণ্যময় প্রয়াগ তীর্থে তাঁর যে ভারতীয় অমৃতব তাহা তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন : “মুষ্টিমান ভারত আজ আমার সম্মুখে। ভারত সত্যই মাটি, পাহাড়, বিচিত্র নদনদীর শোভায় গৌরবময়। ভারত চিদ্রক্তির পরম প্রকাশ। সব কিছুই কামনা বলে’ বলি দিতে বাধে না, কিন্তু ভারতের অভ্যুদয় কামনা ঈশ্বরকাম—ইহা অপরিভাজ্য। অত্র কাম আমার মধ্যে স্থান পায় না। ভারত তার মর্যাদা, স্বভাব ও স্বধর্ম নিয়ে মাথা তুলুক, ইহাই আমার পরম চাওয়া। প্রবর্তক সঙ্ঘের কাজ বাংলায় এই অমিশ্র ভারতীয় ভাবের পুণ্য প্রদীপ জ্বলি রাখা।”

প্রবর্তক সঙ্ঘ তথা প্রবর্তক পত্রিকা ভারতীয় এই অমিশ্র অভ্যুদয়ের জন্তই তপস্তারত।



স্মৃতি

শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

স্বর্ধেন সেন পুরুলিয়ার সবার প্রিয়। বহু প্রাণের ভারতে একতা স্থাপনের নিমিত্ত সত্য্যগ্রহী অনেক দাম দিয়েছেন স্মৃতি সত্তর বৎসরে। বিগত পাঁচ দশক ধরে যত আন্দোলন প্রাবনের মতো প্রবাহিত হয়েছে, তিনি প্রবল ভরদে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

সাঁইজিশ সালে বিহার প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েই যখন বাঙালীদমন শুরু করেছিল, তখন বঙ্গবল্লাল হয়েও মন্ত্রীসভাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। উনচল্লিশে ত্রিপুরীতে সর্বভারতীয় প্রতি-ক্রিয়াপন্থী নায়কদের জঘন্ত কপটতায় নাজেহাল প্রগতিবাদী বঙ্গ সন্তান স্মৃতিচক্রের বৈরিশিবিরে সানন্দে যোগ দিয়েছেন। বিকৃত ভারতপ্রেমিক!

সাতচল্লিশ সালে জিন্না-জহরলালের চুক্তিতে বাঙলার জবাই হল, লীগ-কংগ্রেসের টাগ-অব-ওয়ারে এক ভারত-রাষ্ট্র ছুই টুকরো হয়ে গেল। উনপঞ্চাশে পাটনার কর্তাদল অবিচার করল বঙ্গজনের প্রতি, অত্যাচার চালাল বঙ্গভাষার উপর; বঙ্গ-আকাংখা সংরক্ষার আয়োজন হল মানভূমে। দিল্লীর প্রভুসম্প্রদায় কর্ণপাত করল না আহত বঙ্গস্বভাবের আকুলতাভরা আবেদনে।

স্বর্ধেনবাবুর যত্নলালিত বিরাট ভারতবৃত্তি ভেঙ্গে গেল। জীবনসারাহে বঙ্গনন্দন অহুধাবন করলেন, হিন্দীভাষী হিন্দুর সঙ্গেও স্বার্থে সংঘবদ্ধ নন; বঙ্গভাষা-ভাষী মুসলমানের সঙ্গেই পরমার্থে তিনি সংযোজিত, বঙ্গ বুদ্ধির যুগজাগৃতি সংকটভ্রাণের শুদ্ধ উপায়।

সাধারিক

অসম্ভব সূর্য :

ভারতের অধ্যাপক-পণ্ডিত হইতে একটি সদাশীল ভাষার জ্যোতিষ বসিয়া পড়িল।

অগস্ত্য শব্দটি চাৰ্ঘ্য অনন্ত শক্তিধারী অগস্ত্য আশ্রমপাণ্ডিত মহারাজ গত ২২-এ মার্চ শুক্রবার রাত্রি সন্ধ্যা আটটার তাঁর তপস্কেন্দ্রে কাকোমর্টে (ধানবাড়-কাংরাগড়ের সন্নিকটে) মহাসমাধিযোগে কৈবল্যধামগত হইয়াছেন। মহাপ্রয়াণকালে তাঁর মর্ত্য আত্মা হইবাছিল আর একান্তর বৎসর। প্রতি বৎসরেই মৃত এবারও শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে ১৭-২৩এ মার্চ কাকোমর্টে তাঁরই তত্ত্বাবধানে সনাতন ধর্মের অভ্যুত্থান সঙ্কল্পে সম্ভাষণার্থী ভাগবতপারায়ণ, হোম ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়। মহাপ্রয়াণের পূর্বে মূর্ত্ত পূর্ণাঙ্গত তিনি স্বীয় আসনে সমাধীন থাকিয়া আত্মস্থানমগ্ন ছিলেন। গত ১৫ই ফাল্গুন রাক্ষসী দশরোহে তবীর ভাঙার মহোৎসব কাকো, কাশী, তারকেশ্বর প্রভৃতি মঠে হুসুম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে বেদগান, উপনিষদ পাঠ, কীর্তনাদি ও ভাঙার অনুষ্ঠিত হয়। কাকোমর্টে আর ১২ হাজার সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণাদি সর্ব বর্ষের নরনারী পরম পরিতৃপ্তি সহকারে এসাদ পাইয়া বৃত্ত হন।

হিমালয়ের মত বিশালকর, প্রশান্ত মহাসাগরের মত অতলম্পর্ষ অসাধারণ এই মহাজীবনের মূল্যায়ন করা সাধারণ মানুষের ক্ষমতা নাগালের বাহিরে। আর ৩৫ বৎসর পূর্বে তারকেশ্বর মঠের তদানীন্তন প্রাণিময় কলঙ্ক-কালিমা দূর করার জন্য যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত

পকানন তর্করত্ন প্রমুখ ব্যক্তিগণ উচ্চাঙ্গী হন তখন আর পার্শ্ববর্তী বর্ষায় আকিঞ্চন সন্ন্যাসী এই সিদ্ধ মহাপুরুষ মোহন পদের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। তিনি সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূর্ত্তমান বিগ্রহ ছিলেন। শাস্ত্রমূর্ত্তি, শাস্ত্রচক্ষু ছিলেন এই সন্ন্যাসী প্রবর। হিন্দুকোড বিলের বিরুদ্ধে তাঁর তেজোবীজ প্রতিবাদ ও আন্দোলন দেশবাসী প্রত্যক্ষ করিয়াছে। লৌকিক ভাবে সনাতন ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও অভ্যুত্থানকল্পে তিনি তাঁর সারা জীবন উৎসর্গ করিয়াই বান নাই, এই জন্য অকাতরে শ্রম ও কষ্টব্যয়ও করিয়া গিয়াছেন। "রাজ্য করাত্ত বিজ্ঞানী শিক্ষামটতু নির্ভরং"—পরমার্থবর্ষী যিনি তিনি রাজ্যই করন বা শিক্ষাই করন তিনি যতঃশক্ত। ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিল ধামাধী মহারাজের জীবন। স্থিতধী মূনি, ব্রহ্মবিদ্বৎ স্থিতপ্রজ্ঞ বধি বলিতে কি বুঝার তাহা তাঁহাকে দেখিলে বুঝা বাইত। সনাতন ভারতবর্ষের ধর্মপুঞ্জ ছিলেন তিনি। প্রবর্তক পত্রিকাকে তিনি অত্যন্ত মেহের চক্ষে দেখিতেন—বহুবার আশীর্বাদ করিয়াছেন পত্রিকাখানিকে। এই সনাতন পুরুষের পূর্ণা জীবন সম্বন্ধে বারম্বার প্রবর্তকে অলোচনা ইচ্ছা রহিল। আমরা তাঁর নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের নিকট আমাদের আনত পরম প্রণতি জানাইয়া শুভমতি ও কল্যাণপ্রেরণা প্রার্থনা করি।

সারস্বত সম্মেলন :

কাশীমহিহিত শ্রীরাবণী প্রচার সমিতির উদ্যোগে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী সারস্বত সম্মেলন পদ্মভূষণ ডঃ বি. এল. আনন্দের ডি. মিট, প্রাচ্যবিজ্ঞান-মহাপ্রব মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ভাষণাভির্ষের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সম্মেলনের প্রারম্ভে পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোতির্বার্ণব ও পণ্ডিত শ্রীবনমালী ধর্মশাস্ত্রী সংস্কৃত ভাষায় বাণী কর্তব্য করেন। প্রচার সমিতি-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীব্যাকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ভাগত ভাষণান্তে স্ব. যজ্ঞবল্ক্য ও ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বারানসীর সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের

নিবেদন

‘প্রবর্তক’ পত্রিকা প্রবর্তক-সঙ্ঘের মুখপত্র। কোন ব্যবসায়মূলক উদ্দেশ্য পত্রিকার নাই। নাই বলিয়াই উপরিচর লোকমতের স্রোতে ইহা ভাসিয়া চলে না। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সংস্কৃতি-ভিত্তিক জ্ঞাতিগঠনের লক্ষ্যে প্রবর্তক পরিচালিত। সম লক্ষ্য ও আদর্শে শ্রদ্ধাশীল গ্রাহক-গ্রাহিকার সঙ্গে সম্বন্ধই পত্রিকার সম্পদ। এই সব অমুরাগী সুহৃদদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দায়িত্ব-সচেতনতার উপর প্রত্যয়শীল বলিয়া আমরা প্রবর্তকের দক্ষিণার জন্য যখন-তখন তাগাদা-পত্রও দিই না। নিয়মিত টাঁদা আদায় না হইলে বর্তমান অগ্নিমূল্যের বাজারে পত্রিকা-পরিচালন ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি স্বাভাবিক। আমরা আশা করিব, চৈত্র মাসের মধ্যে বকেয়া টাঁদা পাঠাইয়া দিয়া অথবা অপারগ পক্ষে আদায়ের নির্দিষ্ট সময় জানাইয়া দিয়া গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ আমাদের আগামী চলার পথ সুগম করিবেন।

আগামী বৈশাখে, ১৩৭১, প্রবর্তকের ৫০তম বর্ষ পথ-চলার শুরু হইবে। পত্রিকার এই সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণীয় করার জন্য যথাযোগ্য পরিকল্পনাও করা হইতেছে। প্রবর্তকের গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও অমুরাগী-সুহৃদবৃন্দের সপ্রেম সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে আগামী বর্ষে প্রার্থনা করিতেছি। ইতি— পরিচালক : প্রবর্তক।

অনুস্থান ক্রীড়ার ডাইরেক্টর পণ্ডিত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “বেদে সরস্বতী” ও শ্রীদেবীনারায়ণ এড্‌ভোকেট, বিজ্ঞানাগর ‘সারস্বত’ বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা ও ডাঃ শ্রীনন্দলাল মুখার্জী “বিজ্ঞান” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহোদয় “যোগবাশিষ্ঠ” বিষয়ে তথ্যপূর্ণ ভাষণে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বাঙ্গী গোবিন্দ চক্রবর্তী, রত্না পাল, অসীমা ভট্টাচার্য, বিকাশরঞ্জন ব্যানার্জী ও তাঁহার পুত্র প্রাপ্তোষ।

নব ব্যারাকপুরে পূর্ণিমা সম্মেলন :

গত ১৭ই জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় নব ব্যারাকপুর গ্রামে সজ্জের দ্বিধাবান গৃহী-শিষ্য শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্যের নব নিম্নিত “ভগবানের বাড়ী”তে সজ্জের প্রবর্তিত পূর্ণিমা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। শ্রীমতী দীপালী ভট্টাচার্যের হুমিষ্ট কণ্ঠের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীমদোরঞ্জন মুখার্জি পূর্ণিমা সম্মেলনের মর্মকথা ব্যক্ত করেন। অন্তঃপর প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী শ্রীশঙ্করতত্ত্ব, দীক্ষা-মাহাত্ম্য ও সজ্জ-প্রবর্তিত সমবেত ব্রহ্ম উপাসনার তাৎপর্য ও উপকারিতা বিশদভাবে বিশ্লেষণ-মূলক ভাষণ দেন। ভট্টার সমবেত সাক্ষ্য-উপাসনার উদ্বোধন হুইট শ্রীশঙ্কর আর্যক সঙ্গীতের পর উপাসনা হয়। উপাসনান্তে সমাপ্তি সঙ্গীত হইলে পূর্ণিমার মন্তব্যে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়। সজ্জের পূর্বে ও সাম্প্রতিক দীক্ষিত গৃহস্থ সভ্য ও সভ্যাগণ এবং গ্রামের সজ্জাশ্রমী অনেক নারীপুরুষ, বালকবালিকা এই উপাসনার যোগদান করেন। উপস্থিত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রী অর্জুনানারায়ণ শিবের বার্ষিকোৎসব :

বিগত ১লা মাঘ রিষড়া প্রেম-মন্দিরে রাত্রি বারটায় অর্জুনানারায়ণ বিগ্রহের মঙ্গল-আর্য্যিকান্তে সংস্কৃত শিক্ষায়তনের চাত্রস্বাক্ষীর্ণণ যোগা-যাত্র বৈদিক মন্ত্রে মঙ্গলাচরণপূর্বক “হরকাঈর্ধ্যষ্টক স্তোত্র” গান করেন। অন্তঃপর হর ও শ্রী সজ্জের সভাগণ নরেন্দ্রনাথ গুহাইতের পরিচালনার প্রতীষ্ঠাতার কীর্ত্তিগাথা এবং বিভিন্ন ধর্মসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

শনিবার ২রা মাঘ প্রাতঃকালে নিষ্ঠাবান, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক দেবতার বোধশোপচারে পূজা, হোম ও আরতির পর অপরূহ চারিটা গর্ধ্যস্ত দেবতার প্রদান বিতরিত হয়। সন্ধ্যায় আর্য্যিক ও গুরু-অগ্রলিঙ্গ পর শ্রীশ্রীকোকেবার ভট্টাচার্য মহাশয় সংস্কৃত ও ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত দ্বারা জনগণের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করেন। পরদিন প্রেম-মন্দির আশ্রম ভক্ত ও শিষ্য সমাগমে পরিপূর্ণ হয়। এইদিন কয়েকশত বালক-বালিকাকে পরিভূষণপ্রদে প্রসাদ বিতরিত হয়। শ্রীশ্রী অর্জুনানারায়ণের প্রতিষ্ঠা পূজা উৎসব বাংলাদেশে শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারীজির অভিনব কীর্ত্তি। এই অভিনব বিগ্রহের পরিচয় প্রবর্তকের গত মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে হাজিমা :

দক্ষিণ ভারতে সাম্প্রতিক ভাষা-সম্পর্কিত হাজিমার পণ্ডিতেরা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যে অবস্থিত তাৎপর্য কণ্ঠ চালান হয় তাহা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। এই আশ্রমের ফলে বহু কালের সব্ব সঙ্কীত মূল্যবান জীব্যাদি বিনষ্ট হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অচির। সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের এদিকে তেমন দৃষ্টি আরুঠ হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জি ও শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এই অনভিপ্রেত ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং প্রধান মহাশ্রী শ্রীশান্তীকে ভক্তদের জন্ত পত্র দিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম বিষ চিহ্নার অন্ততম কেন্দ্রতীর্থ এবং আত্মজ্ঞাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা বাহাতে না ঘটে সেদিকে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের দায়িত্ব-সচেতনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। আশ্রমের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থাও সরকার করিবেন, এ আশা দেশবাসী করে।

পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় :

অত্যন্ত হৃদয়বোধ যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিয়োজিত একটি কমিটি কলিকাতা অধ্যা নবদ্বীপ এই দুইটি স্থানের স্থাপনা

উৎসব অনুষ্ঠানে -

ইন্দ্র'র সন্দেশ

অপরিহার্য!

৮৬, আমহার্ট ট্রাট কলি: ৯	৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২
ফোন-৩৫-১৩৮৩	ফোন-৩৪-২৫৩৩

অনামধন্ত ক্রীড়াবিদ
করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্যের
বিদেশে মোহনবাগান-৪-০০
বিভিন্ন দেশে মোহনবাগান ক্লাবের
রোমাঞ্চকর সফর কাহিনী। বহু
চিত্র ও অজানা তথ্যসমৃদ্ধ। সহজ
সাবলীল। রম্য-রচনার ভঙ্গী।
ফুটবল খেলার এ-দেশ ও-দেশের
তুলনামূলক সমালোচনা-বই এই
প্রথম। সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত।
প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলি: ১২

কবিরাছেন। সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিবেচনাও নবদ্বীপের দাবী অগ্রগণ্য। ভারতের সাধনা ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি সংস্কৃতভাষা ও শাস্ত্র। সদাচার ও ভারতীয় মেধা গঠনে সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনা নাই। মহানগরীর সদা-উত্তেজনায রাজসিক পরিবেশ সংস্কৃত চর্চা ও তদনুকূল জীবনগঠনের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। প্রশান্ত পরিবেশ ও বিভ্রালয়ের পরিধি বিস্তারের সম্ভাবনার দিক দিয়া নবদ্বীপ বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবদিক বিবেচনায় নবদ্বীপই নির্বাচন করিবেন।

নিগৃহীত কৃষ্ণাজ নেতা :

শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বর্ণ-বিবেচনাবহিত আমোলনের নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এক হোটেলে খোজা দক্ষিণপন্থীর হস্তে নিগৃহীত হন। উক্ত হোটেলট এক সময় শুধুমাত্র খোজাদের জন্য চিহ্নিত ছিল। ডঃ কিং কয়েকজন অমুগায়ীসহ উক্ত হোটেল প্রবেশ করিয়া যখন হোটেল বই-এ সই করতেছিলেন তখনই তিনি আক্রান্ত হন। পণ্যতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে এই উৎকট বর্ণবিবেচ

আজ বিখ্যাত। কিন্তু করলার মরলা হাজার হুইলেও বাইকার নহে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে শ্রমতিশীল বলিয়া অমুকরণের দৃষ্টান্তহীন।

শিক্ষা পর্যবেক্ষক :

ভারতে এক আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে লইয়া বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অমুসন্ধানের জন্য কতকগুলি পর্যবেক্ষকদল গঠিত হইয়াছে। ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনের পক্ষ হইতে ইঁহারা গঠিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যসরকার ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

রাজ্যসরকারগুলি বাহাতে পর্যবেক্ষক দলগুলিকে এই ব্যাপারে সহায়তা করেন, তৎক্ষণাৎ কমিশন অমুরোধ জানাইয়াছেন। ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সহকারী ডিরেক্টর জি.ম.তী কর্তৃপক্ষ গুপ্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ হইতে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও কমিশনের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী অফিসাররূপে কাজ চালাইবেন। স্বাধীনতা-উত্তর-যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিবর্তন,

তার মিত্রের

মায়ুর মার্কা

তিল তৈল



বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃস্রাবাগ অস্থিতীয়

শ্রীমূলপ্রসাদ সর্বাধিকারী
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০

সদা প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি
বাংলার জীবনী - সাহিত্যে
অরণীয় অবদান। অর্ধ শতাব্দীর
পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র
সম্বলিত।

সতীরাণী. ৩-০০

দাম্পত্যজীবনের উন্নত উজ্জল
রস ও সম্বন্ধের বিস্তার এই
গ্রন্থখানি গ্রন্থই অমুপম।

প্রবর্তক পাবলিশার্স
কলিকাতা-১২

|| শ্রীবীজকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ.
পি. আর. এস. ||

শ্রীমার্থ তত্ত্ব ৫-০০ শ্রীমার্থ তত্ত্ব ১৫-০০

জাতিভেদে ১ বেদ ও
কোরানের সাদৃশ্য ১

|| পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ||

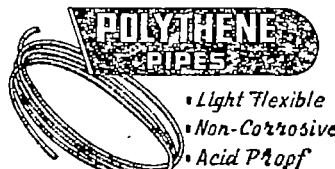
শ্রীশ্রীনারায়ণ ২-২৫

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-০০

|| কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ||

পরার্থকথা ২-২৫

প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২



P.V.C. PIPES.



Purnima TOOTH BRUSH

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

ESTD. 1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO. 10813

শিক্ষাব্যবহার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের ভূমিকা, সর্বস্বত্বাধারী শিক্ষা-সার্ভিসের প্রতিষ্ঠা, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মূদ্রণ ও বণ্টনের সমস্তা প্রভৃতি বিষয়ে পর্যবেক্ষকদল অনুসন্ধান চালাইবেন।

পরলোকে বসন্তকুমার দাস :

বাণীনাভা আন্দোলনের অন্ততম অঙ্গান্ত সংগ্রামী নেতা শ্রীবসন্তকুমার দাস গত ১৯শে জানুয়ারী ৮২ বৎসর বয়সে কলিকাতার শেখ নিঃ'স ত্যাগ করেন। ১৮৮০ সনে শ্রীহট্ট জেলার তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণপাত হয় ১৯০৬ সালের ঐতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশনে। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। “আইনভঙ্গের হির তোরণে” নামলার আইনজ্ঞরূপে তিনি সর্বস্বত্বাধারিত খ্যাতি অর্জন করেন। দেশবন্ধুর স্বাধীন দলের প্রাণীকরণে তিনি আসামের আইনসভার নির্বাচিত হন। ১৯৪৬-এ তিনি আসামের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন। দেশবিভাগের পরও তিনি শ্রীহট্টেই থাকিয়া বান। বিরোধী বান যুগের আমলে তিনি পাকিস্তানের শিক্ষা ও প্রশমন্ত্রী ছিলেন। প্রশমন্ত্রীরূপে তিনি আন্তর্জাতিক প্রশমসংস্থা (আই. এল. ও.)-র সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি আসাম ও পাকিস্তানের বিশেষ জনপ্রিয় নেতা ছিলেন।

বিশ্বসমাজ সংগঠন :

১৮১ বৎসরের পুরাতন এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্বোধনকালে রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ বলেন, আত্মদর্শন সমস্ত শাস্ত্রের মূল কথা। এই জ্ঞানার পথে বৈজ্ঞানিক ও মানবিক সংস্কৃতিতে কোন প্রসঙ্গ নাই। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা—উভয়েরই সমান অগ্রগতি প্রয়োজন মানব-সমাজের অগ্রগতির চক্ষু। তিনি আরও বলেন, এই পৃথিবী আমাদের বাসভূমি এবং ইহার সকল ঐতিহ্যের অধিকারী আমরা। বর্তমানে প্রয়োজন

বিশ্বসমাজ গঠনের প্রস্তুতি। ডঃ রাধাকৃষ্ণ সোসাইটিকে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে উদ্যোগী হইতে আহ্বান করেন। ভাষণের পর একটি প্রদীপ জালিয়া তিনি আধুনিকভাবে নব জীবনের উদ্বোধন করেন। প্রার্থনা করি এই প্রদীপের শিখা যেন অনির্বাপন হয়।

চীনাশাট্রির বাসন কি পবিত্র ? :

চীনাশাট্রির বাসন প্রস্তুত-সম্পর্কিত একটি সংবাদ হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা হইতে ‘টুথ’ সাপ্তাহিক পত্রিকা উদ্ধৃত করিয়াছে। সংবাদটিতে প্রকাশ, চীনাশাট্রির কাশার সঙ্গে হাড়ের জুড়া শিশাইয়া চীনাশাট্রির কাপ, ডিস, বাসন ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ইহা বাহিরে দেখিতে এত মন্থ ও মন্থর যে, ইহার উপাধান সম্বন্ধে প্রশ্নই জাগে না। পৌড়া হিন্দু হাড়ের শুড়ার বাসন ব্যবহার অপরিচিত ও অবিধেয় মনে করিবে। এই জন্তই পূর্বে পাণ্ডর বা তামার বাসনকোষণ পুঞ্জায় ব্যবহৃত হইত। হিন্দু বিধবারাও ইহাই ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যুগধর্মে পবিত্রতার ধারণাই বদলাইয়াছে।

মরণ-সংগ্রাম :

সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকার সচিত্র এই সংবাদটি প্রকাশিত। হাওড়া বোটানিক্যাল গার্ডেনের নিবটে মধুসূদন দাস লেনে এক ষোপে এক বিষধর সাপ ও নেউলকে তীব্র সংগ্রামের পর মৃত্যুবরণ করিতে দেখা যায়। দুপুরবেলার বহু লোক সেই ষোপের ধারে সমবেত হইয়া এই সংগ্রাম-দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করে। অন্তর্য চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীরা সংগ্রাম চালাইয়া শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাপের বেটীতে নেউলের পেট ফাটিয়া মৃত্যু হয় এবং নেউলের ছোবলে সাপের গলা কাটিয়া মৃত্যু হয়।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল আলোয়ান, ও হোসিয়ারী পোষাক বিক্রোতা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা। ফোন : ৩০-২৩০৩

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্ম

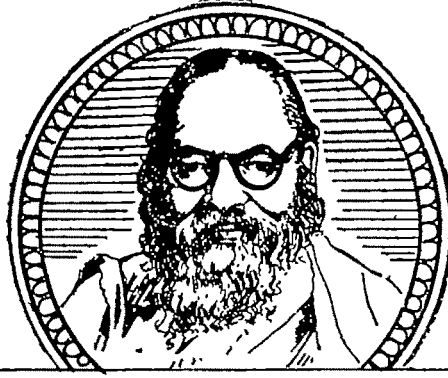
রামকানাই মেডিক্যাল স্টোয়ার্স

১২৮১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিণ্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণিষ্ঠময় রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৯ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

প্রবন্ধ

চৈত্র, ১৩৭১

জীবনের আলো

ভারতে অধ্যাত্ম ধারা ধরিয়া ভগবানের মাহু গড়ার আযোজন চলিয়াছে চিরযুগ। যাত্রার পরিসমাপ্তি কবে আসিবে তাহার দিকে ভারতের দৃষ্টি নাই। সে চলিয়াছে অনন্তের পথে। তাহার রাষ্ট্র ও সমাজ ইহার উপরেই প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। যদি রাষ্ট্র হারাইয়া যায়, সমাজও এই ভিত্তির উপর গড়িয়া না উঠে, তবুও ভারতের যাত্রা নিরন্তর হইবে না। গতিই তাহার জীবন। এই গতির আশ্রয়েই সে চলিয়াছে অন্তহীন জীবনের সত্য আবিষ্কার করিয়া। শরীর-প্রাণ-মনের উর্দ্ধে আত্মার জ্যোতির্ময় চেতনাই ভারতের মৌলিক লক্ষ্য। এই আত্মা সনাতন শাস্ত্র। তাহাতে আপনাকে লয় কবিয়া দিয়া মাহু পাইয়াছে শাস্তি। কিন্তু ভারতের গতি এইখানেই স্তব্ধ হইয়াছে, সে চাহিয়াছে ভাগবত-জীবন; এই তত্ত্ব ভারতের সর্বত্র পরিষ্কৃত। বাংলার সাধক-কবি গীতচ্ছন্দে যাহা সহজ বাংলাভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, গীতার ভগবান তাহাই দেবভাষায় বোষণা করিয়াছেন। গানের সুরে চণ্ডীদাস গাহিলেন—“মাহু মাহু ত্রিবিধ মাহু, মাহু বুঝিয়া লহ। সহজ মাহু, অযোনি মাহু, মাহু সংস্কার দেহ।” সংস্কার মাহু ভুবনে নিযত গতায়ত করে। অযোনি মাহু দ্রষ্টা হইয়া সর্বজীবে বসবাস করে। সহজ মাহু উত্তম পুরুষ। গীতার ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমেরই ইহা অমুবাদ। এই ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমের জীবন লইয়াই ভারত বাঁচিতে চায়। ভারতের লক্ষ্য এই পূর্ণ ও সিদ্ধ জীবন। এই লক্ষ্য অমুসরণ করিয়াই ভারতবাসী নবজীবন চায়। এই ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করিয়া তাহার জীবন-সাধনা কখনও সার্থক হইতে পারে না। পুরুষোত্তমের আনন্দবিধানের জন্তই যে তাহার অভ্যুত্থান। এই ধারায় সে চলিয়া আসিয়াছে বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত চরণে। সেই যে সে শুনিয়াছে, দেবহিত আয়ুর কথা, তাহা সে আজও ভুলিতে পারে নাই। সংস্কার-দেহ লইয়া সে বাঁচিতে চাহে না। অযোনি কুটস্থ পুরুষ হইয়াও তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি নাই। পুরুষোত্তমের সহিত পূর্ণযোগে যুক্ত জীবনই তাহার অব্যর্থ কাম্য। এই পুরুষোত্তমের ইচ্ছামুসারে সর্বকর্ম সমাপ্ত করার জন্তই সে বলিয়াছে “ভূয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিষুকোহস্মি তথা করোমি।” এই যোগসিদ্ধ জীবন দিয়াই ভারতবাসী গড়িতে চাহে ভাগবত-সাম্রাজ্য। ভারতের প্রয়াস সেইদিনই সফল হইবে, যেদিন ভারতের সর্বত্র দেবচরিত্র মানবের আবির্ভাবে জাতির জীবন সর্বতোভাবে পুরুষোত্তমেরই চিৎসত্তাে বিধৃত হইয়া তাঁহারই প্রেরণা সকল দিক দিয়াই সিদ্ধ করিবে।

(পুরাতন নবসংস্কৃত হইতে) .

সত্যগুরু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । অষ্টত্রিংশৎ স্তবঃ ।) চতুর্থী ঋক্

(সম্বন্ধরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

যদ্ যুয়ং পুশ্নি মাতরোঃ মর্ত্যাসঃ স্তাতন্ ।

স্তোতা বো অমৃতঃ স্তাৎ ॥ ৪ ॥

অর্থ—“হে পুশ্নিমাতরঃ” (হে পুশ্নি নামক রশ্মিসমূহ হইতে জাত মরুদেবগণ) “যুয়ং” (আপনারা) “যদ্” (যখন) “মর্ত্যাসঃ” (মর্ত্যবাসীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট) “স্তাতন্” (হয়েন) তদ্-“বঃ” (তখন আপনাদের) “স্তোতা” (স্তবকারীরাও) “অমৃতঃ স্তাৎ” (দেবতুল্য হন) ॥ ৪ ॥

সরলার্থ—হে পুশ্নি নামক রশ্মিসমূহ হইতে জাত মরুদেবগণ! আপনারা যখন মর্ত্যবাসীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন, তখন আপনাদের স্তবকারীজনও দেবতুল্য হন।

বিশদার্থ—“পুশ্নিমাতা যেষাং তে পুশ্নিমাতরঃ”—পুশ্নিমাতা যাহাদের, তাহারা এই ব্যাসবাক্যে পুশ্নি-মাতর পদ নিষ্পন্ন। পুশ্নি শব্দের অর্থ রশ্মি। আচার্য্য সায়েন বলেন—‘পুশ্নি নামক খেচুপুত্র মরুত’। খেচু গো শব্দেরই প্রতিশব্দ। বেদে গো এবং অশ্ব এই দুই শব্দ কিরণ ও গতির ছোতক। তাহা হইলে পুশ্নিমাতর শব্দের অর্থ হয় পুশ্নি নামক রশ্মি হইতে যাহারা জাত, তাহারা ই পুশ্নিপুত্র। আমরা পূর্বোক্ত স্তোত্রে পাইয়াছি—আকাশ হইতেই মরুদেবগণের উৎপত্তি। আকাশ বলিতে কি বুঝায়? উহা কি শূন্য পদার্থ? না। আকাশ শূন্য পদার্থ নহে। ইহা অগ্রবাহিত ঘন তেজঃ পদার্থ বা জগৎবৈশ্বাণর দ্বারা পরিপূর্ণ। জগৎবৈশ্বাণর মানেই দীপ্তিশীল রশ্মিকণাসমূহ। পুশ্নি অর্থও তাহাই। দুই-ই দীপ্তিময় তেজঃ পদার্থ, ঘন রশ্মিজাল। সব রশ্মি হইতেই আবার বায়ুর উৎপত্তি হয় না। যাহারা আকাশের শব্দগুণকে আশ্রয় করিয়া নিয়ত গতিশীল—তেজঃস বায়ুর জনক তাহারা ই। পুশ্নি তাহাদেরই নাম। এই হেতু এই ঋকে মরুদেবগণকে পুশ্নিপুত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঋষি বলিতেছেন—যখন পুশ্নিপুত্র মরুদেবগণ মর্ত্যাসঃ স্তাতন—মর্ত্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন, তখন স্বভাবতঃ মর্ত্যবাসীরাও অমৃত স্তাৎ—দেবোভাবেন—দেবভাবাপন্ন হইবেন। বিশেষভাবে স্তোতা, স্তবকারী যাহারা, তাঁহারা তো দেবভাবে ভাবিত হইবেনই। কেন হইবেন? ইহা অতি সাধারণ নিয়ম। কারণ, তখন সেই আর্ধ্যাধিগণের যুগে জন-সাধারণ স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যে যে বায়ু গ্রহণ করিত, সেই বায়ু বিশুদ্ধ, পবিত্র, হবির্গন্ধযুক্ত ছিল। পরমেশ্বরের প্রতীকস্বরূপ ভূমা হইতেই সেই বায়ুর উৎপত্তি। আকাশের শব্দগুণকে আশ্রয় করিয়া তাহারা ক্রিয়াশীল। সে বায়ুতে মলিনতার লেশমাত্র ছিল না। এখনকার মত বিষবাপ্পে তাহা বিষাক্ত নয়, এখন যেমন বিজ্ঞানের সম্মোহনে ভূ-বায়ু হইতে অস্তরীক্ষ বায়ু দ্যাৱা পৃথিবীর সবথানিই দূষিত, বিষাক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত, তখন তো তাহা ছিল না। তখনকার আকাশও নির্মল, বাতাসও স্বচ্ছ-পবিত্র ছিল। সেই পুত আকাশ-বাতাস হইতে যে মেঘ সৃষ্টি হইত তাহারা ই বারিধারা মর্ত্যের বৃকে যে শস্যাদি উৎপন্ন হইত তাহাও বীজাণুযুক্ত সতেজ, জীবাণুশক্তি সম্পন্ন পবিত্রতম শস্য। জল-বায়ু-খাদ্য সবই যদি বিশুদ্ধ, পবিত্র, অমৃততুল্য হয়, তাহা গ্রহণ করিয়া মানুষের মনও কেন না পবিত্র উন্নততর হইবে? কেন দেহ স্বস্থ, সবল ও নীরোগ হইবে না? কেন প্রাণে বিস্তৃত অনাবিল আনন্দের প্রবাহ নামিবে না। মানুষ যদি দৈবীগুণ সম্পন্ন হইয়া, দৈবভাবে ভাবিত হয়—তবে সে কেন দেবতা-পদবাচ্য হইবে না? যাহা সৎ, যাহা পবিত্র, তাহার ফলভাগী সাধারণভাবে সকলেই যখন হইতে পারে, তখন বিশেষভাবে অর্চনাকারী ধারা, তাঁরা তো হইবেনই। এখনকার মানুষ দেবতাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের কৌশল জানে না—সে শিক্ষা, সে সাধনা, সে তপস্যা তাহার নাই—তাই দেবতা হওয়ার আশাও আজ কল্পনাবিলাস মাত্র।

ভারতের ভাষাসমস্যা ও তার চূড়ান্ত সমাধানের পথনির্দেশ

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস, এম-এসসি, ডি-ফিল

(লেকচারার, জার্মান ভাষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

মহারবি গ্যেটে বলেছেন—“Allen edlen Völkern ist ihre Sprache höchsten Stolz und Hort gewesen.—প্রত্যেক আত্মসম্মানসম্পন্ন মহৎ জাতির নিকটেই তার মাতৃভাষা সর্বাপেক্ষা গর্বের বস্তু এবং অমূল্য সম্পদ।”

ভারতের মত বিরাট দেশে একটি অত্যন্ত অহম্মত ভাষাকে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ নানাভাবে সর্বভারতীয় ভাষায় পরিণত করবার যে স্বপ্ন মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু ও তাঁদের অহুচরবর্গ এতদিন দেখে আসছিলেন তা যে কতদূর অবাস্তব ও ভ্রমাত্মক আজ তা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। হিন্দীভাষারূপী অশ্বমেধের ঘোড়া প্রভুদের পরম আদরে দামী দানাপানি পেয়ে যতদিন দিল্লী দরবারের আশ-পাশে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল ততদিন মহাত্মাদের গলদ ধরা পড়েনি। যখনই ঐ ঘোড়া বিদ্যুৎগিরি পেরিয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের প্রয়াস পেল, তখনই চতুর্দিকে প্রচণ্ড আগুন জ্বলে উঠে ঐ ঘোড়ার পথরোধ করে দাঁড়ালো।

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অহুচরগণ যত বড় রাজনীতি-বিদই হউন না কেন, তাঁরা সর্বজ্ঞ নন এবং মহুগুপ্তলভ দুর্বলতা ও ভ্রমপ্রমাদ থেকে তাঁরা যে একেবারে মুক্ত নন এ কথা তাঁরাই একাধিকবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য করেন নাই। স্মরণ্য ভাষা সম্বন্ধে তাঁরা যে সিদ্ধান্ত করে গেছেন তা বেদবাক্য নয়। বর্তমান শোচনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ তার আমূল পরিবর্তন না করলে ঋণ্ডিত ভারত আরও ঋণ্ডিবিধ হতে যাবে—কোনও শক্তিই তা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

ভারতের প্রাদেশিক ভাষা অনেকগুলি এবং তার অধিকাংশই ওদের মনোনীত ভাষার চেয়ে অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। স্মরণ্য ঐসব প্রদেশের আত্মসম্মান-সম্পন্ন লোকেরা নেহাৎ প্রলোভনে পড়ে তাদের মায়ের মুখের ভাষা ছেড়ে অপর ভাষা অবলীলাক্রমে গ্রহণ করবে এ ধারণাই বা তাঁরা মনে স্থান দিলেন কিরূপে? বোধ করি নেতাদের প্রধান বক্তব্য, একভাষাভাষী হলে দেশের

সকল লোকের হৃদয় ও মন একসূত্রে গ্রথিত হবে, হিংসা-ঘেয বিদূরিত হয়ে ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ ধারণার যে গোড়াতেই গলদ। ইংলণ্ড ও আমেরিকা এক ভাষাভাষী হলেও তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হ'ল কেন?—ছুটি দেশ চিরতরে পৃথকই বা হল কেন? এক পিতামাতার সন্তান হয়েও দুই ভাইএর মধ্যে মারামারি কাটাকাটি হয় কেন? বস্তুতঃ স্বার্থের সংঘাতই সকল বিবাদ-বিসংবাদ ও বিচ্ছেদের মূল কারণ।

তারপর অভাবের নিদারুণ তাড়নাও মানুষকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। গ্রাসাচ্ছাদনের তেমন ভাবনা না থাকলে সাধারণ মানুষ জানতেও চায় না—শাসকেরা কোন্ ভাষার কথা বলে? হাজার মিষ্টি কথা বলেও স্বামী যদি জীর ভাতকাপড়ের সংস্থান না করতে পারে তবে ঐ সংসারের অবস্থাটা কেমন হয়?

জাতীয় সরকার সেদিক তলিয়ে দেখে তার সর্বাত্মক প্রয়াস না পেয়ে একটা অহম্মত ভাষার পেছনে কোটি কোটি টাকা ঢালছেন। ঐ টাকা সারা ভারতের বুড়ুফু প্রাথমিক শিক্ষকদের দিলে তাতে ক'রে দেশে মানুষ তৈরির পথ অনেকটা প্রশস্ত হত। কিন্তু চরম দুঃখের বিষয় এ দিকে তেমন নজর কেউই দিচ্ছেন না।

পূর্বেই বলেছি নেহেরুজীও মানুষ ছিলেন—দেবতা তিনি নন—কাজেই মহুগুপ্তলভ sentiment-ও তাঁর মধ্যে কম ছিল না। নতুবা মৃত্যুর পর তাঁর ভস্মরাশি এই গরীব দেশের অজ্ঞ অর্থব্যয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিবার উদ্ভট, হিন্দু সংস্কারবিরোধী কল্পনা কি ক'রে তাঁর মাধায় স্থান পেল? এ ব্যাপারে বিজ্ঞানসাধক, জনহিতৈষী উৎসর্গীকৃত প্রাণ নেহেরুর ছবি আমরা দেখতে পাই কি? ঐ বিপুল অর্থ শিকার ক্ষেত্রে ব্যয়িত হলে দেশে মানুষ তৈরির ক্ষেত্র উর্বরতর হ'তে পারত—তা কে না স্বীকার করবে?

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করার প্রাতঃস্মরণীয় সম্রাট ফ্রেডারিক দী গ্রেটের কথা মনে পড়ে। তিনি নিজে স্পৃহাশীল ছিলেন

এবং বিদ্বান লোকের সংসর্গ ভালবাসতেন। বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ভলটেয়ার কিছুদিন তাঁর সভাসদ ছিলেন। তাৎকালীন জার্মানদের শিক্ষাদীক্ষা বা কৃষ্টি নেই বলে বিক্রপ করাতো, ১৭৭৫ সালে ইহার উত্তরে ফ্রেডারিক ভলটেয়ারকে যে কথা বলেছিলেন আজকের দিনে আমাদের তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।—“আপনি সত্যই বলেছেন জার্মানদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট অভাব। কিন্তু আপনার হয়তো অজানা নেই যে, ‘Thirty Years’ War জার্মানিকে কিরূপ বিধ্বস্ত করেছিল। জার্মানি এখনও সেই ক্ষতি সামলিয়ে উঠতে পারেনি। আমি চাই সর্বপ্রথম কৃষির উন্নতি করে বৃহৎ জনগণের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে। তারপর স্কুল হবে ছোটখাটো শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য। এইরূপে যখন দেশে সচ্ছলতা আসবে তখন এখানে ওখানে ছ’চারজন প্রতিভাবান পুরুষ জন্মাবে—তারা ভাষার উন্নতিসাধন ও সঙ্গে সঙ্গে চাকরকারও বিকাশসাধনে যত্নবান হবে।”

মহামতি সম্রাট কৃষিকে কিরূপ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি থেকেই তা স্পষ্ট বুঝা যায়—“Derjenige, welcher machen kann, dass dort zwei Halme wachsen, wo sonst nur einer wuchs, hat für die Interessen seines Vaterlandes mehr getan, als alle Politiker zusammengenommen. —অর্থাৎ যেখানে একটিমাত্র শস্য শিষ জন্মাত, সেখানে যিনি দুটি শিষ ফলাতে পারেন, মাতৃভূমির প্রকৃষ্ট কল্যাণকল্পে তাঁর দান দেশের সমুদয় রাজনীতিবিদের দানের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।” অনেকেই জানেন, মহামতি সম্রাটের ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই ফলপ্রসূ হয়েছিল। অনতিকাল মধ্যেই জার্মানিতে গ্যেটে, শিলার প্রমুখ মহাকবি ও দার্শনিকের আবির্ভাবে জার্মানভাষা বিশ্ব-সাহিত্যের সূক্ষ্মতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে পরিগণিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে উলাণ্ড, আইকেনউর্ক, হাইনে, মেরিকে প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ও কবি ঐ ভাষাকে আরও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করেন। এই শতাব্দীর শেষ ভাগে সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক গেরহার্ট হাউপটম্যানের আবির্ভাব। বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান জার্মান

সাহিত্যিক হিসাবে টমাসমান, রাইনার মারিয়া রিল্কে ও হেরমান হেসের নামও সারা বিশ্বের শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। ঐরা কেঁহিই যে রাজকীয় সাহায্যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই তার উল্লেখ নিম্নয়োজন। ইংলণ্ডে সেক্সপিয়র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটসের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

তারপর ভাষার প্রসার ও প্রচারের কথা। ফুলে মধু থাকলে ভ্রমরকে খবর দিতে হয় না—সে নিজের তাগিদেই তাকে খুঁজে নেয়। ভাষার অন্তর্নিহিত সম্পদ বিদ্যমান থাকলে বিশ্বের দৃষ্টি তার উপর এসে পড়ে। উনবিংশ-শতাব্দীর শেষার্ধ্বে দিকপাল জার্মানবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান আহরণের জন্য সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গবেষকবর্গ জার্মান ভাষা শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। এটা আমার মুখের কথা নয়; মনীষী এইচ. জি. ওয়েল্‌স তাঁর পৃথিবীর ইতিহাস গ্রন্থে ইহা স্পষ্টভাবে লিখে গেছেন। বর্তমান রুশ বিজ্ঞানীদের অসামান্য অবদান অবগত হবার জন্য সারা পৃথিবীতে এখন রুশ ভাষা শেখবারও প্রবল আগ্রহ বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

সমাজের সর্বস্তরের সচ্ছলতা ব্যতিরেকে ভাষার উন্নতি হয় না। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের জনগণের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব ছিল না, তাই ১৮৫০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে বাংলাভাষার অপূর্ব বিকাশ সাধিত হয় এবং বাংলাভাষা বিশ্বের দরবারে গৌরবের আসন লাভ করে।

সচ্ছলতা ছাড়া যুগধর্ম ও ভাষার বিকাশ সাধনে কার্যকরী মনে হয়। অগ্রহায়ণে ফুলকপির চারা রোপণে বা কালবৈশাখী নামার আগে পাটবীজ বপনে উপযুক্ত বীজ, সার ও জলসেচও যেমন ফলন হয় না—ভাষার উন্নতিতেও সেইরূপ যুগধর্মের প্রভাব স্বীকার্য। যে যুগে ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী নিদারুণ জঠর জ্বালায় এবং অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় ব্যক্তি লোভ-লালসার উদগ্রে তাড়নায় সর্বপ্রকার আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে দ্রুত পশুত্বের নিম্নতম স্তরে নেমে যাচ্ছে, সে যুগে কোন্‌ও ভাষার বিকাশ বা সত্যিকারের সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়।

তারপর অসুবাদ-সাহিত্যের কথা। ভাষা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে অসুবাদ-সাহিত্যের মূল্য স্বীকৃত। কিন্তু

অনুবাদের অধিকারী কে? প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে স্বকনিষ্ঠতার সমন্বয় ব্যতিরেকে উচ্চ স্তরের অনুবাদ অসম্ভব। জার্মানির অগ্রতম মহাকবি শিলার সেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ প্রভৃতি নাটকের যে জার্মান অনুবাদ করেছিলেন তা এখন পর্যন্ত জার্মান সাহিত্যের গৌরব বলে বিবেচিত। প্রচুর মেধা ও পরিশ্রমশীলতার সঙ্গে অনুবাদকের চাই অসামান্য ধৈর্য। তাঁর অবিদ্যমান কীর্তি, জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদের সময়, মার্টিন লুথার কোনও একটি ‘জুংসই’ কথা সংগ্রহের জন্য সমাজের ছোট বড় নানা শ্রেণীর লোকের কণোপকণন লক্ষ্য করে ঘুরে বেড়াতেন। একটি সার্থক কথার জন্য তাঁকে পক্ষাধিক কাল লেখা বন্ধ রাখতে হয়েছে বলে জানা যায়। কাজেই উৎকৃষ্ট অনুবাদ যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার।

১৭৮৯ সালে সুবিখ্যাত প্রাচ্য-তত্ত্ববিদারদ সুপণ্ডিত সার উইলিয়াম জোনস কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় শকুন্তলার অনুবাদ প্রকাশ করেন। জর্জ ফরসটার নামক জনৈক জার্মান সাহিত্যিক ১৭৯১ সালে উহা অনুবাদ করে মহাকবি গ্যেটেকে এক খণ্ড উপহার দেন। গ্যেটে এই জার্মান অনুবাদ পাঠ করে এত মুগ্ধ হন যে, তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটি চিরস্মরণীয় ছন্দে তাঁর প্রগাঢ় উচ্ছাস প্রকাশ করেন। নিম্নে মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হ’ল।

Will ich die Blumen des frühen,
die Früchte des späten Jahres,
Will ich, was reizt und entzückt,
will ich was sättigt und nährt,
Will ich den Himmel, die Erde,
mit einem Namen begreifen,
Nenn ich Sakuntala dich,
und so ist alles gesagt.

নব বৎসরের ফুঁড়ি, তারি একপাতে বরষ শেষের পক্ষ ফল,
প্রাণ করে চুরি, আর তারি একসাথে,

প্রাণে এনে দেয় নববল,
আছে স্বর্গলোক, আর সেই এক ঠাই,

বাঁধা যেথা আছে ধরাতল,
হেন যদি কিছু থাকে, তুমি তবে তাই,

ওহে অভিজ্ঞান শকুন্তল। (রবীন্দ্রনাথ)

অনুবাদ কতদূর মূল্যহীন হওয়ায় শকুন্তলা গ্যেটের অন্তরে এরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর এরূপ স্তরের অনুবাদ খার-তার হাতে বের হয়না, তার উল্লেখও নিম্নয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকার রাতারাতি হিন্দীকে উন্নত করবার জন্য হিন্দিভাষী ঋীদের উপর বাংলা প্রভৃতি ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিম্মিতে অনুবাদের তার তত্ত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়জন সত্যিকারের নিষ্ঠাবান, স্বকনিষ্ঠসম্পন্ন, ধৈর্যশীল সাহিত্যিক আছেন? উগ্র প্রাদেশিকতা বশতঃ বা অগ্রপঞ্চাৎ বিবেচনা না করে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি দৃকপাত না করে ঋারা একটি মাত্র ভারতীয় ভাষাকে সর্বভারতীয় রূপ দানে বন্ধপরিকর তাঁরা যদি পক্ষপাতহীন মনে ধীরচিন্তে বিবেচনা করেন তবে সংস্কৃতই একমাত্র ভাষা যাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে সাংগ্রহে বরণ ক’রে লওয়া যায়। সাধু ভাষা কেন, অসাধু বাংলাভাষার মধ্যেও তুরি তুরি সংস্কৃত ও তৎসম্ভব শব্দাবলী বিদ্যমান। অপরাপর আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। সর্বজনপুজ্য স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার যে সহজ পথ দেখিয়ে গেছেন তাহাতে এই ভাষা শিক্ষা করা কঠিন নয়—সময়সাপেক্ষও নয়। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ সবই মূলতঃ সংস্কৃত ভাষায় বলে প্রত্যেক হিন্দুর কাছেই সংস্কৃত আদরণীয়। তবে সংস্কৃতকে এই ভাবে সর্বভারতীয় ভাষা করলেও বাইরের জগতের সঙ্গে আদান প্রদানের, বিশেষ করে উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার খাতিরে এবং কূটনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ইংরেজীকে আদৌ বাদ দিলে চলবে না। ঋারা সংস্কারমুক্ত মনে অপক্ষপাত দৃষ্টিতে ভারতের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করেন তাঁরা কিছুতেই ইংরেজী বর্জন বরদাস্ত করবেন না। ইংরেজী না থাকলে কি আমরা বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী বা জহরলালজীকে পেতাম? ইংরেজী না জানলে কি আর সি. ভি. রমন, সার জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি জগদ্বরেণ্য বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটত? ইংরেজী না শিখলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত বাহক জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষাও দুঃসাধ্য হবে। ইংরেজী শেখাও যায় অতি সহজে; তারপর রোমান

হরফের দরুণ চিঠিপত্র থেকে আরম্ভ করে বিরাটকার গ্রন্থাদি প্রণয়নেও সময় এবং শ্রম যে অনেক কম লাগে তা উগ্রপন্থী হিন্দী দরদীরাও স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। বিখ্যাত মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েন বলেছেন—English can be learnt in 30 hours, French in 30 days and German in 30 years। কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি থাকলেও মোটের উপর কথাটি খাঁটি বলেই ভাষাবিদদের ধারণা।

সত্য বটে ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলের লোকেরা অনেক আগে ইংরেজের সংস্পর্শে আসার দরুণ মাত্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের সাধারণ লোকেও মোটামুটি ইংরেজী বলতে ও বুঝতে পারে। ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চলের লোকেরা অনেক পরে ইংরেজের সাম্রিক্য লাভ করায় উপকূলবর্তী অঞ্চলের লোকের তুলনায় তারা এ বিষয়ে কিছুটা পশ্চাৎপদ। তবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সঙ্কট, আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকগণের দ্বারা পাঠ গ্রহণ করলে এ ভাষা আয়ত্ত করতে তাঁদেরও বেশী সময় লাগবে না।

একটা হাস্তকর মজার কথা এই, ভারতের যে সব অঞ্চলের অধিবাসী ইংরেজী বিভাডনে উচ্চত-লম্বড় তাঁরা, কিন্তু ইংরেজী বা বিলিতি পোষাক পরতে আদৌ লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করছেন না।

সুইজারল্যান্ড অতি ক্ষুদ্র দেশ। লোকসংখ্যা মাত্র ৫২ লক্ষ ৩৫ হাজার। অথচ জনগণের উদার মনোবৃত্তির বলেই তারা জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পবাণিজ্যে পৃথিবীর অগ্রতম শ্রেষ্ঠ জাতি বলে সম্মানিত। ক্ষুদ্রতম দেশ, অথচ সেখানে চারিটি রাষ্ট্রভাষা প্রচলিত। ১৯৪৯ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের বিদায় সম্বর্ধনা সভায় দেখলাম—কেউ জার্মান ভাষায়, কেউ ফরাসীতে, কেউবা আবার ইতালীয় ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। শিক্ষক ও ছাত্র 'হল' ভর্তি, অথচ কারও মুখে বিন্দুমাত্র বিরক্তির ভাব দেখতে পাইনি।

রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলেছিলেন—পূর্বপুরুষের খনিত দীর্ঘ কালক্রমে ভরাট হয়ে ব্যাধিবীজসংকুল ডোবাষ পরিণত হয়েছে। এখন পূর্বপুরুষের সম্মানার্থে ঐ দ্বিত জল পান করে প্রাণ হারাতে হবে? আজ কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সংবিধানের দোহাই দিয়ে ভাষা-সমস্যা সমাধানে পরাশ্রয় তাঁদের কি রবীন্দ্রনাথের ঐ বাণী একান্ত প্রণিধানযোগ্য নয়? প্রারম্ভেই বলেছি দ্বারা সংবিধান সৃষ্টি করছেন তাঁরা ত্রিকালজ্ঞ নন, মানবীয় ক্রটি বিচ্যুতি থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিমুক্ত এ ধারণাও গ্রাহ্য নহে। মানুষের জন্তই সংবিধান, সংবিধানের জন্ত মানুষ নয়।

সুতরাং সর্বদম্মতিক্রমে, নিঃস্বার্থভাবে, ভরতের উচ্ছল ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে, অগোণে ভাষা সম্বন্ধীয় সংবিধানের অমুচ্ছেদ পরিবর্তন করা সর্বাগ্রে আবশ্যক।

ভারতের ভাষা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান নির্ভর করছে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি অগোণে অপক্ষপাত দৃষ্টিতে, সংস্কারমুক্ত মনে গ্রহণ ও প্রতিপালনের উপর।

১। প্রত্যেক রাজ্যকেই তার মাতৃভাষা ও ইংরেজী সমভাবে শিখতে হবে।

২। সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষারূপে ইংরেজীকে চিরদিনের জন্ত বহাল রাখতে হবে।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক রাজ্যের মাতৃভাষাকে তার বিকাশকল্পে সমভাবে সাহায্য করবেন।

৪। ভারতীয় কোনও আঞ্চলিক ভাষাকে সর্ব-ভারতীয় ভাষা করার জিদ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।

৫। সংস্কৃত সমৃদ্ধ দেশীয় ভাষার জননী—সুতরাং অন্ততঃ উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত উহার পঠনপাঠনের ব্যবস্থা সকল রাজ্যেই রাখতে হবে। সংস্কৃত এবং ইংরেজীর জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট বাহন জার্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করা অত্যন্ত দুর্লব।

৬। প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার বর্ণমালা রোমান হরকে প্রবর্তন করতে হবে। এতে করে এক রাজ্যের অধিবাসী অপর রাজ্যের মাতৃভাষা সহজে সত্ত্বর আয়ত্ত করতে পারবে। পুস্তকাদি প্রণয়নেরও প্রচুর সময় এবং ব্যয় লাঘব হবে। এই সব সুবিধার জন্ত জার্মান জাতি তাদের স্বকীয় বর্ণমালা বর্জন করে রোমান হরফ গ্রহণ করতে আদৌ দ্বিধা বোধ করে নি।

বর্তমান প্রগতিশীল জগতে অল্পাত্ন উন্নত জাতি যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিদ্যুতপতিতে অগ্রসর হচ্ছে, সে সময় কোনও শিশু ভাষাকে লালন পালন করে সাবালক করে তোলার জন্ত সময় শক্তি ও অর্থ নষ্ট করা আদৌ সমীচীন নয়। ইংরেজীর মাধ্যমে ক্রম জ্ঞানাহরণ করে দেশের জীবনধারণের মানদণ্ডের উন্নতি বিধান সর্বাগ্রগণ্য। হিন্দীকে চালু করতে গেলে প্রত্যেক অহিন্দীভাষীদের ইংরেজী সহ তিনটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হবে—এতে সময় ব্যয় হবে প্রচুর—তারপর প্রোটিন খাওয়া যে দেশে অতি হুমূল্য এমন কি ছাপ্রাপ্য এবং সঙ্কট চিন্ত, আদর্শপরায়ণ, সচ্ছল শিক্ষকেরও যে দেশে দারুণ অভাব, সে দেশের ছেলেমেয়েদের তিনটি ভাষা শিক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। ইউরোপের অনেক দেশে শেখে বলে নজির

দৃষ্টিকোণ

শ্রীনির্মল রায়

অতঃপরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল বিয়েতে। ব্যাপারটা কিছু অস্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক নয়। অতঃপর কিন্তু এমনটাই ভেবেছিল। ভাববার কারণও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সমস্ত কারণ ছাড়িয়ে এ ব্যাপারে স্মিতার নিজের তাগিদটাই যে ছিল সব থেকে বেশী—অতঃপর তা জানতে পারল অনেক পরে। বিয়ের দিন।

বাসু সাহেবের নামে দুর্নাম রটেছিল স্মিতার নাম জড়িয়ে। বাসু সাহেব এম. এণ্ড এম. কোম্পানীর এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। প্রকৃতি গম্ভীর। দেখতে শুনতে সৌম্য এবং সুদর্শন।

একই কোম্পানীর ম্যানেজার এ্যাসিস্ট্যান্ট—শ্রীমতী স্মিতা বোস। সংক্ষেপে মিস্ বোস। চক্চকে এবং চটপটে দীর্ঘাঙ্গী অনুচা যুবতী। চোখে মুখে যৌবনের জ্বলন্ত উজ্জ্বল। বয়স কুড়ি একশ। কিংবা কিছু কম বা বেশী। এ হেন স্মিতাকে নিয়ে দুর্নাম রটল বাসু সাহেবের নামে।

দুর্নাম কেউ বিশ্বাস করত। কেউ করত না। দুর্নামেরই যুক্তি ছিল যথেষ্ট। যদিও সম্যক প্রমাণ সাবুদ ছিল না কারণ হাতে।

একদল বলত, হঁ হঁ বাবা, সব জানা আছে। প্রমাণ চাও দিতে পারি। নিজের চোখে দেখা। শোনা কথা মোটেই নয়। নিজের চোখে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি নে ইত্যাদি। অল্পদল বলত, কল্পনা না, হতেই

পারে না। বাসু সাহেব ও ধাতেরই নয়। ধারণ তার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতঃপর অফিসর, কিন্তু কত বিনয়ী, কত অমায়িক। তাছাড়া বয়স—।

প্রথম দলের রমেন হাজরা প্রায় ষোলোকে ওঠে,—খাম বাপু খাম্। সবতো বুঝলাম। কিন্তু পাঁচটা বাজতে না বাজতে, যুগলমূর্তি রোজ টু সীটারে কোথায় যায় জানিস? খবর রাখিস কিছু? বলবি বাড়ী যায়, না? মিস্ বোসের ট্রামে-বাসে যুলে যেতে বড় কষ্ট, তাই বাসু ওকে পৌঁছে দেয় রোজ—এক পাড়ায় থাকে কিনা—?

এ দলের সত্যেন ঘোষাল গর্জে ওঠে—হ্যাঁ তাইতো। তাছাড়া আবার কি?

রমেন হাজরা দমবার পাত্র নয়। তর্জনী উঁচিয়ে বাকানো গলায় বলে ওঠে,—কিন্তু মিস্টার,—শ্রীমপুত্র এলাকাটা কি হালে রেড রোডে উঠে এসেছে? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে বুকি নব শ্রীমপুত্রের পত্তন হয়েছে?

কে একজন কোঁড়ন কাটে—শ্রীমপুত্র নয় ব্রাদার, শ্রীমপুত্র নয়। কলির শ্রীমলীলা নিকেতন ঐ গড়ের মাঠ। পুত্র নেইবা থাকল। গোপিনীদের সঙ্গে গোপন অভিসার চলুক আধো আলোছায়ায় উজ্জল চেউএর দোলা লাগা ঐ নিশীথ সরোবরে। ভয় কি? হিন্দুস্থান হামারা হায়। ‘হিম্মার-হিম্মার’—একটা অতি কদম্ব অটুহাসি ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত ঘরময়।

সত্যেনদের দল শুক। থেমে যায় ওরা একেবারে।

দেখালে চলে না, তাদের খাদ্যপদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা ও আদর্শবাদের কথা ভুলে গেলে চলবে না। পক্ষান্তরে জীবনের কোনও অঞ্চল একটি কি দুটি ভাষা শিখে কিস্তী-মাত করবে—আর অপর অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা তিনটি ভাষা শিখতে জীবনপাত করবে—এ কি গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা? তাই বলি উৎকট হিন্দী অমুরাগ বর্জন করে নেতাদের স্বার্থলেশশূন্য মনে বিচার বিবেচনা করে

ধামাচাপা বা ছাইচাপা দিয়ে সাময়িক সমাধানের চেষ্টা না করে চিরদিনের জ্ঞান সুসমাধান করে, চিরদিনের মত ভারতের সংহতি বজায় রাখার জ্ঞান তাঁরা দৃঢ়সংকল্প হউন; আর তার জ্ঞান, উদ্ভিষিত প্রস্তাবগুলি যে সর্বোত্তমভাবে গ্রহণীয় তার সন্দেহমাত্র নাই। কোনও একটি ভাষা ভাল করে শিখতে গেলে কত সময় ও শক্তি ব্যয়িত হয়, তুচ্ছভোগী লেখক সবিশেষ জানে বলেই আমার আন্তরিক অন্তিমত প্রকাশ করলাম।

শুধু বলে,—তোদের সঙ্গে কথা বলাই দায়। কি জবাব তোদের মনোবৃত্তি ইত্যাদি।

অতঃ এই ছুটো দলের কোনোটাতেই সোজা স্তম্ভিত নয়। খেই ধরে ছুটো দলের সঙ্গেই। নিজে বলে না কিছুই। রমেনদের দল কিছু জিজ্ঞাস করলেই বলে,—কি বলি ভাই! এসব ব্যাপার ভাল করে সঠিক না জেনে যদিও কিছু বলা ঠিক নয়; তবু তোমরা যা বলছ তাতে সন্দেহ হয় বৈকি! সত্যেনদের দলকে বলত—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো, নাতনীর বয়সের মেয়ে—! ননা না, যা বলেছো—এ হ'তেই পারে না, কখনো না। ও সব বিশ্বাস করি না আমি।

অতঃ বিশ্বাস না করলেও, তার মন সন্দেহ হ'বে ওঠে ক্রমশঃ।

ও-অফিসে অতঃর কাজের সুনাম ছিল যথেষ্ট। নিজের দক্ষতায় সামান্য কেরানী থেকে একটা বিভাগের বড়বাবু পর্যায় উন্নীত হয়েছে সে। মিস্ বোস্ ওরই সেকশনের এসিস্ট্যান্ট। সে প্রায় আট মাস আগের কথা, বাসু সাহেব স্বয়ং একদিন ডেকে মিস্ বোস্কে দেখিয়ে বললেন,—একে তোমার জিম্মা দিলাম। কাজ-কর্ম শিখিয়ে তৈরী ক'বে নিও। মিস্ বোস্কে বললেন,—এঁর কথামত কাজকর্ম দেখে-শুনে নিও, অসুবিধা কিছু হবে না। দরকার হ'লে আমার কাছে এসো।

বাসু সাহেবের কথায় আশ্বাসদানে ভরে গিয়েছিল অতঃর মন। বলেছিল—ঠিক আছে স্যার, আমি নিজে সব দেখিয়ে দেব। আপাতত ওঁকে কিছুদিনের জন্য জেনারেল ডায়েরীতে দিচ্ছি। তাতে জানতে পারবে সেকশনের সবরকম কাজের ধাঁচ। তারপর কোন আইটেমে নিয়ে আসব। বাসু সাহেব সম্মতি জানিয়ে-ছিলেন ঘাড় নেড়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই স্মিতার কর্মতৎপরতার পরিচয় মিলল—অতঃ এবং অতঃ অনেকের এমনকি বাসু সাহেবেরও। বাসু সাহেব একদিন ডেকে বললেন,—এই যে অতঃ, মেয়েটি চালাচ্ছে কেমন?

—খুব ভাল স্যার। চমৎকার ইংরেজী জান। তাছাড়া কাজও বুঝে নিয়েছে চটপট। বুদ্ধিমতী স্যার।

সামান্য সাতদিনের মধ্যেই শেয়ারের কাজটা ধরে নিয়েছে। ক্ষিতীশকে অনেক চেষ্টা করে এক বছরেও ওটা ধরানো যায়নি। আসলে মেয়েটির কাজে খুব মন আছে স্যার। তাছাড়া খাটতেও পারে এবং চায়ও। বাসু সাহেব শুধু বললেন,—একবার দেখা করতে বসো তো আমার সঙ্গে।

এরপর প্রায়ই ডাক পড়ত স্মিতার বাসু সাহেবের ঘরে। মাঝে মাঝে ক্ষিতীশ প্রায় এক দেড় ঘণ্টা কাটিয়ে। ক্ষিতীশ, রজন, রমেনদের চোখ টাটাত। অহযোগ আসত অতঃর কাছে,—এসব কি হ'চ্ছে স্যার, এমনটা হ'লে তাদের আর কাজ করা চলবে না ইত্যাদি। অতঃ সব চুপ করে শুনত। বলত না বিশেষ কিছুই। মাঝে মাঝে বলত নিজের কাজ নিজে করে যান, অতঃর কাছে মাথা গলাবেন না। তা ছাড়া সেটা ঠিকও হবে না। যা দিনকাল পড়েছে, নিজেদের চাকরী বাঁচিয়ে চলতে হবে তো।

সেদিনও এমনি আলোচনাই হচ্ছিল একটা। স্মিতা বাসু সাহেবের ঘরে গেছে টিফিনের আগে, বেলা তিনটা নাগাদও ফেরেনি। অতঃর টেবলের সামনে বসে টেবল চাপড়ে উদ্বেজিত কণ্ঠে রমেন বলছিল—এম. এ. পাশ, এম. এ. পাশ—হোঃ—। এম. এ. পাশ কি আপনি করেন নি? আপনি তো এম. এ.-তে ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট। এ বিভাগ তো আপনিই চালাচ্ছিলেন এতদিন। এ বিভাগকে ভাগ করে তার একটার চার্জ দেয়া হবে ওঁকে!—কেন? কি অন্তে শুনি? বাসু সাহেবের ঐসব হজুগে জ্বলম্বল চলবে না বলে দিচ্ছি স্যার। আমরা সব ভেসে আসিনি।

রমেনের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অতঃ বলল—কিন্তু আমার কথা আসছে কি করে? এই সেকশনের কাজের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এই সেকশনটাকে ভেঙে যদি ছুটো করা হয়, তবেতো কাজেরই অবিধে হবে অনেক। আর মিস্ বোস সত্যিই একটা সেকশনের ভার নেবার মত যোগ্যতা রাখেন।

দপ্ দপ্ করে জলে ওঠে রমেন,—হ্যাঁ—তাতে রাখবেনই। কারণ উনি যে মেয়েমানুষ। আমাদের

দিয়ে তো আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাহেবদের মনোরঞ্জন হ'তে পারে না। আর—

খামের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মিস্ বোস। কখন যে তিনি ঘরে ঢুকেছেন কেউ লক্ষ্যই করেনি। রমেন যেন অকস্মাৎ একদম নিভে গেল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই একটু কেসে গলা বেড়ে নিয়ে বলল,— আপনিই বলুন না মিস্ বোস—আপনি মেয়েমাহুষ, আপনাকে কেন এত ডাকাডাকি—এত খাটানো। দু'তিন ঘণ্টা সাহেবের ঘরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা তো কম কথা নয়। তা ছাড়া আপনি নতুন, এইত সেদিন এসেছেন। এত ইনফর্মেশন ইত্যাদি আপনি দেবেনই বা কি করে ?

গলা বেয়ে উপচে ওঠা খুঁতুর প্রবাহ এক টোকে চট করে গিলে নিল রমেন। তারপর বলল,—তাই বলছিলাম অতমুহাবুকে—সাহেবের ঘরে পাঠাতে হয় আমাদের পাঠান। আমরা পুরুষ মাহুষ—কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত। আপনি মেয়েমাহুষ—কথায় বলে অবলা—। কথা শেষ করে একটা আঙ্গুরনাদের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল স্মিতার দিকে।

স্মিতা এতক্ষণ ফাইলের গাদাটা হাতে ক'রেই রমেনের কথা শুনছিল। সেগুলি অতমুর টেবলের উপর রেখে বলল—নিশ্চয়ই, কষ্ট আমার হয় খুবই। কিন্তু কি করব বলুন ? ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছি পেটের খান্দায়। কষ্ট বললে মনিব স্তনবে কেন ? তাই কষ্টকে গ্রাহ্য করলে চলে কি ? বলতে বলতে সামনের চেয়ারটাঘ বসে পড়লেন মিস বোস। বসে বললেন রমেনকেই লক্ষ্য করে,—তবু আপনাদের অসংখ্য খজ্বাবাদ। কিন্তু এর যখন অজ্ঞ কোন উপায়ই নেই তখন মুখ বুজে সহ্য করতেই হবে।

রমেন বলল,—না না, কক্ষনো না, এ হ'তে পারে না। আমরা আপত্তি তুলব। ঘোরতর আপত্তি তুলব। বড় সাহেবের কাছে যাব। দরকার হ'লে বিলেতে হেড অফিসে জানাব, নইলে ধর্মঘট করব।

—না। রমেনকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে স্মিতা বলল, ছি ছি—তাতে লোকে কি বলবে বলুন তো ? একটা মেয়ের জ্ঞাত এত ? এতে হয়ত শেষে আমার চাকরীটাই

যাবে। কিছু দরকার নেই। যেমন চলছে চলুক। দেখা যাক কি হয়—ব'লে উঠে গিয়ে নিজের টেবলে কাজে বসলেন মিস বোস। সমস্ত ঘরটা চূপচাপ। শুধু মাথার উপর পাখার আওয়াজ চলছে বোঁ বোঁ ক'রে।

ক'দিন পর।

অফিসের পরে নিউ মার্কেটের দিকে যাচ্ছিল অতমু। হঠাৎ—এই যে মিষ্টার চৌধুরী, বলে সামনে এসে দাঁড়ালেন মিস বোস।

—কোথায় যাচ্ছেন এদিকে ?

—মেট্রোয়।

—ও, ছবি দেখতে। টিকিট করেছেন ? করেন নি তো ? তবে বেশ হয়েছে। আমার দুটো টিকিট কেনা আছে। য়ার জন্তে কিনেছিলাম তিনি যেতে পারলেন না। যাক্ ভালই হোলো—চলুন।

অতমু একবার একটু কিন্তু ভাবল। কদিন থেকেই স্মিতার উপর মনটা বিরূপ ছিল কোন কারণে। কিন্তু তবু স্মিতার সামনে স্মিতার উপর রাগ করা সম্ভব হয় না অতমুর। আসলে, হালে স্মিতার প্রতি ওর কি একটা দুর্বলতা যেন জমাট বাঁধছে। ওর মনে অবশ্য একটা শ্রদ্ধা আছে স্মিতার জন্তে। তার কারণ অনেক। বাসু সাহেবের কাছে যেমন কোরেই হোক অতমুর এতসব প্রশংসা ও করেছে, য়ার জন্তে বাসু সাহেব এবার অতমুর জন্তে পঞ্চাশ টাকা ইন্ক্রিমেন্ট রেকমেন্ড করেছেন। কিন্তু তবুও, অতমু কিন্তু ভাবল স্মিতার প্রস্তাবে।

স্মিতা নাছোড়বান্দা। কিছুতেই ছাড়ানো গেলো না ওকে। যেতেই হোলো সিনেমা। দু'জনে পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখল। সিনেমা শেষ হ'তে স্মিতাই প্রস্তাব করল,—চলুন কফি খাই।

অতমু আপত্তি তুলল—না না, এখন বাড়ী যাই। অনেক রাত হ'য়ে গেল।

স্মিতা হাতঘড়ি দেখে বলল, কোথায় রাত অনেক হোলো। মোটে তো আটটা চল্লিশ। তা ছাড়া বাড়িতে আপনার জন্ত কে অপেক্ষায় আছে শুনি ? আইবুড়ো ছেলে, থাকেন তো চক্রবেড়ের মেসে। অপেক্ষমান তো

একটা চাকর বা একটা ঠাকুর। শরৎচন্দ্রের 'সাবিত্রী'র মত কেউ থাকলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু তা যখন নয়, তখন চলুন কফিই খাওয়া যাক।

কোনো আপত্তি টিকল না। কফি হাউসে অনেক কথা হোলো ছুজনের। অতহু জ্ঞানল সুমিতার কথা,—বডলোকের মেয়ে, ছোট বয়েস থেকেই বোর্ডিং-এ মানুষ। বাবা মা'র কাছে থেকেছে খুব কম। থাকত বেষ্টে। কলকাতা তার কাছে নুতন।

অতহুও তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিল সুমিতাকে : সংসারে আছেন বিধবা মা, বিধবা দিদি আর ছোট ভাই। তাঁরা থাকেন দেশে। কলকাতার মেসে তাকে থাকতে হয় একা। বিয়ে করবার সুযোগ ঘটেনি আজও, ইত্যাদি।

অফিসের গুজব গুজ্বন বেড়েই চলে ক্রমশঃ। রমেন হাজারার দল বেপরোয়া, এর বিহিত চাই।

সেদিন টিফিন রুমে রঞ্জন চৌধুরী এক অতি চিত্তাকর্ষক সংবাদ পরিবেশন করল—মেয়েটা বদ্—বদ্, একেবারে বদ্। শুধু বাসু সাহেবই নয়, আরও অনেকের জুড়ি সাজেন উনি। কাল দেখেছে, ফিরপোর কাছে—এক ধোপহরন্ত বাঙালী সাহেবের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে যাচ্ছিল। রঞ্জনকে দেখে আবার আলাপ করিয়ে দিল—মিষ্টার হীরেন ঘোষ, ডাকনাম ডারমণ্ড ঘোষ। অক্সফোর্ডের এম. এ.। দিল্লীর প্রফেসর। রঞ্জনের পরিচয় দিয়েছিল—কলিগ। রঞ্জন চৌধুরী হাত পা নেড়ে থিয়েটারী ঢঙে চৈচিয়ে বলল,—ইডিয়েট ইডিয়েট, শ্রেফ ইডিয়েট। সন্ধ্যায় মোমাছির সন্ধ্যানে পাপড়ি মেলে খুঁরে বেড়ায় সুমিতা বোস। জাঁদরেল কিছু একটা পেলে আটকে ধরে। এদিকে হারামজাদা বাসুতো হাতের পাঁচ আছেই। ত্রে ব্যবসা মাইরি।

মোহিত টিপ্পনি কাটে,—আবার জাকামী কত! চাকরী গেলে খাব কী? ওদিকে শাড়ি গয়নার বহর কত! তবে ই্যা—চাকরী গেলে মোমাছি ধরার মূলধন ফক্কা। একেবারে বেহুদ বেহুদ মাইরী। ছোা ছোা—টিফিনরুমের গরম চা গলধঃকরণ চলতে থাকে চটকদার এমন সব চাটের সহযোগে।

অতহুর সঙ্গে পথে ঘাটে দেখা হয় সুমিতার। গল্প হয় জু'জনায়ে। জু'জনে বেড়ায়। সে খবরটাও টিফিন-রুমের গুজ্বন বাড়ায়—বেহুদ বেহায়া মেয়ে এমন ভাল ছেলেটার মাথাও খায় বুঝি! 'সুমিতা আর অতহু', এই আলোচনাও টিফিনরুম সর্বগরম মাঝে মাঝে।

একটি সন্ধ্যা :

কার্জন পার্কের এক নির্জন কোণায় ওদের গল্প হচ্ছে। অনেক গল্প। অতহু বলছিল,—অনেকে অনেক কথাই তো বলে, সব কিছুতে—কান দেয়া অবিশিষ্ট ঠিক নয়, সম্ভবও নয়। তবু দৃষ্টিকটু যা তা এড়িয়ে চলাই ভাল।

সুমিতা নিশ্চুপ। একমনে শুনছিল অতহুর কথা, অতহুর দিকে আলগোছা দৃষ্টি মেলে দিয়ে।

একটু পরে ওপাশ দিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে চলে গেল রমেন হাজারা। তারপর রঞ্জন চৌধুরী, মোহিত দে এবং পর পর আরও অনেকে।

অতহু বলল—চল একটু হাঁটা যাক। সুমিতা আর অতহু এগিয়ে চলল ওপাশের রেড রোডের দিকে।

চলতে চলতে হঠাৎ বলল অতহু,—দেখো একটা কথা, বাসু সাহেবের সঙ্গে তোমার এমন মেলামেশা ঠিক খুব ভাল দেখায় না।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, ওদের অফিসের বাইরের আলাপনে 'আপনি' সোধোদন 'তুমি'তে পৌঁছেছে ক'দিন আগে। যাই হোক, অতহুর কথায় কিছুই বলল না সুমিতা। নীরবে চলতে লাগল জু'জনে।

গোল চক্করের কাছে রাস্তা ক্রস করতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল ওরা। সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে বাসু সাহেবের বৃইক। ভ্রাইত করছেন বাসু সাহেব স্বয়ং, গাড়ী থামিয়ে দরজা খুলে দিয়ে আন্তরিক জ্ঞানল সুমিতাকে—এসো।

সুমিতা উঠে গেল গাড়ীতে। গিয়ে বসল বাসু-সাহেবের পাশে। একেবারে বাসু সাহেবের গা' ঘেঁষে। তারপর হাত তুলে বলল অতহুকে—আচ্ছা তা'হলে আসি, চিয়রিও ...।

খুলো উড়িয়ে বাসু সাহেবের বৃইক ছুটে চলল রেড রোড ধরে—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে।

অতহু থ'।

এরপর অতম্বু ক'দিন খুব গম্ভীর। ক'দিন পর
সুমিতাকেও আর দেখা যায় না অফিসে। একদিন এক
পত্র পেল অতম্বু।

সুমিতার পত্র। সুমিতার বিয়ে। সুমিতা নিজেরই
তার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে নিজের হাতের লেখা চিঠিতে।
সঙ্গে ছাপা পত্রও এসেছে একগাদা, সহকর্মীদের জুজ।
অতম্বুর কাছে বিশেষ মিনতি,—যেমন কোরেই হোক
বিয়েতে উপস্থিত থাকা চাই।

বালীগঞ্জ সাকুলার রোডের তাড়াটে বিয়ে বাড়ী।
লোকজন, হৈ চৈ, শাড়ী, গাড়ী, গয়না—আলোর ঝক-
মকি। রমেনদের দল, অতম্বু—সবাই এসেছে। হলঘরে
দামী গরদের পাঞ্জাবী গায়ে বাসু সাহেবও উপস্থিত।
তিনিই যেন সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন।

রমেন আড়ালে দাঁতে দাঁত কাটছে—শালা এটি তো
তোমার ফস্কালো, এবার আর একটির চেষ্টা দেখো।

সত্যেন আশু ঈশারায় ধমকে বলল,—আ রে, চুপ।
কি একেবারে!

এসে গছে। বর

ল।

র

বাসু সাহেব ওদের দেখতে পেয়েই ব্যস্তভাবে উঠে
দাঁড়িয়ে আত্মান জানালেন সাগ্রহে—আরে এসো এসো।
তারপর গদগদ কণ্ঠে বললেন, আমার জামাইকে দেখেছো
তো? কেমন লাগল?

আর একটা ভয়ঙ্কর চমকের চাবুক এসে পড়ল ওদের
চোখে-মুখে। সবাই ধমকে গেল একই সঙ্গে। শুধু
দাঁড়িয়ে রইল—ধোঁয়াটে ঘোলা দৃষ্টি মেলে দিয়ে বাসু
সাহেবের দিকে।

বাসু সাহেব কি ভাবলেন—তারপর হঠাৎ হো হো
করে হেসে ফেলে বলে উঠলেন—ওহো সুমি যে আমার
মেয়ে সে খবরটাই বলা হয়নি তোমাদের। অবিশ্টি
না বলার কারণও কিছু ছিল, তাছাড়া স্বেযোগইবা
কোথায় হোলো। তা সে যাক্ গে যাক্—আমার
জামাই-এর সঙ্গে আলাপ করে যেও কিন্তু—বেশ ভাল
ছেলে—ভাল লাগবে তোমাদের। আর তোমাদের
খাওয়া দাওয়া—ই্যা ই্যা চলো...

নীরবে নমস্কার জানিয়ে সুমিতার হাতে উপহার
গছিয়ে দিল ওরা। সুমিতা আলতোভাবে স্মিত হেসে
গ্রহণ করল উপহার।

বাসু সাহেব ওদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন খাবার
ব্যবস্থার দিকে।

তরুণ সমাজের প্রতি সজ্ঞগুরু

শ্রীতুষার দে (কলেজের তরুণ ছাত্র)

আজ শুধু বাংলার নয়, শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের তরুণ সমাজের দিকে তাকিয়ে এক আতঙ্কিত প্রশ্ন জাগে মনে, 'এ আমরা কোথায় চলেছি? বিদেশের 'বিটল যজ্ঞের' তাণ্ডব উন্মত্ততা, স্বদেশের একান্ত নিষ্ঠার সাথে বিদেশীয় উচ্ছৃঙ্খলতাকে অহুসরণ যখন দেখি, যখন দেখি যে পৃথিবীর তরুণ সমাজ অন্ধের মত এগিয়ে চলেছে একে নিশ্চিন্ত অন্ধকারের দিকে, যখন দেখি যে দয়া, প্রেম, ভালবাসা, শুভেচ্ছা শব্দগুলি পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর এ দেখে যখন বিহ্বল হয়ে পড়ি, হতাশ হয়ে পড়ি, তখন মনে পড়ে এক সত্যদ্রষ্টা ঋষির কথা—'জীবনের আলো'র প্রবর্তক-সজ্ঞগুরু শ্রীমতিলালের কথা। যে প্রদীপে তিনি আজ থেকে অনেকদিন আগে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন কেন জানি মনে হয় একমাত্র সেই প্রদীপই পারে বর্তমানের আর আগামী দিনের তারুণ্যের সমগ্র আধার দূর করতে।

আজকের তরুণসমাজ নিত্য নতুনের সন্ধানে ছুটেছে ঠিকই, কিন্তু তা বহিরঙ্গের নতুনত্ব সাধন। ঝড়ের গতিতে তারা প্রসাধনে আর পরিচ্ছদের অভিনবত্ব সাধন করে চলেছে। কিন্তু বেদের বাণী 'চরৈবেতি' তো এ গতির কথা বলেনি। বহিরঙ্গ নয়, আন্তরিক মানসিকতার অভিনবত্ব সাধনই তো তার লক্ষ্য। চাবিটিকে আজ

আমার দাবীকে আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করেই পূর্ণ করব, এ চাওয়া করুণ মিনতি নয়—দাবী, জীবনের দাবী।"

জীবনের প্রতি এই যে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী আজকের দিনে বাংলার তরুণের তা একান্ত দরকার। আজ বীৰ্য্যবস্তার অভাব, নিষ্ঠার অভাব বাংলার ঘরে ঘরে। তাইতো ভারতের রাজনৈতিক আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন, সীমান্ত সমস্যায় তাইতো ভারত আত্ম জর্জরিত। এ সকল বিপত্তির মূলে কিন্তু ঐ দুর্বলতা। তাই সজ্ঞগুরুজীর নির্দেশ: "জীবনের দুর্বলতা পরিহার কর। ভীর্ণতা অক্ষমতা অস্বীকার কর; যদি বেঁচেই থাকতে হয়, হিমাদ্রির মত বিপুল ভার নিয়ে বিপুল কলেবরে বিদ্যমান থাক।" সত্যিই তাই। সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে বেঁচে থেকে কি লাভ? সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে জয়ের মহিম সঙ্গীত তুলতে হবে। আমরা অমৃতের সম্ভান, পরাজয় আমাদের জীবনে আসবে কেন? ভীম ভৈরব গর্জনে আপন দাবীর মহারব তুলতে হবে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে, তাহলে আমাদের বর্তমানিক জীবনের দাবীকে পাবে না স্বকীয়ত

অমৃত

শশাঙ্ক

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

[“বাঙ্গালী রাজাগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি। তাঁহার বংশ বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত, এবং তিনি গুপ্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এ মতটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন...। শশাঙ্ক প্রথমে একজন মহাসামন্ত মাত্র ছিলেন।... শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তর অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন...। ৬০৬ অব্দের পূর্বেই শশাঙ্ক একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রাজ্যমাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।...আর্যাবর্তে ৬১২ খৃঃ অব্দ অবধি শশাঙ্ক একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন।...তাঁহার রাজ্যের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রসার ও প্রতিপত্তি ছিল। বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।” ‘বাংলার ইতিহাস’—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার]

[পঞ্চগৌড়ের রাজা শশাঙ্ক। বাংলার ইতিহাসে এক অরণীয় অধ্যায়, বরণীয় মহানায়ক। মহাবীর ছিলেন শশাঙ্ক। ঋগু ঋগু রাজ্যগুলিকে একত্র করে এক বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। হর্ষবর্ধন ছিলেন তাঁর মহা শত্রু। তাঁর জীবদ্দশায় গৌড় মাথা নত করেনি। তিনি ছিলেন হিন্দু তাই হিউয়েনসাং-এর গ্রন্থে তাঁর কিছু বিকল্প সমালোচনা পাওয়া যায়। প্রথমে তিনি ছিলেন সামন্ত, এই সামন্ত দশা থেকে হন সম্রাট]

সব রাজার সেরা যিনি তিনি রাজা শশাঙ্ক।

মহাসেনগুপ্তের মহাসামন্ত রাজা শশাঙ্ক। বেরিয়েছেন নগর পরিদর্শনে। মনের বাসনা পূরের শেকল কেটে দেশ স্বাধীন করবেন। গৌড়ের শশাঙ্ক বলতে লোকের বুক ফুলে উঠে। বনের বুনো হাতী ভয় পায়।

মন্তবড় শিবের মন্দির, ঘোড়া থেকে নেমে রাজা এগিয়ে গেলেন। মাথা নীচু করে, পায়ে হেঁটে। পূজা করবেন, বর নেবেন দেবতার কাছে। পূজা দেবেন। পুরোহিত এগিয়ে এসে বলেন—“জয়ন্ত। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক। সকল হোক মনোবাসনা। সসাগরা ধরণীর রাজা হও।” রাজা মাথা পেতে দেবতার আশীষ গ্রহণ করলেন। তারপর এগিয়ে চললেন রাজপ্রাসাদের দিকে। রাত্তার দুই ধারে লোক জয়ধ্বনি করে উঠল।

গুপ্তবংশের রাজা মহাসেনগুপ্ত, তাঁর সামন্ত অনেক, এরই এক মহাসামন্ত শশাঙ্ক। তাঁর রাজ্য আছে, আছে রাজধানী। সৈন্য আছে, আছে শাস্ত্রী। লোক আছে, আছে লস্কর। কিন্তু রাজার প্রাণে শাস্তি নেই। রাণী বলেন—মহারাজ, প্রাণে আপনার অশান্তি। কিন্তু কেন?

হাসলেন রাজা—রাণী, পায়ে শেকল বাঁধা থাকলে শাস্তি পাই কই? যত বড়ই হই না, সামন্ত ছাড়া তো নই। আমি চাই স্বাধীন হতে। স্বাধীন সার্বভৌম গৌড় রাজ্য গড়তে শঙ্কর জানেন পারব কিনা।

—কেন পারবেন না মহারাজ!

—দেখি। জয় শিবশঙ্কু।

তখনো ভালো করে ডাকেনি কাক কোকিল। হাতে ফুলের সাজি, রাণী চলেছেন মন্দিরে। দাসী বলে, রাণী মা, আজ এই ভোরে?

—আজ যে সোমবার। শঙ্করের কাছে প্রার্থনা করবো মহারাজের বাসনা যেন পূরণ হয়।

সামন্তও না, মহাসামন্তও নয়। স্বাধীন সার্বভৌম গৌড়ের দিগ্বিজয়ী বীর রাজা শশাঙ্ক। পাখের বাঁধন তাঁর গেছে ছিঁড়ে। আজ তিনি সত্যিই স্বাধীন। শশাঙ্কর রাজধানীর নাম কর্ণসুবর্ণ। রাজা সভায় বসেন, মন্ত্রী বসেন পাশে, সেনাপতি দাঁড়িয়ে—কোষে বদ্ধ ভালোয়ার।

—মহারাজ! আপনার দিগ্বিজয়ী খ্যাতি দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মহাশত্রু, মৌখিরি রাজ, তাঁকে দমন করা নাহলে..... রাজার কপালে চিন্তার রেখা, তাই তো।

—মহারাজ মৌখিরি রাজ গ্রহবর্ষা থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ষনের কন্যা রাজ্যাত্মিকে বিবাহ করেছেন। আর কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে মিত্রতা করেছেন।

—হঁ। আমারও মনে হয় আমরাও কোনও শক্তির সঙ্গে মিত্রতা করি। আপনি মালবরাজ দেবগুপ্তের কাছে দূত পাঠান।

খট খট খট; তেজী ঘোড়া ছুটে চলেছে। ধুরের ঘায়ে উড়ছে পাথর ধূলা। ছ'পাশে গাছ, রাস্তা পড়ে রইল পিছনে। রাস্তার পথিক চেয়ে দেখলো বকমকে পোবাক, মাথায পাগড়ি, চলেছে রাজার দূত। কোথায়? না, দেবগুপ্তের কাছে। বন্ধুত্বের প্রস্তাব নিয়ে। সাদরে দূতকে গ্রহণ করলেন রাজা দেবগুপ্ত।

যেমন বীর, তেমনি ধীর রাজা শশাঙ্ক। তাঁর চির-শত্রু মোখিরিরাজ। আর তাঁরই পরম আত্মীয় রাজা রাজ্যবর্ধন। পিতার মৃত্যুর পর সবে সিংহাসনে বসেছেন। বসে আছেন রাজসভায় এমন সময় দূত এসে হাজির।

—কি সংবাদ দূত?

—মহারাজ, মহারাজ দেবগুপ্ত কাত্যকুজ জয় করে মহারাজের পরমাত্মীয় গ্রহবর্মাকে নিহত করেছেন।

রাজ্যবর্ধন রাগে, শোকে অধীর হয়ে উঠলেন। ভেরী উঠল বেজে, সৈন্য এল সেজে, দলে দলে পালে পালে।

ওদিকে—, মালবরাজকে সাহায্য করবার জন্ত ছুটে আসছেন গোড়রাজ শশাঙ্ক। প্রবল তাঁর বিক্রম। তাঁর কাঁচা সোনার রঙ, বিশাল বিরাট দেহ, শালগ্রাম বাহ, কালো কেশের রাশি।

দেবগুপ্ত তো কাত্যকুজ জয় করলেন। আর জয় করে শশাঙ্কের জন্ত অপেক্ষা না করেই বিজয়ী সৈন্যদের নিয়ে ছুটে চললেন। একদিকে দেবগুপ্ত, আর অপর দিকে রাজা রাজ্যবর্ধন। শশাঙ্ক তখনো এসে পৌঁছাননি, যুদ্ধ শুরু হল। দেবগুপ্ত পরাজিত হলেন রাজ্যবর্ধনের কাছে। আনন্দে মেতে উঠলো সৈন্যরা। রাজ্যবর্ধন মালবরাজের শিবির লুণ্ঠ করে টাকাকড়ি আর কিছু সৈন্য থানেশ্বরে পাঠিয়ে দিলেন। বাকি সৈন্য নিয়ে তিনি এগুচ্ছেন। এমন সময়—

দূরের আকাশ হয়ে উঠল কালো। ঘোড়ার ধুরের শব্দ হল খট খট খট। দেখা গেল গোড়ের পতাকা, আর আগে আগে আসছেন গোড়রাজ শশাঙ্ক। রাজ্যবর্ধন পড়লেন বিপদে। বেশীর ভাগ সৈন্যই পাঠিয়ে দিয়েছেন থানেশ্বরে, খবর পাঠাবারও উপায় নেই। কি আর উপায়! দুই দল হল সামনাসামনি। রাজ্যবর্ধন কিন্তু হেরে পেলেন। গোড়ের পতাকা উড়ল পত পত করে।

রাজা শশাঙ্ক জয়লাভ করে ফিরে এসে রাজ্যবর্ধনকে রাজসম্মান দিয়ে নিয়ে আসবার জন্ত লোক পাঠালেন। লোক চলল রাজার হুকুম নিয়ে। এদিকে রাজ্যবর্ধন রাজসম্মান পেয়ে রাজধানীতে এলেন, রইলেন মুক্ত অবস্থায়। গ্রহরীরা ভাবল তাই তো, একি, বন্দী ছিল যে, এখন ছাড়া পেল সে! একি মন্ত্র না ষড়যন্ত্র? ভাবল একজন—যদি একে ধরা যায় হয়তো ভালো পুরস্কার মিলতে পারে। রাজা রাজ্যবর্ধন ঘুরছেন নির্ভয়ে, এমন সময় গ্রহরী ধরল। চমকে উঠলেন রাজা, কিছুক্ষণ হল ধস্তাধস্তি, তারপর হঠাৎ উত্তেজিত গ্রহরী আমূল বসিয়ে দিল তরবারি তাঁর বুকে। আর চোখের সামনে ভেসে উঠল পুরস্কারের অঙ্কটা। শশাঙ্কর কানে কণাটা গেল, লজ্জায় ক্ষোভে হলেন মর্মাহত। হি হি হি, হল একি!

হর্বর্ধন সব শুনলেন, শুনে রেগে আগুন। কি আমার ভাইকে হত্যা! ধ্বংস করে দেব গোড় বাংলা। বললেন সৈন্যদের। হর্বর্ধনের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন যত সব বৌদ্ধ রাজারা। আর এল গতবারের হেরে-যাওয়া কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা। আগের প্রতিশোধ নেবার জন্ত।

একদিকে হর্বের ঐ বিশাল সৈন্য, আর একদিকে বিশাল সেনাদল শশাঙ্কর সৈন্যরা চিৎকার করে উঠল হর হর মহাদেব। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেকে অনেকে অনেক কথা বলেন। তবে শশাঙ্ক যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁকে কেউ হারাতে পারেন নি। মৃত্যুর দিন অবধি ছিলেন মগধের অধীশ্বর। গোড়, মগধ, দণ্ডভূজি, উৎকল ছিল তাঁর অধীন। তাঁর সময়ে বঙ্গরাজ্য কামরূপ, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমভট ও তাম্রলিপি এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল।

শশাঙ্ক হিন্দু হলেও তাঁর রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রসার ছিল। সারা বাংলার এক সাম্রাজ্য প্রথম তিনিই গঠন করেন। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। শশাঙ্কই প্রথম বাঙ্গালী যিনি প্রথম বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, আর গুহুভাবে তাকে শাসন করেন, বাংলাকে ভারতের প্রধানতম রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি তাই আজও বাংলার আদর্শ বীর।

সংহতিরক্ষার সড়পায়

শ্রীগেপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যাতীর্থ

সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরেরও পূর্বের কথা। নিতান্ত একজন সাধারণ ব্যক্তি যখন প্রস্তাব করিলেন যে, সংস্কৃতকেই রাষ্ট্রভাষা করা উচিত, তখন কথাটায় বিশেষ কেহ তেমন একটা সাড়া দেন নাই। কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইলে ভারতের কল্যাণ হইবে, সে বিষয়ে তখন বড় একটা কেউ তেমন মাথাও ঘামান নাই।

তাহার প্রধান কারণ, সকলে তখন স্বাধীনতা পাইতেই আগ্রহান্বিত; স্বাধীনতা পাইলে পর দেশের সংহতিরক্ষার পক্ষে কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত—এ সব বিষয়ে চিন্তা করার তখন অবসরই ছিল না। শুধু একজন মানুষ নিতান্ত এক সাধারণ ভদ্রলোক—অদ্বৈয় শ্রীমুরেশচন্দ্র মজুমদার দাদা মহাশয় “দেবভাষা পরিষৎ” গঠন করিয়া প্রচার কার্য শুরু করিয়াছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার কর্মস্থল ভাগলপুর খাস হিন্দী এলেকা হইলেও, হিন্দীভাষী অসংখ্য ব্যক্তি অসংখ্য বিদ্যান ব্যক্তি তাঁহার এই কল্যাণকর প্রস্তাব তখন সমর্থন করেন। হিন্দীভাষীরা ঐকান্তিক ভাবে সমর্থন না করিলে, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন সহরে উক্ত পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশন বিপুল সমারোহে জুসুম্পন্ন হইতে পারিত না। কাশী, পাটনা, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, ছাপরা, বারহাজ, ভাগলপুর—এ সবই তো হিন্দীওয়ালাদের বেলা। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয়, অসংখ্য হিন্দীভাষী পণ্ডিত অকুণ্ঠকণ্ঠে তখন ঘোষণা করিতেন—হিন্দী নিতান্ত অপুষ্টি ভাষা, একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই ভারতের মর্যাদা রাখিতে পারে। প্রবর্তক সন্তোষকর শ্রীমতিলাল এই দেবভাষা পরিষদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং এক সময়ে সভাপতিও হইয়াছিলেন। চন্দননগর প্রবর্তক সন্তোষ পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন আহ্বান করিয়া বাংলায় ইহার প্রচার ও প্রসার লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দেশের সামগ্রিক কল্যাণচিন্তা করিয়াই তখন বক্তারা সংস্কৃতের পক্ষে অকাটা যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত করিতেন। কোন রাজনৈতিক দুর্বুদ্ধি এখনকার মত মতিবিস্রম করিত না। আকুমারী হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভারত-

ভূমির সংহতিরক্ষার সড়পায় হিসাবেই তখন তাঁহার প্রস্তাব চিত্তে সংস্কৃতের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। অল্পে পরে কা কথা, স্বর্গত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন রাষ্ট্রপতি হন নাই, তখন তো নানা ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতই যে ভারতের Lingua Franca রূপে আন্তঃপ্রাদেশিক সংহতি রক্ষা পূর্বেও করিয়াছে—এবং এখনও করিতে পারে, এই কথাই বলিয়াছেন :

“It was Sanskrit that provided a common medium of expression and also literary effort. While regional languages in various stages of development were spoken in various regions, Sanskrit truly provided the *lingua franca*, it enjoyed the status of what we might call the *national language of India*, for many centuries. In spite of the vast distances which separate one region from the other, and the great variety of people and languages, Sanskrit produced one unifying force.”

Italicগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বেকটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী ভাষণ হইতে উদ্ধৃত হইল।

(১২. ১১. ৫৫)

তারপর কি হইতে যে কি হইয়া গেল, আমরা সকলেই তাহা লক্ষ্য করিতেছি। ক্ষুদ্র আঞ্চলিক স্বার্থ এই সব All India Leaderদের দৃষ্টিভঙ্গীর কি শোচনীয় পরিবর্তনই না টানিয়া আনিল! হিন্দীওয়ালারা হিন্দী একরকম জোর করিয়াই চালাইতে বন্ধপরিকর হইয়া উঠিল, অমনি দাক্ষিণাত্যও সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়া উঠিল—প্রলয়কাণ্ড বাধাইল।

যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংস্কৃতকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনিই আবার Casting vote দিয়া হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দিলেন! ঠিক তেমনি আবার যে রাজাজী একদিন হিন্দীর পক্ষে ছিলেন, তিনিই এখন হিন্দীর ঘোর শত্রু হইয়াছেন। বরং ইংরাজী বরাবর থাক, তবু হিন্দী কিছুতেই মানিব না—মাল্লাজবাসীর এই জিদের মূলেও রহিয়াছেন ঐ প্রখ্যাত বর্ষায়ান্ নেতা রাজাগোপালাচারী।

অদৃষ্টের পরিহাস! কি হইতে কি হইয়া গেল।

হিন্দীর মাধ্যমে দেশের সংহতিশক্তি দৃঢ় হইবে বাহারা মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। ইংরাজীকে আরও কিছুদিন সহকারী ভাষারূপে রাখিয়া হিন্দীকেই মানাইয়া লইবার যে একটা চেষ্টা হইতেছে, ইহাও স্বাধী সমাধান বলা যায় না। কারণ, অহিন্দী রাজ্যগুলি কতদিনে হিন্দীপ্রেমী হইয়া উঠিবে, কেহই তাহা বলিতে পারে না। ততদিন ইংরাজী ভাষা থাকি বাহারা বলিতেছেন তাঁহাদের কাছে অপূর্ণিত ক্রীকৈলাসনাথ কাটজু মহাশয়ের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি সম্পূর্ণভাবে বলিয়াছেন, দেড়শত বৎসর শাসন স্বত্বও ইংরাজী ভাষা সহরের মধ্যেই আজও সীমাবদ্ধ। দেশের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে ইংরাজী-জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ২ জনও নয়। চাকুরি প্রভৃতি ক্ষেত্রেই ইংরাজীর প্রচলন। জনসাধারণের ইহার কোন যোগাযোগ নাই।

তাছাড়া সব চাইতে বড় কথা হইতেছে, ইংরাজী শিখিয়া অহিন্দীভাষীকে যে পরীক্ষা দিতে হইবে হিন্দী-ভাষী মাতৃভাষার দৌলতেই তাহা দিতে পারিবে। একজন মাতৃভাষায় যে রূপ দক্ষতা দেখাইতে পারিবে, ইংরাজী ভালমত শিখিয়াও কি তাহার সহিত পাল্লা দেওয়া যায়? ইহাতে তো আমাদের সংবিধানে যে প্রত্যেকটি নাগরিককেই সমান অযোগ্য দিবার কথা, তাহার ব্যতিক্রম হইয়া যাইতেছে। হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা, তাহারাই তো জন্মগত একটা অযোগ্য পাইয়াই যাইতেছে। এই সব বুঝিয়াই না মালদ্বীপ প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। একই দেশের একদল লোক—তা সংখ্যায় যতই হউক না কেন,—অল্প সময় লোক অপেক্ষা বেশী অযোগ্য পাইবে কেন? এ কথার উত্তর নাই,—হিন্দীওয়ালারা কোন সম্ভাষণক উত্তর দিতে পারিবেন না।

দুঃখের বিষয়, নিত্যন্ত ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রলোভনে হিন্দীর পক্ষপাতী নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় সংহতির মূল শিথিল হইতেছে দেখিয়াও অজ্ঞায় জিদু পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলিয়াই লইয়াছেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা যখন প্রায় তেরো কোটি, তখন হিন্দীই

হইল সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাষা—অতএব ইহারই রাষ্ট্রভাষা হইবার পূর্ণ অধিকার, অহিন্দীভাষীদেরও যথাসম্ভব হিন্দী শিখিয়া লইতে হইবে। কিন্তু যে ভারতে ১৪টি আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে, সেখানে মাত্র হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষা করা হইবে কেন এবং অজ্ঞাত ভাষাভাষীদের বা হিন্দী শিখিয়া লইতে বাধ্য করা হইবে কেন—ইহার কোন সম্ভাষণক উত্তর নাই।

হিন্দীওয়ালারা গোড়া হইতে এই যুক্তি দেখাইতেছেন যে, যেহেতু আন্তঃরাজ্য মধ্যে একটি যোগসূত্ররক্ষণী ভাষা থাকা উচিত এবং হিন্দীভাষা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাষা, তখন মাত্র হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে। এ যুক্তি কিন্তু আদৌ গণতন্ত্রসম্মত নহে। বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ—এই প্রদেশগুলিকে হিন্দীভাষী ধরিয়া লইয়া হিন্দীভাষীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেভাবে দেখানো হইয়াছে, তাহা বাস্তব নহে। ঐ কয়টি প্রদেশের কথাভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। বর্তমানে সংস্কৃত হইতে শব্দচয়ন করিয়া যে নূতন হিন্দীভাষা গঠিত করিয়া উহাকেই রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা, সে ভাষা কিন্তু পূর্বোক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে একটিরও সহিত সমান নহে। হিন্দী এলেকা বলিয়া যে বিশাল ভূখণ্ড দেখানো হইতেছে, সেখানে মৈথিলী, ভোজপুরী, আউরী, ব্রজবুলী, রাজস্থানী, বিলাসপুরী প্রভৃতি অসংখ্য অপভ্রংশ ভাষা প্রচলিত। এই সমস্ত ভাষাকে দাবাইয়া দিয়া যে নূতন হিন্দী খাড়া করা হইয়াছে পণ্ডিত নেহেরু তাহাকে ‘উঁচু দরজে কী হিন্দী’ বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছেন এবং চলিত ভাষায় উহাকে নামাইয়া আনিতে পরামর্শও দিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরামর্শ মানিতে গেলে হিন্দী এলেকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমিয়া যাইবার আশঙ্কায় উদযোগীরা বর্তমান খড়ী বোলী হিন্দীকেই আদর্শরূপে খাড়া করিয়াছেন। হিন্দী ভাষা এইরূপ নবভাবে রূপান্তরিত হইয়া উঠুক—ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ঐ ভাষাটিকে সমগ্র দেশ-বাসীকে শিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইবে কেন? যে সকল প্রদেশে হিন্দীর অপভ্রংশ ভাষা প্রচলিত, তাহারাই হয়তো এই নবগঠিত ভাষাকে তাহাদের সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, করিলে বরং তাহাদের উপকারই

হইবে, কিন্তু বাংলা, তামিল বা মারাঠীর মত ভাষা যখন ঐ হিন্দীভাষা হইতেও সমৃদ্ধ, তখন ঐ সব ভাষা-ভাষীকে হিন্দী শিখিতে বলা কি ঘোরতর অবিচার নহে? এবং এইজন্যই না মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছে? বেশ দেখা গেল, হিন্দী উত্তর দক্ষিণের যোগসূত্র স্বরূপ হওয়া তো দূরের কথা, বরং স্রবণাভীত কাল হইতে একমাত্র সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে উত্তর দক্ষিণে পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে যে সংস্কৃতি ও ভাবগত ঐক্য অক্ষুণ্ণ ছিল, হিন্দীর পৌষারতুমির ফলে তাহার মূলও দারুণ চোট লাগিতেছে।

অ-হিন্দীভাষীদের বিক্ষোভ দূব করিবার মারাত্মক প্রয়োজন উদ্ভূত হওয়ায়, ইংরাজী ভাষাকেও আপাতত সহায়ক ভাষাকূপে বজায় রাখিতে হিন্দী পক্ষীয়দলকে সম্মত করিবার জন্য একদল মধ্যস্থ যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও কতকটা ধামাচাপা দেওয়া ব্যবস্থাই বলিতে হইবে। কারণ, ইংরাজী একে বিদেশী ভাষা, তত্পরি কোন রাজ্যেরই মাতৃভাষার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই—প্রত্যেকেই কঠোর কষ্ট করিয়া এই ভাষা শিখিতে হয়। আজ পর্য্যন্ত এ দেশের ছাত্রগণকে এই ইংরাজী শিখিতে যে সময়, শক্তি ও অর্থব্যয় করিতে হয়, বাকী সমস্ত বিষয় শিখিতেও বোধ হয় তাহা হয় না। রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যেভাবে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়, আমাদের দেশেও তাহার নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। কিন্তু মাতৃভাষায় ক'খ লিখিতে না শিখিতেই যেভাবে A. B. C. D. পড়ানো শুরু হয় তাহাতে সমগ্র জাতিরই ক্ষতি হয়। ইংরাজী বজায় থাকিলে ভবিষ্যতে এ ক্ষতি কোনদিনই বন্ধ হইবে না।

তা'ছাড়া ইংরাজীকে যদি চিরস্থায়ী রাখাও যায়, তাহা হইলেই বা কি এমন ভাল ব্যবস্থা হইল? হিন্দী-ভাষীরা মাতৃভাষার সাহায্যে চিরদিন যে স্বেযোগ পাইবে, ইংরাজী শিখিতে বাধ্য হইলে অন্তেরা তাহা পাইবে না, হিন্দী শিখিতে বাধ্য হইলেও তাহাদের দুর্ভোগ থাকিলাই যাইবে।

এই সমস্ত সমস্তার সব দিক দিয়া একমাত্র সমাধান

হইল—সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা। এই ভাষা কাহারও কথ্যভাষা নয় বলিয়া কোন আঞ্চলিক ভাষা-ভাষীর ক্ষোভের কারণ নাই। ইংরাজী থাকিতে যেমন সর্বপ্রদেশেরই স্বেযোগ দুর্ভোগ সমান ছিল, সংস্কৃত হইলেও ঠিক তাহাই হইবে। অধিকন্তু ইংরাজী অপেক্ষা সংস্কৃত শিক্ষা হইবে ঢের সহজ। কারণ, ইহার অধিকাংশ শব্দই মাতৃভাষায় গৃহীত।

পাঁচশত বৎসরের মোগল পাঠান ও দেড়শত বৎসরের ইংরাজ আমলের অবদমন ও অবহেলা সত্ত্বেও সংস্কৃত আজও তাহার অক্ষুণ্ণ প্রাণশক্তিবলেই সগৌরবে টিকিয়া আছে। পৃথিবীর বরণ্য বিদ্বানেরা সংস্কৃতের গৌরব কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সংস্কৃত অবশু-পাঠ্য থাকায় ইহার যে কত বড় মর্যাদা তাহা বেশী বলার প্রয়োজন হয় না। বহু বিদেশী মনীষী এমন কথাই বলিয়াছেন যে, সংস্কৃতের মত ভাষা থাকিতে ভারতে রাষ্ট্রভাষা লইয়া প্রশ্নের অবসর কোথায়?

সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষে সবচাইতে বড় যুক্তি হইল—সংস্কৃতি রক্ষার গুরুত্ব। পূর্বেই বলিয়াছি—আজ পর্য্যন্ত কি দৈবকৃত্যে, আর কি ইহলৌকিক কৃত্যে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সংস্কৃতেরই প্রবল প্রাধিক্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এ কথা পণ্ডিত নেহেরুকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণের সময় নেহেরুকে বলিতে হইয়াছিল—এই শোষিত-সর্বস্ব ভারতবর্ষে আজ আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে কি পাইয়াছি, তবে নিশ্চয়ই বলিব তাহা হইল এই মহতী সংস্কৃতভাষা—ইহাই আমাদের পক্ষে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত একসূত্রে গ্রথিত রাখিয়াছে। “If I am asked what is the heritage that we are going to inherit, I would boldly say, it is the great Sanskrit language that binds us together from the Himalayas to the Cape Comorin.”

দূরদর্শী নেহেরুর প্রতি যাঁহাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদের উচিত এই ভাবগত ঐক্যবিধায়িনী সংস্কৃত ভাষাই যাহাতে রাষ্ট্রভাষা হয় তৎপক্ষে আন্তরিক চেষ্টা করা।

নিউ দিল্লীর নেপথ্যে

অমিয়া সেন

এই সেদিনের কথা। ভারতময় অসাধু ব্যবসায়ী ধরা পড়ছে, গুদামে গুদামে সরকারী শিলমোহর পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, দেখা গেল রাম-রাজ্জ্বের কেন্দ্রস্থি দিল্লীতে তেমন পায়র একজনও নেই।

ষ্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে দেশময় এই হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা সমীক্ষা বের করা হল (১৭ই নভেম্বরের '৬৯) কাগজে। আটটি-প্রদেশের গভর্ণর, মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর লিখিত মতামত বেরল তাতে। মূল্য বৃদ্ধির কারণ বহুবিধ থাকলেও এতে দেখা গেল একটা বিষয়ে প্রায় সকলেই এক মত যে, ব্যবসায়ী এবং সম্পন্ন উৎপাদকদের অসাধুতা ও hoarding tender-ই এর প্রধান কারণ। কেরালার গভর্ণর বললেন—“However the sudden spirit in prices in recent months is largely due to the non-cooperative attitude of the trading community who have increased prices in many cases without proper justification.” পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মতে—“Slow arrival certainly means that stocks were held back somewhere. The real culprits are the large producers and wholesale dealers.”

মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর মতও অমূরূপ। তিনি প্রথমেই বলেছেন—“The main factor is the profit motive...” আসামের অর্থমন্ত্রী মিষ্টার ফকরুদ্দীন আমেদও এ সম্বন্ধে এই একই মত পোষণ করেন—“There was a hold-up somewhere, causing foodgrains to arrive late in the market.”

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীরও এ সম্বন্ধে ঐ একই মত। বাহল্য ভয়ে আর উদ্ধত করিলাম না।

এসব কি রাজধানীর আন্দোলনকারীদের চোখে পড়ে নি? পড়েছে নিশ্চয়ই। তবু তাঁদের প্রতিরোধ সংগ্রাম ক্ষুদ্র দোকানদারদের ছেড়ে এই অগ্নিকাণ্ডের মূল হোতা বা তাদের প্রত্নদাতাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হোলো না।

Priceless chance-এ ষ্টেটসম্যান আরো একটা কথা লিখেছে, যদি পলিটিক্যাল পার্টিগুলি এগিয়ে আসত...। কিন্তু এগিয়ে এলেও যে কিছু লাভ হত না সেটা নিশ্চয়। রাজধানী দিল্লী এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার অনেক কুটনীতিজ্ঞের কর্মতৎপরতার সদা চঞ্চল। ভারতীয় বিরোধী পার্টিগুলির বাঘা বাঘা নেতাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র। কিন্তু পলিটিক্যাল শহর এটা নয়। আন্দোলনে পলিটিক্সের ছোঁয়া লাগার সম্ভাবনা মাত্র অফিসিয়ালদের এক বৃহৎ অংশ হয়ত বা সকলেই এ থেকে পশ্চাদপসরণ করতেন। এমনিতেই সব স্তরের লোক যে এতে নেমেছিলেন তা নয়। অফিসিয়ালদের মধ্যে সাউথ ইন্ডিয়ানরা একটি গরিষ্ঠ দল। এসব ঝামেলা থেকে তাঁরা সর্বদা শত হস্ত দূরে থাকেন। দেশবিদেশের নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও এটি আঙ্গকাল পাঠস্থান। তবু ইন্টেলেক্চুয়েল শহরও এটা নয়। আড়ালে থেকে সার্চ লাইট ফেলে আন্দোলনের পথ নির্দেশ করবেন বা নাগরিকদের মনটিকে তৈরি করে কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবেন তেমন ইন্টেলেক্চুয়াল বা রাজনীতিজ্ঞ কেউ এর মধ্যে নাক গলাননি (আছেন কিনা জানি না)।

বাকী রইল সরকারী সমর্থন।

এ এক মজার জিনিষ।

এবারের মূল্যবৃদ্ধিটা কোন আঞ্চলিক ব্যাপার নয়। যেভাবে হঠাৎ ভারতময় বাজার চড়ে গেল, সেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্বরূপে হিটলারের পোলাও আক্রমণ মনে করিয়ে দেয়। কলকাতায় খবর পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে বারো ঘণ্টার মধ্যে এক একটা জিনিষের দাম আধ পয়সা (তখনো আধ পয়সা চালু ছিল বাজারে) থেকে এক আনায় চড়ে গিয়েছিল।

ছ’ বছর আগে চৈনিক আক্রমণকে মূলধন করে ব্যবসায়ীরা একবার স্কোপ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জনমতের স্বার্থ দেখেই হোক বা অন্য কোন কারণে হোক শেষ পর্যন্ত সেটা আর সফল হয়নি।

পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনার দোহাইও এ প্রসঙ্গে অবাস্তব। কারণ ধীরগতিতে মূল্য বৃদ্ধি এটা নয়। পরিকল্পনার ধাক্কা এর অনেক আগে থেকেই বাজারের উপর এসে পড়েছে। জনসাধারণও ইতিমধ্যে তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এ যা হল একে আকস্মিক বজ্রাঘাতের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা চলে। তবু দিল্লীতে ঢেউটা এসেছে সবার পরে।

আন্দোলনে অনভ্যস্ত রাজধানী তাইতে ভেবেছিল, যেখানে যা হয় হোক, আমার ঘরের বাটি ঠিকই থাকবে। কিন্তু তা যখন থাকল না, লোকের মতিগতি দেখে কর্তারা একটু শঙ্কিত হলেন। হাজার হলেও দিল্লী হলো সারা ভারতের কী-বোর্ড। এখান থেকে বোতাম টিপেই সারা দেশের অরগ্যান ঠিক রাখতে হয়। তা ছাড়া পৃথিবীর নানান দেশের অনেক মানুসগণ্য ব্যক্তির এখানে বারো মাস উপস্থিত নানান কর্ণে। কেবল ত সতের বছরের স্বাধীনতা নয়, এর আভিজাত্য বহু শতাব্দীর। যুদ্ধ-বিগ্রহ অবশ্য অনেক হলেও এখানে, তবে সে যুদ্ধও রাজায় রাজায় যুদ্ধ। তার মর্যাদাই আলাদা।

এখন যদি তুচ্ছ দানাপানি নিয়ে এ হেন রাজধানীতে রাজায় প্রজায় একটা লড়াই জমে ওঠে, সেটা হবে ভারী লজ্জাজনক। সবচেয়ে আগে আসবে ইংরেজরা। কী দিল্লী কী হলো।

গভর্নমেন্ট তাড়াতাড়ি পুরানো দিল্লীর কয়েকটা গুদামে হানা দিলেন। চাবী লাগালেন, আবার খুলেও দিলেন। কিনা, হিসেব ঠিক আছে।

কিন্তু এই সরকারী রিপোর্টের শাস্তিঞ্জলেও হুমানের লেজের আঙুন নিভল না। বাদরটা লাফিয়ে বেড়াতে লাগলো রাজধানীর বাজারময়। পুড়তে লাগলো নাগরিকদের সাধের স্বর্ণলকা। কাছায় কোঁচায় টান পড়লো মর্যাস্তিকভাবে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় সরকার যখন ভাবছেন, কী করা যায়, পথ দেখালেন জনপথের কফি বিদ্রোহীরা। পার্লামেন্টের সামনে ভীড় করে স্লোগান নয়, গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ নয়, এমন কি প্রিয় ভাতাবুদ্ধির দাবীতেও হৈ চৈ হাঙ্গামা কিছু নয়, শ্রেফ দোকানদারী।

মনে মনে নিশ্চয়ই শাস্ত্রী-কেবিনেট টেচিয়ে উঠেছিল ইউরেকা ইউরেকা বলে।

এ বছরেরই গোড়ার দিকে হঠাৎ যখন বাসের ভাড়া অনেকখানি বেড়ে গেল, তখন রাজধানীর উপকণ্ঠে ক্রুদ্ধ জনতা খানখুই বাস পুড়িয়েছিল। পার্লামেন্টে একে কোন রসিক সদস্য Calcutta method বলে উল্লেখ করেছিলেন।

এবারেও হয়ত কেম্বের ভয় ছিল, খাদ্যের ব্যাপারে আবার এখানে সেই কলকাতার দমদম দাণ্ডয়াই এসে না পৌঁছায়। তা যখন হলো না, তাঁরা খুশী হলেন। খুশী হয়ে নাগরিকদের আরো consumer's shop খুলে বাজার দর আয়ত্তে রাখার উপদেশ দিলেন। জানালেন, আমরা আছি তোমাদের পেছনে। মাইভঃ! এগিয়ে চল, নাগরিকদের বিদ্রোহোন্মুখ মনটাকে এভাবে দোকানদারীর দিকে ঠেলে দিয়ে তাঁরা ঘরে গেলেন গ্রীনরুম লালাজীদের মেক-আপে সহায়তা করার জন্ত।

দিল্লী কর্পোরেশনের কংগ্রেস দলপতি শ্রীযুক্তমোহন-জীকে দেখা গেল নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে। ফুটপাথে বসে দাঁড়ি-পাল্লা ধরে নিজে আলু বিক্রী করলেন। ৭৫ পয়সা কে. জি.। বাজারে যার দর এক টাকা। ষ্টেটসম্যানে ছবি উঠলো। কয়েকদিন তাঁর ভ্রাম্যমাণ আলুর দোকান ঘুরলো রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে। নাগরিকদের প্রেরণা জাগিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন রঙ্গমঞ্চ থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ডের ছাতার মত consumer-দের সব্জীর দোকান গজিয়ে উঠলো রাজধানীর প্রায় সর্বত্র। তবে ব্যাণ্ডের ছাতার চেয়েও এগুলি স্বল্পজীবী। বন্ধ হবার কারণ বহুবিধ। প্রধান কারণ অব্যবস্থা। যে ছ'চারটি বেশীদিন টিকলো মুনাকাবাজীতে তারা প্রফেশনাল দোকানদার ও ভ্রাম্যমাণ সজীওয়ালাদেরও ছাড়িয়ে পেল।

দেয়ালীর সময় সরকারের তরফ থেকে জোর প্রচার কার্য চালানো হয়েছিল, মিষ্টি বয়কট করার জন্ত। দোকানদাররা স্বপ্ন হোক। দেয়ালী এদিকের সবচেয়ে বড়ো পর্ব। আর এ পর্বের মিষ্টিই প্রাণ। সরকার বললেন, নিজেদের মিষ্টি নিজেরা বানাও। চিনির জন্ত ভাবনা নেই।

যদিও সরকারী উদারতা থেকে দোকানদাররাও বঞ্চিত হলো না। যার যতখানি দরকার চিনি পেল ছ' দলই। ফলে মিষ্টি বানানোর প্রতিযোগিতা তীব্রতর হলো—ক্রেতা-সমবায় ভাণ্ডার ও প্রফেশনাল দোকানদারদের মধ্যে। এর মধ্যে অল্পপূর্ণা ও সরকারী ক্যান্টিনগুলি যোগ দিল নাগরিকদের পক্ষে। তবু শেষ পর্যন্ত জিৎ হলো প্রফেশনাল দোকানদারদেরই। সমবায় ভাণ্ডার, অল্পপূর্ণা ও সরকারী ক্যান্টিনের মিষ্টির দাম বাঁধা ছিল, দোকানদারদের সে বালাই ছিল না। ওরা রামরাজস্বের স্বযোগ নিল পূর্ণ মাত্রায়। দেওয়ালীর দিন রাত দশটার মধ্যে মিষ্টির পাহাড় শেষ করে পকেটে, না, তরা সিন্দুকে হাত দিয়ে ওরা প্রমাণ করলো, রাজধানীতে 'ছাত নট' নেই এবং ওদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে দেশে এমন শক্তি আজ কারোও নেই।

অল্পদিকে অল্পপূর্ণা ফেল পড়লো। আন্দোলনকারীদের সমবায়গুলি বিশৃঙ্খলা, চুরি বাটপাড়ির রেকর্ড সৃষ্টি করলো।

দুধের ব্যাপারে নাগরিকদের গোয়ালাদের সঙ্গে মারামারিই সার হয়েছে। লাভ কিছু হয়নি। ওদের সম্মুখিত্তি এবং অর্থবল P. R. R. M-এর সম্মিলিত শক্তিকে তুড়ি মেরে নশ্তাং করে দিয়েছে। যে কফি দিয়ে এর সুর, সেখানেও এই একই ব্যাপার। আরম্ভে এদের নীতি ছিল No profit no loss. কিন্তু যে মুহূর্তে জিনিষটা সাময়িকতার স্তর পেরিয়ে স্থায়ীত্বের দিকে মোড় নিল, সেই মুহূর্তে ফাটল ধরল নীতিগত আদর্শে। আত্মকলহে কমিটি ভেঙ্গে ছ' টুকরো। যে দলটি শেষ পর্যন্ত বারান্দা দখল করে বসে রইল সরকার তাদের স্থায়ী ডেরা দিয়ে সরিয়ে দিল অল্পদ্র। অর্থাৎ জনপথের প্রতিষ্ঠিত কফি হাউসকে রক্ষা করলেন টলোমলো অবস্থা থেকে। ওদের অবাধ লুণ্ঠনের পথ নিরঙ্কুশ করা হলো।

আন্দোলন যদি জনগণের আন্দোলন না হয়, তবে তার হাল এমনি হওয়াই স্বাভাবিক। দিল্লীর আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ইংরেজ শাসকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের

প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের মত কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের সম্মুখে প্রদ্রিয়ে। ছ' দলই চেয়েছিলো এটাকে স্ব স্বার্থে প্রয়োগ করতে। এরকম স্বার্থহুই বুদ্ধি কখনো কোন মহৎ উদ্দেশ্যের পথে নিয়ে যেতে পারে না।

নাগরিকদের ব্যক্তিগত উত্তমকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এম্প্লয়ীদের জন্ত গভর্নমেন্ট কো-অপারেটিভ ষ্টোরও খুলেছেন, কিন্তু খোলা বাজার ছেড়ে দিয়েছেন ব্যাপারী দোকানীদের সম্পূর্ণ স্বচ্ছা-নিয়ন্ত্রণে। একটা নমুনা দিই—

সরকারী ষ্টোরে যে ডালের দাম এক টাকা পর্য্যাপ্ত পয়সা, পাশের প্রাইভেট দোকানে তাই দেড়টাকা। গম সরকারী ষ্টোরে ২৪।২৫ মণ। প্রাইভেট দোকানে ৩২।৩৩। সব পাশাপাশি চলছে।

সরকারী ষ্টোরের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তাও দশ টাকা দিবে মেস্বারশিপ না নিলে সব জিনিষ পাওয়া যায় না এবং সে মেস্বারশিপ নেওয়ার অধিকারও মাত্র কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের। সুতরাং রাজধানীর ব্যাপারীরা নিশ্চিন্ত। দিল্লী এখন জনগণ-সমৃদ্ধ। বে-সরকারী জনতার ভবনদী পারাপারের তাঁরাই একমাত্র কাণ্ডারী। তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে। সরকারী ষ্টোরের অনেক খাজদ্রব্য দামে কিঞ্চিৎ সস্তা হলেও, খাদ্য হিসাবে অখাদ্য।

মূল্য গতিরোধ আন্দোলনকারীরা শ্রাম ও কুল উভয়-দিক বজায় রেখে আলগোছে নিজেদের মুদ্রা-সঙ্কটের কিছুটা সুরাহা করতে চেয়েছিলেন এই উপলক্ষ্যে। কাজেই দিল্লীর PRRM (Price Rise Resistance Movement) শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে আশ্রয় নিল কাগজে-কলমে আর কর্মস্বানীদের মিটিং মোলাকাতে।

এমনিভাবে যুক্ত্য হল একটি মহৎ সম্ভাবনার। ধুকতে ধুকতে রাজধানী আবার ফিরে গেল তার চিরচরিত ঐতিহ্যে।

রবীন্দ্রনাথের 'কাদম্বিনী মরিষা প্রমাণ করিল যে, সে মরে নাই।' তেমনি দিল্লীর খাদ্য আন্দোলন জন্মমাত্র মৃত্যুবরণ করে প্রমাণ করল যে এখানে আন্দোলন হয় না।

ভারতের দারিদ্র্য

শ্রীরাধাবল্লভ দে

পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী দেশসমূহের তুলনায় ভারতবর্ষ একটি দরিদ্রতম দেশ। ভারতের অধিকাংশ লোক উপযুক্ত আহার, পরিচ্ছদ, আবাসস্থান পায় না। রোগে চিকিৎসা করাবার এবং সন্তানদেব যথাযোগ্য শিক্ষা দিবার ভাগ্য খুব কম লোকেরই আছে। দেশের শতকরা ৭০ জন লোক অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত দারিদ্র্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা টাকা নোটের সঙ্গেই অবিকল্পভাবে জড়িত। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তি বিশেষ কি জাতি বিশেষ কেহই একমাত্র টাকা বা নোটের আধিক্য দ্বারা ধনী অথবা উহার অভাবে দরিদ্র হয় না। যদি তাহাই হইত দরিদ্র দেশের গবর্ণমেন্ট তাহাদের মুদ্রায়ন্ত্রের দ্বারা কোটি কোটি টাকা নোট বাহির করিয়া একদিনে দেশের লোককে ধনী করিয়া দিতে পারিতেন। দেশে টাকা বা নোটের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তদনুপাতে যদি দেশের জনসাধারণের দ্বারা উৎপাদিত ও লোকের প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রীর পরিমাণও বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে লোকের হাতে টাকা ও নোটের পরিমাণের বৃদ্ধি দ্বারা তাহাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। ইহার কারণ জিনিস পত্রের মূল্যও টাকা ও নোট বৃদ্ধির অনুপাতে সঙ্গে সঙ্গে চড়িয়া যায়। স্মরণ্য টাকা বা নোট ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের স্বচ্ছলতা বা দারিদ্র্যের মাপকাঠি নয়। জীবনযাত্রার

প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের সক্ষমতা বা অক্ষমতাই যথার্থ মাপকাঠি।

ভারতবাসীর দারিদ্র্যের প্রধান কারণ তাহারা ভারতবর্ষের মুখ্য উৎপাদনগুলিকে গৌণ উৎপাদনে পরিণত করিয়া তাহাদের মূল্য বাড়াইতে পারে না। জমির ফসল, বনজঙ্গলের কাঠ, খনির লৌহ ইত্যাদি ভারতের মুখ্য উৎপাদন। এই উৎপাদনগুলি যখন কল-কারখানাতে শিল্পদ্রব্যে পরিণত হয় তখনই তাহারা গৌণ উৎপাদন পর্যায়ে পৌঁছয়। ভারতবর্ষ প্রচুর তুলা এবং পাট বিদেশে রপ্তানি করে, অবার বহুগুণ দাম বেশী দিয়া এই কৃষিজাত জিনিসগুলিকে শিল্পজাত দ্রব্যরূপে খরিদ করে। প্রচুর খনিজ লৌহ বিদেশে প্রেরণ ক'রে আবার বহুগুণ দাম বেশী দিয়া লৌহ নির্মিত কলকক্সা প্রভৃতি শিল্পজাত বিদেশী দ্রব্যরূপে খরিদ করে। কৃষিজাত তামাক প্রেরণ ক'রে শিল্পজাত সিগারেট খরিদ করে। অর্থাৎ একই পরিমাণে শিল্পজাত জিনিসের বদলে উহার বহুগুণ কৃষিজাত বা খনিজদ্রব্য বিদেশে পাঠাইতে হয়। ভারতে যে পরিমাণে জিনিসপত্র উৎপাদনের ক্ষেত্র ও সুযোগ রহিয়াছে, ভারত যেদিন পূর্ণভাবে এ সম্পদকে কাজে লাগাইতে পারিবে এবং বিদেশীর শোষণ বন্ধ করিতে পারিবে সেই-দিনই ভারতে দারিদ্র্য ঘুটিবে অর্থাৎ যেদিন উৎপাদনের বৃদ্ধি শিল্পের সমৃদ্ধি আর শোষণের নিবৃত্তি হবে।

বোধন

শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বপন জড়িত নয়নে আমার
এ কী অপূর্ব ছন্দে
আসন পাতিয়া বসিয়াছ তুমি
নিভৃতে পরমানন্দে।

পবিত্র এই বোধন সঙ্কায়
খুপ-দীপ জ্বালা মধু গন্ধায়
নিত্যকালের সাধনার তুমি
হাসিছ মধুর গন্ধে।

নাহি আয়োজন দীক্ষা-মন্ত্র
নাহিক পুজারী, নাহিক তন্ত্র,
প্রাণের কামনা পূর্ণ করুক
একক চাওয়ার মন্ত্রে।

শত সহস্র নাম আছে তব
তাহা দিয়া আমি কী বুঝিয়া লব,
মানবী কি দেবী বুঝি না কখনো
কিবা প্রয়োজন স্বন্দে।

গুধু মনে হয় হৃদয়ে তোমার
লীন হয়ে আমি ছিহু একাকার,
প্রকাশ করিয়া এনেছ ধরায়
তোমার স্বজনানন্দে।

শোধ-বোধ

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বসাধিকারী

॥ এক ॥

মাধব চন্দননগরী ফরাসীর প্রজা। বড় ভাই অল্পবয়সে মারা যাওয়াতে বাপের আত্মরে গোপাল। গোপাল ননী খায়, মাখন খায়, আবার পথে-বাটে আঁচল টানাটানি করে তাদেরও যারা সে জানে পরনারী। কুমারী বা ওই জাতীয়দের ত' কথাই নাই।

বাপ ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখে-শুনে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে ব'সে ভাবে। যেটা গেছে সেতো গেছেই, আর এটা গেরস্ত ঘরের কুম্ভাও হ'বে আমাকে মেচমার করবার যোগাড়। কি করি ?

বাপ সাতে নেই, পাঁচে নেই কারও। নিখাদ ভদ্রলোক। তার স্বভাব-মাধুর্য্যে সাহেব-সুবোধের মধ্যে যারা তার সংস্পর্শে এসেছে, তারা সকলেই তার ওপর সদয়। এই সদয়তার ফলে ফরাসী মদের কারবারে স্বেযোগ তারা করে দেয়।

সে কারবারে মাধবকে বাপ সাহায্যকারীরূপে মোতায়েন করে। কলিকাতা ও অস্ত্রান্ত স্থান থেকে চন্দননগরে আসে কত লোক মদ গিলতে বা তা' যোগাড় করে নিয়ে যেতে। মাধবের অস্ত্র কোনও গুণ না থাকলেও ফরাসীদের আবহাওয়ায় কথায় চি'ড়ে ভেজার কায়দায় সে বেশ রপ্ত হয়েছিল। লোভী মদ্যপদের মাইডিয়ার হ'বে পডল মাধব বিনা আয়াসে।

কারবারে বাপের সুনামের স্বেযোগ নিয়ে, বে-আইনী ভাবে পণ্য চালানোর কারচুপি অবাধে সে ঢালাল বেশ কিছুদিন, বাপকে অন্ধকারে রেখে। শেষ বেশ কিন্তু হ'ল না। একটা ব্যাপারে হাতেনাতে ধরা প'ড়ল।

ননী চুরি নয়, মাখন চুরি নয়, চুরি ফরাসী স্বেয়ায়। গরল মোক্ষণ এতে অবশুস্তাবী জেনে, ছেলের ওপর ফরাসী তুডুম-এর কঠোরতার ভয়ে, অতি-সংগোপনে বাপ ছেলেকে পাচার করল কলকাতায়। ফরাসী বন্ধু একঘরের কুপায় কলকাতার এক সওদাগরী আপিসে মাধবের একটা চাকরীও জুটল।

সুপারিশ-পত্র হাতে বড় সাহেবের সঙ্গে প্রথম ভাঁড়ের ভাঁড়ামীকেও হার মানিয়ে তার নিয়োগে সাহেবকে congratulate করল মাধব।

সাহেব খুব খুসি হ'য়ে দূরে দণ্ডায়মান বড়বাবুকে হাসিয়া বলিল, এতদিনে আপিসের সকলের আনন্দের এমন খোরাক দিতে পারলাম, তজ্জন্ত তোমাদেরও আমাকে congratulate করা উচিত।

॥ দুই ॥

বনবিহারী আপিসের আর এক ধূধর। পিডারশিপ্ পরীক্ষায় সাত-সাতবার কেল হয়ে আপিসে আসে সে মুখ বদলাতে। সাহেব এক আঁচড়ে তার জ্ঞান-সাগরের গভীরতা মেপে চাকরীতে তাকে বহাল করে। সাহেব লক্ষ্য করে—তাকে কাজ দেওয়া ভুল হয়নি। আপিসে এসে নিত্যই খাড়া থাকে সে সাহেবদের সেলাম দিতে। নেটাই তার প্রধান কাজ হয় আপিসে।

বনবিহারী দেখল, মাধব তাকে টপকে যাচ্ছে, ভাঁড়ামীর বহরে। সট্টেপট্টে একদিন সে পাকড়াও করল তাকে। গভীর জলের মাছ তুমি চাঁদ, মন্তলব কি ? বনবিহারীর এবস্থিৎ সন্তাষণ শুনেই মাধব তার চোখে চোখ মিলিয়ে হেসে বলে, চেপে যাও ব্রাদার, রতনেই রতন চেনে। আজ থেকে তুমি আমার জ্যেষ্ঠ, হলধর। ছোট ভাই-এর আবদার হলচালনা করে গোদন রক্ষা কর তুমি কংসারির হাত থেকে। ভায়ের ওপর দাদার দাবি দিন দিন তাতে বাড়বেই।

এক কাজ করা যাক দাদা। হু'ভায়ের আস্তানা পাশাপাশি গড়াই ভাল। বিনা বাক্যব্যয়ে সেই বন্দোবস্তই হ'ল। আপিসে হু'জনের জ্যেষ্ঠ চাক্ষুয কারো কারো না হ'লেও অন্তঃসলিলা ফল্গপ্রবাহ চ'লতে লাগল হু'জনের মধ্যে মনে প্রাণে। আপিসের বাহিরে-হু'জনের গুজুগুজুনি ফিস্‌ফিসিনি কি !

বড়বাবু খুঁজে পান না কি কাজ এই যুগল রত্নকে পাকাতাবে তিনি দেবেন। নিত্যনুতন তাদের কাজ।

আপিসে চরকী দিয়ে একে ডাকা, ওকে ডাকা, তাকে ডাকা। মানে বড়বাবুর দৌলতে আপিসের সকলের সঙ্গেই 'সখ্যতা' তাদের হ'ল। মাধবের ওপর ক্যাশিয়ারের অহুগ্রহের সীমা নেই। তাঁর পান সিগারেট আনা থেকে তাঁর বাড়িতে এটা-ওটা-সেটা ব'য়ে নিয়ে যাওয়া—মুখ বুজে সে করে। ক্যাশিয়ারের টেবিলের ধারে মাধব হামেহাল হাজির, হজুরের ফরমাস তামিল করবার জ্ঞান।

কদিন দেখা গেল, মাধবের শুকনো মুখ, চেহারা উস্কোখুস্কো। সবাই বলে মাধব হ'ল কি তোমার? এমন চেহারা?

মাধব কৈদে ফেলবার উপক্রম। কি যে হয়েছে। মরে মরে আপিসে আসি। আসতে আর পারি না। আপিসের সাহেবদেরও নজরে পড়ে মাধবের শুকনো চেহারা। বড় সাহেব মাধবের পিঠ চাপড়ে বলে, "ঘাবড়াও মত, জন্দি সব ঠিক হো যাগা।" মাধব কৈদে বলে, "আপকো দুয়া হজুর।"

মাধব ক'দিনের ছুটি চাহিল। ছুটি মজুর হইল।

॥ তিন ॥

ছুটি পাইয়াও মাধব দু'একদিন আপিসে আসিল। শেষদিনে সে আপিসে আসিয়া শুইয়া পড়িল। বড় সাহেবের বন্দোবস্তে তাহাকে বাসাঘ পাঠান হইল বনবিহারীর সাহায্যে।

পরদিন আপিস টাইমে ক্যাশিয়ার আসিয়াই দেখিল, প্রায় দশ হাজার টাকা তহরুপ হইয়াছে, দেখ দেখ। পুলিশ মোতায়েন হইল। তল্লাসী চলিতে লাগিল।

ওদিকে খবর আসিল, মাধবের অবস্থা সঙ্গীন। এমন কেহ নাই যে তাহার মুখে এক কোঁটা জল দেয়। এ সংবাদে বড় সাহেব কাতর হইল। আহা-হা লোকটা ইভিট্রি কিস্ত খুব ফানি (funny)। আপিসের খরচায় তাঁর চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত হইল।

পুলিশের সম্মেহ মাধবের উপর। সে কথা যথাস্থানে জানান হইলে বড় সাহেব বলিল, না না, নিরীহ গোবেচার।

এক ঝাঁচড়ে খতম হইল পুলিশ-তৎপরতা।

আর এক গোবেচারী বনবিহারীর মাধ্যমে বড় সাহেব মাধবের খবরাখবর পায়।

দিন যায়, মাস যায়। মাস আড়াই পরে মাধব কাঁপিতে কাঁপিতে বড় সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত। কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

বড় সাহেব বলিল, তোমার শরীর ত' এখন দেখছি ভালই। কাজ কর, খেটে খেতে হবে ত'!

মাধব—হজুর মা বাপ। হজুর হুকুম করলে প্রাণান্ত করেও কাজ করব। শরীর বাইরে চাকচিক্য, ভেতরে কৌপরা—

সাহেব—তাই ত'! কি ক'রে খাবে?

মাধব—ওইত' জালা। কি যে করি! ভাবছিলাম, আপিসের ছিট-ছাট অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ যদি পাই—

সাহেব—পারবে মাল যোগাতে?

মাধব—হজুর দোয়া করলে...

সাহেব—আচ্ছা আচ্ছা, পাবে ও কাজ।

॥ চার ॥

ক'দিন বাদে বনবিহারী মুখ শুকনো করে মাধুর কাছে উপস্থিত। মাধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কি হয়েছে দাদা, কোনও অপরাধ হয়েছে?

না না ভাই, বড় ভাই-এর মান রেখে আসছ বরাবর। দাদার পুজো ক'রে তবে তুমি প্রসাদ পাও। এ স্মৃতি তোমার অক্ষর হ'ক। খবর কি জান, সাহেব যে চ'লল—

মাধু—এঁ্যা, বনবিহারী—ভাবনার কথা। ত'জনের নিছতে আলাপ আলোচনা হ'তে লাগল।

পরদিন মাধু কৈদে গড়িষে প'ডল সাহেবের সম্মুখে। হজুর হজুর, একি শুনি মম্বরার মুখে; হজুর হবেন বনবাসী! আমরা কেউ থকব না।

সাহেব বাংলা বোঝেন, কিন্তু 'মম্বরা' বুঝেন না। ব'ললেন কি ব'লছ, 'মম্বরার মুখে'! যাব আমি ইংলণ্ড মাদারল্যাণ্ড ডিকে। বুঝতে পারছ?

মাধব—মা বাপ ছেলে ফেলে যাবে, বুঝব কি মাথা-মুণ্ড—পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব হজুর। মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে এই পুরস্কার।

সাহেব—পুরস্কার! পুরস্কার নিশ্চয় পাবে। মাহিনা যা ছিল তোমার, সেই হিসাবে এক বছরের টাকা একসঙ্গে পাবে তুমি।

মাধব—চুলোয় থাক্ টাকা, হজুরকে হারিয়ে টাকা—সবাই ব'লছে, সময় হয়েছে যাবার—কিসের সময়, যেতে আমরা দেবো না।

সাহেব—আচ্ছা আচ্ছা, পাগলা বেটারা সাপ্লাই-এর কাজে—

মাধব—কোনওরকমে শাক-ভাত জুটছে। একটা দোকান করতে পারলে হয় ত' কিছু হয়। তা' ঘর কোথা পাব।

সাহেব—দোকান করবে? ঘর চাই—বড়বাবুকে হমি ব'লবে—ঠিক্ হোবে। খুদী—Congratulate করবে না হামাকে—

হজুর মা বাপ—হজুর পেরেন্ট (Parent) ব'লে,—মাধবের আবার হাহতাশ।

॥ পাঁচ ॥

মাধুর দোকান খোলা হ'ল। মাল যোগাড় হ'ল ছ'ভায়ের পরামর্শে।

খদ্দের যোগাড়ের ফিকিরই হ'ল সমস্তার বিষয়। আপিসের লোকজন খুবই জানা। বহু বলা কওয়াতেও তারা ভিড়তে বড় চাইল না।

একদিন একজন পশ্চিমা এসে উপস্থিত। এসেই বাহবা দিলে দোকানের। সাহস দিলে ছুদিনে দোকান কেঁপে যাবে—তরিখা ঠিক্ ঠিক্ মত হলে। 'তরিখা' বাতলেও দিলে। 'সাইতে' বেশী-বেশী মাল আমদানীর বন্দোবস্ত হ'ল। মাল চালানোরও মজ্ঞ-তজ্ঞ শিক্ষা দেওয়া হ'ল। গোল বাধালে বনবিহারী।

মেথো এবার মরবি। ধুয়ে পুঁছে যাবে সব রে মেথো, ধুয়ে পুঁছে যাবে সব। দেখছিস না মাল যা আনবার কথা তা না এসে কি আসছে, আর যা পুঠাবার কথা কি যাচ্ছে, খদ্দের আগাম টাকা দিয়ে!...কর তোর যা খুদী—আমি এতে নেই।

সে কি দাদা! ককিয়ে বলে মাধব। লেনদেন-এ গোল কিছু নেই।

বনবিহারী রেগে বলে, গোল নেই, চৌকো আছে। মহাজনেরা সবই ওই পশ্চিমার তাঁবেদার। ওঁরা মালের আদত আড়ভদার। তাকে মাঝে রেখে সে সব হরদম কাটাচ্ছে। তোর খদ্দের, হেজিপেঁজি নয় কেউ। বিশ্বাসে তারা সে সব মাল জাহাজ-জাত করছে। বাজার ছাড়া দরে তাদের মাল খরিদ। তার আসল রূপ ঘরা প'ড়লে—কি হবে তোর আর তোর দোকানের বুঝতে পারছিস? যথাসর্বস্ব খুইয়ে শ্রীঘর।

মাধব—দাদা, বাঁচা, বাঁচা! কি উপায় ব'লে দে।

বনবিহারী—এবারের আমদানী না ছুঁবে জানিয়ে দে পশ্চিমাকে দোকান তুই রাখবি নি। অর্ডার যা দোকানের নামে আছে, স্বচ্ছন্দে সে সবের যোগান সে দিতে পারে। দোকানঘরের মালিকের সব পাওনা মিটিয়ে দিয়ে লিখিত ভাবে জানিয়ে দে যে, 'আজ থেকে ঘর ছেড়ে দেওয়া হ'ল, তার দখল নেন যেন তিনি।

মাধব বর্ণে বর্ণে দাদার অমুজ্জা পালন ক'রলে। দাদা যা বলেছিল ঘটতে বিলম্ব হ'ল না। রেজিষ্টারী তাগিদ-পত্রাদি আনতে লাগল দোকানের ঠিকানায়। কাকতালু পরিবেদনা দোকান কোথায়! দোকানদারই বা কোথায়! পশ্চিমাও গা-ঢাকা দিয়াছে।

দোকানের ঠিকানায় উপস্থিত হ'ল একদিন রুক্ষিণী। চন্দননগরের লীলারদিগ্গী সে। সঙ্গে তার আধাধেড়ে একটা ছেলে। ফরাসী মূলকের ফরাসীলীলার নায়কের তল্লাসে রুক্ষিণীর আসা। এসে দেখে শূন্য গোয়াল। খোঁয়াড়ে খোঁয়াড়ে ঘুরবে সে কত!

না ঘুরে গেল সে যেখানে মাধু কর্ম ক'রত সেই আপিসে। মাধবের নাম করতেই আর যায় কোথা। সবাই তাকে পেয়ে বসল। কে সে? মাধবকে সে খোঁজে কেন? সঙ্গে ছেলেটা কে? রুক্ষিণী কাঁপরে প'ড়ল। কি বলে! শেষে গুছিয়ে ব'লল, তার ঠিকানাটী আপাততঃ চাই।

বনবিহারী আড়ালে আড়ালে থেকে সব কথা শুনে উচ্চবাক্যটিও করলে না। বেগোছ বুঝে রুক্ষিণী চ'লে গেল আপিস থেকে। বনবিহারী তার পিছু নিলে।

কথাবার্তা হ'ল হুজনে অনেকক্ষণ। তারপরে দেখা
গেল রুস্তগী বনবিহারীর পিছু নিয়েছে।

॥ ছয় ॥

এর পরের ঘটনা, মাধবের বাসায় রুস্তগীর চড়াও
হওয়া। মাধব হৈকে বলে তোকে পুলিশে দেবো।
রুস্তগীর গর্জন, কে কাকে পুলিশে দেয় দেখিয়ে দিচ্ছি।
দেখছিস্ এই নখরী নোট। এই নোট আর তোর এই
চিঠি নিয়ে চল্লুম আপিসে—

মাধবের কালো মুখ হ'ল সাদা রুস্তগীর গর্জনে।
ঘরের দরজা তেজিবে খস্তাখস্তি সুর হ'লো হুজনে
নোটখানার ওপর লক্ষ্য রেখে। হাত ছাড়িয়ে রুস্তগী
ঘর থেকে বেরোবার উপক্রম, বনবিহারী রুস্তগীকে ঘরের
মধ্যে ঠেলে দিয়ে, চোখ পাকিয়ে মাধবকে বললে রক্ষা
কর। ও মোটা নোটখানার কথা মুকিষেছিস তুই
আমাকেও। ফল দেখছিস তার। বলছি রক্ষা কর,
বাঁচতে চাসত' রক্ষা কর—

মাধব—কি বলছিস তুই?

বনবিহারী—করুকরে হাজার টাকা দিয়ে ওই নোট-
খানা ফিরিয়ে নে।

রুস্তগী—ও রক্ষা মানব না আমি। আমি ওর বিষে
করা, মানতে ওকে হবে। আর ওর এই ছেলেটাকেও
পুলেতে হবে ওকে।

মাধব মাধায় হাত দিবে বসে পড়ল। রুস্তগী হাত
পা নেড়ে বলে, পুরুষ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কাপ।
দে পুলিশে দে—

॥ সাত ॥

মানতে হ'ল মাধবকে রুস্তগীর সর্ষ। রুস্তগী
হরণ হয়েছিল ফরাসী মূলকে, বরণ ক'রে নিতে হ'ল
কলিকাতা সহরে।

বনবিহারীকে কিন্তু মাধব জানিয়ে রাখে দাদার
কর্ম দাদা করেনি এটাত। এর কারণ যাই হ'ক, ছোট
তাই পাকৈ যে প'ড়ল, তাতে দাদারও মাথা হেঁট
হ'ল না কি? দাদা মুখ তুলে আর তাকাতে পারবে
ভায়ের দিকে।

রুস্তগী অঙ্গে বা অঙ্গনে পারিজাত ফোটাবার দিক
দিয়েও মাধব গেল না। তবে রুস্তগীনন্দন ফুটে উঠতে
লাগল যে ভাবে তাতে মাধবের পদপদ্মব দেহি দেহি
যাক্কা করা ভিন্ন গতান্তর রহিল না। রুস্তগী বুঝিয়ে দেয়
বাপ্কা বেটা, ও আমি কি করব, সামাল দিতে হবে
জন্মদাতাকে।

ফরাসী মতলব ফুটে উঠল মাধব হৃদে। বস্তীর
সেরা গুঁচাকে লাগাল পাখণ্ড দমনে। মদ বেচে
মাধবকে হতে হয়েছিল পগার পার। কোকেনুওয়াল
হয়ে ছোঁড়া হ'ল পসার সহ। হালে পানি পেলে না
রুস্তগী, পোলাকে বাঁচাতে।

তাতে হ'ল। রুস্তগীর দংশনভীতিতে মাধব
আঁতকে রইল অহর্নিশি। কখন মারে! কখন মারে!
তার আগেই মারল আপিসের মাল যোগানের হিসাব
নিকাশ। পবীকার ফল বেতল, মাল যোগানের তুলনায়
প্রায় দ্বিগুণ টাকা নিয়েছে মাধব। সে টাকার দাবি
করল আপিসের কর্মকর্তা। মাল যোগান দেওয়া তার
বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

দোকানখাতে রুদ্দিমাল যোগান দেওয়ার অভিযোগে
বিভিন্ন ক্রেতা দাবি করল প্রায় আঠার হাজার টাকা।
তা অনাদায়ে মাধবের নামে সরাসরি ফৌজদারী মামলা
চালাবার ভীতি প্রদর্শন।

বিশবাঁও জলে পড়ল মাধব। দাদা হলধরও গা-
টাকা দিয়েছে। মাধবের দুর্দশা দেখে রুস্তগীর মহা-
আনন্দ। হেসে গড়িয়ে পড়ে সে বললে, আমার মত
মহাপাপিণীও দিনরাত যে হয় এখনও, সেটা দেখে,
বোঝে কে সে। আর তুমি মহাপুরুষ কিনা দিনকে রাত
করবার তোমার মতলব। দেখতে পাচ্ছ তার ফল।

মাধব—থাম্ থাম্। কাটা ঘায়ে হুনের ছিঁটে
দিস্নি। বলতিস একদিন তুই, ভালবাসিস আমাকে।
একটু মনে করে দেখ।

রুস্তগী—ওরে হাড় হাবাতে, সত্যিই ভালবাসতুম।
তুই (হ্যাঁ তুই, তুমি না) তা বুঝি না। ফেলে আমাকে
চম্পট দিলি। তার প্রতিশোধ নিতেই আমার এখানে
আসা। তোর দুর্দশা দেখে কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে—

পুরোন সব কথা ভেবে। দেখ তোকে বাঁচাতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার—

মাধব—বাঁচাবি তুই? কেমন করে বাঁচাবি?

রুক্মিণী—তোমার পুরোন সাহেবের ঠিকানাটা দেতো আমাকে। তারপরে দেখ আমি কি করি।

মাধব হাঁ হ'য়ে চেয়ে রইল রুক্মিণীর দিকে।

॥ আট ॥

এর মাস দুইয়ের মধ্যে চিঠি এলো রুক্মিণীর নামে পুরোন বড় সাহেবের কাছ থেকে। মাধবকে ততদিন রুক্মিণী লোকচক্ষুর আড়াল করে রাখিবেছিল। এরই মধ্যে তার পোলাটা মরে জ্বলে, হাতুড়ি পিটতে পিটতে। বনবিহারী অপিসের কাজে ইস্তফা দিয়ে সরেছিল, রুক্মিণী তাকে গরু খোঁজার মত খুঁজে বার করে এমন শাসায় যে আপিসের ক্যাস ভাঙা প্রভৃতির বেশ কিছু তার নেওয়া অংশ থেকে লক্ষণ ভাইকে উপড় হস্ত করতে হয় মোটা টাকা। সেই টাকা বাবদে মাধবের কারবার সংক্রান্ত গোলমাল ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে রুক্মিণী।

বড় সাহেবের চিঠিটার মর্ম মাধব অনুধাবন করে রুক্মিণীর পায়ে পড়বার উপক্রম। বলে সে কঁাদ কঁাদ হয়ে, রুক্মিণী নাম তাঁর সার্থক হয়েছে। রুক্মিণী হরণে রুক্মিণী করেছিল রথচালন আর আমার রুক্মিণী পত্রচালনায় নিরাপদ করতে এগিয়েছে তার...

রুক্মিণী—কেন জানিস মিন্বে? নিজ হাতে তোমার টুটি টিপে মারবার জ্ঞাত—

মাধব—না না, তা তুই পারবি নি। এ ধারণা আমার হয়েছে ব'লে এই দেশ, তিরিশ হাজার টাকা নগদ ক'রে তোমার হাতে আমি দিলাম। টাকা টাকা ক'রে কি পাপ আমি না করেছি। আঙুল আঙুল টাকা পেয়েও মনে শান্তি আসে নি এক মুহূর্তের জন্ত। টাকা সব তুই নে। যা খুশী তুই কর তা নিয়ে।

হো হো করে হাসে রুক্মিণী। সার্জন পুলিশ নয় আসল পুলিশের ঠেলা বুরছিস!

॥ নয় ॥

পুরোন সাহেবের সুপারিশে আপিস মাধব সম্বন্ধে পাওনা গণ্ডা সব ছেড়ে দিলে। সাহেব লেখেন এর জন্ত

আপিসের লোকসান পূরণ হয় যেন আপিসের মালিক দেয় তাঁর অর্থ থেকে। সেই অর্থ থেকেই মাধবের কারবারের ঋণ মিটমাট যতদূর করা সম্ভব তা করে যেন মিটিয়ে দেওয়া হয়।

রুক্মিণীকে সাহেব লেখে তুমি মাধবের যথার্থই অমুরাগিণী! তাকে আমি প্রশ্রয় দিই কারণ তার মধ্যে লুক্কায়িত সম্ভাব দেখতে আমি পেয়েছিলাম। বাস্তব ক্ষেত্রে পা তার হড়কে যায়। তুমি টেনে তাকে তোলবার চেষ্টা করছ, তোমার সঙ্গে সে অত্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব। তোমার চেষ্টা সার্থক হ'ক। যে কারণেই হ'ক মাধবকেও স্নেহ আমি করতুম, এখনও করি। কিছু তোমাদের সাহায্য হ'তে পারে এ অবস্থায়, সে কারণে কলিকাতার আপিসে নির্দেশ পাঠালুম, এক হাজার টাকা তোমাকে দিতে।

আপিসের মধ্যস্থতায় মাধবের কারবারে গোলমাল মিটে গেল বটে কিন্তু আসল অপরাধী সেই পশ্চিমার ওপর বাকি ঝাঁক পড়ল। দেউলিয়ার নাম লিখিয়ে নিস্তার পাবার চেষ্টা সে ক'রতে লাগল।

মাধবের দেওয়া ও সাহেবের দেওয়া সব টাকা একত্র ক'রে রুক্মিণী তা' মাধবের পায়ের কাছে রেখে সে তাকে প্রণাম ক'রলে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে মাধব ব'ললে, আবার টাকা! না না, রক্ষা কর রুক্মিণী, আমি ওর কিছু চাইনি। আমি চাই শুধু আলোকবস্তিকা হ'য়ে তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

নত হ'য়ে প্রণাম ক'রে রুক্মিণী ব'ললে, তবে চল প্রভু, দু'জনে যাই ব্রন্দাবনে, রাসলীলার যেখানে শেষ নেই। নয়ন মন দিয়ে ব্রন্দাবনের নিত্যলীলা দেখি সেখানে গিয়ে।

যুগলে ব্রন্দাবনে গিয়া দেখে বনবিহারী আগ নিয়ে গিয়ে সেখানে বসে 'রুক্মিণী ভবন' প্রতিষ্ঠা ক'রেছে।

দুজনকে দেখে হেসে বলে বনবিহারী, সাত সাতবার প্রিডারসিপ্ ফেল্ করাকে হারাবে তোমরা।

হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে রুক্মিণী বলে, পারি হারি দেখ না।

অল্পদিনের মধ্যে ব্রন্দাবনে গড়ে তোলে রুক্মিণী

শিক্ষা-ভাবনা

(আলোচনা)

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

শিক্ষাত্রতীদেব অবস্থান ধর্মঘট হয়ে গেল। এই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দেন, তাতে তিনি বেগরকারী বিদ্যালয়কে সরকারী আওতায় আনার কথা তোলেন। আরেকটা কথাও বলেন যে, যেসব বিদ্যালয়ে শতকরা ৫০ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না, সেই সব বিদ্যালয় সরকারী অহুদান থেকে বঞ্চিত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতি বহু শিক্ষাত্রতীকে ভাবিত করে তোলে। ঝাড়গ্রামের শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত এই বিষয়ে ভালোমন্দ দিকগুলি আলোচনা করেছেন এবং সেই আলোচনা-পত্রটি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন বিচার-বিবেচনার জন্ত। দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারা ভাবিত আছেন, তাঁদের পক্ষে অনিলবাবুর বিচার-বিবেচনাগুলি একবার ভেবে দেখা ভাল।

অনিলবাবু বলেছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারী আওতায় আনা গণতন্ত্র-বিরোধী। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রেই শিক্ষার উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দেখা যায়। তাছাড়া সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে একটা বাঁধাধরা গভী আছে,

সেই গভীর মধ্যে কাজ করতে হয় বলে, কোন নতুন ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ নেই। অথচ আমাদের দেশের বর্তমান প্রয়োজন অহুসারে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করতে হলে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ থাকা দরকার। উপরন্তু সরকারী আওতায় আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর গতানুগতিক ব্যবস্থার মধ্যে পড়লে বিদ্যালয়ের শিক্ষামান অবনত হবার আশঙ্কাও আছে। বাঁধাধরা ছকের মধ্যে শিক্ষাত্রতীদের প্রেরণা ও প্রচেষ্টা ব্যাহত হবার সম্ভাবনাও আছে।

শতকরা পঞ্চাশজন পাস করার ব্যাপারে, অনিলবাবু সমস্ত বিদ্যালয়ের একই নিরিখ বৈধে দেবার বিরোধী। বাংলার শহর ও গ্রামের মনোবিকাশের ভিত্তি ও পরিবেশ এক নয়। এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে শতকরা পঞ্চাশজন ছাত্রকে পাস করানো মোটেই সহজ নয় এবং এখনও দীর্ঘকাল লাগবে সেই শিক্ষামানে পৌঁছাতে। তাহলে কি সেই সব ইস্কুল ভুলে দেওয়া হবে? তাহলে গণতন্ত্রে শিক্ষাপ্রসারের যে ব্যাপকতা রূপায়ণের চেষ্টা চলছে তার ভবিষ্যৎ কি?

বলরাম মন্দির। মন্দিরদেবতা ষ্টেতকায় বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে নিয়া লীলা করিতেছেন।

বনবিহারী মন্দির, মন্দির দেবতা দেখে আর ভাবে, কালোবাজারী, চোরামি ক'রতে হয় ত' এমনি ক'রে কর। করে শোধ-বোধ করে দে।

৥ পরিশিষ্ট ৥

রুক্মিণী বারবিলাসিনী নয়, গৃহস্থকন্ডা, মাধবদেব পাণ্ডা ঘর। চোখের নেশায় নায়ক নায়িকা ছুইজনেরই পদস্থলন হয়। বিপাকে পড়িয়া নায়ক পলাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে কিন্তু মর মর হয়। সেই নিদারুণ অবস্থা হইতে উদ্ধার সে পায় নায়িকার সহৃদয়তায়। তখন এবং তখনই শক্তিময়ী নারী-মাহাত্ম্য অহুভব সে করে। নায়কের নবজীবন প্রাপ্তির মূলে থাকে শক্তিময়ী নারী।

বলদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা মাধবের সদাশয় প্রভুর স্মৃতিতে। দরিদ্র অহুগতের প্রতি তাঁহার দয়া মমতা বলদেবের লীলা-মাধুর্যেরই তুল্য ভক্তসমাজে বিবেচিত

হওয়ার কারণে শুভ, শুভ, শুভ বলদেব মূর্তির কল্পনা রুক্মিণীর।

ইহা হইতে রুক্মিণীর আভ্যন্তরিক মনোভাব অহুময়। ভক্ত গৃহস্থ কন্ডার পদস্থলন সত্ত্বেও আভ্যন্তরিক সং মনোবৃত্তি তাহার চিত্ত শুদ্ধতার সহায়ক হয়।

মাধব চরিত্র আধুনিক যুগসম্প্রদায়ে বিয়ল নহে আদৌ। তাহার সৌভাগ্য রুক্মিণীর শক্তিমত্তা তাহার মত পতিতের উদ্ধারে নিয়োজিত হয়। এখানেও রুক্মিণীর মহত্ব দৃশ্যমান। “কোলে রাখিলেও নারী, রেখো সাবধানে। জেনো নারী কভু বশ নাহি মানে”—কবির এ কথা, রুক্মিণী চরিত্র মিথ্যা সপ্রমাণিত করে। ‘কোল’ হইতে নির্ভুরভাবে নিষ্কিপ্ত নারী নির্খ্যাতকের হিতসাধনে নারীমূলভ স্নেহ মমতা দানে আদৌ কপণতা করে নাই। নারীর স্বাভাবিক বৃত্তিই এই। নারীর আকারে পিশাচিনী নিশ্চয়ই পিশাচিনীর ধর্ম পালন করিবে।

এই সম্পর্কে আরেকটা কথাও ভাববার আছে। যে সব পরিবেশে শতকরা পঞ্চাশজন পাস করানোর সুবিধা আছে, সেখানে ইন্সল-কর্তৃপক্ষ অল্পমেধার ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করাবেন না। তখন সেই সব ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা-লাভ করা একটা সমস্যা হয়ে উঠবে, কাছাকাছি অন্য ইন্সল না পেলে, লেখাপড়া বন্ধ হবার সম্ভাবনাই দেখা দেবে। তাহলে আমরা শিক্ষা প্রসারের যে স্বপ্ন দেখছি তা সার্থক হবে কি?

মন্ড মেধার ছাত্রছাত্রীদের মান-উন্নয়নের এক আদর্শ পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। সে ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা। যে ছেলে সব বিষয়ে সপ্তম মানের যোগ্য, অথচ ইংরাজীতে সে পঞ্চম মানের চেয়ে উন্নত নয়, তাকে সেই পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য ব্যক্তিগত শিক্ষাদান। এই পদ্ধতি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক হলে এই ব্যবস্থা চালানো সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য অনেক সময় শিক্ষামান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু ক্লাসের সেকশন বৃদ্ধি ও শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ওঠে না।

অনিলবাবু আর দুটি কথা তুলেছেন। প্রথম কথা ‘প্রত্যেক বিদ্যালয়কে কর্মক্ষেত্রিক করা হোক।’ আমাদের দেশের জনসংখ্যার অসুপাতে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারের মান অনেক নীচে। সাধারণ মানুষ যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক কম ভোগ্যবস্তুতে প্রয়োজন মেটায়, তার দুটি কারণ—প্রথমটি অর্থাতাব, আর দ্বিতীয়টি মূল্যবৃদ্ধি। মূল্যমানকে নীচে নামিয়ে আনতে হলে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বাড়তে হবে। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া সে নির্মাণ কর্ম রুচিসম্মত হতে পারে না। বিদ্যালয়কে সেদিকের শিক্ষাক্ষেত্র করা একান্ত যুগোপযোগী প্রস্তাব। তার ফল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীকালে ছাত্রেরা যৌথ শিল্প উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। উপার্জনের ক্ষেত্র নগরকেত্রিক না হয়ে পল্লীকেত্রিক হবার সম্ভাবনা থাকে, এবং নিম্নবিস্তার মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা কিছুটা কমতেও পারে।

অনিলবাবুর দ্বিতীয় কথা হলো বিদ্যালয় মণ্ডল গঠন।

‘৮ থেকে ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে এক একটি বিদ্যালয় মণ্ডল গঠিত হোক।’ এই মণ্ডলের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করবেন স্থানীয় শিক্ষাবিদদের একটি পরিদর্শক-মণ্ডলী। তাঁরা ঘুরে ঘুরে বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করবেন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যাপারে কিছুটা গবেষণা করারও সুযোগ পাবেন। কোন পরিদর্শক-মণ্ডলীই চিরদিনের একচেটিয়া অধিকার পাবেন না। তিন বছর পরে তাঁদের স্থলে নতুন মণ্ডলী নির্বাচিত হবে। তার ফলে পুরানো মণ্ডলীর গুণাগুণ নতুন মণ্ডলীর কাছে স্পষ্ট ধরা পড়বে।

শিক্ষাবিষয়ক মণ্ডলীর মত আরেকটি মণ্ডলীও থাকবে, সে হিসাবপত্রের ব্যাপারে। ২০টি ইন্সল নিয়ে একজন একাউন্টস অফিসার থাকবেন, তাঁর কাজ হবে কুড়িটি বিদ্যালয়ের হিসাব ঠিকমত রক্ষা করা। এদিক থেকে প্রধান শিক্ষক মশাইকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। তার ফলে তিনি শিক্ষার ব্যাপারে আরও বেশী সময় দিতে পারবেন। ভাছাড়া আরেকটা কথাও আছে, সরকারী সাহায্য সম্পর্কে খরচপত্রের ব্যাপারে এবং শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে প্রাইভেট ইন্সলের সেক্রেটারিদের সম্পর্কে নানা হুঁসিতির কথা কানে আসে, একাউন্টস অফিসার থাকলে সেদিকের কিছুটা সুরাহা হবে। সেক্রেটারী পদের হয়তো তখন আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। অনেক ক্ষেত্রে ইন্সল ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত হয়ে উঠেছে, সেদিকটাও ধরা পড়ে যাবে।

সব শেষে অনিলবাবু শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিতে আপত্তি জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন এইভাবে চাহিদা বৃদ্ধি আত্মনাশের পথ, জাতিকে রক্ষা করতে হলে নতুন মূল্যবোধ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট করানো দরকার। কথাটা ভাল। কিন্তু সমাজের চিন্তাধারা যে পথে চলেছে তার মোড় ফেরানো সময়সাপেক্ষ, সেই অন্তর্বর্তী কালের জন্য যে প্রয়োজন, তা শিক্ষাত্তরী সংস্থান করবেন কেমন করে? এক সময় এদেশে অর্ধাশনে থেকে আদর্শ প্রচার করা চলতো, ছুচার জনের ক্ষেত্রে হয়তো তা সম্ভব ছিল, কিন্তু বহুজনের ক্ষেত্রে তা সম্ভব কি, বিশেষতঃ বর্তমান অর্থায়ন জীবনধারণের যুগে?

দুটি সনেট

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

॥ কবি সাবিত্রী প্রসঙ্গ ॥

বিংশাদিক চতুষ্ঠয় মাস পূর্বে, শেষ দেখা দিয়া,
গড়কল্য গেল চলি', সদালাপ ফুরালো সকলি।
অপূর্ণ রহিল আশা, সঙ্কল্পের ধামে বলাবলি।
যতটুকু রেখে গেল, তুষ্ঠ রবো তাই মোরা নিয়া।
দধির অভাব কতু ঘুচিবে না শুধু তক্র পিয়া।
অস্বহিত দীর্ঘ বপু, বাণীমুষ্টি হেরিব কেবলি।
কালের অসাধ্য হবে শব্দব্রহ্ম যাইতে বিদলি'।—
ক্রান্তদর্শী কবিদের এ-বিশ্বাসে পূর্ণ থাকে হিয়া।

শোক দুঃখ ভুলাইয়া, মহানন্দে রাধিতে সবারে,
কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করি' জীবনেরে করিতে শোভন,
পুণ্যেরে করিতে জঘী, পাপেরে ধিক্কারি' বারে বারে,
কবির অগতে আসে, চিরস্থির তাদের বোঁবন।
মৃত্যু জয় করি' কবি, মৃত্যুজয় হয় অবশেষে ;
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তারা স্বদেশে বিদেশে।

॥ মহাশূন্য-সম্ভরণ ॥

অসীম অনন্ত নভে, লিওনত্ মহাশূন্যবানে,
পঞ্চশত মাইলের ভারশূন্য বাতাসের স্তরে,
সেকেণ্ডে মাইল পঞ্চ দ্রুতবেগে আনন্দে সম্ভরে!—
এ-কথা স্মরিতে মহাবিশ্বের দোলা লাগে প্রাণে!
মহাশূন্য আবিষ্কার! অতঃপর কি হবে কে জানে!
চন্দ্রলোকে যাতায়াত চালু হবে কিছুকাল পরে,
মর্ত্যের মানুষ র'বে ঘর বেঁধে চাঁদের উপরে,
পূর্ণ হবে চন্দ্রলোক ক্রমাগত মহাপূণ্যবানে!

এ-কী লীলা বিজ্ঞানের! অসম্ভব করিল সম্ভব।
মর্ত্য আর চন্দ্র মাঝে এবে বুকি দূরত্ব ঘুচায়!
এখন জীবিতকালে চন্দ্রে যাওয়া একান্ত বাস্তব!
জীবনান্তে পূণ্যবান্ এঘাবৎ যেতেন যথায়!
কারুণিক, কৃপা করি' কবো আরো দীর্ঘায়ু: প্রদান!
লমিয়া আসিব চন্দ্রে মহানন্দে করিয়া প্রস্থান!

বিজ্ঞাপন

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

সামনের দেয়ালটাষ এইমাত্র
একদল ছাত্র
কয়েকটা বিজ্ঞাপন আর কি একটা ইস্তাহার
আজকে আবার
আটকে গিয়ে গেল :
তার পর এলো
কাঠের মই ঘাড়ে করে
সিনেমার বিজ্ঞাপনওলার দল।

তারা দেয়ালটার আকর্ষণ ভরে'—

এঁটে দিয়ে গেল হালফিল চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন :

বোবা দেয়ালটা যেন হঠাৎ এখন

বহু চিত্রকথার লাবণ্যে বল্মলিয়ে উঠলো,—

ভাবনা-প্রজ্ঞাপতির পাখায় যেন অনেক রঙের

সংকেত ফুটলো।

মনে হ'লো দেয়ালটা যেন একটা আড়ম্বরের

ধম্পমে হুগু,—

আর এ শতাব্দীটাই বিজ্ঞাপনের যুগ!

এই বিজ্ঞাপন ছাড়া এ যুগে কে কাকে চিন্বে?

আজ-পরিচিতির বিজ্ঞাপন কে না দিচ্ছে?

এই যে রূপ রস গন্ধে ভরা প্রকৃতি—

সেখানেও বর্ণবিশ্বাসের কি বিবৃতি!—

যেন এক অব্যক্তের বিশ্লেষণ,

সেই বিরাট বিশ্ব-সম্ভার বিজ্ঞাপন!

তেমনি এক আশ্র-প্রকাশের রীতি

বহন করে চলেছে আমাদের পরিচিতি।

আর আমাদের অভিজ্ঞতার চুনী পান্না,

জীবনের হাসি কান্না,

কতনা ভাবনার খেয়ালে—

নিত্য বিজ্ঞপিত হ'চ্ছে সাহিত্যের দেয়ালে।

আমাদের চারদিকেই চলেছে অহুঙ্কণ

বিচিত্র ভাব-চিন্তার উপস্থাপন ;

যেমন আমাদের স্বভাবের,

কখনও বা অভাবের,

রীতি নীতির,

অথবা সংস্কৃতির,

ভাবৈক্যের,

কিংবা মানবিক কার্যের

যে শিল্পকৃতির বিজ্ঞাপন করছি জ্ঞাপন—

তার কোনটাও কি হবে না সত্য পরিচিতির

বিজ্ঞাপন?

সাম্প্রতিক কবিতা প্রসঙ্গে

শ্রীদীপ্তোপল রায়

কবিতাকে আমি অগ্নি বলে ধরেছি। কবিতা—সে অম্লভূতিই হোক অথবা বেদনা, নতুবা আনন্দ, না হয় ভাবাবেগ আর যাই হোক না কেন, কবিতা কল্পনার, কবিতা মননের, কবিতা প্রকাশের। সে সাম্প্রতিক হক অথবা অসাম্প্রতিক, সে আধুনিক হ'ক বা অনাধুনিক।

আমরা সবাই এটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছি যে, এক এক যুগে বা এক এক সময়ের গম্বীকে ঘিরে কবিতার এক একটা ধারা আবর্তিত হয়। কখনও সৌম্য, কখনও অশান্ত, কখনও নির্জীব আর কখনও সজীব।

এই অর্থেই ত কবিতার আধুনিকীকরণ; আধুনিক অর্থে একটা নির্দিষ্ট ধারাকে পরিবর্তনের তুলিকাঙ্গণে যুগোপযোগী করে তোলায় প্রচেষ্টা।

কবিতা মাঝেই কোন একজন, কোন এক মনের প্রকাশ। শিল্পী তার তুলির স্পর্শে ছবি আঁকছে—নিজের অথবা অস্তিত্বের। কবিতায় তাকে প্রকাশ করে তুলছে। অভিজ্ঞতা, কল্পনা, চিন্তা, আদর্শ—এগুলিকে মিলিয়ে তুলছে স্বপ্নে। প্রকাশ—তা আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক যাই হোক না কেন, প্রতি কবিতারই একটা নিজস্ব রূপ আছে—আর তাই কারও সাথে কারও মিল নেই—তা সে বক্তব্য এক হোক বা না হক।

আগেই বলেছি একটা নির্দিষ্ট সময়ের গম্বীকে ঘিরে কবিতার এক একটা ধারা আবর্তিত হয়। তাই ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালের কবিতাকে আমরা যুদ্ধোত্তর যুগের কবিতা থেকে ভিন্ন অর্থে দেখি; এবং আমার মনে হয় বিংশ শতাব্দীর পঞ্চদশক থেকে যে কবিতার আবির্ভাব তা আজও অব্যাহত এবং তার মূল স্রু একভাবেই চলেছে—তা যতই কাব্যিক বা বাস্তব যেন হ'ক না কেন। সাম্প্রতিক কবিতা বলতে সাধারণতঃ মনে হবে এই যুগের কবিতাকেই। কবি বয়সে নবীন বা প্রবীণ যাই হোন না কেন, আমার কাছে কিন্তু তাঁদের কবিতার বিচারমূল্য এক রেখায় দাঁড়িয়ে আছে।

জীবনপ্রেমিকতাই কবিতা। আর হুঁমুঠো শাস্তিতে খেতে পাওয়া ঝুঁকি বিশ্রাম মানেই যেমন জীবন নয়, তেমনি

কবিতা বলতে আমরা শুধু দৈনন্দিন কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়ার ভাষাকেই বুঝব—এও হতে পারে না।

কবিতার আন্তরিকতার অর্থ এই অর্থেই প্রোজ্বল যে, রূপের মধ্যে অরূপের ধ্যান, জ্ঞানলোক থেকে ধ্রুবলোক, অগ্নি থেকে বৃহতের আবির্ভাব। বড় কিছু চিন্তা করা, অম্লভূতির গভীরতা, বিশ্বাসের কঠিন কাঠামো—কবিতার ধর্ম। আর তাই ত অনেকের মতে আধুনিক কবিতা বা সাম্প্রতিক কবিতা সংশয়বাদীতার ক্ষুদ্র গম্বীতে পড়ে মরছে।

মনের আয়না যে সব ছবির প্রতিফলন, রঙে, রূপে যার মুখর প্রতিকৃতি তাদের প্রতিচ্ছুরিত আলোকবিন্দুই তো কবিতা। এই অর্থে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা যদি জ্বলজ্বল করে এবং অনেক পাঠকের মতে তা যদি দুর্বোধ্যতা দোষে দুষ্ট বলে মনেও হয়, তাহলেও বলা চলে সাম্প্রতিক কবিতা স্থিতিশীল নয় বরং আত্ম-আবিষ্কারে, আত্মপ্রকাশে এবং বক্তব্যের ধ্রুতায় তা মুখর গতিশীল। পাঠকপাঠিকার বক্তব্য স্তন্য হবে না এমন কথা নয়, কিন্তু পাঠকপাঠিকার বক্তব্য ছাড়াও যে কবিতার বা কবির নিজস্ব একটা মনের প্রকাশ আছে, দৃষ্টির সজীবতা আছে—এ কথাও ত অস্বীকার করা চলে না।

কবিতার জন্মে যে অম্লভূতি, যে স্থিতিধী মানস, কল্পনার, ভাবনার চিন্তার ঝড়ো হাওয়ার মন এবং সর্বশেষে যে বক্তব্যের ভঙ্গিমা আর উপলব্ধি প্রয়োজন—তা যাদেরই মধ্যে আছে তারা হয়ত নানা মনের, নানা বিচারের বক্তব্য-আকার দিতে পারবেন—কিন্তু তাঁরা কি কখনও ভাবেন না—কবিতা তাদের কি দিল?

ভাবেন বলেই তাদের কাছে এত বক্তব্য, তাদের সামনে কবিতার এত সমস্তা। এত 'ইজম্' এর সৃষ্টিও ত সে কারণেই। প্রতীকধর্মিতা, প্রতিচ্ছবিধর্মবোধ, বাস্তব-মর্মিতা, চিত্তপ্রক্ষেপ ইত্যাদি দিয়েও ত আজকে আমরা এক একটা গোষ্ঠী, এক একজন মানুষ, এক একটা মানসকে আবিষ্কার করছি, চিহ্নিত করছি।

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে সংশয় থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। আর ইদানিং কালের কবিতা যদি সংশয়বাদকে ধরেও থাকে তাহলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বরং আজকের সংশয়বাদ, জড়বাদের মাঝখানেও যখন সত্যিকারের জীবনদর্শন উঁকিঝুঁকি দেওয়ার স্বর নিয়ে আসে তখন কবিতার আসল রূপই প্রকাশ পায়।

বিবর্তনের মাধ্যমে হয়ত বাংলা কবিতা দ্ব্যর্থতা বা এ্যামবিগুইটিধর্মী হয়ে পড়েছে—না পড়ে উঠায় নেই বলেই হয়ত। কারণ সমস্তা-জর্জরিত মনের প্রকাশ—এভাবে ছাড়া অত্ন কি ভাবে হওয়া সম্ভব? তাছাড়া এটাত্ত্রব সত্য যে, সমসাময়িক সাহিত্যে—তা সাহিত্যের যে বিভাগই হোকনা কেন—তাতে সমসাময়িক রাজনীতিক, সামাজিক এবং আনুসঙ্গিক আরও অগ্রান্ত্র সমস্তার প্রতিচ্ছবি আসবেই। সাম্প্রতিক কবিতাও তাই যদি কিছুটা স্বাবরোধ প্রবণতায় দোষহুঁষ্ট হয়ই, তাহলেও বলার কিছু নেই। কারণ এতকিছুর মধ্যেও সাম্প্রতিক কবিতা মনের জানলা খুলে দিয়ে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এই খুসর রঙের মাঝেও কোন সবুজ মাঠকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

আবার সাম্প্রতিক কালের কবিতা পাঠ করে অনেকেই এ মত ছড়িয়ে দিচ্ছেন যে, কবিরা কিছুদিনের জন্তে এক এক গোষ্ঠীভুক্ত হচ্ছেন আবার বদলাচ্ছেন। এ অভিযোগকে অস্বীকার করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার মধ্যে কবির নিজস্ব ধ্যান, স্বকীয়তা, জীবনদর্শন, আত্মোপলব্ধি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই গত বছর তাই অনেক সময় এমন হয় যে, গত বছর যে কবির সুর বাজল পঞ্চমে আজ যদি তার সুর খাদের সর্বশেষ স্তরে এসে প্রতিধ্বনি তুললো। অবশ্য এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এর পরে হয়ত আবার সে সুর বাজবে সপ্তমে। তবু যে রূপ, যে ধ্যান-ধারণা, যে বহু-দর্শিতা কবির নিজস্ব তাকে বাদ দিয়ে চলার মধ্যে হয়ত গতি থাকতে পারে, কিন্তু আন্তরিকতার অভাবে তা নির্জীব হয়ে পড়বে, এ স্বাভাবিক।

বর্তমান পাঠকসমাজ যে সাম্প্রতিক কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা-আলোচনা, যুক্তিতর্কের অবতারণা করছেন

এতে নিরাশ হবার কিছু নেই। বরং আনন্দ-ক্লান্ত এসেছে বলেই আমার বিশ্বাস। এতে আমাদের উপলব্ধি আরও গভীর হবে। দ্ব্যর্থোদ্যতা এবং গোষ্ঠীপরিবর্তনের ধোঁয়া তুলে যারা সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা পড়ব না বলে একপুঁয়েমি করছেন তাঁদের কাছে অহরোধ তাঁরা যেন আর একটু গভীর সহানুভূতির সঙ্গে সাম্প্রতিক কবিতা সম্বন্ধে ভেবে দেখেন।

এটা ঠিক যে, আজকের যুগের কবিদের মধ্যে আমরা যে বেশী মাত্রায় নৈরাশ্যবাদকে লক্ষ্য করছি। আনন্দোচ্ছ্বাসের আর্ট তাদের কাছে মৃত্যু। দেহ-বাদের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী বা একাকীত্বের দীর্ঘশ্বাসে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভাবে কবিতা লেখার মধ্যে হয়তো তাদের জীবনের যোগ নেই। প্রাণোচ্ছলতার আলিঙ্গনের অভাব হয়ত তাদের বেশী মাত্রায় উদ্বেগ সচেতন করে তুলেছে বা হয়ত প্রচারধর্মী মনোভাবে টেনে এনেছে।

এই যুগ হযত ব্যাপক অর্থে কবিতার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। তাই হয়ত অনেক সময় তা স্বচ্ছ নয়। হয়ত অতিকথন দোষে হুঁষ্ট, নতুবা অব্যক্ত কথার ভারে আনত। তবু বাস্তবকে স্বীকার করার মধ্যে যে গভীর আত্মপ্রত্যয়, বলিষ্ঠতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা-নিরাশা-হতাশার যে নিবিড় আনন্দোচ্ছ্বাস বা দীর্ঘশ্বাস তাদের সব কিছু মিলিয়েই সাম্প্রতিক কবিতা সমৃদ্ধ।

সাম্প্রতিক কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাই হয়ত অনেকে সন্দেহশীল; হয়ত সেই কারণেই আজকের কবিতা অনেকের হৃদয় স্পর্শ করতে পারছে না। অনেকে হয়ত হুঁচার দশজন বিদেশী কবির নাম উদ্ধৃত করে বলবেন এদের প্রত্যেক ছায়া পড়েছে আমাদের সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার উপর এবং আমাদের কবিরা বেশ ক্লান্ত-ভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে, ভাবার মাধুর্যে অলঙ্কৃত করে নিজেদের উপহার দিচ্ছেন এবং তাই হয়ত তাদের উদ্বেগ, নৈরাশ্যবাদ, একাকীত্ব, হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করতে পারছে না, বরং কবিতার জগকে ঘোলা করে তুলছে।

এ অভিযোগকেও যেমন অস্বীকার করতে পারি না,



বিশ্ব মানবধর্মের বনিয়াদ :

প্রাকৃত বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক উন্নতির ফলে এই পৃথিবীর পরিধি শুধু সঙ্কুচিত হয় নাই, সকল বাধা, সর্ব রকম অন্তরায় অস্তিত্ব হইয়া সারা বিশ্বের মানুষ যেন একই হাটে ভীড় জমাইয়াছে। বিচিত্র মানুষ আজ মুখোমুখি, গলাগলি। একত্রিত হইয়াছে কিন্তু একান্ত হইতে পারে নাই। দেহগত নৈকট্য অন্তরের মিলন ঘটাইতে পারে নাই, বরং অপরিচয়ের ব্যবধান মানুষকে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে আরও হিংস্র ও বিদ্বেষী করিয়া তুলিয়াছে। এ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রিক, অর্থনীতিক বা ধার্মিক মত ও পথ সামগ্রিকভাবে মানুষের সার্বভৌম সম্মিলনের সূত্র দিতে পারে নাই। ইতিহাসের অল্প পুনরাবর্তনই চলিয়াছে।

প্রশ্ন জাগে, তবে কি মানব-সত্যতার এই সুদীর্ঘ-কালের জয়যাত্রা নিঃসার বাষ্পস্ফীতি মাত্র? কোথাও কি এমন সূত্র, এমন সর্বোদয়ের দর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই যার ভিত্তিতে দেশ-জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষ এক ও একান্ত হইয়া মিলনের মধু আশ্বাদ করিতে পারে?

বর্তমান শতাব্দীর মহাযোগী ঋষি অরবিন্দ ইহার দিপদর্শন দিয়াছেন। নিব্বন্দ্ব কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন : “In Hinduism we find the basis of the future world religion” কেন, তার কারণও তিনি দেখাইয়াছেন : “It is the universal eternal religion which embraces all.” সংস্কারাচ্ছন্ন মনের কাছে শ্রীঅরবিন্দের এই কথা সহজে

গ্রাস হইবার নহে। পৃথিবীর প্রচলিত আর পাঁচটা ধর্মের ধারণা নইয়া অথবা হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত আনুষ্ঠানিক দিক দেখিয়া, ইহা বিচার করিলে বিশ্বাস্তি ঘটাই স্বাভাবিক। সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধির বিচারেই একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্যের সত্যতা ধরা পড়িবে। তখনই প্রতীয়মান হইবে যে, হিন্দু ধর্মের অন্তঃসার সত্য যে হিন্দুত্ব তাহা বিশ্ব-মানবতাবাদের সহিত একার্থবাচক। বস্তুতঃ হিন্দুত্বের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও দর্শন স্বজনবিজ্ঞান-সম্মত। সম্রামী বিবেকানন্দ ইহা উপলব্ধি করিয়াই হিন্দুত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ইহার বি-জ্ঞান মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মত, সারা বিশ্বের মানুষ যদি কখনও ভুলিষাও যায়, তবুও ইহা থাকিবে, পুনরাবিষ্কৃত হইলে ঐ একই সত্য আবার পুনশ্চ দৃষ্ট হইবে। তাই স্বামীজী সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া এবং সকল মত-বাদের অভিজ্ঞতার আলোতে নিঃসংশয় উক্তি করিতে পারিয়াছিলেন যে, হিন্দুত্বের মত এমন মৌলিক, উদার, সার্বভৌম ধারণা আর কোথাও এ পর্যন্ত অবতরণ করেনি। হিন্দুত্বের ভৌমত্ব বৈচিত্র্যকে এক করিয়া নহে—সমাহার করিয়া, সব কিছুকে যথাস্থানে ঠিক যেমন তেমনি বিকাশের সুযোগ দিয়া। হিন্দুত্বের এই ভৌম তত্ত্ব-দর্শনের আধারিক দুর্বলতা ও সংহতির শৈথিল্য লক্ষ্য করিয়াই স্বামীজী বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় সংহতির কথা বলিয়াছিলেন। স্বামীজী মানসচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন, “বর্তমান বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের পূর্ণ ভারত বৈদান্তিক মানস ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে অপরাঙ্কীয় মহিমায় উদ্ভিত হচ্ছে।” এই উক্তির দ্বারা স্বামীজী হিন্দুর দৃঢ়-সম্মিলক সঙ্ঘত্বেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

মানুষে-মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ ও হানাহানির মূলগত

তেমনি যখন চোখের সামনে কোন কবির কবিতাতে “কোনখানে যন্ত্রণার শেষ আছে” দেখতে পাই, তখন মনের কিনারায় একটা আলোড়নকে অনুভব করি। বুঝতে পারি সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা শুধু বেদনার ভারে নিষ্পেষিত নয়, বরং ব্যথা থেকে আলোর সন্ধান করে বেড়াচ্ছে সে। নিরবচ্ছিন্ন স্রব বলে যেমন কিছু নেই,

তেমনি নির্বিকল্প আনন্দ বলেও কিছু থাকতে পারে না। একটা মানুষের সমগ্র জীবনের স্রব ছঃষ, আশা নিরাশা, চাওয়া পাওয়া, উত্থান-পতন, হাসি-কান্নার মতই। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার অন্তরঙ্গ এবং বহিঃরঙ্গ জীবন-স্রোত বহে চলেছে। আর এই স্রবের মাঝখানেই খুঁজে দেখতে হবে তার মূল স্রবকে।

হেতু হইতেছে জগৎ ও জীবনবোধের পার্থক্য। সাধারণতঃ সংহতি দানা বাঁধিয়া উঠে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া। মনোবী এমার্সনের কথা : প্রতিষ্ঠান বস্তুতঃ বিশেষ একটি ব্যক্তিত্বের দীর্ঘায়ত ছায়া ('Institution is the projection of a personality')। এক হিন্দু ছাড়া পৃথিবীতে অতীতে বা বর্তমানে যত ধর্মমত, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচলিত তাহা সবই পুরুষকেন্দ্রিক। স্তবরাং ইহা খণ্ড হইতে বাধ্য। খণ্ডবোধের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ অনিবার্য। খণ্ড পূর্ণ হইতে চাহে অল্প খণ্ড সত্ত্বাকে বিনাশ করিয়া, ধ্বংস করিয়া, তার স্থান অধিকার করিয়া। কিন্তু স্বজন-বিজ্ঞানের অন্তর্গত অভিপ্রাণের ইহা বিরোধী। বৈচিত্র্যই সৃষ্টির স্বরূপ। সব কিছুকে, সকল বিচিত্রকে সমাহার করিতে পারে একমাত্র অপৌরুষেয় তত্ত্ববোধ। দেহগত, এমন কি ভাবগত ঐক্যবাহু বা একাকার করণের প্রয়াস অসম্ভব অবাস্তব বলিয়াই ব্যর্থ হইতে বাধ্য এবং ইহা হইলে সৃষ্টিই মাধুর্যহীন অনাশ্রয় হইয়া পড়িবে। প্রয়োজন মানুষের খণ্ড চেতনার মুক্তি। এবং এই মুক্তি আসিতে পারে একমাত্র অখণ্ড অপৌরুষেয় ভৌম-চেতনায়, তথা বেদাহুগ জ্ঞানে উন্নীত হইবার মধ্যে, অর্থাৎ হিন্দুত্বের স্বীকৃতিতে। হিন্দুত্ব এই ভৌম পরাজ্ঞানের অমুবাদ-বিজ্ঞান। শ্রীঅরবিন্দের কথায় এই হিন্দুত্বই বিশ্ব-মানবধর্মের ভিত্তি।

রাজনৈতিক আবর্তে পড়িয়া হিন্দু নামের সঙ্গে একটা আবিলতা জড়াইয়া গিয়াছে। পরিচ্ছন্ন ধারণার অভাবে হিন্দুত্ব আজ অস্থানসর্বস্ত্র পৌরুষবাদের সমপর্য্যায় গৃহীত। হিন্দু বলিতে কি বুঝায় তাহা যুগধর্মী শ্রীমতিলালের ভাষায়ই বলি : “বেদপ্রবর্তিত জ্ঞান ও কর্মে আত্মসম্পন্ন জাতির একটা নামকরণ করা হইয়াছে। কেননা, জাতি থাকিলেই প্রতিষ্ঠান থাকিবে—সেই প্রতিষ্ঠানকে অভিহিত করার জন্য নামেরও প্রয়োজন থাকিবে। সেই নাম হিন্দু। বেদ যেমন অপৌরুষেয় সার্বজনীন তত্ত্ব, হিন্দু নামটিও তাই। ইহা মানবমাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। বেদপ্রতিষ্ঠ জাতির ভাষা বড় অপূর্ণ।

প্রত্যেক বর্ণটি অন্তরংগের আকৃতি স্বরূপ। প্রতি শব্দের ধাতুগত অর্থ সুনির্দিষ্ট। হিন্দু বলিতে হিন্দু শব্দের উত্তর দুই ধাতু ড প্রত্যয়যোগে নিম্ন, অর্থাৎ হীনতাকে যে ঘণা করে সেই হিন্দু। ভারত নামের চেয়ে হিন্দু নামের তাৎপর্য অধিকতর ব্যাপক ও গভীর। ভারতবাসী অপেক্ষা হিন্দুত্বের মধ্যে বৃহত্তর সম্ভাবনা অধিক রহিয়াছে। হিন্দু তাই বৃহত্তর উপাসক। হিন্দুর বেদান্তের ধর্ম্যে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। অপৌরুষেয় বেদবাদের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুত্ব শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের জাতীয় সংস্কৃতি ও সংহতির মূল ভিত্তি।”

সম্মুখের শ্রীমতিলাল হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার মর্ম্মকথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন : “মানুষ হইবে ধর্ম্মের বিগ্রহ। ধর্ম্ম শুধু শাস্ত্রবাক্য নয়,—আহারে, বিহারে, জীবনের সর্বকাঠামোর মধ্য দিয়া দৈনন্দিন-চৈতন্যেরই প্রকাশ। ধর্ম্ম অভ্যুত্থান দেয়, নিঃশ্রেয়স দেয়। ধর্ম্ম অমুসরণের ফলে দৈনন্দিন, ভূমাকে, বৃহৎক জীবনের সর্ব স্তরে অমুসব করা যায়।” ভারত-সভ্যতার গোড়ার কথাই হইতেছে ভৌম চৈতন্যকে শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ সর্বক্ষেত্রেই বিকশিত করিয়া তুলনা। এজন্য ব্যক্তির অহমিকা বিকাশের অবাধ অধিকার নহে, পরন্তু প্রয়োজন অহমিকার উৎসর্গ। একমাত্র বৃহৎ আদর্শ ও বোধির নিকট ব্যষ্টি-সমষ্টির আত্মনিবেদনেই পারস্পরিক বিরোধের বীজ অপসারিত হইতে পারে। হিন্দু সভ্যতার গোড়ার কথাই হইতেছে এই সার্বভৌম বেদবিধির আহুত্যা—কোন ব্যক্তির মতবাদে নহে।

স্থপতিত সংস্কৃতিপ্রাণ অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এই বিশ্ববন্দিত হিন্দুসভ্যতার একটি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন : “উর্দ্ধমূল অধঃশাখ অর্থ—সুপ্রাচীন অথচ অবিনশ্বর—জ্ঞানার্ণবে বিশাল বনস্পতি—দিকে দিকে অসংখ্য শাখা ও বুড়ি—এখনও প্রাণরসে উচ্ছল—ইহাই হিন্দুসভ্যতা। কালের প্রবাহে, নানা জাতি, নানা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইহা সাক্ষী। স্বরণাতীত-কাল হইতে ভারতে সাধুসন্ত, নরপতি ও দেবমানব পরম্পরার প্রয়ত্তে রোপিত হইয়া বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে। নানা জাতি, নানা ভাষা ইহার অববয়ব—সর্ব সময়ে গঠিত এ হেন অপূর্ণ জাতি-পুরুষের অন্তরে

নিখিলের সংস্পর্শে যে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিচ্ছবি জাগে—
হিন্দু সংস্কৃতি তাহারই বিগ্রহ। পূর্ণ বিকশিত জাতীয়
জীবনের সকল উপকরণে ইহা সমৃদ্ধ—পুণ্যতম বেদ,
বিপুল ধর্মশাস্ত্র, বিচিত্র সাহিত্যসম্ভার, মৌলিক ও
প্রায়োগিক বিজ্ঞান, সূক্ষ্মতম শিল্পকলা, নানা দার্শনিক
সম্প্রদায়, অসংহত সমাজ বিস্তার, বিবিধ ধর্ম্যাহুঠান—
সমগ্র মানবজাতির ইহা চিরন্তন সম্পৎ, শাশ্বত
প্রেরণার উৎস।”

॥ ভারত রাষ্ট্র ও ভারতের হিন্দু ॥

বিশ্বমানবতার ভিত্তি এই হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির
ধারক ও বাহক যে মানবগোষ্ঠী তাহার আদি ও একমাত্র
বাসভূমি এই ভারতবর্ষ। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী এই পুণ্য
ভারতভূমি হইতে একদা আলো ও অমৃতের সংবাদ
পাইয়াছিল। ইহা পূবাণ-কথা হইলেও, অনৈতিহাসিক
নহে। এমন সামগ্রিক, সর্বগ্রাসী ও সর্বোদয়মূলক সংস্কৃতি-
সভ্যতার ধারা বাহাদের রক্তে প্রবাহিত তাহার। আজ
আত্মবিস্মৃত, সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও নিজবাসভূমে পরবাসী,
অপাণ্ডু স্তম্ভ। তাহাদের আপন জীবনবোধ ও জীবন-ধারা
স্বকীয় ছন্দে বিকশিত করিয়া তুলিবার কোন নিষ্বস
স্বতন্ত্র ভৌগোলিক ভূমি নাই। ‘হিন্দু ভারত’ একথা আজ
বলিবার উপায় নাই, ভারতের হিন্দু তাহার। অ-
মুসলমান ভারত! অদৃষ্টের অপকল্প পরিহাস! একবর্ণা
অপরিণামদর্শী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সাধনার বিষময় ফলশ্রুতি।
স্বাধীনতা-উত্তরকালে নানা দিক দিয়া হিন্দুর উপর
আঘাত আসিয়াছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কিন্তু হিন্দুর
সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিতে পারে নাই। তার আইন-
কানূনের তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপিত হইতেছে হিন্দুর পিতৃস্বত্তি,
তার উত্তরাধিকারের গৌরব ভুলাইবার লক্ষ্যেই—
অ-হিন্দুর নয়। চিন্তাশীল হিন্দুর নিকট এ বক্তব্য বিশদ
বিস্তার করিবার প্রয়োজন হইবে না।

‘বিশ্বমানব ধর্মের ভিত্তি হিন্দু’—তবে কি মহাযোগীর
এই ভবিষ্যদর্শন মিথ্যা হইবে! ভারতের আস্তর-সত্যের
সঙ্গে বাহাদের পরিচয় আছে তাহার। শ্রীঅরবিন্দের এ
অমোঘ দর্শনে, কখনও অবিশ্বাসী হইবে, না। মানব-

সভ্যতার প্রগতি কখনও থামিষা থাকিবে না। বিভ্রান্ত
ভারত-রাষ্ট্র নানা জাতি ও নানা ভাষাভাষীর মুখ চাহিয়া
যে পথ ধরিয়াছে তাহা ভারতের ভৌম লক্ষ্যে পথ-ঘাত্তার
একটি সাময়িক পর্য্যায় মাত্র।

ভারতে নানা জাতি, মতবাদ ও ধর্মের সম্মিলন।
অঘটন-ঘটনপট্যসী চৈতন্য শক্তিরই ইহা ইচ্ছা। আশ্চর্য্য,
ভারত-সাধনার এই দূর সম্ভাবনা ও সিদ্ধির আভাষ
সম্বন্ধক শ্রীমতিলালের চিত্রপটে প্রতিকলিত হইয়াছে।
সমসাময়িক কাল হয়তো সম্বন্ধরুজ্জীর এই ভবিষ্য দর্শন
অবাস্তব অসার শূন্যগর্ভ কল্পনা বলিয়া উপেক্ষা উড়াইয়া
দিবে। কিন্তু দূরগামিনী শ্ববি-দৃষ্টির অমোঘ অব্যর্থতা
কালই প্রমাণ করিবে। সম্বন্ধরুজ্জীর ভবিষ্যদ্বাণী : “ভূমার
অনুভূতি যুগেই বিশ্ব এসে উপস্থিত হল ভারতে। সে
কোথাও আত্মরক্ষায় আর মাথা তুলতে পারল না।
ভারত বরণ করে নিল বিশ্বকে আপনার মত করে।
ভারতে ছিল না এত জাতি, এত ধর্ম। বিগত কবেক
সহস্র বছরের মধ্যে নানা জাতি, নানা ধর্ম এদেশে স্থায়ী
আসন গ্রহণ করেছে। আজ ভারত হিন্দু, মুসলমান,
খৃষ্টান, বৌদ্ধ সবাই। ভারত ভূমার ধর্ম পেয়ে সকল
ধর্মকে নিজের ক্ষেত্রে ডেকে এনেছে। যে সম্ভা ভূমার
ধর্মে অনুপ্রাণিত সেই হিন্দুসভ্যে ধর্মবস্ত্রই বিসর্জন
দিতে হইবে। ভারত যেদিন ধর্ম বিসর্জন দিবে সেইদিন
বিশ্বে এক নূতন আন্দোলন আসবে। * * ধর্মের পরিচ্ছদ
যতদিন ততদিনই হিন্দু। এই পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করার
পর ধর্মের কোন আকার থাকবে না—অধর্মেরও নয়।
তখন একটা জীবন থাকবে—সে জীবন ধর্ম-অধর্ম বর্জিত
—একবারে অভিনব। * * এতবড় বিশাল জাতি আজ
সর্বহারার—পাপে নয়। উদ্দেশ্য আছে ইহার মূলে!
এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার উপরই বিশ্বজগতের কল্যাণ—
সর্ব মানবমিলনের বনিয়াদ রচিত হইবে।”

ইহাই সম্বন্ধরুজ্জীর অধ্যাত্ম জীবনবাদ।

সর্বসংস্কারমুক্ত, সমর্পিত, নিত্যযুক্ত, নগ্ন, অনন্ত গতিশীল
জীবনের স্পষ্ট যুগ-প্রবক্তা ছিলেন তিনি। এইরূপ
জীবনধর্মী মানবতাবাদের যে ইঙ্গিত তিনি দিয়াছেন
তাহা হ্রস্কিত আগামী কালের মানব চিন্তা ও চেতনার

নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিবে। বিশ্ব মানব চেতনার বিবর্তনও এই সামগ্রিক মানবতা-লক্ষ্যেই। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাবনার মধ্যেও ইহার উদয় দেখিতে পাওয়া যায়। সুভাষচন্দ্রের কথা : “মানবতার উপর আমি আস্থাশীল। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যদি নিঃস্বার্থ হয়ে পবিত্রভাবে জীবন যাপন সম্ভবপূর্ণ হয়, তাহলে একটা জাতির পক্ষেও তা না হবার কারণ নেই।”

একটা সমগ্র জাতির পক্ষে অথবা মানবতায় উত্তরণ সম্ভব—নেতাজীর এই আশা একমাত্র ভারতের হিন্দুর পক্ষেই প্রযোজ্য এই ক্ষুদ্র যে, বিশ্বরহস্য এবং পদার্থের স্বরূপ ও সংগঠনপ্রণালী বিষয়ে বৈদিক সভ্যতার দৃষ্টি ও অনুভব নির্দোষ ও সামগ্রিক—জড় এবং চৈতন্য উভয়কে লইয়াই। অপর পক্ষে পশ্চিমী বৈজ্ঞানিক মানবতার ধারণা কেবলমাত্র জড়মূলতার ক্ষুদ্র ইহা অসম্পূর্ণ, আত্ম-অনুপলব্ধ ও স্ববিরোধী। ভারতীয় সাধনা ও অভিব্যক্তির এই সম্পূর্ণতার অনুভবসিদ্ধ ছিলেন বলিয়াই শ্রীমদ্রবিন্দ বলিতে পারিয়াছিলেন যে বিশ্বমানব ধর্মের বনিয়াদ হিন্দুত্ব।

॥ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ॥

প্রবর্তক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সম্প্রতি পঞ্চকাল দিল্লী পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছেন। মহানগরীর হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠান ভবনে তিনি অবস্থান করিতেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত হিন্দু মহাসভার কর্তৃপক্ষের সহিত ‘বিশ্ব হিন্দু পরিষদ’ সংগঠন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়। এই পরিষদের পরিকল্পিত আগামী প্রথম বিশ্ব-হিন্দু মহাসম্মেলন ভারতে অনুষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহাতে ভারত রাষ্ট্রের স্বাগত সমর্থন ও সহায়তা মিলিবে কি না, এ বিষয়ে উদ্বোধকাদের মনে ঘোরতর সন্দেহ বিদ্যমান। হিন্দু সম্বন্ধে ভারত-রাষ্ট্রের যে স্পর্শকাতর মনোভাব তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। যেহেতু ভারত-রাষ্ট্রের কাছে খৃষ্টান নয়, মুসলমান নয়, বৌদ্ধ নয়, হিন্দু জাতিভেদ-জর্জরিত জঘন্য সাম্প্রদায়িক। অবশ্য এই ‘বিশ্ব হিন্দু পরিষদ’ সংস্থার বিধোচিত উদ্দেশ্য হইতেছে, হিন্দু জাতিকে সামগ্রিক-

ভাবে সুগঠিত করিয়া হিন্দু সংহতি প্রচার দ্বারা মানব-জাতির কল্যাণসাধন। ধর্ম্মান্দোলন বা মন্ত্রপ্রদায়িকতা প্রচারোদ্দেশ্যে এই সংস্থা যে গঠিত হয় নাই তাহা পরিষদের ঘোষণা পত্রে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে।

ইদানীংকালে এই ভারতভূমিতেই বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের দুইটি সম্মেলন হইয়া গেল—গয়ায় বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলন আর বোম্বাই শহরে ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আন্তর্জাতিক ইউক্যারিষ্টিক কংগ্রেস। এই দুইটি সম্মেলনই ভারত রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা ও অগ্রসর গুণেচ্ছা পাইয়াছে। হিন্দু ভারতে হিন্দু কেন এত অবহেলিত, উপেক্ষিত; কারণ হিন্দু আত্মবিশ্বস্ত, অচেতন, অসংহত, নিজেদের চেনে না, জানে না। পৃথিবীর সর্ব ধর্ম্ম, সকল জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শনের আকর এই বৈদিক ভারত। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বুদ্ধ এই ভারতেরই বিদ্রোহী সন্তান (rebel child) এবং খ্রিস্টানিটি ইহার দূর প্রতিধ্বনি (distant echo)। অদ্বৈত অদৃষ্টের পরিহাস!

ভারতে এই ক্যাথলিক খৃষ্টানদের আন্তর্জাতিক ইউক্যারিষ্টিক কংগ্রেস সম্পর্কে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে ‘খৃষ্টধর্ম্মের ভারত বিজয়াভিযান’ শীর্ষক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তিকায় ক্যাথলিক খৃষ্টানদের আগ্রাসী অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনী নগ্ন করিয়া ধরা হইয়াছে। পুস্তিকায় প্রশ্ন করা হইয়াছে : “এই ক্যাথলিক খৃষ্টানগণই কি দক্ষিণ তিয়েৎনামে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ জনতার উপর অমামুখিক আক্রমণ-অত্যাচার করে নাই? এই খৃষ্টানগণই কি ভারতের নাগাভূমিতে বিজ্রোহ জিয়াইয়া রাখিতেছেন না? ভারতে গোয়ার স্বাধীনতা লাভের পরে এই খৃষ্টানগণই কি তাহাদের জঘন্য প্রচারক পূর্বপুরুষ ক্র্যাঙ্গলিস ত্রেভিয়ারের মূর্তি ছাপাইয়া প্রচার এবং ভগবান বুদ্ধের মূর্তিতে পদাঘাত করে নাই? ইহারাই কি কলিকাতারীতে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিচিহ্ন নষ্ট করে নাই?”

এই আন্তর্জাতিক ইউক্যারিষ্টিক কংগ্রেসের ঘোষণা পত্রে (IEC Bulletin Vol. 11—6) ইহার অভিসন্ধি এইভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে : “আমাদের লক্ষ্য—এ দেশে ও সমগ্র জগতে খৃষ্টের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

করা। আমরা খৃষ্টের সৈন্তবাহিনী। আমাদের এই ধর্মযুদ্ধ খৃষ্টধর্মের বিজয়যুদ্ধ।”

বোম্বাই সহরে এই ক্যাথলিক খৃষ্টান কংগ্রেস অধিবেশনের অনতিকাল পরেই ইহার বিজয়যুদ্ধের একটি অধ্যক্ষ নমুনাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গত হিন্দীবিরোধী আন্দোলনের সময় পণ্ডিতেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের উপর যে অহেতুক ঘণ্য আক্রমণ হয় তার চারিটি উৎসের কথা আশ্রমজননী এক বোষণা পত্রে জানাইয়াছেন। ‘মাদার’-এরই ভাষা “This antagonism comes from four sources.” এই ‘Source’-এর সর্বপ্রথম হইতেছে : “The militant catholics, because—in spite of what the Pope declared after his visit to India,—they are convinced that whoever is not a Catholic must be an instrument of the devil.”

এই ‘আন্তর্জাতিক ইউক্যারিষ্টিক’ আর ‘প্যান ইসলামিক’ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি একই। এই উভয়েরই ধারণা অ-খৃষ্টান ও অ-মুসলমান যথাক্রমে ডেভিল ও কাফের।

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ। এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সবারই সমান অধিকার। রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানের প্রয়োগে ও আচরণে সান্য থাকিলে কাহারও কিছু অভিযোগ থাকে না। কিন্তু গদী ও কমতা রক্ষার সাময়িক অন্ধ মোহজনিত ভারত-রাষ্ট্রের দুয়ো-সুয়োরামণীর ব্যবহার ভারতের বিশেষ হিন্দুর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্নই করিয়া তুলিতেছে।

রাষ্ট্র জনগণেরই প্রতিনিধি-নিয়ন্ত্রিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভারতে এমনটি ছিন্ন-মস্তা নীতি যে ঘটতে পারিতেছে তাহার কারণ ভারতের হিন্দু আজ বিভ্রান্ত। হিন্দুদের হিন্দু হইয়া বাঁচিতে হইলে অনিশ্চিত অসংহত হইতে হইবে এবং শুধু তাই নয়, আরও যাহা হইতে হইবে স্বামীজীর ভাষায় “Hinduism must be aggressive and Hindus a little fanatic.”

এ কথা বলিলে অত্যাক্তি হইবে না যে, হিন্দু যদি লুপ্ত হয়, বিশ্বমানব সভ্যতার বনিয়াদ ধসিয়া পড়িবে, আর

নিভিয়া যাইবে সভ্যতার দিব্য উত্তরণের আলো। হিন্দুধর্মবিহীন পুণ্য ভারতভূমির যে ছুরবস্থা হইবে তাহা দূর-দর্শিনী অ্যানি বেসান্টের ভাষায়ই বলি : “এ কথা ধেন মনে থাকে, কদাচ ভুল না হয় যে হিন্দুধর্ম ছাড়া ভারতের কোন ভবিষ্যৎ নাই। হিন্দুধর্মের ভূমিতেই ভারতের মূল স্বদৃঢ়রূপে প্রোথিত। হিন্দুধর্ম হইতে ছিন্নমূল হইলেই ভারতবর্ষ শুকাইয়া যাইবে। ভারতে কত বৈদেশিক জাতি আসিয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে : কত, রাজা ও রাজ্যের উত্থানপতন ঘটিয়াছে, তথাপি এখনও ভারত নিজস্ব সত্ত্বা লইয়া বর্তমান। কিন্তু যদি হিন্দুধর্মের ভিত্তিভূমি ধসিয়া যায়, তবে কি থাকিবে? থাকিবে একটি জড় ভূখণ্ড, তার সমস্ত মহত্ত্ব মহিমা হইবে বিলুপ্ত।

সুতরাং সাধু সাবধান! এখনও অনতিবিলম্ব হয় নাই। বর্তমানে গণতন্ত্রে ব্যক্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ গণনীয় নহে। ইহার ক্ষমতার উৎস চোর-ডাকাত, ঠগ-প্রবঞ্চক, কালোবাজারী, শীল-সদাচারহীন, নীতিভ্রষ্ট নির্বিশেষে মাথা গুন্তি জন-সংখ্যা। সুতরাং আজকের দিনে হিন্দুকে যদি হিন্দু হইয়াই বাঁচিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে সম্ভবদ্রুত ও জনসংখ্যা উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই লক্ষ্যে যদি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সভ্যই অগ্রসর হয় তবে তাহা নিশ্চয়ই অভিনন্দনীয় হইবে।

প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার কার্যবিবরণী :

- ১। প্রকাশের স্থান : ৬১ বিশিষ্টবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২
- ২। প্রকাশকাল : মাসিক
- ৩। মুদ্রাকর : শ্রীকৃষ্ণচরণ রায়
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ২২৩ বিশিষ্টবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলি-১২
- ৪। প্রকাশক : রাধারমণ চৌধুরী
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৬১ বিশিষ্টবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলি-১২
- ৫। সম্পাদক : অরুণচন্দ্র দত্ত ও রাধারমণ চৌধুরী
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : প্রবর্তক সত্ত্ব, চন্দ্রনগর, হুগলী
- ৬। স্বরাধিকারী : প্রবর্তক ট্রাস্ট, ৬১ বিশিষ্টবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলি-১২
আসি রাধারমণ চৌধুরী ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১০/৪/৩৫

রাধারমণ চৌধুরী
প্রকাশক : প্রবর্তক

স্মৃতি-আলেখ্য

স্মৃতি-আলেখ্য—শ্রীমূলপ্রসাদ সর্বাধিকারী।
শাশক—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, বি. এ.। ৩১, বিপিন-
বহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫৮ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে আত্ম-চরিত্রের অভাব নাই। পঞ্চ-সাহিত্যের
চরিত্র কিছুকাল পর হইতেই আত্ম-চরিত্র রচনা আরম্ভ হয়। অবশ্য
স্মৃতি-আলেখ্য লেখকের নিছক আত্ম-চরিত্র নহে; তথাপি তাঁহার
ঘটনাবহুল জীবনের কিয়দংশের উপর এই গ্রন্থ আলোকপাত করিয়াছে।
কলিকাতার কতিপয় অভিজাত বংশের মধ্যে সর্বাধিকারী বংশ
প্রাচীন। কলিকাতায় বহু অভিজাত বংশের সঙ্গে গ্রন্থকারের
প্রিয়ারে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, সে-সুপের সমাজ-ব্যবহার, বিশেষ
গন্ধ-প্রতিষ্ঠানের নিখুঁত চিত্র উক্ত গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়াছে।

বাহ্যিক নব-জাগৃতির যুগে শিক্ষার, বিজ্ঞানের, সাহিত্যের, চিকিৎসার,
এমন কি রাজনীতিতে যে সকল মনোবীর অবদান বেশকিছু সমুদ্র করিয়াছে,
সেই সকল মনোবীর সহিত লেখকের যোগাযোগের ঘটনাসমূহ
স্পষ্টভাবে এই স্মৃতি-আলেখ্যে লিখিত আছে। এই গ্রন্থে লেখক
‘মিউজিয়াম অফ দ্য পাস্ট’, ‘মেডিক্যাল কোর’ ও ‘কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠার
ইতিহাস সবিত্তরে না হইলেও, ইতিহাসে ব্যস্ত করায়, কিছু কিছু নূতন
তথ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। অধুনালুপ্ত ‘হিতবাদী’ পত্রিকার

অবলুপ্তির ইতিহাসটি এতদিন প্রায় অজ্ঞকার অবগুণ্ঠনের অন্তর্ভুক্ত
লুপ্ত ছিল; লেখক সেই রহস্যের উপর আলোকপাত করিয়াছেন।
সে কালের অস্তিত্ব পত্রিকার একটা মোটামুটি আভাসও গ্রন্থকার
স্বকোশলে পরিবেশনের চেষ্টা করেন নাই।

স্মৃতি-আলেখ্য গ্রন্থের চরম ও পরম অধ্যায়টি রচিত গ্রন্থকারের সন্ততি
তার সহধর্মিণী সত্যবতীর সম্পর্কে, মিলন ও বিচ্ছেদ। এত বাস্তব, কিন্তু
ইহার রসসংবেদন উপভোগকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। স্মৃতি-
লেখক-মাধুর্যের অনাবিল নিরন্তর পাঠকের চিত্ত রসানুত করে। এই
দিক দিয়া বাংলার রস-সাহিত্যে শ্রীমূলপ্রসাদের স্মৃতি-আলেখ্য অক্ষয়
স্থান লাভ করিবে ইহা অনিশ্চিত। এই দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য ও
সহিমা আত্মকের দিনে বিলুপ্তপ্রায়। আগামী দিনে বর্তমানের
বিভ্রান্ত সমাজ এখন আত্মস্থ হইবার পথ খুঁজিবে তখন ‘স্মৃতি-আলেখ্য’
গ্রন্থে অনিশ্চিত পথের দিশা মিলিবে।

গ্রন্থের প্রচ্ছদপট মনোরম হইয়াছে। সর্বাধিকারী লেখকের
রচনামৌলিক সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ অধুনালুপ্ত ‘বিশ্বলী’কে
শোক-স্মৃতি বলা চলে। লেখকের শ্রেষ্ঠীলা প্রথমা কল্পার অকাল
মৃত্যুর আঘাতের ফল—উক্ত গ্রন্থ। দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘সত্যবতী’—তাঁহার
প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুজনিত শোকোচ্ছ্বাস। লেখক বারুক-প্রীড়িত
হইয়া তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী এই স্মৃতি-আলেখ্যে তৃতীয় গ্রন্থরূপে
পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছেন। লেখকের এই অবদান অতুলনীয়।
লেখক যে সকল ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল ঘটনার
সন, তারিখ উল্লেখ থাকিলে, তথ্যমুসন্ধিগ্রন্থ পাঠকের পক্ষে বিশেষ
সুবিধা হইত। আশা করি, লেখক পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থের এই অভাব
পূরণ করিয়া গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ করিবেন। গ্রন্থখানি বাংলার
ইতিহাসের উপাদান হিসাবে আবৃত্ত হইবে।

ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার

বর্ষ শেষের নিবেদন

● আগামী বৈশাখে, ১৩৭২, শ্রীভগবানের অশেষ করুণায়, প্রবর্তক পত্রিকা ৫০ তম বর্ষে পদার্পণ
করিবে। ১৩৭২ সাল প্রবর্তকের স্বর্ণ জয়ন্তী বৎসর। পত্রিকাখানিকে ইহার মৌলিক আদর্শমুগ্ধ যথাসাধ্য
মৌলিক দিবার ইচ্ছা। প্রবর্তকের প্রাণপুষ্প ও প্রতিষ্ঠাতা সজ্ঞানুভূত শ্রীমতিলালের জন্মতিথিতে (২২-এ পৌষ)
পত্রিকার বিশেষ স্বর্ণ জয়ন্তী স্মরণীয় সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনাও আছে। এই পুণ্য স্মরণীয় বৎসরে প্রবর্তকের
গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও অস্বাভাবিক সুহৃদবৃন্দের সপ্রেম সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

● প্রবর্তক যুগসম্মত মৌলিক ভারতীয় ভাব ও আদর্শের উদ্গাতা। সেই আদর্শের হোমায়ি-শিক্ষা আজকের
প্রতিকূল পরিবেশ ও ব্যাপক চটুল উপরিচর আবহাওয়ার মধ্যে প্রচ্ছলিত রাখার ব্রত প্রবর্তকের এবং ইহার সমুদয়
তার তপস্বী ও কৃষ্ণসাধন। এই মহৎ ভাবগর্ভতার জন্তই প্রবর্তকের ক্ষীণকায় মরমী পাঠক-পাঠিকার নিকট
স্বীয়ের হয়নি। জহরীর নিকট পক্ষত প্রমাণ নোংরা আবর্জনা স্তরের চেয়ে স্বর্ণ মুষ্টির আদর অধিক নিশ্চয়ই।

● আগামী বর্ষেও যথারীতি প্রবর্তকের বৈশাখে অক্ষয়তৃতীয়া সংখ্যা ও পূণ্য পূজা-সংখ্যা হইবে।

● গ্রাহকগণ পত্রিকার বকেয়া ও নব বর্ষের দক্ষিণা যথাসম্ভব পাঠিয়ে দিলে বাধিত হইবে। অগ্রথায় আদায়ের সঠিক
সময়টি জানিয়ে দিলে ভাল হয়। অপরিহার্য কারণে পত্রিকা বন্ধ করিলে তাও চৈত্র সংখ্যা পত্রিকা প্রাপ্তির
সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিবেন। গ্রাহক নম্বর, পুরো ঠিকানা ও নূতন গ্রাহকের পক্ষে ‘নূতন’ কথাটি উল্লেখনীয়।

● পত্রিকার কম্পিউটারী-প্রাপকগণ তাঁহাদের বর্তমান ঠিকানা সম্বন্ধে পত্রদ্বারা নিশ্চিত করিবেন।

● পত্রিকার উন্নতিকল্পে সহদয় ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ প্রার্থনীয়।

● পাকিস্তানে চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা : শ্রীবীরেন্দ্রলাল চৌধুরী, প্রবর্তক সজ্ঞ, চট্টগ্রাম।

পরিচালক—প্রবর্তক

PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD.

Gram : 'PRABARTAK'

Mg. Agents—PRABARTAK TRUST

Phone : 34-3088 &

IMPORT :
Machineries
Papers, Boards,
Synthetic Resin
Milk products
Casein and Chemicals
and Sundry Goods.

**Expert Buying Service available
at a very Moderate Charge.**

EXPORT :
Jute Manufactures
Shellac, Kapok,
Myrobalan,
Cattle foods,
Spices, Rosin and
other India Products

61, Bepinbehari Ganguly Street

Calcutta-12

Codes used : A. B. C. 5th. 6th. & 7th. Edition ; Bentley's Complete
Phrase, Western Union, Universal and 5-Letter, Acme
and Com. Phrase with Supplement ; Schofields 3-Letter.

আর মিতের

স্মারক

তিল তৈল



বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃস্রাবাদ অদ্বিতীয়

আমি সত্যাকীর সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীশ্রীশ্রীপ্রসাদ সর্কাধিকার
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
এছখানি বাংলার জীবন
সাহিত্যে অমরীয় অবদান।
শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত
বহু চিত্র সম্বলিত।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ
ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬ টাকা। ডঃ আনন্দভট্টাচার্য্য
কর্তৃক সংকলিত।
দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কর্তৃক
ডি. এম. লাইব্রেরী কলিকাতা
প্রবর্তক পাবলিশার্স কলিকাতা

॥ শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ.
পি. আর. এস. ॥
সংস্কৃত ভাষা ৫-০০ শব্দ ভাষা ১৫-০০
জাতিভেদ ১ বেদ ও
কোরাণের সাদৃশ্য ১
॥ পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ॥
শ্রীশ্রীনামাযত্ন ২-২৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০
। কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥
পরার্থকথা ২-২৫

প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২



**POLYTHENE
PIPES**

- Light Flexible
- Non-Corrosive
- Acid Proof

P.V.C. PIPES.



**SANKHA
COMBS**

- Durable
- Comfortable
- Economic

Purnima TOOTH BRUSH

JESSORE COMB INDUSTRY CO.
ESTD. 1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO. 10813

সাময়িক

প্রবর্তক সঙ্ঘ আক্ষয় তৃতীয়া উৎসব :

আগামী ২১-এ বৈশাখ ১৩৭২ (৪ঠা মে) হইতে ১লা জ্যৈষ্ঠ (২৫-এ) পর্যন্ত প্রবর্তক সঙ্ঘ আক্ষয় তৃতীয়া উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী যথারীতি নাননগর গোখামোঘাটস্থ শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে। এই জাতীয় হোৎসবের এবার ৪০তম বর্ষ। শ্রীমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসবের ব্যোম্মপ্রবাহ প্রায় একমাস চলে। এই মহোৎসবের উদ্দেশ্য ভারতীয় মৌলিক ভাব ও আদর্শের প্রচার, ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজ শিক্ষা, বিজ্ঞান, যুগ প্রভৃতি বিষয়-প্রচার দ্বারা জনগণের কল্যাণ বিধান করা। আগামী রাতে মুক্তি, চিত্র ও লিপিবোগে কয়েকটি দৃশ্যে 'নবজাতির দীক্ষা' কল্পনাটিকে রূপ দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুজীর তিরোভাবোৎসব :

প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রাণপুঙ্খ ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুজীর ষষ্ঠ বার্ষিক তিরোভাবোৎসব গত ২৭-এ চৈত্র, ১৩৭১ সনিত শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-স্বরণ ও নিবিড় নিষ্ঠাময় আবহাওয়ার মধ্যে চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সারাদিন শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-স্বরণানুষ্ঠানের কার্যক্রম অনুস্থত হয়। সকাল ৫টা হইতে সমবেত উপাসনা, সঙ্ঘবাণী পাঠ এবং কঠোপনিষদের আংশিক ও সমগ্র গীতা পাঠ হয়। তারপর বেলা ১-১০টা পর্যন্ত শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-ভবনে সমবেত গুরু ধ্যানায়ে সত্য-সত্যারা সমাধিক্ষেত্র প্রদক্ষিণ ও পুষ্পাঘা বেদন করেন। ইহাব পর অপরাহ্ন ৫টা পর্যন্ত ব্রহ্মনাম যজ্ঞ এবং ৬টা পর্যন্ত সঙ্ঘাচার্য শ্রীশ্রীনাথায় তর্কতীর্থ মহাভারতের সমবেচিৎ বিশেষ ব্যাখ্যা করেন। সমবেত সাক্ষা উপাসনা ও পূর্ণমদঃ পুস্তির সঙ্গে উৎসব সমাপ্ত হয়। এই শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-স্বরণবাসবে সঙ্ঘের তুরাগী, হুহান, ভক্ত, শিষ্য ও সর্বশ্রেণীর সত্য-সত্যারা বোগদান করেন।

পরলোকে রাজমোহন নাথ :

বিগত ৩রা এপ্রিল শ্রীব্রাহ্মমোহন নাথ বি. ই. তত্ত্ববূষণ অকল্যাঃ একদিনের অসুস্থতায় পরলোকগমন করেন। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই সংবাদটি আমাদের বেদনার্ত্ত করে। মাত্র ক'দিন পূর্বেই আমরা তাঁর পত্র পাইয়াছিলাম। পত্রে কত কথা, কত আশা, কত পরিকল্পনা। প্রবর্তক পত্রিকার তিনি শুধু নিয়মিত লেখকই ছিলেন না, একান্ত শুভামুখ্যারীও ছিলেন। পত্রিকাখানি পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তিনি পত্রিকার দীর্ঘকাল গ্রাহক থাকিয়া নিয়মিত ইহাব দক্ষিণা দিরা গিয়াছেন। প্রবর্তক পাঠক-পাঠিকার নিকট রাজমোহনবাবুর নাম সুবিধিত।

অসাধারণ জীবন ছিল তাঁর। আসাম-হর্ম্মা উপত্যকার কাছাড় জেলার লাল পল্লীতে এক ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন তিনি। তাঁর জন্ম যে সময়ে দে-সময়ে শিক্ষাব আলো বা সুযোগ সুবিধা ও অঞ্চলে ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু কোন বাধা-বিপত্তিই তাঁকে মেধাবী ও জ্ঞানাত্মসম্বীর অগ্রগমনের পথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি আসাম সরকারের ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে বহু কৃতিত্বের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য একাধারে তাঁকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাঁর মত অসাধারণ অর্থ সম্প্রদায়ী মানুষ এ যুগে বিরল। অমৃত্যুর প্রতিবাদ করিতে এমন নির্ভীকতাও কমই দেখা যায়। রাজমোহনবাবুর প্রায় সর্ব বিষয়েই গভীর পাণ্ডিত্য ছিল—আসামী, বাংলা, ইংরাজীতে প্রায় শত গ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন নাথ-পন্থী যোগী ও সাধক। গৌরবান্বিত সম্প্রদায়ের যোগ-পন্থার জটিল রহস্যের উপর বহু এবং বিচিত্র গ্রন্থ লিখিয়া তিনি যে আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন তাহা শুধু এই আদি যোগবিজ্ঞানকে যুগদম্বিত করিয়া ধবে নাই, নাথ-সম্প্রদায়কেও শ্রদ্ধা ও যুগ-পরিচিতিতে প্রতিষ্ঠা দিয়া গিয়াছে। বেদ-উপনিষদের সাধন ও প্রায়োগিক জটিল রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়া শ্রীনাথ আধুনিক ও বেদ-বিজ্ঞানের যে তুল্য-মূল্যতা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার স্মরণীয় মনীষার অমূল্য অবদান হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি যে গুরুদেবের পশ্চিমাবাদ

উৎসব অনুষ্ঠানে -
হৃদয় সন্দেশ
অপরিহার্য!

৮৬, আমহার্ট স্ট্রীট কলি: ৯ ফোন-৩৫-১৩৮৩	৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২ ফোন-৩৪-২৫৩৩
---	---

স্বনামধন্য ক্রীডাবিদ
কল্পনাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের
বিদেশে মোহনবাগান-৪০০
বিভিন্ন দেশে মোহনবাগান ক্লাবের
রোমাঞ্চকর সফর কাহিনী। বহু
চিত্র ও অজানা তথ্যসমৃদ্ধ। সহজ
সাবলীল। রচনা-রচনার শুদ্ধী।
ফুটবল খেলার এ-দেশ ও-দেশের
তুলনামূলক সমালোচনা-বই এই
প্রথম। সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত।
প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলি: ১২

করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও ছাপা সম্পূর্ণ হয় নাই। এ কথা বিনা বিতর্কে বলা চলে যে, রামমোহনের অন্তর্ধান ভারতীয় সংস্কৃতি বিশেষ বৈদ-রত্ন উৎসবটির ক্ষেত্রে যে অভাব সৃষ্টি করিল তাহা সহজে পূরণীয় হইবার নহে।

অবসরজীবনে অধ্যাপক মনীষা-স্কুরণের মধ্যাহ্ন যুহুর্ভে, ৭০ বৎসর পূর্ণ না হইতে, রামমোহনের পরলোকগমন জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে মর্মান্তক দুর্ঘটনা। বৈদিক ও বৌদ্ধিক সাধন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক কিছু করার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা তাঁর অপরূপ রহিয়া গেল। শিলং-এর নিম্ন বাটীতেই তিনি থাকিতেন এবং ঐখানেই তিনি গবেষণা ও জ্ঞান-চর্চা করিতেন। এই জগৎই তাঁর পরিচিতি ঐকটী মীমিত হইয়া আছে। অন্ত্যায় ইহা আরও ব্যাণকতা লাভ করিতে পারিত। এই মহাজীবনের পরিচয় প্রবর্তকে আগামীতে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

পরলোকে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী :

গত ১-ই মার্চ প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ৮০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৮৮৫ খ্রষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার ছুরাজানী গ্রামে গিরিজাশঙ্করের জন্ম হয়। তাঁহার ছাত্রজীবন বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও রামমোহনীয় ব্রাহ্ম-সমাজের ভাবধারার প্রভাব যুক্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আচার্য্য ব্রহ্মেন্দ্রনাথ শীলের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ বোঝাপড়া ছিল। ১৯১২ হইতে তিনি 'দেবালয়' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১০ খ্রষ্টাব্দ হইতে প্রায়

অর্ধশতাব্দীকাল তিনি বাংলা সাহিত্যেব সেবা করিয়া গিয়াছেন 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার যদেনী যুগ', 'বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উদয়-শতাব্দী' 'অযকেন-বার্গেনে-নিট সে' 'রাজা রামমোহন রায়' প্রভৃতি তাঁর রচিত কথোপনি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী সম্পদ।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

দৃষ্টিশক্তি (আই ড্রপ)

(সম্পূর্ণ ভারতীয় ভেষজজাত)

অনেক সাধুমহাত্মার স্বেচ্ছা প্রণোদিত নির্দেশে ঔষধটি প্রস্তুত ও ব্যবহৃত। ছানি এবং জটিল ও দুরারোগ্য চক্ষুরোগে 'দৃষ্টিশক্তি'র অব্যর্থ কার্যকারীতা প্রমাণিত।

দেশ-বিদেশে চক্ষুরোগ নিরাময় ক্ষেত্রে 'দৃষ্টিশক্তি' ঔষধটি অচিরে যুগান্তর আনার সম্ভাবনাপূর্ণ। সম্প্রতি পেটেন্ট আকারে ঔষধটি চালু করা হইয়াছে।

রাধারমণ ঔষধালয়

৫৫, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা - ৩

সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা

= শুভবিবাহের বিচিত্র বেনারসী শাড়ী =

॥ বিভাগীয় বিপণি ॥

[কটন : সিল্ক : উলের জিনিষ : বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী প্রভৃতি]

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : ফোন ৩৩-২৩০৩

বাজালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি বিচিত্র রুচিসম্মত শাড়ীর বিপুল সম্ভার।

আধুনিক ডিজাইনের হরেক রকম দেশী তাঁতের শাড়ী।

গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার প্রচুর আয়োজন।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাক্টোন লিমিটেড, ৫১৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণরায় কর্তৃক মুদ্রিত।

॥ কষেকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ ॥

॥ অধ্যাপক বিজ্ঞানবিহারী বসু ॥

কর্মবীর রাসবিহারী বসু—৫-০০

৷ উন্নয়োগ্য জীবনকথা । বহুল চিত্রসম্বলিত ।

৷ বিপ্লবী নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ॥

বিপ্লবীবীর রাসবিহারী—৫-০০

॥ শ্রীবলাই দেবশর্মা ॥

উপাধ্যায় ব্রজবান্ধব—৫-০০

॥ ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী

এম. এ. পি-এইচ-ডি. ॥

অমৃতের সন্ধান (উপনিষদের সারমর্ম) ৬।০

॥ শ্রীশুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক ॥

মহাত্মার কথামৃত—১০-০০

৷ কুরাচার্য ৫-০০ ৷ সঁওতালী কথা ২-০০

Jpanishad Vol. I Rs. 3/- Vol. II 6/-

মনোবী পণ্ডিত গুণদাচরণ সেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (২য় সং) ৫-০০

বহুদারণ্যক ও ছান্দোগ্য—১-৫০

॥ ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥

ভক্তের আলো ৪-০০

প্রজ্ঞার আলো—১-২৫

॥ শ্রীমৎ স্বামী উপানন্দ মহারাজ ॥

আত্মার আলো ১-২৫

॥ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী ॥

৷ গীতার আলো ১-৫০ ৷ মহামায়ী ১-৫০

প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

বাজারের ডেরা

কিরণ



কিরণের ষ্টাণ্ডার্ড ও ডিল্লু মার্কা চিকণী বিভিন্ন
রঙে পাওয়া যায়, ইহা মেশিনে তৈয়ারী।
প্রতিটি চিকণীর দাঁত গোলাকার ও মাথা মসৃণ।
চুল ছিঁড়ে আসে না বা মাথায় লাগে না আর
এমন টেকসই যে স্বচ্ছন্দে অনেক দিন চলে।

কিরণ এর চিকণী

আপনার চিকণীর
সমস্তা মেটাবে

কিরণ প্রোডাক্টস প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২



"নিম্বল"

আয়ুর্বেদীয় দাঁতের মাজন

নিয়মিত ব্যবহারে অল্পজ্বলিত দন্তের
ক্ষয় নিবারণ করিয়া দন্ত ও মাড়ী
সুস্থ করে এবং মুখের হৃগন্ধ বিদূরিত
হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস সুবভিত হয়।

আর্য ওষধালয় কলিকাতা-১৭

॥ স্বামী যোগানন্দ প্রণীত ॥

স্বরূপ সিদ্ধি (৩য় সং) ২-৫০

জীবনতত্ত্ববিবেক (২য় সং) ৪-০০

Living Knowledge 4.00

(যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি বিশ্লেষণ
নৈপুণ্য। মুখস্থ নিশ্চয়ই সাধনার
আলো ও পথ পাইবেন)

॥ শুভঙ্করের ॥

মন্ডা-নন্দা'র দেশে ৪-০০

(উপস্থাপনাম ভ্রমণ কাহিনী)

॥ শ্রীশুরেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও
প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ
ঘোষের বিস্তৃত পরিশিষ্ট সম্বলিত ॥

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০

প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলি-১২

30 APR 1933



মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে হ'লে
ক্লোরোফিল যুক্ত

রদফেন

টুথপেস্ট ব্যবহার করুন

দাঁতের গোড়ার ঘা, পাথো বিয়া
ইত্যাদি সারাতে ক্লোরোফিল সাহায্য
করে। নিয়মিত ক্লোরোফিল যুক্ত
রদফেন ব্যবহারে মুখের
বিশ্রী গন্ধ নিবারিত হয়, দাঁত
ঝকঝকে সাদা দেখায়, ঘা
ও দাঁতের ক্ষয় দূর হয়।



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর



ঔষধ ও ঔষধসিক্ত
মবার আর্জি
সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো
বাটেই ক্রমবর্ধমান রপ্তানি
বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা
আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও
উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করে চলে

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা - উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে :
'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিক্যুরিটি'
সিলিং ওয়াল, 'পেনসল', স্টাম্প প্যাড,
বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল,
স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

ফাউন্টেন পেনের
কালি

স্টেনসিল

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন রঙে
এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ৭০০ এম.এল সাইজে পাওয়া যায়

PRO/SW - 17